বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার

সিলেট

প্রধান সম্পাদক

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার
সিলেট

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার

সিলেট

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
প্রধান সম্পাদক
জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন কর্মসূচি
প্রাক্তন মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্রাক্তন সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
প্রাক্তন সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাক্তন সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
কবি ও নৃবিজ্ঞানী

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
২০১৭

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৭/পৌষ ২০২৪
প্রকাশক: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মুদ্রক:
এফএ অ্যান্ড এমআইএস (প্রকাশনা শাখা)
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।

পাণ্ডুলিপি:
জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন কর্মসূচি
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

মূল্য: টাকা ৪০০.০০
ইউএস ডলার : ২০

ISBN: 978-984-34-5290-0

Bangladesh Zila Gazetteer Sylhet
(Physical and Socio-economic History of Sylhet District):
Edited by Dr. Kamal Abdul Naser Chowdhury
Published by Statistics and Informatics Division
Agargaon, Dhaka-1207

Price: Taka 400.00
USD: 20

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

হজরত শাহজালাল (র.) ও হজরত শাহপরান (র.)-এর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহ্যবাহী সিলেট জেলার গেজেটিয়ার বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সুরমা-কুশিয়ারা নদীবিধৌত, জৈন্তা ও খাসিয়া পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধ ও প্রাচীন এক জনপদের নাম সিলেট। ইতিহাস-ঐতিহ্যে গৌরবমণ্ডিত, অপূর্ব জীববৈচিত্র্য, টিলা, পাহাড়, বন, চা-বাগান, ঝরনা, হাওর-বাঁওড়, জলাভূমির এক বিচিত্র সমাহারে সমৃদ্ধ সিলেট জেলা।

সুশোভিত চা বাগান, রাতারগুল বন, জাফলংয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসমৃদ্ধ প্রাণিবৈচিত্র্যে ভরপুর সিলেট জেলা।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবানে সাড়া দিয়ে এ জেলার মুক্তিকামী জনগণ দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতায় অসামান্য অবদান রাখেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল এমএজি ওসমানী এ জেলারই কৃতিসন্তান। সিলেট জেলার জনগণের আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গেজেটিয়ার প্রতিটি জেলার আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক অবস্থান, ভূপ্রাকৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান, পরিবেশ, জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য, নদনদী, প্রাগৈতিহাসিক, ঔপনিবেশিক শাসন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ সার্বিক ইতিহাসকে কালের ধারাবাহিকতায় ধারণ করে রাখে। গেজেটিয়ারের প্রতিটি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা, রাজনীতি, জনস্বাস্থ্য, সংখ্যাতত্ত্ব প্রভৃতি অতীত ও বর্তমানের সাথে ভবিষ্যতের মেলবন্ধন রচনা করে।

এ গেজেটিয়ার প্রকাশে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি এ গেজেটিয়ারের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত পাহাড়, হাওর, টিলা ঘেরা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সিলেট জেলার গেজেটিয়ার বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত খুশির বিষয়। বাংলা ভাষায় লিখিত এই গেজেটিয়ার জ্ঞানপিপাসু পাঠকের মনকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পুণ্যভূমি সিলেট জেলা আমাদের কাছে পরিচিত হজরত শাহজালাল (র.) এবং হজরত শাহপরান (র.)-এর পবিত্র মাজার এবং এর বিশ্ববিখ্যাত চায়ের জন্য। ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সুরমা-কুশিয়ারা-সারি নদীবিধৌত এ জেলার রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান।

বাংলা ভাষায় সিলেট জেলার গেজেটিয়ার প্রস্তুতে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যথাক্রমে, প্রধান সম্পাদক, উপদেষ্টামণ্ডলী, প্রণেতাবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি এ গেজেটিয়ার সর্বস্তরের পাঠকের কাছে সাদরে গৃহীত হবে।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, *এম. পি*

সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

১২ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

উপক্রমণিকা

একটি জেলার ভূপ্রকৃতি-পরিবেশ, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, ভাষা সাহিত্য এবং সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ইতিহাসের আলোকে কালানুক্রমিক বিবরণই হলো জেলা গেজেটিয়ার।

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতে জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান আমলে দেশের ১৬টি জেলার গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৩টি জেলা গেজেটিয়ার ইংরেজি ভাষায় এবং ১২টি জেলা গেজেটিয়ার বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে দেশে ৬৪টি জেলার সৃষ্টি হয়।

সংস্থাপন (বর্তমানে জনপ্রশাসন) মন্ত্রণালয়ের ২১ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখের সম(জেএ-২)-২৩/৯০-১৭০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মোতাবেক জেলা গেজেটিয়ার কার্যালয়ের কার্যকারিতা ১ জুলাই, ১৯৯৮ তারিখ থেকে বিলুপ্ত করে জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নের দায়িত্ব পরিসংখ্যান বিভাগের (বর্তমানে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ) ওপর ন্যস্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে এ বিভাগ হতে ৬৪টি জেলার জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পাইলট হিসেবে বর্তমানে ৭টি জেলার গেজেটিয়ার প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাকি ৫৭টি জেলার গেজেটিয়ার প্রণয়নের ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন আছে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে জেলাসহ ৭টি জেলার গেজেটিয়ার প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সম্পাদনা পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদ এবং জেলাপর্যায়ে জেলা সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। প্রখ্যাত কবি ও নৃবিজ্ঞানী এবং মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীকে প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। জেলাপর্যায়ে প্রণীত কমিটিসমূহ জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে লেখক নির্বাচন করে অধ্যায়সমূহ রচনা করেন এবং প্রধান সম্পাদক মহোদয়ের নেতৃত্বে সম্পাদনা পরিষদ প্রণীত অধ্যায়সমূহ বিশদ পর্যালোচনা ও সম্পাদনা করে জেলা গেজেটিয়ারসমূহ প্রণয়ন করেছেন। এ কর্মসূচিতে পরামর্শক হিসেবে সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব ড. মো. হাফিজুর রহমান ভূঞা দায়িত্ব পালন করেছেন।

দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা, আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনগণকে পরিচিতকরণে জেলা গেজেটিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তা ছাড়া জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণ, গবেষক, সমাজকর্মী ও অন্যান্য তথ্য ব্যবহারকারীগণের জন্য জেলার বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা। বাংলা ভাষায় লিখিত এই গেজেটিয়ার জ্ঞানপিপাসু পাঠকের মনকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এ জেলা গেজেটিয়ার প্রস্তুতে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন প্রধান সম্পাদক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, উপদেষ্টামণ্ডলী, সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, পরামর্শক ও অধ্যায় প্রণেতাবৃন্দ, কর্মসূচি পরিচালক, সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আশা করি এ জেলা গেজেটিয়ার পাঠে সর্বস্তরের পাঠক উপকৃত হবেন।

কে এম মোজাম্মেল হক

ভূমিকা

কোনো জেলার ভূ-প্রকৃতি (Topography) ও পরিবেশ, সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা, জীবন-জীবিকা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জনপ্রশাসন ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের নানা বিষয়ে পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় লিখিত কোনো ঘটনাবলির বিবরণ হলো জেলা গেজেটিয়ার। প্রসঙ্গত, *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ* কর্তৃক ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত *ভারতকোষ* (তৃতীয় খণ্ড: ১৭৪)-এর বিজ্ঞ সম্পাদকমণ্ডলী গেজেটিয়ারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন: 'যে গ্রন্থে বিভিন্ন জায়গা সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত থাকে তাহাকে গেজেটিয়ার বা ভৌগোলিক অভিধান বলে। ইহাতে নানা দেশ, অঞ্চল, জেলা, নদনদী, পাহাড়, গ্রাম, শহর ইত্যাদি সম্পর্কে বহুবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবিষ্ট থাকে। এতদ্‌ব্যতীত দেশের বা অঞ্চলের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবরণও লিপিবদ্ধ থাকে।' জেলা গেজেটিয়ারে একটি নির্দিষ্ট জেলার উপরিউক্ত বিষয়-তথ্যাদি থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগেও স্থানিক বিবরণসম্বলিত এ-ধরনের গ্রন্থের সন্ধান পৃথিবীর অনেক দেশেই পাওয়া যায়। এ উপমহাদেশে গেজেটিয়ার জাতীয় প্রথম গ্রন্থ হলো *বাবুরনামা* বা তুজুক-ই-বাবুরি (*Babur-Nama* or Memoirs of Babur, Trans. Annette Susannah)। নাম থেকেই বোঝা যায়, এটি ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর (১৫২৬-৩০)-এর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ, যা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি প্রণয়ন করেন। *বাবুরনামায়* এ-উপমহাদেশের প্রাকৃতিক বিবরণ, ভূমিগঠন, মৃত্তিকা, জীবজন্তু, জলবায়ু, স্থাপত্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও অধিবাসীদের জীবনপ্রণালি ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে, শুধু মোগলযুগেই নয়, সমগ্র মধ্যকালীন ভারতে *বাবুরনামার* চেয়েও সুবিপুল ও তথ্যবহুল, প্রথম প্রকৃত গেজেটিয়ার জাতীয়গ্রন্থ, যেটি ক্ষমতাসীন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি হলো সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)-এর রাজত্বকালে, তাঁর রাজস্বমন্ত্রী ও ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরি* (*The Ain-I-Akbari*, Vols I & II, Trans. Colonel H. S. Jarrett & annotated by Sir Jadunath Sarkar)। গ্রন্থটিতে তৎকালীন শাসনকার্য সম্পর্কিত বিষয়াবলি বর্ণিত হলেও সমসাময়িক ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজস্বনীতি ও ব্যবস্থা, মোগল সুবা বা প্রদেশগুলো ভূ-প্রকৃতি, অধিবাসীদের জীবন-জীবিকার উল্লেখযোগ্য তথ্য-পরিসংখ্যানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বাংলা ভূখণ্ডে গেজেটিয়ার প্রণয়নের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গেলে ইতিহাসের দিকে একটু না তাকালেই নয়। বস্তুত ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর বাংলা, বিহার ও ওড়িশা এ-তিন মোগল সুবার শাসনক্ষমতা পরোক্ষভাবে

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। ১৭৬৫ সালে তৎকালীন মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বার্ষিক ৫৬ লাখ টাকা সেলামির বিনিময়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দিওয়ানি অধিগ্রহণ তথা রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা পায়। ফলে শাসন ও রাজস্ব আদায়-সংক্রান্ত উভয় ক্ষমতার তারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণকারী হয়ে পড়ে। শুরু হয় মুর্শিদাবাদের তখনকার নবাবকে শিখণ্ডী রেখে ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানির দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা। এরই সূত্রে তারা দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার নামে শুরু করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তবে চরম অনভিজ্ঞতা, সীমাহীন দুর্নীতি, অর্থ লুটপাট ও স্বদেশে পাচার ইত্যাদি নানা কারণে এ-সব ব্যবস্থা উপর্যুপরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে ইংরেজরা এদেশে আজকের যুগের বহুলপরিচিত 'জেলা প্রশাসন' ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, 'কালেক্টর' ছিল যার প্রশাসনিক প্রধান, বলা যায় সর্বেসর্বা। প্রসঙ্গত, হ্যারি ভেরেলস্ট (১৭৬৭-৬৯)-এর যুগে জেলায় জেলায় নিযুক্ত 'সুপ্রাভাইজর (Supravisor)' বা 'সুপারভাইজর' (Supervisor) পদবির পরিবর্তন করে হেস্টিংসের শাসনকালে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে 'কালেক্টর' (Collector) পদবি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে কালেক্টরশিপ (Collectorship) চালু হয়েছিল; যার বিবর্তিত রূপ আজকের জেলা প্রশাসকের অফিস। এ-সময় জেলার (তখন জেলাগুলোর আয়তন ছিল সুবিশাল) অধিক্ষেত্রের ভূ-প্রকৃতি, ইতিহাস, স্থানীয়দের জীবন জীবিকা, সমাজব্যবস্থা, প্রচলিত শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জনস্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল না। কাজেই সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে প্রশাসন পরিচালনার স্বার্থে তারা উল্লিখিত বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধানক্রমে অর্থাৎ প্রতিটি জেলার সুবিপুল তথ্যপঞ্জি সংকলিত করে গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। 'সুপ্রাভাইজর' বা 'সুপারভাইজর'দের নিয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্যও ছিল তাদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ('summary history of the 'province' assigned to his charge'), বড়ো বড়ো তথা অভিজাত পরিবারগুলোর বংশীয় বিবরণ, তাদের অধিকার-সুবিধাদি, প্রথা, ভূমির উৎপন্ন শস্য ও সক্ষমতা, রাজস্ব, সেস, আবওয়াব, এককথায় রায়ত কর্তৃক রাষ্ট্র, জমিদার ও কালেক্টরকে দেয় কর প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করে কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রথম থেকেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় নীতিনির্ধারকগণ গেজেটিয়ারের ন্যায় এক ধরনের 'exhaustive report' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে সে-অনুযায়ী কোম্পানির স্বদেশীয় (মূলত ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অপরাপর দেশের) কর্মকর্তাগণ এ-জাতীয় জেলা গেজেটিয়ার রচনা শুরু করেছিলেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যেটি তা হলো, এ-সব গেজেটিয়ার-প্রণেতা বা রচয়িতাগণের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (আইসিএস)

ক্যাডারভুক্ত জেলান্তরের কর্মকর্তা, যথা- কালেক্টর, সুপারিনটেন্ডেন্ট ইত্যাদি পদবিধারী।

অবিভক্ত বা বৃহত্তর বাংলার (আসামসহ) প্রতিটি একক (কখনও কখনও দ্বৈত) জেলার নামোল্লেখ করে মোট ৩টি সিরিজে বা ক্যাটিগরিতে এ-সব জেলা গেজেটিয়ার বিগত শতকের গোড়া থেকে নিয়ে দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের মধ্যেই প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছিল। সিরিজগুলো হলো: ১. Bengal District Gazetteers; ২. Eastern Bengal District Gazetteers এবং ৩. Assam District Gazetteers (১০ খণ্ড)। এ-সময় Imperial Gazetteers of India নামেও মোট ২৬-খণ্ডে (আঞ্চলিক বা স্থানীয় মিলিয়ে সর্বমোট ১২৮টি) গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেইসঙ্গে ছিল এর Provincial Series (বাংলার ক্ষেত্রে ৩-খণ্ডে)। তবে এগুলোরও বহু আগে থেকে গেজেটিয়ারের অনুরূপ একাধিক জেলার সুবিস্তৃত তথ্যবহুল গ্রন্থ বিভিন্ন ইংরেজ বা ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের দ্বারা রচিত হয়, যার কোনো কোনোটির ছিল একাধিক খণ্ড এবং এগুলোর অধিকাংশই সরকারি মুদ্রণালয়ে (কিছু খোদ গ্রেট ব্রিটেনে ও বেসরকারি মুদ্রণালয়ে) মুদ্রিত হয়েছিল। এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ১৮৩৩ সালে Calcutta: Bapist Mission Press থেকে প্রকাশিত ফ্রান্সিস বুকানন-হ্যামিলটন (Francis-Buchanan Hamilton-এঁর নামটি অন্যভাবেও লেখা হয়)-এর A *Geographical, Statistical and Historical Description of the District, or Zila of Dinajpur in the Province, or Soubah of Bengal (পরে* Robert Montogomery Martin-এর সম্পাদনায় ১৮৩৮ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India শীর্ষক* সিরিজে বা খণ্ডগুলোতে অন্তর্ভুক্ত); ঢাকার এককালীন সিভিল সার্জন James Taylor-এর ১৮৪০ সালে প্রকাশিত *A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca*; ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর A. L. (Arthur Llyod) Clay-এর *Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division* (১৮৬৭), রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর E. G. Glazier-এর *A Report on the District of Rungpore* (১৮৭৩, ১৮৭৬), যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর James Westland-এর *A Report on the District of Jessore: Its Antiquities, Its History, and Its Commerce* (১৮৭১, ১৮৭৪;), H (Henry) Beveridge-এর *The District of Bakarganj: Its History and Statistics* (১৮৭৬) প্রভৃতি অন্যতম। এছাড়া উনিশ শতকের শেষদিকে (১৮৭৫-৭৭) স্বনামধন্য উইলিয়াম উইলসন হান্টার (William Wilson Hunter, 1840-1900)-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত *A Statistical Account of Bengal* (২০ খণ্ড) সিরিজগ্রন্থ তো

গবেষক ও সুধীমহলের ভূয়সী প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আজও এগুলো আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ভারতের তথা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জেলা গেজেটিয়ার নির্ভরযোগ্য ও মুখ্য সূত্র হিসেবে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। আইসিএস বা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের স্কলার সদস্যদের হাতেই শুরুতে এগুলো রচিত হয়েছিল। স্মর্তব্য, জেলাভিত্তিক পূর্বোক্ত তিন সিরিজের গেজেটিয়ার প্রণয়নের কাজ শুরু হলে যে-সব বিশিষ্ট ইংরেজ ও ইউরোপীয় সিভিলিয়ান গেজেটিয়ার রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন L. S. S. (Lewis Sidney Steward) O'Malley, যিনি একাই বাংলা ও বিহার মিলিয়ে কমবেশি ৮টি গেজেটিয়ার রচনার কৃতিত্বের অধিকারী। অন্যদের মধ্যে রয়েছেন, যেমন-B. C. (Basil Copleston) Allen (ঢাকা, ১৯১২), F. A. (Frederick Alexander) Sachse (ময়মনসিংহ, ১৯১৭), J. E. (John Edward) Webster (ত্রিপুরা বা বর্তমান কুমিল্লা, ১৯১০ এবং নোয়াখালী, ১৯১১), R. H. Sneyd Hutchinson (পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯০৯), J. C. Jack (বাকেরগঞ্জ, ১৯১৮), J. N. Gupta (বগুড়া, ১৯১০) প্রমুখ।

বাংলাদেশে সাবেক পূর্বপাকিস্তান আমলে ১৯৬১ সালে বিদ্যমান গেজেটিয়ারগুলো হাল-নাগাদকরণ, সংশোধন ও পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ-সময় মোট ১৬টি জেলার গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, ১৯৬৩ সালে গেজেটিয়ার রচনা ও প্রকাশনার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে জেলা গেজেটিয়ার অফিস বা কার্যালয় স্থাপিত হয়। গেজেটিয়ারের চূড়ান্ত খসড়া (Final Draft) অনুমোদনের জন্য তখন একটি উপদেষ্টা পরিষদও গঠিত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম 'জেলা গেজেটিয়ার অফিস বা কার্যালয়' তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়)-এর অধীন ন্যস্ত করা হয়। কার্যালয়টি ১ জুলাই ১৯৯৮ তারিখ থেকে অবলুপ্ত ঘোষিত হয় এবং জেলার গেজেটিয়ার প্রণয়ন-প্রকাশনার সব দায়িত্ব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। অবলুপ্তির আগে জেলা গেজেটিয়ার কার্যালয় ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় নব কলেবরে বেশ কয়েকটি সংশোধিত ও বর্ধিত আকারে গেজেটিয়ার প্রকাশ করে, যার শেষটি ছিল খুলনা জেলা গেজেটিয়ার (প্রকাশকাল: ১৯৯৬)।

আগেই বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১ জুলাই ১৯৯৮ থেকে জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করছে। এই বিভাগের প্রাক্তন সচিব ও বর্তমান মুখ্য সচিব জনাব মো. নজিবুর রহমান -এর উদ্যোগে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ২০১৩ সালে দেশের তৎকালীন ৭টি বিভাগ (বর্তমানে দেশে বিভাগ সংখ্যা ৮টি) থেকে একটি করে জেলা নিয়ে অর্থাৎ ৭টি জেলা, যথা- ময়মনসিংহ, বগুড়া, দিনাজপুর, খুলনা,

সিলেট, বরিশাল ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার গেজেটিয়ার প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এ-জন্য 'জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়।

বিস্তীর্ণ সবুজ সারি সারি চা-বাগান, পাহাড়-টিলা আর গিরি-প্রস্রবণের লীলাভূমি সুরমা নদীতীরবর্তী জেলা সিলেট। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এ অঞ্চলের বিভিন্ন নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো 'শ্রীহট্ট'। পুরাণ মতে, শিবের স্ত্রী সতী দেবীর কাটা হস্ত (হাত) এই অঞ্চলে পড়েছিল, সতী-র সেই ভূ-পতিত হাত অর্থাৎ 'শ্রী হস্ত' থেকে 'শ্রীহট্ট' নামের উৎপত্তি বলে একশ্রেণির লোকের বিশ্বাস, বিশেষ করে হিন্দুসম্প্রদায়ের। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের গ্রিক ঐতিহাসিক এরিয়ান (Arrian) লিখিত বিবরণীতে এই অঞ্চলের নাম 'সিরিওট' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের আরেক গ্রিক লেখক এলিয়ান (Aelian)-এর বিবরণে 'সিরটে', এবং খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের অজ্ঞাতনামা (মিশরীয়?) বণিক লিখিত *The Periplus of the Erythraean Sea : Travel and Trade in the Indian Ocean by a Merchant of the First Century* নামক গ্রন্থে এ অঞ্চলের নাম 'সিরটে' এবং 'সিসটে'- এই দু'ভাবে লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য, চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (Yuan Chwang)-এর ভ্রমণকাহিনিতে এ অঞ্চলের নাম 'শিলিচতল' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে (খ্রি. ৬৪০)। এদেশে মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের দলিলপত্রে 'শ্রীহট্ট' নামের পরিবর্তে 'সিলাহেট' নামের ব্যবহার দেখা যায়। ফলত এভাবেই শ্রীহট্ট থেকে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় শেষপর্যন্ত 'সিলেট' নাম পরিগ্রহ করে। এছাড়াও সিলেট নামোৎপত্তির পিছনে অন্যতম একটি কিংবদন্তি রয়েছে এমন যা থেকে জানা যায়, অতীতে কোনো এক সময়ে সিলেট জেলায় জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির একটি কন্যাসন্তান ছিল। তার নাম ছিল শিলা। স্বীয় প্রিয় কন্যার স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি এখানে একটি হাট নির্মাণ করেছিলেন এবং নাম দিয়েছিলেন 'শিলার হাট'। তার প্রতিষ্ঠিত সেই 'শিলার হাট'-এর অপভ্রংশ রূপ 'সিলেট'।

মধ্যকালীন বাংলার অন্যতম খ্যাতিমান মুসলিম দরবেশ হযরত শাহজালাল (রহ.) ও হযরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজার রয়েছে এখানে। সিলেট শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতের আসাম, ত্রিপুরা বাংলার বাইরেও রয়েছে জেলাটির বিশেষ পরিচিতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সিলেট ও সন্নিহিত অঞ্চল 'গৌড়', 'লাউর' ও 'জৈন্তিয়া'- নামের স্থানীয় রাজন্যশাসিত জনপদে বিভক্ত ছিল। সিলেটের প্রশাসনিক বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, মোগল, নবাবি ও ইংরেজ- এই তিন যুগেই সিলেট ছিল মূলত সীমান্তবর্তী (Frontier) জেলা (Walter Hamilton, East-India Gazetteers, p. 551)। ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার এবং ওড়িশার দিওয়ানি অধিগ্রহণকালে জেলাটির একটি বড় অংশ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয় (B. H. Baden-Powell, Land Systems of British India, Vol. III, 1990,

p. 443)। শুরুতে অবশ্য এখানে কোনো নিয়মিত কালেক্টর নিয়োগ করা হয়নি। বরং তার পরিবর্তে একজন নিয়মিত 'রেসিডেন্ট' (Resident) কোম্পানির পক্ষে এখানকার ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের কাজ ও স্থানীয় রাজাদের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ রক্ষা করতেন। প্রসঙ্গত, সিলেটের প্রথম রেসিডেন্টের নাম ছিল William Makepeace Thackeray; ইনি ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক William Makepeace Thackeray (1811-63)-এর পিতামহ। তাঁর পরে (১৭৭৬) একই দায়িত্ব পালন করেছিলেন Holland প্রমুখ।

এক সময় সিলেট বৃহত্তর ঢাকা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল (Imperial Gazetteer of India: Provincial Series: Eastern Bengal and Assam, pp. 418-21). হ্যারি ভেরেলস্ট (Harry Verelst)-এর 'সুপারভাইজরি' প্রথায় (বর্তমান যুগের কালেক্টরদের অব্যবহিত পূর্বপদের নাম ছিল 'সুপারভাইজর' বা 'সুপ্রাভাইজর') পদাধিকার বলে ঢাকার সুপারভাইজর টমাস কেলসাল (Thomas Kelsall) ছিলেন সিলেটেরও সুপারভাইজর। পরবর্তীকালে (১৭৭৫) সিলেটের ক্ষেত্রে এককভাবে এই দায়িত্ব পালন করেন Richard Sumner। তিনিই ছিলেন সিলেটের প্রথম ও শেষ সুপারভাইজর। অন্যদিকে ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hastings)-এর সময়ে সিলেটের প্রথম কালেক্টর (Collector at Sylhet) নিযুক্ত হয়েছিলেন W. M. Thackeray। (Proceedings of the Committee of Circuit at Dacca, Vol. IV, 3 October to November 1772, p. 43)।

লর্ড কর্নওয়ালিস (Lord Cornwallis)-এর পুনর্গঠিত জেলাব্যবস্থায় কালেক্টরের কাজ করেন Robert Lindsay (১৭৭৮-১৭৮৯)। তার পরে (১৭৮৯) আসেন John Willies।

উল্লেখ্য, ১৮৬৭ সালে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে 'সিলেট' জেলাকে মোট ৪টি মহকুমায় বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এগুলো হলো- 'সিলেট সদর', 'সুনামগঞ্জ', 'করিমগঞ্জ' ও 'হবিগঞ্জ'। (Assam District Gazetteers : Vol. II, Sylhet, B. C. Allen, Calcutta, 1905, p. 248)। কিন্তু নানা জটিলতায় ও বিশেষ করে অর্থনৈতিক কারণে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছিল প্রায় এক দশক পরে।

যাহোক, ১৮৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম গঠিত হয় 'সুনামগঞ্জ' মহকুমা (Assam District Gazetteers : Vol. II. Sylhet, p. 248)। এর পরের বছরই (১৭৭৮) গঠিত হয়েছিল 'হবিগঞ্জ' ও 'করিমগঞ্জ' মহকুমা (Assam District Gazetteers : Vol. II. Sylhet, p. 249)। সিলেট সদর মহকুমা আয়তনে অত্যন্ত বিশাল ছিল বলে পরে এটিকে 'উত্তর' (North) ও 'দক্ষিণ' (South)- নামে দু'টি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে প্রথমটির সদর দপ্তর ছিল বর্তমান সিলেট শহর এবং দ্বিতীয়টির 'মৌলভীবাজার' (IGI :

Provincial Series : Eastern Bengal and Assam, p. 421)। সিলেট দক্ষিণ ১৮৮২ সালে 'মৌলভীবাজার' নামক মহকুমায় রূপান্তরিত হয় (Assam District Gazetteers : Vol. II. Sylhet, p. 249)। তবে 'দক্ষিণ সিলেট' নাম তখনও লোকমুখে বহুল প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত, ১৯০১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টেও দেখা যায়, মহকুমা হিসেবে 'মৌলভীবাজার' নাম তাতে ব্যবহৃত হয়নি, হয়েছে 'SUBDIVISION SOUTH SYLHET'; যার অধীনে ছিল 'Maulvi Bazar Town, Thana Moulvi Bazar ও Thana Hingajiya' (Census of India, 1901, Assam, Part II, Tables, Vol. IV-A, B. C. Allen, Shillong, 1902, p. 279)।

বিশ্বব্যাপী তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লব দিয়ে সূচনা একবিংশ শতাব্দীর। বাংলাদেশেও এর ঢেউ আছড়ে পড়েছে প্রবলভাবে। বিশেষভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। দেশের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা ও শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। তাছাড়া দেশের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, পরিবেশ, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় অগ্রগতি ও পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বর্তমান সরকারের অর্জন অসামান্য। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের দেশ। বিশ্বায়নের সূত্রে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, সহযোগিতা ও অংশীদারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে একটি সুনির্দিষ্ট কালপর্বে জেলাপর্যায়ে ঘটমান এ-সব বিষয় অতীতের ধারাবাহিকতায় গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। জেলা গেজেটিয়ার এক্ষেত্রে তথ্যভাণ্ডার হিসেবে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

লক্ষণীয়, বর্তমান গেজেটিয়ারেই প্রথম নতুন কয়েকটি অধ্যায়, যথা- ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ, খাদ্য ও পুষ্টি, দুর্যোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন, স্থানান্তর, অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিশেষ পণ্য, জীবন ও জীবিকা, খেলাধুলা, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা এবং সমস্যা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। বলাবাহুল্য এ সমস্ত বিষয় আগের গেজেটিয়ারগুলোতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না বা হয়নি। বলতে গেলে একুশ শতকের চাহিদার আলোকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রায় সবরকম তথ্যই এতে সন্নিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৫২-র ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে সিলেটবাসীর অংশগ্রহণ এবং তাঁদের গৌরবময় ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অর্জনগুলো এ গেজেটিয়ারে তুলে ধরা হয়েছে। এতে করে আগামী প্রজন্ম

সিলেটে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

আধুনিক উন্নয়ন প্রশাসনের মূলভিত্তি হলো সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার সফল বাস্তবায়ন। সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে জেলা গেজেটিয়ার অতীত অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে।

নতুন কলেবরে জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নের উদ্যোগ পুনঃগ্রহণ, এই কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে এবং সার্বিক দিকনির্দেশনা ও সমন্বয় প্রভৃতি কাজে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন প্রাক্তন সচিব ও বর্তমান মুখ্য সচিব জনাব মো. নজিবুর রহমান, প্রাক্তন সচিব বেগম কানিজ ফাতেমা এনডিসি এবং কর্মসূচির যুগ্ম সম্পাদক, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রাক্তন সচিব জনাব কে এম মোজাম্মেল হক এবং বর্তমান সচিব জনাব সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী। তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

গেজেটিয়ার প্রণয়ন-প্রকাশনাসংক্রান্ত কর্মসূচির পরামর্শক ছিলেন সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ড. মো: হাফিজুর রহমান ভূঞা। গেজেটিয়ারের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। এ-জন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ। এই কর্মসূচির পরিচালক, যুগ্মসচিব মো: তরিকুল আলম, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক ও যুগ্মসচিব জনাব জাফর আহাম্মদ খান এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, যারা গেজেটিয়ার প্রকাশনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন, তাদেরও জানাই ধন্যবাদ। মাঠপর্যায়ে সিলেট জেলার প্রাক্তন জেলা প্রশাসক জনাব মো. শফিকুল ইসলাম এবং তাঁর পূর্বসূরী যারা একাজে অকুণ্ঠ সহায়তা করেছেন, জেলার এ-সংক্রান্ত সম্পাদনা পরিষদের সদস্য এবং অধ্যায় লেখকগণ ও পাণ্ডুলিপির সৌকর্যবৃদ্ধিতে সহায়তাকারী সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

বলাবাহুল্য, গেজেটিয়ার প্রণয়ন সব সময়ই একটি দুরূহ ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ। এ কাজে কেন্দ্রীয় সম্পাদনা পরিষদের সদস্যগণ সম্পাদনা কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ গেজেটিয়ারের পান্ডুলিপি পর্যালোচনা করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামতসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধনের প্রস্তাব করেছেন। এ-জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিবসহ এসব কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া সম্পাদনা উপকমিটির সদস্য তথা বিষয় বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ করে বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল কাজী সাজ্জাদ আলী জহির এবং সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও গবেষক কাবেদুল ইসলাম পান্ডুলিপির তথ্য-উপাত্ত যাচাই ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। জনাব সিরাজুল এহসান পান্ডুলিপির বানান সমন্বয় ও পরিমার্জন করেছেন। এ-জন্য তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, পূর্বতন প্রকাশনা ও গ্রন্থাদি, সরকারি দলিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক গেজেটিয়ার প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি গেজেটিয়ারকে সর্বাঙ্গ সুন্দর ও পরিস্রুত অবয়ব দেওয়ার জন্য। তারপরও এ ধরনের কাজের প্রকৃতিগত কারণে অপূর্ণতা থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোনো ত্রুটি বা ভুল দৃষ্টিগোচর হলে প্রিয় পাঠক সদয় হয়ে আমাদের জানাবেন।

পরিশেষে উল্লেখ্য, মূলত দেশের অতীত ও পরিবর্তমান আঞ্চলিক ইতিহাসের তথা একটি নির্দিষ্ট জেলার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনসাধারণ ও সচেতন নাগরিক ও নতুন প্রজন্মকে অবহিত করা গেজেটিয়ারই রচনার মূল উদ্দেশ্য। এটি ইতিহাস গ্রন্থ নয় কিন্তু ইতিহাসের অনেক তথ্য-উপাত্ত এখানে রয়েছে। রয়েছে একটি জেলার অতীত ও বর্তমান ঘটনাবলি ও সার্বিক অবস্থার বিবরণ। আমি প্রত্যাশা করি এ গেজেটিয়ার লেখক, গবেষক, রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক এবং সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। পাঠক, সুধী জনসাধারণ ও সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাগণ এটি পাঠে তাঁরা যদি উপকৃত হন, তবে সরকারের এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

প্রধান সম্পাদক

অধ্যায় সূচি

	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১	ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশ	১
অধ্যায়-২	ইতিহাস	২৫
অধ্যায়-৩	অধিবাসী, সমাজ ও সংস্কৃতি	৫৯
অধ্যায়-৪	জনপ্রশাসন	৯১
অধ্যায়-৫	ভূমিরাজস্ব ও ব্যবস্থাপনা	১১৫
অধ্যায়-৬	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১৫১
অধ্যায়-৭	অর্থনৈতিক অবস্থা	১৭৩
অধ্যায়-৮	যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৮৯
অধ্যায়-৯	শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্য	২১১
অধ্যায়-১০	স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও জনস্বাস্থ্য	২২৯
অধ্যায়-১১	শিক্ষা	২৪৫
অধ্যায়-১২	ভাষা ও সাহিত্য	২৬৩
অধ্যায়-১৩	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	৩৩৭
অধ্যায়-১৪	ঐতিহাসিকস্থান ও এলাকা এবং স্থাপত্য	৩৬১
অধ্যায়-১৫	ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ	৩৮৩
অধ্যায়-১৬	খাদ্য ও পুষ্টি	৪২১
অধ্যায়-১৭	দুর্যোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন	৪২৯
অধ্যায়-১৮	অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	৪৩৯
অধ্যায়-১৯	বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৪৫৯
অধ্যায়-২০	বিশেষ পণ্য	৪৭৩
অধ্যায়-২১	প্রাকৃতিক সম্পদ	৪৭৯
অধ্যায়-২২	জীবন ও জীবিকা	৪৯১
অধ্যায়-২৩	খেলাধুলা	৪৯৯
অধ্যায়-২৪	গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা	৫২১
অধ্যায়-২৫	সমস্যা ও সম্ভাবনা	৫৪৭

সূচিপত্র

অধ্যায়-১ : ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশ পৃষ্ঠা ১-২৪

ভূপ্রকৃতি -১, পাহাড় ও টিলা-১, বিল-২, হাওর-২, নদনদী-৩; সুরমা-৫, কুশিয়ারা-৬, সারি নদী-৭, ডাউকি-গোয়াইন ও পিয়াইন নদী-৭, কাফনা নদী-৭, ভূতত্ত্ব-৮, জলবায়ু-৯, মাসিক ও বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত-৯, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য-১০, সিলেট জেলার উদ্ভিজ ও প্রাণিকুল-১০, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান ও টিলাগড় ইকোপার্ক-১১, রাতারপুল মিঠাপানির জলার বন (Ratargul Fresh water Swamp Forest)-১১, বাঁশ বন (Bamboo Forest)-১৩, বসতবাড়ি বন (Homestead Forest)-১৩, রিডল্যান্ড বনাঞ্চল-১৬, চা-বাগানের উদ্ভিদ-১৭।

অধ্যায়-২ : ইতিহাস পৃষ্ঠা ২৫-৫৮

প্রাগৈতিহাসিক সিলেট-২৫, প্রাচীন যুগ-২৬, সিলেটে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা-৩০, হজরত শাহজালাল (র.)-৩০, মোগল আমলে সিলেট-৩২, ব্রিটিশ আমলে সিলেট-৩৬, আসামভুক্ত সিলেট-৩৯, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া-৪১, অসহযোগ আন্দোলন খেলাফত আন্দোলন-৪১, ভারত বিভাগ, গণভোট ও সিলেট ভাগ-৪৭, পাকিস্তান আমলে সিলেট-৫১, খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব-৫২, ভাষা আন্দোলন-৫৩, সামরিক শাসন ও আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল-৫৬।

অধ্যায়-৩ : অধিবাসী, সমাজ সংস্কৃতি ও নারীর ক্ষমতায়ন পৃষ্ঠা ৫৯-৯০

জনসংখ্যা-৫৯, ব্রিটিশ আমলে জনসংখ্যা-৬০, ব্রিটিশ আমলে হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যা-৬১, শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা-৬১, ব্রিটিশ-পরবর্তী সিলেটের জনসংখ্যা-৬১, ১৯৫১ আদমশুমারি-৬২, ১৯৬১ আদমশুমারি-৬২, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা-৬২, ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা-৬৩, অভিবাসন ও সিলেটের জনসংখ্যা-৬৩, বর্তমান জনসংখ্যা পরিস্থিতি-৬৪, বর্তমান শিক্ষার হার ও ভোটার সংখ্যা-৬৬, জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস-৬৭, ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা-৬৭, মুসলিম সমাজ-৬৮, হিন্দু সমাজ-৬৯, সিলেট নারীশিক্ষার পটভূমি ও বর্তমান অবস্থা-৬৯, নারীর ক্ষমতায়ন-৭১, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী-৭২, মণিপুরি-৭২, খাসিয়া-৭৫, পাত্র-৭৭, গারো-৭৮, উরাং (ওঁরাও)-৭৯, মাল (মালো)-৮০, চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী-৮০, সংস্কৃতি-৮২, মণিপুরি নৃত্য-৮৫, মেলা-৮৬, রথের মেলা-৮৬, বাসুদেব বাড়ির মেলা-৮৬, শ্রীচৈতন্যের মেলা-৮৬, ওরসের মেলা-৮৬, লোকশিল্প-৮৬, শখের হাঁড়ি-৮৭ বাঁশ ও বেতের তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্প-৮৭, আলপনা-৮৮, নকশিকাঁথা-৮৮, বাড়িঘর-৮৯, আসবাবপত্র-৮৯।

অধ্যায়-৪ : জনপ্রশাসন পৃষ্ঠা ৯৩-১১৬

সিলেট বিভাগীয় প্রশাসন-৯৩, জেলা প্রশাসন-৯৪, বাংলাদেশ পুলিশ, সিলেট রেঞ্জ-৯৫, সিলেট জেলা পুলিশের সার্কেলসমূহ-৯৮, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি)-৯৮, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-৯৯, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর-৯৯, জেলা মৎস্য অফিস-৯৯, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-৯৯, সিলেট সড়ক বিভাগ-১০০, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-১০১, গণপূর্ত বিভাগ-১০১, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-১০১, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-১০১, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ-১০২, জেলা শিক্ষা অফিস-১০২, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস-১০২, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অফিস-১০৩, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়-১০৩, সিভিল সার্জন অফিস-১০৩, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়-১০৪, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ-১০৪, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-১০৪, সিলেট পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি-১০৫, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয়-১০৫, জেলা ক্রীড়া অফিস-১০৫, জেলা শিল্পকলা একাডেমি-১০৫, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি-১০৫, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়-১০৬, জেলা নির্বাচন অফিস-১০৬, জেলা তথ্য অফিস-১০৬, জেলা পরিসংখ্যান অফিস-১০৬, জেলা জজশিপ-১০৭, মহানগর জজ এর কার্যালয়-১০৮, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজেস্ট্রেট আদালত-১০৯, সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-১০৯, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-১০৯, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস-১০৯, আনসার ও ভিডিপি-১১০, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি-১১০, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-১১০, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়-১১০, জেলা সঞ্চয় অফিস-১১২, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস-১১২, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কো. লি.-১১২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন-১১২, পরিবেশ অধিদপ্তর-১১৩, বন বিভাগ-১১৩, আবহাওয়া অফিস-১১৩, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন-১১৩, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন-১১৪, জেলা রেজিস্ট্রার-১১৪, উপজেলা প্রশাসন-১১৪।

অধ্যায়-৫ : ভূমিরাজস্ব ও ব্যবস্থাপনা পৃষ্ঠা ১১৫-১৫০

সিলেট ভূমিরাজস্ব ও বন্দোবস্ত কার্যক্রম-১১৬, বিভিন্ন জরিপের নাম-১১৭, সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন-১১৮, সিলেট ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে (সিএস) ও স্টেট একুইজিশান সার্ভে (এসএ) জরিপ কার্যক্রম-১১৯, ভূমি উন্নয়ন কর-১২০, সিলেট জেলার ভূমি অফিসসমূহ-১২০, নদীবাহিত পাথরের উৎস ও অবস্থান-১১৫, সিলেট জেলার বালুমহাল-১৩২, জলমহাল-১৩৪, বদ্ধ জলমহাল-১৩৪, উন্মু ক্ত জলমহাল-১৩৫, জলমহালসংক্রান্ত তথ্য-১৩৫, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা-১৩৬, চা-বাগান-১৩৬, সিলেট জেলার অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা-১৪৭, সিলেট জেলার ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা-১৪৮, খান মোহাম্মদ আবু নছর মোহাম্মদ এহিয়া ওয়াকফ এস্টেট-১৪৯, এস্টেটের সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ-১৪৯।

অধ্যায়-৬ : কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পৃষ্ঠা-১৫১-১৭২

শীত ও গ্রীষ্মকালীন ফসল-১৫২, ভূমির বিভাজন-১৫৩, কৃষিকাজে ব্যবহৃত সেচযন্ত্র-১৫৩, চাষাবাদ পদ্ধতি-১৫৪, আউশ-১৫৪, আমন ধান-১৫৫, রবি ও খরিপ সবজি-১৫৬, ডাল জাতীয় ফসল-১৫৭, তেল জাতীয় ফসল-১৫৮, ফল-১৫৯, ফুল-১৬০, চা-১৬২, মৎস্য-১৬২, নদনদী-১৬৩, খাল-১৬৩, বিল-১৬৩, হাওর-১৬৩, প্লাবনভূমি-১৬৪, মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম-১৬৬, মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রম-১৬৬, বিল নার্সারি স্থাপন কার্যক্রম-১৬৬, মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন-১৬৭, পুকুর-দিঘিতে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ-১৬৭, মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম-১৬৮, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন-১৬৮, প্রাণিজাত সামগ্রী-১৭১।

অধ্যায়-৭ : অর্থনৈতিক অবস্থা পৃষ্ঠা ১৭৩-১৮৮

কৃষি ও মৎস্য-১৭৪, কৃষি-১৭৫, মৎস্য উৎপাদন-১৭৭, বনভূমি-১৭৭, চা উৎপাদন-১৭৭, প্রাকৃতিক গ্যাস-১৭৮, শিল্প-১৭৯, বিদ্যুৎ উৎপাদন-১৮০, যোগাযোগ ব্যবস্থা-১৮১।

অধ্যায়-৮ : যোগাযোগ ব্যবস্থা পৃষ্ঠা ১৮৯-২১০

সড়ক যোগাযোগ ইতিকথা-১৯০, অভ্যন্তরীণ রুটের (আন্তঃজেলা) বাস সার্ভিস-১৯১, রেললাইন স্থাপনের ইতিকথা-২০১।

অধ্যায়-৯ : শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য পৃষ্ঠা ২১১-২২৮

সরকারি খাতে শিল্প-ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা-২১২, শাহজালাল সার কারখানা-২১৩, সিলেট টেক্সটাইল মিল-২১৩, বিসিক শিল্প-১১৪, গোটাটিকর বিসিক-২১৪ খাদিমনগর বিসিক-২১৫, মণিপুর তাঁত শিল্প-২১৬, চা শিল্প-২১৬, পাথর শিল্প-২১৮, আমদানি-রফতানি বাণিজ্য-২১৯, সিলেট চেয়ার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-২২০, সিলেট মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-২২০, গোলাপগঞ্জ উপজেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-২২০, পর্যটনশিল্প-২২০, আবাসন শিল্প-২২১, অন্যান্য শিল্প-২২১, বিনিয়োগ বিকাশ-২২২ সিলেট জেলায় কার্যরত ব্যাংকসমূহ-২২২।

অধ্যায়-১০ : স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও জনস্বাস্থ্য পৃষ্ঠা ২২৯-২৪৪

ব্রিটিশ আমল-২২৯, ব্রিটিশ চিকিৎসা প্রশাসন-২২৯, পাকিস্তান আমল-২৩১, বাংলাদেশ আমল-২৩৩, রেড ক্রিসেন্ট মাতৃমঙ্গাল হাসপাতাল-২৩৭, লায়ন্স শিশু হাসপাতাল-২৩৮, জালালাবাদ প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র-২৩৮, জালালাবাদ অন্ধ কল্যাণ সমিতি চক্ষু হাসপাতাল-২৩৮, সিলেট সরকারি তিব্বিয়া কলেজ-২৩৮, জালালাবাদ হোমিও মেডিকেল কলেজ-২৩৮, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল-২৩৯, সিলেট জেলার নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা-২৩৯, সিলেট পৌরসভা স্বাস্থ্যতথ্য-২৪০, পরিবার পরিকল্পনা-২৪২, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি-২৪০, কমিউনিটি ক্লিনিক-২৪৩।

অধ্যায়-১১ : শিক্ষা পৃষ্ঠা ২৪৫-২৬২

সিলেটের শিক্ষা ও শিক্ষাব্রতী-২৪৫, ইংরেজি শিক্ষা ও প্রচলিত শিক্ষাধারা-২৪৬, ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা: নানামুখী পালাবদল-২৪৬, সিলেট অঞ্চলের শিক্ষাঙ্গন-২৪৯, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সিলেট-২৫১, প্রাথমিক শিক্ষা-২৫৫, মাধ্যসিক ও উচ্চশিক্ষা-২৫৬, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি-২৬২।

অধ্যায়-১২ : ভাষা ও সাহিত্য পৃষ্ঠা ২৬৩-৩৩৬

ভাষা-২৬৩, স্বরধ্বনি বিচারের মানদণ্ড অনুযায়ী সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনি-২৭২, ঠোঁটের অবস্থা-২৭২, অর্ধ স্বরধ্বনি-২৭৩, যৌগিক স্বরধ্বনি-২৭৪, ব্যাঞ্জন ধ্বনি-২৭৭, আদি, মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে সিলেটি উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর ব্যবহার-২৭৮, সিলেটি ধ্বনিতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য-২৭৮, সিলেট উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগত পরিবর্তন (পরিবর্তনরীতি)-২৮০, সিলেট উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র-২৮২, বিশেষ্যমূলক রূপমূল-২৮৪, প্রযোজক ক্রিয়া-৩০০, অনুসর্গ-৩০১, যৌগিক শব্দ-৩০২, শব্দদ্বৈত-৩০২, আত্মীয়বাচক শব্দ-৩০৩, অঙ্গাপ্রত্যঙ্গাবাচক শব্দ-৩০৩, গৃহপালিত পশু-৩০৩, তরিতরকারি ও ফলফলাদি-৩০৩, ঋতু-মাস-সময় ইত্যাদি-৩০৩, দ্রব্যনাম ও বিবিধ-৩০৩, কিছু অব্যয়শব্দ -৩০৩, কিছু বিশেষণ শব্দ-৩০৩, প্রাচীন যুগ-৩০৩, মধ্যযুগ-৩০৪, আধুনিক যুগ-৩০৬, সৃজনশীল গদ্য উপন্যাস-৩১১, ছোটোগল্প-৩১২, নাটক-৩১৩, কবিতা-৩১৪, মরমি গান-৩১৭, শিশুসাহিত্য-৩১৮, সাহিত্য-সংগঠন-৩১৮, সাহিত্য সম্মেলন-৩১৮, সিলেটি নাগরি লিপিতে রচিত সাহিত্য-৩২০, সংস্কৃত-৩২২, আরবি-৩২৩, ফারসি-৩২৩, উর্দু-৩২৪, ইংরেজি-৩২৫, মণিপুরি সাহিত্য-৩২৭, লোকসাহিত্য-৩২৭, প্রবাদ-প্রবচন-৩২৮, ধাঁধা-৩৩০, লোককথা-৩৩১, লোকসংগীত-৩৩১, সিলেটের জনপ্রিয় লোকসংগীতের তালিকা-৩৩২, বারমাসী-৩৩৪, লোক-গীতিকা-৩৩৫, ধামাইল-৩৩৫, ঘাটুগান-৩৩৬।

অধ্যায়-১৩ : স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৬০

সিলেট সিটি করপোরেশন-৩৩৮, বিয়ানীবাজার পৌরসভা-৩৩৯, গোলাপগঞ্জ পৌরসভা-৩৩৯, জকিগঞ্জ পৌরসভা-৩৩৯, কানাইঘাট পৌরসভা-৩৪০, জেলা পরিষদ-৩৪০, উপজেলা পরিষদ-৩৪২, ইউনিয়ন পরিষদ-৩৪৫, ইউনিয়ন পরিষদের বিবর্তন-৩৪৬, এলজিএসপি-৩৪৮, পল্লী উন্নয়ন-৩৪৮, ভিলেজ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট-৩৪৮, সবার জন্য বিদ্যুৎ-৩৪৯, জেলার কার্যক্রম-৩৪৯, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি-৩৫১, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প-৩৫২, দি সিলেট কো-অপারেটিভ টাউন ব্যাংক লি.-৩৫৪, সিলেট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি.-৩৫৪, সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক লি.-৩৫৫, সিলেট কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন লিমিটেড-৩৫৫, সিলেট কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি লি.-৩৫৫, কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি.-৩৫৬, জেলা সমবায় অফিস-৩৫৬, আশ্রয়ণ প্রকল্প-৩৫৮, সমবায় বাজার কার্যক্রম-৩৫৯, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম-৩৬০।

অধ্যায় ১৪ : ঐতিহাসিক ও দর্শনীয়স্থান এবং স্থাপত্য পৃষ্ঠা ৩৬১-৩৮২

হজরত শাহজালাল (র.)-এর মাজার-৩৬১, হজরত শাহ পরান (র.)-এর মাজার-৩৬৩, আলী আমজদের ঘড়ি-৩৬৫, ওসমানীনগর উপজেলা-৩৬৫, ওসমানী জাদুঘর-৩৬৬, কানাইঘাট উপজেলা-৩৬৭, কিনব্রিজ-৩৬৭, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা-৩৬৮, গিরিধারী মন্দির-৩৬৮, গোয়াইনঘাট উপজেলা-৩৬৮, গোলাপগঞ্জ উপজেলা-৩৬৯, জকিগঞ্জ উপজেলা-৩৭০, জাফলং-৩৭০, জৈন্তাপুর উপজেলা-৩৭১, জৈন্তা রাজবাড়ি-৩৭১, ঢাকাদক্ষিণের তীর্থভূমি-৩৭৩, তিন মন্দির বাড়ি-৩৭৪, দশনামী আখড়া-৩৭৪, দক্ষিণ সুরমা উপজেলা-৩৭৪, নিস্বার্ক আশ্রম-৩৭৫, ফরহাদ খাঁর সেতু-৩৭৫, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা-৩৭৫, বালাগঞ্জ উপজেলা-৩৭৬, বিয়ানীবাজার উপজেলা-৩৭৬, মতিন উদ্দীন আহমদ স্মৃতি জাদুঘর-৩৭৮, মণিপুর রাজবাড়ি-৩৭৮, মিউজিয়াম অব রাজাস-৩৭৯, মুরারিচাঁদ কলেজ-৩৭৯, শাহী ঈদগাহ-৩৮০, সিলেট সদর উপজেলা-৩৮০, হাদা মিয়া মাদা মিয়ার টিলা-৩৮১, যুগল টিলা-৩৮২।

অধ্যায় ১৫ : ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পৃষ্ঠা ৩৮৩-৪২০

বাংলা ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)-৩৮৩, জিন্নাহ ও বাংলা ভাষা-৩৮৫,আরবি হরফে বাংলার ষড়যন্ত্র-৩৮৬, বাংলা ভাষা সংস্কার-৩৮৭, বাংলা বর্ণমালা উচ্ছেদের চেষ্টা-৩৮৭, বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও অমর একুশে-৩৮৭, ভাষা আন্দোলনে সিলেট-৩৯০, মুক্তিযুদ্ধে সিলেট-৩৯৪, সূতারকান্দি-৪০১, আটগ্রাম-জকিগঞ্জ-৪০২, রাধানগর অভিযান-৪০৩, কানাইঘাট অভিযান-৪০৫, সিলেটে যুদ্ধাপরাধ-৪০৮, গণহত্যা-৪০৮, নারীনির্যাতন-৪০৯, অগ্নিসংযোগ লুটপাট-৪১০, রাজাকার-আলবদরদের কর্মকান্ড ও তৎকালীন সংবাদপত্রের ভাষ্য-৪১০, ২৩ এপ্রিল-৪১০, ২৪ এপ্রিল-৪১১, ২৯ এপ্রিল-৪১১, ২ মে- ৪১১, ১০ মে-৪১১, ২১ জুন-৪১১, ৩০ জুন-৪১১, ১ জুলাই-৪১১, ৬ জুলাই-৪১২, ১৪ জুলাই-৪১২, ২৫ জুলাই-৪১২, ৩০ জুলাই-৪১২, ৩১ জুলাই-৪১২, ১৬ আগস্ট-৪১২, ২২ আগস্ট-৪১২, ২৯ আগস্ট-৪১২, ৬ সেপ্টেম্বর-৪১৩, ১৬ সেপ্টেম্বর-৪১৩, ২৩ সেপ্টেম্বর-৪১৩, ১ অক্টোবর-৪১৩, ৪ অক্টোবর-৪১৩, ৬ অক্টোবর-৪১৩, ৮ অক্টোবর-৪১৩, ১৫ অক্টোবর-৪১৪, ২০ অক্টোবর-৪১৪, ২৬ অক্টোবর-৪১৪, ২৭ অক্টোবর-৪১৪, ২১ নভেম্বর-৪১৪, ২৫ নভেম্বর-৪১৪, মুক্তিযুদ্ধে সিলেটের নারী-৪১৫, যুদ্ধ শুরুর আগেই ময়দানে-৪১৬, সংগঠক ছিলেন যাঁরা-৪১৬, অস্ত্র হাতে শত্রুর মোকাবিলা-৪১৬, মহিলা মুক্তিফৌজ সহায়ক কমিটি-৪১৭, সীমান্তের ওপারেও সোচ্চার-৪১৭, যাঁদের রক্তে পতাকা লাল-৪১৮।

অধ্যায় ১৬ : খাদ্য ও পুষ্টি পৃষ্ঠা ৪২১-৪২৮

খাদ্যাভ্যাস-৪২১, ঐতিহ্যবাহী খাবাসমূহ-৪২১, বিরইন চাল-৪২১, চোঙা পিঠা-৪২১, সন্দেশ পিঠা-৪২২, আখনি-৪২২, বাখরখানি-৪২২, শাকসবজি-৪২২, নাগা মরিচ-৪২২, লাইশাক-৪২৩, হইলফা-৪২৩, ফলমূল-৪২৩, তৈকর-৪২৩, ডেফল-৪২৩, লটকন-৪২৪, মাল্টা-৪২৪, লেবু-৪২৪, খাসিয়া পান-৪২৫, আনারস-৪২৫,

শুঁটকি-৪২৭, চা-৪২৭, মণিপুরিদের খাদ্যাভ্যাস-৪২৮, খ) খাসিয়াদের খাদ্যাভ্যাস-৪২৮, গ) জৈন্তিয়াদের খাদ্যাভ্যাস-৪২৮।

অধ্যায় ১৭ : দুর্যোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন পৃষ্ঠা ৪২৯-৪৩৮

ভূমিকম্প (Earthquake)-৪২৯, ১৫৪৮ সালের ভূমিকম্প-৪৩০, ১৬৪২ সালের ভূমিকম্প-৪৩০, ১৬৬৩ সালের ভূমিকম্প-৪৩০, ১৮৬৯ সালের ভূমিকম্প-৪৩০, ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্প-৪৩০, বন্যা-৪৩২, ১৭৮১ সালের বন্যা-৪৩৩, ১৭৮৫-৯৫ সালের বন্যাসমূহ-৪৩৩, ১৮৫০-৫১ সালের বন্যাসমূহ-৪৩৩, ১৮৯৩ সালের বন্যা-৪৩৩, ১৯০২ ও ১৯২৯ সালের বন্যা-৪৩৩, ১৯৬৬ সালের বন্যা-৪৩৩, ১৯৬৮ সালের বন্যা-৪৩৪, টিলাকর্তন ও পাহাড় ধস-৪৩৪, কালবৈশাখি ঝড়-৪৩৫, বজ্রপাত-৪৩৫, দুর্যোগ প্রতিরোধ-৪৩৬, দুর্যোগ প্রস্তুতিতে করণীয়-৪৩৭, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-৪৩৭, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ-৪৩৭, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ-৪৩৮।

অধ্যায় ১৮ : অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান পৃষ্ঠা ৪৩৯-৪৫৮

সিলেটে অভিবাসী হওয়ার কারণ-৪৩৯, চা-বাগানে চাকরির সুবাদে অভিবাসন-৪৩৯, হাওর অঞ্চল-৪৩৯, পাহাড়ি এলাকা-৪৩৯, প্রবাসী অর্থের প্রভাব-৪৪০, উত্তরপূর্ব পাহাড়ি এলাকা-৪৪০, প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা-৪৪০, সিলেট মহানগর-৪৪১, অভিবাসনের সুফল ও কুফল-৪৪১, বৈদেশিক অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান-৪৪১, বিদেশে অভিবাসী হওয়ার ইতিহাস-যুক্তরাজ্য গমন-৪৪২, যুক্তরাষ্ট্র-৪৪৭, কানাডা-৪৪৭, অস্ট্রেলিয়া-৪৪৭, সিঙ্গাপুর-৪৪৮, জার্মানি-৪৪৮, ইতালি-৪৪৮, ফ্রান্স-৪৪৮, মধ্যপ্রাচ্য-৪৪৯, প্রবাসীদের অবদান-৪৫১, রেমিট্যান্স-৪৫১, প্রবাসীদের সমস্যা-৪৫৪, জেলা প্রশাসনের প্রবাসী কল্যাণ শাখা-৪৫৫, প্রবাসী অভিযোগ সেল-৪৫৫, জনশক্তি উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সিলেট শাখা-৪৫৬, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সিলেট শাখা-৪৫৬, ওভারসিজ ইউনিয়ন-৪৫৬, কুয়েত প্রত্যাগত বাংলাদেশি সমিতি-৪৫৭, ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম-৪৫৭।

অধ্যায় ১৯ : বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৃষ্ঠা ৪৫৯-৪৭২

ডিজিটাল বাংলাদেশ-৪৬০, ক. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-৪৬০, Nonlinear Optics ল্যাবরেটরি-৪৬১, সূর্যালোক ব্যবহার করে দূষিত পানি পরিষ্কার-৪৬১, ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল সায়েন্সের ওপর গবেষণা-৪৬১, Bio Reactor ইউনিট ব্যবহার করে বৃহত্তর পরিসরে দূষিত পানি পরিষ্কার-৪৬২, মোবাইল ফোনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন-৪৬২, পিপীলিকা সার্চ ইঞ্জিন-৪৬২, মঙ্গলদীপ-৪৬৩, সুবচন-৪৬৩, ব্রেইল প্রিন্টার-৪৬৩, ড্রোন প্রকল্প-৪৬৩, রোবট প্রকল্প-৪৬৪, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ-৪৬৪, মুরারিচাঁদ (এমসি) কলেজ-৪৬৫, সরকারি মহিলা কলেজ-৪৬৫, আইসিটি ইনস্টিটিউট-৪৬৫, খ. হাইটেক পার্ক-৪৬৬, গ. সফটওয়্যার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ-৪৬৬, ঘ. ফ্রিল্যান্সিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ-৪৬৬, ঙ. আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি-৪৬৭, ইন্টারনেট সার্ভিস

প্রোভাইডার (আইএসপি)-৪৬৭, ডিজিটাল সেন্টার-৪৬৮, খ. জেলা ই-সেবাকেন্দ্র-৪৬৯, গ. ই-পর্চা-৪৬৯, ঘ. মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমে ডিজিটাল কনটেন্ট-৪৬৯, ঙ. অনলাইনে আবেদনের ব্যবস্থা-৪৬৯, চ. সেবা যখন মোবাইল ফোনে-৪৭০, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সিলেটের সম্ভাবনা-৪৭০।

অধ্যায় ২০ : বিশেষ পণ্য পৃষ্ঠা ৪৭৩-৪৭৮

সাতকরা-৪৭৩, কমলা-৪৭৩, মণিপুরি তাঁতবস্ত্র-৪৭৪, শীতলপাটি-৪৭৫, বেতের আসবাবপত্র-৪৭৬, চা-৪৭৭।

অধ্যায় ২১ : প্রাকৃতিক সম্পদ পৃষ্ঠা ৪৭৯-৪৯০

প্রাকৃতিক গ্যাস-৪৮০, খনিজ তেল-৪৮২, চুনাপাথর-৪৮৪, কঠিন শিলা বা নুড়ি-৪৮৪, বালু-৪৮৬, পিট কয়লা-৪৮৮, বনজ সম্পদ-৪৮৮, রাতারগুল জাতীয় উদ্যান-৪৮৮, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান-৪৮৯, টিলাগড় ইকোপার্ক-৪৮৯।

অধ্যায় ২২ : জীবন ও জীবিকা পৃষ্ঠা ৪৯১-৪৯৮

কর্মপেশা-৪৯১, বাড়িঘরের ধরন-৪৯২, পোশাক-৪৯৩, খাদ্যসামগ্রী-৪৯৩, বিবাহ-৪৯৫, সড়ক ও যানবাহন-৪৯৫, শ্রমজীবীদের জীবনাচরণ-৪৯৫, চা-শ্রমিক-৪৯৬।

অধ্যায় ২৩ : খেলাধুলা পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫২০

ফুটবল-৫০১, সিলেট প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগের ক্লাবসমূহের তালিকা-৫০৫, ক্রিকেট-৫০৫, ভলিবল-৫০৭, লন টেনিস-৫০৮, অ্যাথলেটিক্স-৫০৯, হকি-৫০৯, হকি লীগের ক্লাবসমূহ-৫১০, বাস্কেটবল-৫১০, অন্যান্য খেলাধুলা-৫১০, মোহাম্মদ আলী জিমনেসিয়াম ও স্টেডিয়ামের উন্নয়ন-৫১০, সিলেটের ক্রীড়াসংগঠন-৫১১, ক্রীড়ালেখক সমিতি-৫১১, সিলেটের কৃতী খেলোয়াড় ও ক্রীড়াসংগঠক-৫১২, প্রেমদারঞ্জন দাস-৫১২, হাজী জহুর বক্স-৫১২, মুফতি বুকনউদ্দিন আহমদ-৫১২, কালীসদর কর-৫১৩, এএইচএ কাহের-৫১৩, বিমলেন্দু (সাধু বাবু)-৫১৩, মামুনুর রশীদ চৌধুরী-৫১৩, মো. কামরুজ্জামান-৫১৩, মো. আবদুল করিম-৫১৪, সিরাজ উদ্দিন আহমদ-৫১৪, আহমদ হক মুকুল-৫১৪, মো. কমরু মিয়া (ঝাড়ু ভাই)-৫১৪, ওয়ালী আহমদ চৌধুরী-৫১৪, লুৎফুর রহমান লালু-৫১৫, মফিজুর রহমান তিতন-৫১৫, রানি হামিদ-৫১৫, রামা লুসাই-৫১৫, কায়সার হামিদ-৫১৬, রেহানউদ্দিন-৫১৬, রণজিৎ দাস-৫১৬, এমএ হামিদ-৫১৬, শফিকুল হক হীরা-৫১৬, ডনডন লুসাই-৫১৭, জুম্মন লুসাই-৫১৭, মোস্তাক আহমদ-৫১৭, সাইদুর রব-৫১৭, গোলাম ফারুক চৌধুরী সুরু-৫১৭, নেহাল হাসনাইন-৫১৭, এনাম আহমদ-৫১৮, জুয়েল রাজা-৫১৮, ফারজান হোসেন সোমা-৫১৮, জাহাঙ্গীর হামিদ-৫১৮, শাহজাহান হামিদ-৫১৮, আবদুল জলিল চৌধুরী-৫১৮, আবদুল খালেক চৌধুরী-৫১৮, মাহমুদুর রহমান মোমিন-৫১৯, দিলদার হোসেন সেলিম-৫১৯, এহিয়া রেজা চৌধুরী-৫১৯, যায়েদ আহমদ চৌধুরী-৫১৯।

অধ্যায় ২৪ : গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা পৃষ্ঠা ৫২১-৫৪৬

সিলেট থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা-৫২৫, ১. অগ্রগতি-৫২৫, অরুণ-৫২৫, আল-জালাল-৫২৫, জনশক্তি-৫২৫, জয়ন্তী-৫২৬, জাগরণ-৫২৬, ব্র্যহস্পর্শ-৫২৬, দেশবন্ধু-৫২৬, দেশবার্তা-৫২৭, নবরঙ্গা-৫২৭, নয়াদুনিয়া-৫২৭, পরিব্রাজক-৫২৭, পূরবী-৫২৭, বাসন্তী-৫২৭, বেপরোয়া-৫২৭, মোজাহেদ-৫২৭, যুগবাণী-৫২৭, যুগভেরী-৫২৮, যুগশক্তি-৫২৮, যুগের আলো-৫২৮, শান্তি-৫২৯, শ্রীহট্টবাসী-৫২৯, শ্রীহট্ট মিহির-৫২৯, শ্রী দেশবার্তা-৫২৯, সংহতি-৫২৯, সুরমা-৫২৯, সুরমা উপত্যকা-৫২৯, স্বাধিকার-৫২৯, সিলেট থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা-৫৩৭, বলাকা-৫৩৭, শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণ পরিষদ পত্রিকা-৫৩৭, প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকা-৫৩৮, ১. Friends of Sylhet-৫৩৯ ২. The Assam Herald-৫৩৯, ৩. The Awakening-৫৩৯, ৪. Janaskti-৫৩৯, ৫. The Sylhet Chronicle-৫৪০, ৬. The Weekly The Chronicle-৫৪০, বাংলাদেশ বেতার-৫৪৫, বাংলাদেশ টেলিভিশন রিলে সেন্টার-৫৪৫।

অধ্যায় ২৫ : সমস্যা ও সম্ভাবনা পৃষ্ঠা ৫৪৭-৫৫৪

নির্ঘণ্ট পৃষ্ঠা ৫৬৫- ৫৭২

পরিশিষ্ট (১-৭) পৃষ্ঠা ৫৭৩-৬২৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি পৃষ্ঠা ৬২৯-৬৪৪

ছবি পৃষ্ঠা ৬৪৫-৬৬০

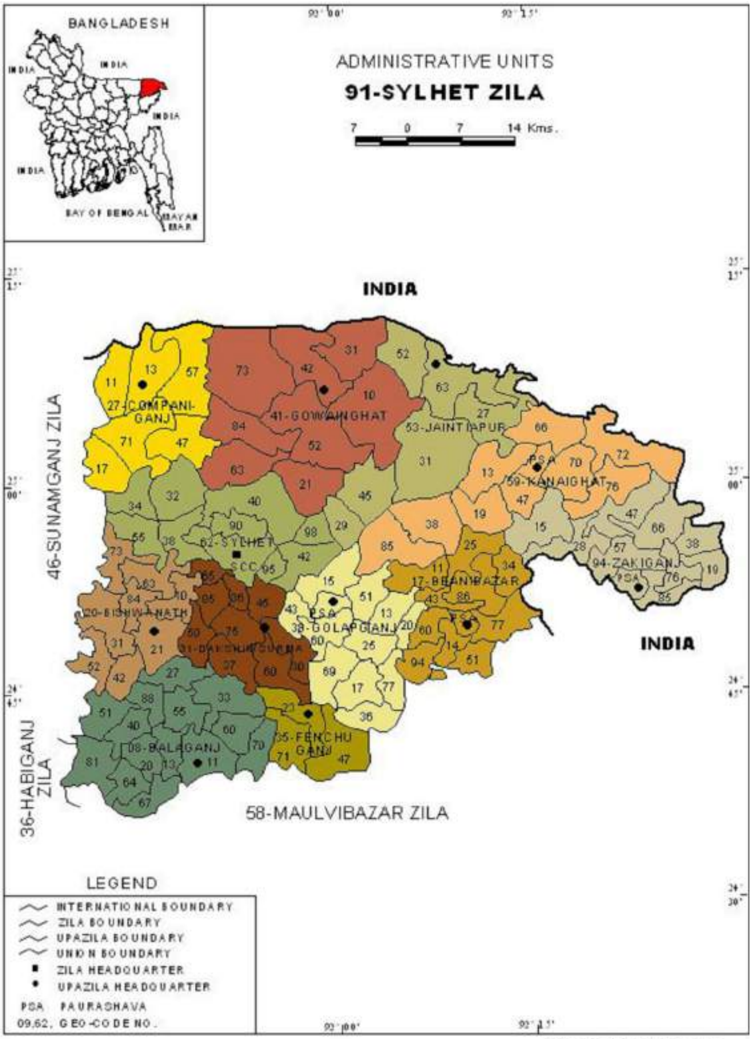

Cartography & GIS Project,LB BS-2012

সারণিসূচি

সারণি-১	খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান ও টিলাগড় ইকোপার্কের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদসমূহ	১১
সারণি-২	রাতারগুল মিঠাপানির জলারবনে বিদ্যমান উদ্ভিদ প্রজাতির তালিকা	১২
সারণি-৩	সিলেট জেলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের তালিকা	১৩
সারণি-৪	সিলেট জেলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির বেতের তালিকা	১৩
সারণি-৫	বসতবাড়ি বনে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের তালিকা	১৪
সারণি-৬	রিডল্যান্ড বনে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের তালিকা	১৬
সারণি-৭	চা-বাগানে ব্যবহৃত ছায়াপ্রদানকারী বৃক্ষের তালিকা	১৭
সারণি-৮	সিলেট জেলায় বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির উভচর প্রাণীর তালিকা	১৭
সারণি-৯	সিলেট জেলায় বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ সরীসৃপ প্রজাতির তালিকা	১৮
সারণি-১০	সিলেট জেলায় প্রাপ্ত স্থানীয় প্রজাতির পাখির তালিকা	১৯
সারণি-১১	সিলেট জেলায় প্রাপ্ত পরিযায়ী পাখির তালিকা	২০
সারণি-১২	সিলেট জেলায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তন্যপায়ী প্রাণীর তালিকা	২২
সারণি-১৩	সিলেট জেলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রজাপতির তালিকা	২৩
সারণি-১৪	গণভোটের ফলাফল	৪৯
সারণি-১৫	ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন সময়ে বৃহত্তর সিলেটের জনসংখ্যা	৬০
সারণি-১৬	সিলেট জেলার হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার হার, ১৮৭২-১৯৫১ (শতকরা হার)	৬১
সারণি-১৭	সিলেট জেলার ১৮৭২ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত মোট শহুরে জনসংখ্যা	৬১
সারণি-১৮	পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন সময়ে সিলেটের জনসংখ্যা	৬১
সারণি-১৯	জনসংখ্যার জাতিগত বণ্টন, ১৯৬১	৬২
সারণি-২০	জনসংখ্যা ভাষাভিত্তিক বণ্টন, ১৯৬৬	৬৩
সারণি-২১	১৯০১-১৯১১ আদমশুমারি দশকে সিলেটে মাইগ্রেশন	৬৪
সারণি-২২	সিলেট জেলার জনসংখ্যা, ১৯৫১-২০১১	৬৪
সারণি-২৩	সিলেট জেলার উপজেলাভিত্তিক জনসংখ্যা, ১৯৯১-২০১১	৬৫
সারণি-২৪	সিলেট জেলার শিক্ষার হার ১৯৮১-২০১১ এবং ভোটার সংখ্যা, ২০১১	৬৬
সারণি-২৫	নগরায়ণ/ শহুরে জনসংখ্যা	৬৭
সারণি-২৬	সিলেট জেলায় হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা, ১৮৭২-১৯৪১	৬৭
সারণি-২৭	উপজেলাভিত্তিক জনসংখ্যার ধর্মীয় বণ্টন, ২০১১	৬৮
সারণি-২৮	সিলেট জেলায় নারীশিক্ষার হার, ১৯৭৪-১৯৯১	৭০
সারণি-২৯	সিলেট জেলায় নারীশিক্ষার হার (উপজেলাভিত্তিক), ২০০১ ও ২০১১	৭০
সারণি-৩০	১৯০২ সালে সিলেট জেলা পুলিশ ফোর্সের পরিসংখ্যান	৯৬
সারণি-৩১	বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত জরিপসমূহ	১১৭
সারণি-৩২	ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায়	১২০
সারণি-৩৩	একনজরে সিলেট জেলার পাথরমহালের তথ্য	১২৬

সারণি-৩৪	একনজরে সিলেট জেলার ইজারাকৃত পাথরমহালের তথ্য	১৩১
সারণি-৩৫	একনজরে সিলেট জেলার ইজারাকৃত বালুমহালের তথ্য	১৩২
সারণি-৩৬	সিলেট জেলার বালুমহালের উপজেলাওয়ারি তথ্য (১৪২১ সাল পর্যন্ত)	১৩৩
সারণি-৩৭(১)	বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে ২০ বছরের উর্ধ্বে জলমহালের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্য (১৪২৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)	১৩৫
সারণি-৩৭(১)	বিগত ৫(পাঁচ) বছরের ২০ বছরের নিম্নে জলমহালের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্য (১৪২৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)	১৩৫
সারণি-৩৮	সিলেট জেলার হাট/বাজারের ইজারা ও দোকান লাইসেন্স সম্পর্কিত তথ্য	১৩৬
সারণি-৩৯	সিলেট জেলার ‘ক’ ও ‘খ’ তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির জমির পরিমাণ	১৪৮
সারণি-৪০	সিলেট জেলার ওয়াকফ্ সংক্রান্ত তথ্যাদি	১৪৯
সারণি-৪১	সিলেট জেলার দেবোত্তরসংক্রান্ত তথ্য	১৫০
সারণি-৪২	শস্য-বিন্যাসভিত্তিক জমি	১৫১
সারণি-৪৩	একনজরে সিলেট জেলার কৃষিবিষয়ক তথ্য	১৫৩
সারণি-৪৪	রবি মৌসুমে ব্যবহারযোগ্য সেচযন্ত্রের তথ্য	১৫৪
সারণি-৪৫	২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ সময়ে সিলেট জেলার ধানের উৎপাদন	১৫৫
সারণি-৪৬	রবি সবজি ফসল (২০১৬-১৭)	১৫৬
সারণি-৪৭	প্রধান রবি সবজি ফসল (২০১৬-১৭)	১৫৭
সারণি-৪৮	ডাল জাতীয় ফসল (২০১৬-১৭)	১৫৭
সারণি-৪৯	তেল জাতীয় ফসল	১৫৮
সারণি-৫০	২০১৫-১৬ অর্থবছরে উৎপাদিত ফলের তথ্যাদি	১৫৯
সারণি-৫১	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ফুল উৎপাদনের তথ্যাদি	১৬১
সারণি-৫২	মশলা জাতীয় ফসল (২০১৬-২০১৭)	১৬১
সারণি-৫৩	সিলেট জেলার প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাবলি (২০১৫-২০১৬ সালের পরিসংখ্যান)	১৬৯
সারণি-৫৪	সিলেট জেলার লোকসংখ্যা	১৭৩
সারণি-৫৫	শ্রমশক্তির হিসাব (হাজারের অঙ্কে)	১৭৩
সারণি-৫৬	বিভিন্ন পেশায় জনশক্তির অংশ	১৭৪
সারণি-৫৭	২০০৮-২০১৬ পর্যন্ত সিলেট জেলার তাপমাত্রা ও আর্দ্রতাবিষয়ক তথ্য	১৭৫
সারণি-৫৮	সিলেটে জমির ব্যবহার (একরে)	১৭৫
সারণি-৫৯	প্রধান খাদ্য উৎপাদন (২০১৫-১৬)	১৭৫
সারণি-৬০	খাসজমির পরিমাণ (একরে)	১৭৬
সারণি-৬১	সিলেট জেলায় গ্যাসক্ষেত্র ও গ্যাস রিজার্ভ	১৭৮
সারণি-৬২	সিলেট জেলায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০১৫-১৬	১৮০
সারণি-৬৩	উপজেলা ওয়ারি এলজিইডি/এলজিআই-এর আওতাধীন সড়কের বিবরণ	১৮১
সারণি-৬৪	গন্তব্যস্থল, সাল-ও যাত্রীসংখ্যা	১৮১

সারণি-৬৫	সিলেট জেলাস্থিত ব্যাংক শাখাসমূহের আমানত ও ঋণের পরিসংখ্যান ২০১৪-১৬	১৮২
সারণি-৬৬	নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরো দাম ১৯৮২-৮৩	১৮৪
সারণি-৬৭	কিছু নির্বাচিত দ্রব্যের বার্ষিক গড় মূল্য	১৮৫
সারণি-৬৮	Head Count Rates Incidence of Poverty (CBN Method)	১৮৬
সারণি-৬৯	সিলেট জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা	১৮৭
সারণি-৭০	১৯৬১ সালে সিলেট জেলাধীন সড়কের পরিসংখ্যান	১৯১
সারণি-৭১	সওজ-এর আওতাধীন সড়কসমূহের বিবরণ	১৯১
সারণি-৭২	সওজ-এর আওতাধীন সড়কসমূহের তালিকা (ডিসেম্বর, ২০১৭)	১৯২
সারণি-৭৩	এলজিইডি/এলজিআই-এর আওতাধীন সড়কের বিবরণ	১৯৩
সারণি-৭৪	উপজেলাওয়ারি এলজিইডি/এলজিআই-এর আওতাধীন সড়কের বিবরণ	১৯৩
সারণি-৭৫	উপজেলাওয়ারি ব্রিজ ও কালভার্টের বিবরণ	১৯৪
সারণি-৭৬	সওজ-এর ও এলজিইডি-কর্তৃক নির্মিত/নির্মাণাধীন/নির্মিতব্য উল্লেখযোগ্য ব্রিজসমূহ	১৯৪
সারণি-৭৭	আন্তঃজেলা সড়কপথে যোগাযোগের রুট এবং যানবাহনের সংখ্যা	১৯৮
সারণি-৭৮	অভ্যন্তরীণ রুটে বাসের সংখ্যা	১৯৯
সারণি-৭৯	নিবন্ধনকৃত রিকশা, ভ্যান, ইজিবাইক এবং অটোরিকশার সংখ্যা	১৯৯
সারণি-৮০	অনিবন্ধনকৃত রিকশা, ভ্যান, ইজিবাইক এবং অটোরিকশার সংখ্যা	২০০
সারণি-৮১	ঢাকা-সিলেট রুটে ট্রেনের সময়সূচি	২০৩
সারণি-৮২	সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে চলাচলকারী ট্রেনের সময়সূচি	২০৪
সারণি-৮৩	সিলেট-আখাউড়া রুটে চলাচলকারী ট্রেনের সময়সূচি	২০৪
সারণি-৮৪	সিলেট-ছাতক রুটে চলাচলকারী ট্রেনের সময়সূচি	২০৪
সারণি-৮৫	উপজেলাভিত্তিক রেললাইন এবং স্টেশন	২০৪
সারণি-৮৬	উপজেলাভিত্তিক নদী ও খালের দৈর্ঘ্যের বিবরণ	২০৬
সারণি-৮৭	সাপ্তাহিক ফ্লাইট শিডিউল (১৯৬৬)	২০৮
সারণি-৮৮	বিমান বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সাপ্তাহিক সূচি	২০৯
সারণি-৮৯	ঢাকা-সিলেট-ঢাকা রুটে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের সাপ্তাহিক সূচি	২০৯
সারণি-৯০	সিলেটে চা-উৎপাদন (হেক্টরে)	২১৭
সারণি-৯১	Establishments and TPE by Major Economic Activities, 2013	২২৪
সারণি-৯২	Establishments and TPE by Upazila, 2013	২২৫
সারণি-৯৩	জন্ম ও মৃত্যুর ছক	২৩২
সারণি-৯৪	অনূর্ধ্ব ১ বছরের শিশু ও মাতৃমৃত্যুর ছক	২৩২
সারণি-৯৫	বিভিন্ন রোগের মৃত্যুর ছক	২৩৩
সারণি-৯৬	সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকদের সংখ্যা	২৩৩
সারণি-৯৭	অনূর্ধ্ব ১ বছরের শিশু ও মাতৃমৃত্যুর ছক	২৩৩
সারণি-৯৮	উপজেলা হাসপাতালসমূহে ভর্তি রোগী অনুসারে প্রথম দশটি রোগের ছক	২৩৪

সারণি-৯৯	উপজেলা হাসপাতালসমূহে ভর্তি রোগীর মৃত্যু অনুসারে প্রথম দশটি রোগের ছক	২৩৫
সারণি-১০০	কমিউনিটি ক্লিনিকের তথ্যাদি	২৪৩
সারণি-১০১	চট্টগ্রাম বিভাগীয় অঞ্চলের নারীশিক্ষার তুলনামূলক হার	২৫৪
সারণি-১০২	সিলেট জেলায় উপজেলাভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৫
সারণি-১০৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	২৫৬
সারণি-১০৪	সিলেট জেলার শিক্ষাহার, ১৯৮১-২০১১	২৫৬
সারণি-১০৫	সিলেট জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-শিক্ষক-বিদ্যার্থী (২০১৬-২০১৭)	২৫৭
সারণি-১০৬	উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ২০১০-২০১৭	২৫৮
সারণি-১০৭	মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ২০১০-২০১৬	২৫৯
সারণি-১০৮	উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	২৬০
সারণি-১০৯	উনিশ শতকের বিশিষ্ট মুসলিম স্নাতকগণ	২৬০
সারণি-১১০	উনিশ শতকের বিশিষ্ট হিন্দু স্নাতকগণ	২৬১
সারণি-১১১	সিলেট জেলার উপজেলাসমূহের আয়তন, জনসংখ্যা ও শিক্ষিতের হার, ১৯৯১	২৬২
সারণি-১১২	জর্জ গ্রিয়ার্সনের সিলেটি উপভাষার বিভাগ	২৬৮
সারণি-১১৩	মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সিলেটি উপভাষার অঞ্চল বিভাগ	২৬৮
সারণি-১১৪	সিলেটি উপভাষার আঞ্চলিক বিন্যাস	২৬৯
সারণি-১১৫	সিলেট জেলার ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য	২৭০
সারণি-১১৬	সিলেটি উপভাষার মৌখিক স্বরধ্বনি	২৭১
সারণি-১১৭	জিভের উচ্চতা ও অবস্থান অনুসারে সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনি	২৭২
সারণি-১১৮	ঠোঁটের অবস্থা অনুসারে সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনি	২৭২
সারণি-১১৯	কোমল তালুর অবস্থা অনুসারে সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনি	২৭২
সারণি-১২০	সিলেটি উপভাষার আনুনাসিক স্বরধ্বনি	২৭৩
সারণি-১২১	সিলেটি উপভাষার আনুনাসিক ব্যঞ্জনধ্বনি	২৭৩
সারণি-১২২	সিলেটি উপভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি	২৭৩
সারণি-১২৩	সিলেটি উপভাষার যৌগিক স্বরধ্বনি	২৭৪
সারণি-১২৪	সিলেটি উপভাষার স্বাতন্ত্র্যসূচক যৌগিক স্বরধ্বনি	২৭৪
সারণি-১২৫	সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনিগত পরিবর্তন (পরিবর্তনরীতি)	২৭৫
সারণি-১২৬	সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র	২৭৬
সারণি-১২৭	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি	২৭৭
সারণি-১২৮	উচ্চারণরীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি	২৭৭
সারণি-১২৯	আদি মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে সিলেটি উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি	২৭৮
সারণি-১৩০	সিলেটি ন্যূনতম শব্দজোড়ের স্বরাঘাতজনিত অর্থপার্থক্য	২৭৯
সারণি-১৩১	সিলেটি উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগত পরিবর্তন (পরিবর্তনরীতি)	২৮০
সারণি-১৩২	সিলেটি উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র	২৮২
সারণি-১৩৩	সিলেটি শব্দবিভক্তি (কারক বিভক্তি)	২৮৪
সারণি-১৩৪	বিভিন্ন কারকে বিভক্তি প্রয়োগ	২৮৪

সারণি-১৩৫	সিলেটি উপভাষার পুরুষবাচক সর্বনাম	২৮৭
সারণি-১৩৬	সিলেটি উপভাষার উত্তম পুরুষবাচক সর্বনাম	২৮৮
সারণি-১৩৭	সিলেটি উপভাষার মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম	২৮৯
সারণি-১৩৮	সিলেটি উপভাষার প্রথম পুরুষবাচক সর্বনাম	২৯০
সারণি-১৩৯	সিলেটি উপভাষার নির্দেশক সর্বনাম	২৯০
সারণি-১৪০	সিলেটি উপভাষার অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক সর্বনাম	২৯১
সারণি-১৪১	সিলেটি উপভাষার প্রশ্নবাচক সর্বনাম	২৯১
সারণি-১৪২	সিলেটি উপভাষার সর্বনামজাত বিশেষণ	২৯১
সারণি-১৪৩	সিলেটি উপভাষার ক্রিয়া বিশেষণ	২৯২
সারণি-১৪৪	সিলেটি উপভাষার লিঙ্গকেন্দ্রিক সর্বনাম	২৯২
সারণি-১৪৫	সিলেটি উপভাষার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয়	২৯২
সারণি-১৪৬	ক) সিলেটি উপভাষার পুংলিঙ্গের শব্দগঠন প্রক্রিয়া	২৯২
	খ) সিলেটি উপভাষার পুংলিঙ্গের শব্দগঠন প্রক্রিয়া	২৯৩
সারণি-১৪৭	সিলেটি উপভাষার ভিন্ন শব্দের দ্বারা স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন	২৯৩
সারণি-১৪৮	সিলেটি উপভাষার বিশেষ্যমূলক রূপমূলের লিঙ্গান্তর	২৯৩
সারণি-১৪৯	সিলেটি উপভাষার উভয়লিঙ্গ নির্দেশক রূপমূল	২৯৩
সারণি-১৫০	সিলেটি উপভাষার একবচন ও বহুবচন নির্দেশক বিভক্তি	২৯৪
সারণি-১৫১	সিলেটি উপভাষার পদাশ্রিত নির্দেশক	২৯৫
সারণি-১৫২	সিলেটি উপভাষার উৎসভিত্তিক ধাতু	২৯৫
সারণি-১৫৩	সিলেটি উপভাষার সিলেটি নিজস্ব ধাতু	২৯৬
সারণি-১৫৪	সিলেটি উপভাষার ক্রিয়া বিভক্তি	২৯৬
সারণি-১৫৫	সিলেটি উপভাষার অসমাপিকা ক্রিয়া	২৯৯
সারণি-১৫৬	সিলেটি উপভাষার নাম অনুসর্গ	৩০১
সারণি-১৫৭	সিলেটি উপভাষার ভাব অনুসর্গ	৩০১
সারণি-১৫৮	সিলেটি উপভাষার বর্তমান অনুজ্ঞার 'খ'র্' ধাতুর রূপ	৩০১
সারণি-১৫৯	সিলেটি উপভাষার ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার 'খ'র্' ধাতুর রূপ	৩০২
সারণি-১৬০	সিলেটি উপভাষার সমাসবদ্ধ পদ	৩০২
সারণি-১৬১	সিলেটি উপভাষার দ্বিগুণিত শব্দ	৩০২
সারণি-১৬২	একনজরে সিলেট জেলায় স্থানীয় সরকার কাঠামো	৩৩৭
সারণি-১৬৩	জেলা পরিষদ, সিলেট কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প	৩৪১
সারণি-১৬৪	সিলেট জেলার উপজেলাসমূহের ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের তথ্যাবলি	৩৪৩
সারণি-১৬৫	২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের তথ্যাদি	৩৪৯
সারণি-১৬৬	জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি	৩৫০
সারণি-১৬৭	পল্লি জীবিকায়ন প্রকল্পের তথ্য (লাখ টাকায়)	৩৫০
সারণি-১৬৮	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমসমূহ	৩৫১
সারণি-১৬৯	একটি বাড়ি একটি খামার (২য় সংশোধিত) প্রকল্প কার্যক্রমের	

	অগ্রগতি প্রতিবেদন জুন ২০১৬ পর্যন্ত	৩৫৩
সারণি-১৭০	সিলেট জেলায় মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত মোট আশ্রয়ণ প্রকল্পের চিত্র	৩৫৮
সারণি-১৭১	সিলেট জেলায় ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত মোট আশ্রয়ণ প্রকল্পের চিত্র	৩৫৯
সারণি-১৭২	২০১০-২০১৭ সাল পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহে প্রবাসী কর্তৃক প্রেরিত মোট রেমিট্যান্স	৪৫২
সারণি-১৭৩	সিলেট জেলায় প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ (বিসিএফ)	৪৮১
সারণি-১৭৪	সিলেট জেলায় সম্ভাব্য প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ (বিসিএফ)	৪৮১
সারণি-১৭৫	সিলেট জেলায় উৎপাদিত দৈনিক গ্যাসের পরিমাণ (এমএমসিএফ)	৪৮২
সারণি-১৭৬	সিলেট জেলায় সম্ভাব্য শেল তেলের মজুদ (মিলিয়ন ব্যারেল)	৪৮৩
সারণি-১৭৭	সিলেট জেলায় উৎপাদিত তরল হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ (হাজার লিটারে)	৪৮৩
সারণি-১৭৮	সিলেটি সম্পাদক কর্তৃক সিলেট ও সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত পত্রিকা: বাংলা	৫২৩
সারণি-১৭৯	সিলেটি সম্পাদক কর্তৃক সিলেট ও সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত পত্রিকা: ইংরেজি	৫২৩
সারণি-১৮০	সিলেট সদর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা: ১৯৭২-১৯৯৮	৫২৪
সারণি-১৮১	সিলেট থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা (১৯৩৯-১৯৫২)	৫২৫
সারণি-১৮২	সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক (১৮৭৫-১৯৬২)	৫৩০
সারণি-১৮৩	সিলেটের সাংবাদিক কর্তৃক সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক (১৮৩৯-১৯৫৫)	৫৩১
সারণি-১৮৪	সিলেট থেকে প্রকাশিত বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা (১২৯৯-১৩৬৪)	৫৩২
সারণি-১৮৫	সিলেটের সাংবাদিক কর্তৃক সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা (১৮৮৯-১৯৪১)	৫৩৩
সারণি-১৮৬	সিলেট থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রপত্রিকা (১৮৯০-১৯৪২)	৫৩৫
সারণি-১৮৭	সিলেটের সাংবাদিক কর্তৃক সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা (১৮৮৪-১৯৭৪)	৫৩৬
সারণি-১৮৮	সিলেট থেকে প্রকাশিত বাংলা ত্রৈমাসিক পত্রিকা (১৯২৬-১৯৪১)	৫৩৭
সারণি-১৮৯	সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা (১৯৪১-১৯৬২)	৫৩৮
সারণি-১৯০	সিলেট ও সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকা (১৮৮২-১৯৬৭)	৫৩৮
সারণি-১৯১	সিলেট থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক (১৯০০-১৯৩৯)	৫৪০
সারণি-১৯২	সিলেটের বাইরে থেকে সিলেটের সাংবাদিক কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক (১৮৮৩-১৯৪২)	৫৪১
সারণি-১৯৩	সিলেটের সম্পাদক কর্তৃক সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পাক্ষিক (১৯০৮-১৯৩৫)	৫৪১
সারণি-১৯৪	সিলেট থেকে প্রকাশিত ইংরেজি মাসিক (১৯২৭-১৯৩৯)	৫৪১

সারণি-১৯৫	সিলেটের সম্পাদক কর্তৃক সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত ইংরেজি মাসিক (১৮৭৫-১৯৩৮)	৫৪২
সারণি-১৯৬	সিলেট জেলার দৈনিক পত্রিকার তালিকা (১৯৮৭-২০১৪)	৫৪২
সারণি-১৯৭	সিলেট জেলার সাপ্তাহিক পত্রিকার তালিকা (১৯৮৭-২০১৪)	৫৪৩
সারণি-১৯৮	সিলেট জেলার মাসিক পত্রিকার তালিকা (১৯৮৭-২০১৪)	৫৪৪
সারণি-১৯৯	সিলেট জেলার পাক্ষিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকার তালিকা (১৯৯১-২০১৪)	৫৪৫

অধ্যায়-১

ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশ

বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব প্রান্তে সিলেট জেলার অবস্থান। এ জেলার মোট আয়তন ৩,৪৫২.০৭ বর্গকি.মি.। মোট ১৩টি উপজেলা, ১৭টি থানা, ১০৫টি ইউনিয়ন, ১,৬৭৪টি মৌজা এবং ৩,৩৬৭টি গ্রাম নিয়ে সিলেট জেলা গঠিত। সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী সিলেট জেলার মোট জনসংখ্যা ৩৪,৩৪,১৮৮ জন এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৯৫ জন।

ভৌগোলিকভাবে সিলেট জেলা ২৪$^{\circ}$৩৬' থেকে ২৫$^{\circ}$১১' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১$^{\circ}$৩৮' থেকে ৯২$^{\circ}$৩৩' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। সিলেটের উত্তরে খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড় (ভারতের মেঘালয় রাজ্য) দক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলা, আগে ভারতের কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা (ভারতের আসাম রাজ্য) এবং পশ্চিমে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা। বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.২$^{\circ}$ সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন ১৩.৬$^{\circ}$ সেলসিয়াস।

ভূপ্রকৃতি

সিলেটের ভূপ্রকৃতি খুবই বৈচিত্র্যময়। পাহাড়, টিলা এবং সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকাসহ এখানে রয়েছে ছোটো-বড়ো অসংখ্য বিল ও হাওর। ভূপ্রকৃতির ধরন অনুযায়ী সিলেট জেলাকে প্রধান ৩টি প্রাকৃতিক ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. উত্তরপূর্বের খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়শ্রেণির পাদদেশীয় এলাকার ছোটো-বড়ো, উঁচু পাহাড় ও টিলাময় ভূমি।

খ. সুরমা ও গোয়াইন-পিয়াইন অববাহিকার চাষাবাদ উপযোগী বিস্তীর্ণ সমভূমি এলাকা।

গ. জলমগ্ন নিম্নাঞ্চল তথা বিল ও হাওরসমূহ।

পাহাড় ও টিলা

সিলেটের উত্তরভাগজুড়ে অবস্থিত খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়শ্রেণির অংশবিশেষ নিয়ে সিলেটের পাহাড় ও টিলাভূমি বিস্তৃত। এগুলো টারশিয়ারি যুগে সৃষ্ট। এসমস্ত টিলাসমূহের স্থানভেদে উচ্চতার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তবে এগুলোর সব কটির উচ্চতা ১৬০ মিটারেরও কম। উত্তরের সীমান্তবর্তী পিয়াইন নদীর পূর্বভাগ থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দীর্ঘ জাফলংয়ের পাহাড়শ্রেণি অবস্থিত, যে গুলোর উচ্চতা ৬০ মিটারেরও অধিক। উত্তরের পাহাড় ও টিলাগুলোর উচ্চতা তুলনামূলকভাবে একটু বেশি। উত্তরাংশের পাহাড় ও টিলাগুলোর মধ্যে জৈন্তাপুর (উচ্চতা ৫৪ মিটার), সারি টিলা (উচ্চতা ৯২ মিটার), লালাখাল পাহাড় (উচ্চতা ১৫৩ মিটার), ঢাকা দক্ষিণ টিলা (উচ্চতা ৭৭.৭ মিটার) উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত পাহাড় ও টিলার পাদদেশীয় এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেলেপাথর ও কমবেশি চুনাপাথর পাওয়া যায়। আবার ভোলাগঞ্জের পাথুরে টিলাসমূহ (উচ্চতা ৫২ মিটার) নুড়ি ও পাথর আহরণের জন্য বিখ্যাত।

এ ছাড়াও সমগ্র সিলেট জেলায় রয়েছে ইতস্তত বিস্তৃত টিলা। এসব টিলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য টিলাগুলো হলো: অর্থকি টিলা (উচ্চতা ২৮ মিটার), অবাঞ্জী টিলা, (উচ্চতা ৭৬ মিটার), বারাউতনি টিলা, (উচ্চতা ৭৯ মিটার), চেরাগং টিলা, (উচ্চতা ৯১ মিটার), কৈলাশ টিলা, (উচ্চতা ৬৩ মিটার) ইত্যাদি। এছাড়া মালনীছড়া, মমিনছড়া, লালাখাল, লোভাছড়া, শ্রীপুর, হাবিবনগর, ফতেহপুর, ডালিয়া, তারাপুর, খাদিমনগর, লাক্কাতুরা ও জাফলংয়ের চা-বাগানজুড়ে রয়েছে বিস্তৃত টিলাসারি।

বিল বিল হলো জলাভূমির বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বৃহৎ আকৃতির অবনমিত ভূভাগ, যেগুলোতে ভূপৃষ্ঠ থেকে অভ্যন্তরীণ ও পৃষ্ঠ নিষ্কাশনের মাধ্যমে বয়ে আসা পানি জমা হয়। অধিকাংশ বিলই শীতকালে শুকিয়ে যায়, কিন্তু বর্ষায় প্রশস্ত তবে অগভীর জলাধারে পরিণত হয়। এগুলোকে স্বাদু পানির উপহ্রদও বলা যেতে পারে। বাংলাদেশে অধিকাংশ এলাকার মতো সিলেট জেলার সর্বত্রই বিল নামের এই অবভূমিগুলো দেখতে পাওয়া যায় এবং এগুলোর অধিকাংশই ভূমিক্ষয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট নিচু ভূসংস্থান ধরনের। সিলেটের সুরমা নদীর সক্রিয় বদ্বীপ এলাকায় বিভিন্ন আকৃতির প্রচুর বিল রয়েছে। সিলেট জেলার বিলগুলোর মধ্যে গোয়াইনঘাট উপজেলার বড়ো ডুঙ্গাই, হিদলি, দুলাইন, উনাই, মনন, থুবড়ি, নাবু, বাগুলা, শিলচান্দ বিল, মেউয়া, তুড়াল, ফেটুকুরি, নলকুরি, বলালি, বড়ো দৈয়া বিল, রাওয়া, কুড়ুন্দি, ঘাটুকদি বিল; কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পানিচাপাড়া, নাগর, রাউতি, কালেঙ্গা, নীগার, পানিছাপরা; জৈন্তাপুর উপজেলার কাকই, পিঠা, ধুপানি, স্যাট, পরশ, মোলাইন, মতিহারা; কানাইঘাট উপজেলার মনিকা, আন্দা, চাতল, রোয়া; গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাঘা, সিংগারী, ফাটামাটি, পারইয়া, সোনাডুবি; জকিগঞ্জ উপজেলার ধানকুরী, ডুবাইল, সিঙ্গাইকুড়ী, জুগনী; বিশ্বনাথ উপজেলার কোনাউড়া, চাউলধুনী, নলডুবি; বালাগঞ্জ উপজেলার হাইলা, চেপতাই, কেরী, করছা, মাজাইল, ধলাই, ধুবুরিয়া, বেঘাতি, বড়োচাগতি, টেংরা, বেড়াঘাটি, বড়ো চাতাল, দিঘা, পাতাচাতাল, গাতী, ধর্মিতা, রৌয়া, কান্তারী; ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার আইয়া, বারাইয়া, বিয়ানীবাজার উপজেলার মরামেদি ও গোলচীবিল ও সদর উপজেলার ডুব, বাগোলা, পাটমরা, বহুয়া, মেলান, বড়োতলী, বাজিবাড়ি, ভরারু, থাকাউরা, কানওয়া, কাইছনা ও চালতা বিল অন্যতম।

হাওর হাওর হলো পিরিচ আকৃতির বৃহৎ ভূ-গাঠনিক অবনমন। হাওর শব্দটি ‘সাগর’ শব্দের বিকৃতরূপ বলে ধারণা করা হয়। বর্ষাকালে হাওরের পানিরাশি স্ফীত হয়ে অকূল সাগরের আকার ধারণ করে আবার শীতকালে পানি কমে সংকুচিত হয়ে দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরে রূপ নেয়। বাংলাদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চল তথা সিলেট অঞ্চলে অধিকাংশ হাওর অবস্থিত। সিলেটের উত্তরে ভারতের মেঘালয়ের খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়শ্রেণি থেকে নেমে আসা অসংখ্য পাহাড়ি নদী হাওরগুলোর পানির প্রধান উৎস। বর্ষাকালে পানিতে তলিয়ে থাকার পর টানা খরা মৌসুমের শেষের দিকে যখন পানি শুকিয়ে যায়, তখন এ অঞ্চলের

হাওরগুলোর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ধানের ব্যাপক চাষাবাদ হয় এবং আশাতীত ফলন পরিলক্ষিত হয়। ব্যাপক জীববৈচিত্র্য ধারণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে এতঅঞ্চলের হাওরগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। স্থায়ী ও পরিযায়ী পাখিদের আবাসস্থল হিসেবে হাওরগুলো সুপরিচিত। সুরমা ও কুশিয়ারার সাথে সংযুক্ত অন্যান্য ছোটো-বড়ো পাহাড়ি নদী যেমন : গোয়াইন, পিয়াইন, সারি, সোনাই, ডাউকি, জাদুকাটা প্রভৃতি সংযুক্ত হয়েছে এ অঞ্চলের হাওরের সংযোগকারী জলনির্গম-প্রণালীর সঙ্গে। সমগ্র সিলেট জেলা ছোটো-বড়ো অসংখ্য হাওর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সিলেট জেলার গুরুত্বপূর্ণ হাওরগুলোর মধ্যে গোয়াইনঘাট উপজেলার দমদোমা হাওর, বগাইয়া হাওর, আমবাড়ী হাওর, ভিত্রিখেল হাওর, বাউরভাগ হাওর, আসামপাড়া হাওর, সান্‌কীভাঙ্গা হাওর, বুধিগাই হাওর, তিতগুল্লি হাওর, নাইন্দা হাওর, বারকিপুর হাওর, লামাসাতাইন হাওর, সতীর হাওর, লেঙ্গুরা হাওর, পূর্বপেকেরখাল হাওর, শিয়ালা হাওর, পশ্চিম পেকেরখাল হাওর, চদিভদি হাওর, লক্ষী হাওর, সিমইল বিল হাওর, তুরুকভাগ হাওর, পেকেরখাল হাওর, সাহাপুর হাওর, চাতল হাওর, কৈয়া হাওর, বোগা হাওর, পাঁচপাড়া হাওর, হুগরাউলি হাওর, ভুজিহাওর, খাগড়া হাওর; কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বাওয়া, পোকোহাইর, সোনা, লালী, লোবা; জৈন্তাপুর উপজেলার কেন্দ্রী, বিরাইমারা; জকিগঞ্জ উপজেলার বালাই, মইলাট, চালিয়ার হাওর কানাইঘাটের শিয়ালা হাওর, কাঁঠালবাড়ি হাওর ও সদর উপজেলার বরাইয়া, বাওরকান্দি ও দলদলী হাওর অন্যতম।

নদনদী

নদনদী হলো প্রকৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নদনদীর তীর ধরে আদি মানব-সভ্যতার জন্ম হয়েছে। এক কথায় নদনদী সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। নদনদী-উপত্যকার জনগোষ্ঠী নদনদী, পানি, ভূমি, বন ও মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল জীবনধারা গড়ে তোলে। পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠেছে নদনদীর তীরে। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশও তাই নদনদী। নদনদীকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের অধিকাংশ নগরের পত্তন হয়েছে।

সিলেট বিভাগের প্রধান নদী হলো সুরমা ও কুশিয়ারা। ভারতের মণিপুর রাজ্যের কাছাড় পর্বতে উৎপন্ন বরাক নদী সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার বারঠাকুরী ইউনিয়নের অমলসিদ সীমান্তে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। সুরমা নদী সিলেটের পূর্বদিকে এবং কুশিয়ারা নদী সিলেটের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। সুরমা ও কুশিয়ারা সিলেটের দুই প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কিশোরগঞ্জের ভৈরবের উজানে পুনরায় মিলিত হয়ে মেঘনা নামধারণ করে। সিলেট জেলার অন্যান্য প্রায় সকল নদনদীই সুরমা বা কুশিয়ারায় এসে মিলিত হয়েছে।

পাঁচ দশক আগেও সিলেট জেলায় শাখানদী, উপনদী মিলিয়ে শতাধিক নদনদীর অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে রয়েছে ৫০টি। এর মধ্যে ৩০টি মৃতপ্রায়। মৃতপ্রায় নদনদীগুলো বিভিন্ন হাওরের সাথে সংযুক্ত। বর্ষায় হাওরে পানি এলে এগুলো

'নদী' থাকে আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি চলে গেলে এগুলো খাল বা ফসলের মাঠে পরিণত হয়।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের উজানে ভারতের বাঁধ বা ড্যাম নির্মাণ, পাহাড় বা টিলা কাটার কারণে নদীর তলদেশ ভরে যাওয়া, নদী দখল করে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা, নৌ চলাচল কমে যাওয়া, অপরিকল্পিত বেড়িবাঁধ ও স্লুইস গেট নির্মাণ, হাওর-বিল বা জলাশয় ভরাট করে চাষাবাদ, প্রাকৃতিক জলাধারগুলোকে শুষ্ক মৌসুমে পানিশূন্য করে দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কারণে সিলেট জেলার নদনদীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

সিলেট জেলায় প্রবহমান নদনদীগুলো হলো : সুরমা, কুশিয়ারা, লোভা, সারি, গোয়াইন, চেঙ্গেরখাল, পিয়াইন, ডাউকি, ধলাই, সুনাই, বড়োভাগা, বাসিয়া, আমিরদীং, কাফনা, দেওরভাগা, নুনছড়া, রত্না, জুড়ী নদী, ভাদেশ্বর নদী, কুইগাং, বেটুয়া, রাংপানি, সবড়ি, বড়ো নয়াগাঙ, নয়া গাঙ, কাটাগাঙ, ফাটাগাঙ, কুল, হিংগার, ঈশাবা, কুড়া, বড়োদল, লুলা, করল, মাটিজুরা, পেকুয়া, কালিয়া, দেড়ু, ডোনা, দেওছই ছড়া, মাকুন্দা, খাজাঞ্চি, নারকিলা, কাকেশ্বর, ধাপ্পাই, গিরগিট, বুড়িবরাক, সুরই, শিংগারীয়া, আমরী, খামাজুরী, চিলাই ও হুর্মা নদী। এই নদনদীগুলোর অধিকাংশ স্বল্প দৈর্ঘ্যের। জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েই এর ব্যাপ্তি। আবার কিছু নদনদী জেলার ১৩টি উপজেলার মধ্যে একাধিক উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত। জৈন্তাপুর ও গোয়াইনঘাটে সারি, গোয়াইনঘাট ও সিলেট সদরে গোয়াইন, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জে পিয়াইন, গোলাপগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর ও গোয়াইনঘাটে কাফনা, দক্ষিণ সুরমা ও বালাগঞ্জে বড়োভাগা, বিশ্বনাথ ও বালাগঞ্জে আমিরদীং, গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজারে সুনাই নদী আন্তঃউপজেলা নদী হিসেবে প্রবাহিত হচ্ছে। সুরমা-কুশিয়ারা ব্যতীত সিলেট জেলার কয়েকটি নদী আন্তঃজেলা দিয়ে প্রবাহিত। মৌলভীবাজার জেলা থেকে প্রবেশ করা জুড়ী নদী ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় কুশিয়ারা নদীতে মিলিত হয়েছে। দক্ষিণ সুরমা উপজেলার কামালবাজার এলাকায় সুরমা নদী থেকে উৎপন্ন বাসিয়া নদী বিশ্বনাথ বাজারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার খাইকা এলাকায় কুশিয়ারা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বাসিয়া নদীর দৈর্ঘ্য ৩০ কিলোমিটার। ভারত থেকে প্রবেশ করা ধলা বা ধলাই নদী কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় সুরমা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রত্না নদী সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার হাওর থেকে উৎপন্ন হয়ে সিলেট জেলার বালাগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুশিয়ারা নদীতে পতিত হয়েছে।

সিলেট জেলার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নদীর পরিচয় দেওয়া হলো।

সুরমা

সুরমা বাংলাদেশের অন্যতম দীর্ঘতম নদী। সুরমা শুধু সিলেট জেলা নয়, সিলেট বিভাগেরও প্রধান নদী। সুরমার দৈর্ঘ্য ২৯৯ কিলোমিটার। সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার অমলসিদ পয়েন্ট থেকে বরাক নদ হতে সুরমা নদীর উৎপত্তি। সুরমা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে সুরমা অববাহিকার সৃষ্টি করে। অমলসিদ থেকে সুরমা প্রায় ২৭ কিলোমিটার সীমান্ত নদী হিসেবে প্রবাহিত। সুরমা বরাক নদীর শাখানদী হলেও বর্তমানে সুরমা নদীতে বরাক নদীর পানি প্রবাহ একেবারেই ক্ষীণ। সুরমার প্রবেশমুখ অমলসিদে প্রতিবছর নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাসে বড়ো একটি চর জাগে। এই চরের কারণে শুষ্ক মৌসুমে বরাক নদীর মাত্র ২০ ভাগ পানি সুরমা দিয়ে প্রবাহিত হয়।

সুরমা অমলসিদ থেকে ৪২ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে লোভাছড়া বা লোভা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। লোভাছড়ার পানি প্রবাহেই সুরমা প্রাণশক্তি ফিরে পায়। কানাইঘাট উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী লোভাছড়া চা-বাগান দিয়ে প্রবেশ করা লোভা নদীর বাংলাদেশ অংশের দৈর্ঘ্য মাত্র ৯ কি.মি.।

ভারত থেকে সুরমা সিলেট জেলায় প্রবেশ করে জকিগঞ্জ-কানাইঘাট-গোলাপগঞ্জ-সিলেট সদর-বিশ্বনাথ উপজেলার লামাকাজি পর্যন্ত ১৩২ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় প্রবেশ করেছে। সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক-দোয়ারাবাজার-সুনামগঞ্জ সদর-জামালগঞ্জ-ধর্মপাশা উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুরমা নদী হবিগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ উপজেলা স্পর্শ করে নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরি এবং কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম অতিক্রম করে বাজিতপুর ও কুলিয়ারচর উপজেলায় মেঘনা নামধারণ করে। সুরমা নদী আজমিরীগঞ্জের ভাটি থেকেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেঘনা নামে পরিচিত। সুরমা-মেঘনা নদীপ্রবাহ মদনা নামক স্থানের পরে প্রায় ২৬ কি.মি. ভাটিতে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রামের কাছে ধলেশ্বরী নামধারণ করে। উত্তরের অংশে ধলেশ্বরী নদী অত্যন্ত ভাঙনপ্রবণ এবং দিক পরিবর্তনশীল। নদীর এই নামকরণ মেঘনা নামের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর। এই অসুবিধা দূর করার জন্য আজমিরীগঞ্জের ভাটিতে মূল প্রবাহ যেখানে ধনু এবং ঘোড়াউত্রা নদীর মিলিত স্রোতের সঙ্গে মিশেছে, সে পর্যন্ত নদীটির নাম সুরমা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই স্থানটি কুলিয়ারচরের ৫ কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত। এই সঙ্গমস্থলের পর থেকেই নদীটি মেঘনা নামে পরিচিত। ভৈরব উপজেলায় মেঘনার সাথে ব্রহ্মপুত্র নদ এসে মিলিত হয়। সুরমা নদী জামালগঞ্জ উপজেলা থেকেই অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্ষা মৌসুমে সুনামগঞ্জ সদর থেকেই সুরমা নদী হাওরের সাথে একাকার হয়ে যেন সমুদ্রে পরিণত হয়। প্রতিবর্ষাতেই সুরমা বন্যাপ্রবণ। সাধারণভাবে বন্যা মৌসুমের সময়সীমা মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এসময়ে নদীতে গড় পানি অপসারণের পরিমাণ ৩০,০০০ কিউসেক। ১৯৫০

থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন অপসারণ রেকর্ড করা হয়েছে ৫৩.০০৮ কিউসেক (১৫ অগাস্ট ১৯৫৮) এবং ৪৮৭ কিউসেক (২১ মার্চ ১৯৫৪)।

<u>২০১৬ সালে সিলেট জেলার সুরমা নদীতে পানি প্রবাহের তথ্য</u>

শুষ্ক মৌসুম (জানুয়ারি/২০১৬-মার্চ/২০১৬, নভেম্বর/২০১৬-ডিসেম্বর/২০১৬)	সর্বোচ্চ পানিপ্রবাহ- ৭৫৭.৩৬৪ কিউসেক (০৯-১১-২০১৬)
	সর্বনিম্ন পানিপ্রাবাহ- ৬.৮৬ কিউসেক (০৩-০৩-২০১৬)
বর্ষা মৌসুম (এপ্রিল/২০১৬- অক্টোবর/২০১৬)	সর্বোচ্চ পানি প্রবাহ- ১৭২৯.৬১৯ কিউসেক (২৭-০৪-২০১৬)
	সর্বনিম্ন পানি প্রাবাহ- ২৩০.৬৪১ কিউসেক (২৬-১০-২০১৬)

সুরমা নদীপ্রণালির অধিকাংশই হাওর অববাহিকায় পতিত হয়েছে, যেখানে নিষ্কাশন রেখা স্পষ্ট এবং সুনির্ধারিত নয়। নেত্রকোণার দুর্গাপুর থেকে সিলেটের জৈন্তিয়াপুর পর্যন্ত বিস্তৃত গারো খাসিয়া জৈন্তা পাহাড় শ্রেণির পাদদেশীয় ভূমিতে অধিকাংশ স্রোতধারা ও নদীখাত বর্ষা মৌসুমে উপচে পড়া পানিতে প্লাবিত হয় এবং বিস্তৃত পানি হাওরের সাথে নদীর সংযোগ সৃষ্টি করে। হাওর অববাহিকায়ও নদীগুলো উপচে পড়ে এবং বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই হাওরগুলো পরিপূর্ণ হয়। মৌসুমি বৃষ্টিপাত হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে বিপুল পানি আগের স্থানে অর্থাৎ নদীর মূলধারায় ফিরে আসে।

কুশিয়ারা সিলেট বিভাগের দ্বিতীয় প্রধান নদী কুশিয়ারা। ভারত থেকে প্রবাহিত বরাক নদীর মূল স্রোতধারা কুশিয়ারা নদী দিয়েই নিষ্কাশন হয়। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বিভাজন করে কুশিয়ারা নদী সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলা ও আসামের করিমগঞ্জ মহকুমার সীমান্ত নদী হিসেবে অনেকটা পথ প্রবাহিত হয়ে বিয়ানীবাজার উপজেলায় প্রবেশ করে। অতঃপর বিয়ানীবাজার-ফেঞ্চুগঞ্জ-বালাগঞ্জ হয়ে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলায় প্রবেশ করে কুশিয়ারা। বালাগঞ্জ অতিক্রমকালে কুশিয়ারা নদী মৌলভীবাজার সদর উপজেলাকেও স্পর্শ করেছে। নবীগঞ্জ থেকে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় প্রবেশ করে। অতঃপর হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং ও আজমিরীগঞ্জ উপজেলা ও সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুরমার সাথে পুনরায় মিলিত হয়েছে। কুশিয়ারা নদীর দৈর্ঘ্য ২২৮ কি.মি.। এ নদী সিলেট বিভাগের চারটি জেলাকেই স্পর্শ করেছে। এজন্য কুশিয়ারা নদী সিলেট বিভাগের চার জেলারই অন্যতম প্রধান নদী। কুশিয়ারা নদী হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার কয়েকটি স্থানে ‘বিবিয়ানা’ নামে এবং আজমিরীগঞ্জ উপজেলা ও সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার কোথাও কোথাও ‘কালনী’ নামে প্রবাহিত হয়েছে । কুশিয়ারা নদীতে শুষ্ক মৌসুমেও নাব্যতা থাকে। পঞ্চাশ বছর আগেও কুশিয়ারা নদী দিয়ে বড়ো বড়ো পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল করত। এই নদীর তীরে সিলেট বিভাগের

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ফেঞ্চুগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এশিয়ার বৃহৎতম সার কারখানা।

সারী নদী

সারি ঐতিহ্যবাহী একটি নদী। এটি বিশুদ্ধ ও মিঠা পানির নদী। সারি নদী বাংলাদেশের অন্যতম সুন্দর নদী। এই নদীকে বাংলাদেশের 'নীল পানির নদী' বলে অভিহিত করা হয়। সারির স্বচ্ছ নীলজল পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। নদীটি ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত দিয়ে। জৈন্তিয়াপুর উপজেলার চারিঘাটা ইউনিয়নের লালাখাল নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার নদীটি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বিভাজন করে প্রবাহিত হয়েছে। সারি নদী প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে গোয়াইনঘাট উপজেলার কাছে গোয়াইন নদীর সাথে মিলিত হয়ে গোয়াইন নামেই প্রবাহিত হয়েছে। খাটি বালুর অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে এ নদীতে, যা সারির বালু নামে প্রসিদ্ধ। ভারতীয় সীমানায় এ নদী মাইন্ডু নদী নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৩০ কিলোমিটার উজানে ডাউকি চ্যুতির কাছে এ নদীতে ভারতের জৈন্তিয়া হিল ডিস্ট্রিক্টে ৬৩ মিটার উঁচু 'লেসকা হাইড্রো ইলেকট্রিক ড্যাম' নির্মাণ করা হয়েছে ।

ডাউকি-গোয়াইন ও পিয়াইন নদী

ভারতের ডাউকি নদী মেঘালয় পাহাড় থেকে গোয়াইনঘাট উপজেলার সীমান্তবর্তী জাফলংয়ের বল্লাঘাটে প্রবেশ করে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। একটি শাখা ডাউকি নামে, অন্য শাখা পিয়াইন নামে পরিচিত। তামাবিল-শিলং মহাসড়কের ডাউকি ব্রিজের কাছে এ নদীর প্রবেশমুখ হলো বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যতম স্থান জাফলং। ডাউকির উত্তরপূর্ব ধারা পূর্ব জাফলং ইউনিয়নে মরা পিয়াইন নামে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ধারা পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নে ডাউকি নামে প্রবাহিত। এই ডাউকি নদীই গোয়াইনঘাট উপজেলা সদরের নিকট থেকে গোয়াইন নামধারণ করে প্রায় ১০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে সারি নদীর সাথে মিলিত হয়। গোয়াইন ও সারির মিলিত প্রবাহ গোয়াইন নামে ২১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সিলেট সদর উপজেলায় চেঙ্গেরখাল নামধারণ করে। চেঙ্গেরখালের দক্ষিণ তীরে দেশের অন্যতম সোয়াম্প ফরেস্ট বা জলারবন রাতারগুল অবস্থিত।

কাফনা নদী

গোলাপগঞ্জ, কানাইঘাট ও গোয়াইনঘাট উপজেলার বাঘার হাওর, দালাইর হাওর ও বড়ো হাওরের সাথে সংযুক্ত কাফনা নদী। ফতেহপুর ইউনিয়নের চিরিঙ্গি নামক স্থানে কাফনা নদী চেঙ্গেরখাল বা গোয়াইন নদীতে মিলিত হয়েছে। এই নদীর তীরে জৈন্তাপুর উপজেলার হরিপুর বাজার। সিলেটের স্থানীয় ভাষায় কাফনা শব্দের অর্থ ঝিনুক। অতীতে এ নদীতে হয়তো ঝিনুক পাওয়া যেত। কাফনা ও চেঙ্গেরখালের মোহনায় ফতেহপুর ইউনিয়নে রাতারগুল জলারবন অবস্থিত।

সিলেট জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রবাহিত ছোটো-বড়ো নদীগুলোর মধ্যে সিলেট সদর উপজেলার হাটখোলা ইউনিয়নে ভাদেশ্বর নদী ও টুলটিকর ইউনিয়নে কুইগাঙ, দক্ষিণ সুরমার বরইকান্দি ইউনিয়নে বেটুয়া,

তেতলী ইউনিয়নে ধাপ্পাই, গিরগিট, কানাইঘাটের লোভাছড়া, নুনছড়া, ডোনা, দেওছই, সুরই, শিংগারীয়া, আমরী, খামাজুরী, চিলাই, হুর্মা, জকিগঞ্জ উপজেলার কাজলসার ইউনিয়নের পার্শ্বস্থ চৌধুরী বাজারের পশ্চিমে কুল নদী, বড়ো চতুল ইউনিয়নে হিংগার নদী ও ঈশাবা নদী, জৈন্তাপুর উপজেলার রাংপানি, জৈন্তাপুর ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সবুড়ী (বড়ো নয়াগাঙ ও নয়া গাঙ নদীর মিলনে উৎপন্ন), গোয়াইনঘাট উপজেলার ডাউকী নদী, ফাটাগাঙ, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার কাটাগাঙ, গোলাপগঞ্জের লক্ষণাবন্দ ইউনিয়ন দিয়ে প্রবাহিত দেওরভাগা নদী, বিয়ানীবাজারের কুড়ার বাজার ইউনিয়নের কুড়া নদী, মোল্লাপুর ইউনিয়নের লুলা ও করল, বিশ্বনাথের মাকুন্দা, খাজাঞ্চি, দৌলতপুর ইউনিয়নে মাটিজুরা, বালাগঞ্জের পেকুয়া, কালিয়া, সাদিপুর ইউনিয়নের এলঙ্গি-খেজুরা বিল থেকে প্রবাহিত নারকিলা, বরুঙ্গাবাজার এবং বোয়ালজুর ইউনিয়নকে পৃথক করা বুড়িবরাক, ৩নং পশ্চিম পৈলনপুর ইউনিয়নের উত্তর-দক্ষিণ সীমান্ত বুড়িনদী, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়নে জুড়ী, গিরগিট, মমিনছড়া চা-বাগান হতে হাকালুকি হাওরের সংযোগকারী দেড়ুনদী উল্লেখযোগ্য।

ভূতত্ত্ব সিলেটকে বলা হয় সুরমা অববাহিকা (Surma Basin) অঞ্চল। ভারতের মণিপুর ও মিজোরাম রাজ্য থেকে উৎসারিত বরাক নদীর দক্ষিণমুখী উপনদী সুরমা নদী সিলেট শহরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার পশ্চিমে বরাকের উত্তরমুখী উপনদী কুশিয়ারার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, যার সম্মিলিত উত্তাল স্রোতধারাই মেঘনা নদী। ভুবন ও বোকাবিল স্তরসমষ্টি নিয়ে গঠিত মায়োসিন সুরমা সিরিজের নাম এই নদী থেকে উদ্ভূত, সুরমা অববাহিকায় যার বিকাশ খুবই সমৃদ্ধ। সুরমা উপত্যকা ও সিলেট খাদ (Sylhet trough) কমবেশি সুরমা অববাহিকারই অনুরূপ। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক জরিপের মহাপরিচালক কর্তৃক ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত উত্তরপূর্ব ভারতের ভূতাত্ত্বিক ও মণিক মানচিত্রে দক্ষিণ খাসিয়া পাহাড়ে প্রবীণ ক্রিটেসিয়াস যুগের চারটি সিলেট ট্র্যাপ অঞ্চল দেখানো হয়েছে। শিলং মালভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে আরকিয়ান ভিত্তিশিলার উপরে অসংগতভাবে সিলেট ট্র্যাপের (নবীন জুরাসিক ও প্রবীণ ক্রিটেসিয়াস) শিলাসমূহ শায়িত। আবার মেসোজোয়িক-টারশিয়ারি শিলাসমূহ সিলেট ট্র্যাপের শিলাসমূহের উপরে শায়িত। এটি জাদুকাটা নদী গিরিসঙ্কটে (gorge) দেখা যায়। এই নদীর দক্ষিণে একটি কূপে ২,৩৯০ মিটার গভীরতায় প্রায় ১৫০ মিটার পুরু সিলেট ট্র্যাপ শিলা পাওয়া গেছে। এটি ঘন সবুজ থেকে সবুজাভ ধূসর বর্ণের এবং প্রায়ই ক্ষুদ্র গর্ত (vesicle) বা অপ্রধান মণিক (secondary mineral) দ্বারা গর্ত ভরাট বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। শিলং ম্যাসিফ ও বড়াইল রেঞ্জ উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত এবং ত্রিপুরা বলিত বলয় (Tripura Folded Belt) একে দক্ষিণে ঘিরে রেখেছে। আগে এটি বরাইল-মণিপুর গিরিশিরা দ্বারা বেষ্টিত, আর পশ্চিমে অববাহিকাটি ধীরে ধীরে হিঞ্জ জোন অভিমুখে ওঠে অবশেষে দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গীয় পুরঃখাতে (Bengal foredeep) এসে মিশেছে। প্রায় ১ লাখ

বর্গকিলোমিটার-বিশিষ্ট সুরমা অববাহিকা ওলিগোসিন ও পায়োসিন উপযুগের মধ্যে কোনো এক সময় অবনমিত হয়ে যাওয়া বঙ্গীয় অববাহিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলজুড়ে বিরাজ করছে। শিলং ম্যাসিফের (Shillong massif) দক্ষিণে সুরমা উপত্যকার উত্তরাঞ্চল দিয়ে অতিক্রমকারী ডাউকি চ্যুতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-গাঠনিক উপাদান, যার কারণে আর্কিয়ান ভিত্তিশিলা সুরমা উপত্যকার ১৮ কিলোমিটার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। গঠনগতভাবে সুরমা অববাহিকা দুটি বৃহৎ ভূ-গাঠনিক উপাদান উত্তরের উত্থিত শিলং ম্যাসিফ এবং বার্মা প্লেন্টের পশ্চিমমুখী অগ্রসরমাণ ইন্দো-বার্মা ভ্রাম্যমাণ বলিত বলয় দ্বারা গঠিত। সুরমা অববাহিকা বাংলাদেশের ভূমিকম্প জোন ১-এ অবস্থিত। তাই সিলেট অঞ্চল সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প ঝুঁকির মুখে।

সিলেট-সুনামগঞ্জ ও ভারতের শিলংকে বিভক্ত করেছে ডাউকি নদী, আর এই ডাউকি নদী ডাউকি চ্যুতি (Dauki fault) বরাবর অবস্থান করছে, আর ভূতাত্ত্বিক চ্যুতিগুলোই বড়ো ধরনের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। সিলেটের সীমান্ত এলাকাবর্তী এধরনের চ্যুতিগুলোর কোনো কোনোটিতে সাব-ডাউন ফল্ট রয়েছে। সিলেট জেলার ভূপ্রকৃতি, পরিবেশ-প্রতিবেশ সুরমা-কুশিয়ারাসহ প্রায় অর্ধশতাধিক নদনদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

জলবায়ু

সিলেট উপক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুর অঞ্চল। বাংলাদেশের মধ্যে এ অঞ্চলই সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩৪০০ থেকে ৪৬০০ মিলিমিটার। সিলেটের উত্তর-পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত ৫৮০০ মিলিমিটার সমবর্ষণরেখা অতিক্রম করে যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় ভারতের মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জিতে। চেরাপুঞ্জির অবস্থান সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ হতে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে। চেরাপুঞ্জিতে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিস্ময়কর রকমের বেশি, ১০৮২০ মি.মি.। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিপাতের রেকর্ড সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার লালাখাল (৬৪০০ মি.মি.) এলাকার।

মাসিক ও বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)

সাল	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	বার্ষিক মোট (মি.মি.)
২০০৮	১৯	৩৫	১৮৮	১৩৯	৫৮৯	৫৭৬	৫৯৬	৭৬১	২৬০	১৯৩	৫	০	৩৩৬১
২০০৯	০	২০	১০২	৪২০	৫৪৩	৫১২	৫৮০	২৫১	১৩৬	১	০	৩	২৫৬৮
২০১০	০	১	১৪৭	৮০৪	৭২৮	৯৪৬	৫২৮	৭৬৭	৭৩২	২৩১	১০	৪৫	৪৯৩৯
২০১১	০	৩	৯৯	৭৮	৪০৩	৫৭৮	৬৭৩	৭২২	৪৯০	৫৫	০	০	৩১০১
২০১২	১০	৬	৯৫	৬৯১	৪০৫	১১৮৯	৬৭৩	৭৭২	৩১৫	৪৪৩	৪৮	০	৪৬৪৭
২০১৩	০	০	১৬	২৩৭	৯৫৭	৭২৭	৫৬৭	৫৩৪	৩৩৮	৪৪৪	০	০	৩৮২০
২০১৪	০	৩৪.২	৬৫.৫	১৪৭.৩	৫৪০.১	৭৪১.৩	৩১১.৪	৭৯০.৯	৭২১.৬	৩৩	০	০	৩৩৮৫.৭
২০১৫	১৬	৪০	২৮	৫৪৩	৭৫২	৮৩৯	৬৬৮	৯৩৪	৫৭	৫৭	০	৭	৩৯৪১
২০১৬	১০.৯	২৮.৯	১৩৯.৪	১০৩০.১	৬৭০.১	৬৫৭.২	৫২৮.২	৪৮২.৯	৪৭৭.৬	১৫৬.৯	১০৮.২	৪.৮	৪২৯৫.২

সূত্র: স্ট্যাটিস্টিকাল ইয়ার বুক অব বাংলাদেশ-২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৫ বিবিএস। ২০১৪ এবং ২০১৬ সালের তথ্য আবহাওয়া অফিস, সিলেট থেকে সংগৃহীত।

পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য

চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ, আর গোটা পরিবেশের একটি কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রতিবেশ ব্যবস্থা। পৃথিবীর নানাপ্রান্তে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেশ ব্যবস্থা থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেই মানুষসহ সকল জীবন টিকে আছে। ভৌগোলিক কারণে আমাদের দেশ বেশকিছু বৈচিত্র্যময় জলজ ও স্থলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থার ধারক। আর্দ্র-ক্রান্তীয় জলবায়ুর এ দেশটির উত্তরপূর্ব প্রান্তে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যতম জেলা সিলেট। সিলেটের প্রকৃতি সমৃদ্ধ। প্রকৃতি অকৃপণ হাতে নিখুঁতভাবে সাজিয়েছে বৃহত্তর সিলেট বিভাগের কেন্দ্রস্থল সিলেট জেলাকে। বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিতে রয়েছে জালের মতো ছড়ানো নদীনালা, খালবিল; অগণিত টিলা-পাহাড়, বন, ঝোপজঙ্গল এবং হাওর-বাঁওড় ও জলাভূমি। এখানে রয়েছে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ ও সমতলভূমি । বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওর এবং দেশের একমাত্র জলারবন (সোয়াম্প ফরেস্ট) এখানেই অবস্থিত ।

বাংলাদেশের এককেটি অঞ্চলের একেক রকম ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোনো এলাকা শুধু পাহাড়টিলাতে ভরপুর, আবার কোনো অঞ্চলে রয়েছে শুধুই সমতলভূমি কিংবা জলাভূমি। কিন্তু সিলেটই একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে একসাথে টিলা, পাহাড়, বন, নদী, সমতলভূমি, হাওর-বাঁওড়, জলাভূমির এক বিচিত্র সমাহার ঘটেছে। এই সব প্রাকৃতিক বন, পাহাড়, হাওর-বাঁওড় ও নদীতে রয়েছে বিচিত্র সব প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ।

দেশের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলগুলোর মধ্যে সিলেট জেলার বনাঞ্চলসমূহ জীববৈচিত্র্যের কারণে দেশ-বিদেশে বিশেষ গুরুত্ব আর পরিচিতি লাভ করেছে। সিলেটে ২০০ বর্গকিলোমিটার সংরক্ষিত বনাঞ্চল রয়েছে। সেখানে রয়েছে বিচিত্র বর্ণের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমারোহ।

সিলেট জেলার বনভূমি মূলত উষ্ণমণ্ডলীয় চিরহরিৎ বন। এর পাশাপাশি বাঁশ ও বেতের বন, চা-বাগান, বসতবাড়ি বন, মিঠা পানির জলারবন উল্লেখযোগ্য। খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান (৬৭৮.৮ হেক্টর), টিলাগড় ইকোপার্ক (৪৫.৩৮ হেক্টর) ও রাতারগুল জলার বন সিলেট জেলার প্রধান বনাঞ্চল ।

বৃহত্তর সিলেট বনবিভাগে ১২টি সংরক্ষিত বন (Reserved Forest) রয়েছে; এর মাঝে ৩টি সিলেট জেলায় অবস্থিত। এগুলো হলো খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, টিলাগড় ইকোপার্ক এবং জাফলং সবুজ উদ্যান। নানাবিধ বিরুৎ, গুল্ম আর বৃক্ষের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাহার রয়েছে এসব সংরক্ষিত বনে। সেই সাথে রয়েছে বিষধর সাপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ী ও উভচর প্রাণী।

সিলেট জেলার উদ্ভিজ ও প্রাণিকুল

ক) উদ্ভিজ্জ

সিলেট জেলা উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে অনন্য। প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে এ এলাকার উদ্ভিদকুলে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। নিম্নে বিভিন্ন বনে উদ্ভিদের বর্ণনা দেওয়া হলো:

১) খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান ও টিলাগড় ইকোপার্ক

একে ২০০৬ সালে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়। সিলেট শহর থেকে ১৫ কি. মি. উত্তরপূর্বে সিলেট-তামাবিল সড়কে এই জাতীয় উদ্যানের অবস্থান। এ উদ্যানের ৬৭৯ হেক্টর এলাকা সংরক্ষিত বন। এ বনের কাছাকাছি বেশকিছু চাবাগান, বাঁশ ও বেতের বন থাকায় এ জাতীয় উদ্যানটি পর্যটকদের কাছেও দিন দিন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এ রক্ষিত এলাকাটি চিরহরিৎ বনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

সারণি-১

খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান ও টিলাগড় ইকোপার্কের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদসমূহ

Local name	Scientific name	Local name	Scientific name
০১। কয়েনগোলা	*Garuga pinnata*	১৫। সেগুন	*Tectona grandis*
০২। কোয়াথুকী	*Cordia fragreantissima*	১৬। মেহগনি	*Swietenia mahagoni*
০৩। গামার	*Gmelina arborea*	১৭। লোহাকাঠ	*Xylia dolabriformis*
০৪। জারুল	*Lagerstroemia speciosa*	১৮। চালতা	*Dillenia pentagyna*
০৫। পোংটা	*Premna bengalensis*	১৯। শিমুল	*Bombax ceiba*
০৬। সোনালু	*Cassia fistula*	২০। কদম	*Anthocephalus chinensis*
০৭। আওয়াল	*Vitex Spp.*	২১। ছাতিম	*Alstonia scholaris*
০৮। নাগেশ্বর	*Mesua ferrea*	২২। আগর	*Aquilaria agallocha*
০৯। চাপালিশ	*Artocarpus chapalasha*	২৩। আমলকি	*Emblica officinalis*
১০। জাম	*Eugenia spp*	২৪। জংলিবাদাম	*Pterygota alata*
১১। গর্জন	*Dipterocarpus turinatus*	২৫। বহেরা	*Terminalia bellirica*
১২। চিকরাশি	*Chickrassia tabularis*	২৬। ডেওয়া	*Artocarpus lacucha*
১৩। করই	*Albizia spp*	২৭। হরিতকী	*Terminalia chebula*
১৪। বোনাক	*Schima wallichii*	২৮। পিটালি	*Trewia polycarpa*

বিচিত্র উদ্ভিদরাজির পাশাপাশি এ বনে ১৬ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৯ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ২০ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ২৫ প্রজাতির পাখির উপস্থিতি রয়েছে।

২) রাতারগুল মিঠাপানির জলার বন (Ratargul Fresh Water Swamp Forest)

হাওর এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জলাবন (Wetland Forest) বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। রাতারগুল জলার বনটি সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত। ২৫°০′ ও ৪১°০২′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৫৫′ ও ৪২°১৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এ বনের অবস্থান। সিলেট শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে গোয়াইন নদীর

পাশে (স্থানীয়ভাবে চেঙ্গোর খাল নামে পরিচিত) এ বন প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠেছে। বর্ষাকালে পানিতে বনটি জলমগ্ন থাকে।

দেশের একমাত্র মিঠা পানির এ জলার বন অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে আলাদা গুরুত্ব বহন করে। অনন্য বৈশিষ্ট্য আর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে এ বন প্রকৃতিপ্রেমীদের মাঝে দারুণ সাড়া ফেলেছে। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় এ বনে ৭৪ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৯ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ২০ প্রজাতির দেশি ও অতিথি পাখির অবস্থান সম্পর্কে জানা গেছে। রাতারগুল জলারবনের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :

সারণি-২

রাতারগুল মিঠাপানির জলারবনে বিদ্যমান উদ্ভিদ প্রজাতির তালিকা

Canopy	Local	Scientific Name
উচ্চ পল্লববিতান শ্রেণি (Top Canopy Class)	১. করচ	*Pongamia pinnata*
	২. হিজল	*Barringtonia acutangula*
	৩. পানিজাম	*Syzygium fruticosum*
	৪. মেরুক	*Ficus hispida*
	৫. অশ্বত্থ	*Ficus religiosa*
	৬. বরুন	*Crateva nurvala*
	৭. কালঝুআ	*Cordia dichotoma*
	৮. কাও	*Garcinia cowa*
	৯. জারুল	*Lagerstroemia speciosa*
	১০. পিটালি	*Trewia polycarpa benth*
নিম্ন পল্লববিতান শ্রেণি (Lower Canopy Class)	১. পাটিপাতা	*Clinogyne dichotoma*
	২. ঢোলকলমি	*Ipomoea fistulosa*
	৩. শাপলা	*Nymphaea nouchali*
	৪. বনগোলাপ	*Rosa involucrata involucrata*
	৫. জালিবেত	*Calamus guruba*
	৬. থানকুনি	*Asparagus racemosus*
	৭. শতমূলী	*Centella asiatica*
	৮. অনন্তমূল	*Hemidesmus indicus*
	৯. গিমা	*Glinus oppositifolius*
	১০. হোগলা	*Schoenoplectus juncoides*
	১১. নল	*Phragmites karka*
	১২. খাগড়া	*Saccharum spontaneum*

৩) বাঁশ বন (Bamboo Forest)

সিলেট জেলার অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ হলো বাঁশ ও বেত। যুগ যুগ ধরে নানান প্রজাতির বাঁশ ও বেত বৃহত্তর সিলেটের বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। পাশাপাশি বসতবাড়িতেও বাঁশ-এর চাষ এবং অব্যবহৃত জলাভূমি ও জমির পাশে বেতের চাষ বহুল প্রচলিত।

সিলেট জেলার প্রাকৃতিক বন ও বসতবাড়ির পারিবারিক বনে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। সিলেট জেলায় প্রাপ্ত প্রধান প্রধান বাঁশ ও বেতের প্রজাতির তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

সারণি-৩

সিলেট জেলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের তালিকা

SL No.	Bengali Name	Scientific Name
১.	মিতিঙ্গা	*Bambusa tulda*
২.	কালী	*Oxytenanthera nigrociliata*
৩.	ডলু	*Teinostachyum dullooa*
৪.	মুলি	*Melocanna baccifera*
৫.	ওরাহ	*Dendrocalamus longispathus*
৬.	ফারুয়া	*Bambusa polymorpha*
৭.	তিলসুন্ধী	*Talauma phellocarpa*
৮.	কান্তা	*Bambusa bambos*

সারণি-৪

সিলেট জেলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির বেতের তালিকা

SL No.	Bengali Name	Scientific Name
১.	গোল্লা বেত	*Daemonorops jenkinsiara*
২.	জালি বেত	*Calamus tenuis*
৩.	বুদুম বেত	*Calamus latifolius*
৪.	কেরাক বেত	*Calamus viminalis*

৪) বসতবাড়ির বন (Homestead Forest)

বসতবাড়ির আঙিনার ধার ঘেঁষে গড়ে ওঠা বনই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উৎপাদনক্ষম বন, যা দেশের বনজ সম্পদের মোট চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করে চলেছে। সিলেট জেলার বসতবাড়ির বন দেশের অন্যান্য বসতবাড়ির বনগুলোর মতোই। নানান প্রজাতির বৃক্ষরাজির সমারোহ দেখা যায় এই বসতবাড়ির বনসমূহে। ফলদ, বনজ ঔষধি নানান প্রজাতির উদ্ভিদের সংমিশ্রণ রয়েছে সিলেট জেলার বসতবাড়ির বনে। এ বনের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদগুলো সারণিতে দেওয়া হলো।

সারণি-৫

বসতবাড়ির বনে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের তালিকা

SL No.	Local Name	Scientific Name	SL No.	Local Name	Scientific Name
১.	কয়েনগুলা	*Garuga pinnata*	২৯.	তুন	*Toona ciliate Ciliata*
২.	কোয়াথুকী	*Cordia fragrantissima*	৩০.	রামদালা	*Duabanga sonneratioides*
৩.	গামার	*Gmelina arborea*	৩১.	গর্জন	*Dipterocarpus turbinatus*
৪.	জারুল	*Lagerstroemia speciosa*	৩২.	চিকরাশি	*Chickrassia tabularis*
৫.	পোংটা	*Premna bengalensis*	৩৩.	করই	*Albizia Proceka*
৬.	মরিচা সুন্দী	*Alseodaphne owdeni*	৩৪.	বোনাক	*Schima Wallichii*
৭.	সোনালু	*Cassia fistula*	৩৫.	ইকরা	*Erianthus ravaneae*
৮.	আওয়াল	*Vitex Spp.*	৩৬.	আসুলিয়া	*Cordia myxa*
৯.	নাগেশ্বর	*Mesua ferrea*	৩৭.	ঢেওকল	*Garcinia xanthochymus*
১০.	চাপালিশ	*Artocarpus chapalshalasha*	৩৮.	পিঙ্গো	*Cynometra polyandra*
১১.	চম্পা সুন্দী	*Michelia Montana*	৩৯.	গোন্দরী	*Cinnamomum glanduliferum*
১২.	জাম	*Suzygim cumini*	৪০.	সেগুন	*Tectona grandis*
১৩.	রাতা	*Amoora wallichii*	৪১.	মেহগনি	*Swietenia mahagoni*
১৪.	লোহাকাঠ	*Xylia dolabriformis*	৪২.	বন শিমুল	*Salmalia insignis*
১৫.	পাতিদাল	*Licuala peltata.*	৪৩.	বরুন	*Crateva nurvala*
১৬.	চালতা	*Dillenia pentagyna*	৪৪.	বেলা	*Sapium baccatum*
১৭.	মহাল	*Vatica lanceaefolia*	৪৫.	ভুরি	*Baccaurea sapida*
১৮.	নল	*Phragmites karka*	৪৬.	চালমুগড়া	*Hydnocarpus kurzii*
১৯.	শিমুল	*Bombax ceiba*	৪৭.	ঢেওয়া	*Artocarpus lacucha*
২০.	কদম	*Anthocephalus Chinensis*	৪৮.	হলুদ	*Adina cordifolia*
২১.	ছাতিম	*Alstonia scholaris*	৪৯.	হরিতকী	*Terminalia chebula*
২২.	আগর	*Aquilaria agallocha*	৫০.	হারগোজা	*Dillenia pentagyna*
২৩.	আমলকি	*Emblica officinalis*	৫১.	হিজল	*Barringtonia acutangula*

SL No.	Local Name	Scientific Name	SL No.	Local Name	Scientific Name
২৪.	জংলীবাদাম	*Pterygota alata*	৫২.	বাঁশপাতা	*Podocarpus neriifolius*
২৫.	বহেরা	*Terminalia bellirica*	৫৩.	করচ	*Pongamia pinnata*
২৬.	বজরং	*Zanthoxylum budrunga*	৫৪.	সাতকরা	*Citrus hystrix*
২৭.	লুকলুকি	*Flacourtia jangomas*	৫৫.	পিটালী	*Trewia nudiflora*
২৮	রামকাঁটা	*Quercus spp*	৫৬.	সোনারী	*Cassia nodosa*

আম, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদি বৃহৎ বৃক্ষের পাশাপাশি নানান প্রজাতির লতাগুল্মের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো:

Local name	Scientific Name
১। চালিতা লতা	*Delina sarmentosa*
২। গিলা লতা	*Entada pursaetha*
৩। কুচাই লতা	*Acacia pennata*
৪। কুচিলা লতা	*Strychnos wallichiana*

উদ্ভিদের পাশাপাশি নানান বৈশিষ্ট্যের প্রাণীর আবাসস্থল সিলেট জেলার বসতবাড়ি বনাঞ্চলসমূহ। উল্লেখযোগ্য প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি আর সরীসৃপের আবাসস্থল এই বসতবাড়ি বনাঞ্চলসমূহে।

এই বনাঞ্চল মূলত সুরমা, পিয়াইন ও গোয়াইন নদীবিধৌত হাওর অববাহিকায় অবস্থিত। এ বনের অন্তর্ভুক্ত হলো প্রাকৃতিক জলার বন ও নল খাগড়ার বন এবং ছোটো-বড়ো বিল ও কুড়ি। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর উপজেলাজুড়ে বিস্তৃত রিড ল্যান্ড বনাঞ্চল।

পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে রিড ল্যান্ড বনাঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিকভাবেই এ বনাঞ্চল অত্যন্ত উর্বর এবং উৎপাদনশীল। নানান দেশি প্রজাতির মৎস্যের উৎপাদন ক্ষেত্র হিসেবেও এই বনাঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে অতিথি পাখির আবাসস্থলও এই রিডল্যান্ড বনাঞ্চল।

নির্বিচার বৃক্ষ ও পাখি নিধন আর মৎস্য শিকারের ফলস্বরূপ এই বনের জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মু খীন। সময়ের আবর্তে অনেক উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি এ বনাঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা এদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। এই বনের বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের তালিকা সন্নিবেশিত হলো :

সারণি-৬

রিডল্যান্ড বনে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের তালিকা

রিডল্যান্ড বনাঞ্চল

SL No.	Local Name	Scientific Name	SL No.	Local Name	Scientific Name
১.	খাগড়া	*Saccharum spontaneum*	২১.	তারা	*Alpinia allughas*
২.	নল	*Phragmites karka*	২২.	পাটিপাতা	*Clinogyne dichotoma*
৩.	ইকর	*Sclerostachya fusca*	২৩.	কেয়া	*Pandanus odoratissimus*
৪.	হিজল	*Barringtonia acutangula*	২৪.	জগডুমুর	*Ficus racemosa*
৫.	বরুন	*Crateva nurvala*	২৫.	বিন্না	*Vetiveria zizanioides*
৬.	ভুরি	*Baccaurea sapida*	২৬.	জাম	*Syzygium cumini*
৭.	করচ	*Pongamia pinnata*	২৭.	ঝির বট	*Ficus rumphii*
৮.	জারুল	*Lagerstroemia speciosa*	২৮.	পাকুড়	*Ficus benghatensis*
৯.	ল্যান্টেনা	*Lantana indica*	২৯.	শতমূলী	*Asparagus racemosus*
১০.	জাতি বেত	*Calamus tenuis*	৩০.	কাকডুমুর	*Ficus hispida*
১১.	শিল কড়ই	*Albizia Procera*	৩১.	ভুইশুকড়া	*Lipia javanica*
১২.	মটর কড়ই	*Albizia Iucida*	৩২.	বনলতা	*Ficus heterophylla*
১৩.	শিমুল	*Bombax ceiba*	৩৩.	মাখনা	*Euryale ferox*
১৪.	বুহাল	*Cordia dichotama*	৩৪.	পদ্ম	*Nelumbo nucifera*
১৫.	ভাটকুর	*Vitex heterophylla*	৩৫.	ছন	*Imperata Cylindrica*
১৬.	বিস	*Salix tetrasperma*	৩৬.	রেইনট্রি	*Samanea saman*
১৭.	তুলসী	*Ocimum sanctum*	৩৭.	চা-লতা	*Dillenia pentagyna*
১৮	তেঁতুল	*Tamarindus indica*	৩৮.	অর্জুন	*Terminalia arjuna*

SL No.	Local Name	Scientific Name	SL No.	Local Name	Scientific Name
১৯	দেশি গাব	*Diospyros peregrina*	৩৯.	রাজকড়ই	*Albizia richardiana*
২০	শেওড়া	*Streblus asper*	-		-

৫) চা-বাগানের উদ্ভিদ

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ হিসেবে পরিচিত এই সিলেট জেলা। নয়নাভিরাম চা-বাগানগুলো যেন সবুজের গালিচা দিয়ে ঢাকা। সিলেট জেলার প্রায় ২০টি চা-বাগান রয়েছে। এ বাগানগুলো অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি জীববৈচিত্র্যের এক বিশাল ভান্ডারও বটে। ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষরাজি আর নানা প্রজাতির প্রাণিকুলের উপস্থিতি এসব চা-বাগানগুলোকে করেছে সমৃদ্ধ। চা গাছ সহ উল্লেখযোগ্য ছায়াপ্রদানকারী বৃক্ষসমূহের তালিকা বর্ণিত হলো :

সারণি-৭

চা-বাগানে ব্যবহৃত ছায়া বৃক্ষের তালিকা

Local name	Scientific Name
১। বকাইন	*Albizia procera*
২। রাধাচূড়া	*Azadirachta indica*
৩। আকাশম	*Delonix regia*
৪। ম্যানজিয়াম	*Acacia auriculiformis*
৫। জারুল	*Lagerstroemea speciosa*
৬। মড়ই	*Albizia odoratissima*

খ) সিলেটের জীবজন্তু

বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ প্রজাতির পাশাপাশি সিলেট জেলা প্রাণিসম্পদেও ভরপুর। এ জেলার বন বাদাড়, হাওর-বাঁওড় আর বসতবাড়ির আঙিনায় নানা প্রজাতির সরীসৃপ, উভচর প্রাণী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপস্থিতি দেখা যায়। এর পাশাপাশি বিচিত্রবর্ণের দেশীয় ও পরিযায়ী পাখির সবচেয়ে বড়ো আবাসস্থল এ জেলা। গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীর তালিকা বর্ণিত হলো :

i) উভচর প্রাণী

সারণি-৮

সিলেট জেলায় বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির উভচর প্রাণীর তালিকা

SL No.	Bengali	Scientific Name
১.	বুনো ব্যাঙ	*Duttaphrynus melanostictus*
২.	স্কিপার ফ্রগ	*Euphlyctis cyanophlyctis*
৩.	ঝিঁঝি ব্যাঙ	*Fejervarya limnocharis*

SL No.	Bengali	Scientific Name
৪.	জেরডনস্ বুল ফ্রগ	*Hoplobatrachus crassus*
৫.	সোনা/ কোলা ব্যাঙ	*Hoplobatrachus tigerinus*
৬.	ভামো ব্যাঙ	*Humerana humeralis*
৭.	কোপস্ ফ্রগ	*Hylarana leptoglossa*
৮.	ঘাসব্যাঙ	*Hylarana taipehenisis*
৯.	লিপিং ফ্রগ	*Hylarana tytleri*
১০.	এশিয়ান পেইন্টেড ফ্রগ	*Kaloula pulchra*
১১.	স্মিথ্স ফ্রগ	*Leptobrachium smithi*
১২.	খাসি পাহাড়ি ব্যাঙ	*Limnonectes khasianus*
১৩.	Berdmores Microhylid Frog	*Microhyla berdmorei*
১৪.	Bhamo Frog	*Microhyla ornata*
১৫.	Leaping Frog	*Microhyla rubra*
১৬.	গেছো ব্যাঙ	*Polypedates leucomystax*
		Polypedates Maculatus
১৭.	Horned Toad	*Xenophrys parva*

সূত্র: জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস, সিলেট

ii) সরীসৃপ প্রজাতির প্রাণী

সারণি-৯

সিলেট জেলায় বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ সরীসৃপ প্রজাতির তালিকা

SL No.	Bengali	Scientific Name
১.	লাউডগা সাপ	*Ahaetulla nasuta*
২.	চিলুসাপ	*Amphiesma Stolata*
৩.	সবুজ ফণিমনসা	*Boiga cyanea*
৪.	ফণিমনসা	*Boiga gokool*
৫.	কালকেউটে সাপ	*Bungarus caeruleus*
৬.	শঙ্খিনী সাপ	*Bungarus fasciatus*
৭.	দুধরাজ	*Coelognathus radiatus*
৮.	গিরগিটি	*Calotes emma*
৯.	রক্তচোষা	*Calotes versicolor*
১০.	সবুজ বোড়া	*Cryptelytrops albolabris*
১১.	সবুজ বোড়া	*Cryptelytrops erythrurus*
১২.	কাছিম	*Cuora amboinensis*
১৩.	উড়ন্ত গিরগিটি	*Draco maculatus*
১৪.	পাইন্না সাপ	*Enhydris enhydris*
১৫.	তক্ষক	*Gekko gecko*
১৬.	মগম কাছিম	*Geoclemys hamiltonii*
১৭.	হারইল টিকটিকি	*Hemidactylns*
১৮.	কাইট্রা	*Hardella thurjii*
১৯.	সুন্দী কাছিম	*Lissemys punctata*
২০.	ঘরগিন্নী সাপ	*Lycodon aulicus*

SL No.	Bengali	Scientific Name
২১.		*Lycodon fasciaus*
২২.		*Lycodon zawi*
২৩.	স্পটেড সাপ স্কিন্ক	*Lygosoma punctata*
২৪.	অঞ্জন	*Mabuya carinata*
২৫.	আঁচিল	*Mabuya macularia*
২৬.	শিলা কচ্ছপ	*Melanochelys tricarinata*
২৭.	কাছিম	*Morenia petersi*
২৮.	গোখরা	*Naja kaouthia*
২৯.	খৈয়া গোখরা	*Naja naja*
৩০.	কুকরী	*Oligodon arnensis*
৩১.	রাজগোখরা	*Ophiophagus Hannah*
৩২.	ইন্ডিয়ান টেন্ট টারটল	*Pangshura tentoria*
৩৩.	সিলেটি করী কাছিম	*Pangshura sylhetensis*
৩৪.	করী	*Pangshura tecta*
৩৫.	আসাম স্নেইল ইটার	*Pareas monticola*
৩৬.	পাহাড়ি সাপ	*Psammodynastes pulverulentus*
৩৭.	দাঁড়াশ	*Ptyas korros*
৩৮.	অজগর	*Python molurus*
৩৯.	লালমাথা ঢোড়াসাপ	*Rhabdophis subminiatus*
৪০.	স্পটেড স্কিন্ক	*Sphenomorphus maculates*
৪১.	পাহাড়ি মৈ সাপ	*Takydromus khasiensis*
৪২.	সুতানলী সাপ	*Typhlops jerdoni*
৪৩.	গুঁইসাপ	*Varanus bengalensis*
		Varanus salvator
৪৪.	পেইন্টেড কিলব্যাক	*Xenochrophis cerasogaster*
৪৫.	ঢোড়াসাপ	*Xenochrophis piscator*

সূত্র: জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস, সিলেট

iii) পাখি ক) স্থানীয় প্রজাতি

সারণি-১০

সিলেট জেলায় প্রাপ্ত স্থানীয় প্রজাতির পাখির তালিকা

SL No.	Bengali	Scientific Name
১.	কানি বক	*Ardeola grayii*
২.	লাল বক	*Ixobrychus cinnamomeus*
৩.	ডাহুক	*Amaurornis phoenicurus*
৪.	শঙ্খচিল	*Haliastur Indus*
৫.	ভুবন চিল	*Milvus migrans*
৬.	জালালি কবুতর	*Columba livia*

SL No.	Bengali	Scientific Name
৭.	টিলা ঘুঘু	*Streptopelia chinensis*
৮.	সবুজ টিয়া	*Psittacula krameri*
৯.	কোকিল	*Eudynamys scolopaceus*
১০.	করুল পেঁচা	*Athene brama*
১১.	আবাবিল	*Apus affinis*
১২.	নীলকণ্ঠ	*Coracias benghalensis*
১৩.	ছোটো মাছরাঙা	*Alcedo atthis*
১৪.	সাদা গলা মাছরাঙা	*Halcyon smyrnensis*
১৫.	নীল গলা বসন্ত বৌরী	*Alcedo atthis benghalensis*
১৬.	পেকড়া বুক কাঠঠোকরা	*Halcyon smyrnensis*
১৭.	কালোকোমড় কাঠঠোকরা	*Megalaima asiatica*
১৮.	ফটিকজল	*Dendrocopos macei*
১৯.	হলদে পাখি	*Dinopium benghalense*
২০.	কালো ফিঙে	*Alcedo atthis benghalensis*
২১.	লাটোরা	*Halcyon smyrnensis*
২২.	ব্রাউন স্রাইক	*Megalaima asiatica*
২৩.	কাঠশালিক	*Dendrocopos macei*
২৪.	বটশালিক	*Dinopium benghalense*
২৫.	খৈরী হাঁড়িছাঁচা	*Dendrocitta vagabunda*
২৬.	পাতিকাক	*Corvus splendens*
২৭.	দাঁড়কাক	*Corvus macrorhynchos*
২৮.	বুলবুলি	*Pycnonotus cafer*
২৯.	লাল বুক চাতক	*Ficedula aldicilla*
৩০.	দোয়েল	*Copsychus saularis*
৩১.	সাদাটুপি পানি গীরদী	*Chaimarrianis leucocephalus*
৩২.	টুনটুনি	*Orthotomus sutorius*
৩৩.	বড়ো টিট	*Parus major strupae*
৩৪.	টিলা মুনিয়া	*Lanchura punctulata*
৩৫.	চড়ুই	*Passer domesticus*
৩৬.	টিলা নাগ ঈগল	*Spilornis cheela*

খ) পরিযায়ী পাখি

সারণি-১১

সিলেট জেলায় প্রাপ্ত পরিযায়ী পাখির তালিকা

SL No.	Bengali	Scientific Name
১.	Greater Spotted Eagle	_*Aquila clanga*
২.	Paddy field Warbler	*Acrocephalus agricola*
৩.	টিকরা	*Acrocephalus stentoreus*
৪.	চা-পাখি	*Actitis hypoleucos*

SL No.	Bengali	Scientific Name
৫.	পাতি তিলি হাঁস	*Anas crecca*
৬.	বৈকাল তিলিহাঁস	*Anas formosa*
৭.	গিরিয়া হাঁস	*Anas querquedula*
৮.	মেটে রাজহাঁস	*Anser anser*
৯.	গোলাপী তুলিকা	*Anthus roseatus*
১০.	পাতি ভুতি হাঁস	*Aythya ferina*
১১.	কালি/ তিলি হাঁস	*Aythya fuligula*
১২.	Curlew Sandpiper	*Calidris ferruginea*
১৩.	Long Toed Stint	*Calidris subminuta*
১৪.	তেমিনখার চখা	*Calidris temminckii*
১৫.	জিরিয়া	*Charadrius dubius*
১৬.	ফরফরি	*Chlidonias hybrida*
১৭.	কুরিয়া চিল	*Circus aeruginosus*
১৮.	পাপিয়া	*Clamator jacobinus*
১৯.	বড়ো কাবাসী	*Coracina melanoptera*
২০.	বউ কথা কও	*Cuculus micropterus*
২১.	ফুটফুটি চাতক	*Culicicapa ceylonensis*
২২.	ছোটো সরালী	*Dendrocygna javanica*
২৩.	আমি দ্রঙ্গা	*Dicrurus leucophaeus*
২৪.	বাঘেরী	*Emberiza spodocephala*
২৫.	সাপখেকো বাজ	*Falco tinnunculus*
২৬.	লালবুক চাতক	*Ficedula parva*
২৭.	পাতি কুট	*Fulica atra*
২৮.	পাতি চেগা	*Gallinago gallinago*
২৯.	আবাবিল	*Hirundo rustica*
৩০.	Eurasian Wryneck	*Jynx torquilla*
৩১.	বাদামি কসাই	*Lanius cristatus*
৩২.	গঙ্গা কৈতর	*Larus ridibundus*
৩৩.	কালোলেজ জরালী	*Limosa limosa*
৩৪.	Blue throat	*Luscinia svecica*
৩৫.	Blue Tailed Bee Eater	*Merops philippinus*
৩৬.	খঞ্জনা	*Motacilla alba*
৩৭.	Gray wagtil	*Motacilla cinerea*
৩৮.	হলদে খঞ্জনা	*Motacilla flava*
৩৯.	Dark sided fly catchere	*Muscicapa sibirica*
৪০.	লালঝুঁটি ভুটি হাঁস	*Netta rufina*
৪১.	Rosy minivet	*Pericrocotus roseus*
৪২.	গেওলা বাতান	*Philomachus pugnax*
৪৩.	লাল গিরদী	*Phoenicurus ochruros*
৪৪.	কালচে ফুটকী	*Phylloscopus fuscatus*

SL No.	Bengali	Scientific Name
৪৫.	Blyths Leaf Warbler	*Phylloscopus reguloides*
৪৬.	হালতি	*Pitta sordida*
৪৭.	মেটে বাতান	*Pluvialis fulva*
৪৮.	খোঁপা ডুবুরি	*Podiceps cristatus*
৪৯.	Common Stonechat	*Saxicola torquatas*
৫০.	Gray Hooded Warbler	*Seicercus xanthoschistos*
৫১.	শা চখা	*Tadorna tadorna*
৫২.	টিলা লাল পা	*Tringa erythropus*
৫৩.	Wood sandpiper	*Tringa glareola*
৫৪.	পাটি সবুজ পা	*Tringa nebularia*
৫৫.	গোতরা	*Tringa nebularia*
৫৬.	বিলবাতান	*Tringa stagnatilis*
৫৭.	পিউ	*Tringa stagnatilis*
৫৮.	Common redshank	*Tringa totanus*
৫৯.	ধূসর টিটি	*Vanellus cinereus*
৬০.	Scaly Thrush	*Zoothera dauma*

iv) স্তন্যপায়ী প্রাণী

সারণি-১২

সিলেট জেলায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তন্যপায়ী প্রাণীর তালিকা

SL No.	Bengali	Scientific Name
১.	ইঁদুর	*Bandicota bengalensis*
২.	বড়ো ইঁদুর	*Bandicota indica*
৩.	বাদামি কাঠবিড়ালী	*Callosciurus pygerythrus*
৪.	পাতি শিয়াল	*Canis aureus*
৫.	ফটকা	*Caprolagus hispidus*
৬.	কালো বাদুর	*Cynopterus sphinx*
৭.	বনবিড়াল	*Felis chaus*
৮.	মেছো বাঘ	*Felis viverrina*
৯.	তিন দাগা কাঠবিড়ালি	*Funambulus palmarum*
১০.	বেজি/নেউল	*Herpestes javanicus*
১১.	বাদুড়	*Hipposideros galeritus*
১২.	সজারু	*Hystrix indica*
১৩.	খরগোশ	*Lepus nigricollis*
১৪.	পাতি ভোঁদর	*Lutra lutra*
১৫.	ভোঁদর	*Lutrogale perspicillata*
১৬.	আসামি বানর	*Macaca assamensis*

SL No.	Bengali	Scientific Name
১৭.	বানর	*Macaca mulatta*
১৮.	নেংটি ইঁদুর	*Mus musculus*
১৯.	লজ্জাবতী বাদুড়	*Nycticebus bengalensis*
২০.	গন্ধগোকুল	*Paradoxurus hermaphroditus*
২১.	উড়ন্ত কাঠবিড়ালি	*Petaurista magnificus*
২২.	চামচিকা	*Pipistrellus coromandra*
২৩.	চিতা বিড়াল	*Prionailurus bengalensis*
২৪.	মেছো বিড়াল	*Prionailurus viverrinus*
২৫.	গেছো ইঁদুর	*Rattus norvegicus*
২৬.	ঘরের ইঁদুর	*Rattus rattus*
২৭.	কোলা বাদুর	*Rousettus leschenaulti*
২৮.	চিকা	*Suncus murinus*
২৯.	বন্য শুয়োর	*Sus scrofa*
৩০.	মুখপোড়া হনুমান	*Trachypithecus pileatus*
৩১.	বড়ো বাঘডাশ	*Viverra zibetha*
৩২.	খাটাস	*Viverricula indica*
৩৩.	খেকশিয়াল	*Vulpes bengalensis*

V) প্রজাপতি

সারণি-১৩

সিলেট জেলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রজাপতির তালিকা

SL No.	Bengali Name	English Name	Scientific Name
	চান্নরী	Grey Pansy	*Junonia atlites*
২.	পায়রাচালী	Common/Lemon Emigrant	*Catopsilia pomona*
৩.	খয়ের চাক	Common Palmfly	*Elymnias hypermnestra*
৪.	রু রু	Common Lime	*Papilio demoleus*
৫.	নীলবিজুরি	Straight Swift	*Parnara naso*
৬	খাগড়া	Common Mime	*Papilio clytia*
৭.	দুলকাপাস	Striped Albatross	*Appias libythea*
৮.	তিলাইয়া	Common Pierrot	*Castalius rosimon*
৯.	উসুম	Lemon Pansy	*Junonia lemonias*
১০.	পাঁচবুন্দী	Common Five Ring	*Ypthima baldus*
১১.	নয়ন	Peacock Pansy	*Junonia almana*
১২.	রয়েল	Yellow Pansy	*Junonia hierta*
১৩.	হলুদ	Common Grass Yellow	*Eurema hecabe*

SL No.	Bengali Name	English Name	Scientific Name
১৪.	কনকা	Red-spot Jezebel	*Delias aganippe*
১৫.	কাওয়া	Common Crow	*Euploea core*
১৬.	খয়েরি কাপাস	Chocolate Albatross	*Appias lyncida*
১৭.	বাঘবালস্না	Striped Tiger	*Danaus genutia*
১৮.	জংলা বিরহা	Common Bushbrown	*Mycalesis perseus*
১৯.	তুরা	Indian Lime Blue	*Chilades lajus*
২০.	তামট	Plain Tiger	*Danaus chrysippus*
২১.	মেঘা	Grey Count	*Tanaecia lepidealepidea*
২২.	পুরাস	Psyche	*Leptosia nina*
২৩.	জামুই	Great Eggfly	*Hypolimnas bolina*
২৪.	খয়েরি	Chocolate Pansy	*Junonia iphita*
২৫.	ভুষান্দা	Common Baron	*Euthalia aconthea*
২৬.	করহী	Quaker	*Neopithecops zalmora*
২৭.	হিমেলকুচি	Blue Tiger	*Tirumala limniace*
২৮.	পিপলাই	Chestnut Bob	*Iambrix salsala*
২৯.	সাঞ্জলা	Common Evening Brown	*Melanitis leda*
৩০.	কলীম	Common Mormon	*Papilio polytes*
৩১.	আলতে	Common Rose	*Pachliopta aristolochiae*
৩২.	কেশবতী	Common Batwing	*Atrophaneura varuna*
৩৩.	ছিটপায়রা	Mottled Emigrant	*Catopsilia pyranthe*
৩৪.	টুয়া	Blue Pansy	*Junonia orithya*
৩৫.	চরবাতাসি	Common Sailor	*Neptis hylas*

বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ আর প্রাণী সমৃদ্ধ করেছে সিলেট জেলার জীববৈচিত্র্যকে। নানান আকৃতির, বর্ণের আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এসব উদ্ভিদ আর প্রাণীর তালিকা থেকে এ অঞ্চলের পরিবেশ ও প্রতিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব।

অধ্যায়-২

ইতিহাস

প্রাগৈতিহাসিক সিলেট

সিলেট ও সিলেটের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের, বিশেষ করে নব্য প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। শুধু সিলেট নয়, সমগ্র বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলেই নব্য প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১৯৯৬ সালে বৃহত্তর সিলেটের হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের নিকট একটি প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হয়। সেখান থেকে সর্বমোট ৮৩টি প্রত্নবস্তু সংগৃহীত হয়েছে। প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার নব্য প্রস্তরযুগে তৈরি হয়েছিল। প্রত্নস্থলটি ভারতের ত্রিপুরার নিকটবর্তী। ত্রিপুরার নব্য প্রস্তরযুগের প্রত্নস্থল থেকে একটি রেডিওকার্বন তারিখ পাওয়া গেছে। সেগুলোকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব বলে অনুমান করা হয়। সিলেটের নব্য প্রস্তরযুগের সময়ের তাই ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্ব সময়ের মধ্যে হওয়া স্বাভাবিক বলে ধারণা করা যায়।

প্রস্তর সংস্কৃতি অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। প্রস্তরযুগের স্থায়িত্বকাল কয়েক হাজার বছরব্যাপী বিরাজমান থেকে ক্রমে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য প্রস্তর ব্যবহার যে খ্রিস্টের জন্মের হাজার বছর পরও বিরাজমান ছিল, সিলেটের জৈন্তিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন আকারের পাথরের নিদর্শন থেকে তা পাওয়া যায়।

অস্ট্রিকভাষী এ আদি অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর লোকেরাই সিলেটে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। তারা পশুপাখি শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করে এবং হাওর-বাঁওড়, নদী কিংবা খালবিলে সহজলভ্য মাছ ধরে খাদ্যের চাহিদা পূরণ করত। কোনো মৌসুমে অতিরিক্ত মাছ ধরা পড়লে সেগুলো শুকিয়ে খাদ্যসংকটের সময় খাওয়ার জন্য শুঁটকি তৈরির কৌশলও তারা আয়ত্ত করেছিল। সিলেটের নিম্নবিত্তের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা একপ্রকার মাটি পুড়িয়ে 'ছিকর' নামে এক ধরনের খাবার তৈরি করে থাকে এবং গ্রামগঞ্জ ও হাটবাজারে তা বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করে। সিলেট অঞ্চলে গর্ভবতী মহিলারা প্রধানত এ ছিকর খেয়ে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে এটি নোংরা অভ্যাস মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে মাটি খাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ, খনিজ পদার্থ লাভের একটি বিকল্প উপায়। এটা মূলত অস্ট্রিক খাদ্যাভ্যাস।[১] সিলেটের গ্রামাঞ্চলে, হাটে বাজারে ছোটো মাছ, সুপারি ইত্যাদি এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (বিশ বা বিংশ নয়) একপণ অর্থাৎ ৮০ টায় একপণ গণনার রীতি প্রচলিত ছিল। এ কুড়ি শব্দটি এবং গণনারীতি দুই-ই অস্ট্রিক।[২]

---

[১] মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, সিলেটের রাজনৈতিক ইতিহাস, মো. আবদুল আজিজ ও অন্যান্য (সম্পা.) বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, সিলেট-১৯৯৭, পৃ. ৩০।

[২] নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, সংক্ষেপিত সংস্করণ, কলকাতা ১৩৭৩, পৃ. ২৫।

প্রাগৈতিহাসিককালে সিলেটের পার্শ্ববর্তী পূর্বভারতীয় অন্যান্য মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর লোকেরাও সিলেট অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। কোনো কোনো পন্ডিত মনে করেন খাসিয়ারা মূলত আদি-অস্ট্রিক নরগোষ্ঠীর লোক। তাদের মতে, পূর্ববর্তীকালে তাদের মধ্যে মোঙ্গলীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে, ফলে তারা বর্তমান দেহগঠন লাভ করেছে। তাদের বক্তব্যের সমর্থনে তারা কাছাড়ে প্রাপ্ত কিছু পাথরের অস্ত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, একই ধরনের অস্ত্র খাসিয়ারাও তৈরি করত। আবার প্রাগৈতিহাসিক আদি অস্ট্রেলীয়রাও তৈরি করত।[৩]

আদি বাসিন্দা হিসেবে বিভিন্ন সময়ে ইন্দোমঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর (কিরাত) ছোটো-বড়ো দল সিলেটে প্রবেশ করেছে। নরতত্ত্বের মধ্যে এর সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ করা যায়। আদি অস্ট্রেলীয় এবং ইন্দোমঙ্গোলীয় উভয় নরগোষ্ঠীর বাস্তব সভ্যতা ছিল প্রায় একই পর্যায়ের অর্থাৎ তারা ছিল কৃষিজীবী, শিকারবৃত্তি ও খাদ্যসংগ্রহ ছিল তার পরিপূরক।

ক্রমে ক্রমে সমাজ পরিবর্তিত হয়ে সামন্তপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়। কৌম সর্দারগণই নিজ নিজ গোষ্ঠীর সামন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারা পঞ্চায়েত প্রথার মতো কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ পরিচালনা করতেন। এ অঞ্চলের প্রাচীন মানুষ ঠিক কী ধরনের ধর্ম পালন করত, তা আজ আর যথার্থভাবে জানার কোনো উপায় নেই; তবে অনুমান করা যায় বিশেষ গাছ, পাথর খণ্ড, নদী, পাহাড়, দৈত্য, দানব, তন্ত্রমন্ত্র, ওঝার প্রতি তাদের বিশ্বাস ও ভীতি ছিল।

প্রাচীন যুগ

অশোকের শাসনামলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবৈদিক আর্যসংস্কৃতির প্রসার ঘটে। অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তার ও ধর্মনীতি বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমসাময়িক ধ্যানধারণাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে মধ্যপন্থার বাণীপ্রচার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লৌকিক বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে নয়, বরং স্বীকার করে নিয়ে দিন দিন বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হতে থাকে।[৪]

গুপ্তযুগে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রসার ও বৌদ্ধ ধর্মের পতন শুরু হয়। ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ও বসতি স্থাপন, যাগ-যজ্ঞ এবং পৌরাণিক দেবদেবীর প্রচলন শুরু হয়। তাই ধর্ম মহাপাত্র এবং অন্ত মহাপাত্রদের প্রতিনিধি রূপে প্রেরণের পরিবর্তে তারা ভূমিদানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ বসানোর প্রথা গ্রহণ করেন।

সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত রাজ্য ছিল কামরূপ। মহাসেন গুপ্ত নামক জনৈক গুপ্ত নরপতি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর চতুর্থপাদে) লৌহিত্য তীরে কামরূপরাজ সুমিত বর্মাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন বলে লিপি-প্রমাণ রয়েছে।[৫] তাই অনুমান করা যায়, কামরূপরাজগণ গুপ্ত আধিপত্য স্বীকার করতেন অথবা তাদের সামন্ত ছিলেন। কামরূপরাজ ভূতিবর্মার শাসনকাল

---

৩ সুজিৎ চৌধুরী, শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৯৯২, পৃ. ২৫।

৪ মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, হবিগঞ্জের ইতিহাস, সিলেট, ২০০৭, পৃ. ১৬-১৭।

৫ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, সংক্ষেপিত সংস্করণ, কলকাতা ১৩৭৩, পৃ. ২৩২।

মোটামুটিভাবে ৫১৮ থেকে ৫৪২ সাল পর্যন্ত ধরা হয়।[৬] তিনি সিলেটের বিয়ানীবাজার অঞ্চলে শত শত ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন। দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দেওয়া নিষ্কর ভূমির তাম্রলিপি পরবর্তীকালে আগুনে পুড়ে গেলে দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের ভোগদখলকারী বংশধরগণ ভূতিবর্মার প্রপৌত্র ভাস্করবর্মার শরণাপন্ন হন। সপ্তম শতাব্দীতে ভাস্করবর্মার (৫৯০-৬৫০ সাল) শাসনকালে তাম্রলিপিগুলো নবায়ন করে দেওয়া হয়। ১৯১২ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে তাম্রলিপিগুলো সিলেটের বিয়ানীবাজারের নিধনপুরে পাওয়া যায়। বহিরাগত এ ব্রাহ্মণদের চাষাবাদে লোহার ফালযুক্ত উন্নত লাঙল ব্যবহারের ফলে কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

ব্রাহ্মণরা যেহেতু কোনো কায়িক শ্রম করতেন না এবং বাইরে থেকে কৃষিশ্রমিক আনাও সম্ভব ছিল না, তাই তারা স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আত্মীকরণের মাধ্যমে একটি বর্ণসংকর সৃষ্টি করেন। আগন্তুক ব্রাহ্মণরা সমাজে তারা নিজেদের জন্য অতি উচ্চস্থান নির্ধারণ করে, স্থানীয় সকল মানুষকে নিম্ন শূদ্রবর্ণে অবনমিত করেন। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের দ্বিবর্ণ সমাজ সিলেটে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে 'শ্রীহট্টে মধ্যমা নাস্তি' প্রবচনটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে নবাগত শূদ্রদের মধ্যে নিজ দক্ষতা বলে ও সামাজিক প্রয়োজনে কায়িক শ্রম ছাড়া অন্য কিছু বৃত্তিতে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ যারা পেয়েছিল, তারা উত্তম শূদ্র ও মধ্যম শূদ্রের মর্যাদা লাভ করে। শ্রমজীবীরা রয়ে যায় অধম শূদ্রের পর্যায়ে এবং যারা এ সমন্বয়ের বাইরে থেকে যায়, তারা নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে নৃ-গোষ্ঠী রূপে এখনো বিচরণশীল।[৭]

১৯৬৩ সালে সপ্তম শতাব্দীর স্থানীয় শাসক সামন্ত মরু-নাথের ভূমিদানলিপি মৌলভীবাজারের কালাপুর গ্রামে পাওয়া যায়।[৮] দেবতা অনন্ত নারায়ণের উদ্দেশ্যে সুববঙ্গা বিষয়ে অটবীক্ষেত্র ও স্থলী ক্ষেত্রে এ ভূমি দান করা হয়। প্রতিষ্ঠিত মঠের বলি-চরু সত্রের জন্য এক পাটক দই দ্রোন জমি কুমারামাত্যাধিকরণ থেকে ভূমিদানলিপি প্রদান করা হয়। অবশ্য সামন্ত মরু নাথের ভূমিদানলিপি পাওয়ার অনেক আগেই সপ্তম শতাব্দীর শাসক লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রলিপি পাওয়া গিয়েছিল।[৯] সে তাম্রলিপিতেও একই দেবতার নামে মন্দির স্থাপন ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য সুববঙ্গা বিষয়ে বিশাল ভূখন্ড প্রদান করার কথা আছে। লোকনাথের মহাসামন্ত প্রদোষ শর্মনের অনুরোধে তিনি গভীর অরণ্যের মধ্যে দুই শতাধিক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন। এ লিপি-সায থেকে লোকনাথের মহাসামন্ত প্রদোষ শর্মনের বংশপরিচয়ও জানা যায়। তার নাম থেকে বোঝা যায় তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। এ

---

[৬] Epigraphica Indica-XII, পৃ. ৬৫-৭৯।

[৭] সুজিৎ চৌধুরী, শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস, প্রথম খন্ড, কলকাতা ১৯৯২, পৃ. ৬৮-৬৯।

[৮] Kamala Kanto Gupta- Copper Plates of Sylhet-Sylhet-1967, পৃ. ৬৪-৮০।

[৯] Epigraphica indica-XV, পৃ. ৩০১-৩১৫।

থেকে এটাও বোঝা যায়, ব্রাহ্মণরা সেসময় শুধু দেবালয়ের পূজা-অর্চনা ও পৌরহিত্য নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তারা শাসনক্ষমতার অংশীদার হয়েছেন এবং প্রশাসনের উচ্চপদেও অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে রচিত আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল তিনটি স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোষকার হেমচন্দ্র তার অভিধান চিন্তামণি (১২ শতক) রচনায় বঙ্গও হরিকেল জনপদ এক ও সমার্থক বলে উল্লেখ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত রুদ্রাক্ষ মাহান্ত্য এবং রূপচিন্তামোনিকোষ (৫ শতক) নামক দুটি পাণ্ডুলিপিতে শ্রীহট্ট এবং হরিকোল নামক জনপদ দুটিকে এক এবং সমার্থক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপিতে তার পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে আগে হরিকেল এবং পরে চন্দ্রদ্বীপের (বরিশাল) রাজা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১০] সে সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে বলা যায় ষষ্ট শতাব্দীর কামরূপ অন্তর্গত সিলেট সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণাঞ্চলে ত্রিপুরা রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলেও অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গ ও সমতটের সংলগ্ন কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, হরিকেল মূলত শ্রীহট্টের নাম এবং শ্রীহট্টরাজ্যের বঙ্গো বিস্তৃতির ফলে পরবর্তীকালে সেটি বঙ্গোরও নামরূপে ব্যবহার হতো।[১১] ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কেশবের কল্পদ্রুকোশ গ্রন্থে বলা হয়েছে হরিকেলের নামান্তর শ্রীহট্ট বা শ্রীহট।

ত্রৈলোক্যচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে তার পুত্র মহারাজা শ্রীচন্দ্র (৯৩০-৯৭৫) আরও সম্প্রসারিত করেছিলেন, তার পশ্চিম ভাগ তাম্রলিপিতে যমন (সম্ভবত 'যবন'), হুন, উৎকলদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে।[১২] ১৯৬৮ সালে শ্রীচন্দ্রের পশ্চিম ভাগ তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। এতে চন্দ্রপুর, গরলা ও পোগার নামে পরস্পরসংলগ্ন তিনটি বিষয় (জেলা) সাধারণভাবে চন্দ্রপুর নামে পরিচিত এক বিরাট এলাকা ধর্মশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মঠ-মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য নিষ্কর দান করা হয়। শ্রীচন্দ্রের পঞ্চম রাজ্যবর্ষে রাজধানী বিক্রমপুর থেকে জারিকৃত এ লিপিতে তৎকালীন সিলেটের তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তথ্য পাওয়া যায়।[১৩] দানকৃত ভূমি বর্তমান সিলেটের কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণে প্রায় সমগ্র মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের পূর্বাঞ্চল ও সদর সিলেটের অংশবিশেষ নিয়ে হাজার বর্গমাইলব্যাপী বিস্তৃত ছিল।[১৪] দানকৃত ভূমি

[১০] নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, সংক্ষেপিত সংস্করণ, কলকাতা ১৩৭৩, পৃ. ৬৩।

[১১] দীনেশচন্দ্র সরকার, পালসেন যুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা ১৯৮২, পৃ. ১০৬।

[১২] Kamala Kanto Gupta- Copper Plates of Sylhet-Sylhet-1967, পৃ. ৮১-১৫২।

[১৩] আব্দুল মমিন চৌধুরী শ্রী চন্দের পশ্চিম ভাগ তাম্রশাসনে দশম শতাব্দীর সিলেট, সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০।

[১৪] Kamala Kanto Gupta- Copper Plates of Sylhet-Sylhet-1967, পৃ. ৩৩-৩৭।

তিনটি বৃহৎ খণ্ডে ভাগ করা হয়। প্রথমটির আয়তন ছিল ১২০ পাটক, যা দেবতা ব্রহ্মাও তাঁর মঠের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ডটির আয়তন ছিল ২৮০ পাটক, একই দেবতার দুটি করে ৪ জন দেবতার ৮টি মঠের জন্য এ ভূমি দেওয়া হয়। অবশিষ্ট সকল ভূমি ৬ হাজার ব্রাহ্মণকে সমান ভাগে দান করা হয়েছিল।

বিপুলসংখ্যক বহিরাগতের আগমন এবং বিশাল এলাকা ব্রাহ্মণদের দান করে তাদের স্থানীয় বিচার এবং প্রশাসনের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গণক, চিকিৎসক, মালাকার, তৈলক কুম্ভকার, শঙ্খবাদক, কর্মকার, চর্মকার, নট, সূত্রধর, নাপিত, স্থপতি, ভৃত্য, পরিচালিকা অথবা দেবদাসী ইত্যাদির নাম উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে দশম শতাব্দীতে সিলেটে একটি পরিপূর্ণ হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ভূমিদানপত্রের একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, একই উপাস্য দেবতা হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গাল এবং দেশান্তরীয় নামে ব্রাহ্মণরা দুই ভিন্ন বা পৃথক গোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন এবং ধর্মবিশ্বাস এক হলেও একই দেবতার দুইটি করে ৪×২=৮টি মঠ তৈরি করা হয়েছিল। তাই যুক্তিসংগতভাবে বলা যায়, এ পৃথক মঠ তৈরি এবং বঙ্গাল ও দেশান্তরীয় দুই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও কোনো না কোনোভাবে দূরত্ব, অসহিষ্ণুতা বা বৈরিতা বিরাজমান ছিল।

এ সময়ের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের মতো ভৌগোলিক দেশ বা আঞ্চলিক শক্তি এবং উপাদানগুলোর উদ্ভব ও গুরুত্ব বৃদ্ধি। ষষ্ঠ শতাব্দীর কামরূপ রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সিলেট দশম শতাব্দীতে বঙ্গালদেশের অংশ হিসেবে স্থানীয় মানুষ, বঙ্গালদেশীয় রূপে পরিচিত হয়েছেন। কামরূপ ও ত্রিপুরার আধিপত্যমুক্ত হয়ে সিলেট বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পশ্চিম ভাগ তাম্রলিপিতে সর্ব প্রথম ‘শ্রীহট্ট’ নাম এবংএকটি স্বতন্ত্র মন্ডল হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট মণ্ডলকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে শ্রীহট্টরাজ্য গড়ে ওঠে।

১৮৭২ সালে ভাটেরায় প্রাপ্ত সিলেট রাজ্যের রাজাদের দুটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। প্রথম লিপি অনুযায়ী রিপুরাজ গোপী গোবিন্দ উপাধি গ্রহণকারী কেশবদেব (১২২০-১২৩০) ৩৭৫ হাল ভূমি এবং নানা পরিজনসমেত ২৯৬টি বাড়ি দান করেন। তিনি খ্যাতিমান যোদ্ধা ছিলেন এবং ‘তুলাপুরুষ যজ্ঞ’ করেছিলেন। তার শ্রবণাভিরাম গুণাবলিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু বিদেশি ব্রাহ্মণ সিলেটে এসেছিলেন। লিপি প্রমাণে বোঝা যায়, তখনো সিলেটে বিদেশি ব্রাহ্মণ আগমনের স্রোত অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয় তাম্রলিপিটি তার পুত্র ঈষাণ দেবের, তিনিও কিছু ভূমিদান করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র সরকার প্রত্নলিপিবিদ্যানুসারে এটিকে ১৩ শতাব্দীর মধ্যভাগের হতে পারে বলে মতো প্রকাশ করেছেন।[১৫]

[১৫] দীনেশচন্দ্র সরকার, পালসেন যুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা ১৯৮২, পৃ. ১৪৪-১৪৬।

সিলেটে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

অনেক পূর্ব হতেই সিলেটে আরব বণিকগণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সিলেটে আসতেন এবং অনেকে সিলেটে বসতি স্থাপন করে ব্যবসা ও ধর্মপ্রচার করতেন। শেখ বোরহান উদ্দীন নামক এমনি একজন মুসলমান সিলেট শহরে বসবাস করতেন। এ সময় সিলেটের রাজা ছিলেন গৌড়গোবিন্দ। কথিত আছে- শেখ বোরহান উদ্দীন তার পুত্রের আকিকা উপলক্ষে গোরু জবাই করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজা গৌড়গোবিন্দের প্রাসাদের আঙিনায় (মতান্তরে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে) একটি চিল গোরুর এক টুকরা গোশত এনে ফেলে দেয়। এতে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে বোরহান উদ্দীনকে ধরে আনেন, তার দক্ষিণ হস্ত কেটে দেন এবং নবজাত সন্তানকে হত্যা করেন। বোরহান উদ্দীন তৎকালীন বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের নিকট এ অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য অভিযোগ করেন। সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২) সেনাপতি সেকান্দর গাজীকে গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সেকান্দর গাজী গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে পর পর দু'বার অভিযান চালিয়েও সিলেট অধিকার করতে ব্যর্থ হন। সুলতান পরবর্তী সময়ে সৈয়দ নাসির উদ্দীনকে সিপাহসালার নিয়োগ করে সেকান্দর গাজীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এ সময় সুফী সাধক হজরত শাহজালাল (র.) তার সঙ্গীয় আউলিয়াগণসহ সোনারগাঁও অবস্থান করছিলেন।

হজরত শাহজালাল (র.)

হজরত শাহজালাল (র.) তুরস্কের কুনিয়ায় (মতান্তরে ইয়েমেনে) জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহারা হয়ে তিনি তাঁর মামা আহমদ কবীরের তত্ত্বাবধানে 'ইলমে মারেফাতে' দীক্ষিত হন। তিনি তাঁর মামা আহমদ কবীর কর্তৃক পূর্বদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হন। কথিত আছে, পূর্বদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর মামা আহমদ কবীর এক মুঠো মাটি দিয়ে তাঁকে বলেন যে, স্বাদে বর্ণে গন্ধে এ মাটির তুল্য মাটি যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করবে। হজরত শাহজালাল (র.) ইয়েমেন হতে মাত্র ১২ জন আউলিয়া নিয়ে রওনা হয়েছিলেন বলে জানা যায়। পথিমধ্যে তার চরিত্র মাধুর্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে অনেকেই তার শিষ্য ও সহযাত্রী হন। সিলেটে আসার প্রাক্কালে ৩৬০ জন (মতান্তরে ৩১৩ জন) আউলিয়া তাঁর সঙ্গী ছিলেন।

সিলেট বিজয়

হজরত শাহজালাল (র.) তাঁর শিষ্যগণসহ যখন সোনারগাঁয়ে অবস্থান করছিলেন তখন সেকান্দর গাজী ও নাসির উদ্দীন সিপাহসালার তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর কাছে গৌড়গোবিন্দের ঘটনা বর্ণনা করে তাঁর দোয়া ও সাহায্য কামনা করেন। হজরত শাহজালাল (র.) দোয়া করেন এবং ৩৬০ (মতান্তরে ৩১৩) জন শিষ্যসহ গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযানে শরিক হন। হজরত শাহজালাল (র.) এর আধ্যাত্মিক শক্তিবলে ১৩০৩ সালে মুসলিম বাহিনী অনেকটা বিনা যুদ্ধেই সিলেট জয় করেন। গৌড়গোবিন্দ ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পেঁচাগড় জঙ্গলে পলায়ন করেন। হজরত শাহজালাল (র.) সিলেটের মাটির সাথে তাঁর মামার দেওয়া

মাটির সাদৃশ্য দেখে তিনি সিলেটে খানকা প্রতিষ্ঠা করে আধ্যাত্মিক সাধনায় রত হন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (৯১৮ হিজরি) উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় 'সুলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ৭০৩ হিজরিতে (১৩০৩-০৪) সিকান্দার খাঁ গাজির হাতে শ্রীহট্ট শহরে প্রথম ইসলামের বিজয় সাধিত হয়।[১৬] লিপিটি বর্তমানে ঢাকা জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে। ফিরোজ শাহের মৃত্যুর (১৩২২) পর তার পুত্রদের মধ্যে বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে দিল্লির সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক বাংলাদেশ জয় করেন। সে সঙ্গে সিলেটও দিল্লির অধীন হয়। অবশ্য বেশিদিন সে অবস্থা বজায় ছিল না। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ফখর উদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯) সোনাগাঁওয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেসময় বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা দিল্লি থেকে দক্ষিণ ভারত হয়ে সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে আসেন। তিনি সিলেটে হজরত শাহজালাল (র.) এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তিনি সিলেটে এসে হজরত শাহজালাল (র.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কয়েকদিন সিলেটে অবস্থান করেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে সমসাময়িক সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এদেশে দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য ও কম মূল্য দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। তিনি মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। স্থানীয় মানুষজন অবশ্য তাকে দ্রব্যমূল্য অনেক বেশি বলে জানিয়েছিল। এতে বোঝা যায় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা অনেক কম ছিল।

তিনি উল্লেখ করেছেন এ অঞ্চলের মানুষ হজরত শাহজালাল (র.)-এর নিকট ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে। দ্বিবর্ণ হিন্দু সমাজে বৌদ্ধরাই হয়ত প্রথমে ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কারণ বৌদ্ধরা সহজেই মুসলমান সুফি-দরবেশদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিধিনিষেধ আর ছোঁয়াছুঁয়ির বাধা এড়িয়ে হিন্দুদের পক্ষে মুসলমানদের নিকট আসা সহজ ছিল না। যে নবাগত ধর্মমত সামাজিক অসাম্যের দূরীকরণ ও অন্যায় শোষণ এবং অবিচারের প্রতিকারে সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে ধর্মমত ক্রমেই বৌদ্ধ হিন্দুসহ আপামর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেছিল এবং সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তা ছিল সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ধর্মান্তর।

পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩)-এর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করা হয়। শ্রীচেতন্য নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করলেও তার পৈতৃক বাড়ি ছিল সিলেটে। হবিগঞ্জের বাঘাসুরা গ্রামের জগন্মোহন গোঁসাই (১৫২৮-১৫৫৯) অনুরূপভাবে ব্রহ্মবাদের প্রবর্তন করেন, ফলে সে অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এমনকি সিলেটের মুসলিম লেখক কবিগণও হিন্দুধর্মশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সৈয়দ সুলতান তার রচনায়

[১৬] Abdul Karim, Corpus of the Arabic and Persian Inscription Bangal, Dhaka-1992, পৃ. ২৯৬।

হিন্দুধর্মের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শৈব মতবাদ ও মিস্ট্রিক-তান্ত্রিকবাদের ভাবাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নবিবংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দুদেবতাদের নবিবংশের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭]

সিলেট বাংলার উত্তরপূর্ব সীমান্তে অবস্থানের কারণে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হয়েছিল। সুযোগ পেলেই পার্শ্ববর্তী অহোম ও ত্রিপুরার শাসকগণ সে অঞ্চলে হানা দিতেন। কোচ নরপতি নরনারায়ণের ভাই সেনাপতি চিলারায় ১৫৬৩ সালে সিলেট এবং ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্য ও যুবরাজ ধনমাণিক্য ১৫৮৫ সালে প্রথমে তরফ এবং পরে দক্ষিণ সিলেটে অভিযান পরিচালনা করেন। সুলতানি আমলে সিলেট থেকে প্রচুর হাতি সরবরাহ করা হতো। বাংলার সুলতানদের সেনাবাহিনীতে হস্তিবাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

মোগল আমলে সিলেট

১৫৩৯ সাল সিলেটসহ সমগ্র বাংলা শেরশাহের অধিকারে চলে আসে। আফগান সুর বংশের পতন ঘটিয়ে ১৫৬৪ সালে কররানী আফগানরা বাংলায় ক্ষমতা দখল করে। সে সময় সিলেটসহ সমগ্র ভাটি অঞ্চলে বারোভুঁইয়াদের উদ্ভব হয়। তারা নিজেদের এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। গৌড়ের সুলতান ও তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না। দিল্লিতে আফগান শাসন পতনের পরবর্তীকালে সিলেটে অনেক পাঠান সর্দার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাই সিলেট অঞ্চল হয়ে ওঠে তাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্রস্থল।[১৮]

সিলেটে তখন ব্যাপকভাবে আফগানরা বসতি স্থাপন করেছিল। আফগান ও বারোভুঁইয়ারা পরস্পরের সহযোগিতায় মোগল সম্রাটের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। স্বাধীনতার জন্য তাদের এ সংগ্রাম প্রায় দীর্ঘ ৪০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। সিলেট অঞ্চলের বারোভুঁইয়াদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন (১) উসমান খান লোহানী (মৌলভীবাজার), (২) আনোয়ার খান (বানিয়াচং), (৩) বায়াজিদ কররানী (সিলেট সদর), (৪) ফতেহ খান (দক্ষিণ সিলেট), (৫) মাতাঞ্জোর পালোয়ান (তরফ)।[১৯] মোগল সুবাদার ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩) ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করে অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে বারোভুঁইয়াদের বিরুদ্ধে রণনীতি গ্রহণ করেন। তিনি বারোভুঁইয়াদের মূল শক্তির উৎস নৌবাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য মোগল নৌবাহিনীকে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। তিনি পূর্ণপ্রস্তুতি গ্রহণ করে বারোভুঁইয়াদের নেতা ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের পর পরাজিত মুসা খাঁ মোগল সুবাদার ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

মুসা খাঁর মতোই শক্তিশালী শাসক ছিলেন সিলেটের বানিয়াচং অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিদার আনোয়ার খান। বাহারিস্তান-ই-গায়েবী-এর লেখক মোগল

---

[১৭] আজিজুর রহমান মল্লিক, বৃটিশ রাজনীতি ও বাংলার মুসলমান ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৪৫।

[১৮] রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৩২।

[১৯] ড. আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২৫১।

সেনানায়ক মির্জা নাথান লিখেছেন, তিনি বারোভুঁইয়াদের নেতা মুসা খাঁর চেয়ে কোনো অংশে কম শক্তিমান ছিলেন না। মোগলদের নিকট বন্দি মুসা খাঁকে মুক্ত করার জন্য আনোয়ার খান এক দুঃসাহসী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু তার পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল না হওয়ায় মাত্র দুজন মোগল সেনাপতিকে তিনি বন্দি করতে সক্ষম হন এবং তাদের নিয়ে নিজ এলাকা বানিয়াচং-এ চলে আসেন। আনোয়ার খানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করা হয়। আনোয়ার খান বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে একাধিক মোগল আক্রমণ প্রতিহত করেন। মুবারিজ খানের নেতৃত্বে বিশাল মোগলবাহিনী বানিয়াচং আসার পর আনোয়ার খান উসমান মোগলদের কাছে খান লোহানীর পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন এবং মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করেন। আনোয়ার খানকে মোগলরা অন্ধ করে দিয়ে রোটাশ দুর্গে বন্দি করে রাখে।

আনোয়ার খানের ভাই হোসেন খান ঢাকায় মোগল কারাগারে বন্দি ছিলেন। তিনি সুকৌশলে কারারক্ষীদের ধুতুরামিশ্রিত খাবার খাইয়ে অজ্ঞান করে কারাগার থেকে গভীর রাত্রে পালিয়ে আসেন। তার লোকজন আগে থেকেই চাঁদনীঘাটে দ্রুতগামী নৌকা নিয়ে প্রস্তুত ছিল। সে নৌকায় তিনি নিজ এলাকা বানিয়াচংয়ে ফিরে আসেন। তিনি তার নিজ স্ত্রী, কন্যা ও ভাইয়ের স্ত্রী, কন্যাসহ পরিবারের সকল মহিলাকে হত্যা করে সমাহিত করেন। কারণ মোগলদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব হবে না মনে করে শত্রুর হাতে নিগৃহীত হওয়ার চেয়ে পরিবারের মহিলাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য এ হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত করেন। এ থেকে বোঝা যায় রাজপুতদের জওহরপ্রথার মতো প্রথা তখন সে অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। তারপর তিনি তার সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর অস্ত্রসজ্জিত করেন এবং গোলন্দাজ বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখেন।

ইতোমধ্যে মোগল বাহিনী বানিয়াচং এসে পৌঁছে। কৌশলী যোদ্ধা হোসেন খান মোগলবাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য কয়েকটি ছোটো নৌকা প্রেরণ করেন। তিনি তাদের যুদ্ধ করতে করতে ক্রমশ পিছু হটে আসার নিদের্শ দিয়ে একটি খালে ঢোকার নির্দেশ দেন। হোসেন খান তার মূল সেনাবাহিনীকে খালটির দুই তীরে মোতায়েন করে মোগলবাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। তিনি নৌবাহিনীর কুড়িটি কোষা নৌকাসহ গোলন্দাজ বাহিনীকেও প্রস্তুত রাখেন। হোসেন খান প্রেরিত নৌকাগুলো যুদ্ধের ভান করে তার পিছু হটে আসতে থাকে। মোগল বাহিনী তাদের অনুসরণ করে অপেক্ষারত খালের মধ্যে হোসেন খানের আওতায় আসামাত্র তিনি তার বাহিনী নিয়ে সিংহের মতো মোগল বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ অতর্কিত আক্রমণে মোগল সেনাপতি দিশাহারা হয়ে কোনোমতে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। সম্পূর্ণ মোগল বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রসহ হোসেন খানের হাতে বন্দি হয়। হোসেন খান স্বাধীন শাসক রূপে বানিয়াচংয়ে প্রস্তুত হতে থাকেন।

সিলেটের হবিগঞ্জ অঞ্চলে বারোভুঁইয়াদের আরও এক বীরযোদ্ধা ছিলেন মাতাঙ্গোর শাসক পাহলোয়ান। মাতাঙ্গোর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন, তবে বাহারী স্থান-ই-গায়বীর বিবরণ থেকে প্রতীয়মান স্থানটি তরফের নিকটে কোথাও ছিল। সুতাঙ্গের নাম বিকৃত হয়ে মাতাঙ্গা বলে উল্লেখ হয়ে থাকতে পারে। এক শক্তিশালী মোগল বাহিনী পাহলোয়ানের রাজ্য ও তরফ দুর্গের মধ্যস্থলে এসে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে লুণ্ঠন আরম্ভ করে। সে সময় তরফ দুর্গে অবস্থানকারী ওসমানের ভাই মালহী ও পুত্র মুমরিজের নিকট মোগলদের দুষ্কর্মের সংবাদ পৌঁছলে সকল আফগান যোদ্ধা ও অনুগামীরা তরফ দূর্গে এক ক্ষুদ্র সৈন্যদল রেখে মোগলদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। পরদিন ভোরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পাহলোয়ানের বর্শাঘাতে মোগল সেনাপতি নিহত হলে মোগলরা বিপর্যয়ের সম্মু খীন হয়। মোগল বাহিনীর একটি তীর এসে পাহলোয়ানের বুকে বিদ্ধ হলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন। সংখ্যাধিক্যের কারণে মোগলরা অবশেষে যুদ্ধে জয়লাভ করে।

বানিয়াচংয়ে হোসেন খান স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। তাকে দমন করার জন্য ইসলাম খান দুইশ রণতরীসহ এক বিশাল মোগল বাহিনী প্রেরণ করেন। এ মোগল বাহিনীকে জানিয়ে দেওয়া হয় হোসেন খানের বিরুদ্ধে তাদের জয়লাভ করতে হবে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রেই তাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে। উভয়পক্ষে মরণপণ যুদ্ধ আরম্ভ হলে দুপুরে মোগল সেনাপতি নিহত হন। তবে অসম শক্তির এ লড়াইয়ের একপর্যায়ে হোসেন খান বন্দি হন। তাকে ইসলাম খানের নিকট প্রেরণ করা হলে তাকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়।[২০] হোসেন খানের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধের সময় সম্ভবত একটি ছোটো কামান বানিয়াচংয়ের নিরাপত্তা খালে পড়ে গিয়েছিল অথবা কামানসমেত নৌকাটি খালের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে পুরাতন কামানটি বানিয়াচং থানার সামনে রক্ষিত ছিল। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১৯৩৬ সালে কামানটির বিবরণ জার্নাল অব আসাম রিসার্চ সোসাইটিতে প্রথম প্রকাশ করেন। বর্তমানে কামানটি সিলেট পুলিশ লাইনে শহীদ মিনারের পাদদেশে রক্ষিত আছে। সিলেটের পুলিশ সুপার সহিদ উল্লা কামানটি বানিয়াচং থানা থেকে সিলেট পুলিশ লাইনে নিয়ে এসেছিলেন।[২১]

মোগল-পাঠানের শেষ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে উসমানকে মোগল-আধিপত্য মেনে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে পত্রসহ একজন দূত প্রেরণ করা হয়। বিনিময়ে উসমানকে ভাতার পরিবর্তে পাঁচহাজারি মনসবদারের সম্মানজনক মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।[২২] উসমান ঘৃণার সঙ্গে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ১৬১২ সালের ১২ মার্চ তার মূল ঘাঁটি মৌলভীবাজারের উহর থেকে

---

[২০] মির্জা নাথান, বাহারীস্থান-ই গায়বী, খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৯৫-১২১।

[২১] মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, হবিগঞ্জের ইতিহাস, সিলেট, ২০০৭, পৃ. ৩৫-৩৭।

[২২] গোলাম হোসায়েন সলীম, রিয়াজ-উস-সালাতিন, আকবর উদ্দিন অনূদিত ঢাকা, ১৯৭৪

অগ্রসর হয়ে দেড় ক্রোশ দূরে দৌলম্বাপুরে একটি জলাভূমিকে সামনে রেখে সুপারিবাগানে শিবির স্থাপন করেন। সুজাত খাঁ মোগল বাহিনী নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হয়ে ওসমানের অবস্থান থেকে আধক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করেন। দুই বাহিনীর মধ্যস্থলে শুষ্ক মৌসুমে জলাভূমিতে সামান্য পানি ছিল। সকালে দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। দুর্ধর্ষ আফগান বীর উসমানের অসম সাহসিকতা ও চমৎকার রণকৌশলে মোগল বাহিনীর পুরোভাগের সেনাপতি সৈয়দ আদমবারহা, শেখ আচ্চা, বামপাশের সেনাপতি ইফতিখার খান, ডানপাশের সেনাপতি কিশওয়ার খানসহ বিপুলসংখ্যক মোগলসৈন্য হতাহত হয়। উসমান বিধ্বস্তপ্রায় মোগল বাহিনীর সম্মু খভাগে প্রচ আক্রমণ চালিয়ে বার বার আঘাত হানতে থাকেন।[২৩] রিয়াজ উস-সালাতীন-এর লেখক উল্লেখ করেছেন, অনেক যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ মোগল সেনাবাহিনীর এসব খ্যাতনামা বীর সেনাপতি শোচনীয়ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হওয়ায় মোগল সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক ও ত্রাসের সঞ্চার হয়। অমিতবিক্রম উসমানের কাছে সুজাত খান তার বিশাল বাহিনীর ডান ও বাম উভয় অংশের সেনাপতিদের হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। মুতাকিদ খাঁ ও ইতিমাম খাঁ ছাড়া আর কোনো নামকরা মোগল সেনাপতি সুজাত খাঁর পাশে জীবিত ছিলেন না।[২৪]

সে সময় মোগল বাহিনীর একটি তীর এসে উসমানের চোখে বিদ্ধ হলে প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে মধ্যরাতে উসমান মুত্যুবরণ করেন। উসমানের পুত্র মুমরিজ যুদ্ধ-পরিচালনা অব্যাহত রাখেন।

কিন্তু উজিরের ষড়যন্ত্রে আফগানদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। নেতার মৃত্যুতে অন্য আফগান সর্দারগণও হতোদ্যম হয়ে পড়েন। অবশেষে তারা সুজাত খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

ইতোমধ্যে সিলেটে বায়াজিদ কররানীর বিরূদ্ধে শেখ কামালের নেতৃত্বে সুবাদার ইসলাম খান মোগল সেনাবাহিনী প্রেরণ করে ছিলেন। তারা পথে পথে লুটতরাজ চালিয়ে এসে সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরে কদমতলীতে শিবির স্থাপন করে। বায়াজিদ কররানীর ভাই ইয়াকুব কররানী সুরমা নদীকে প্রতিরক্ষা হিসেবে ব্যবহার করে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সপ্তাহখানেক যুদ্ধের পর মোগলরা নদী অতিক্রম করে ইয়াকুবের দুর্গ অধিকার করে। বায়াজিদের সাহায্যে কাছাড়ের রাজা প্রেরিত সৈন্যবাহিনী সিলেট আসার পর আফগানরা নবোদ্যমে মোগলদের ওপর পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করে। মোগলরা পিছু হটে নদীর দক্ষিণতীরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। মোগলদের এ বিপর্যয়ের সময় নতুন মোগলবাহিনী এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। মোগলদের সঙ্গে উসমানের যুদ্ধে জয়পরাজয়ের পরস্পরবিরোধী সংবাদ আসে সিলেটে। অবশেষে উসমানের পরাজয়ের সংবাদ

---

[২৩] ওই, পৃ. ১৪০।

[২৪] মির্জা নাথান, বাহারীস্থান-ই গায়বী, খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৫৭।

নিশ্চিত হয়ে আফগান সর্দারগণ মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সিলেটে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুবরিজ খানকে প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[২৫]

প্রাচীন কাল থেকেই সিলেটে ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে সুলভ মূল্যে দাসদাসী কেনা-বেচার প্রমাণ পাওয়া যায়। দাসত্বের বড়ো একটি কারণ ছিল দারিদ্র্য। অভাবগ্রস্ত পিতামাতা তাদের সন্তানদের বিক্রয় করে দিত। আত্মবিক্রয়ও প্রচলিত ছিল, দেনার দায়ে নিজেই নিজেকে বিক্রয় করে দায়মুক্ত হয়ে দাসত্ববরণ করতো মানুষ।

শুধু ক্রীতদাস নয়, সিলেট অঞ্চল ছিল খোজা সরবরাহের এক প্রশস্ত ক্ষেত্র। খোজাব্যবসায়ীরা দরিদ্র পিতামাতা এবং শিশু অপহরণকারীদের নিকট থেকে ছোটো বালকদের কিনে নিয়ে তাদের খোজায় পরিণত করে ধনী বিত্তশালী ব্যক্তিদের নিকট বিক্রয় করত। তারা স্ত্রী পরিজন ও গৃহের দ্বাররক্ষী হিসেবে খোজাদের কাজে নিয়োগ করতো। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর এ নিষ্ঠু র প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে খোজা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ জারি করেন। এখনো সিলেট অঞ্চলে ‘খোজকর’-এর নাম বলে ভয় দেখিয়ে অবাধ্য ছেলেদের শান্ত করা হয়।[২৬]

ব্রিটিশ আমলে সিলেট

১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পর ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি ক্ষমতা লাভ করে। সে সঙ্গে সিলেটের উপরেও তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসকেরা মোগল আমলের সরকার, পরগনা ও জেলার ভিন্ন ভিন্ন সত্তা ভেঙে দিয়ে ১৭৭২ সালে আঞ্চলিক প্রশাসনকেন্দ্র হিসেবে জেলাকে (District) সমন্বিত করে গড়ে তোলে। ১৭৮৭ সালে জেলা কালেক্টরদের বিচার, পুলিশ, রাজস্বসহ সকল ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল কম খরচে প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করা।[২৭] ১৭৯০ সালে কর্নওয়ালিশের সময় কোম্পানিসৃষ্ট আধুনিক অর্থে জেলার পুনর্গঠন করে ঔপনিবেশিক আঞ্চলিক শাসনকাঠামো গঠিত হয়। অসীম ক্ষমতা নিয়ে সিলেটে আগত ইউরোপীয় এ সকল উন্নাসিক কর্মকর্তা ব্যক্তিগত ব্যবসা আর অর্থের সন্ধানে সময় ব্যয় করতেন। সিলেটের প্রথম কালেক্টর উইলিয়াম থ্যাকারে (১৭৭২-১৭৭৫) দুর্নীতির জন্য পদচ্যুত হন। তিনি চুন এবং হাতির ব্যবসা করতেন এবং বেনামিতে রাজস্ব সংগ্রহের ইজারা নিয়েছিলেন। তিনি কম দামে লবণ ক্রয় করে বেশি দামে লবণ বিক্রয় করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে ছিলেন। দেশে যাওয়ার সময় তিনি বিপুল অর্থবিত্তের মালিক ছিলেন। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলাও হয়েছিল।

---

[২৫] মির্জা নাথান, বাহারীস্থান-ই গায়বী, খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৫৯-১৬২।

[২৬] মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, হবিগঞ্জের ইতিহাস, সিলেট, ২০০৭, পৃ. ৫২-৫৩।

[২৭] সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৭৭।

কলকাতা থেকে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন সুদূর সিলেটের কর্মস্থলে কর্তব্য পালনে ছিল নিস্পৃহ ও অলস। দেশীয় কোর্ট আমলাদের ওপর তারা অন্ধভাবে নির্ভরশীল ছিল। রবার্ট লিন্ডসে (১৭৭৮-১৭৮৭) কালেক্টর থাকাকালীন গৌরহরি সিংহ এবং প্রেমনারায়ণ বসুর ওপর সরকারি সকল কাজের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। ১৮৩৫ সালে অফিস-আদালতে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত আমলারাই সকল ফাইলপত্র প্রস্তুত করত এবং তাদের পরামর্শেই রায় দেওয়া হতো। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে দেশীয় আমলারা ঘুষ, নজরানা প্রভৃতি নিয়ে বিচারকের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করত। এসময় সিলেটের ভূমিসংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। কোর্ট কাচারিকে কেন্দ্র করে বিকৃত ও বিকারগ্রস্ত লোকেরা সমাজে এক বিশেষ শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরা নৈতিকতাকে ধ্বংস করে এবং মামলা মোকদ্দমা, মিথ্যাবাদিতা ও শঠতাই হয়ে দাঁড়ায় তাদের প্রধান পেশা।[২৮]

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সিলেটে কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ছিল ভিন্নতর। এখানে নানভাবে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়। বড়ো জমিদারগণ প্রথমে কোম্পানির শাসন মানতে রাজি ছিলেন না। তারা কখনো প্রবল অসহযোগিতা এবং কখনো তাদের আঞ্চলিক প্রভাব প্রয়োগ করে ইংরেজ শাসন অচল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

বানিয়াচংয়ে জমিদার কোম্পানির চুন রফতানিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। কোম্পানি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর চুন রফতানি স্বাভাবিক হয়। জৈন্তিয়ার রাজা ছত্রসিংহ (১৭৭০-১৭৭৪) সুরমা নদীতে কোম্পানির মালামাল পরিবহণে বাধা প্রদান করেন এবং কোম্পানির কর্মচারীদের নির্যাতন করে তার লোকজন মালপত্র লুণ্ঠন করে নেয়। ১৭৭৩ সালে উভয়পক্ষের এক সংঘর্ষে রাজার সৈন্যরা পরাজিত হয়। রাজা ১৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে কোম্পানির সঙ্গে আপস করেন। ১৭৭৯ সালে বালিশিরার জমিদার তার জমিদারির নিলামদারকে দখল দিতে অস্বীকার করেন। কোম্পানি সৈন্য নিলামদারকে দখল দেওয়ার জন্য বালিশিরা গেলে উত্তেজিত জমিদার তাদের আক্রমণ করে হতাহত করেন এবং কোম্পানির রাজস্ব পরিবহণকারী নৌকা লুণ্ঠন করেন। পরে অবশ্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

১৮৮২ সালে মহরমের সময় সৈয়দবংশীয় এক ধর্মীয় নেতার সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষে ধর্মীয় নেতাসহ অনেক লোক হতাহত হয়। ১৭৮৬ সালে প্রতাপগড়ের রাধারাম ইংরেজদের রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে কোম্পানির কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। তার বিরুদ্ধে কোম্পানির একাধিক অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর গোপনে এক অতর্কিত আক্রমণে তাকে পরাজিত করে বন্দি করা হয়। তিনি বন্দি অবস্থায় আত্মহত্যা করেন। অনুরূপভাবে গঙ্গাসিংহের বিদ্রোহ দমন করা হয়।

---

[২৮] সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৬৮-১৮৮।

ধৃত হয়ে তিনিও বন্দি অবস্থায় আত্মহত্যা করেন। ১৭৯৯ সালে আগা মোহাম্মদ রেজা নামে এক মোগল সর্দার প্রায় সাত হাজার সৈন্য নিয়ে কাছাড়ে নিজের ক্ষমতা সুসংহত করেন। তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে প্রচার করে জমিদারদের সহায়তা লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালান। তারা কোম্পানির রাজস্ব প্রদান স্থগিত রাখে কিন্তু রেজার বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত সমর্থন পাওয়া যায়নি। ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে সম্মু খ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি ত্রিপুরা যাওয়ার পথে ধৃত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হন।

কোম্পানি শাসনের শুরুতে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সিলেটে অনেক বেশি প্রতিরোধ কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। কোম্পানি সরকার সিলেটের ব্যাপারে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ সিলেটের ম্যাজিস্ট্রেটকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়, সশস্ত্র কোনো মানুষের দল অথবা সশস্ত্র নয় অথচ সংখ্যায় বেশি এরকম কোনো দলকে সিলেটে প্রবেশ করতে অথবা সিলেট জেলা অতিক্রম করতে যেন না দেওয়া হয়।[২৯]

১৮০০ সালে কোম্পানি সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং নিরাপত্তা আইন পাস করে। তখন সিলেটে ক্রমশ প্রতিরোধ-যুদ্ধ হ্রাস পেতে থাকে। ১৭৯০ সালে সিলেট অঞ্চলে ৩০টি থানা সৃষ্টি করা হয়েছিল। জমিদারদের হাত থেকে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে ঔপনিবেশিক পুলিশের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ফলে গ্রামীণ সমাজে জমিদারদের ক্ষমতা কমে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্মীরা মণিপুর আক্রমণ করে, ফলে সমগ্র এলাকাটি জনশূন্য হয়ে পড়ে। সেসময় মণিপুরি খাসিয়া প্রভৃতি নৃ-গোষ্ঠী সিলেটে এসে আশ্রয়গ্রহণ করে। বর্মীদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য অনেকে কাছাড়ে এসেও আশ্রয়গ্রহণ করে। ১৮২৪ সালে সিলেট সীমান্তে ইংরেজ ও বর্মীবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে বর্মীরা পরাজিত হয়। ব্রহ্মযুদ্ধের পর আসাম উপত্যকা কোম্পানি শাসনের অধিকারে চলে এলে আসাম ও সিলেটের মধ্যবর্তী স্বাধীন ক্ষুদ্ররাজ্য জৈন্তিয়ার ওপর ইংরেজদের নজর পড়ে। ১৮২৪ সাল বর্মীবাহিনী জৈন্তিয়াসংলগ্ন কাছাড় দখল করে নেয়। কোম্পানি এসময় জৈন্তিয়া রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না বলে অঙ্গীকার করে মৈত্রী স্থাপন করে, কিন্তু ১৮৩৫ সালে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে জৈয়ন্তিয়া রাজ্যের রাজা ইন্দ্র সিংহকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার রাজ্য অধিকার করে নেয়।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় সিলেটের কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ফোর্ট উইলিয়ামে কোষাগার প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা অত্যন্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাহিদের গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে দলত্যাগী পলাতক সিপাহিদের তৎপরতা প্রত্যক্ষ করে। ভীত ইউরোপীয় নাগরিকদের পরামর্শে

---

[২৯] মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, সিলেটের রাজনৈতিক ইতিহাস, মো. আবদুল আজিজ ও অন্যান্য (সম্পা.) বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, সিলেট-১৯৯৭, পৃ. ৬৮।

সিলেটের ম্যাজিস্ট্রেট তার স্ত্রীকে নিরাপত্তার জন্য চেরাপুঞ্জি পাঠিয়ে দেন। জনসাধারণ শহর ত্যাগ করে গ্রামে চলে যায় এবং দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যায়।

চট্টগ্রামের ৩৪ নম্বর দেশীয় পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ করে সেখানকার কারাগার ভেঙে কয়েদিদের মুক্ত করে দিয়েছিল। অস্ত্রাগার ও কোষাগার লুণ্ঠন করার পর ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বিদ্রোহীরা মণিপুর অভিমুখে যাত্রা করে সিলেটের দক্ষিণাঞ্চলে এসে পৌঁছায়। মেজর ব্যঙ-এর নেতৃত্বে কোম্পানি সৈন্যরা লাতুর নিকট মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হলে বিদ্রোহী সিপাহীরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ শেষে ২৬টি মৃতদেহ, বেশ কিছু আহত সিপাহিকে ফেলে রেখে তারা জঙ্গলে পালিয়ে যায়। অবশ্য কোম্পানি সৈন্যের অধিনায়ক মেজর ব্যঙসহ ৫জন নিহত ও ১জন আহত হয়েছিল। পলায়নরত সিপাহিদের অনুসরণ করে কোম্পানি সৈন্যরা আরো ১০জন বিদ্রোহী সিপাহিকে হত্যা করে। পলায়নকারী সিপাহিরা কাছাড় পৌঁছার পর সেখানে সিলেট লাইট ইনফ্যান্ট্রির সৈন্যদের আক্রমণে তারা গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করে। সিলেটে বিপুল সংখ্যক দলত্যাগী ও বিয়োজিত বিদ্রোহী সিপাহি গ্রেফতার হয়। সংক্ষিপ্ত বিচারে ইংরেজরা বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহী পলাতক সিপাহিদের গ্রেফতারের জন্য সিক্কাবরকন্দাজ নিয়োগ করে, ফলে অধিকসংখ্যক সিপাহি সিলেটে বন্দি হয়েছিল।

বিদ্রোহী সিপাহিদের সহায়তা করার অভিযোগে প্রতাপগড়ের জমিদার মৌলবগঞ্জের আলীকে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু পরে তাকে প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। সিলেটের হাজি সাঈদ বক্ত মজুমদারের ছয়টি কামান সে সময় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের অধিকারে নিয়ে যায়। সে সময় কোম্পানির সৈন্যদের রসদ সরবরাহ ও বিদ্রোহী সিপাহিদের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে ইংরেজদের কৃপা লাভের চেষ্টা করেন সিলেটের জমিদার ও ব্যবসায়ী রামকৃষ্ণ মজুমদার এবং বাণীনাথ দে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় উপজাতীয় নাগা কুকী, খাসিয়া প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর লোকদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ সিলেটের স্থানীয় প্রশাসনের ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল।[৩০] সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মুসলমানদের ওপর ইংরেজদের প্রবল সন্দেহ ছিল।

আসামভুক্ত সিলেট

১৮৭৪ সালে আসাম প্রদেশ গঠন করার পর সিলেট জেলাকে নবগঠিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবে এ জেলার মানুষের অসন্তোষ চরমে ওঠে। তারা এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সিলেটে আগত গভর্নর জেনারেল নর্থব্রুকের নিকট সিলেটকে আসামভুক্ত না করার জন্য আবেদন জানায়। তিনি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অভিমত যাচাই করে ঘোষণা দেন যে, সিলেট জেলা আসামভুক্ত হলেও প্রচলিত আইনকানুন, বিধিব্যবস্থা, ভূমিবন্দোবস্তের নিয়মকানুন প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকবে। তার এ প্রতিশ্রুতি পরবর্তীকালে আংশিক রক্ষা করা

[৩০] রতনলাল চক্রবর্তী, সিপাহী যুদ্ধকালীন সিলেট, সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সিলেট অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসচ্ছল, শিক্ষাসংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ চিফ কমিশনার-শাসিত আসাম প্রদেশভুক্ত হয়।

রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৮৭৭ সালে সুনামগঞ্জ, ১৮৭৮ সালে হবিগঞ্জ এবং ১৮৮২ সালে মৌলভীবাজার মহকুমা স্থাপন করা হয়। সেখানে মহকুমা প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে তাকে মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি মহকুমাপর্যায়ে জেলা প্রশাসকের অধীনে দায়িত্ব পালন করতেন।

ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমানরা খুব দুঃখ দুর্দশায় পতিত হয়। মুসলমানরা ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে, কিন্তু হিন্দুরা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নেয়। তারা দ্রুত ইংরেজি শিক্ষাও গ্রহণ করে নেয়। ১৮৩৫ সালে অফিস আদালতে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি প্রচলিত হওয়ার পর ইংরেজি শিক্ষায় অগ্রসর হিন্দুরা শুধু অফিস-আদালতের কাজেই নয়, ব্যবসাবাণিজ্য, ওকালতি, ডাক্তারি ইত্যাদি পেশাতেও এগিয়ে যায়। এসকল চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণি এবং অন্যান্য পেশাজীবী মধ্যবিত্ত যেমন আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি সকলেই তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে জমিজমা ক্রয় করত। তারা উদ্বৃত্ত অর্থে জমিদারি ক্রয়ে বিনিয়োগ করে। এসব পেশা ও ব্যবসায় হিন্দুরাই একচেটিয়া কর্তৃত্ব করতে থাকে।

নবাগত হিন্দু জমিদার ছাড়াও সিলেট অঞ্চলের সমাজে হিন্দু মহাজনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইসলাম ধর্মে সুদের ব্যাবসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তাই মহাজনি ব্যাবসায় হিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য কিছু মুসলমানও মহাজনি ব্যবসায় যুক্ত হয়, কিন্তু সমাজে তারা নিন্দিত ও ধিকৃত হতো। হিন্দু জমিদারদের মধ্যে অনেকেই মহাজনি ব্যাবসায় অংশগ্রহণ করে, কিন্তু ধনী মহাজনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা হেরে যায়। মহাজনরা তাদের কৃপণতা ও কৌশলী শোষণের মাধ্যমে এত বেশি সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করেছে যে, তারাই সমাজে সব চেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত। তাদের ক্রমবর্ধমান সম্পদ ও প্রভাব অর্জনে হতভাগ্য কৃষকের অবদান সবচেয়ে।[৩১]

মুসলমান কৃষক পরিবারের দুঃসাহসী যুবকেরা কলকাতার খিদিরপুরে গিয়ে জাহাজের চাকরির জন্য ভিড় জমাত। জাহাজে সিলেটি নাবিকদের চাহিদা ছিল। তারা জাহাজে চাকরি নিয়ে দীর্ঘদিন বিভিন্ন দেশ ঘুরে নিজ গ্রামে এসে জমিজমা কিনে সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারত।

[৩১] মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, হবিগঞ্জের ইতিহাস, সিলেট, ২০০৭, পৃ. ৬৮।

প্রথম পর্যায়ে সিলেট থেকে অনেক হিন্দু শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, তারাকিশোর চৌধুরী প্রমুখ হিন্দুধর্মের প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮০ সালে সিলেটে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করতে গেলে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনের জন্য সিলেটে সামাজিক আন্দোলনও শুরু হয়েছিল। কলকাতার উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারীদের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীহট্ট সম্মেলনী' সিলেটের নারীশিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখে। সিলেটের ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে রেভারেন্ট পাইজকে ইংরেজি শিক্ষার জনক বলা যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তি দূর্বল হয়ে এলে এবং বংশবিস্তারের ফলে সিলেটের মুসলমান ভূস্বামীদের ছেলেরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। দেরিতে হলেও তারা বাস্তব উপযোগিতা উপলব্ধি করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে হিন্দুদের মতো সরকারি চাকরিসহ বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষালাভের পথ তখন সুগম হয়ে ওঠে। মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন কুসংস্কার যেমন পিরপূজা, কবরপূজা, নদীতে খোয়াজের বাতি দেওয়া প্রভৃতি কমে আসে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে সিলেট পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। শিক্ষিত হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। বিক্ষোভ সমাবেশ ও বিদেশি পণ্যদ্রব্য বর্জনসহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৯০৬ সালে সিলেট শহরে সুরমা উপত্যকায় রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সিলেটের হিন্দু যুবকেরা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর প্রভৃতি গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়। তারা অস্ত্র ক্রয় ও ব্যয়নির্বাহের জন্য ট্রেন ডাকাতি, ডাক লুট ও মহাজনদের বাড়িতে অর্থের জন্য হানা দিত।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই সুনজরে দেখত না। কারণ বঙ্গভঙ্গের ফলে নতুন প্রদেশে মুসলমানদের চাকরি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, অবিভক্ত বাংলায় তা সম্ভব ছিল না। মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করার পরও ব্যাবসাবাণিজ্য, চাকরি, ওকালতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা খুব কমই পেত। তারা মনে করত নবগঠিত প্রদেশে হিন্দুদের প্রভাবমুক্ত হয়ে সকল ক্ষেত্রেই উন্নতি করতে সক্ষম হবে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা হলে হিন্দুরা আনন্দিত হলেও মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়।

অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলন

সিলেটবাসী খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তবে অন্যান্য এলাকার তুলনায় এর তীব্রতা সিলেটে কম ছিল। ইতোমধ্যে মহাত্মা গান্ধী তার ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি খেলাফত আন্দোলনকে সক্রিয় সমর্থন জানান। ফলে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাথে খেলাফত

আন্দোলন একাকার হয়ে যায়। সরকারি খেতাব বর্জন ও সরকারি চাকরি ত্যাগের দৃষ্টান্ত সিলেটে কম দেখা গেছে। সর্বপ্রথম সরকারি চাকরি ত্যাগ করেন সিলেট সরকারি হাই স্কুলের ফারসির শিক্ষক মৌলভী আব্দুল মুছাব্বির। সরকারি খেতাব (রায় সাহেব) বর্জন করেন করিমগঞ্জের সতীশচন্দ্র দেব।[৩২] ১৯২১ সালে মৌলভীবাজারের যুগিডরে আসাম প্রাদেশিক খেলাফত সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন সৈয়দ হোসেন আহমদ মদনী ও চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সিলেটে ১৯২২ সালে আন্দোলনের সময় খেলাফত কর্মীদের বাড়ি অনুসন্ধানের নামে ধর্মগ্রন্থ ছিঁড়ে ফেলে পুলিশ। একটি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জলসায় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় সরকারি বাহিনীর মাধ্যমে। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন হিন্দু মুসলিম ঐক্য অত্যন্ত শক্তিশালী গণআন্দোলনে রূপলাভ করে।

সে সময় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল সুরমা উপত্যকার চা-বাগানগুলোতে। চরগোলায় চা-শ্রমিকরা বাগান ছেড়ে জন্মভূমিতে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে। অনেক কষ্টে তারা চাঁদপুর পৌঁছলে সরকারি গুর্খাবাহিনী তাদের ওপর হামলা চালায়। এ অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদে আসাম বাংলার রেলওয়ে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে চা- শ্রমিকদের সহায়তা করার ইচ্ছা থাকলেও, কংগ্রেস-নেতৃত্বের তাতে অনুমোদন ছিল না। কারণ, বরদলইয়ের মতো কংগ্রেস নেতারা নিজেই ছিলেন চা-বাগানের মালিক। সিলেটে কৃষকদের মধ্যে খাজনা না দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সিলেট শাহী ঈদগাহ ময়দানে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের বিশাল জনসভায় মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও মৌলানা শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয়সহ গান্ধী যোগদান করেছিলেন। এক বছরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতিতে অস্পষ্টতা ও বাস্তবতার অভাবের ফলে জলোচ্ছ্বাসের মতো ভবিষ্যৎ সুখরাজ্যের স্বপ্ন মানুষের মনে জেগে ওঠে।[৩৩] খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সিলেটে মৌলভী আব্দুল মুসাব্বির চৌধুরী, মৌলভী আব্দুল্লাহ বিসেল. সাখাওয়াতুল আম্বিয়া, মৌলভী আব্দুল হামিদ, বসন্তকুমার দাস, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, শিবেন্দ্র কুমার বিশ্বাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দসহ বিপুলসংখ্যক মানুষ কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরার ঘটনায় গান্ধী হঠাৎ আন্দোলন বন্ধের ডাক দেওয়ায় মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়। ব্রিটিশরা তাকে গ্রেপ্তার করে ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে।

১৯৩০ সালে বিশ্বমন্দার ফলে ধান ও পাটের দাম কমে গেলে সিলেটের গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ধান ও পাট দুটি মূল কৃষিপণ্যের মূল্য উৎপাদনব্যয়েরও নিচে নেমে যায়। অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, কেরোসিনসহ সকল জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে কৃষক ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং তারা অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার হয়। তাই জমিদারি ব্যবস্থা

---

[৩২] মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, হবিগঞ্জের ইতিহাস, সিলেট, ২০০৭, পৃ. ৮২।

[৩৩] সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ২০০।

ও সংকটের মধ্যে পতিত হয়। কোনো কোনো জমিদারিতে খাজনা আদায় প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কমে গিয়েছিল।

সিলেটের মৌলভীবাজারের ভানুবিলে জমিদার তার প্রজাদের ওপর খাজনা আদায়ের জন্য চাপ দিলে প্রজারা খাজনা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। জমিদারের লাঠিয়াল প্রজাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়। প্রজারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সরকারের সমর্থনপুষ্ট জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা স্থানীয় কংগ্রেস সদস্যদের সহায়তা কামনা করে। কংগ্রেসকর্মীরা প্রথমে আন্দোলনে সহায়তা দিলেও পরবর্তী পর্যায়ে সরে দাঁড়ায়। কারণ জাতীয় কংগ্রেস তখন জমিদারি ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে ছিল।

কংগ্রেসের ডাকে 'আইন অমান্য আন্দোলন' সিলেটে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। অবশ্য খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মতো সর্বাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেনি। কারণ অসমীয়া ও বাঙালি এবং হিন্দু মুসলিম ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষের ফলে আন্দোলনে মানুষের আগ্রহ কমে গিয়েছিল। এ আন্দোলন আসাম প্রদেশের অন্যান্য স্থানে তেমন জোরদার ছিল না। প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তরুণরাম ফুকন এবং সেনসি বরদলইয়ের মতো নেতাগণ ছিলেন আন্দোলনের প্রতি উদাসীন। আসাম প্রদেশের মধ্যে শুধু সিলেট অঞ্চলই হয়ে উঠেছিল আন্দোলনের মূল ঘাঁটি। ১৯৩০-১৯৩১ সালে গ্রেপ্তার হওয়া ২৩৭৩ জন রাজনৈতিক কর্মীর মধ্যে ৮৯২ জনই ছিল সিলেট জেলার লোক।[৩৪] গান্ধী নারীসমাজকে আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানোর ফল হয়েছিল বিস্ময়কর। দলে দলে সিলেটের মহিলারা পর্দার বাঁধন ছিন্ন করে রাজপথে রাজনৈতিক মিছিলে অংশ নেন। সে সময় সিলেটের নারীনেত্রীদের মধ্যে কৈশোর মঞ্জরী শ্যাম, জোবেদা খাতুন চৌধুরী, লাবণ্যপ্রভা দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আন্দোলনে সরকারি বিধি অমান্য করে বক্তৃতা দেওয়ার কারণে সুনীতি বালাদাস ও গিরিজাবালা গুপ্ত পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

সিলেটে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সন্ত্রাসবাদী দলের যে সকল সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তারা জেলে বন্দি অবস্থায় মার্কসবাদ লেলিনবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর তারা কংগ্রেসের ভিতর থেকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ তখন কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল।[৩৫] তারা কৃষক শ্রমিক শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আন্দোলন সংগঠন গড়ে তোলার জন্য কাজ করতে থাকেন। ১৯৩৬ সালে আসামে প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। কিন্তু নানকার প্রজাদের রাখা হয় এর বাইরে। ফলে বিভ্রান্তি দেখা দেয় সমগ্র কৃষক আন্দোলনের মধ্যে,

---

[৩৪] সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ৩০৫।

[৩৫] মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, ঔপনিবেশিক আমলে সিলেটের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন, সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬।

তাই নানকার প্রজারা কৃষক, প্রজাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সিলেটের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে আগত এ হতদরিদ্র মানুষেরা জমিদারের বাড়ি বা জমিতে বেগার খাটার বিনিময়ে কিছু পরিমাণ জমির ফসলের ওপর নিষ্কর অধিকারের শর্তে চাষাবাদ করত। সে আবাদকারী চাষিদের নানকার প্রজা বলে অভিহিত করা হতো। দীর্ঘকাল থেকে এ ব্যবস্থায় নানকার প্রজারা তাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বস্তই ছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে নানকার প্রজারা কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের চেষ্টা ও যত্নে সচেতন হয়ে ওঠে। তারা বেগারপ্রথা বন্ধ ও তাদের বসতবাড়ি এবং জমির ওপর জোতস্বত্বের স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও নানকার প্রথা বেআইনি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু জমির ওপর তাদের কোনো অধিকার কিংবা মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে আসাম প্রাদেশিক পরিষদে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় তাদের দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেনি। তাই মোহাম্মদ সাদউল্লা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের কারসাজিতে দলবদল ঘটিয়ে সাদউল্লা মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো হয়। অতঃপর কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই আমলাতান্ত্রিক ও ব্রিটিশধরনের মেজাজ কংগ্রেসি নেতাদের মধ্যে প্রকটভাবে ফুটে উঠতে থাকে।

১৯৩৪ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লন্ডন থেকে ফিরে এসে মুসলিম লীগের সভাপতি হন। জিন্নাহ কেন্দ্রীয় পরিষদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সময় সিলেটের আব্দুল মতিন চৌধুরী এ পার্টির সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয়ী ৯ জন প্রার্থীর মধ্যে অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৩৮ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি সমিতির বৈঠকে তিনি জিন্নাহর পক্ষ থেকে এ কমিটির আহবায়ক হয়েছিলেন। আসামে সাদউল্লা মন্ত্রিসভায় দুবারই তিনি মন্ত্রী ছিলেন। সিলেট তথা আসামে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য তিনি জিন্নাহর প্রধান সহযোগী হিসেবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে একটি জনপ্রিয় দল হিসেবে গড়ে তোলেন।[৩৬]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের নীতি ও ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করতে রাজি না হওয়ায় ১৯৩৯ সালে অন্যান্য প্রদেশের মতো আসামেও কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। এ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করায় মুসলিম লীগ ত্রাণ দিবস পালন করে। সাদউল্লা পুনরায় আসামে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সে বছর ধুবড়িতে আসাম মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করার ফলে আগের তুলনায় মুসলিম লীগ অনেক বেশি সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সম্মেলনে

[৩৬] সৈয়দ মর্তুজা আলী, হজরত শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস ঢাকা-২০০৩, পৃ. ১১৮-১১৯।

আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি পদে সৈয়দ সাদউদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মোদাবিবর হোসেন চৌধুরী নির্বাচিত হন। পরের বছর সিলেটের হবিগঞ্জে আসাম মুসলিম লীগের সম্মেলনেও দুজন পুনর্নির্বাচিত হন।

১৯৪০ সালে জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে এ কে ফজলুল হক ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবি উত্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এটি পাকিস্তান প্রস্তাব নামে খ্যাত হয়। লাহোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে বাংলা ও আসামসহ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একাধিক রাষ্ট্রগঠনের দাবি জানানো হয়।[৩৭]

১৯৪২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির শাখা সিলেটেও স্থাপিত হয়। পাকিস্তান প্রস্তাব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সিলেটের মুসলমানদের যেমন অতি দ্রুত এক স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করে, তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রেও হিন্দু লেখকদের প্রভাবমুক্ত করে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। সিলেট থেকে মুসলমানদের দ্বারা প্রকাশিত কিছু পত্রপত্রিকায় মুসলিম ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের সময় মুসলমানরা প্রায় দূরেই ছিলেন। শুধু ‘জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ’-এর সমর্থকরা এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সিলেটে মুসলমানদের মধ্যে যারা কলেজে বা সরকারি মাদরাসায় তাদের ছেলেদের লেখাপড়া করাতে চাইতেন না, তাদের ছেলেদের দেওবন্দ মাদরাসায় ধর্মীয় শিক্ষালাভের জন্য পাঠাতেন। তারা রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন না। কংগ্রেসের সহযোগী হিসেবে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনকারী ‘জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ’-এর কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। এ সংগঠনের সভাপতি মওলানা হোসেন আহমদ মাদানির অনেক শিষ্য সিলেটে ছিলেন। মহিলারাও এ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের হাতে সিলেটের পুলিশ সুপার লাঞ্ছিত হলে পুলিশ ফাঁকা গুলি করে তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। উত্তেজিত জনতা পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস ইত্যাদিতে হামলা চালায় এবং নানাধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠার পর সরকার নৃশংস দমননীতি চালিয়ে এবং ব্যাপকভাবে নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করে জেলে প্রেরণ করতে থাকে। সিলেটে কংগ্রেস সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাদের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৪ সালে কোহিমা ইম্পল সীমান্তে ব্রিটিশ ও জাপানি সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। জাপানিরা সিলেটের পাথারকান্দি এলাকায় বোমাবর্ষণ করে, ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ সিলেটসহ অন্যান্য শহর থেকে গ্রামে আশ্রয় নেয়। কোহিমা যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যরা জাপানিদের অগ্রযাত্রা বন্ধ করতে সক্ষম হলে

[৩৭] ড. আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৪৯৩।

জনমনে স্বস্তি ফিরে আসে। চালের দাম কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ার ফলে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সিলেট অঞ্চলে অনাহারে মানুষ মৃত্যুবরণও করেছিল।

ইতোমধ্যে ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত এবং মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিতে দুই দল অনড় থাকায় ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়। যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশরা বুঝতে পারে বিশ্ব জনমত, তাদের জনগণ, এমনকি সেনাবাহিনীর যে মনোভাব তাতে ঔপনিবেশিক শক্তি দিয়ে আর ভারতে ব্রিটিশ শাসন চালানো সম্ভব নয়। ১৯৪৫ সালে তাই ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে ওয়াভেল পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৫-৪৬ সালে শীতকালের নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুই দল নির্বাচনযুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এ নির্বাচনে মুসলমানদের মধ্যে প্রধান দলরূপে মুসলিম লীগের দাবি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তারা কেন্দ্রে ৩০টি আসনের সবকটিতে জয়লাভ করে। মুসলিম লীগ আসাম প্রদেশে ৩৭টি আসনের মধ্যে ৩৪টিতে জয়লাভ করে, অন্য ৩টি আসনে 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এর প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে কিন্তু মুসলিম এলাকাগুলোতে কংগ্রেসসমর্থক সকল মুসলমান প্রার্থী পরাজিত হন, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাদের জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বরদলইয়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। আসামের স্থানীয় অধিবাসীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বসতিস্থাপনকারী কৃষকদের বিতাড়িত করার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল। তারা অনাবাদি এলাকায় লাইন টেনে কৃষকদের সেখানে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দেয়। এটাকে 'লাইন প্রথা' নামে অভিহিত করা হয়। আসাম মুসলিম লীগের নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর অনুসারীদের নিয়ে এ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেও সমস্যার কোনো সুরাহা করতে পারছিলেন না। মুসলিম লীগের অভিজাত অংশের নেতাদের নমনীয় মনোভাব লক্ষ করে বরদলই সরকার কৃষকদের ওপর নির্যাতন আরম্ভ করেছিল, তাই সমগ্র সিলেটব্যাপী কংগ্রেস সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত ছিল। মুসলিম লীগ নেতা আব্দুল মতিন চৌধুরীর প্রচেষ্টায় ১৯৩৫ সালের আগে আসামে বসতি স্থাপনকারী কৃষকদের ভূমিদান করতে সরকারকে বাধ্য করা হয়।

সিলেটে হিন্দু-মুসলিম তিক্ততা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে আসামে বসতিস্থাপনকারী কৃষকদের ওপর কংগ্রেসের বরদলই সরকারের আচরণ অনেকাংশে দায়ী করা হয়। মুসলিম লীগ প্রচার করে পাকিস্তান অর্জিত হলে হিন্দু মহাজন, জমিদার এবং বেনিয়াদের শোষণ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। মুসলিম লীগ নেতাদের প্রচারণার ফলে শ্রেণি সংহতি কিংবা অন্য যে-কোনো আবেদনের চেয়ে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে তখন পাকিস্তানের আবেদন এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে, কমিউনিস্টদের লাল পতাকার পাশে তারা পাকিস্তানের সবুজ পতাকা একই

সঙ্গে গ্রহণ করে।[৩৮] মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে নিজেদের পার্থক্য নিরূপণের জন্য ধুতির বদলে লুঙ্গি পাজামা এবং মাথায় টুপি পরা আরম্ভ করে এবং নামাজ রোজাসহ ধর্মীয় কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য শুধু ভৌগোলিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও তারা হিন্দু প্রতিবেশীদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৪৬ সালে কেবিনেট মিশন ভারতে আসার পর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর তাদের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র ঘোষণা করে। তিন স্তরবিশিষ্ট ফেডারেশনে আসাম ও বাংলা প্রদেশ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা পুনর্বিবেচনা করতে থাকে এবং তাদের ইঙ্গিতে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বরদলই প্রস্তাবিত গণপরিষদে গ্রুপিং ব্যবস্থায় যোগ দিতে অস্বীকার করেন।[৩৯] কংগ্রেস সভাপতি নেহরু প্রস্তাবিত গণপরিষদের ক্ষমতা সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিলে সমগ্র পরিকল্পনাই প্রত্যাখ্যানের পর্যায়ে চলে যায়।

ভারত বিভাগ, গণভোট ও সিলেট ভাগ

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে মুসলিম লীগ সম্মেলনে পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। ১৬ আগস্ট থেকে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সমগ্র ভারতের প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী ভারতের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে তাদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ঘোষণা দেন। সে উদ্দেশ্যে মাউন্ট ব্যাটেন নতুন ও শেষ বড়োলাট হয়ে ভারতের দিল্লিতে এসে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি লীগ-কংগ্রেস উভয় দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ভারত স্বাধীন হবে তবে তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশ হবে।

মুসলিম লীগ নেতা আব্দুল মতিন চৌধুরী, মনোয়ার আলী, মুদাব্বির হোসেন চৌধুরী, আব্দুল হামিদ, মাহমুদ আলী, মইনুল হক চৌধুরী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, নূরুল হোসেন খান, দেওয়ান বাছিত, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ প্রমুখ নেতাগণ সিলেট ও কাছাড়সহ আসামের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভাইসরয়ের বৈঠকের ভিত্তিতে জুনের ৩ তারিখের ঘোষণায় বলা হয়, হস্তান্তরের তারিখ ১৯৪৮ সালের জুন থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্টে এগিয়ে আনা হবে। এ ঘোষণায় আরও বলা হয় যদি বাংলাকে ভাগ করা হয়, তবে আসাম প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে গভর্নর জেনারেলের তত্ত্বধানে সিলেট জেলার গণভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে পাকিস্তান অথবা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে। সিলেট ও তৎসংলগ্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণের জন্য বাংলা বা পাঞ্জাবের মতো কোনো পৃথক বাউন্ডারি কমিশন গঠন করা হবে না। বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনই আসামের সীমানা

---

[৩৮] মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, হবিগঞ্জের ইতিহাস, সিলেট, ২০০৭, পৃ. ৯৬-৯৭।

[৩৯] সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ৪৩৯।

নির্ধারণের কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সালে ৬ ও ৭ জুলাই সিলেটে গণভোটের দিন নির্ধারিত হয়। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে কংগ্রেস মুসলিম লীগের স্লোগানে সমগ্র সিলেট অঞ্চল সরগরম হয়ে ওঠে। সিলেটকে পূর্ববাংলার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য প্রচারাভিযানে বাংলা থেকে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড ও ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকরা যেমন এসেছিল, তেমনি পাঞ্জাব থেকে তরুণ শিখসহ কংগ্রেসি স্বেচ্ছাসেবকরাও এসে যোগ দিয়েছিল আসামভুক্ত করার জন্য। আসামের লাইন প্রথাবিরোধী আইন অমান্য আন্দোলনের কারণে স্থানীয় অনেক মুসলিম লীগ নেতাকর্মী তখনো কারাগারে বন্দি ছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের এক বিরাট দল সিলেটে এসেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, নূরুল আমিন, পীর বাদশা মিয়া, সৈয়দ মুয়াজ্জম উদ্দিন হোসেন, এ.এ.ইস্পাহানী, মৌলানা আব্দুল্লাহেল বাকী, ইউসুফ আলী চৌধুরী, মৌলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, ছাত্রনেতা শাহ আজিজুর রহমান, ফজলুল কাদের চৌধুরী ও শেখ মুজিবুর রহমান (পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতির পিতা ও বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের স্থপতি)। বাংলা থেকে আগত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সিলেটে অবস্থান করে প্রচারকার্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। সিলেটে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতাকর্মীরা কংগ্রেসের সঙ্গে আসামভুক্তির পক্ষে প্রচারণা চালায়। সিলেট মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রচুর সমর্থক ছিলেন। এ দলের বেশ কয়েকজন ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে আসাম প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারা পূর্ববাংলার সঙ্গে সিলেটের অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। আসাম সরকারের সিলেট অঞ্চলের মন্ত্রী বসন্তকুমার দাস এবং বৈদ্যনাথ মুখার্জি ও সিলেটের আসামভুক্তির পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন, ফলে গণভোটের ফলাফল নিয়ে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ যথেষ্ট উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও শঙ্কার মধ্যে ছিলেন।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের বিরোধীপক্ষের নেতা মৌলানা সহুল উসমানীর অনুসারীবৃন্দ সিলেটের পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে। গণভোটের সময় তার কঠোর ফতোয়া লিফলেট আকারে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। এতে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের ভোট প্রদান কুরআন ও হাদিসের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফরজ বলে ঘোষণা করা হয়। শুধু তাই নয়, পূর্ববাংলার পক্ষে ভোট দেওয়া জিহাদের সমতুল্য ইবাদত এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সকল মুসলমানের ধন সম্পদ উৎসর্গ করার আহবানও জানানো হয়। সিলেটের গণভোটে নির্বাচনী প্রচারণাসহ স্থানীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বদানকারী একজন নেতা লিখেছেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের খুব কম ভোটই আসামভুক্তির পক্ষ দেওয়া হয়েছিল।[৪০]

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ৬ জুলাই প্রথম দিনে ভোটগ্রহণ আরম্ভ হলে প্রথমে ভোটকেন্দ্রে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তবে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ

---

[৪০] মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, হবিগঞ্জের ইতিহাস, সিলেট, ২০০৭, পৃ. ১০০।

আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় অতিদ্রুত অবস্থা স্বভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসেন। পরদিন ৭ জুলাই ভোটগ্রহণের দ্বিতীয় দিন সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়। সরকারি সূত্র অনুযায়ী গণভোট শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছে বলা হলেও ভোটগ্রহণ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নিকট থেকে ভোটদানে বাধা প্রদানসহ সন্ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টির অসংখ্য অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

সিলেটের গণভোটে প্রদত্ত ভোটের সামগ্রিক শতকরা পরিমাণ পাকিস্তানভুক্তির পক্ষে দেওয়া ভোটের তুলনায় ভারতভুক্তির পক্ষে কিছু বেশি ছিল।

সারণি-১৪

গণভোটের ফলাফল

মহকুমা	মোট মুসলমান ভোটের সংখ্যা	পূর্ববাংলার পক্ষে প্রদত্ত ভোট সংখ্যা	%	মোট সাধারণ ভোটের সংখ্যা	আসাম পক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা	%
সিলেট সদর	৯২২৬৮	৬৮৩৮১	৭৪.১১	৪৮৮৬৩	৩৮৮৭১	৭৯.৫৫
করিমগঞ্জ	৫৪০২২	৪১২৬২	৭৬.৩৮	৪৬২২১	৪০৫৩৬	৮৭.৭০
হবিগঞ্জ	৭৫২৭৪	৫৪৫৪৩	৭২.৪৬	৬০২৫২	৩৬৯৫২	৬১.৩৩
মৌলভীবাজার	৩৮২৯৭	৩১৭১৮	৮২.৩২	৪১৪২৭	৩৩৪৭১	৮০.৭৯
সুনামগঞ্জ	৫১৮৪৬	৪৩৭১৫	৮৪.৩১	৩৯০৪৫	৩৪২১১	৮৭.৬২
সিলেট জেলা	৩১১৭০৭	২৩৯৬১৯	৭৬.৮৭	২৩৫৮০৮	১৮৪০৪১	৭৮.০৫

বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশন ১৯৪৭ সালের ৪-৬ আগস্ট পর্যন্ত সিলেট প্রশ্নে আগ্রহী পক্ষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত স্মারকলিপি ও তাদের প্রতিনিধিদের শুনানির জন্য কলকাতায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক কিছু মতবিরোধ কাটিয়ে কমিশনের সদস্যগণ এ ঐকমত্যে পৌঁছেন যে, তাদের দায়িত্ব হলো মুসলিম ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের মধ্যে সিলেট তৎসন্নিহিত আসামের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা ভাগ করে দেওয়া, তবে সে সাথে অন্যান্য কারণও বিবেচনার মধ্যে থাকবে।

র‍্যাডক্লিফ তার রোয়েদাদে উল্লেখ করেন যে মানচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, গণভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে যদি এলাকা ভাগ করা হয় তাহলে নানা সমস্যার সৃষ্টি করবে, এবং এর ফলে জেলাগুলোর ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি ব্যাহত হবে। করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি মহকুমার ওপর মুসলমানদের দাবি যদি স্বীকৃত হয় তাহলে সিলেটের ছয়টি অমুসলমান থানা আসামের বাকি অংশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং আসামের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগের জন্য দুর্গম সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং লুসাই পাহাড় অতিক্রম করা ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না। অন্যদিকে থানাগুলো যেভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে লম্বালম্বি অবস্থায় আছে, তাতে সেগুলোকে যদি সিলেট থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে সিলেটের রেল যোগাযোগের লাইনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

সিলেট শহরের সঙ্গে রেল যোগাযোগের যে জংশন (কুলাউড়া) তা পূর্ববাংলায় না পড়ে আসামের মধ্যে পড়বে।

তাই কিছু এলাকা আসাম ও পূর্ব বাংলার মধ্যে বিনিময় হওয়া দরকার। তিনি বলেন, এর দ্বারা কিছু অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা অবশ্যই পূর্ব বাংলার মধ্যে যাবে এবং কিছু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা এবং হাইলাকান্দি আসামের মধ্যে থাকবে। সে অনুযায়ী সিলেটের দক্ষিণাঞ্চলের মৌলভীবাজার মহকুমার এবং করিমগঞ্জ মহকুমার অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রীমঙ্গাল, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া ও বড়োলেখা থানার বিনিময়ে সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার মুসলিম অধ্যুষিত করিমগঞ্জ ও বদরপুর থানা এবং অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা পাথারকান্দি ও রাতাবাড়ি এবং সে সঙ্গে কাছারের হাইলাকান্দি মহকুমা আসামকে প্রদান করা হবে।

বেঙ্গালে বাউন্ডারি কমিশনের রোয়েদাদে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ করিমগঞ্জ ও বদরপুর থানা এবং অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাথারকান্দি ও রাতাবাড়ি থানা ছাড়া সমগ্র সিলেট জেলাকে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। যে নীতির ভিত্তিতে সীমানা চিহ্নিত করা হয়, আসামকে সিলেট ও কাছাড়ের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা প্রদান করায় সে নীতি লঙ্ঘিত হয়। র‍্যাডক্লিফ করিমগঞ্জ মহকুমার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৫,৫৩৪ জনের সংখ্যাগরিষ্ঠ) এলাকা এবং কাছাড়ের হাইলাকান্দি মহকুমা আসামকে প্রদান করে ‘সংখ্যাগরিষ্ঠতা’ এবং ‘সন্নিহিত’ নীতিকে চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। যেহেতু অমুসলিম থানাগুলো আসামের সন্নিহিত ছিল না এবং মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে আবদ্ধ ছিল, সেজন্য স্থানীয় কারণসমূহের ভিত্তিতেই সিলেটের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সঙ্গে প্রশ্ন না তুলে পূর্ববাংলার সাথে সংযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত ছিল। এগুলোর বিনিময়ে মুসলিম অধ্যুষিত করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি মহকুমা আসামকে দিয়ে আসামের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ নিশ্চিত করার প্রশ্ন ছিল সম্পূর্ণ অবান্তর বিষয়। মাউন্ট ব্যাটেনের ৩ জুন পরিকল্পনায় যদিও ‘সম্প্রদায়গত সংখ্যাগরিষ্ঠতা’ এবং ‘এলাকার সংলগ্নতা’র ভিত্তিতে সীমানা চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু র‍্যাডক্লিফ কথিত, ‘আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং রায় দিচ্ছি’ প্রসঙ্গটি ছিল তার খেয়ালখুশিমতো সিদ্ধান্ত এবং তা মূলনীতি ও বিচার্য বিষয়ের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি কখনো সীমান্ত চিহ্নিত করার কাজের জন্য আসাম কিংবা সিলেট অঞ্চলে আসেননি, তার দিল্লির অফিসে বসে টেবিলের ওপর মানচিত্র রেখে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাইলের পর মাইল সীমানা চিহ্নিত করার কাজ চূড়ান্ত করেন।

সিলেট ভাগের অনিয়মগুলোর ১৯৪৭ সালের ১৮ আগস্ট রোয়েদাদ প্রকাশিত হওয়ার পরপরই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার মানুষ পতাকা উড়িয়ে আনন্দে মেতে উঠেছিল, তারা ১৮ আগস্ট সকালে নিজেদের আসামের মধ্যে দেখতে পায়। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে যে উৎসাহ ও আনন্দ ব্যাপকভাবে হওয়ার কথা ছিল, তা সবার জন্য সমান হয়ে ওঠেনি। সবচেয়ে

বেদনাদায়ক বিষয় হলো, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অনেকে তাদের বহুপুরুষের বাসভূমির মায়া ত্যাগ করে আসাম ও পূর্ববাংলায় নিজের ঘরবাড়ি ফেলে রেখে পাড়ি জমায়। কিছু মানুষ অবশ্য সম্পত্তি বিনিময় করে ভারত পাকিস্তানের বাসিন্দা হয়েছিলেন। তবে তাদের সংখ্যা নেহায়েতই কম ছিল।

পাকিস্তান আমলে সিলেট

১৯৪৮ সালের শুরু থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে পূর্ববাংলার প্রতি অবহেলা ও প্রবঞ্চনা আরম্ভ হয়। পাকিস্তানের রফতানি আয়ের সিংহভাগ পূর্ববাংলা থেকে অর্জিত হতো। সেখান থেকে পাট, চা, চামড়া রফতানি হতো, বিশেষ করে তৎকালীন বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদার ফলে পাট রফতানি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনই পাকিস্তানে অর্থনীতির মেরুদণ্ড ছিল বলা যায়। শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি খাতের সিংহভাগ অর্থ পশ্চিমাঞ্চলের জন্য বরাদ্দ হতো। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই দুই অঞ্চলের মধ্যে অসম অর্থনীতি ছাড়াও জাতিগত, মানসিক, প্রকৃতিগত, সংস্কৃতিগত এবং ইতিহাসের স্বতন্ত্র সত্তাগুলো ক্রমশ প্রকট হতে থাকে। বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও পূর্ব-পশ্চিমে ছিল আকাশপাতাল তফাত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫০-৫১ সালের দুর্ভিক্ষে পূর্ববাংলায় অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ক্রমে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পূর্ববাংলাকে শোষণের লীলাভূমিতে পরিণত করা হয়। ফলে পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ সরকার দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও দমন-পীড়নের প্রতিবাদে বিকল্পধারার রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে।

১৯৪৭ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ' নামে তাসাদ্দুক আহমদ চৌধুরীকে সভাপতি করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। পাকিস্তান সরকারের নির্যাতন ও দমননীতির কারণে অল্পদিনের মধ্যেই সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আসাম ও পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ শাখাকে একীভূত করে পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। এতে আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলী এবং সদস্য দেওয়ান বাসেত ও দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। কিন্তু মওলানা আকরম খাঁ এ কমিটি ভেঙে দিয়ে নিজেই এক নতুন কমিটি গঠন করেন।

১৯৪৯ সালে ঢাকার রোজ গার্ডেনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক পদে শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সালে ঢাকায় সরকারি বাধার মুখে বুড়িগঙ্গা নদীর বুকে সম্মেলনে নৌকার ওপর 'পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ' গঠিত হয় এবং মাহমুদ আলী ও অলি আহাদ যাথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ঘোষণাপত্রে বাংলা ভাষাকে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতি ছিল (পৃ. ৩০) কিন্তু ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলা ব্যবহার সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ধীরেন্দ্রনাথের উত্থাপিত প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া হয়। জিন্নাহ ঢাকা এসে ঘোষণা করেন, শুধু উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, ছাত্ররা তার প্রতিবাদ করে। ফলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং প্রদেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হয়। সিলেটে পীর হাবিবুর রহমানকে আহবায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৪৮ সালের শুরু থেকেই সিলেটে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ছাত্রনেতা ও কর্মীরা সক্রিয় ছিলেন।[৪১] সে উপলক্ষ মিছিল মিটিংয়ে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের হামলা ও চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে আন্দোলন অব্যাহত ছিল।

খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব

ক) আজমল আলী চৌধুরী (১৯১৬-১৯৭১): আজমল আলী চৌধুরী ১৯১৬ সালে সিলেট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দেশ বিভাগের আগ পর্যন্ত তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। সিলেটে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় আঞ্চলিক নেতা হিসাবে তার ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয় এবং সেসময় তিনি কারাবরণও করেন। সিলেট রেফারেন্ডামেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আজীবন অকৃতদার এই রাজনীতিবিদ জনসেবাকে তার জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন। সিলেট শহরের শ্রীবর্ধন ও স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতির জন্য তিনি নিরলস কাজ করে গেছেন। ১৯৪৪ সালে আজমল আলী চৌধুরী সিলেটের পৌর কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

খ) এমএজি ওসমানী (১৯১৮-১৯৮৪): তাঁর পুরো নাম মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী। দেরাদুনে ব্রিটিশ-ভারতীয় মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কমিশনড অফিসার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে মুজিবনগরে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন সেক্টর ও বাহিনীর মাঝে সমন্বয়সাধন করা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ রাখা, অস্ত্রের যোগান নিশ্চিত করা, গেরিলা বাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা- প্রভৃতি কাজ সাফল্যের সাথে পালন করেন ওসমানী। ১৯৭৩ সালের মার্চে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে নিজের এলাকা থেকে নির্বাচিত হন এবং ডাক, তার, টেলিযোগাযোগ, অভ্যন্তরীণ নৌ যোগাযোগ, জাহাজ ও বিমান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন। তিনি ১৯৮৪ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারি লন্ডনে চিকিৎধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে হজরত শাহজালাল (র.) এর মাজারের সংলগ্ন স্থানে সমাহিত করা হয়। তাঁর স্মরণে ঢাকায় গড়ে উঠেছে ‘ওসমানী উদ্যান’ ও স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশ সচিবালয়ের বিপরীতে ‘ওসমানী মেমোরিয়াল হল’।

[৪১] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি প্রথম খন্ড, ঢাকা ১৯৭০

এ ছাড়া তাঁর সিলেটের বাসভবনকে পরিণত করা হয়েছে জাদুঘরে। সরকারি উদ্যোগে সিলেট শহরে তাঁর নামে একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

গ) হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (১৯২৮-২০০১): বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা কূটনীতিবিদ ছিলেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার গৌরব অর্জন করেছিলেন তিনি। বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, ফরাসি এবং ইতালীয় ভাষায় কথা বলতে পারতেন। এছাড়াও, আরবী, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, জার্মান এবং ইন্দোনেশিয়ান ভাষায়ও তার সম্যক দখল ছিল। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৮ সালে তিনি স্বাধীনতা পদক পান।

ঘ) আবুল মাল আবদুল মুহিত (১৯৩৪): একজন খ্যাতনামা বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, লেখক এবং ভাষাসৈনিক। এছাড়াও তিনি ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁর জন্ম বাংলাদেশের সিলেট (সাবেকঃ শ্রীহট্ট) জেলায়। আবুল মাল আবদুল মুহিত ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের এমসি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে ইংরেজী সাহিত্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম শ্রেণী পেয়ে কৃতকার্য হন এবং একই বিষয়ে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন এবং বিদেশে চাকুরীরত অবস্থায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন তিনি। অতঃপর ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমপিএ ডিগ্রী লাভ করেন। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির *মহাসচিব* হিসেবে ছিলেন আবুল মাল আবদুল মুহিত। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণারয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মুহিত।

ঙ) নুরুল ইসলাম নাহিদ (১৯৪৫): বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং বর্তমান বাংলাদেশের সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। তিনি ২০০৯ সাল থেকে এ পদে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৯৬ সালে ৭ম ও ২০০৮ সালে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা (সিলেট-৬) থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ৬ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর লেখা 'বাঙালি বুখে দাঁড়াও' (২০০৬), 'বঙ্গাবন্ধুর আদর্শ, লক্ষ্য ও সংগ্রাম' (২০০৭), 'রাজনীতির সুস্থধারা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম' (২০০৯), 'শিক্ষানীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গা' (২০০৯), বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও গণতন্ত্রের পথ পরিক্রমা (২০১০) সালে প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকায় ছাত্রদের ওপর **ভাষা**
গুলিবর্ষণ ও হত্যার ফলে সিলেটসহ সারা দেশে গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। **আন্দোলন**

বিবিসি বেতার মাধ্যমে সে সংবাদ রাতেই সিলেটের মানুষ জানতে পারেন। পরদিন হরতালের সঙ্গে হজরত শাহজালাল (র.)-এর দরগায় গায়েবানা জানাজা এবং বিকালে গোবিন্দ পার্কে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিপুলসংখ্যক ছাত্রজনতা এতে মিছিল শেষে অংশগ্রহণ করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল থেকে অনেকে পদত্যাগ করে প্রতিবাদ জানান। সিলেট অঞ্চলের মেধাবী ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতেন। ঢাকায় অবস্থানকারীদের মধ্যে শাহ এস.এম. কিবরিয়া, আব্দুস সামাদ আজাদ, আখলাকুর রহমান, আবুল মাল আবদুল মুহিত, দেওয়ান আহমদ কবির চৌধুরী, রওশন আরা, মোহাম্মদ ইলিয়াছ, মোয়াজ্জেম আহমদ চৌধুরী, সদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী ও জাকারিয়া খান চৌধুরী প্রমুখ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ কারাবরণসহ পুলিশের লাঠিচার্জ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা থেকে সিলেট অঞ্চলের ছাত্ররা এসে ছাত্রজনতাকে আন্দোলনের জন্য সংগঠিত করে স্থানীয় ভাষা সংগ্রামীদের নিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও আন্দোলন ছড়িয়ে দেন। সিলেটের সকল মহকুমাসহ থানাপর্যায়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে। পুলিশ এ সকল আন্দোলনে মারমুখী অবস্থান নিয়ে লাঠিচার্জ করে মিছিল-মিটিং পন্ড করে দিত এবং নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করে নাজেহাল করত।[৪২]

ঔপনিবেশিক আমলে সিলেট ভিন্নভাষী আসাম প্রদেশভুক্ত হওয়ার পর সিলেটের বাঙালিরা আত্মপরিচয় সংকটের মুখে পড়েন, তাই বাংলা ভাষার প্রশ্নে তারা স্পর্শকাতর ছিলেন। ১৯২৭ সালে আসাম প্রাদেশিক পরিষদে সিলেটের গোলাপগঞ্জ থেকে নির্বাচিত সদস্য আব্দুল হামিদ চৌধুরী বাংলা ভাষায় বক্তব্য প্রদান করে সরকারের সিদ্ধান্ত জানতে চান, কিন্তু সরকার বাংলা ভাষার প্রশ্ন উত্থাপনের কারণে উত্তরদানে বিরত থাকে। সিলেটে নির্বাচিত সদস্যগণ দাবি করেন প্রত্যেকেরই মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আছে। তুমুল বিতর্কের পর আব্দুল হামিদ চৌধুরীকে বাংলা ভাষায় বক্তব্য প্রদানের দাবি সরকার মেনে নেয়, ফলে আসাম ব্যবস্থাপনা পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তব্যদানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সিলেটের আব্দুল হামিদ পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সরকারে শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মুসলিম লীগ নেতা দলবলসহ ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। গণবিরোধী এ মন্ত্রীর সময়ে বৃহত্তর সিলেটের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান সরকারি মহিলা কলেজের দায়িত্ব সরকার প্রত্যাহার করে নেয়।[৪৩] তাই সিলেটের জনসাধারণের মধ্যে ধারণা জন্মে তাদের কল্যাণের পরিবর্তে শুধু নিজেদের স্বার্থে মুসলিম লীগের নেতা-মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাদের বশংবদে পরিণত

---

[৪২] তরফদার মুহাম্মদ ইসমাইল, ভাষা আন্দোলনে হবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ২০০০, পৃ. ৩১-৩৮।

[৪৩] মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, ঔপনিবেশিক আমলে সিলেটের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন, সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮।

হয়েছেন। ফলে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রতি সিলেটের সচেতন মানুষের মোহভঙ্গ হয়। যে আবেগ, আশা আর স্বপ্ন নিয়ে সিলেটের মানুষ গণভোটের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তাদের সে স্বপ্নের ইমারত ভেঙে যেতে থাকে।

১৯৫৪ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেরেবাংলা এ.কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত বিরোধী দলীয় যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং ১৯৫৪ সালে শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ববাংলায় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই পাকিস্তানের শাসকচক্র অন্যায়ভাবে এই নির্বাচিত সরকারকে বাতিল করে শাসনতন্ত্রের ৯২(ক) ধারা প্রয়োগের মাধ্যমে কেন্দ্রের শাসন জারি করে।

১৯৫৫ সালে পূর্ববাংলা থেকে ৯২ ক ধারার গভর্নরের শাসন প্রত্যাহারের পর কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠন করেছিলেন। এ সরকারের অযোগ্যতা ও ভ্রান্তনীতির ফলে পূর্ববাংলার সামগ্রিক জনজীবনে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং খাদ্যপরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। ১৯৫৬ সালে সমগ্র পূর্ববাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ৪ আগস্ট ভুখা মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। চরম ব্যর্থতার মুখে তাই আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।

আবু হোসেনের সরকার পতনের পর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন। এ সরকারের আমলে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা স্থাপন করা হয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

সামরিক শাসন ও আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল

১৯৫৮ সালে ইস্কান্দর মির্জা ৮ অক্টোবর সামরিক আইন জারি করেন, ফলে সংবিধান বাতিল হয়ে যায়। সবকটি আইন পরিষদ বিলুপ্ত হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলোও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খানকে দেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। আইয়ুব খান মাত্র একুশ দিনের মাথায় ইস্কান্দর মির্জাকে ব্রিটেনে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়ে দেশের সকল ক্ষমতা অধিকার করে নেন। তিনি ২৭ অক্টোবর স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সেনাবাহিনী দিয়ে সমগ্র দেশ অধিকার করে নেন। শেখ মুজিবসহ বহু রাজনৈতিক নেতা প্রশাসক ও পরিষদসদস্যকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে সর্বত্র এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়।

জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসনকাঠামো ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে নিজের ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য কৌশলে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে এক অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ ব্যবস্থায় ১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারি নির্বাচিত ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য হ্যাঁ-না ভোটের মাধ্যমে প্রহসনের নির্বাচনে পাঁচ বছরের জন্য তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে।

১৯৬৬ সালে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে **৬ দফা দাবি** পেশ করেন। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ছয় দফা দাবির মূল উদ্দেশ্য- *পাকিস্তান হবে একটি Federal বা যৌথরাষ্ট্র এবং ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে এই Federation বা যৌথরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।* পরবর্তী সময়ে এই ৬ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করা হয়।

ছয় দফার দাবিগুলো নিম্নরূপ:

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ সার্বভৌম হবে;

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দুটি বিষয় প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক এবং অপর সব বিষয় ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের হাতে ন্যস্ত থাকবে;

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে তার ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে;

৪. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোনো হারে আদায় করা হবে;

৫. দুই অংশের মধ্যে দেশীয় পণ্য বিনিময়ে কোনো শুল্ক ধার্য করা হবে না এবং রাজ্যগুলো যাতে যে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে সংবিধানে তার বিধান রাখতে হবে;

৬. প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধা-সামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে।

সামরিক শাসন এবং মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘ এক দশক শাসনকালে সারা বাংলায় দুর্বার আইয়ুববিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৯৬৮ সালে সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করে। শত শত নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার ও পাইকারি হারে ধরপাকড় করে কিংবা ১৪৪ ধারা জারি করেও আন্দোলন থামানো সম্ভব হয়নি ১৯৬৯ পর্যন্ত আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে প্রায় শতাধিক লোক মৃত্যুবরণ করেছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২৪ জানুয়ারি সিলেটে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। ধর্মঘটকারী ছাত্ররা বিশাল মিছিল বের করে। সিলেটের প্রত্যন্ত পল্লি অঞ্চলসহ সর্বত্র আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।

সিলেটে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে দেওয়ান ফরিদ গাজী, পীর হাবিবুর রহমান, মোয়াজ্জম আহমদ চৌধুরী, হাবিবুর রহমান, সাদত খান, সিরাজউদ্দিন আহমদ, ড. নুরুল হোসেন চঞ্চল, গুলজার আহমদ, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, পীযূষকুমার রায়, আখতার আহমদ, ইনামুল হক চৌধুরী, আবু হেনা চৌধুরী, নুরুল ইসলাম নাহিদ, লতিফুর রহমান মাহমুদ, আশরাফ আলী, শামসুল হক, শাহ আজিজুর রহমান, রেজওয়ান উদ্দিন, সদর উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুল মুনিম, মকসুদ ইবনে আজিজ লামা প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতারা অবদান রাখেন। ১৯৬৯ সালে দেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়।

সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি অসহায় হয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি প্রদান করে। পরদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ লোকের উপস্থিতিতে গণসংবর্ধনা প্রদান করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুধু পূর্বপাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পশ্চিমেও ব্যাপকতা লাভ করে। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সকল আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে এবং দেশে বিভিন্ন স্থানে অরাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। আইন ও প্রশাসন সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় স্বৈরাচার আইয়ুব খান ২৪ মার্চ ১৯৬৯ সালে সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে চিঠি লিখে ক্ষমতা গ্রহণের আহবান জানান। ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন। পাকিস্তানে পুনরায় সামরিক শাসনের করতলগত হয়। আওয়ামী লীগের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সালের প্রথমদিকে তিনি দেশে রাজনীতিক কার্যকলাপ-বিধি ঘোষণা করেন এবং মার্চ মাসের শেষের দিকে

নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নতুন শাসনতন্ত্রের মূলনীতি রচনা পদ্ধতি (Legal Frame Work Order) এলএফও ঘোষণা করেন।

অবশেষে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর বহুদিনের প্রতীক্ষিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদেও জনগণ এ দলকে অনুরূপ রায় দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি ৮৮টি আসনে জয়লাভ করে। দুই দল দুই অঞ্চলে প্রাধান্য ও আধিপত্য লাভ করে। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে।

১৯৭০ সালে সিলেট অঞ্চলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবকটি আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি আসনের মধ্যে ১৮টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করে।

অধ্যায়-৩
অধিবাসী, সমাজ ও সংস্কৃতি

ধারণা করা হয় যে, সিলেটের আদি বাসিন্দা ছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী লোকজন যারা সমতল ও নিম্নভূমিতে বসতি স্থাপন করেছিল। আবার পাহাড়ি অঞ্চলে জনবসতির ইতিহাস একটু ভিন্ন। এখানে খাসিয়া নামক মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করে। গুপ্ত শাসনের শেষ দিকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে হুন আক্রমণ শুরু হলে ব্রাহ্মণরা সিলেট অঞ্চলে অভিবাসন করে বসতি স্থাপন শুরু করে। সিলেটের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার কোনো কোনো সম্প্রদায়ের লোকজন সমতল ও নিম্নভূমিতে বসতি স্থাপন করতে আগ্রহী ছিল না। ব্রাহ্মণরা আবার কায়িক শ্রম করত না। তাই তাদেরকে রাজন্যবর্গ কর্তৃক দেওয়া সরকারি অনুদানের জমি আবাদ করা ও তাদের সেবা দেওয়ার জন্য অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের এখানে আগমন ঘটে। সপ্তম শতাব্দী থেকে কয়েক শতাব্দীজুড়ে রাঢ় ও বরেন্দ্র-ভূমিতে প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দু জনগণ সিলেট অঞ্চলে বসতি স্থাপন শুরু করে। আবার সপ্তম শতকের শেষে ও অষ্টম শতকের প্রথমভাগে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল শাসন শুরু হলে এ কারণেও অনেক হিন্দু পরিবার সিলেট অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। দশম শতকে চন্দ্ররাজাদের সময়েও এই অঞ্চলে হিন্দু বসতি বৃদ্ধি পায়। আবার ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে অনেক মুসলমান সিলেটে চলে আসে। একই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সিলেটে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিয়মিত আগমন শুরু হয় বলে ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেন। হজরত শাহজালাল (র.)-এর আগমনের পর তা আরও বেড়ে যায়। আবার বাংলায় আফগান শাসনের বিরুদ্ধে মোগল (১৫৭৫ সাল হতে) আক্রমণ শুরু হলে বহু আফগান মুসলমান সেনা সিলেটে পালিয়ে চলে আসে এবং অনেকেই এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।

জনসংখ্যা

সিলেট গেজেটিয়ার ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়, সিলেটের জনসংখ্যা কত হতে পারে এ নিয়ে সর্বপ্রথম অনুমান করেন জন উইলিস। তিনি মনে করেন, ১৮০৮ সালে সিলেটের জনসংখ্যা সর্বমোট ৪,৯২,৪৯৫ হতে পারে। উল্লেখ্য, তখনকার সিলেট বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা এবং ভারতের করিমগঞ্জ জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। ১৮৫৩ সালে মিল-এর রিপোর্টে বলা হয়, জৈন্তাপুরসহ এখানকার জনসংখ্যা ছিল ১৩,৯৩,৫০০। ১৮৬০-৬৬ সাল সময়ে রাজস্ব জরিপ অনুসারে ধারণা করা হয়, জৈন্তিয়া ব্যতীত এ অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল ৭,৯৫,২৭২। তবে ১৮৬৭ সালে সমগ্র জেলার লোকসংখ্যা কমপক্ষে এক মিলিয়ন ছিল বলে অনেকের ধারণা।

ব্রিটিশ আমলে জনসংখ্যা ১৮৭২ সালে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এই জেলার জনসংখ্যা জরিপ করা হয়। তারপর ব্রিটিশ আমলে আরও সাতটি আদমশুমারি সম্পন্ন হয়। এই আদমশুমারিসমূহের প্রধান উপাত্তসমূহ সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

সারণি-১৫

ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন সময়ে বৃহত্তর সিলেটের জনসংখ্যা

ক্র. নং	জরিপ সাল	মোট জনসংখ্যা	ঘনত্ব/প্রতি বর্গমাইল	বৃদ্ধি/হ্রাস
০১	১৮৭২	১৭,১৯,৫৩৯	৩১৯	-
০২	১৮৮১	১৯,৯৬,০০৯	৩৬৮	+১৪.৫%
০৩	১৮৯১	২১,৫৪,৫৯৩	৪০৬	+৯.৪%
০৪	১৯০১	২২,৪১,৮৪৮	৪১৬	+৪.০%
০৫	১৯১১	২২,৪০,৮৩৮	৪৫৯	+১০.৩%
০৬	১৯২১	২২,৯৭,৭২০	৪৭১	+২.৫%
০৭	১৯৩১	২৪,৬৬,৪১০	৫০৫	+৭.৩%
০৮	১৯৪১	২৮,৩১,৯০০	৫৮০	+১৪.৮%

সূত্র: বিভিন্ন আদমশুমারি রিপোর্ট, ১৮৭২-১৯৪১

উপর্যুক্ত আদমশুমারি রিপোর্টসমূহ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রতি দশ বছর অন্তর শুমারি হয়েছিল এবং বিভিন্ন দশকে ভিন্ন ভিন্ন হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে কোনো সময় জনসংখ্যা হ্রাস ঘটেনি। ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে উল্লিখিত লোকজন ২,৮৬,৫৯৪টি খানায় বসবাস করত এবং জেলার মোট আয়তন ছিল ৫,৩৮৩ বর্গমাইল। ১৮৮১ এবং ১৮৯১ সালে জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি ঘটে তার মূল কারণ ছিল অভিবাসন ও জন্মহার বৃদ্ধি। ১৮৯১ সালে দক্ষিণ সিলেটে চা-শিল্প যেখানে বিস্তৃত হয় সেখানে বৃদ্ধির হার ছিল ১৬%; অন্যদিকে হবিগঞ্জে এ হার ছিল ৬% এর নিচে। ১৯০১ সালের জরিপে দেখা যায়, হবিগঞ্জ মহকুমার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৯.৯% এবং সুনামগঞ্জ মহকুমার হার ছিল ৫%। তবে ওই সময়ে সিলেটের দক্ষিণ অংশে জনসংখ্যার হার ৩.৯% হ্রাস পায়। কারণ, এ সময়ে এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মহামারি আকার ধারণ করেছিল। ১৯১১ সালে পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে লোকসংখ্যা ২০৯,৯২৬ জন বৃদ্ধি পায়। ওই সময়ে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)-এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামক দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশ তৈরি হয় এবং মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা বৃদ্ধি পায়। ১৯১১-২১ সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারি আকার ধারণ করে এবং ১৯২১ সালে কিছু অংশে জরিপ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩১ পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ নিলে ১৯৪১ সালের আদমশুমারিতেও এর প্রভাব পড়ে।

ব্রিটিশ আমলে হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যা

১৮৭২ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮,৫৯,২৩৪ এবং ৮,৫৪,১৩১ জন (৪৯.৯৭ : ৪৯.৬৭)। আর অন্যান্য শ্রেণিতে দেখানো হয়েছে ৬,০১৫ জন। পরে এই হার বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত হয়েছে।

সারণি-১৬

সিলেট জেলার হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার হার, ১৮৭২-১৯৫১ (শতকরা হার)

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	হ্রাস/বৃদ্ধি
হিন্দু	৪৯.৯৭	৪৮.২১	৪৭.১৬	৪৬.৮০	৪৪.৪৪	৪৩.২৭	৪০.৮৭	৩৬.৮৮	৩১.৪১	-১৮.৪৬
মুসলমান	৪৯.৬৭	৫১.৫৭	৫২.১৭	৫২.৬৫	৫৫.১৯	৫৬.৪০	৫৮.৮৭	৬০.৭১	৬৭.৭৭	+১৮.১০

উৎস : বিভিন্ন আদমশুমারি রিপোর্টসমূহ, ১৮৭২-১৯৫১

শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা

ব্রিটিশ আমলের আদমশুমারিগুলোতে অনেক উপাত্ত বর্তমান সিলেট বিভাগের চার জেলার সমন্বিত হিসেবে গণনা করা হতো। আবার কিছু বিষয়ের পৃথক তথ্য পাওয়া যায়। ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন আদমশুমারি থেকে এ অঞ্চলের শহর সম্প্রসারিত হওয়ার চিত্র পাওয়া যায়।

সারণি-১৭

সিলেট জেলার ১৮৭২ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত মোট শহুরে জনসংখ্যা

শহর	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১
সিলেট	১৬,৮৪৬	১৪,৪০৭	১৪,০২৭	১৩,৮৯৩	১৪,৪৫৭	১৬,৯১২	২১,৪৩৫	১৮,১২৮	৩২,৭৭৩
সুনামগঞ্জ	-	১,০২০	৩,১৩৯	৩,৫৩০	৪,৬২০	৪,৮৮১	৫,৩২৬	৭,৪৮৪	৮,৪৮২
মৌলভীবাজার	-	১,৮৫৭	২,৬২৯	২,৪৮১	২,৩৬৯	৩,৩৩৪	৪,৩১৪	৫,৮৫৫	৫,৯৪৫
শ্রীমঙ্গল	-	-	-	-	-	-	-	২,৫২৩	৩,০০৬
হবিগঞ্জ	-	৪,০৬১	৪,১৬১	৫,২৩৬	৬,২৪৪	৫,৯১৮	৭,৫৭৭	১১,৮৫৬	১০,৭৮৪
মোট শহুরে জনসংখ্যা	১৬,৮৪৬	২১,৩৪৫	২৩,৯৫৬	২৫,১৪০	২৭,৬৯০	৩১,০৪৫	৩৮,৬৫২	৫৫,৮৪৬	৬০,৯৯০

উৎস : আদমশুমারি রিপোর্টসমূহ, ১৮৭২-১৯৫১

ব্রিটিশ-পরবর্তী সিলেটের জনসংখ্যা

ব্রিটিশ-পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি আদমশুমারির প্রধান উপাত্তসমূহ সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-১৮

পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন সময়ে সিলেটের জনসংখ্যা

ক্র. নং	শুমারি সাল	মোট জনসংখ্যা	ঘনত্ব/প্রতি বর্গমাইল	বৃদ্ধি/হ্রাস
০১	১৯৫১	৩০,৬৬,২৬৯	৬২৮	+৮.২%
০২	১৯৬১	৩৪,৮৯,৫৮৯	৭২৯	+১৪%

উৎস : আদমশুমারি রিপোর্টসমূহ, ১৯৫১-১৯৬১

১৯৫১ আদমশুমারি এ সময়ে দেখা যায়, সিলেট সদর মহকুমা অন্য মহকুমাগুলোর তুলনায় ছিল অধিক ঘনবসতিপূর্ণ। এর মধ্যে বিয়ানীবাজার থানায় সর্বোচ্চ ঘনবসতি এবং জৈন্তাপুর থানায় সর্বনিম্ন ঘনবসতি ছিল। ১৯৩১-১৯৫১ সালে প্রায় সকল থানা এলাকায় শতকরা ২০-৩০ ভাগ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪১-১৯৫১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়। এ সময়ে মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক লোক ভারতে চলে যায় এবং অনেক মুসলমান ভারত হতে সিলেটে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে জনসংখ্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ (১৪,২১৯) নিজেদের 'মোহাজির' বলে দাবি করে। উক্ত আদমশুমারিতে তাদের উল্লেখ করা হয় এভাবে, মোহাজির হচ্ছে তারা যারা ভয়ভীতির কারণে পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তবে এটা নিয়ে বিতর্কও আছে। কারণ, এরকম বৈশিষ্ট্যের অনেকে আবার নিজেদের মোহাজির পরিচয় দিতে নারাজ ছিল।

১৯৬১ আদমশুমারি ১৯৬১ সালের যে আদমশুমারি হয় তাতে দেখা যায়, ১৮,০৮,৪৪৬ জন ছিল পুরুষ এবং ১৬,৮১,১৪৩ জন ছিল মহিলা। জনসংখ্যার দিক থেকে পাকিস্তানের মধ্যে সিলেট জেলার অবস্থান ছিল ষোড়শ এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ছিল ষষ্ঠ। তখন জলাভূমি, হাওর, পাহাড়ধস ও অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক জায়গায় জনসংখ্যার তারতম্য ছিল। যেমন: জামালগঞ্জ, তাহিরপুর, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট থানায় জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্যান্য থানার তুলনায় নিম্ন ছিল। তবে সামগ্রিকভাবে জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১৯৬১ সালের আদমশুমারির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল যা ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে অনুপস্থিত ছিল। জনসংখ্যার বেশিরভাগই ছিল বাঙালি। তবে এদের পাশাপাশি মণিপুরি, ত্রিপুরা, কাছাড়ি, নেপালি ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী ছিল। উক্ত আদমশুমারিতে জনসংখ্যার বিভাজনকে সারণির মাধ্যমে দেখানো যায় :

সারণি-১৯

জনসংখ্যার জাতিগত বণ্টন, ১৯৬১

ক্রমিক নং	জাতিগোষ্ঠীর নাম	সংখ্যা
১	অ-এশীয় (ইউরোপিয়ান)	২৯৯
২	অ্যাংলো-পাকিস্তানি	৩৯
৩	বাঙালি	৩৩,৭২,৩১৫
৪	অসমীয়া	৩৬৫
৫	হিন্দুস্থানি (চা-শ্রমিকসহ)	৮৫,১২৯
৬	নেপালি, বার্মিজ	২১,১৯২
৭	ইরানি	২৩৮
৮	উপজাতি	১০,০১১
	সর্বমোট =	৩৪,৮৯,৫৮৮

সূত্র : সিলেট জেলা গেজেটিয়ার, ১৯৭০

ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা

১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, প্রতি ১০,০০০ জনের মধ্যে ৯,৭১৫ জন বাংলা, ১৩৭ জন উর্দু ও হিন্দি, ২১ জন সাঁওতালি ও খাসিয়া এবং ১ জন আরাকানি ও বার্মিজ ভাষায় কথা বলে। এ কথা সত্য যে, সিলেট অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণ শুদ্ধ বাংলা হতে কিছুটা আলাদা। কারণ, সিলেটের লোকজনের ভাষার মধ্যে অনেক আরবি ও ফারসি শব্দের মিলন ঘটেছে। এ সময়ে সিলেটের গ্রামাঞ্চলের অনেক লোক উর্দু অথবা হিন্দি ভাষায় কথা বলত। ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকজনের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। নিচের সারণির মাধ্যমে তা দেখানো হলো :

সারণি-২০

জনসংখ্যার ভাষাভিত্তিক বণ্টন, ১৯৬১

ক্র. নং	ভাষার নাম	লোকসংখ্যা	ক্র. নং	ভাষার নাম	লোকসংখ্যা
১	বাংলা	৩৩,৭২,৩১৬	১১	ব্রহমী	৫
২	হিন্দি	৭৬,০০৭	১২	কাশ্মিরী	৩৯
৩	সাঁওতালি ও খাসিয়া	১০,০১১	১৩	ইংরেজি	২৯৯
৪	ওড়িয়া	৩,১৬৯	১৪	অসমীয়া	৩৬৫
৫	সিন্ধি	২,৪৮১	১৫	গুজরাটি	৫
৬	আরাকানি	২,১৬৮	১৬	পাঞ্জাবি	৭২
৭	মারাঠী	১,৩৩৯	১৭	ফারসি	১৪৬
৮	উর্দু	১,০২০	১৮	পশতু	৯২
৯	অন্যান্য অসমীয়া-বার্মিজ	১৯,০১২	১৯	বার্মিজ	১২
১০	দক্ষিণ ভারতীয়	১,০৩১			

সূত্র : সিলেট জেলা গেজেটিয়ার, ১৯৭০

অভিবাসন ও সিলেটের জনসংখ্যা

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সিলেটে এমিগ্রেশন এবং ইমিগ্রেশন এর উভয় ধারা লক্ষ করা যায়। ১৯০১ সালের পরও চা-বাগানসমূহে অবাঙালি চা-শ্রমিকের আগমন অব্যাহত ছিল। একই সাথে সিলেটের পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ হতে অনেকে এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করে। আবার অনেক সিলেটবাসী নিজ বাসভূমি ছেড়ে অন্য জেলায় বসবাস শুরু করে। তবে সিলেটে অন্য জেলা হতে আগমনের হার, এখান হতে অন্য জায়গায় গমনের তুলনায় ছিল অনেক বেশি।

সারণি-২১

১৯০১-১৯১১ আদমশুমারি দশকে সিলেটে মাইগ্রেশন

বহিরাগমন	সংখ্যা			আগমন	সংখ্যা		
	মোট	পুরুষ	মহিলা		মোট	পুরুষ	মহিলা
ঢাকা	১৮৬৬	১৫০০	৩৬৬	আসামের বিভিন্ন জেলা	৫৩৯৮	৩১৯৮	২২০০
ময়মনসিংহ	১২০২৯	৫৮৬২	৬১৬৭	ময়মনসিংহ	১৭২১৬	৯২৪০	৭৯৭৬
ত্রিপুরা	৮১৮৭	৩৩৭১	৪৮১৬	ত্রিপুরা	১৫১৫৩	৭৫৮৯	৭৫৬৪
পার্বত্য ত্রিপুরা	২৫৫৪৯	১৩৮১৩	১১৭৩৬	পার্বত্য ত্রিপুরা	২৬৫	১০১	১৬৪
অন্যান্য	৪৬৯৪	৪০২৫	৬৬৯	বাংলার অন্যান্য জেলা	১৮২৯৫	১২১৪৪	৬১৫১
				বাংলার বাইরে থেকে	১০৩১৭১	৫৪৬৭৮	৪৮৪৯৩
				অন্যান্য	৩৯৫৮	২৫৭১	১৩৮৭
মোট	৫২,৩২৫	২৮,৫৭১	২৩,৭৫৪		১৬৩,৪৫৬	৮৯,৫২১	৭৩,৯৩৫

উৎস : L.S.S. O'Malley, Census of India, 1911, vol. V, Bengal pt. II Tables, 110-14.

সারণি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই সময়ে ৫২,৩২৫ জন লোক সিলেট হতে চলে গেলেও ১,৬৩,৪৫৬ জন লোক এখানে এসে বসতি স্থাপন শুরু করে। উল্লিখিত সময়ের পরে দেখা যায়, চা-বাগান ও হাওর অধ্যুষিত স্থানে ইমিগ্রেশন বেশি ঘটায় সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও হয়েছে বেশি। চা-শ্রমিক ছাড়াও ১৮৯০-এর দশক থেকেই ময়মনসিংহ জেলার বারহাট্টা, আটপাড়া, মোহনগঞ্জ, দুর্গাপুর, ইটনা এবং অষ্টগ্রাম থেকে প্রচুর লোক সিলেটে আসতে থাকে। বর্তমানেও এ ধরনের অভিবাসন হচ্ছে।

বর্তমান জনসংখ্যা পরিস্থিতি আগে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে যে সকল আদমশুমারি সম্পন্ন হয়েছে, সেগুলোর যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে সিলেট বলতে বৃহত্তর সিলেটকে বুঝানো হয়েছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এপর্যন্ত পাঁচটি আদমশুমারি সম্পন্ন হয়েছে। এর প্রত্যেকটিতে ক্রমানুসারে সিলেট জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির আভাস পাওয়া যায়। ১৯৫১-২০১১ সময়ে অনুষ্ঠিত আদমশুমারিসমূহে বর্তমান সিলেট জেলার জনসংখ্যা

সারণি-২২

সিলেট জেলার জনসংখ্যা, ১৯৫১-২০১১

ক্রমিক নং	আদমশুমারি সাল	মোট জনসংখ্যা
১	১৯৫১	৯,০০,০২৭
২	১৯৬১	১০,২৭,০৮৪
৩	১৯৭৪	১৪,৭৮,৭০৭
৪	১৯৮১	১৭,৭৭,৭৮৪
৫	১৯৯১	২১,৫৩,৩০১
৬	২০০১	২৫,৫৫,৫৬৬
৭	২০১১	৩৪,৩৪,১৮৮

উৎস : বিভিন্ন আদমশুমারি, ১৯৫১-২০১১

এ কথা সত্য যে, আগেকার আদমশুমারিতে জেলার পরবর্তী একক ছিল মহকুমা, তারপর থানা। কিন্তু ১৯৮৪ সালে মহকুমাস্তর বিলুপ্তি এবং উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় (মাঝে কিছু সময় বাদ দিলে) জেলার পরবর্তী একক হিসেবে উপজেলাকে উল্লেখ করা হয়। স্বাধীনতার আগে জেলায় ১০টি থানা ছিল। পরে ক্রমানুসারে কোম্পানীগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা ও ওসমানীনগরকে উপজেলা ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে থানা ও উপজেলার সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রশাসনিক কার্যক্রম উপজেলাই সম্পন্ন করে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি জরিপে জেলার পরবর্তী একক হিসেবে উপজেলা পরিষদ প্রাধান্য পায়। জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ১৯৯১ এবং দক্ষিণ সুরমা ২০১১ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়। ওসমানীনগর উপজেলা যেহেতু সম্প্রতি (২০১৪) গঠিত হয়েছে, সেহেতু সরকারি জরিপ বা নথিপত্রে এ উপজেলার পৃথক পরিসংখ্যান উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

সারণি-২৩

সিলেট জেলার উপজেলাভিত্তিক জনসংখ্যা, ১৯৯১-২০১১

ক্র. নং	উপজেলা/এলাকা	সাল/জনসংখ্যা		
		১৯৯১	২০০১	২০১১
১	বালাগঞ্জ	২৩০,৮৬৫	২৫৬,২৩৯	৩২০,২২৭
২	বিয়ানীবাজার	১৮১,৫৪৭	২১০,৬৭৩	২৫৩,৬১৬
৩	বিশ্বনাথ	১৬৯,৭৩০	১৮৯,৭৭৫	২৩২,৫৭৩
৪	কোম্পানীগঞ্জ	৮৫,১৬৯	১১৩,৭৮৪	১৭৪,০২৯
৫	দক্ষিণ সুরমা	-	-	২৫৩,৩৮৮
৬	ফেঞ্চুগঞ্জ	৮১,৬০৫	৯৫,১৬১	১০৪,৭৪১
৭	গোলাপগঞ্জ	২২৯,০৭৪	২৬৩,৯৫৩	৩১৬,১৪৯
৮	গোয়াইনঘাট	১৬৯,৯৩৭	২০৭,১৭০	২৮৭,৫১২
৯	জৈন্তাপুর	৯৮,২৭০	১২১,৪৫৮	১৬১,৭৪৪
১০	কানাইঘাট	১৭৮,৬৫৪	২১৬,৪৯৫	২৬৩,৯৬৯
১১	ওসমানীনগর	-	-	-
১২	সিলেট সদর	৫৫৪,৪১২	৬৮২,৪৫৯	৩৪৩,৯৬৫
১৩	সিলেট সিটি করপোরেশন	-	-	৪৮৫,১৩৮
১৪	জকিগঞ্জ	১৭৪,০৩৮	১৯৮,৩৯৯	২৩৭,১৩৭
মোট		২,১৫৩,৩০১	২,৫৫৫,৫৬৬	৩,৪৩৪,১৮৮

উৎস : আদমশুমারি রিপোর্ট, ১৯৯১-২০১১

উল্লিখিত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কিছু উপজেলায় পূর্ববর্তী আদমশুমারি হতে জনসংখ্যা কমেছে। যেমন: সিলেট সদর উপজেলায় ২০০১ সালে যে সংখ্যা দেখা যায়, তা ২০১১ সালে কমেছে। কারণ, ২০১১ সালের আদমশুমারিতে সিলেট সিটি করপোরেশনের জনসংখ্যা পৃথক করে দেখানো হয়েছে। তা ছাড়া, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার জনসংখ্যা অন্য উপজেলা হতে কম

হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, ২০০১ সালের পর দক্ষিণসুরমা উপজেলা গঠিত হয়েছে সিলেট সদর ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার কিছু অংশের সমন্বয়ে।

বর্তমান শিক্ষার হার ও ভোটার সংখ্যা এ কথা সত্য, সিলেট জেলায় শিক্ষিতের হার আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে দ্বিগুণের বেশি লোক শিক্ষিত হয়েছে। তবে কিছু উপজেলায় শিক্ষিতের হার তেমন বাড়েনি। যেমন: কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় শিক্ষিতের হার মাত্র ২৮.৮% (২০১১) এবং গোয়াইনঘাট উপজেলায় ৩২.৭% (২০১১)। সিলেট জেলা শহরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো এমন উপজেলায় শিক্ষিতের হার বেড়েছে। তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রম হচ্ছে বিশ্বনাথ উপজেলা। ধারণা করা হয়, প্রবাসী-অধ্যুষিত এ উপজেলায় জনগণের বিদেশমুখী প্রবণতা শিক্ষিতের হার কম হওয়ার অন্যতম কারণ। সারণির মাধ্যমে সিলেট জেলার উপজেলাভিত্তিক শিক্ষিতের হার ও ভোটার সংখ্যার একটি ধারণা পাওয়া যাবে :

সারণি-২৪

সিলেট জেলার শিক্ষার হার ১৯৮১-২০১১ এবং ভোটার সংখ্যা, ২০১১

উপজেলা/এলাকা	শিক্ষারহার ৭ বছর ও তদূর্ধ্ব (%)				ভোটার সংখ্যা/২০১১ (০০০)
	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	
বালাগঞ্জ	২২.৭	৩১.৪	৪৭.৮	৫০.২	১৬৯
বিয়ানীবাজার	৩১.৪	৪৩.৪	৫২.৫	৫৯.৭	১৩৬
বিশ্বনাথ	২১.৭	৩৩.৬	৩৩.৯	৪৬.৯	১১৪
কোম্পানীগঞ্জ	০৯.৩	১২.৩	২৭.৭	২৮.৮	৭৬
দক্ষিণ সুরমা	-	-	-	৫৬.০	১৪৫
ফেঞ্চুগঞ্জ	৩৩.০	৩৯.০	৪৬.৩	৫০.৫	৫৯
গোলাপগঞ্জ	২৬.৮	৩৩.৭	৪৮.২	৫৭.০	১৭৬
গোয়াইনঘাট	১২.১	১৫.১	২২.৮	৩২.৭	১৪১
জৈন্তাপুর	১৫.৪	২৪.৭	৩৫.১	৪১.২	৭৮
কানাইঘাট	১৪.১	২১.৮	২৯.৬	৪৩.৫	১৩৪
ওসমানীনগর	-	-	-	-	
সিলেট সদর	৩৭.৫	৪৪.১	৫৯.১	৬১.৩	১৭৩
সিলেট সিটি করপোরেশন	-	-	-	৬৭.৮	১৮১
জকিগঞ্জ	২২	৩০.৮	৪৫.২	৪৯.৪	১২৩
সিলেট জেলা	২৫.০২	৩৩.৮৫	৪২.৩৪	৫১.০২	১৭০৫

উৎস : জেলা পরিসংখ্যান ২০১১ সিলেট, বিবিএস।

সারণি-২৫

নগরায়ণ/ শহুরে জনসংখ্যা

সাল	শহুরে জনসংখ্যা
১৯৮১	২৩৩৫৫৯
১৯৯১	৩৩২৪৯২
২০০১	৪৩৩৫৯৮
২০১১	৭৫৩৫৪৯

উৎস : আদমশুমারি রিপোর্ট, ১৯৮১-২০১১

১৯৮১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত আদমশুমারির তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সিলেটেও শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। ২০০১ এবং ২০১১ সালের শহুরে জনসংখ্যার সাথে অন্যান্য শহর (পৌরসভা ব্যতীত উপজেলা হেডকোয়ার্টার)-এর জনসংখ্যা যুক্ত করা হয়েছে।

জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস

ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা

সারণি-২৮ এ ১৮৭২ থেকে ১৯৫১ সালে সিলেটের জনগণের ধর্মভিত্তিক বিন্যাসকে (শতকরা) দেখানো হয়েছে। সেখানে শুধু হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অন্য এক জায়গায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অন্যান্য হিসেবে দেখানো হয়েছে। যাই হোক, সিলেট অঞ্চল তথা সিলেট জেলায় ব্রিটিশ আমলের মাঝামাঝি সময় থেকে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কয়েকটি কারণও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। সারণির মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সিলেটের জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক বিভাজন দেখানো হলো :

সারণি-২৬

সিলেট জেলায় হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা, ১৮৭২-১৯৪১

(লক্ষে)

সিলেট	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
হিন্দু	৮.৫৯	৯.৪৯	১০.১৬	১০.৪৯	১০.৯৯	১১.০	১১.৩৪	১১.৫০
মুসলমান	৮.৫৪	১০.১৬	১১.২৪	১১.৮০	১৩.৬৫	১৪.৩৩	১৬.০৪	১৮.৯২

উৎস : আদমশুমারি রিপোর্টসমূহ, ১৯৮২-১৯৪১

২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য উপস্থাপন করলে সিলেট জেলার উপজেলাভিত্তিক জনসংখ্যার ধর্মীয় বণ্টন পাওয়া যায়।

সারণি-২৭

উপজেলাভিত্তিক জনসংখ্যার ধর্মীয় বণ্টন, ২০১১

উপজেলা/এলাকা	মুসলিম	হিন্দু	খ্রিস্টান	বৌদ্ধ	অন্যান্য	মোট
বালাগঞ্জ	২৯২২৫৬	২৭৮৩২	৫	৪	১৩০	৩২০২২৭
বিয়ানীবাজার	২৪৪৪৫৩	৯১৪৭	৬	২	৮	২৫৩৬১৬
বিশ্বনাথ	২২২৩৯৩	১০০৬৫	৩৪	৭	৭৪	২৩২৫৭৩
কোম্পানীগঞ্জ	১৬০৭৮২	১২৯৫৪	১২	১০	২৭১	১৭৪০২৯
দক্ষিণ সুরমা	২৪৩৪৪১	৯৮৯৯	৪	৬	৩৮	২৫৩৩৮৮
ফেঞ্চুগঞ্জ	৯৩৪৩১	১১২৯৬	৬	০	৮	১০৪৭৪১
গোলাপগঞ্জ	৩০২৪৭৯	১৩৬০৩	২৯	১১	২৭	৩১৬১৪৯
গোয়াইনঘাট	২৬৬৭০৮	১৯৩৩১	৯০৫	২৬৯	২৯৯	২৮৭৫১২
জৈন্তাপুর	১৪৭১৪০	১৩৮৮৭	১৯৯	৩	৫১৫	১৬১৭৪৪
কানাইঘাট	২৫৪৯৪০	৮৭৩০	২৪৮	৬	৪৫	২৬৩৯৬৯
সিলেট সিটি করপোরেশন	৪২৩৩২৪	৬০৭৪৯	৪৪৪	২৭৭	৩৪৪	৪৮৫১৩৮
সিলেট সদর	৭৩৮৯৫৮	৮৮০৭১	৯৮৮	৩২৮	৭৫৮	৮২৯১০৩
জকিগঞ্জ	২১৩৭৮৫	২৩৩৩৯	১১	১	১	২৩৭১৩৭
মোট	৩১৮০৭৬৬	২৪৮১৫৪	২৪৪৭	৬৪৭	২১৭৪	৩৪৩৪১৮৮

উৎস: জেলা পরিসংখ্যান ২০১১ সিলেট, বিবিএস।

সারণি থেকে দেখা যায়, সিলেট সিটি করপোরেশন ও সিলেট সদর এলাকায় অন্যান্য উপজেলা থেকে হিন্দু জনসংখ্যা বেশি রয়েছে। অনেক উপজেলায় আদিবাসী রয়েছেন যারা কেউ কেউ খ্রিস্টান বা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। ১৯৬১ সালের আদমশুমারির সাথে ২০১১ সালের আদমশুমারির তুলনা করলে দেখা যায়, সিলেট জেলায় উক্ত সময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হিন্দু জনগোষ্ঠী হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ উদ্ঘাটনে ভবিষ্যৎ গবেষণা প্রয়োজন।

সামাজিক বিন্যাস :

মুসলিম সমাজ

সিলেট জেলার প্রায় সকল মুসলমানই সুন্নি সম্প্রদায়ের। তবে বৃহত্তর সিলেটে কিছু জায়গায় শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানও রয়েছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সিলেটে কিছু জাতিভেদ থাকলেও সেটা প্রাত্যহিক জীবনে খুব বেশি প্রভাব না রাখায় তা তেমন বিবেচনায় আসে না।

মুসলমানরা আচার আচরণ ও ধর্মে এক হলেও বিভিন্ন বংশের একেকটি পদবি আছে। আবার সামাজিক বন্ধনে ধর্ম এক হলেও অন্যান্য কিছু বিষয়ে (যেমন: বিবাহ বা আচার-অনুষ্ঠানাদি) বৈষম্য রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে শেখ, সৈয়দ, পাঠান ও মোগল প্রধান। সিলেটে সৈয়দ পদবিধারী কিছু মুসলমান রয়েছেন

যারা নিজেদের উঁচ শ্রেণির বলে মনে করেন। এর বাইরেও নিম্নশ্রেণির অনেক জাতি রয়েছে। যেমন: গাইন, মীর শিকারি, মাহিমাল (মৎস্যজীবী), বেজ, জোলা (বস্ত্র বয়নকারী), নাগারছি (বাদ্যকর) প্রভৃতি। এদের মধ্যে অনেক জাতি বিদেশ থেকে আগত। গাইনের ব্যবসা গান করা ও পুঁতির মালা বিক্রয়। জোলারা বস্ত্র বয়ন করেন। মীর শিকারি ও বেজের ব্যবসা, পক্ষীশিকার, সর্পক্রীড়া, বানর ও ভল্লুক নাচানো পেশা ছিল। বর্তমানে এদের একদল ছাতা মেরামত, সেলাই ও অন্যেরা মনিহারি দ্রব্য ফেরি করে বিক্রি করে থাকেন। কেউ কেউ আবার বড়ো ব্যাবসা করেন। সংখ্যায় কম হলেও সিলেট জেলায় পেশাভিত্তিক আরও কিছু সম্প্রদায় যেমন হাজাম, কামার, মিস্ত্রি ইত্যাদি রয়েছে। তবে আধুনিক আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণায় মুসলমানদের মধ্যে পদবি ও পেশাভিত্তিক মর্যাদায় বৈষম্য বিভেদ অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে।

হিন্দু সমাজ

হিন্দু ধর্মের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে জাতিভেদ প্রথা প্রবল থাকার কারণে বর্ণপ্রথা বললেই হিন্দু ধর্মের কথা বোঝানো হয়। একাডেমিক ঘরানায় হিন্দু ধর্মের যে চারটি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) কথা উল্লেখ করা হয়, বাস্তবে তা অনেক বিস্তৃত। হিন্দুস্তানের মতো সিলেটেও হিন্দু ধর্মের পেশাভিত্তিক বিভিন্ন জাতি ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বর্তমান, যেমন: ব্রাহ্মণ (পূজারি), ক্ষত্রিয়, আচার্য (জ্যোতিষী), বৈদ্য (ডাক্তার), কায়স্থ (লেখক), গন্ধবণিক (মিষ্টান্নবিক্রেতা), কাঁসারি (তাম্রকার), ঘোষ (দুধবিক্রেতা), তেলি (তেল বিক্রেতা), নাপিত (চুল কর্তনকারী), বারই (পান উৎপাদনকারী), ফুলমালি (ফুল সাজসজ্জাকারী), কুরি (মিষ্টি তৈরিকারক), কামার (লৌহজাত জিনিস তৈরিকারক), কুমার (মাটির জিনিস তৈরিকারক), তাঁতি (কাপড় তৈরিকারক), হালওয়ার্দাস (চাষি), কুশিয়ারী (গুড় তৈরিকারক), সোনা বণিক (স্বর্ণের জিনিস তৈরিকারক), নট (গালার কাজ করে), মাহরা (পালকি বহনকারী), কৈবর্ত, মালো, থালো ও টিওর (সকলেই মৎস্যজীবী), ছুতার (মিস্ত্রি), ধোপা (কাপড় ধৌতকারী), যোগী (বুননকারী), শাহু (চোলাইয়ের কাজ করে), শংকরি, মালি (বাগানে কাজ করে), পাটনি (ফেরিচালক/মাঝি), রাহু, নমশূদ্র, ডুকলা, মুচি।

সিলেটে নারীশিক্ষার পটভূমি ও বর্তমান অবস্থা

১৮৭৬-৭৭ সালে সিলেটে নারীশিক্ষার জন্য কোনো স্কুল ছিল না। তখনকার সচেতন অবিভাবকরা মেয়েদের নিজেদের বাড়িতেই সামান্য শিক্ষা দিতেন। উক্ত সময়ে সিলেটের প্রথম এম. এ. ডিগ্রিধারী জয়গোবিন্দ সোমের নেতৃত্বে কলকাতায় 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' গঠিত হয়। এ সম্মিলনীর মাধ্যমে মূলত কলকাতায় অধ্যয়নরত সিলেটের ছাত্ররা এখানের অন্তঃপুরের মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। ১৯০৩ সালে শ্রীহট্টের তৎকালীন স্পেশিয়েল সাব রেজিস্ট্রার রাজচন্দ্র চৌধুরীর শিক্ষিত পত্নী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণীর প্রচেষ্টায় বর্তমান বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে বালিকাদের জন্য একটি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। অবশ্য এর আগে ১৮৮৬ সালে ওয়েলস প্রেসবিটারিয়ান মিশন সিলেটে প্রতিষ্ঠা করেন মিশন বালিকা বিদ্যালয়, যা পরে মীরাবাজারে

কিশোরীমোহন বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯২৮ সালে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মাধ্যমিক ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৩৫ সালে সিলেটের শেখঘাটে প্রতিষ্ঠিত হয় মইনুন্নেসা প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৩৯ সালে পাইলগাঁওয়ের জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বসন্তকুমার দাস, বৈদ্যনাথ মুখার্জি, রায় বাহাদুর ধর্মদাস দত্ত এবং এ. এ. আবদুল হাফিজ প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা কলেজ, সিলেট মহিলা কলেজ (বর্তমানে, সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ)। বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নারীর শিক্ষায় অনেক অবদান রাখছে। তা ছাড়া, মুরারীচাঁদ কলেজ, মদনমোহন কলেজ, ওসমানী মেডিকেল কলেজ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে যেখানে বর্তমানে সিলেটের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শিক্ষিত হচ্ছেন। বিভিন্ন আদমশুমারিতে সিলেট জেলার নারীশিক্ষার যে হার দেখা যায়, বর্তমানে এ হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে।

সারণি-২৮

সিলেট জেলায় নারীশিক্ষার হার, ১৯৭৪-১৯৯১

ক্র. নং	সাল	হার (শতকরা)
১	১৯৬১ (৫ বছর +)	১০.০
২	১৯৭৪ (৫ বছর+)	১২.৬
৩	১৯৮১ (৫ বছর+)	১৩.১
৪	১৯৯১ ((৭ বছর+)	২৭.৫
৫	২০০১ (৭ বছর +)	৪১.৬
৬	২০১১ (৭ বছর +)	৪৮.৯

সূত্র : আদমশুমারি রিপোর্ট ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০১১

সারণিতে দেখা যায়, ১৯৭৪ সালের পর ১৯৮১ সালে সিলেটে নারীশিক্ষার হার খুব কম বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে অভিভাবকদের অসচেতনতা বা কম সচেতনতাকে দায়ী করা যায়। তবে ১৯৯১ সালে সিলেটে নারী শিক্ষা সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি পায়। নব্বইয়ের দশকের পর সরকার কর্তৃক মেয়েদের শিক্ষার বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করায় তারপর উল্লেখযোগ্য হারে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। সিলেট জেলার উপজেলাভিত্তিক নারী শিক্ষিতের হার সারণি থেকে পাওয়া যায় :

সারণি-২৯

সিলেট জেলায় নারীশিক্ষার হার (উপজেলাভিত্তিক), ২০০১ ও ২০১১

উপজেলা/এলাকা	শিক্ষিতের হার (৭+)	
	২০০১	২০১১
বালাগঞ্জ	৪৫.১৯	৪৯.৩
বিয়ানীবাজার	৪৯.৫৬	৫৭.৯

উপজেলা/এলাকা	শিক্ষিতের হার (৭+)	
	২০০১	২০১১
বিশ্বনাথ	৩৬.৩১	৪৮.৭
কোম্পানীগঞ্জ	১৮.৩	৩০.৯
দক্ষিণ সুরমা	৫৪.৪২	৫৭.৭
ফেঞ্চুগঞ্জ	৪৮.৯৭	৫১.২
গোলাপগঞ্জ	৪৫.৬৪	৫৮.২
গোয়াইনঘাট	১৮.২৯	৩৫
জৈন্তাপুর	৩০.৩৪	৪৩.৬
কানাইঘাট	৩৪.৪৩	৪৫.৮
সিলেট সিটি করপোরেশন	-	৭১.১
সিলেট সদর	৬৩.০৯	৬৪.৬
জকিগঞ্জ	৪০.৪৬	৫১.৯
সিলেট জেলা	৪১.৬	৪৮.৯

উৎস : জেলা পরিসংখ্যান ২০১১ সিলেট, বিবিএস।

নারীর ক্ষমতায়ন

শিক্ষার পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করেছে। সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন: বয়স্ক ভাতা প্রকল্প, উপবৃত্তি প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, ভিজিডি, ভিজিএফ-এর মাধ্যমে নারীদের সহায়তা করছে। এই সহায়তা নারীর পরিবারকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করছে তেমনি তাকে আর অবহেলিত হতে হচ্ছে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিবারে নারী অবদান রাখতে পারছে। সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন হচ্ছে, নারীরা স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে জাতীয় সরকারের অংশ হয়ে গেছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে (৭ম ও ৯ম সংসদ) সিলেটের নারীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। দু-বারই সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দা জেবুন্নেসা হক। বর্তমানে সিলেট জেলার সিলেট সিটি করপোরেশন মহিলা কাউন্সিলর হিসেবে ৯জন, ১০টি উপজেলায় ১০জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, ৪টি পৌরসভায় ১২ জন মহিলা কাউন্সিলর, ১০৫টি ইউনিয়নে ৩১৫ জন মহিলা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মহিলা কমিটিতে নারীরা কাজ করছেন।

সিলেট জেলায় নারীর ক্ষমতায়নে আরও একটা বড়ো ভূমিকা রেখেছে বিভিন্ন বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সরকারি হিসাব (২০১৪) মতে, সিলেট জেলায় ৫৫টি সংস্থা কাজ করে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে, নারীদের গ্রুপের সদস্য হিসেবে অথবা প্রশিক্ষণ দিয়ে নারীদের ঋণ প্রদান করে। এরা পরবর্তী সময়ে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কাজ করে এবং তাদের কর্মতৎপরতায় নারী ক্ষমতায়িত হয়। এসকল স্থানে বিপুলসংখ্যক নারী চাকরিতে নিয়োজিত আছেন।

জেলা ও উপজেলায় নারী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প/ব্যবসা পরিচালনা করেন এটা সিলেটে ক্রমবর্ধমান একটি দৃশ্য।

জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান। সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৫১০ জন। ৩ মাস মেয়াদী ৫টি ট্রেডে মোট ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে (৪ ব্যাচে) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং উপস্থিতি হারে দৈনিক ৬০/- টাকা ভাতা প্রদান করা হয়।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সিলেটের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মণিপুরি, খাসিয়া, পাত্র, গারো, উরাং (ওঁরাও), মাল (মালো) এবং বিভিন্ন চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী। সিলেটের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিবরণী দেওয়া হলো:

মণিপুরি বাংলাদেশে মণিপুরিদের বসতি স্থাপনের ইতিহাস ততটা প্রাচীন নয়। ১৮১৯ সাল থেকে ১৮২৬ সাল- এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোকজন বসতি স্থাপন করে। মণিপুর রাজ্যে বার্মাবাহিনীর চালানো ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রেহাই পেতে এদেশে তাদের আগমন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা গম্ভীর সিংহ মণিপুর পুনর্দখল করলেও বাংলাদেশে বসতি স্থাপনকারী সকল মণিপুরি আর স্বদেশে ফিরে যায়নি ।

একসময় ঢাকার তেজগাঁও মণিপুরি পাড়া, ময়মনসিংহের দুর্গাপুর, কুমিল্লা জেলার কসবা এবং সিলেট অঞ্চলে মণিপুরি সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। তবে কালের বিবর্তনে সিলেট বিভাগ ছাড়া দেশের অন্য কোনো স্থানে এখন আর মণিপুরিদের বসবাস নেই। সিলেট বিভাগে আনুমানিক চল্লিশ হাজার মণিপুরি বসবাস করছেন। সিলেট জেলার ৩টি উপজেলায় বসবাসকারী মণিপুরির সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। সিলেট সদর উপজেলায় মণিপুরিদের ১৩টি, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ৩টি ও গোয়াইনঘাট উপজেলায় ১টি গ্রাম রয়েছে।

মণিপুরিদের ৩টি সম্প্রদায় সুদীর্ঘকাল ধরে এইসব অঞ্চলে বসবাস করছেন। সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে : (১) মৈতৈ, (২) বিষ্ণুপ্রিয়া এবং (৩) পাঙান (মণিপুরি মুসলিম)। এই তিনটি সম্প্রদায়ের মণিপুরি পরিবারসমূহ স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতি লালন করে সিলেটে বাস করছেন। সিলেট সদর উপজেলায় অবস্থিত পাড়াগুলো হচ্ছে- মণিপুরি রাজবাড়ি, মাছিমপুর, লামাবাজার, শিবগঞ্জ, কেওয়াপাড়া, আম্বরখানা, নয়াবাজার, লালাদিঘিরপার, সাগরদিঘিরপার, বাগবাড়ি, বড়োবাজার, সুবিদবাজার ও দক্ষিণগাছ। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ৩টি গ্রামে মণিপুরিরা রয়েছে। গ্রামগুলো হচ্ছে- মাঝেরগাঁও (বরম), নয়া বালুচর ও পুরান বালুচর, গোয়াইনঘাটে অবস্থিত গ্রামের নাম বিছানাকান্দি (লাখাত)।

মণিপুরিরা ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুর থেকে সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। যেখানে তারা বসতি স্থাপন করেছে সেখানেই পাশাপাশি কয়েকটি পরিবার ঘরবাড়ি তৈরি করে পাড়া বা গ্রাম গড়ে তোলে। মণিপুরিদের প্রতিটি পাড়া বা গ্রামে কমপক্ষে দু-একটি দেবমন্দির বা মণ্ডপ রয়েছে। দেবতার পূজা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য দু-একটি ব্রাহ্মণ বা

পুরোহিত পরিবার থাকেন। গ্রাম বা পাড়ার মন্ডপকে কেন্দ্র করে মণিপুরিদের সকল ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। প্রতিটি গ্রামে থাকেন একজন গ্রামপ্রধান, আবার কয়েকটি গ্রাম বা পাড়া মিলে গঠিত হয় পঞ্চায়েত সভা। পঞ্চায়েত সভার সভাপতি নির্বাচিত হন জ্ঞানী গুণী একজন ব্যক্তি। আর পঞ্চায়েত সভার কার্য পরিচালনার জন্য কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তিকেও নির্বাচন করা হয়। মৈতৈ সম্প্রদায়ের রয়েছে সাতটি গোত্র। এগুলো হলো : খুমন, আঙোম, মোইরাং, নিংথৌজা, লুওয়াং, চেংলৈ ও খাবা-ঙানবা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিদের রয়েছে পাঁচটি গোত্র। এগুলো হলো : খুমল, মোইরাং, আঙোম, লোয়াং ও মাঙাং। পাঙান মণিপুরিদের মধ্যে ময়চিং, ইফাম, থৌবাল, কইনৌ, সাজবম ইত্যাদি বেশ কিছুসংখ্যক গোত্র রয়েছে।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে মণিপুরিদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। [রণজিত : ১৯৯৭ : ৩৪] কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় কয়েকজন মণিপুরী মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। তার মধ্যে নীলকান্ত সিংহ, ব্রজমোহন, নন্দলাল, দিনমণি, হীরেন্দ্র ও ধনো সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। সিলেট শহরের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে নীলমণি সিংহ, আদিত্য শর্মা, অবনী কুমার, দীলিপ কুমার, কিরণ সিংহ, জীতেন সিংহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মৈতৈরা নৃতাত্ত্বিকভাবে মঙ্গোলীয় পরিবারের তিববত-ব্রহ্ম শাখার অন্তর্গত।[১] আর বিষ্ণুপ্রিয়ারা আর্য পরিবারের ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার অন্তর্গত।

মণিপুরি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মের অনুসারীও রয়েছে। তারা পাঙান হিসেবে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে ‘বাংলাদেশের মণিপুরী সম্প্রদায়’ প্রবন্ধে সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান উল্লেখ করেছেন : ‘কথিত আছে যে, ভারতবর্ষের কোনো এক অঞ্চলের জনৈক পাঠান মুসলিম ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে মণিপুর গিয়েছিলেন। তাঁদের একজন এক মৈতৈ মণিপুরি মেয়ের সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ হন এবং তাঁকে বিবাহ করে সন্তানাদিসহ সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। মা মৈতৈই ও পিতা পাঠান মুসলিম বংশোদ্ভূত সম্প্রদায়কে পাঙান জাতি বলে। তাদেরকে মণিপুরি মুসলিমও বলা হয়। তারা মায়ের ভাষায় কথা বলে এবং পিতার ধর্ম পালন করে। তারা পেঁয়াজ, রসুন ও মাংসভোজী। তাদের মেয়েরাও বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈই মেয়েদের মতো নিজস্ব উৎপাদিত পোশাকপরিচ্ছদ পরিধান করে।[২]

নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে মণিপুরি ভাষার। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম অনুযায়ী করা হয়েছে বর্ণমালার নামকরণ। ঐতিহাসিকদের মতে, মণিপুরি লিপির প্রবর্তক মহারাজা পাখংবা (রাজত্বকালের সূচনা ৩৩ খ্রি.)। লিপির প্রাথমিক

---

[১] E. A. Gait; The History of Assam; Calcutta, 1905 (Reprint-1967), Page – 321.

[২] হাজী মুহম্মদ আব্দুস সামাদ, ডিসেম্বর ২০১৭, মনিপুরি মুসলমানদের ইতিবৃত্ত, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা নং-৭১।

সংখ্যা ছিল ১৮টি। বর্তমানে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭টি। এক সময়ে মণিপুরি বর্ণমালার স্থান গ্রহণ করে বাংলা বর্ণমালা। বর্তমানে সাবেক মণিপুরি বর্ণমালা পুনঃ প্রচলনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, মণিপুরী ভাষার বয়স প্রায় ৩৪ শ বছর। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য কৃষ্ণ-যজুর্বেদের পরেই মণিপুরি সাহিত্যের স্থান। পূর্বভারতে বাংলা এবং অসমীয়ার পর পরই মণিপুরি ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থান।

মণিপুরিদের মধ্যে দুটি ভাষা প্রচলিত রয়েছে। মৈতৈ সম্প্রদায়ের ভাষার নাম মণিপুরি ভাষা। এ ভাষা তিববত-ব্রহ্ম ভাষা পরিবারের কুকী চীন গোষ্ঠীর অন্তর্গত। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিদের ভাষার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি। এ ভাষা মণিপুরের বিষ্ণুপুর অঞ্চলে জন্ম এবং তা ইন্দো-আর্য ভাষা পরিবারের পূর্বাঞ্চলীয়, মধ্য ইন্দো আর্য পরিবার থেকে পরিপুষ্ট হয়। এই ভাষা বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার সহোদরা স্থানীয়। বাংলাদেশে উভয় ভাষার একটি অগ্রসরমান সাহিত্য বাংলা বর্ণমালায় গড়ে উঠেছে। উভয় ভাষার কবি সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন ভাষা সাময়িকী ও গ্রন্থ প্রকাশনার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র থেকে মণিপুরিদের জন্য স্বতন্ত্র সাপ্তাহিক ‘মৃদঙ্গা অনুষ্ঠান’ ১৯৭৬ সাল থেকে প্রচারিত হচ্ছে। মৃদঙ্গা অনুষ্ঠানে এক সপ্তাহ মৈতৈ ও অপর সপ্তাহ বিষ্ণুপ্রিয়া- এভাবে উভয় ভাষাভাষী সম্প্রদায় পর্যায়ক্রমে সমতার ভিত্তিতে অনুষ্ঠানমালা প্রচার করছেন। এতে মণিপুরি উভয় ভাষা পরিবারের স্বীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠান, সংগীত ও সাহিত্- সংস্কৃতির সুষ্ঠু   বিকাশ ও পরিস্ফুনের সুযোগ পায়।

মণিপুরি নৃত্য ও সংস্কৃতি এদেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। মণিপুরি সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান রাসনৃত্যের খ্যাতি ও পরিচিতি দেশ-বিদেশে বহুলভাবে প্রশংসিত। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেট ভ্রমণকালে মাছিমপুর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি পাড়ার মন্ডপে এসে মণিপুরি নৃত্য দর্শন করে মুগ্ধ হন এবং পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে মণিপুরি নৃত্য শিক্ষা বিভাগ চালু করেন। প্রতিবছর কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মাধবপুর জোড়া মন্ডপে, আদমপুরে ও ছয়শ্রী মন্ডপে মহারাসলীলা সাড়ম্বরে পালিত হয়।

মণিপুরিদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কমলগঞ্জ উপজেলায় মণিপুরি ললিতকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১০ সালে প্রণীত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন’ মহান জাতীয় সংসদে পাস হলে এটি সরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায় (বাংলাদেশ গেজেট, ঢাকা, এপ্রিল ১২, ২০১০)।

তা ছাড়া আষাঢ় মাসে মণিপুরি মণ্ডপসমূহে নয় দিনব্যাপী রথযাত্রা উৎসব পালন করা হয়। ঝুলনযাত্রাও অনুরূপভাবে পালিত হয়। মণিপুরি বস্ত্রশিল্প তথা তাঁতে

বোনা কাপড় টেকসই ও ডিজাইনের দিক দিয়ে উন্নত। শাড়ি, গামছা, বেড কভার, খেস ইত্যাদি মণিপুরীদের তাঁতে বোনা কাপড় নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারজাত হচ্ছে এবং এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মণিপুরিরা প্রধানত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী এবং তারা মাংসাহারী নয়। তবে মৈতৈদের কিছুসংখ্যক প্রাচীন ধর্ম আপোকপা বা সানামাহী লাইনীং ধর্মে বিশ্বাস করেন। পাঙান মণিপুরীরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। সিলেটের খাদিমনগরে দক্ষিণ গাছে তাদের একটি পাড়া রয়েছে। মণিপুরীদের উচ্চ শিক্ষার হারও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলের মণিপুরিরা প্রধানত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ের আদর্শ কৃষক যাদব সিংহ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে কৃষি উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন। শহরাঞ্চলের মণিপুরিদের প্রধান পেশা স্বর্ণশিল্প এবং মটর মেকানিক।

বয়স্ক মণিপুরীরা ধুতি পাঞ্জাবি পরিধান করেন। অন্যরা শার্ট, প্যান্ট পরিধান করে। গ্রামাঞ্চলে নিজেদের তাঁতে বোনা বড়ো গামছা ও ধুতি পরিধান করে। মণিপুরি মেয়েরা তাঁতে বোনা ফানেক বা লাহিঙ পরিধান করে ও নিজেদের তৈরি পাতলা ইন্নাফি ওড়না বিশেষ রূপে ব্যবহার করে থাকে। ইন্নাফি বিভিন্ন ডিজাইনের করা হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে মণিপুরি মেয়েরা চাকচাবি বা লৈফানেক নামে এক ধরনের কারম্নকার্যময় পোশাক পরিধান করে।

খাসিয়া

সাধারণভাবে ‘খাসিয়া’ নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত নাম ‘খাসি’। খাসিদের গ্রামগুলোকে ‘পুঞ্জি’ বলা হয়। সিলেট জেলায় খাসিদের ১৪টি গ্রাম বা পুঞ্জি আছে। এগুলো হলো: জৈন্তাপুর উপজেলায়- ১. মোকামপুঞ্জি, ২. বড়োলা পুঞ্জি, ৩. জৈন্তাপুর পুঞ্জি, ৪. সোনাটিলা, ৫. করমফুম, ৬. লালাখাল, ৭. লোভাছড়া ও ৮. সাদিছড়া; গোয়াইনঘাট উপজেলায়- ১. সেনরেম পুরান (সংগ্রাম পুঞ্জি), ২. সেনরেম নতুন, ৩. নকশিয়ার পুঞ্জি, ৪. লামা পুঞ্জি ও ৫. প্রতাপপুর পুঞ্জি[৩] এবং কানাইঘাট উপজেলায়: ১. দোনা পুঞ্জি (তথ্যসূত্র : বনিফাস খংলা)। প্রত্যেক পুঞ্জিতে একজন প্রধান বা হেডম্যান থাকেন, তাকে ‘মন্ত্রী’ বলা হয়। সিলেট জেলায় খাসি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আনুমানিক ৩,০০০ জন। খাসিয়ারা এই অঞ্চলের খুব প্রাচীন অধিবাসী। তাদের নৃতাত্ত্বিক উৎস এবং আদি নিবাস নিয়ে কিছুটা মতোদ্বৈততা আছে। তবে তাদের বর্তমান মূল বাসভূমি খাসিয়া ও জৈন্তিয়া হিলস। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ‘মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর আগমনের আগেই আসাম ও পূর্ববঙ্গে অস্ট্রিক ভাষাভাষী লোক বাস করতো। তিনি অভিমতো দেন যে, খাসিরা হচ্ছে মঙ্গোলীয় ও অস্ট্রিক মানবগোষ্ঠীর

---

[৩] রুশ পতাম, ২০০৫; খাসিয়াদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি; সিলভানুস লামিন, ঢাকা, পৃ. ১৮৮।

সংমিশ্রণ। তিনি যুক্তি দেন যে, খাসিরা জাতিগতভাবে মঙ্গোলয়েড কিন্তু ভাষাগত দিক থেকে অস্ট্রিক।'[৪] তাদের ভাষার নামও খাসি। এই ভাষা অস্ট্রিক পরিবারের মন-খুমের শাখার অন্তর্গত। কোল, মুন্ডা, সাঁওতালদের ভাষার সাথে সাদৃশ্য আছে। নিজস্ব বর্ণমালা নেই। রোমান বা বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করে লেখে। খাসি জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাসি ভাষা ছাড়াও সিন্টেং, ভয়, মিকির ইত্যাদি ভাষাও প্রচলিত। তবে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রধান ভাষা হিসেবে প্রচলিত হলো খাসি ভাষা। খাসি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশ ক'টি গোত্র বিভাজন আছে। এই গোত্রগুলো হলো : দিয়েংগো, যাপাং, খার, খং, খাইরিয়েম, লিংডো, মাজাও, নং, পাংখন, রাংবাহ, উয়াহালাং প্রভৃতি। প্রতিটি গোত্র আবার অনেক উপগোত্রে বিভক্ত।[৫]

ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে খাসিয়ারা অধিকাংশই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী, প্রায় ৯২%। তবে এখনও প্রায় ৮% লোক তাদের আদি ধর্ম প্রকৃতি পূজার অনুসারী।[৬] খাসিয়ারা মাতৃসূত্রীয়। ছেলেমেয়েরা সবাই মায়ের পদবি ধারণ করে এবং মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হয়। মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠা মেয়ে মায়ের সম্পত্তির অধিকার পায়। সন্তান মেয়ে না থাকলে ছেলেরা সম্পত্তির অধিকারী হয়। বিয়ের সব অনুষ্ঠান মেয়ের বাড়িতে হয় এবং বিয়ের পর ছেলে মেয়ের বাড়িতে থেকে যায়। এটাই সাধারণ নিয়ম। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু পরিবর্তনও এসেছে। শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের পর মেয়েরা ছেলেদের বাড়িতে বা আলাদা বসবাস করে।

খাসিয়া জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা পানচাষ ও এ সংক্রান্ত ব্যবসা। তবে এখন অন্যান্য পেশায় ছড়িয়ে পড়ছে খাসিরা। শিক্ষার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই এই জনগোষ্ঠী। বর্তমান সময়ের অনেক ছেলেমেয়ে উচ্চতর শিক্ষার দিকে ঝুঁকছেন। তবে কারিতাসের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় বড়োলা ও লামা পুঞ্জিতে ২টি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে খাসি ভাষায় পাঠদান করা হয়।[৭] ধর্মীয় বিশ্বাসে প্রধানত খ্রিস্টান বলে খ্রিস্টান ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো ব্যাপকভাবে উদযাপিত হয়। তবে এখনও প্রাচীন ধর্ম তথা প্রকৃতিপূজার অংশ হিসেবে কিছু অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে। এরকম একটি অনুষ্ঠান হলো 'সাড সুর্ক মেনসিম', যার শাব্দিক অর্থ 'মনের আনন্দে নাচ'। ফসল উঠানোর পর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ ঐতিহ্যবাহী নাচের পোশাক পরে নাচ ও গান পরিবেশিত হয়। তবে তাদের সবচেয়ে বড়ো নৃত্যানুষ্ঠানের নাম 'নংখ্রেম নাচ'।

---

[৪] মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পা.); ২০১০; বাংলাদেশের আদিবাসী: এথনোগ্রাফিয় গবেষণা, দ্বিতীয় খণ্ড; উৎস প্রকাশন/ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, পৃ. ২৯০।

[৫] মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য (সম্পা.); ২০০৭; আদিবাসী জনগোষ্ঠী; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৩৭১।

[৬] সাক্ষাতকার: বনিফাস খংলা, কর্মকর্তা, কারিতাস, সুরমাগেইট, খাদিমনগর, সিলেট।

[৭] ওই।

বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান হিসেবে এটি সর্বজনীনভাবে আয়োজন করা হয়। খাসি মহিলারা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে থাকে। তারা বড়ো মাপের একপ্রস্থ কাপড় দিয়ে সারা শরীর ঢাকে, এটাকে বলে 'জইনসেম'; আর মাথায় যে পাগড়ি বাঁধে তাকে বলে 'থাপমু'।

পাত্র

পাত্র জনগোষ্ঠীর প্রকৃত নাম 'লালেং'। প্রাচীন বিভিন্ন রেকর্ডে লালেং নামেরই উল্লেখ পাওয়া গেছে। পাত্র ভাষায় লালেং শব্দের অর্থ 'পাথর'। এই পাথর থেকেই 'পাত্র' নামটি এসেছে। পাত্ররা বৃহত্তর 'বোড়ো' জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে পন্ডিতগণ অনুমান করেন।[৮] এখনও অনেকে তাদের 'পাথর' বা 'পাতর' বলেও উল্লেখ করে থাকেন। বাংলাদেশে একমাত্র সিলেট জেলাতেই পাত্র জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। সিলেট জেলার সিলেট সদর, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৩২টি গ্রামে পাত্র জনগোষ্ঠীর বসবাস। এর মধ্যে সদর উপজেলা এবং গোয়াইনঘাট উপজেলাতেই তাদের জনবসতি বেশি এবং এই সংখ্যা প্রায় ৯০%। নেতৃস্থানীয় পাত্রদের মতে, এই সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজার হবে।[৯] পাত্র জনগোষ্ঠী ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে থেকেই সিলেট অঞ্চলে বসবাস করছিল বলে জানা যায়। অনেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিলেটে রাজত্বকারী রাজা গৌড়গোবিন্দকে পাত্র সম্প্রদায়ের একজন বলে দাবি করেন, যদিও এই দাবির সপক্ষে কোনো দালিলিক প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি।

পাত্র জনগোষ্ঠী পিতৃতান্ত্রিক। পিতা বা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্যই পরিবারের প্রধান। পাত্র জনগোষ্ঠী ১২টি গোত্রে বিভক্ত। এই বিভাজনকে তারা 'রই' বলে। পাত্রদের ১২টি গোত্র বা রই হলো: লংকিরই, গাবুরই, আলইরই, লংথুরই, তংরারই, টুকরিরই, থেকলারই, কেলাংরই, চামাংরই, বারই, পনবাবুরই ও চন্দ্ররই। প্রতিটি গোত্রের পেশা ও কর্মের প্রকৃতি ভিন্ন এবং তা নির্ধারিত থাকে। যেমন: আলইরই হলো যারা হাল চাষ করে, লংথুরই হলো পাচক, বারই হলো মুটে বাহক, কেলাংরই হলো অঙ্গার বানিয়ে যারা বিক্রি করে ইত্যাদি।[১০] পাত্রদের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। আন্তঃগোত্রে বিবাহ হয়।

বর্তমানে পাত্র জনগোষ্ঠী যে ধর্মবিশ্বাস লালন করে তাকে পূর্বতন সর্বপ্রাণবাদ ও হিন্দুদের সনাতন ধর্মের সংমিশ্রণ বলা যায়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হলেও তারা মূর্তি পূজা করে না।[১১] আর হিন্দু ধর্মের যে-সব দেবদেবীর পূজা করেন তারা সেগুলোরও তাদের নিজেদের ভাষায় নিজস্ব একটি

---

[৮] মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য (সম্পা.); ২০০৭; আদিবাসী জনগোষ্ঠী; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৪৩১।

[৯] মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পা.); ২০১০; বাংলাদেশের আদিবাসী: এথনোগ্রাফিয় গবেষণা, দ্বিতীয় খণ্ড; উৎস প্রকাশন/ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, পৃ. ৩১৭।

[১০] ওই, পৃ. ৩২০।

[১১] রতন লাল চক্রবর্তী; ১৯৯৮; সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৪৪।

নামকরণ করেন। যেমন: দুর্গা দেবীর নাম হলো 'পুইন', বিষহরী দেবীর নাম 'পুইলুংনুং', কালী দেবীর নাম 'ইকওইন' ইত্যাদি। বর্তমানে দুর্গা বা পুইন দেবীর পূজাকেই তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বলে বিবেচনা করা হয়। ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু হলেও পাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত শ্রেণির কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রাচীন ধর্মমতের বিভিন্ন পূজার্চনার জন্য পুরোহিত ছিলেন 'ওসাই'। এই ওসাইরাই এখনও যাবতীয় পূজা-অর্চনার দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে পাত্র সম্প্রদায় বিভিন্ন পেশায় জড়িত। তবে দিনমজুর ও কৃষিকাজই তাদের প্রধান পেশা।

পাত্রদের ভাষার নাম 'পাত্র ভাষা'। এই ভাষা তিব্বত-ব্রহ্ম ভাষাপরিবারের কুকি-চীন শাখার বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।[১২] এই ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। পাত্রদের ঐতিহ্যবাহী অনেক উৎসব আছে। 'ফাক খুং' বা শূকর শিকার করার উৎসব অন্যতম এক প্রধান উৎসব। এছাড়া রয়েছে কর্ণভেদ প্রথা, বংশপ্রদীপ জ্বালানো, তিল সংরাইন ইত্যাদি।

গারো সিলেট জেলায় সিলেট শহরের বাগবাড়ি এলাকা, সদর উপজেলার অন্তর্গত খাদিমনগরের দলইপাড়া ও কলগ্রাম এলাকা এবং তারাপুর চা-বাগানে কিছু গারো পরিবারের বসবাস আছে। তা ছাড়া কানাইঘাট উপজেলায়ও কিছু গারো পরিবার বসবাস করে। চাকরিজীবী, ছাত্র- এরকম ভাসমান অবস্থায়ও গারো জনগোষ্ঠীর বসবাস আছে সিলেট জেলায়। সব মিলিয়ে এই জেলায় একশ' থেকে সোয়াশ' পরিবার মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার গারো জনগোষ্ঠীর বসবাস। নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে মঙ্গোলীয় মহাপরিবারের তিব্বত-ব্রহ্ম শাখার অন্তর্গত গারো জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা গারো ভাষাও তিব্বত-ব্রহ্ম শাখারই অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন ভাষাবিজ্ঞানী জিএ গ্রিয়ারসন।[১৩] তাদের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। গারোরা নিজেদের ভাষাকে 'আচিক ভাষা' বলে। তবে অনেক উপভাষা প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রচলিত ভাষা হলো 'আবেং' ভাষা। এছাড়াও আরো অনেক উপভাষা প্রচলিত আছে, যেমন: আত্তং, মেগাম, দোয়াল, চিবক ইত্যাদি। লিখিত সাহিত্যের ঐতিহ্যও খুব প্রাচীন বা সমৃদ্ধ নয়। তবে লোকসাহিত্য হিসেবে মৌখিকভাবে অনেক গল্প, গাথা, সংগীত, ধাঁধা বা প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত আছে। গারো জাতি প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। আচিক এবং লামদানি। আচিক গারোরা পাহাড়ে জুম চাষ করে এবং লামদানি গারোরা সমতলভূমিতে হাল চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে।[১৪] বাংলাদেশের গারোরা নিজেদের 'মান্দি' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। মান্দি শব্দের অর্থ মানুষ।

---

[১২] মাহফুজুর রহমান, ২০০৯; সিলেট অঞ্চলে নৃ-তাত্ত্বিক ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী; ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১১৩।

[১৩] মণীন্দ্রনাথ মারাক; ২০০৫; গারো উপজাতি; বাংলাদেশের মঙ্গোলীয় আদিবাসী (মুস্তাফা মজিদ সম্পা.); মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৩১।

[১৪] বিভা সাংমা; ২০০৯; গারোদের উৎসব, নৃত্য, সঙ্গীত এবং ধর্মাচার; আদিবাসী সংস্কৃতি (মুস্তাফা মজিদ সম্পা.); মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৮০।

গারোদের সমাজব্যবস্থা মাতৃসূত্রীয়। মেয়েরা পরিবারের সম্পত্তির মালিক হয়। বিবাহের পর বর স্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে বসবাস করে থাকে। সন্তানসন্ততিরা মায়ের পদবি ধারণ করে। তবে পরিবার এবং সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরুষরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গারো সমাজ অনেক দল বা গোত্রে বিভক্ত। এই দল বা গোত্রগুলো হলো : আবেং, আত্তং, রুগা, চিবক, দোয়াল, কচ্ছু, মেগাম ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও তাদের মধ্যে বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্রও আছে। গারোরা গোত্রকে 'চাচ্চি' এবং উপগোত্রকে 'মাহারী' বলে।[১৫] একই গোত্রে বিবাহ গারো সমাজে নিষিদ্ধ। গারোদের প্রাচীন ধর্মের নাম 'সাংসারেক'। 'তাতারা রাবুগা' তাদের প্রধান দেবতা। তিনি অন্যান্য দেবতার সহায়তায় পৃথিবী, আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র, সাগর, পর্বত, গাছপালা, জীবজন্তু প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। তাদের অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে আছেন সলংজং (সূর্যদেব), ছোছুম (চন্দ্র), গোয়েরা (বজ্র), নবাং ইত্যাদি। তারা পুরোহিতকে 'কামাল' বলে। যদিও এখন অধিকাংশ গারোই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী, তথাপি তাদের প্রাচীন জড়বাদী ধর্ম সাংসারেক ধর্মের নানা আচার অনুষ্ঠান এখনও তারা পালন করে থাকেন।[১৬]

গারোরা ভাত, মাছ, পশুপাখির মাংস এবং নানা শাকসবজি খেয়ে থাকে। তাদের পুরুষদের পরনে থাকে গান্দো, পান্ত্রা, জামা, কাদি বা কটিপ ইত্যাদি পোশাক। আর মেয়েরা পরে রেকিং, জারন, আনপান, কপিং ইত্যাদি। তারা বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কারও ব্যবহার করে থাকে। গারো সংস্কৃতিতে গীত বাদ্য ও নৃত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নিজস্ব কিছু বাদ্যযন্ত্রও আছে। ফসল বোনা, নবান্ন, নববর্ষ ইত্যাদি উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন হয়। 'ওয়ানগালা' গারোদের প্রধান ও জনপ্রিয় উৎসব।

উরাং (ওঁরাও)

ওঁরাওদের পরিচয় নিয়ে কিছু ভিন্নমত রয়েছে। তবে সাধারণভাবে নৃবিজ্ঞানীরা ওঁরাওদের অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে মতো প্রকাশ করে থাকেন। তবে তাদের ভাষা আবার দ্রাবিড় ভাষাপরিবারের। তাই অনেক গবেষকই মনে করেন, ওঁরাওরা দ্রাবিড়ভাষী কুড়ুখদের উত্তরপুরুষ।[১৭] ওঁরাওদের ভাষার নাম 'কুরুখ', তবে তারা নিজেরা 'কুরুকার' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের ওঁরাওরা সাধারণত 'সাদরী' বা 'ফারসি' ভাষায় কথা বলে থাকে। সাদরী ভাষা আবার ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কুরুক ভাষার সাথে ফারসি, হিন্দি, উর্দু, বাংলা ইত্যাদি ভাষার মিশ্রণে এ ভাষার উদ্ভব। এই ভাষার কোনো

---

[১৫] মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য (সম্পা.); ২০০৭; আদিবাসী জনগোষ্ঠী; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৩৯০।

[১৬] বিভা সাংমা; ২০০৯; গারোদের উৎসব, নৃত্য, সঙ্গীত এবং ধর্মাচার; আদিবাসী সংস্কৃতি (মুস্তাফা মজিদ সম্পা.); মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৮০।

[১৭] মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য (সম্পা.); ২০০৭; আদিবাসী জনগোষ্ঠী; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ২২৩।

বর্ণমালাও নেই। তাদের সাহিত্য মৌখিক। তবে লোকসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আছে।[১৮]

ওঁরাওদের আদি বাসভূমি ভারতের রাঁচি, নাগপুর অঞ্চল। উনবিংশ শতাব্দীতে সিলেটে চা-বাগান প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হলে চা-শ্রমিক হিসেবেই অন্যান্য অনেক জনগোষ্ঠীর মতো এদেরও এই অঞ্চলে আনা হয়। এই জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে 'ওঁরাও' বলে পরিচিত হলেও সিলেটে তারা 'উরাং' নামে পরিচিত। শহরতলির বালুচর ও ইসলামপুর এলাকা এবং লালিছড়া, তারাপুর, গুল্লি, ছড়াগাঙ, লালাখাল ও খান চা বাগানে এদের বসবাস। সিলেট জেলায় এদের জনসংখ্যা দুই থেকে আড়াই হাজার বলে অনুমান করা হয়। ওঁরাওদের অনেক গোত্র আছে। এই গোত্রগুলো পশুপাখি, মাছ, গাছপালা অথবা কোনো বস্তুর সাথে সম্পর্কিত। সিলেটে যে-সব গোত্রের লোক আছে, সেগুলো হলো- মিঞ্জি, টপ্পো, কুজুর, কেরকাটা, ননুয়ার, তিরকি, ইন্দুয়ার, বাকলা, খালকো, এক্কা ইত্যাদি।[১৯]

চা বাগানের বাইরে বসবাসরত ওঁরাওরা প্রধানত কৃষিজীবী। একসময় তাদের নিজস্ব এক ধর্মবিশ্বাস থাকলেও, যাকে একধরনের জড়-উপাসনা বলা চলে, বর্তমানে ওঁরাওরা প্রধানত সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। দুর্গাপূজাই তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। তবে এখনও তারা তাদের প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসের আওতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি করে থাকে। এগুলোর মধ্যে কারাম উৎসব, সোহরাই উৎসব, সারহুল উৎসব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মাল (মালো) সিলেট জেলায় ওঁরাওদের পাশাপাশি 'মাল' (মালো) নামে আর একটি জনগোষ্ঠীও বসবাস করে। সংখ্যায় খুবই কম এই জনগোষ্ঠী সংখ্যাস্বল্পতা এবং ওঁরাওদের সাথে মিলেমিশে অবস্থান করার কারণে নিজস্ব স্বকীয়তা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে তারা ওঁরাওদের মতোই একই ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাগত পরিচয় নিয়ে বেঁচে আছে।

চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী সিলেট জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা ২০টি। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৭টি, জৈন্তাপুর উপজেলায় ৬টি, গোয়াইনঘাট উপজেলায় ২টি, কানাইঘাট উপজেলায় ২টি এবং ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় রয়েছে ৩টি বাগান।[২০] তবে এই সংখ্যা আরেকটু বেশি। এখন ছোটো-বড়ো মিলিয়ে (ফাঁড়ি বাগানসহ) মোট চা-বাগানের সংখ্যা ২৮টি। এসব চা-বাগানে কর্মরত আছেন বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যরা। এদের মধ্যে তারা হলেন- কর্মকার, বাকতি, বাউরি, ছত্রী, সিং ছত্রী, বাড়াইক, নায়েক, লোহার, কৃষ্ণগোয়ালা, দেশোয়ালী গোয়ালা, দেশোয়ালী শীল, চাষা, মুন্ডা/ মুড়া,

---

[১৮] মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য (সম্পা.); ২০০৭; আদিবাসী জনগোষ্ঠী; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ২২৮।

[১৯] সাক্ষাতকার: মিলন উরাং, ছাত্র, বালুচর, সিলেট।

[২০] ফিলিপ গাইন (সম্পা.); ২০০৯; চা শ্রমিকের কথা; সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা, পৃ. ২৯৭।

সাঁওতাল, উরাং, মাল/ মালো, রিকিয়াসন/ ভুঁইয়া, মাদ্রাজী, মাহালী, কাহার, নেপালী, গঞ্জু, রবিদাস, মুদি, রায় ঘাটুয়ার, কুর্মি, ভূমিজ, কালিন্দি, বুনার্জি, তাঁতি, বল্মীক দাস, খদাল দাস, বাইজ্ঞা, রাজবংশী।[২১] এইসব চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী ভারতের ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল পরগণা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তৎকালীন আসাম প্রদেশে চা-চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠলে চা-বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য এদেরকে নিয়ে আসা হয়। দীর্ঘকাল ধরে মূল জাতিসত্তা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চা-বাগানের আবদ্ধ জীবনে বসবাস এবং গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ গঠনের সুযোগ বঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন ভাষিক ও সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী একত্রে মিলেমিশে থাকায় তাদের মধ্যে এক ধরনের মিশ্র ভাষা ও সংস্কৃতির জন্ম নিয়েছে। সুতরাং ভাষিক পরিচয়ে চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে ৬টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এগুলো হলো: উড়িয়া, ভূজপুরী (দেশোয়ালী), সাদরী, তেলেগু, সানতালী ও বাংলী। যেমন:ওড়িশা (উড়িষ্যা) প্রদেশ থেকে আগত জনগোষ্ঠী ওড়িশা ভাষা ও সংস্কৃতি লালন করে থাকে। তেমনি উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ থেকে আগত লোকজন ভূজপুরি (দেশোয়ালী) ভাষা ও সংস্কৃতি, বিহার প্রদেশ থেকে আগত লোকজন ভূজপুরি (দেশোয়ালী) ও সাদরী, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আগত লোকজন তেলেগু, পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল পরগনা থেকে আগত লোকজন সান্তালি ভাষা ও সংস্কৃতি লালন করে থাকে। আর পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের লোকজন বাংলার সাথে বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে সৃষ্ট এক মিশ্র ভাষায় কথা বলে, যা স্থানীয়ভাবে ‘বাংলী’ ভাষা বলে পরিচিত। তা ছাড়া চা-বাগানগুলোতে গারো, নেপালি এবং ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীরও বাস আছে।[২২]

চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তবে বিহার থেকে আগত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু ইসলাম ধর্মাবলম্বীও আছেন। আবার কেউ কেউ খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। প্রতিটি জনগোষ্ঠীরই নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি, সমাজশাসনের পদ্ধতি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আছে। কিন্তু বাগানগুলোতে বিভিন্ন জাতিসত্তা বা জনগোষ্ঠীর লোক একত্রে মিলেমিশে থাকে বলে কোনো একক জনগোষ্ঠীই তাদের স্বতন্ত্র জীবনচর্যা যথাযথভাবে চালিয়ে যেতে পারেন না। সামাজিক বিচার-অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিটি বাগানেই পঞ্চায়েত পদ্ধতি চালু আছে। পঞ্চায়েতে তিন স্তরের প্রশাসনিক পদ বিদ্যমান। প্রধান প্রশাসনিক পদের নাম ‘চৌধুরী’। জাতি বা গোষ্ঠী সকলের সর্বজনীন ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। তেমনি লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত ‘গ্রাম পূজা’ও সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর সর্বজনীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এটি একধরনের প্রকৃতি পূজা। সারা গ্রাম বা বাগানের

---

[২১] সাক্ষাতকার: চিত্তরঞ্জন রাজবংশী, প্রভাষক (ইংরেজি), গোয়াইনঘাট ডিগ্রি কলেজ, সিলেট; উপদেষ্টা, বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন (বি-৭৭), সুরমা ভ্যালি শাখা।

[২২] পরিমল সিং বাড়াইক; ২০০৯; চা-জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি; পরিমল সিং বাড়াইক, ভূড়ভূড়িয়া চা-বাগান, শ্রীমঙ্গল, পৃ. ১৫-১৬।

সকলের কল্যাণ কামনায় এই পূজার আয়োজন করা হয়। সাধারণত বৈশাখ মাসে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ধর্মীয় মতের কোনো বৈদ্য বা ওঝা জঙ্গলে কোনো বড়ো বৃক্ষছায়ায় এই পূজার আয়োজন করেন। 'করম পূজা'ও এমনি আরেকটি উল্লেখযোগ্য সর্বজনীন পূজা। সাধারণত ভাদ্র মাসে এই পূজার আয়োজন হয় এবং এ উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী ঝুমুর নাচ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু লোকজ পূজা-পার্বণ ও অনুষ্ঠানাদি থাকে, যা উল্লেখ করা হলো:

উড়িয়া ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী: মঙ্গালা দেবী, উষাকুটি, দণ্ড, ঈশানপূজা, বাঘদেই প্রভৃতি।

ভূজপুরি : কালকামায়ী, বাঘৎবাবা, বৃত্তিয়া, ইষ্টপূজা, রামনবমী, পাঁচ পীর, দেইয়া, পরমেশ্বরী প্রভৃতি।

সাদরী: বনপাহাড়ী, গোহালপূজা, জিতিয়া পরব, সূর্যাহিপূজা ইষ্টপূজা, নতুন খাওয়া, ইষ্টপূজা, শারুলপূজা, বাঘউৎ, গরাইয়া প্রভৃতি।

তেলেগু : মাতামায়ী, প্রেতপেরেন টালু, মাংলাবমু, গণেশ পূজা প্রভৃতি।

সান্তালি : বাহা, সহরাই, বনপাহাড়ী, দাসাই, গড়াবংগা, দম, বাঘুৎ প্রভৃতি।

বাংলি : টুসুপূজা, মনসা পূজা, গোহাল পূজা, আষাঢ়ি পূজা, ইষ্টপূজা, ছান্দন দেবী প্রভৃতি।[২৩] (বাড়াইক : ২০০৯ : ২০)।

সংস্কৃতি সিলেটের লোকমানস ও সংস্কৃতিভাবনা পর্যালোচনা করা একটি জটিল ও কঠিন বিষয়। এব্যাপারে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা বা তার অনুপুঙ্খ আলোচনার অবকাশও এখানে নেই। সিলেট বেশ প্রাচীন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ঋদ্ধ এক জনপদ। এই অঞ্চলে প্রাচীন কালে বসতি স্থাপন করেছে অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী; এসেছে দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় ও ইন্দো-আর্য জনগোষ্ঠী। আর্য আগমনের আগে এতদঞ্চলে বসবাসরত নানা কৌম, গণ বা খণ্ডে বিভাজিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নিজস্ব নানা লৌকিক ধর্ম অনুসরণ করেছে, স্বকীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির আলোয় বেঁচে থেকেছে। তারপর আর্য জনগোষ্ঠীর আগমনের সাথে বিস্তৃত হয়েছে হিন্দু ধর্ম, সনাতন হিন্দু ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল প্রতাপ। কিন্তু তারাও প্রচলিত লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে তেমন কোনো সংঘাতে না গিয়ে গড়ে তোলে এক ধরনের সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির ধারা। তারপর একসময় সিলেট অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। সিলেট অতি প্রাচীন কাল থেকেই কামরূপ বা বর্তমান আসামের অংশ ছিল। কামরূপের শাসক মহারাজ ভূতিবর্মার প্রপৌত্র ভাস্করবর্মার সময়ে সিলেট, জৈন্তিয়া, কাছাড়সহ পার্শ্ববর্তী অনেক অঞ্চল কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তখন সিলেটের অধিকাংশ

[২৩] পরিমল সিং বাড়াইক; ২০০৯; চা-জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি; পরিমল সিং বাড়াইক, ভূড়ভূড়িয়া চা-বাগান, শ্রীমঙ্গল, পৃ. ২০।

অধিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল।[২৪] ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল প্রতাপ এবং ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ফলেই নিম্নবর্গের হিন্দুগণ ক্রমশ বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে থাকে। এই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণকারীরা ব্যাপকভাবে কামরূপ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত সিলেটের পঞ্চখণ্ডল অঞ্চল কামরূপের অন্তর্গত ছিল এবং সেসময় সিলেটে ব্রাহ্মণদেরও বসবাস ছিল।[২৫] বৌদ্ধ-আচরিত ধর্মদর্শনের মাধ্যমেই আমরা প্রথম গুরুবাদের সাক্ষাৎ পাই। এরপরই আসে তুর্কি তথা মুসলিম অধিকারের যুগ।

সিলেটে মুসলিম আগমনের পর ইসলামি সাংস্কৃতিক উপাদান যুক্ত হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম এ তিনধর্মের সহাবস্থানে অভিযোজিত হয়ে এ এলাকার সংস্কৃতি এক নতুন মাত্রা লাভ করে। ফলে, চাষবাসের প্রয়োজনে বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন লোকজ বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত থাকে। বারুণী মেলা, রথযাত্রা, বৈশাখিমেলা, চড়কের মেলা ইত্যাদি সমান উৎসাহ নিয়েই উদযাপিত হতে থাকে। গ্রামীণজীবনে মানুষ শিরনি-মানতের মাধ্যমে নানা লৌকিক দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। কেবল অনেক ক্ষেত্রে ওলাবিবি, সত্যপির, বদর পির, পির গোরাচাঁদ, বড়ো খাঁ গাজি, খোয়াজ খিজির প্রভৃতি মুসলিম লৌকিক দেবমানবে প্রতিস্থাপিত হলো হিন্দু লৌকিক দেবতারা।[২৬] ধর্মীয় সংস্কৃতির এই সমন্বয়ধর্মিতার প্রধান কারণ দরবেশকুল শিরোমণি হজরত শাহজালাল (র.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী যখন সিলেট দখল করে তখন এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা ছিলেন দুর্বল, কিন্তু অত্যাচারী শাসক। ফলে, প্রায় প্রতিরোধবিহীন মুসলিম বিজয়ে এখানকার সাধারণ প্রজারা খুশিই হয়েছিলেন, মুসলিম দরবেশদের ত্রাতা হিসেবেই গণ্য করেছিলেন। সে কারণেই এখানকার হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই শাহজালাল (র.)-এর মাজার-ভক্তিতে সমান অবনত। আর তাই, এই অঞ্চলে প্রচলিত সনাতন হিন্দু ধর্মের সাথে নবাগত ইসলাম ধর্মের কোনো প্রত্যক্ষ বিরোধ বাধেনি। ফলে, ‘বিভিন্ন ধর্মের মিশ্রণে একটি মিশ্র সংস্কৃতির ধারা উৎসারিত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

এই সময়পর্বের হাত ধরেই আসে সিলেটের সংস্কৃতিতে প্রভাববিস্তারী আরেক কালপর্ব। শাহজালাল (র) পরবর্তী সময়ে সিলেটের সংস্কৃতি যখন হিন্দু-মুসলিম চেতনার এক সমন্বিত রূপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তখনই, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে, শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈতাচার্যের আবির্ভাব সে ধারায় নতুনতর প্রবাহ যুক্ত করে। শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি সিলেটের ঢাকাদক্ষিণ আর অদ্বৈতাচার্য সুনামগঞ্জের লাউড় অঞ্চলের। তাঁরা দুজনই নবদ্বীপে অবস্থান করে হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারে প্রবৃত্ত হন এবং হিন্দু ধর্মের বর্ণগত বৈষম্য সংঘাতের বিপরীতে

---

[২৪] মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী; ১৯৯৩; চর্যাপদে সিলেটী ভাষা; সিলেট, পৃ. ৬।

[২৫] ফজলুর রহমান; ১৯৯১; সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ; সিলেট, পৃ. ২৫।

[২৬] গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু; ১৯৮৭; বাংলার লৌকিক দেবতা; কলকাতা।

সৌভ্রাতৃত্বভিত্তিক বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তন করেন। শ্রীচৈতন্য তাঁর ধর্মমত সিলেটসহ সারা বাংলায় প্রচার করতে থাকেন এবং অদ্বৈতাচার্যের শিক্ষা আসাম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।[২৭] শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত এই বৈষ্ণব ধর্মদর্শন হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। গোটা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এই দর্শনে প্রভাবিত। সিলেটে সুফিবাদ ও শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের মহামিলনে রচিত হয়েছে মরমি গান। লোকসংগীত গবেষক ও সংগ্রাহক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সিলেটি গীতরচয়িতাদের পল্লিগানগুলো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, 'সিলেটে মুসলমান প্রাধান্য এবং শিক্ষা বেশি, তৎসত্ত্বেও এই লোকসংগীতগুলো হিন্দুয়ানী ভাব ও উপমায় সমৃদ্ধ। এই সংমিশ্রণ সমাজতত্ত্ববিদদের বিচারের অপেক্ষা রাখে। হাফিজ যেমন বারংবার সাকীর ব্যবহার করিয়াছেন; সিলেটের গানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রাধাকৃষ্ণ প্রতীক নির্মম ব্যবহৃত হইয়াছে।'[২৮]

সুফি মতবাদ এবং বৈষ্ণব দর্শনের মিলিত ধারায় অবগাহন করে সিলেটের লোকজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা বেগবান স্রোতে প্রবাহিত হতে থাকে। সিলেটের উল্লেখযোগ্য মরমি সাধক যারা মরমি গান লিখে সমৃদ্ধ করেছেন সিলেটের লোকসংস্কৃতির ধারাকে, তারা হলেন– মরমি কবি শিতালং শাহ, ইব্রাহিম তশনা, আরকুম শাহ, ভেলা শাহ প্রমুখ। সিলেটের লোকসংগীতের ভান্ডারে এক দ্যুতিময় উপহার 'বারোমাসি গান'। 'প্রেম বিরহসহ জাগতিক কোনো অনুভূতি বারমাসের বর্ণনার মাধ্যমে যে সংগীতে প্রকাশিত হয় তাই হলো বারোমাসি। অধিকাংশ বারোমাসিতে প্রোষিতভর্তৃকার মনের আর্তি বর্ণিত হয়েছে।[২৯] বারোমাসিতে বহিঃপ্রকৃতির পাশাপাশি অন্তঃপ্রকৃতির বর্ণনাও প্রাধান্য লাভ করে। ঋতুচক্রের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ জীবনও পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতির এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে লোকসমাজের বিচিত্র মনোভাব অবলম্বন করে রচিত হয়েছে বারমাসী গান।'[৩০] বারোমাসি গান ছাড়াও জারি, সারি, বাউল, মারফতি, মুর্শিদি, মালজোড়া, ধামাইল, বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠানের গান, কবিগান ইত্যাদি এখনও প্রচলিত আছে।

এই লোকজ সংস্কৃতির ধারা ছাড়াও সিলেটে বিভিন্ন সংগঠন এর মধ্যে অন্যতম সংগীত, নৃত্য, নাটক, চিত্রকলাসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় কাজ করছে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। এই জোটে সিলেটের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সংখ্যা হলো ১২৬টি। এর বাইরেও কমপক্ষে ৫০টির মতো সংগঠন আছে। আবার সিলেটে সক্রিয় নাট্য সংগঠনগুলোর সম্মিলিত সংস্থা হলো– সম্মিলিত নাট্য পরিষদ। নাট্য পরিষদভুক্ত নাট্য সংগঠনের সংখ্যা ২১টি। এর

---

[২৭] এসএনএইচ রিজভী (সম্পা.); ১৯৭০; ইস্ট পাকিস্তান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স ; সিলেট; ঢাকা, পৃ. ৯৭।

[২৮] মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন; ১৯৭৮; হারামণি, সপ্তম খন্ড; ঢাকা, পৃ. ১৩।

[২৯] নন্দলাল শর্মা; ২০০৯; লোকসংস্কৃতি : সিলেট প্রেক্ষিত; ঘাস প্রকাশন, সিলেট, পৃ. ৩৯।

[৩০] ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য; ১৯৮৪; বরাক উপত্যকার বারমাসী গান; শিলচর, vii ।

বাইরেও কমপক্ষে ১০টি নাট্যসংগঠন সক্রিয় রয়েছে। কয়েকটি উপজেলায়ও নাট্যসংগঠন আছে। এছাড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি জেলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে সচল রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, সিলেট জেলা শাখারও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

মণিপুরি নৃত্য

সিলেটের সংস্কৃতির প্রসঙ্গ এলেই মণিপুরি নৃত্যের প্রসঙ্গটি অবধারিতভাবেই চলে আসে। মণিপুরি নৃত্য এখন আর সিলেট বা মণিপুরিদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ নেই। এই নৃত্য এখন জাতীয় সংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর খ্যাতি ও পরিচিতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ছড়িয়ে পড়েছে। মণিপুরি নৃত্যের যদিও নানা প্রকারভেদ আছে তবু মণিপুরি নৃত্য বলতে এখন রাসনৃত্যকে বোঝানো হয়। এই রাসনৃত্যের সূচনা করেন মণিপুরি রাজা ভাগ্যচন্দ্র ১৭৭৯ সালে। নটসংকীর্তন থেকে শুরু হয় রাধাভাব কীর্তন, যা থেকে জন্ম নেয় রাসনৃত্যের। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ সালের নভেম্বরে সিলেট সফরে এসে শহরের মাছিমপুরে গিয়ে প্রথমে রাখাল নৃত্য এবং রাতে কবির সিলেট অবস্থানকালীন বাসস্থান পাদ্রি বাংলোয় পরিবেশিত মণিপুরি রাসনৃত্যের অংশবিশেষ দেখেন। ধ্রুপদী ধারার এই নৃত্য দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি এবং ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহকে নিয়ে গিয়ে শান্তিনিকেতনে মণিপুরি নৃত্য শিক্ষাদান শুরু করেছিলেন।

মণিপুরি রাসনৃত্য মূলত লাস্যধারার। রাসলীলার মাধ্যমে ভক্তশিল্পীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আবেগসূত্রে মিলিত হন। রাসনৃত্য প্রধানত পাঁচ প্রকারের– মহারাস, কুঞ্জরাস, বসন্তরাস, নিত্যরাস ও দিবারাস। মহারাস কার্তিক পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়, কুঞ্জরাস অনুষ্ঠিত হয় আশ্বিন পূর্ণিমায় আর বসন্তরাস চৈত্র পূর্ণিমাতে। এই তিন প্রকার রাসের উদ্ভাবন করেন মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র। আর যে কোনো ঋতুতে অনুষ্ঠান করা যায় এমন রাসনৃত্য হিসেবে নিত্যরাসের প্রবর্তন করেন মহারাজ চন্দ্রকীর্ত। আর তারও কিছুকাল পরে মহারাজ চূড়াচান্দ উদ্ভাবন করেন দিবারাস। দিবাভাগে অনুষ্ঠিত হয় বলে এই রাসের নাম দিবারাস।

রাসনৃত্যে ব্যবহৃত পোশাকও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই পোশাক পরিকল্পনা করেছিলেন রাসনৃত্যের উদ্ভাবক মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র নিজে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি যে পোশাক উদ্ভাবন করেন এখনও রাসনৃত্যে সেই পোশাকই অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়।

ঝুলন নৃত্য মণিপুরি নৃত্যের আরেক উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা। শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচদিন ধরে রাতে অনুষ্ঠিত হয় এই নৃত্য। সিলেট শহরের প্রায় সব মণিপুরি পাড়ায় এই নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সখিবৃন্দ সারারাত ধরে নেচে গেয়ে রাধাকৃষ্ণের ঐশ্বরিক মিলনের আনন্দে বিভোর হয়।

মেলা মেলা হলো লোকজ সংস্কৃতির আরেক উল্লেখযোগ্য রূপ। গ্রামেগঞ্জে আগে বৈশাখি মেলা, চড়কের মেলা ইত্যাদি বসত এবং এসব মেলাকে উপলক্ষ করে কৃষি ও জীবন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্যের পসরা সাজানো হতো। এসব মেলা ছিল গ্রামীণ জনপদের জীবন ও সংস্কৃতির এক প্রকৃত মিলনমেলা। এখন এসব মেলা আর খুব একটা দেখা যায় না। তবে পহেলা বৈশাখে এখনও বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত হয় বৈশাখিমেলা। নবান্ন উপলক্ষে বা শীতের সময় পিঠা মেলারও আয়োজন হয়। সিলেটের ঐতিহ্যবাহী আরও কয়েকটি মেলার কথা উল্লেখ করা হলো :

রথের মেলা আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সিলেট শহরের মণিপুরি পাড়াগুলো এবং কিছু বাঙালি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মন্দির থেকে রথ টেনে নিয়ে আসা হয় শহরের রিকাবীবাজারে অবস্থিত রথের জন্য নির্ধারিত স্থানে। প্রায় ১৪-১৫টি রথের সম্মিলন ঘটে। আবার ৯ দিনের দিন দশমী তিথিতে একইভাবে ফিরারথের অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষ রিকাবীবাজার এলাকায় প্রায় ১০ দিন ধরে বিশাল মেলা বসে।

বাসুদেব বাড়ির মেলা বিয়ানীবাজারের বাসুদেব মন্দিরে এই মেলা বসে। সাধারণত আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় সাতদিন ধরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীচৈতন্যের মেলা ঢাকাদক্ষিণের শ্রীচৈতন্যের মন্দির সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এক তীর্থভূমি। এই মন্দির প্রাঙ্গণে চৈত্র মাসজুড়ে প্রতি রবিবার বিশাল মেলা বসে।

ওরসের মেলা সিলেট শহরে হজরত শাহজালাল (র.)-এর ওফাত দিবসে ১৯ জিলক্বদ ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এই ওরস উপলক্ষ ১৯ ও ২০ জিলকদ দু-দিন ধরে শাহজালাল (র.)-এর দরগাহ শরিফকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলা বসে। তা ছাড়া হজরত শাহজালাল (র.)-এর সফরসঙ্গী বিভিন্ন আউলিয়াগণের ওরস উপলক্ষও মাজার এলাকায় মেলা বসে।

লোকশিল্প একসময় সিলেট শহরের মণিপুরি রাজবাড়িতে মন্দিরসংলগ্ন এলাকায়ও ঢাকাদক্ষিণের শ্রীচৈতন্য মন্দিরের অনুরূপ চৈত্র মাসজুড়ে প্রতি রবিবার বিশাল মেলা বসত। তবে এখন আর স্থানাভাবে এই মেলা বসে না।

লোকশিল্প বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোককলা। সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে এর উদ্ভব। মাটি, কাপড়, সুতা, কাঠ, বাঁশ, বেত, শোলা, শঙ্খ, নল ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় লোকশিল্প। এই শিল্পের যন্ত্রপাতিও অতিসাধারণ। এসব উপাদান ও যন্ত্রপাতি দিয়ে গ্রামবাংলার লোকশিল্পীরা যুগ যুগ ধরে তৈরি করে চলেছেন অসামান্য সব শিল্প। কামার, কুমার, ছুতার, পটুয়া, সোনারু, কাঁসারু, শাঁখারি, তাঁতি প্রভৃতি চারু ও কারুশিল্পীদের তৈরি হস্তশিল্প একদিকে যেমন প্রয়োজন মেটায়, অন্যদিকে এটি তাদের জীবিকারও অবলম্বন। তবে, আলপনা এবং নকশিকাঁথার শিল্পীদের পৃথক কোনো পরিচিতি নেই। গ্রামীণ সাধারণ নারীরাই এর শিল্পী।

আলপনা, মনসাঘট, লক্ষ্মীর সরা, মঙ্গলঘট ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যেমন সম্পৃক্ত, তেমনি হস্তশিল্প গ্রামীণ মানুষের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে গণ্য। এসব শিল্পকলায় আছে নান্দনিকতার ছোঁয়া।

শখের হাঁড়ি

চৈনিক পর্যটক মা-হুয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্তে (১৪০৬) প্রথম বাংলার শখের হাঁড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। শখের হাঁড়ি মূলত লৌকিক আচারের সাথে সম্পর্কিত। সিলেটের অধিকাংশ বিয়ের অনুষ্ঠানে শখের হাঁড়ির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

শখের হাঁড়ি চিত্রিত বর্ণময় পাত্র। পাতিল, কলস বা ঘটসদৃশ মাটির পাত্রের গায়ে সাগু ও আঠার সঙ্গে রং মিশিয়ে মাছ, পাখি, চিরুনি, পদ্ম, পাতা ও জ্যামিতিক রেখা এঁকে শখের হাঁড়ি তৈরি করা হয়। হাঁড়ি তৈরিতে লাল, হলুদ ও সবুজ রং ব্যবহার করে থাকেন শিল্পীরা। বিয়ের ফলমূল, মিষ্টিদ্রব্য ইত্যাদি আদান-প্রদানে শখের হাঁড়ি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সৌখিন কাজে ব্যবহৃত হয় বলেই এর নাম হয়েছে শখের হাঁড়ি। শখের হাঁড়িতে ব্যবহৃত নকশার ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে, যেমন-মাছ উর্বরতার প্রতীক, চিরন্তন প্রেমের প্রতীক ইত্যাদি।

সিলেট জেলার বালাগঞ্জ, জকিগঞ্জ, বিশ্বনাথ, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার উপজেলার শতাধিক কুমার পরিবার অন্যান্য মৃৎশিল্পের পাশাপাশি শখের হাঁড়ি তৈরির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই হাঁড়ি এখন শুধু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শহরে ঘর সাজাবার উপকরণ হিসেবেও তার রয়েছে বিশেষ কদর।

বাঁশ ও বেতের তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্প

মূলী, ডলু, মৃতিঙ্গা, পাড়ুয়া, রূপাই, পেচা, টেটুয়া, বেতুয়া, জাই, বরুয়া, মাকাল বাঁশ সিলেটে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলো দিয়ে তৈরি হয় ঘরবাড়ি। পেশাজীবী ঘরামিরা তৈরি করেন কৃষিজীবীদের লাঙল, জোয়াল, মই, চাঙারি, কুলা, ডালা, পাখা, চালুন, চাটাই, টাইল, ধাড়া, টুকরি, উড়া, ছাতা, উকইন, হুপা, সেঁউত, খলই, ধুচইন ইত্যাদি। একতারার ফ্রেম নির্মাণে বাঁশের বাতা এবং বাঁশি তৈরিতে সরু বাঁশের টুকরা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঘরের ছাদ বানাতেও ব্যবহৃত হয় বাঁশ। মাছ ধরার অধিকাংশ সামগ্রীই বাঁশের তৈরি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—পলো, পারন, ডরি, রুঙ্গা, ডোবি, কোচ, অচু, হগ্রা প্রভৃতি। এক কথায় বলতে গেলে, বাঁশের তৈরি সামগ্রী ছাড়া গ্রামীণ মানুষের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব।

বেতশিল্পের জন্য সিলেটের সুখ্যাতি রয়েছে দেশজুড়ে। দৃষ্টিনন্দন এসব সামগ্রী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি হচ্ছে। বেতের তৈরি চেয়ার, টেবিল, মোড়া, সোফা, বুক শেলফ, ঝুড়ি, বিছানা, বাক্স, ট্রে, বাতির ঢাকনা, তাক, বাচ্চাদের খাট খুবই জনপ্রিয়। মুর্তা নামক বেত দিয়ে শীতলপাটি তৈরি করা হয়। অন্যদিকে আসবাবপত্রের জন্য ব্যবহার করা হয় জালি, সুন্দিজালি, রাঙ্গীজালি, চাকাই এবং গল্লা বেত। মহিউদ্দিন শীরুর ভাষ্য অনুযায়ী 'সিলেট একসময় অপূর্ব চারু ও কারুশিল্পসামগ্রী বিশেষত বাঁশ ও বেতের কাজের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই বাঁশ বেতের কাজের চাহিদা এখনো আছে। সিলেটের সর্বোৎকৃষ্ট উৎপাদন সামগ্রী

ছিল রূপালি বেতের বোনা শীতলপাটি, যা মুর্শিদকুলী খান সম্রাট আওরঙ্গজেবকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।'

মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ হচ্ছে এঁটেল মাটি। এই মাটি দিয়েই কুমাররা বিভিন্ন আকৃতি ও সাইজের হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করে ভাটিতে পুড়িয়ে সেগুলো স্থায়ী করেন। মাটির তৈরি তৈজসপত্রে যে রং ব্যবহৃত হয় তা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান থেকেই তৈরি। আম গাছের ছাল সোডামিশ্রিত পানিতে সিদ্ধ করে তা থেকে প্রাপ্ত রস লাল মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রং তৈরি করা হয়, যার ফলে এ রং দীর্ঘদিন ব্যবহারেও মলিন হয় না। মাটির তৈরি এসব তৈজসপত্র কাঁচা থাকতেই কাঠি দিয়ে পাতা, ফুল, পাখি ও রেখাদির ডিজাইন করা হয়।

মানুষ ও জীবজন্তুর অবয়ববিশিষ্ট পুতুল খোদাই পদ্ধতিতে রূপ দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে স্পষ্ট ও প্রতীকধর্মী দু'ভাবেই পুতুল তৈরি করেন মৃৎশিল্পীরা। মানুষের আকারবিশিষ্ট টেপা পুতুল প্রতীকধর্মী বিমূর্ত শিল্প। পিরের থানে উৎসর্গীকৃত মানতের ঘোড়াও প্রতীকধর্মী। এছাড়াও হরেক রকমের তৈজসপত্র তৈরি করে থাকেন গ্রামীণ শিল্পীরা। বংশপরম্পরায় এই শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন সিলেটের কুমার সম্প্রদায়ের লোকেরা।

আলপনা আলপনা বাংলা লোকশিল্পের অন্যতম নিদর্শন। গ্রামের মহিলারাই এই শিল্পের ধারক। তারাই বাঁচিয়ে রেখেছেন আলপনা শিল্পকে। এতে করে একই সঙ্গে পুরোনো ঐতিহ্য যেমন টিকে আছে, তেমনি নতুন আঙ্গিক ও বৈচিত্র্যের সংযোজনে এ শিল্প হচ্ছে সপ্রতিভ।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে আলপানা আঁকা হয়। বিয়ের ছাতনাতলায়, উঠানে, বাসরঘরে এবং কুলা, ডালা, মঙ্গলঘট, আসনপিঁড়ি ইত্যাদি পাত্রেও আলপনা আঁকার রীতি চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। হিন্দু নারীরা ব্রতের আসনপিঁড়িতে পদ্মশঙ্খ, অন্নপ্রাশনের আসনপিঁড়িতে ব্যঞ্জনের বাটি আর বিয়ের আসনপিঁড়িতে জোড় ফুল, ভ্রমর, পদ্ম ইত্যাদি আঁকা হয়। আলপনার প্রধান উপকরণ চালের গুঁড়োর পিটালি। আলপনার মূল রং সাদা। ব্রতের আলপনা আঙুল বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে আঁকা হয়।

বর্তমান যুগে মুসলমানরাও বিয়েসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আলপনা অঙ্কন করে থাকে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনার ও মিনারসংলগ্ন সড়কগুলোতে প্রচুর আলপনা আঁকা হয়।

নকশিকাঁথা নকশিকাঁথা গ্রামবাংলার নিজস্ব শিল্প। গ্রামের সাধারণ মেয়েরা এ শিল্পের রূপকার। সূক্ষ্ম ও নয়নাভিরাম নক্শার জন্য সিলেট জেলার নকশিকাঁথার দেশজুড়ে রয়েছে বিশেষ খ্যাতি। পুরাতন শাড়ি কাপড়কে কয়েকস্তরে সাজিয়ে কাঁথার জমিন তৈরি করা হয়। এরপর সুঁইসুতার সাহায্যে চলে নকশা তোলার কাজ। কেবল বিছানার কাঁথা ও লেপকাঁথা নয়, ব্যবহারভেদে আরও নানা প্রকার

কাঁথা আছে। যেমন বালিশের ছাপা ও খোল, জায়নামাজ, পূজার আসন, আয়না-চিরুনি ও পান-সুপারি রাখার বটুয়া ও আরশিলতা, বই বাঁধার বস্তনি, তৈজসপত্র রাখার গাঁটরি, খাওয়ার আবরণী দস্তরখানা ইত্যাদি। বিভিন্ন কাঁথায় চিত্ররূপে স্থান পায়, পদ্ম, সূর্য, চাঁদ-তারা, কল্কা, সজীব গাছ, তরঙ্গিত পুষ্পিত লতা, মানুষ, রাজা, ঘোড়া, হাতি, মাছ, পাখি, বর্ফি, তাজিয়া, মন্দির প্রভৃতি। সাধারণত শাড়ির পাড়ের রঙিন সুতা দিয়ে কাঁথা সেলাই করা হয়ে থাকে। এক-একটি কাঁথা তৈরিতে পনেরো দিন থেকে একমাস পর্যন্ত সময় ব্যয় করতে হয় শিল্পীকে। দরিদ্র নারীদের উপার্জনেরও মাধ্যম এটি। অনেকে নকশিকাঁথা তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

বাড়িঘর

গ্রামাঞ্চলে বসতবাড়িগুলো সাধারণত কাঁচা ঘরের থাকে, বাঁশ ও মাটি দিয়ে তৈরি। একসময় ছন দিয়ে বাড়ির ছাদ দেওয়ার প্রচলন ছিল খুব বেশি। ছনের বাড়িগুলো গরমের সময় খুব আরামদায়কও ছিল। এখন আর সেরকম ঘর খুব একটা দেখা যায় না। তার জায়গায় বরং ঘরের ছাদে টিনের ব্যবহার বেড়ে গেছে। কাদামাটির সাথে খড় বা অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে তৈরি করা মাটির দেওয়ালবিশিষ্ট বাড়িঘরের প্রচলনও ছিল একসময়। এখন ক্রমশ পাকা দালানঘর দিয়ে তা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। সিলেট ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। তাই সিলেট শহর এলাকায় একসময় খুব উঁচু দালানঘর নির্মাণ করা হতো না। তবে এখন প্রচুর বহুতলবিশিষ্ট দালানঘর তৈরি করা হচ্ছে। ভূমিকম্পের ভীতি এড়ানোর জন্যে একসময় সিলেটে ইট-সিমেন্টের দেওয়াল এবং ঢালাই ছাদের পরিবর্তে একধরনের বিশেষ ওয়াল বানানোর প্রচলন ছিল এবং ছাদে ব্যবহৃত হতো টিন। ‘প্যানেল ওয়াল’ নামে পরিচিত এই বিশেষ ধরনের ওয়াল তৈরি করা হতো কাঠের ফ্রেম বানিয়ে তাতে বাঁশের শক্ত পাত ব্যবহার করে দুই দিকে সিমেন্ট প্লাস্টারিং করার মাধ্যমে। সিলেট অঞ্চলে এ ধরনের ওয়ালের ব্যবহার খুব জনপ্রিয় ছিল বলে এটি ‘সিলেটি ওয়াল’ বলেও পরিচিত ছিল। এরকম ঘর এখন আর একদম দেখাই যায় না।

আসবাবপত্র

সিলেট অঞ্চলে কাঠের প্রাচুর্য ছিল বলে কাঠের তৈরি বাড়িঘর, ঘরের দরজা, জানালা, চৌকাঠ এবং কাঠের বিভিন্ন আসবাবপত্র প্রচুর ব্যবহৃত হতো। বিশাল আকৃতির কারুকার্যময় খাট, পালং, চেয়ার, টেবিল প্রায় সব সম্পন্ন বাড়িঘরে দেখা যেত। পেশা হিসেবে একসময় কাঠমিস্ত্রির যথেষ্ট কদর ছিল। তাদের হাতের নানা কারুকাজ এসব আসবাবপত্র আর গৃহসামগ্রীকে এক শৈল্পিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত করতো। কাঠমিস্ত্রি হিসেবে মণিপুরি কাঠমিস্ত্রির বেশ সুনাম ছিল। তাদের তৈরি করা খাট-পালং বা দরজার চৌকাঠ ও পাল্লায় যে শিল্পবোধের পরিচয় থাকত, তা যথেষ্ট প্রশংসিত হতো। Sylhet District Gazzetteer থেকে B. C. Allen-এর একটি মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উদ্ধৃত করা যেতে পারে: 'The best carpenters are

Manipuris and they often enrich the boxes and bedsteads they turn out with a little carving.' (Allen: 1905: 157)।

অধ্যায়-৪

জনপ্রশাসন

সিলেট ভূখণ্ড আনুমানিক একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কামরূপ রাজ্যের অধীনে ছিল। পরবর্তী রাজনৈতিক পালাবদলে মধ্যযুগে লাউড়, গৌড় ও জৈন্তিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৩০৩ সালে হজরত শাহজালাল (র.)-এর সিলেট বিজয়ের মধ্য দিয়ে সিলেটে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে। মোগল শাসনের শুরু থেকে সিলেট বাংলা সুবাদারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন ফৌজদারি এলাকা হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। বাংলায় নবাবি শাসন কায়েম হওয়ার পর রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করে সিলেটকে নবগঠিত ঢাকাকেন্দ্রিক উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুর্শিদকুলি খানের কেন্দ্রীভূত রাজস্বনীতি গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাকে চাকলা নামক যে ১৩টি নতুন প্রশাসনিক স্তরে বিভক্ত করা হয়, সিলেট ছিল এর অন্যতম একটি। তবে ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুবা বাংলার দেওয়ানি লাভের পর সুবার ৬০ শতাংশ রাজস্ব প্রদানকারী ১৫টি বড়ো জমিদারির তালিকায় সিলেট অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বাংলার অন্যান্য এলাকার মতো সিলেটে কোনো বংশানুক্রমিক বড়ো জমিদার ছিলেন না। সুবার আওতাধীন সচ্ছল ও শক্তিশালী জমিদাররা যেভাবে স্থানীয় প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন, সিলেটের অসংখ্য ক্ষুদ্র ভূম্যাধিকারীগণ সে ধরনের ক্ষমতা প্রদর্শন করতেন না। তবে তাঁরা সরকার ও রায়তদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রক্ষা করে চলতেন। ফলে, জেলার বেসামরিক প্রশাসনে ফৌজদার, আমিল, দেওয়ান, চাকলাদার ও কানুনগোদের ওপর নবাবের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ছিল লক্ষণীয়।

১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় রাজনৈতিক এবং সামরিক আধিপত্য বিস্তার করে। ১৭৬৫ সালে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে তারা বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বও নিজেদের হাতে নেয়। ১৭৭২ সালে বিচার প্রশাসনের দায়িত্বও তাদের হাতে চলে যায়। ১৭৬৫ সালের পর পরই সিলেটও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে আসে। সে সময় মুহাম্মদ আলী খান কুইমজঙ্গা সিলেটের ফৌজদার ছিলেন।

১৭৮২ সাল পর্যন্ত সিলেট ঢাকা উপ-প্রাদেশিক প্রশাসনের সরাসরি অধীনে ছিল। ১৭৮২ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকা প্রশাসন থেকে সিলেটকে আলাদা একটি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করা হয়।

মোগল প্রশাসন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশের এমন একটি সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন কাঠামো সৃষ্টি করা, যার মাধ্যমে জনজীবনে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা, ভূমিরাজস্ব আদায় এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারের সার্বিক

প্রভাব বজায় রাখা সম্ভব হয়। মোগল আমলে সরকার বা জেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসন (General Administration) প্রধান ছিলেন ফৌজদার, ভুমি রাজস্ব আদায়সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রধান ছিলেন আমিল এবং বিচারব্যবস্থার প্রধান ছিলেন কাজি। তাদের কাজের আলাদা আলাদা অধিক্ষেত্র ছিল। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস পরগনা, সরকার ও জেলাকে সমন্বিত করে একটি ডিস্ট্রিক্ট বা জেলাপ্রশাসন নামক প্রশাসনিক ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবেই আধুনিক জেলা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। নবসৃষ্ট জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট নামকরণ করা হয়। সময়ের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে জেলা প্রশাসনের কর্মপরিধি বাড়তে থাকে। ১৭৭২ সালে সিলেট জেলার আয়তন ছিল ৩৮০০ বর্গমাইল এবং এর জনসংখ্যা ছিল ৪,৯২,৯৪৫ জন। উইলিয়াম মেকপেস থ্যাকারে ১৭৭২ সালে সিলেটের প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন।

থ্যাকারে যখন সিলেটে আসেন (১৭৭২) তখন শহরে কালেক্টরের উপযুক্ত কোনো আবাসন সুবিধা ছিল না। থ্যাকারে শহরের চার কিলোমিটার (আড়াই মাইল) আগে টিলাগড়ে অবস্থিত একটি টিলার ওপরে তাঁর আবাসস্থল নির্মাণ ও এর সন্নিকটে দীর্ঘ দিঘি (থ্যাকারে ট্যাংক) খনন করেন। থ্যাকারে আবাসস্থলের কারণে পরবর্তীসময়ে এই টিলা থ্যাকারে টিলা নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মুরারিচাঁদ কলেজ টিলাগড়ে স্থানান্তরিত হলে উল্লিখিত থ্যাকারে টিলায় কলেজ অধ্যক্ষের বাসভবন, কলা ভবন, লাইব্রেরিসহ অন্যান্য স্থাপনা গড়ে ওঠে।

ব্রিটিশ প্রশাসনে কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন প্রশাসনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। তিনি ছিলেন জেলার নির্বাহী প্রধান এবং তার অধিক্ষেত্রের প্রশাসক। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ এবং রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ ছিলেন তার অধীন। প্রাথমিকভাবে তিনি একাধারে প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রধান সিভিল জজ ছিলেন, পরবর্তী সময়ে এটি পরিবর্তন করে জেলা ও দায়রা জজ পদের সৃষ্টি করা হয়। জেলা রেজিস্ট্রি, জেলখানা, সিভিল ডিফেন্স, আবগারি শুল্ক, তথ্য বিভাগ সরাসরি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

১৮৭৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত সিলেট ছিল ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৭৪ সালের ১২ সেপটেম্বর সিলেটকে নবসৃষ্ট আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভাগ করে যখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়, তখন সিলেটেরঅন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে সিলেট পুনরায় আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৪৭ সালের পূর্বপর্যন্ত আসামেরই একটি জেলা হিসেবে থেকে যায়। ১৯৪৭ সালে সিলেট গণভোটের মাধ্যমে সিলেট পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত এবং পাকিস্তান দুটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় গণভোটের মাধ্যমে সিলেট জেলা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। তখন প্রশাসনিকভাবে সিলেট ছিল চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। তখন পূর্ব পাকিস্তানের

১৭টি জেলার একটি ছিল সিলেট। সেসময় সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এই চারটি মহকুমা নিয়ে গঠিত হয় সিলেট জেলা। ব্রিটিশ সিলেটের অপর মহকুমা করিমগঞ্জ ভারতের সাথে যুক্ত করা হয়।

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন সময়ে সিলেটের জেলা প্রশাসকের দায়িত্বে ছিলেন এ. সামাদ, মো. তৌহিদ খান এবং সৈয়দ আহমদ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও সিলেটে চারটি মহকুমা ছিল। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার মহকুমাকে পৃথক জেলায় রূপান্তর করা হয়। তখন নবগঠিত সিলেট জেলার আয়তন দাঁড়ায় ৩৪৫২.০৭ বর্গকিলোমিটার।

সিলেট বিভাগীয় প্রশাসন

১৯৯৫ সালের ১ আগস্ট সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার এই চারটি জেলা নিয়ে বাংলাদেশের ষষ্ঠ বিভাগ-সিলেট বিভাগ গঠিত হয়। বিভাগ ঘোষণার পর সিলেট জেলা পরিষদ ভবনে সিলেট বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯৭ সালের ২০ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেট সদর থানার (বর্তমানে দক্ষিণ সুরমা উপজেলা) আলমপুর নামক স্থানে গোটাটিকর মৌজাস্থিত সিলেট-গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার-জকিগঞ্জ রোডের উত্তরপার্শ্বে বিভাগীয় সদর দপ্তরের অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০০ সালে নব নির্মিত ভবনে সিলেট বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। সিলেট বিভাগের প্রথম বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন যুগ্ম সচিব জনাব হাবিবুর রহমান।

বিভাগের রাজস্ব ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান ও আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধন করাই বিভাগীয় কমিশনারের প্রধান কাজ। তিনি বিভাগের অভিভাবক হিসেবে কাজ করেন। সিলেট বিভাগ ৪টি জেলা, যথা সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ নিয়ে গঠিত। বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় আইনশৃঙ্খলা কমিটির প্রধান হিসেবে বিভাগের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তদারকি ও বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করে থাকেন।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

বর্তমান ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসক জেলার প্রশাসনিক প্রধান। জেলা প্রশাসক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জেলার প্রশাসনিক কাজকর্মের ও উন্নয়ন কাজের সমন্বয় সাধন করে থাকেন। তিনি জেলার প্রধান প্রটোকল অফিসার। তিনি জেলার কালেক্টর এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

সিলেট সিটিকরপোরেশনের ১৪ নং ওয়ার্ডের বন্দরবাজারসংলগ্ন এলাকায় বর্তমান সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় অবস্থিত।

জেলা প্রশাসন বর্তমানে জেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন জেলা প্রশাসক (ডেপুটি কমিশনার)। জেলার রাজস্ব প্রশাসন এবং সাধারণ প্রশাসন তথা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার সর্বোচ্চ দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের ওপর ন্যস্ত । তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য ২জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও ১জন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকদের একজন সাধারণ প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক বিষয় এবং অপরজন রাজস্ব বিষয়ে কাজ করেন। পরবর্তী সময়ে কাজের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সাল হতে ২১টি জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) হিসেবে আরেকটি পদ সৃষ্টি করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৩ জানুয়ারি ২০১১ সাল তারিখের ০৫.১৩৯.০২৮.০২.০১.০০৩.২০১০-২৭ নং স্মারকাদেশ মূলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) এর নাম পরিবর্তন করে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি) করা হয় এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা)-এর ৬৪টি পদ সৃষ্টি করা হয়। এ ছাড়াও জেলা প্রশাসককে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেক জেলায় রয়েছেন ১জন উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (ডি.ডি.এল.জি), ১জন রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আর.ডি.সি), ১জন ভূমি অধিগ্রহণ অফিসার (এল.এ.ও), ১জন জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার (জি.সি.ও) ১জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১জন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা। তা ছাড়া এ জেলায় ২১টি সহকারী কমিশনারের পদ রয়েছে। ৩০৪টি (তৃতীয় শ্রেণি) অফিস সহকারীর মঞ্জুরিকৃত পদের বিপরীতে ১৬৩জন কর্মচারী জেলা প্রশাসন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস এবং উপজেলা ভূমি অফিসে কর্মরত আছেন।

জেলা প্রশাসনের কাজ মূলত তিন ভাগে বিভক্ত: সাধারণ, ভূমি রাজস্ব ও আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত। ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের কাজ মূলত ভূমি নিয়ে। ভূমি রাজস্ব আদায় এবং সরকারি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করাই এর প্রধান কাজ। ভূমি রাজস্ব আদায় এবং রাজস্ব প্রশাসন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে এ জেলায় একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জরিপ বিভাগে একজন জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রেজিস্ট্রি অফিসে একজন জেলা রেজিস্ট্রার রয়েছে। তা ছাড়াও উপজেলাপর্যায়ে প্রতিটি উপজেলায় একজন সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং তাঁর অধীনে ভূমি সহকারী ও ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা রয়েছেন।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ মূলত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (ডি.এম)-এর ওপর ন্যস্ত। ডি.এম জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেলা পুলিশ বিভাগের পুলিশ সুপার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জেলা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা প্রদান করেন। বর্তমানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (ডি.এম)-এর অধীনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৮,১০০,১০৭,১৪৪,১৪৫ ধারার বিচারকার্য সম্পন্ন করে থাকে। জেলার বিভিন্ন বিভাগের কাজের

সমন্বয়সাধনসহ শিক্ষা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত সকল কাজ জেলা প্রশাসনের অধীনে হয়ে থাকে। জেলা প্রশাসনের কাজের পরিধি অনেক ব্যাপক। শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের মধ্যে রয়েছে জেলা পর্যায়ের সকল পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা, সকল ধরনের নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনাসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান তদারকি করা এবং এর উন্নয়নে কাজ করা। তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তির প্রসারের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রসহ এ সম্পর্কিত সকল বিষয় সরাসরি জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, সমাজসেবা, সমবায়, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিস, যুব উন্নয়ন পল্লী উন্নয়নসহ আরও অনেক বিভাগের সাথে জেলা প্রশাসন সরাসরি যুক্ত হয়ে কাজ করে থাকে।

নির্বাচন পরিচালনা জেলা প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেশের জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন সরাসরি জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে হয়ে থাকে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক জাতীয় নির্বাচনে জেলা প্রশাসক এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এবং তদনিম্নপদস্থ কর্মকর্তাগণ রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। জেলা নির্বাচন অফিস নির্বাচনকালীন অফিসারদের সহায়তা করে থাকেন। নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ, র‍্যাব, সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), ব্যাটালিয়ন আনসার, এপিবিএনসহ আনসার, ভিডিপি, প্রভৃতি বিভাগের সাথে সমন্বয় করে জেলা প্রশাসন কাজ করে থাকে। সাধারণ প্রশাসনের আরেকটি অন্যতম দিক হলো দুর্যোগ মোকাবিলা। জেলা প্রশাসক পদাধিকারবলে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি। জেলা প্রশাসন দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার মাধ্যমে দুর্যোগকবলিত লোকজনকে উদ্ধার, সেবা প্রদান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং জেলা প্রশাসন কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাপ্ত অথবা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রী দুর্যোগকবলিত লোকজন ও সাধারণ গরিব মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়ে থাকে।

সিলেটের উপজেলা সমুহ:

১। সিলেট সদর, ২। কোম্পানীগঞ্জ, ৩। গোয়াইনঘাট, ৪। জৈন্তাপুর, ৫। কানাইঘাট, ৬। জকিগঞ্জ, ৭। বিয়ানীবাজার, ৮। গোলাপগঞ্জ, ৯। ফেঞ্চুগঞ্জ, ১০। দক্ষিণ সুরমা, ১১। বালাগঞ্জ, ১২। বিশ্বনাথ ও ১৩। ওসমানীনগর

বাংলাদেশ পুলিশ, সিলেট রেঞ্জ

সিলেট রেঞ্জ পুলিশ সৃষ্টি ও জেলা/ইউনিটের নাম:

সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলার আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার, জননিরাপত্তা ও পুলিশি সেবা দ্রুততার সাথে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার স্বার্থে বর্ণিত ০৪টি জেলা ও রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স (আরআরএফ), সিলেটের সমন্বয়ে গত ০১/৮/১৯৯৫ তারিখে সিলেট রেঞ্জ

পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়। সিলেট রেঞ্জ সৃষ্টির আগে উক্ত ০৪টি জেলা চট্টগ্রাম রেঞ্জের অধীনে ছিল।

সিলেট রেঞ্জের সর্বপ্রথম ডিআইজি ছিলেন জনাব আব্দুর রহিম খান। সিলেট মেট্রোপলিটন এলাকার মোগলাবাজার থানাধীন সিলেট সিটি করপোরেশন ২৭নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত আলমপুর নামক স্থানে অবস্থিত বিভাগীয় সদরদপ্তরের ১নং ভবনে বর্তমানে সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সিলেট রেঞ্জ কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো:

সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে বর্তমানে ০১ জন ডিআইজি, ০১ জন অতিরিক্ত ডিআইজি, ০১ জন পুলিশ সুপার, ০৩ জন অতিরিক্ত এসপি, ০৩ জন এএসপি, ০২ জন ইন্সপেক্টর, ০৪ জন এসআই, ০৪ জন এএসআই, ১৪ জন কনস্টেবল, ০১ জন প্রধান সহকারী, ০১ জন স্টেনোগ্রাফার, ০১ জন হিসাবরক্ষক, ০৩ জন অফিস সহকারী, ০২ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও ০৪ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীসহ সর্বমোট = ৪৫টি মঞ্জুরিকৃত পদ রয়েছে।

সার্কেলের সংখ্যা- ১৮টি। থানার সংখ্যা- ৩৯টি (০৬টি মডেল থানাসহ)। (সিলেট রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের সার্কেল, থানা, ফাঁড়ি, তদন্তকেন্দ্র, ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট নামের তালিকা এতদসঙ্গে সংযুক্ত) তদন্ত কেন্দ্রের সংখ্যা-১১টি। ফাঁড়ির (টিওপি/ওপি) সংখ্যা-১৬টি (এর মধ্যে ০৪টি নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি ও ০১টি টোল প্লাজা রয়েছে)। ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের সংখ্যা-০৮টি। সিলেট রেঞ্জের সর্বমোট মঞ্জুরিকৃত জনবল- বর্তমানে সিলেট রেঞ্জের পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীর সর্বমোট মঞ্জুরিকৃত জনবল ৭৫৮৯ জন।

সারণি-৩০

১৯০২ সালে সিলেট জেলা পুলিশ ফোর্সের পরিসংখ্যান

(উত্তর সিলেট/সিলেট সাবডিভিশন)

থানা/ফাঁড়ির নাম	এসআই	হেড কনস্টেবল	কনস্টেবল
সিলেট সদর থানা	৩	--	১২
সিলেট থানাধীন শহর ফাঁড়ি	১	--	৩৮
সিলেট থানাধীন গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ি	১	--	৫
সিলেট থানাধীন গোয়াইনঘাট ফাঁড়ি	১	--	৬
সিলেট থানাধীন ফেঞ্চুগঞ্জ ফাঁড়ি	--	১	২
কানাইঘাট থানা	১	--	৮
কানাইঘাট থানাধীন জৈন্তাপুর ফাঁড়ি	১	--	৪
গোলাপগঞ্জ থানা	২	--	৮
গোলাপগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথ বাজার ফাঁড়ি	১	--	৫

করিমগঞ্জ সাবডিভিশন

থানা/ফাঁড়ির নাম	**এসআই**	**হেড কনস্টেবল**	**কনস্টেবল**
করিমগঞ্জ থানা	৩	০১	১৬
করিমগঞ্জ থানাধীন পাথারকান্দি ফাঁড়ি	১	০১	৫
করিমগঞ্জ থানাধীন রাতাবাড়ি ফাঁড়ি	১	--	৫
জলডুব থানা	২	--	৮

দক্ষিণ শ্রীহট্ট/মৌলভীবাজার সাবডিভিশন

থানা/ফাঁড়ির নাম	এসআই	হেড কনস্টেবল	কনস্টেবল
মৌলভীবাজার থানা	২	--	১৪
মৌলভীবাজার থানাধীন শ্রীমঙ্গল ফাঁড়ি	২	--	৬
কুলাউড়া থানা	২	--	৮

হবিগঞ্জ সাবডিভিশন

থানা/ফাঁড়ির নাম	এসআই	হেড কনস্টেবল	কনস্টেবল
হবিগঞ্জ থানা	৪	-	১৪
হবিগঞ্জ থানাধীন মুচিকান্দি ফাঁড়ি	২	-	৮
নবীগঞ্জ থানা	২	-	১০
বানিয়াচং থানা	২	-	৮
বানিয়াচং থানাধীন আবিদাবাদ ফাঁড়ি	১	-	৬
মাধবপুর থানা	২	-	৮
মাধবপুর থানাধীন লাখাই ফাঁড়ি	১	-	৮

১ আগস্ট ১৯৯৫ সালে বৃহত্তর সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার ৪টি জেলা নিয়ে সিলেট বিভাগ তথা সিলেট রেঞ্জ গঠিত হয়। সিলেট বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সিলেট কোতোয়ালি থানা, বিয়ানীবাজার, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ, ফেঞ্চুগঞ্জ, জকিগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, কানাইঘাট থানা নিয়ে সিলেট জেলা ছিল। পরে ২০০৬ সালে সিলেট জেলার কোতোয়ালি থানা নিয়ে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠিত হয়।

সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠিত হওয়ার পর গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও ওসমানীনগরসহ ১১টি থানা নিয়ে বর্তমান বর্তমান পুলিশ সুপারের

এখতিয়ারাধীন জেলা গঠিত হয়। পুলিশ সুপারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সিলেট জেলার পুলিশের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

সিলেট জেলা পুলিশের সার্কেলসমূহ

সিলেট জেলা পুলিশ ৩টি সার্কেলে বিভক্ত। বিশ্বনাথ থানা, ওসমানীনগর থানা, ফেঞ্চুগঞ্জ থানা, বালাগঞ্জ থানা ও গোলাপগঞ্জ মডেল থানা নিয়ে সিলেট সদর দক্ষিণ সার্কেল, কানাইঘাট থানা, জৈন্তাপুর থানা, কোম্পানীগঞ্জ থানা, গোয়াইনঘাট থানা নিয়ে সিলেট সদর উত্তর সার্কেল এবং জকিগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার থানা নিয়ে জকিগঞ্জ সার্কেল গঠিত। প্রতিটি সার্কেলের দায়িত্বে আছেন একজন সহকারী পুলিশ সুপার এবং তিনি থানার সার্বিক কাজকর্ম তদারকি করেন।

তা ছাড়াও জেলায় তামাবিল ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, জকিগঞ্জ ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ও শেওলা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট নামে ৩টি চেকপোস্ট, তামাবিল-জাফলং পুলিশ ফাঁড়ি, সালুটিকর পুলিশ ফাঁড়ি ও চারখাই নামে ৩টি পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে।

বর্তমানে সিলেট জেলা পুলিশের মঞ্জুরিকৃত অফিসার ও ফোর্সের সংখ্যা ১৭৮৪ জন এবং বর্তমানে ১৫৬৯ জন অফিসার ও ফোর্স জেলায় কর্মরত আছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পুলিশের বহুমাত্রিক কাজের কারণে জেলার জনসংখ্যার অনুপাতে ফোর্সের সংখ্যা কম হওয়ায় জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে আরও পুলিশ ফোর্সের প্রয়োজন।

সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি)

ক) সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কার্যক্রম গত ২৬.১০.২০০৬ সাল থেকে শুরু হয়। এসএমপির আয়তন প্রায় ৫১৮.৪৩ বর্গকিলোমিটার (সিলেট মহানগর এলাকা সিটি করপোরেশন ২৭টি ওয়ার্ড এবং ১৮টি ইউনিয়ন এলাকা নিয়ে গঠিত); এসএমপির মঞ্জুরিকৃত থানার সংখ্যা ৬টি; (কোতোয়ালি, দক্ষিণ সুরমা, শাহপরান, জালালাবাদ, এয়ারপোর্ট ও মোগলাবাজার থানা); এসএমপির মঞ্জুরিকৃত পুলিশ ফাঁড়ির সংখ্যা ৬টি; (বন্দরবাজার, লামাবাজার, আম্বরখানা, শিবেরবাজার, দক্ষিণ সুরমা ও সোবহানীঘাট পুলিশ ফাঁড়ি); এসএমপির মঞ্জুরিকৃত পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের সংখ্যা ৩টি (শাহজালাল মাজার, শাহপরান মাজার ও কামাল বাজার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র); প্রথমে কোতোয়ালি ও দক্ষিণ সুরমা থানা এলাকা নিয়ে এসএমপির কার্যক্রম শুরু হয়; ১১.০৮.২০১১ সালে আরো ৪টি থানা (শাহপরান, জালালাবাদ, এয়ারপোর্ট ও মোগলাবাজার থানা)-এর কার্যক্রম শুরু হওয়ায় বর্তমানে এসএমপির থানার সংখ্যা ৬টি; পুলিশ বক্স-এর সংখ্যা ৪টি (ওসমানী মেডিকেল, পাঠানটুলা, টিলাগড় ও লাউয়াই পুলিশ বক্স)।

(খ) এসএমপির জনবল

১. এসএমপির শুরুতে মঞ্জুরিকৃত জনবল ছিল ১৫৫৮;

২. এসএমপির শুরুর পর বিগত আট বছরে ৮৮৪টি নতুন পদ সৃষ্টি হওয়ায় এসএমপির বর্তমান জনবল ২৪৪২। এসএমপির বিভিন্ন পদবির আরও ৩৭১৯টি পদ সৃষ্টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয় শহরের ধোপাদীঘির পূর্বপাড়ে অবস্থিত। বিভাগীয় কার্যালয় প্রধানের পদবী অতিরিক্ত পরিচালক এবং জেলা কার্যালয় প্রধানের পদবী উপপরিচালক। সিলেট জেলা কার্যালয়ের অধীনে ১৩টি উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয় এবং ১টি মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসারের কার্যালয় রয়েছে। সিলেট জেলায় ১০৫ টি ইউনিয়ন ও ৪টি পৌরসভায় ৩২১ টি ব্লকে উপসহকারী কৃষি কর্মকতার মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তাছাড়া নগরী'র মেহেন্দীবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ফলের চারাকলম তৈরি করে বিতরণ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর

সিলেটের প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে নানা জাতের গবাদি পশু। জেলার কৃষিকার্যক্রম এখনো পুরোপুরি যান্ত্রিক কাঠামোতে যায়নি, যে-কারণে স্বাভাবিকভাবেই কৃষি গোরু-মহিষের ওপর নির্ভরশীল। দুধ ও প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস হিসেবেও গবাদি পশু ও হাঁসমুরগির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ ও সাধারণ জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় দুধ ও প্রাণিজ প্রোটিনের সরবরাহ নিশ্চিত করতে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সিলেট নগরীর টিলাগড় এলাকায় জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস অবস্থিত।

জেলা মৎস্য অফিস

এককালে বাড়িতে বাড়িতে ছিল পুকুর, কয়েক মাইল পর পর দিঘি এবং অসংখ্য জলাশয়। নদী, খাল, বিল, হাওর তো ছিলই। বর্তমানে পুকুর ও দিঘি প্রায় বিলুপ্তির পথে। জেলা মৎস্য অফিস স্থানীয় পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্ধারিত ও নির্দেশিত কাজ করে যাচ্ছে। সাগরদিঘীর পাড়, সুবিদবাজার, সিলেটে জেলা মৎস্য অফিস অবস্থিত।

সিলেট জেলায় বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো :

১. মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তি, ২. বিল নার্সারি স্থাপন, ৩. মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, ৪. পুকুর-দিঘিতে উন্নত প্রযুক্তিতে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ, ৫. মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ৬. মৎস্যজীবী/জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান এবং ৭. মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর উপর স্থানীয় পর্যায়ে পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত। এলজিইডির মূল উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল

অংশীদারদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্থানীয় অবকাঠামোগত সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল বিংশ শতাব্দির ষাটের দশকের গোড়ার দিকে পূর্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে, যেখানে পল্লী পূর্ত কর্মসূচী (RWP), থানা সেচ কর্মসূচী (TIP) এবং থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (TTDC) অন্তর্ভূক্ত ছিল। উনিশ' সত্তরের দশকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (MLGRD & C) এর স্থানীয় সরকার বিভাগে (LGD) একটি 'সেল' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা দেশব্যাপী পূর্ত কর্মসূচী পরিচালনার জন্য ১৯৮২ সালে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং-এ রুপ লাভ করে। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে উক্ত উইং রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) রূপে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৯২ সালের আগস্টে এলজিইবি কে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) হিসাবে উন্নীত করা হয়।

সিলেট নগরীর বাগবাড়ি এলাকায় নবাব রোডে প্রায় ৬.৫০ একর জায়গার উপর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর(এলজিইডি) সিলেট-এর কার্যালয় অবস্থিত। উক্ত ক্যাম্পাসে এলজিইডির বিভাগীয়, আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয় রয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলীর অধীনে ১৩ টি উপজেলায় ২৪৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারীসহ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে ১ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, ২ জন সহকারী প্রকৌশলী সহ মোট ২২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে।

সিলেট সড়ক বিভাগ ১৯৪৭ সনে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তির পর পাকিস্তানের সকল নির্মাণ কার্যাদি সম্পাদনের ভার গণপূর্ত বিভাগের উপর ন্যস্ত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৬২ সালে এই বিভাগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এর ১টি গণপূর্ত অধিদপ্তর ও অন্যটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। সিলেট সড়ক বিভাগ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পূর্বে সি. এন্ড বি নামে পরিচিত ছিলো। বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলার সকল সড়কসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ ও কালভার্ট উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই সড়ক বিভাগের অধীন মোট ৪ টি সড়ক উপ-বিভাগ রয়েছে যথা: সিলেট সড়ক উপ-বিভাগ, গোলাপগঞ্জ সড়ক উপ-বিভাগ, বিশ্বনাথ সড়ক উপ-বিভাগ এবং যান্ত্রিক উপ-বিভাগ। এ সড়ক বিভাগের আওতাভূক্ত মোট সড়ক সংখ্যা ২৮ টি যার মোট দৈর্ঘ্য ৫৪৪.৬৮ কি.মি.। তন্মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৭ টি, দৈর্ঘ্য ১৩৯.১৪ কি.মি.; আঞ্চলিক মহাসড়ক ৮টি, দৈর্ঘ্য ১৬২.০১ কি.মি.। এছাড়া এ বিভাগ জেলা মহাসড়কসহ এবং এর আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ সেতু, কালভার্ট এর উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষন-কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সিলেট নগরী'র চৌহাট্রায় সড়ক ভবন অবস্থিত। ১৩২ জন তন্মধ্যে ১ম শ্রেনীর কর্মকর্তা ৫ জন (নির্বাহী প্রকৌশলী-১জন, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী-৩ জন, সহকারী প্রকৌশলী-১জন), ২য় শ্রেনীর কর্মকর্তা-১২ জন (উপ-সহকারী প্রকৌশলী-১১ জন, বিভাগীয় হিসাব রক্ষক-১জন) এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী ১১৫ জন।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট জোন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি অধিদপ্তর। উক্ত অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, মেরামত ও সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে। উক্ত অফিস সিলেট জেলার তালতলা ভিআইপি রোডে অবস্থিত।

গণপূর্ত বিভাগ

সিলেট শহরের তালতলা এলাকায় গণপূর্ত বিভাগের কার্যালয় অবস্থিত। সিলেট গণপূর্ত বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রাক্কলন ও দরপত্র অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সৃষ্ট জটিলতা, সমস্যা সমাধান এবং প্রক্রিয়াকরণ গণপূর্ত বিভাগের এখতিয়ারভুক্ত।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই অফিসের আওতায় সিলেটে বিগত বছরগুলোতে স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনার অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। সিলেট নগরীর চৌহাট্টায় কার্যালয়টি অবস্থিত। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে এই কার্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় কার্যলয়ের দপ্তর প্রধানের পদবী নির্বাহী প্রকৌশলী। বিভাগীয় কার্যালয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীসহ ১০ জন জনবল রয়েছে। এই কর্যালয়ের আওতায় বিভাগের ৪ জেলায় ৪ টি জেলা কার্যালয় রয়েছে। জেলা কার্যালয়ের দপ্তর প্রধানের পদবী সহকারী প্রকৌশলী।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে (ওয়াসাভূক্ত ও সিটি করপোরেশন এলাকা ব্যতিত) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে Lead Agency হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট এর কার্যালয় নগরীর ৩৩, সাগরদিঘিরপাড়, সুবিদবাজার এ অবস্থিত। কার্যালয়টির প্রধান এর পদবী নির্বাহী প্রকৌশলী। তিনি সহ এই কার্যালয়ে মোট ১০ জন জনবল রয়েছে।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচালনা কার্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা) সমূহকে এই কার্যালয়টি কারিগরী সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও আক্রান্ত এলাকা গুলোতে হাইজেনিক কিট, পানি বিশুদ্ধকরন ট্যাবলেট ও জেরিক্যান বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক নাগরিকগন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক পরীক্ষাগার থেকে খাবার পানির বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করাতে পারেন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট জেলাধীন ১৩টি উপজেলার আওতাধীন এলাকা ও পৌরসভা সমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কাজ চলমান আছে যা জেলা কার্যালয় থেকে নিয়ন্ত্রন করা হয়।

প্রত্যেক উপজেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অফিস আছে এবং উক্ত অফিস সমূহ হতে ফিল্ড কিটের মাধ্যমে পানির আয়রন ও আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয় এবং পানির উৎস স্থাপন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন সহ নাগরিকগণকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (সাবেক গৃহসংস্থান অধিদপ্তর) ১৯৫৮ সাল থেকে বাস্তুহারা পুনর্বাসনসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে স্বল্পব্যয়ে বাসস্থান নির্মাণ করে আসছে। অব্যবহারযোগ্য জমিকে বসবাস উপযোগী প্লট, ফ্ল্যাট, নিউক্লিয়াস বাড়ি, সেমি পাকাবাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করে অল্প জমিতে অধিক পরিমাণ লোকের সুপরিকল্পিত বাসস্থানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। শুধু নগরই নয়, গ্রামপর্যায়েও এ প্রতিষ্ঠানটি বিস্তার লাভ করেছে। সিলেটে সংস্থাটির উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে, শহরের উপকণ্ঠে অনাবাদি, ব্যবহার-অনুপযোগী ও জলাবদ্ধ প্রায় ২০০ একর জমির ওপর শাহাজালাল উপশহর নামের হাউজিং এস্টেট গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে নানা আকারের আবাসিক, বাণিজ্যিক, প্রাতিষ্ঠানিক, শিল্পসহ প্রায় ২০০০(দুই হাজার) প্লট সৃষ্টি করে বিভিন্ন পেশার জনগণের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা সিলেট শহর তথা বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম অভিজাত আবাসিক এলাকার মর্যাদা পেয়েছে। প্রকল্পটি ১৭৭৩-৭৪ সালে বাস্তবায়ন করা হয়। সাদিপুর, শিবগঞ্জ, সিলেট এলাকায় জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কার্যালয়টি অবস্থিত।

জেলা শিক্ষা অফিস শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন মাঠ প্রশাসনের জেলা-পর্যায়ের অফিস হচ্ছে জেলা শিক্ষা অফিস সিলেট। নগরীর তালতলা এলাকায় এর অবস্থান। জেলা শিক্ষা অফিসার এর অফিসপ্রধান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমস্ত নিদের্শনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং দাখিলপর্যায়ের মাদরাসার বহুমুখী সেবা প্রদান করে থাকে শিক্ষা অফিস। জেলার ১৩টি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সমস্ত কার্যক্রমও তদারকি করে এই অফিস।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট নগরীর তালতলায় অবস্থিত। ০১ জুন ১৯৮৪ তারিখে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট এর সমস্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি ১৪৭০ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮৩৫৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকার কাজের তদারকি সহ নানাবিধ কাজকর্ম ও বহুমুখী সেবা প্রদান করে থাকে এই অফিস। এ অফিসের অধীন ১৩টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সমস্ত কাজ কর্ম তদারকি করা হয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ১ জন, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ২ জন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ১৩ জন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ৭১ জন প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন করে থাকেন। এ অফিসের অধীনে ১৪ জন

উচ্চমান সহকারী, ২০ জন অফিস সহকারী, ১২ জন হিসাব সহকারী, ১ জন ষ্টোর কিপার, ১৪ জন অফিস সহায়ক এবং ১ জন গাড়ীচালক রয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অফিস

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো রাজস্বখাতভুক্ত একটি মহাপরিচালকের দপ্তর। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অধীনে মাঠপর্যায়ে প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অফিস জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অবস্থিত। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, সিলেটের কার্যালয়টি জেলা প্রশাসক, সিলেট কার্যালয়ের ৩নং ভবন (চারতলা ভবন) এর ৩য় তলার ৩০৭/১নং কক্ষে অবস্থিত। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর জেলা প্রধানের পদবি হচ্ছে সহকারী পরিচালক।
সিলেট উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কার্যাবলি :

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রম বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

২. এনজিওদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি।

৩. বিভিন্ন ব্যক্তি/ দপ্তরে/ সংস্থায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বিভিন্ন উপকরণ/ লার্নিং ম্যাটারিয়ালস্ সরবরাহ করা হয়।

৪. সামাজিক উদ্বু দ্ধকরণ যেমন বিভিন্ন র‌্যালি, সভা সমাবেশ ও বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

১৯৬৭ সালে সিলেট নগরীর জিন্দাবাজার এলাকায় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন মৌসুমে সরকারি ধান সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে এই অফিস। চালকল মালিকদের সঙ্গে চুক্তির তারিখ, চুক্তির সময়, চুক্তির জন্য প্রযোজ্য কাগজ ও দলিলপত্রাদি যাচাই-বাছাই করে থাকেন জেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক।

সিভিল সার্জন অফিস

জেলা সিভিল সার্জন অফিস সিলেট নগরীর চৌহাট্টা এলাকায় অবস্থিত। সিভিল সার্জন এই অফিসের প্রধান কর্মকর্তা। জেলার ১৩টি উপজেলায় অবস্থিত ২৫ টি ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিলেট শহরে অবস্থিত ৮০ শয্যা বিশিষ্ট ০১ টি কুষ্ট হাসপাতাল, ৫৬ শয্যা বিশিষ্ট ০১ টি বক্ষ ব্যাধি হাসপাতাল যেখানে ঔষধ প্রতিরোধী (এমডিআর) যক্ষা রোগীদের চিকিৎসা প্রদান সহ ব্যয়বহুল অত্যাধুনিক বায়োসেফটি ল্যাব (বিএসএল-৩) স্থাপনের মাধ্যমে রোগ নির্নয় করা হয়, ০১ টি বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, ০১ টি স্কুল হেলথ্ ক্লিনিক, ০১ টি গভঃ কলেজ ডিসপেন্সারী, নবগঠিত ৩০ শয্যা বিশিষ্ট খাদিমপাড়া হাসপাতাল সহ চালুকৃত ২৬০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ইপিআই কার্য্যক্রম সহ সকল প্রকার স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা এই অফিসের দায়িত্ব।

আন্তঃ ও জরুরী বিভাগে চিকিৎসা সেবা, টিকাদান কর্মসূচী, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, প্রসূতি সেবা,

যক্ষা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রন কর্মসুচী, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী, বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী সহ স্বাস্থ্য বিভাগীয় গৃহীত অন্যান্য সকল প্রকার কর্মসূচীরও তদারকী করে থাকেন সিভিল সার্জন।

জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় আন্তঃ ও জরুরি বিভাগে চিকিৎসা সেবা, টিকাদান কর্মসূচি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, প্রসূতি সেবা, যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচিরও তদারকি করে থাকেন সিভিল সার্জন।

সিলেট নগরীর সাগরদিঘিরপাড় এলাকায় জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় অবস্থিত। একজন উপপরিচালক এই কার্যালয়ের প্রধান অধিকর্তা। তার অধীনে সহকারী পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), সহকারী পরিচালক (সিসি) এবং মেডিকেল অফিসার (সিসি) এই অফিসে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

জেলার পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করাই পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের অন্যতম কাজ। এছাড়াও জেলার মাতৃ ও শিশু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা, উপজেলাপর্যায়ে নিয়মিত ও বিশেষ স্থায়ী পদ্ধতির বিশেষ কার্যক্রম আয়োজন নিশ্চিত করা, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের প্রজনন স্বাস্থ্য জরুরি প্রসূতি সেবা, শিশুবান্ধব, নারীবান্ধব ও কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি করে থাকে জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ডাক তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন মাঠপ্রশাসনে জেলাপর্যায়ের অফিস হলো বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, সিলেটের কার্যালয়। সিলেট শহরের বন্দরবাজার এলাকায় এর অবস্থান। একই ভবনে পরিচালিত হচ্ছে দুইটি প্রশাসনিক কার্যালয়। একটি হচ্ছে সিলেট ডিভিশনাল অফিস, অন্যটি সিলেট প্রধান ডাকঘর। ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল হচ্ছেন সিলেট বিভাগীয় অফিসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা। একটি প্রধান ডাকঘর, ২১টি উপজেলা ডাকঘর, ৫৮টি উপ-ডাকঘর, ৩৩৪টি শাখা ডাকঘর ও ৭টি ইডি উপ-ডাকঘর নিয়ে এর প্রশাসনিক এলাকা।

সিলেট প্রধান ডাকঘরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হচ্ছেন সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল। সিলেট প্রধান ডাকঘর, ২১টি টাউন সাব পোস্ট অফিস ও ১৩টি শাখা ডাকঘর ও ২টি ইডি উপ-ডাকঘর নিয়ে এর প্রশাসনিক এলাকা। উভয় প্রশাসনের অধীনস্থ অফিসের মাধ্যমে চিঠিপত্র, পার্সেল, মানি অর্ডার, ইলেক্ট্রনিক্স মানি ট্রান্সফার, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, ডাক জীবনবীমা, সঞ্চয় ব্যাংক, পোস্টেজ ও রাজস্ব স্ট্যাম্প বিক্রয়সহ বহুমুখী সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে এই বিভাগের মাধ্যমে।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সিলেট বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিস নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ, অস্থায়ী সংযোগ, বিদ্যুৎ-বিভ্রাট/বিল/মিটার-সংক্রান্ত অভিযোগ ও বিল পরিশোধ-সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা

প্রদান করে থাকে। নগরীর শাহী ঈদগাহ এলাকায় পিডিবির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

সিলেট পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি

১৯৯০ সালে যাত্রা শুরু করে সিলেট পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি। জেলার কৃষি, শিল্প ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে সেবাদানকারী এই প্রতিষ্ঠানটি। আধুনিক সেচব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, বৃহৎসহ মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক প্রসার এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে সংস্থাটি। লাভ নয়, লোকসান নয়, গ্রাহকগণই প্রকৃত মালিক, এই সেবার মূলনীতিতে এবং সমবায় ভিত্তিতে সিলেট পল্লি বিদ্যুৎ সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সিলেট জেলায় ২টি পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি রয়েছে। পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি-১-এর কার্যালয় দরবস্ত, জৈন্তাপুর এবং পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর কার্যালয় কদমতলী, সিলেট এ অবস্থিত।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয়

জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জেলা পর্যায়ের অফিস। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এ অফিসটি অবস্থিত। এই কার্যালয় কাবিখা ও টিআর কর্মসূচির প্রকল্প বাস্তবায়নসহ যেকোনো দুর্যোগে জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দ ও বিতরণে ভূমিকা রাখে।

জেলা ক্রীড়া অফিস

জেলার সর্বত্র ক্রীড়া কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও শিশু-কিশোর সংগঠনের মধ্যে খেলাধুলা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি এবং শারীরিক শিক্ষার বিকাশ সাধনের জন্য ১৯৭৭ সালে যাত্রা শুরু করে সিলেট জেলা ক্রীড়া অফিস। উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও ক্রীড়াপঞ্জি অনুযায়ী বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন, জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের জন্য সুপারিশ, আর্থিকভাবে অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের ভাতা প্রদানের জন্য সুপারিশ, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় গৃহীত ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে এই অফিস বদ্ধপরিকর। নগরীর জেল রোডে জেলা ক্রীড়া অফিস অবস্থিত।

জেলা শিল্পকলা একাডেমি

১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমি নগরীর শাহী ঈদগাহ এলাকায় অবস্থিত। শিল্পকলা একাডেমি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ছাড়াও জেলা পর্যায়ে লোকগীতি, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত এবং সাধারণ লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। জাতীয় বিভিন্ন দিবসও একাডেমির পক্ষ থেকে পালন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সিলেট জেলা শাখা মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। নগরীর রিকাবীবাজার এলাকায় ১৯৮১

সালের ৯ এপ্রিল সিলেট জেলা শাখার যাত্রা শুরু হয়। শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনই একাডেমির লক্ষ্য।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয় সিলেট শহরের বাগবাড়ি এলাকায় জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সিলেট অবস্থিত। এখানে রয়েছে জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সরকারি শিশু পরিবার (বালক), ছোটোমণি নিবাস, মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন (সেফহোম), সিলেট ইনকুলসিভ স্কুল অ্যান্ড কলেজ ইত্যাদি কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে ১২টি উপজেলায় ১২টি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সিটি করপোরেশন এলাকায় ১টি শহর সমাজসেবা কার্যালয় এবং সিলেট শহর ও শহরতলিতে ৭টি প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

জেলা নির্বাচন অফিস সিলেট জেলা নির্বাচন অফিস বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি ও বিতরণ এবং সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। জনগণের সার্বিক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক যাবতীয় কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্নের জন্য জেলা নির্বাচন অফিস অঙ্গীকারবদ্ধ। নগরীর মেন্দিবাগ এলাকায় অবস্থিত আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশনে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় অবস্থিত।

জেলা তথ্য অফিস সরকারের যাবতীয় উন্নয়নমূলক বার্তা সরাসরি প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া জেলা তথ্য অফিসের অন্যতম প্রধান কাজ। পিছিয়ে-পড়া সাধারণ জনগণকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, খাদ্যাভ্যাস, যৌতুকপ্রথা বিলুপ্ত, বাল্য বিবাহ বন্ধ, এইডস, দুর্নীতি ও মাদক প্রতিরোধ, টিকাদান কর্মসূচি, মাদক নিয়ন্ত্রণ, শিশু ও নারী উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, ইভটিজিংসহ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে সচেতন করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা জেলা তথ্য অফিসের প্রচার কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। নাগরিক জীবনে সুবিধাবঞ্চিত খেটে-খাওয়া মানুষ যাদের কাছে বিনোদনের কোনো উপকরণ নেই সেইসব মানুষের কাছে ছুটে যায় জেলা তথ্য অফিসের সিনেমাভ্যান। বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পল্লি সংগীতানুষ্ঠানসহ প্রয়োজনীয় আলোচনার মাধ্যমে জনগণকে বিনোদনের মধ্য দিয়ে সচেতন করে তোলা হয়। সাধারণ জনগণের কাছাকাছি গিয়ে তাদের সুবিধা-অসুবিধা জানা এবং সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি জনগণকে সরাসরি জানানো হয়। জনগণকে উদ্বু দ্ধ করতে জেলা তথ্য অফিস শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে। নগরীর আম্বরখানা, বড়োবাজার এলাকায় জেলা তথ্য অফিস অবস্থিত। এই অফিসের অফিস প্রধান একজন উপ-পরিচালক।

জেলা পরিসংখ্যান অফিস বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জাতীয়

পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দেশের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দায়িত্বরত। এটি দেশের সব ধরনের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, তথ্য-উপাত্তবিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আদমশুমারি, কৃষিশুমারি ও অর্থনৈতিক শুমারি এবং কৃষি, অকৃষি, অর্থনীতি, স্বাসহ্য, জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করে থাকে। জিডিপি এবং মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যানও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশ করে থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর সিলেট বিভাগীয় অফিস নগরীর উপশহর এলাকায় এবং জেলা অফিস চাঁদনীঘাটে অবস্থিত। বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস প্রধানের পদবি যুগ্মপরিচালক এবং জেলা পরিসংখ্যান অফিস প্রধানের পদবি উপপরিচালক। মাঠপর্যায়ে বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ের মাধ্যমে বিবিএস শুমারি, জরিপসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাস হওয়ায় একদিকে পরিসংখ্যানের কাজের আওতা এবং পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কার্যক্রম গতিশীল, সমন্বিত ও লক্ষভিত্তিক হয়েছে। জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়নে প্রণীত এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত National Strategy for Development of Statistics (NSDS) অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শুমারি, জরিপসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

জেলা জজশীপ

সিলেট জেলা জজশিপ সিলেটের সুরমা নদীর উপর নির্মিত পুরাতন ক্বীনব্রিজ ও সার্কিট হাউজ এর উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। বর্তমানে সিলেট জজশিপের বিচারিক, প্রশাসনিক এবং দাপ্তরিক কার্যাবলি দুইটি পুরাতন একতলা ভবন, ১টি তিন তলা ভবন এবং ১টি নতুন ৫তলা ভবনে চলছে। বাংলাদেশে ১৮৩১ সালে জেলা জজ পদের সৃষ্টি হয়। একজন জেলা জজ, ২ জন সাবজজ এবং ১০ জন মুন্সেফ নিয়ে জেলা জজ আদালত ব্যবস্থা শুরু হয়। সিলেট জজশিপের শুরু কবে থেকে তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও রেকর্ডরূমের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৮৬২ কিংবা তারও পূর্ব থেকে এখানে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং তৎকালিন রেকর্ড পর্যালোনায় দেখা যায় ১৮৬২ সালে এখানে ১টি জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ১টি যুগ্ম জেলাজজ আদালত ও ১টি মুন্সেফকোর্ট ছিল এবং ১৯৩০ সালের পর সদর এডিশনাল মোন্সেফ কোর্ট শুরু হয়। বর্তমানে পুরাতন ভবন সমূহের মধ্যে ১৯০৩ সালে নির্মিত ২টি ভবন আছে তন্মধ্যে ১টি ভবনে রেকর্ডরুম, ৩টি সহকারী জজ আদালত ও এই জজশিপের হিসাব রক্ষণ

অফিস অবস্থিত এবং অন্য ১টি ভবনে ৩টি আদালতের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে ১ টি জেলা জজ আদালত, ৪টি অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, ৪টি যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ৪টি সিনিয়র সহকারী জজ আদালত ও ৮টি সহকারী জজ আদালত সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অধীন ১টি অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ৫টি সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং ৫টি জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত রয়েছে।

এছাড়া জেলা জজ পর্যায়ের ৪টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল রয়েছে যথা:

০১। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল (কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৬ সালে),

০২। জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল (কার্যক্রম শুরু হয় ২০০০ সালে),

০৩। বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত (কার্যক্রম শুরু হয় ২০০১ সালে) এবং

০৪। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল (কার্যক্রম শুরু হয় ২০০২ সালে) ।

বর্তমানে (০২/০৭/২০১৭ হতে অদ্যবধি) জনাব ড. মোঃ গোলাম মর্তুজা মজুমদার, সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে জেলা ও দায়রা জজ আদালত সিলেট এ কর্মরত আছেন।

বর্তমান সময়ে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের পর ২০০৭ইং সনের ০১লা নভেম্বর থেকে জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেসী ও তৎপরবর্তী সময়ে মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেসী এবং মহানগর দায়রা আদালতের বিচারিক কার্যক্রম চলছে এবং উক্ত আদালত সমূহের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১টি নতুন ১২তলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। যা অত্র জজশিপের কম্পাউন্ডেই অবস্থিত।

মহানগর জজ-এর কার্যালয়

মহানগর দায়রা জজ এর কার্যালয়, সিলেট জেলা জজ আদালত, সিলেট প্রাঙ্গানে অবস্থিত। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, বিচার শাখা-৪ এর ২১ এপ্রিল, ২০১৩খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ২৩/০৭/২০১৩খ্রি. তারিখে উক্ত আদালত সৃষ্টি হয়। ০৪ জন বিজ্ঞ বিচারক, ০১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ১৭ জন কর্মচারীর মাধ্যমে এই আদালতের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই কার্যালয়ের আওতায় আরও ০৩টি আদালত রয়েছে।

আতালত সমুহ-

১। মহানগর দায়রা জজ আদালত, সিলেট।

২। অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত, সিলেট।

৩। যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, সিলেট।

৪। যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ২য় আদালত, সিলেট।

বর্তমানে (০৮/১১/২০১৮খ্রি. হতে অদ্যাবধি) জনাব মো: মফিজুর রহমান ভূঞা, বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ, সিলেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিলেট

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজেস্ট্রেট আদালত

জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গন, সিলেট এ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিলেট এর কার্যালয় অবস্থিত। ০১/০৯/২০১৩ খ্রি তারিখে কার্যালয়টির কার্যক্রম শুরু হয়। এর অধীন আরও ৪টি আদালত এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই ৫ টি আদালতে মোট ৫ জন বিচারক এবং ৩৭ জন কর্মচারী রয়েছেন।

০১ । চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিলেট

০২। অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিলেট।

০৩। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালত, সিলেট।

০৪। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালত, সিলেট এবং

০৫। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৩য় আদালত, সিলেট।

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র বন্দরবাজারসংলগ্ন ওসমানী শিশু পার্কের পশ্চিমপার্শ্বে অবস্থিত। এটি ১৭৮৯ সালে তৎকালীন জেলা কালেক্টর জন উইলিস প্রায় ১ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৭ সালের ৩ মার্চ কারাগারটি কেন্দ্রীয় কারাগারে রূপান্তর করা হয়। সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে (পুরুষ ১১৮৫ + মহিলা ২৫) মোট ১২১০ জন এবং কারা হাসপাতাল ও টিবি হাসপাতালে ১৬২ জন বন্দীর ধারণক্ষমতা রয়েছে। কারাগারের প্রধান ফটকসংলগ্ন একতলা ভবনটি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উক্ত অফিসে সিনিয়র জেল সুপার, সহকারী সার্জন, জেলার, ডেপুটি জেলারসহ সকল কর্মকর্তা অফিসে তাঁদের জন্য নির্ধারিত কক্ষে অবস্থান করেন।

কারাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বন্দীদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তাদের সাথে মানবিক আচরণ করা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিত করাসহ সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করাই কারা প্রশাসনের কাজ।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

সিলেট নগরীর তালতলা এলাকায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিলেট কার্যালয় অবস্থিত। সংবাদপ্রাপ্তির সাথে সাথে ফায়ারসার্ভিস কর্মীগণ সরঞ্জামাদিসহ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে থাকেন। যে-কোনো দুর্যোগে ১৯৯ ডায়াল করলেই এই সেবা পাওয়া যায়।

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস

সিলেট বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। শহরের আলমপুর এলাকায় বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস

অবস্থিত। এই অফিস থেকে বাংলাদেশে বিদেশিদের গমনাগমনের জন্য ভিসা প্রদান এবং বাংলাদেশিদের বিদেশে গমনাগমনের জন্য পাসপোর্ট প্রদান করে থাকে। বর্তমানে জরুরি নতুন পাসপোর্ট (মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট) ও সাধারণ নতুন পাসপোর্ট (মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট) ২টি ক্যাটাগরির পাসপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে।

আনসার ও ভিডিপি ১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আনসার বাহিনী গঠিত হয়। তৎকালীন পূর্ববাংলা আইন পরিষদে আনসার অ্যাক্ট অনুমোদিত হলে ওই সালের ১৭ জুন তা কার্যকর হয়। এই বাহিনী আনসারবাহিনী আইন ১৯৯৫ এবং ব্যাটালিয়ন আনসার আইন অনুযায়ী বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে। সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের আখালিয়ায় আনসার ও ভিডিপির সিলেট কার্যালয় অবস্থিত।

আনসার ও ভিডিপি সিলেট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য-সদস্যাগণকে ভিডিপি সংগঠন সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং ভিডিপি প্লাটুনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম করে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে ।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বাংলাদেশে ৫২টি সার্কেল এবং ৭টি বিভাগীয় কার্যালয় নিয়ে বিআরটিএ'র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে বিআরটিএ, সিলেট সার্কেল অন্যতম। নিজস্ব অফিস ভবন না থাকায়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তৃতীয় তলায় স্বল্পপরিসরে কয়েকটি কক্ষ নিয়ে বিআরটিএ'র, সিলেট সার্কেল তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। পরিবহণ সেক্টরের রাজস্ব আহরণ এবং পরিবহণসংশ্লিষ্টদের সেবা প্রদানই বিআরটিএ অফিসের মূল কাজ। এছাড়াও এই অফিস থেকে অনলাইনে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন, ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়পত্র প্রদান, ফিটনেস সনদ ইস্যু ও নবায়ন, রুট পারমিট-সংক্রান্ত সেবাসহ পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সবধরনের সেবা প্রদান করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদফতর সিলেট নগরীর টিলাগড় এলাকায় যুব উন্নয়ন অধিদফতরের কার্যালয় অবস্থিত। যুবদের কর্মস্পৃহা ও কর্ম উদ্দীপনার ওপর জাতির উন্নতি সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। যুবদের ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত বাস্তবমুখী শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি যুবদের উৎসাহিত করা ও তাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলি বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে সিলেট যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কার্যক্রম শুরু করে। জাতীয় যুবনীতি ২০০৩ অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছরের বয়সসীমার মধ্যে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশি নাগরিককে যুব বলে গণ্য করা হয়।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় সিলেট শহরের নয়া সড়ক এলাকায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় অবস্থিত। এই অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে মহিলাদের উন্নয়ন-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সিলেট জেলার একটি মহিলা সহায়তা কেন্দ্র, একটি

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং ১৩ উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যক্রম এই অফিস নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ১০ (দশ) টি উদ্যোগ হিসেবে সিলেট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের ১০ বছরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিম্নরূপ:

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	অর্থ বছর										মোট উপকার ভোগী	মন্তব্য
		২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮		
১।	ভিজিডি কর্মসূচি (উপজেলার ইউনিয়ন পর্যায়ে)	৪৯৯ জন	-	৪০০ জন	-	৪০০ জন	-	৪০০ জন	-	৯০০ জন	-	২৫৯৯ জন	প্রতি মাসে ৩০ কেজি হারে ০২ বছর চক্রে চাল/গম বিতরণ করা হয় এবং নির্বাচিত এনজিও দ্বারা আ— সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
২।	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি (উপজেলার ইউনিয়ন পর্যায়ে)	-	১৩৬ জন	১৪৪ জন	১৬৮ জন	১৬০ জন	১৬৮ জন	৩৮৪ জন	৪৪৮ জন	৮৫৬ জন	১০১৬ জন	৩৪৮০ জন	প্রতি মাসে ৫০০/- টাকা হারে ২ বছরের ৪ কিস্তিতে ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খোলা সাপেক্ষে — মাধ্যমে ভাতার টাকা পরিশোধ করা হয় এবং এনজিও দ্বারা সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৩।	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি	-	-	১০০০ জন	-	১০০০ জন	-	১৫০০ জন	-	১৫০০ জন	১৫০০ জন	৬৫০০ জন	প্রতি মাসে ৫০০/- টাকা হারে ২ বছরের ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খোলা সাপেক্ষে —মাধ্যমে ভাতার টাকা পরিশোধ করা হয় এবং এনজিও দ্বারা সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৪।	জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (আধুনিক দর্জি বিজ্ঞান ও এমব্রয়ডারী, মোমবাতি ও থাই ক্লে শো-পিস তৈরি, শো-পিস তৈরি, ব্লক-বাটিক ও নকশীকাঁথা, চটের ব্যাগ তৈরি)	৫০ জন	৫০ জন	৫০ জন	৫০ জন	২০০ জন	২০০ জন	২০০ জন	২০০ জন	২০০ জন	৩১০ জন	২৫১০ জন	৩ মাস মেয়াদি ৫টি ট্রেডে মোট ৫০ জন প্রশিক্ষণা ব্যাচে) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং উপস্থিতি হার ৬০/- টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়। আইজি- আওতায় ৬ মাস মেয়াদি মোবাইল সার্ভিসিং ড্রাইভিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ চলছে।
৫।	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, সিলেট	৬০ জন	৬০ জন	৬০ জন	৬০ জন	৬০ জন	৬০ জন	৬০ জন	৬০ জন	৩০ জন	৬০ জন	৫৭০ জন	৬০ জন শিশু (শ্রমজীবী মেয়েদের) সকাল ৮:৩০-বিকাল

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	অর্থ বছর										মোট উপকার ভোগী	মন্তব্য
		২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮		
													৫:০০ টা পর্যন্ত রাখার সুব্যবস্থা রয়েছে।
৬।	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম (শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিতরণ ও আদায়)	মোট বিতরণ ২৮,৪৫,০০০/-		মোট আদায় ২২০৭৯১২/৯৫								২৬০ জন	প্রতি মাসে কিস্তি আদায় করা হয়।
৭।	‘জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ’ শীর্ষক কর্মসূচি	-		-		-	৫ জন	৫ জন	৫ জন	৫ জন	-	২০ জন	তৃণমূল পর্যায় হতে ৫টি ক্যাটাগরিতে ৫ জন জয়িতা হতে নির্বাচন করে জেলা পর্যায়ে ০৫ জন শ্রেষ্ঠ নির্বাচন করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

জেলা সঞ্চয় অফিস সিলেট নগরীর তালতলায় জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো/অফিস অবস্থিত। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রবর্তিত সঞ্চয় প্রকল্পসমূহে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ ও পেশাজীবীদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সঞ্চয় প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ করানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়। এর ফলে বিনিয়োগকারী যেমন নিজের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে অন্যদিকে তেমনি দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস সিলেট জেলা শহরের পাঠানটুলায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস অবস্থিত। এই অফিসের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের ডাটাবেইজ ও ফিংগার প্রিন্ট সংরক্ষণ এবং বিদেশে কর্মরত কোনো কর্মী মারা গেলে উক্ত কর্মীর লাশ দেশে আনয়ন, লাশ দাফন খরচবহন এবং পরিবারিক ক্ষতিপূরণ এই অফিসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির বিদেশে বকেয়া বেতন, ইন্সু্রেন্স ও মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায় করে তা মৃত ব্যক্তির পরিবারকে প্রদান করা হয়।

আমদানি ও রফতানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর শহরের শিবগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনের প্রেক্ষিতে আমদানি নিবন্ধন সনদ, রফতানি নিবন্ধন সনদ, ইন্ডেন্টিং সনদ জারি ও নবায়ন এ কার্যালয়ের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনি-কেশনস কো. লি. সংস্থাটি সারা দেশেই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জেলার প্রতিটি উপজেলাতেই বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেডের কার্যক্রম চলছে। সংস্থাটির সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয় নগরীর তালতলা এলাকায় অবস্থিত।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন’ প্রতিষ্ঠা করেন। ওই সালের ২৮ মার্চ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট প্রণীত হয়। ১৯৮০ সালে সিলেট জেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন কার্যক্রম শুরু করে। ২০১০ সালে জুলাই মাসে পূর্ব শাহী ঈদগাহের পাশে টিবি গেটসংলগ্ন ৩ একর জায়গার মধ্যে ৫তলা ভবন নির্মাণ করে ইসলাম প্রচার-প্রসারের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলায় মডেল রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর

নগরীর উপশহর এলাকায় পরিবেশ অধিদফতরের সিলেট অফিস অবস্থিত। পরিবেশ অধিদফতর পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কর্মকাণ্ডকে প্রথমত নিরুৎসাহিত করে, দ্বিতীয়ত বাধা দেয় এবং তৃতীয়ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরিবেশ অধিদফতর, সিলেট পরিবেশ অধিদফতর কেন্দ্রীয় কার্যক্রমের আঞ্চলিক বাস্তবায়ন দৃঢ়তার সাথে করে যাচ্ছে। পরিবেশ অধিদফতর পরিবেশ সুরক্ষায় ব্যাপক কর্মসূচিও গ্রহণ থাকে। পরিবেশ অধিদফতরের সাহসী উদ্যোগের ফলে পাহাড়-টিলা কাটা বন্ধসহ পরিবেশ পরিপন্থী কাজকর্ম হ্রাস পেয়েছে।

বন বিভাগ

১৮৮৫ সালের জুলাই মাসে সিলেট জেলার বনাঞ্চল সিলেট বন বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সংরক্ষণ, নতুন বন সৃষ্টি, স্ট্রিপ বাগান সৃজন, চারা উত্তোলন জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে/রাজস্ব মূল্যে বিক্রয় ও বিতরণ, বনজ সম্পদ বিক্রয়ের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ, পর্যটনসুবিধা ছাড়াও অংশীদারত্বমূলক সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বন সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য-বিমোচন ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে বনবিভাগ। তোপখানা রোড, সিলেট এ কার্যালয়টি অবস্থিত।

আবহাওয়া অফিস

দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে আবহাওয়া অফিসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়া ও ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণসহ আবহাওয়ার সকল পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী এ অধিদপ্তর থেকে প্রদান করা হয়। নগরীর শাহী ঈদগাহ এলাকায় সিলেট আবহাওয়া অফিস অবস্থিত। এই অফিস থেকে আবহাওয়া ও জলবায়ুসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের পুর্বাভাস ও সতর্কসংকেত প্রদান করা হয়ে থাকে। যুগোপযোগী আবহাওয়ার উপাত্ত পাওয়ার জন্য সিলেটে দুইটি Automatic Weather Station (AWS) স্থাপন করা হয়েছে। এর একটি ডিএমও, আবহাওয়া অফিসে এবং অন্যটি এএমও, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), সিলেট-এর মতো প্রতিষ্ঠান সরকারের এই লক্ষ্য ও কর্মসূচির বাস্তবায়নে নিয়োজিত। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), সিলেট বিগত তিন বছরে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। খাদিমনগর ও গোটাটিকর এলাকায় বিসিক এর অবস্থান।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুদায়িত্ব। বাংলাদেশে তা পরিচিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন হিসেবে। টেস্টিং ইনস্টিটিউশন, সিলেট বিগত তিন বছরে বেশ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। খাদিমনগর এলাকায় এ কার্যালয়টি অবস্থিত।

জেলা রেজিস্ট্রার জায়গাজমির নিবন্ধনের দায়িত্ব পালন করে বন্দরবাজারস্থ জেলা রেজিস্ট্রার অফিস। প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের দক্ষতা ও স্বচ্ছতার ওপর ভূমিব্যবস্থাপনাকেন্দ্রিক সুশাসন নির্ভর করে। ভূমিব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুদায়িত্ব পালনে জেলা রেজিস্ট্রার অফিস, সিলেট বিগত তিন বছরে বেশ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

উপজেলা প্রশাসন ১৯৮৫ সালে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে। সেই সময় থানা/উপজেলা প্রথমবারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিকস্তরে পরিণত হয়। সিলেট জেলায় বর্তমানে ১৩টি উপজেলা রয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনায় উপজেলা প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপজেলা প্রশাসনিক প্রধান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)। প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনিই উপজেলার সকল বিভাগের কার্যক্রম তদারকি করে থাকেন।

অধ্যায়-৫

ভূমিরাজস্ব ও ব্যবস্থাপনা

সিলেটের রাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় আবুল ফজল রচিত *আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে*। ১৫৭৬ সালে আকবরের রাজত্বকালে বাংলাদেশ প্রথম মোগল শাসনাধীনে আসে। ১৫৮২ সালে সুবে বাংলা (বাংলা প্রদেশ) কে ১৯টি সরকারে এবং ৬৮২টি পরগনায় ভাগ করা হয়। *আইন-ই-আকবরীর* বিবরণমতে, সিলেট সরকার তখন ৮টি মহালে বিভক্ত ছিল। মহালগুলো হলো : ১. কসবা সিলেট, ২. প্রতাপগড়, ৩. বানিয়াচং, ৪. লাউড়, ৫. হরিনগর, ৬. বাজুয়া, ৭. সতর খণ্ডল (বর্তমান সরাইল), ৮. জৈন্তা। ওই বছর সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল সিলেটের রাজস্ব ১,৬৭,০৪০ রূপী নির্ধারণ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে কেবল জৈন্তা পরগনা ছাড়া আর সব পরগনা সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১]

মুসলিম শাসনামলে জায়গির প্রথা ও নিষ্কর ভূমি (লাখেরাজ ভূমি) মঞ্জুরির ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বাদশাহর সামরিক ও শাসন বিভাগের রাজকর্মচারীদের রাজকার্যের বিনিময়ে জায়গির প্রদান করা হতো। জায়গিরদারকে ভূমির মালিকানা প্রদান করা হতো না। ভূমি রাজস্ব আদায় ও ভোগের অধিকার দেওয়া হতো। দু-প্রকারের জায়গির ছিল, শর্তযুক্ত ও শর্তহীন। শর্তযুক্ত জায়গির সিলেটের কর্মকর্তাদের অফিস পরিচালনার খরচ নির্বাহের জন্য প্রদান করা হতো এবং এগুলো যতদিন কোনো বিশেষ অফিসের দায়িত্বে থাকবে, ততদিন বহাল থাকার বিধান ছিল। নিঃশর্ত জায়গির সাধারণত মনসবদার বা জায়গিরদারের সামাজিক মর্যাদা সংরক্ষণ এবং কর্মচারী সৈন্যদল প্রস্তুত রাখার জন্য প্রদান করা হতো। শর্তহীন জায়গির আজীবন ভোগ করা যেত। সিলেটে ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে সুরমা নদী ও খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রায় তিনশত বর্গমাইল এলাকার জায়গিরদার হিসেবে জনৈক উমেদ রাজাকে কার্যরত পাওয়া গিয়েছিল।[২]

পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কার্যত বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাট শাহ আলম থেকে ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর পর সিলেটসহ সারা বাংলা ব্রিটিশ শাসনাধীনে চলে আসে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলের শুরুতে অর্থাৎ ১৭৬৫ থেকে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত কোম্পানির তত্তাবধানে ঢাকা থেকে সিলেটের রাজস্ব আদায় করা হতো। ১৭৭১ সালে সুপারভাইজার হিসেবে সিলেটে মি. সামনার সরাসরি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রথম ও শেষ সুপারভাইজার। সিলেটে

---

[১] সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা, মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, সিলেট, ১৯৯৮, পৃ. ৯৮।

[২] ওই, পৃ. ৯৯।

পরিকল্পিতভাবে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে কালেক্টর পদ সৃষ্টি করা হয় ১৭৭২ সালের ২৭ অক্টোবর। কালেক্টরকে বোর্ড অব রেভিনিউ-এর অধীনে রাজস্ব আদায়, রাজস্বসংক্রান্ত দেওয়ানি মামলার শুনানি গ্রহণ ও রাজস্বসংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নসহ প্রশাসনিক বিবিধ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উইলিয়াম থেকারে প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন । তিনি সিলেটের রাজস্ব ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ধার্য করেছিলেন। ১৭৭৬ সালে মি. হল্যান্ড কালেক্টরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সিলেটের রাজস্ব আড়াই লাখ টাকা ধার্য করেন।[৩]

১৭৭৮ সালেররার্ট লিন্ডসে কালেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি ১৭৮৯ সালের ৩০জুন উইলিসের নিকট দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মি. উইলিস কালেক্টর থাকাকালে দশসালা বন্দোবস্ত ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। তিনি সিলেটকে ১৬৪টি পরগনা এবং ১০টি রাজস্ব ইউনিটে ভাগ করেন। তিনি প্রতি ইউনিটে একজন করে তহশিলদার নিয়োগ করেন। রাজস্ব ইউনিটগুলো হলো:

১। পারকুল, ২। তাজপুর, ৩। রসুলগঞ্জ, ৪। হিংগাজিয়া, ৫। রাজনগর, ৬। নোয়াখালি, ৭। নবীগঞ্জ, ৮। শংকরপাশা, ৯। লস্করপুর ও ১০। প্রতাপগড়।

১৭৯৩ সালে সিলেটে ২৬,২৯৩টি এস্টেট বা মহাল ছিল। এগুলোর রেজিস্টারভুক্ত মালিক ছিল ২৯,৩১৭ জন। ১৮০০ সালে মহালের সংখ্যা খুব একটা না বাড়লেও মালিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১,৪৮,৭৪৮ জনে। এস্টেটগুলোর মধ্যে ৫৩১০টি এস্টেটের খাজনা ১ টাকারও কম ছিল। ১৯২৭-২৮ সালে ৪৯৮২৫টি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত মহালের মধ্যে ৩৯,৩৩৫টি মহালের রাজস্ব ১ টাকা বা তারও কম ছিল। সবচেয়ে বড়ো স্থায়ী বন্দোবস্তকৃত মহালের খাজনা ছিল ২,৭৯১ টাকা এবং সবচেয়ে বড়ো অস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত মহালের খাজনা ছিল ২৫,৫৬৩ টাকা।[৪] ১৮৭৪ সালের ১২ সেপটেম্বর সিলেটকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৮৮৬ সালের দি আসাম ল্যান্ড অ্যান্ড রেভিনিউ রেগুলেশনের আওতায় সিলেটের ভূমি ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

১৮৮৬ সালে এ রেগুলেশন প্রবর্তন হওয়ার পর হতে সিলেট তথা আসামের প্রশাসনিক মর্যাদা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে আসাম পূর্ববঙ্গ ও আসাম (ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম) প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর পুনরায় আসামে চিফ কমিশনার পদের সৃষ্টি করা হয়। সর্বশেষে আসাম স্বতন্ত্রভাবে গভর্নরশাসিত প্রদেশে রূপান্তরিত হয় (১৯২১)।[৫]

সিলেটে ভূমিজরিপ ও বন্দোবস্ত কার্যক্রম

সিলেট জেলার ভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাথে বাংলাদেশের ভূমি বন্দোবস্তের কিছুটা পার্থক্য ছিল। মূল পার্থক্য হলো, সিলেটে ভূমি জরিপ সম্পন্ন করেই

[৩] সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা, মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, সিলেট, ১৯৯৮, পৃ. ১০০।

[৪] ওই, পৃ-১০৩।

[৫] ওই, পৃ. ১০৪।

বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলায় এ ধরনের ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করা হয়নি।

সিলেট জেলায় ব্রিটিশ শাসনামলে বিভিন্ন সময় সময় যে সমস্ত জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে তার তালিকা দেওয়া হলো: **বিভিন্ন জরিপের নাম**

সারণি-৩১

বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত জরিপসমূহ

নং	জরিপের নাম	জরিপকারী	সময়
১।	মেজর রেনেলের জরিপ	মেজর জেমস্ রেনেল	১৭৬৫-১৭৬৬
২।	হস্তবোধ জরিপ	মি. উইলিস	১৭৮৮-১৭৯০
৩।	হালাবাদী জরিপ	মি. ওয়ার্ড ও মি. টুকার	১৮২০
৪।	ইলাম ভূমি জরিপ	লেফটেনেন্ট ফিসার	১৮২৯-১৮৩৪
৫।	বাতিল লাখেরাজ মঞ্জুরি ভূমি খাস করার জন্য জরিপ	ডেপুটি কালেক্টরগণ	১৮৩৬-১৮৪০
৬।	জৈন্তা পরগনা জরিপ	লেফটেনেন্ট থুইলার	১৮৩৭-১৮৮০
৭।	থাকবস্থ জরিপ	-	১৮৫৯-১৮৬৬
৮।	ইলাম এবং অন্যান্য ছোটো ছোটো এবং অস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত মহালের জরিপ	ডেপুটি কালেক্টর এবং সাব ডেপুটি কালেক্টর	১৮৭১-১৮৮০
৯।	জৈন্তা জরিপ	মি. বেকেট	১৮৭৫-১৮৭৮
১০।	করিমগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা ও হবিগঞ্জ এর পাহাড়ি অঞ্চল জরিপ	মেজর বেদলি ও কর্ণেল উডলপ	১৮৭৭-১৮৮৩
১১।	থাকবস্ত জরিপ সঠিকতার জরিপ	পি.এ. জি কাউলি	১৮৮২
১২।	প্রতাপ নগর পরগনা ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ	মি. বেরেট	১৮৯২-১৮৯৩
১৩।	জৈন্তা পরগনা ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ	মি. বেরেট	১৮৯২-১৮৯৩
১৪।	সিলেট প্রপার ইলাম ভূমির ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ	মি. জিসি. দাস ইএসি.	১৮৯৬-১৮৯৭
১৫।	জৈন্তায় স্কট এর বন্দোবস্ত	ডব্লিউ এল স্কট	১৯১৪-১৮
১৬।	আ. রশিদ সেটেলমেন্ট	আ. রশিদ	১৯২২-২৭

সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন

সিলেট আসামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্বের আওতায় আসেনি তবে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫-এর ন্যায় সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৩৬ এ প্রজাদের নিম্নরূপ অধিকার প্রদান করা হয়েছে তা হলো:[৬]

১। ভূমির ওপর প্রজার অধিকার ও দখলের আইনগত স্বীকৃতি দান; ২। যুক্তিসংগত খাজনা নির্ধারণ; ৩। জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ; ৪। প্রজার নিজস্ব প্রয়োজনে যে -কোনো কাজে তার ইচ্ছামাফিক জমি ব্যবহারের অধিকার; ৫। আদালতের নির্দেশব্যতিত প্রজাদের উচ্ছেদ রোধ; ৬। উত্তরাধিকারসূত্রে দখলিস্বত্ব ভোগের ব্যবস্থা; ৭।জমি ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার; ৮। প্রতি খন্ড জমি জরিপ করে রায়তের অধিকারসম্বলিত স্বত্বলিপি ও নকশা প্রণয়নের ব্যবস্থা।

সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনে তিন প্রকার প্রজার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: (ক) মধ্যস্বত্বাধিকারী বা অধীনস্থ স্বত্বাধিকারী বা অধীনস্থ স্বত্বাধিকারী প্রজা, (খ) রায়তি প্রজা, (গ) অধীনস্থ রায়তি প্রজা যারা সরাসরি কোনো রায়তের অধীনে স্বত্ব ভোগ করেন।

রায়তি প্রজাগণকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

(ক) নির্দিষ্ট খাজনা প্রদানকারী রায়ত (Raiyot at fixed rate) : স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট খাজনা আদায় অথবা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হারে খাজনা প্রদানকারী রায়ত।

(খ) দখলাধিকারী রায়ত (Occupancy Raiyot): যে রায়তের কোনো ভূমিতে নিজস্ব দখলের অধিকার রয়েছে।

(গ) অদখলাধিকারী রায়ত (Non-Occupancy Raiyot): যে রায়তের নিজস্ব দখলের অধিকার নেই।

এছাড়া, এ আইনে খাজনার হার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত বিধান রাখা হয়েছে। যদি কোনো প্রজাস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হতে চালু থাকে তাহলে উক্ত প্রজাস্বত্বের ওপর খাজনার হার বৃদ্ধি করা যাবে না। তবে দুটি শর্তে খাজনার হার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(১) প্রজাস্বত্বের শর্ত হিসেবে বা প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে জমিদার খাজনা বৃদ্ধি করার ক্ষমতার অধিকারী তা প্রমাণ করা সম্ভব হলে খাজনা বৃদ্ধি করা যাবে।

(২) স্বত্বের পরিমাণ হ্রাস ছাড়া অন্য কোনো কারণে প্রজা হ্রাসকৃত খাজনার সুযোগ লাভ করে থাকলে এবং জমির উৎপাদিকা শক্তির আওতায় বর্ধিত খাজনা ন্যায্য বিবেচিত হলে খাজনা বৃদ্ধি করা যাবে।

---

[৬] সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা, মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, সিলেট, ১৯৯৮, পৃ. ১০৫

স্বত্ব সম্পর্কিত চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে প্রজাকে স্বত্ব হতে উচ্ছেদ করা যাবে এমন কোনো শর্ত লঙ্ঘন করা ব্যতীত কোনো চিরস্থায়ী প্রজাস্বত্বাধিকারীকে উচ্ছেদ করা যাবে না এবং চিরস্থায়ীস্বত্ব দলিলের মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় হস্তান্তর ও দান করা যাবে মর্মে এ আইনে বলা হয়েছে।

সিলেটে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ও স্টেট একুইজিশান সার্ভে জরিপ কার্যক্রম

বাংলাদেশে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫ সালে প্রণীত হয় এবং এর আওতায় ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে বা সিএস জরিপ পরিচালনা করে ভূমি মালিকানা রেকর্ড করা হয়। সিলেট আসামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫ কার্যকর হয়নি এবং ক্যাডাস্টাল জরিপ (সিএস) ক্রমে রেকর্ডও প্রণীত হয়নি। তবে ১৯৩৬ সালে প্রণীত সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫ এর প্রায় অনুরূপ।

১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় ১৯৫০ সালে সিলেটে ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ শুরু হয়ে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয়। এ জরিপই এস.এ. জরিপ হিসেবে পরবর্তীকালে গণ্য করা হয়। সরকার ২৮ মার্চ ১৯৫৬ তারিখে প্রজ্ঞাপন নং ৪৫১১ এল.আর মূলে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০-এর আওতায় সিলেটে জরিপ পরিচালনার নির্দেশ দেয়। এভাবে ১৯৫০-৫১ সালে পরিচালিত ভূমি জরিপকার্য ১৯৫০ এর আওতায় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় পরিচালিত স্টেট একুইজিশন সার্ভে (এসএ.) জরিপে পরিবর্তিত হয়।

বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতো সিলেট জেলার ভূমিও নানাভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এ এলাকার মাটি খুবই উর্বর। এখানে হাওরও রয়েছে। সিলেট জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনা বৈচিত্র্যপূর্ণ। হাওর, টিলা, পাহাড়, চা-বাগান এবং বিভিন্ন মহালের সমন্বয়ে এখানকার ভূমিব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। ভূমি ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সিলেট জেলায়১৩টি উপজেলায় ১৩টি উপজেলা ভূমি অফিস রয়েছে (১৩টি উপজেলা হলো : সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, জৈন্তাপুর, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট, গোলাপগঞ্জ, জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ ও ওসমানীনগর)। উক্ত ১৩টি উপজেলা ভূমি অফিসের অধীন ৪৯টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস রয়েছে।

উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ রেকর্ড সংশোধন, সংরক্ষণ, রাজস্ব আদায়সহ ভূমিব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

ভূমি উন্নয়ন কর সিলেট জেলায় গত ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে ৬ বছরের ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায় উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৩২

ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায়

ক্রমিক নং	সন	দাবি		আদায়	
		সাধারণ	সংস্থা	সাধারণ	সংস্থা
০১.	২০১০-১১	৬,০৯,২৯,৪৯৫	১৭,৮০,৪৫,৩৯৭	৬,৫১,৮৪,৬২৬	৭১,২২,৮৩৬
০২.	২০১১-১২	৬,১২,৬১,৩৬১	১৯,৪৩,২০,০৬১	৭,০৩,৫১,৪৯০	১,১৬,৭২,৯১৫
০৩.	২০১২-১৩	৬,৫০,৪০,৬৯১	১৪,৯৭,০৯,৬৯৬	৭,৫৯,৮৮,৮৬৪	১,০৬,৯১,০৫৪
০৪.	২০১৩-১৪	৬,৭৯,৬৩,২৬৬	১৭,৩৩,১৯,৯৮৯	৭,৩০,৯৫,৮২২	১,০৫,০৭,৬৬০
০৫.	২০১৪-১৫	৭,৭৯,৯৩,২৫১	১৫,৫৩,৫২,৪১৮	৯,৬২,৭৫,৮৩০	৪,৬৭,২৪,৮১৪
০৬.	২০১৫-১৬	৮,৯৮,৯৪,৩৮৭	১৪,৫৮,১২,০৯৮	১১,৪৭,১২,৭৬২	৩,৬৭,০২,৯৫৩
০৭.	২০১৬-১৭	১০,৭৮,৭১,১৯৭	২০,০৯,৫৩,৬৯৮	১২,০৮,০৫,৯৪৪	১৭,৮১,৫৮,৪৭৫
০৮.	২০১৭-১৮	১১,১৪,৮৪,৪৭৪	২৫,৮৯,৪০,৩৩০	১২,৫২,৮৪,০৭২	৩,২২,৬২,৪১১
	সর্বমোট	৬৫৮০৬৭০১৩	১৩৭৯৬৮২০৮৪	৭৩৮২৭০০৪৮	২৭৭৬০১৯১৪৫

সূত্র: এডিসি (রেভিনিউ), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট।

সিলেট জেলার ভূমি অফিসসমূহ সিলেট জেলার বিভিন্ন ভূমি অফিসসমূহের অবস্থান ও প্রতিষ্ঠাকাল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

উপজেলা	ভূমি অফিসের নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল	মন্তব্য
সিলেট মহানগর/সদর	মহানগর ভূমি অফিস	তোপখানা, সিলেট মহানগর, সিলেট	১৯৮৩	
	চকসুলতানপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	উপশহর, সিলেট মহানগর, সিলেট	-	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের প্রতিষ্ঠাকালের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি
	উত্তরকাছ ইউনিয়ন ভূমি অফিস	চৌকিদেখি, সিলেট মহানগর, সিলেট	-	”
	আখালিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস	নয়াগাও, টুকেরবাজার, সিলেট সদর, সিলেট	-	”
	বহর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	খাদিমপাড়া, সিলেট সদর, সিলেট	-	”
	বিলাজুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	শিবের বাজার, সিলেট সদর, সিলেট	-	”
বালাগঞ্জ	উপজেলা ভূমি অফিস	উপজেলা পরিষদ, বালাগঞ্জ, সিলেট	১৯৮৩	
	বালাগঞ্জ সদর ইউনিয়ন ভূমি	বালাগঞ্জ বাজার,বালাগঞ্জ,	-	”

উপজেলা	ভূমি অফিসের নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল	মন্তব্য
	অফিস	সিলেট		
	সুলতানপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	সুলতানপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট	-	”
ওসমানীনগর	উপজেলা ভূমি অফিস	উপজেলা পরিষদ, ওসমানীনগর, সিলেট	২০১৫	অস্থায়ী ভাবে ভাড়া গৃহে অবস্থিত
	বুরুঞ্জা ইউনিয়ন ভূমি অফিস	বুরুঞ্জা বাজার, ওসমানীনগর, সিলেট	-	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমুহের প্রতিষ্ঠাকালের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি
	তাজপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট	-	”
	খসরুপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	খসরুপুর, সাদিপুর, ওসমানীনগর, সিলেট	-	”
বিয়ানীবাজার	উপজেলা ভূমি অফিস	উপজেলা পরিষদ, বিয়ানীবাজার, সিলেট	১৯৮৩	
	বিয়ানীবাজার সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	বিয়ানীবাজার, সিলেট	-	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমুহের প্রতিষ্ঠাকালের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি
	কুড়ারবাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিস	কুড়ারবাজার, বিয়ানীবাজার, সিলেট	-	”
	লাউতা ইউনিয়ন ভূমি অফিস	লাউতা, বিয়ানীবাজার, সিলেট	-	”
	চারখাই ইউনিয়ন ভূমি অফিস	চারখাই, বিয়ানীবাজার, সিলেট	-	”
	শেওলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস	শেওলা, বিয়ানীবাজার, সিলেট	-	”
কানাইঘাট	উপজেলা ভূমি অফিস	উপজেলা পরিষদ, কানাইঘাট, সিলেট	১৯৮৩	
	কানাইঘাট সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	কানাইঘাট, সিলেট	-	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমুহের প্রতিষ্ঠাকালের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি
	গাছবাড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস	গাছবাড়ী,কানাইঘাট, সিলেট	-	”
	চতুলবাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিস	চতুল, কানাইঘাট, সিলেট	-	”
	দর্পনগর ইউনিয়ন	দর্পনগর কানাইঘাট,	-	“

উপজেলা	ভূমি অফিসের নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল	মন্তব্য
	ভূমি অফিস	সিলেট		
	ঝিংগাবাড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস	ঝিংগাবাড়ী কানাইঘাট, সিলেট	-	”
গোলাপগঞ্জ	উপেজলা ভূমি অফিস	উপজেলা পরিষদ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট	১৯৮৩	
	গোলাপগঞ্জ সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	ফুলবাড়ি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট	-	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমুহের প্রতিষ্ঠাকালের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি
	রানাপিং ইউনিয়ন ভূমি অফিস	উপজেলা পরিষদের পার্শ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট	-	”
	ঢাকা দক্ষিণ ইউনিয়ন ভূমি অফিস	ঢাকা দক্ষিণ বাজার, গোলাপগঞ্জ, সিলেট	-	”
	ভাদেশ্বর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	মোকাম বাজার,গোলাপগঞ্জ, সিলেট	-	”
বিশ্বনাথ	উপজেলা ভুমি অফিস	উপজেলা পরিষদ, বিশ্বনাথ, সিলেট	১৯৮৩	
	বিশ্বনাথ সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	বিশ্বনাথ, সিলেট	-	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমুহের প্রতিষ্ঠাকালের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি
	প্রয়াগমহল ইউনিয়ন ভূমি অফিস	প্রয়াগমহল, খাজাঞ্চী,বিশ্বনাথ, সিলেট	-	”
	রামপাশা ইউনিয়ন ভূমি অফিস	রামপাশা, বিশ্বনাথ, সিলেট	-	”
	দশঘর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	দশঘর, বিশ্বনাথ, সিলেট	-	”
কোম্পানীগঞ্জ	উপজেলা ভুমি অফিস	উপজেলা পরিষদ, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট	১৯৮৪	
	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট (অসথায়ী)	উপজেলা সদর, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট	-	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমুহের প্রতিষ্ঠাকালের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি
ফেঞ্চুগঞ্জ	উপজেলা ভূমি অফিস	পূর্ব ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	১৯৮৩	
	ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়ন	পূর্ব ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার,	-	ইউনিয়ন ভূমি

উপজেলা	ভূমি অফিসের নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল	মন্তব্য
	ভূমি অফিস	ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট		অফিস সমুহের প্রতিষ্ঠাকালের সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি
	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ঘিলাছড়া, ফেঞ্চুগঞ্জসিলেট	যুধিষ্ঠিপুর, ঘিলাছড়া, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	-	“
জৈন্তাপুর	উপজেলা ভূমি অফিস	উপজেলা পরিষদ, জৈন্তাপুর, সিলেট	১৯৮৩	
	জৈন্তাপুর সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	জৈন্তাপুর, সিলেট	-	ইউনিয়ন ভূমি অফিস সমুহের প্রতিষ্ঠাকালের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি
	হরিপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	হরিপুর, জৈন্তাপুর, সিলেট	-	”
	দরবস্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিস	দরবস্ত, জৈন্তাপুর, সিলেট	-	”
গোয়াইনঘাট	উপজেলা ভূমি অফিস	উপজেলা পরিষদ, গোয়াইনঘাট, সিলেট	১৯৮৩	
	গোয়াইনঘাট সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	গোয়াইনঘাট, সিলেট	-	ইউনিয়ন ভূমি অফিস সমুহের প্রতিষ্ঠাকালের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি
	তোয়াকুল ইউনিয়ন ভূমি অফিস	তোয়াকুল, গোয়াইনঘাট, সিলেট	-	”
	সালুটিকর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	সালুটিকর, গোয়াইনঘাট, সিলেট	-	”
	মানিকগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস	মানিকগঞ্জ গোয়াইনঘাট, সিলেট	-	”
	লাফনাউট ইউনিয়ন ভূমি অফিস	লাফনাউট গোয়াইনঘাট, সিলেট	-	”
জকিগন্জ	উপজেলা ভূমি অফিস	উপজেলা পরিষদ, জকিগঞ্জ, সিলেট	১৯৮৩	
	জকিগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস	জকিগঞ্জ বাজার, জকিগঞ্জ, সিলেট	-	ইউনিয়ন ভূমি অফিস সমুহের প্রতিষ্ঠাকালের

উপজেলা	ভূমি অফিসের নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল	মন্তব্য
				সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি
	গনিপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	সোনাসার বাজার, বারঠাকুরী ইউনিয়ন, জকিগঞ্জ, সিলেট	-	”
	আটগ্রাম ইউনিয়ন ভূমি অফিস	কালিগঞ্জ বাজার, মানিকপুর ইনিয়ন, জকিগঞ্জ, সিলেট	-	”
	বিরশ্রী ইউনিয়ন ভূমি অফিস	ইউনিয়ন বাজার, বিরশ্রী ইউনিয়ন, জকিগঞ্জ, সিলেট	-	”
	শাহগলি বাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিস	শাহগলি বাজার, বারহাল ইউনিয়ন, জকিগঞ্জ, সিলেট	-	”
দক্ষিণ সুরমা	উপজেলা ভূমি অফিস	উপজেলা পরিষদ,দক্ষিণ সুরমা, সিলেট	২০০৫	
	মোগলাবাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিস	মোগলাবাজার, দক্ষিণ সুরমা সিলেট	-	ইউনিয়ন ভূমি অফিস সমুহের প্রতিষ্ঠাকালের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি
	জালারপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট	-	”
	লালাবাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিস	লালাবাজার, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট	-	”
	সিলাম ইউনিয়ন ভূমি অফিস	সিলাম, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট	-	”
	লক্ষিপাশা ইউনিয়ন ভূমি অফিস	লক্ষিপাশা, সিলেট সদর, সিলেট	-	”

সিলেট জেলার সায়রাত মহাল :

সিলেট জেলায় অনেকরকম সায়রাত মহাল বিদ্যমান। এক সাথে দেশের অন্য কোনো জেলায় এত রকম সায়রাত মহাল নেই। সায়রাত মহালগুলো হলো :

১। পাথর মহাল, ২। জলমহাল, ৩। বালুমহাল, ৪। মহাল সামীল জলমহাল, ৫। হাটবাজার, ৬। ফেরিঘাট, ৭। বাঁশমহাল, ৮। ঘাষানি মহাল ও ৯। হিজল করচ বাগান।

পাথর মহাল:

বাংলাদেশে প্রাপ্ত পাথর সাধারণত দুভাবে জমা হয়ে থাকে ১.নদীবাহিত পাথর- নদীর বেড ও বেড সংলগ্ন এলাকায় জমা হয় এবং ২. পাহাড়ের পাদদেশে জমা হওয়া পাথর যাকে অ্যালুভিয়াল ফ্যান বলা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন পাথর কোয়ারির পাথর জমা হওয়ার ক্ষেত্রে কোনোটিতে এই দুই পদ্ধতিতে আবার কোনো কোনোটি এক পদ্ধতিতে জমা হওয়ার ব্যাপারটি লক্ষ করা যায়। এছাড়াও ভূতাত্ত্বিকভাবে দেশের বিভিন্ন পাহাড়ে এবং পাহাড়সংলগ্ন সমতল ভূমিতে ভূগর্ভে স্তরবিন্যাসকৃত পাথর রয়েছে।

বিভিন্ন কোয়ারিতে উত্তোলিত পাথরকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা : ১. বড়ো পাথর বা বোল্ডার ২. গ্রাভেল বা ভুতু এবং ৩. সিঙ্গেল। এছাড়া আর এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রাকার পাথর রয়েছে যাকে স্থানীয়ভাবে বুজুরি বলা হয়। সারা দেশে বোল্ডার-এর ব্যাপক চাহিদা থাকায় এর অর্থনৈতিক মূল্য সর্বাপেক্ষ বেশি। এরপর পর্যায়ক্রমে গ্রাভেল বা ভুতু, সিঙ্গেল এবং বুজুরির স্থান। এছাড়াও প্রাকৃতিক ক্ষয়জনিত কারণে ময়লা আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত একধরনের পাথর পাওয়া যায়, যা স্থানীয়ভাবে মরা পাথর হিসেবে পরিচিত, যার অর্থনৈতিক মূল্য কম থাকায় এর ব্যবহার সীমিত।

পাথরের বিভিন্ন উৎস ও অবস্থানকে তিনটি বড়ো শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো: নদীবাহিত পাথর, সমতল ভূমির নিচে অবস্থিত পাথর এবং পাহাড়-টিলায় অবস্থিত পাথর। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

নদীবাহিত পাথরের উৎস ও অবস্থান

সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী ধোলাই, পিয়াইন এবং ডাউকী নদীতে নদীবাহিত পাথর জমা হয়। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড় থেকে প্রাকৃতিকভাবে পাথর ভাটি অঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশের নদীসমূহের তলায় জমা হয়। এরূপ পাথর কোয়ারি সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ, কানাইঘাট উপজেলার লোভাছড়া, গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং, বিছনাকান্দি ও জৈন্তাপুর উপজেলার শ্রীপুর এলাকায় অবস্থিত। এছাড়া শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী শ্রীবর্দী ও ঝিনাইগাতী উপজেলায়ও নদীবাহিত পাথর রয়েছে।

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার উত্তর সীমান্ত বরাবর অধিকাংশ নদী উত্তরে ভারতের মেঘালয় প্রদেশের পাহাড়ি এলাকায় উৎপত্তি হয়ে দক্ষিণে বাংলাদেশের ভিতর প্রবেশ করেছে। এই সমস্ত নদী মেঘালয়ে পাহাড়ি এলাকায় শিলং শিল্ডের কেলাসিত কঠিন শিলা ক্ষয় ও চূর্ণ করে এনে বাংলাদেশের ভিতর পাহাড়ের পাদদেশে এবং নদীবক্ষে কঠিন শিলার নুড়ির মজুদ সৃষ্টি করেছে। এই নুড়িসমূহ গ্রানাইট, কোয়ার্টজাইট, নাইস, কিছু পাললিক শিলাখণ্ড ইত্যাদি দিয়ে গঠিত যা মেঘালয় প্রদেশের কেলাসিত আগ্নেয় ও রূপান্তরিত ভিত শিলারই ক্ষয়প্রাপ্ত ও চূর্ণীভূত খণ্ড মাত্র।

সারণি-৩৩

একনজরে সিলেট জেলার পাথরমহালের তথ্য

উপজেলার নাম	পাথরমহালের নাম	আয়তন (হেক্টরে)
গোয়াইনঘাট	জাফলং	১৫৮.৭০ হেক্টর
	বিছনাকান্দি	৯২.৩৭ হেক্টর
কোম্পানীগঞ্জ	ভোলাগঞ্জ	১৪৫.৬৯ হেক্টর (বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত)
		২৭০.২৩ হেক্টর (সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত)
	সর্বমোট	৪১৫.৯২ হেক্টর
	উৎমাছড়া	১২৩.৮৪ হেক্টর
	রতনপুর	২.৫৯ হেক্টর
	চিকাডহর (শাহ আরফীন টিলা)	১৩৭.৫০ হেক্টর
কানাইঘাট	লোভাছড়া	১৬৩.১১ হেক্টর
জৈন্তাপুর	শ্রীপুর রাংপানি বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারি	১৫.০০ হেক্টর ৭.৫৮ হেক্টর

সূত্র: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট (রাজস্ব শাখা)।

১. জাফলং পাথর কোয়ারি

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার 'জাফলং' পাথর কোয়ারির পাথর ও বালির প্রধান উৎস মেঘালয়ের পাহাড় ও শিলং প্লেটুর শিলাসমূহ। আবহমানকাল থেকে বিভিন্নভাবে মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া জৈন্তা পাহাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ছড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে পতিত হয়ে বালি ও পাথর কোয়ারির সৃষ্টি করেছে। ছড়াসমূহ দিয়ে পাহাড়ের খাড়া ঢাল (Steep Slope) বেয়ে দ্রুত গতিতে পাথর ও বালি প্রবাহিত হয়ে পাহাড়ের পাদদেশে বাংলাদেশ সীমান্তে সমতল ভূমিতে ও নদী বয়ে জমা হয়েছে ও হচ্ছে। বালি ও পাথর খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড় থেকে প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রধানত ডাউকি-পিয়াইন নদী দুটির মাধ্যমে জমা হয়ে বালি এবং পাথরের কোয়ারিতে পরিণত হয়েছে।

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার উত্তর সীমান্ত বরাবর অধিকাংশ নদী উত্তরে ভারতের মেঘালয় প্রদেশের পাহাড়ি এলাকায় উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করেছে। গোয়াইনঘাট উপজেলার অন্তর্গত চৈলাখেল মৌজার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড নিয়ে জাফলং কোয়ারি গঠিত।

জাফলং পাথর কোয়ারি ১ নম্বর খাস খতিয়ানের মোট ১৫৮.৭০ হেক্টর (সরকারি খাস) ভূমি নিয়ে গঠিত।

(উপজেলা ভূমি অফিস, গোয়াইনঘাট, সিলেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত)

ক্রমিক নং	আদায়ের সাল (বঙ্গাব্দ)	আদায়কৃত অর্থ (পরিমাণ)
১.	১৪১৯	১,৮৮,৫৬,৩৪৬/-
২.	১৪২০	১,৯৯,৮৬,২৪৩/-
৩.	১৪২১	১,১৬,৮২,২৩০/-
৪.	১৪২২	১,৩০,২৭,০৯৯/-

২. বিছানাকান্দি পাথর কোয়ারি

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার সদর থেকে প্রায় ১৫-১৬ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিম দিকে মেঘালয় সীমান্ত এলাকায় বিছানাকান্দি কোয়ারির অবস্থান। ভারতে পাহাড়ি ছড়া বাংলাদেশ সীমান্ত পিয়াইন নামধারণ করেছে। এ নদীর অববাহিকা বাংলাদেশ সীমান্তে এ কোয়ারির সৃষ্টি করেছে। গোয়াইনঘাট উপজেলার অন্তর্গত বগাইয়া, বিছানাকান্দি ও কুলমছড়ার পাড় মৌজাসমূহের বিভিন্ন দাগ নিয়ে বিছানাকান্দি কোয়ারি গঠিত। ১ নম্বর খাস খতিয়ানের মোট ৯২.৩৭ হেক্টর (২২৮.১৬ একর) (সরকারি খাস) ভূমি নিয়ে এটি গঠিত।

উক্ত পাথরমহাল থেকে খাস আদায়ের তথ্য নিম্নরূপ:

(উপজেলা ভূমি অফিস, গোয়াইনঘাট, সিলেট থেকে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত)

ক্রমিক নং	আদায়ের সাল (বঙ্গাব্দ)	আদায়কৃত অর্থ (পরিমাণ)
১.	১৪১৯	৪৫,১৯,৩২৫/-
২.	১৪২০	৫৪,০০.৩০০/-
৩.	১৪২১	৬৯,২৫,৩৫০/-
৪.	১৪২২	১,১১,৬৯,৩৬১/-

৩. ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি

সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সদর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তরে মেঘালয় সীমান্ত এলাকায় ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারির অবস্থান। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত ভাইরাই, কালাসাদক ও কালাইরাগ মৌজার বিভিন্ন দাগ নিয়ে কোয়ারি গঠিত। ভারতের মেঘালয় পর্বত থেকে নেমে আসা একটি প্রশস্ত পাহাড়ি ছড়া বাংলাদেশ সীমান্তে এসে ‘ধলাই নদী’ নামধারণ করেছে। এ নদীর অববাহিকা বাংলাদেশ সীমান্তে এ পাথর কোয়ারির সৃজন করেছে। ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি ধলাই নদীর উৎসমুখ থেকে শুরু করে প্রায়

২৭০.২৩ হেক্টর (সরকারি খাস) ভূমি নিয়ে গঠিত। উক্ত ভূমির তফসিল তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	মৌজা ও জেএলনং	জমির পরিমাণ (হেক্টরে)
১.	ভাটরাই ৫৮	১৩৯.৩২
২.	কালাসাদক ৫৭	৬৫.৮৩
৩.	কালাইরাগ ১	৬৫.০৮
সর্বমোট ভূমির পরিমাণ=		২৭০.২৩

উল্লেখ্য, উক্ত পাথর কোয়ারিতে সরকারি খাসভূমি বাদে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ=১৪৫.৬৯ হেক্টর। উক্ত অধিগ্রহণকৃত ভূমি পাথরসমৃদ্ধ এলাকা।

(উপজেলা নির্বাহী অফিস, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত)

ক্রমিক নং	আদায়ের সন (বঙ্গাব্দ)	আদায়কৃত অর্থ (পরিমাণ)
১.	১৪১৬	৮,৪০,৪০০/-
২.	১৪১৭	২২,০১,৮৯৫/-
৩.	১৪১৮	১৮,৫৩,৯০০/-
৪.	১৪১৯	২,৩৬,৭৭,৭০০/-
৫.	১৪২০	২,১১,৩৭,৭০০/-
৬.	১৪২১	২,৮০,৭৩,০৫০/-
৭.	১৪২২	২,২০,৫৪,৩৫০/-
৮.	১৪২৩	২,৬৪,৮৩,৮০০/-

৪. ভোলাগঞ্জ রেলওয়ের রোপওয়ে বাংকার

ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি এলাকা হতে পাথর সংগ্রহের নিমিত্ত ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে প্রকল্পের কাজ ১৯৬৪ সালে শুরু হয় এবং ১৯৭০ সালে শেষ হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে উক্ত প্রকল্পটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তা মেরামত ও পুনর্বাসন করার পর পুনরায় জানুয়ারি ১৯৮০ সাল থেকে রোপওয়ের মাধ্যমে পাথর সংগ্রহ ও পরিবহণের কাজ শুরু হয়। ভোলাগঞ্জ প্রকল্পের জন্য সর্বমোট ১০২৭.৩৩ একর ভূমি রেলওয়ের ব্যবস্থাপনায় থাকার সংস্থান ছিল। এর মধ্যে ৩৫৯.৮৭ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি রেলওয়ের অনুকূলে অধিগ্রহণ করা হয় এবং অবশিষ্ট ৬৬৭.৪৬ একর খাসজমি হিসেবে থেকে যায়। রেলওয়ের অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যে ৩৪৩.৩৯ একর ভূমি ভোলাগঞ্জ কোয়ারি এলাকায় এবং অবশিষ্ট ১৬.৪৮ একর রোপওয়ের ট্রাসেল বরাবর ভোলাগঞ্জ হতে ছাতকবাজার পর্যন্ত রয়েছে।

৫. উৎমাছড়া পাথর কোয়ারি

সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১৫-১৬ কিলোমিটার উওর-পূর্ব দিকে মেঘালয় সীমান্ত এলাকায় উৎমাছড়া পাথর কোয়ারির অবস্থান। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত বনপুর, লামাগ্রাম, বিজয়পাড়ুয়া ও বরমসিদ্দিপুর মৌজার বিভিন্ন দাগ নিয়ে এ কোয়ারি গঠিত। ভারতের মেঘালয় পর্বত থেকে নেমে আসা একটি পাহাড়ি ছড়া বাংলাদেশ সীমান্ত এসে উৎমাছড়া নামধারণ করেছে। বাংলাদেশ সীমান্তে এ ছড়ার সংলগ্ন অংশে এ কোয়ারিটি অবস্থিত। উৎমাছড়া পাথর কোয়ারি ১ নম্বর খাস খতিয়ানের মোট ১২৩.৮৪ হেক্টর (৩০৫.৮৯ একর) (সরকারি খাস) ভূমি নিয়্নে গঠিত।

উৎমাছড়া পাথর কোয়ারি ১ নম্বর খাস খতিয়ানের মোট ১২৩.৮৪ হেক্টর (৩০৫.৮৯ একর) (সরকারি খাস) ভূমি নিয়ে গঠিত।

পাথরমহাল থেকে খাস আদায়ের তথ্য দেওয়া হলো:

(উপজেলা নির্বাহী অফিস, কোম্পানীগঞ্জ, হতে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত)

ক্রমিক নং	**আদায়ের সাল (বঙ্গাব্দ)**	**আদায়কৃত অর্থ (পরিমাণ)**
১.	১৪১৯	১০,৯৫,০০০/-
২.	১৪২০	১৯,৩১,২৪০/-
৩.	১৪২১	২,২৯,৩৬০/-
৪.	১৪২২	১২,০৬৮৫০/-
৫.	১৪২৩-১৪২৪ বাংলা সালের জন্য উল্লিখিত মূল্যে দুই বছরের জন্য বিএমডি কর্তৃক ইজারা প্রদান করা হয়েছে।	৫২,৫০,০০০/-

৬. রতনপুর পাথর কোয়ারি

সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সদর থেকে প্রায় ১৪-১৫ কিলোমিটার উওর-পশ্চিম দিকে মেঘালয় সীমান্ত এলাকায় রতনপুর পাথর কোয়ারির অবস্থান। এলাকাটি বেশ দুর্গম। ভোলাগঞ্জ বাজার থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার যানবাহন চলার পথ আছে। এরপর সোনাই নদী পার হয়ে প্রায় ৫ কিলোমিটার হেঁটে যেতে হয়। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত রতনপুর মৌজার বিভিন্ন দাগ নিয়ে রতনপুর কোয়ারি গঠিত।

ক্রমিক নং	আদায়ের সাল (বঙ্গাব্দ)	আদায়কৃত অর্থ (পরিমাণ)
১.	১৪১০	৮০,০০০/-
২০০৪ সালের পরবর্তী সময়ে আইনগত বিভিন্ন জটিলতার কারণে উক্ত কোয়ারিটি ইজারা দেওয়া হয়নি।		

৭. লোভাছড়া পাথর মহাল

সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার ‘লোভাছড়া’ পাথর কোয়ারির পাথর ও বালি আবহমান কাল থেকে বিভিন্নভাবে মেঘালয় রাজ্যের পাহাড় এবং শিলং প্লাটুর শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ছড়ার মাধ্যমে এদেশে পতিত হয়ে বালি ও পাথর কোয়ারির সৃষ্টি করেছে। উক্ত কোয়ারিসমূহের বালি ও পাথর উজানে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড় হতে প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে লোভা নদীর মাধ্যমে জমা হয়ে বালি এবং পাথরের কোয়ারিতে পরিণত হয়েছে।

সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার সদর থেকে প্রায় ২০/২২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে মেঘালয় সীমান্ত এলাকায় লোভাছড়া কোয়ারির অবস্থান। ভারতের মেঘালয় পর্বত থেকে নেমে আসা একটি পাহাড়ি ছড়া বাংলাদেশ সীমান্ত ‘লোভাছড়া’ নামধারণ করেছে। কানাইঘাট উপজেলার অন্তর্গত বড়োগ্রাম, সাউদগ্রাম, কান্দলা, বাজেখেল, সতীপুর ও নিহালপুর মৌজাসমূহের বিভিন্ন দাগ নিয়ে ‘লোভাছড়া’ কোয়ারি গঠিত।

লোভাছড়া পাথর কোয়ারি ১নম্বর খাস খতিয়ানের মোট ১৬৩.১১ হেক্টর (সরকারি খাস) ভূমি নিয়ে গঠিত।

উক্ত পাথর মহাল হতে খাস আদায়ের তথ্য তুলে ধরা হলো :

(উপজেলা নির্বাহী অফিস, কানাইঘাট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত)

ক্রমিক নং	আদায়ের সন (বঙ্গাব্দ)	আদায়কৃত অর্থ (পরিমাণ)
১.	১৪১৭	৬,২৪,৮৯৮/-
২.	১৪১৮	৭,২৯,৯৮৮/-
৩.	১৪১৯	৭,৯৭,৮৩৬/-
৪.	১৪২০	১৬,৬৭,০২৯/-
৫.	১৪২১	২০,৭৯,২৯০/-
৬.	১৪২২	১৩,৬৩,০৯৯/-
৭.	১৪২৩	১,৬৬,০০,০০০/- (ইজারা)
৮.	১৪২৪	১,৬৬,০০,০০০/- (ইজারা)

৮. শ্রীপুর/রাংপানি বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারি

সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলায় শ্রীপুর/রাংপানি বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারির অবস্থান। উক্ত কোয়ারিটি জৈন্তাপুর উপজেলার অন্তর্গত শ্রীপুর পাহাড়, লক্ষ্মীপুর প্রথম খ-, কেন্দ্রী ও সরুফৌদ মৌজাসমূহের বিভিন্ন দাগ নিয়ে

'শ্রীপুর/রাংপানি বালুমিশ্রিত পাথর' কোয়ারি গঠিত। এটি ১ নম্বর খাস খতিয়ানের মোট ২২.৫৮ হেক্টর (সরকারি খাস) ভূমি নিয়ে গঠিত।
উক্ত পাথরমহাল হতে খাস আদায়ের তথ্য:

(উপজেলা নির্বাহী অফিস, জৈন্তাপুর, সিলেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত)

ক্রমিক নং	আদায়ের সন (খ্রিস্টাব্দ)	আদায়কৃত অর্থ (পরিমাণ)
১.	২৫-১২-২০১২ হতে ৩০-০৪-২০১৪	২৩,১১,৫০০/-
২.	২২-০৬-২০১২ হতে ৩০-০৪-২০১৪	৯,১৮,০০০/-
৩.	মে ২০১৪ হতে মার্চ ২০১৬	মামলার কারণে লিজ কার্যক্রম স্থগিত ছিল
৪.	১৪-০৪-২০১৬ হতে ১৩-০৪-২০১৮ (২ বছরের জন্য লিজ)	৯৯,১০,০০০/-

সারণি-৩৪

একনজরে সিলেট জেলার ইজারাকৃত পাথরমহালের তথ্য

ক্র. নং	ইজারার সন	ইজারাযোগ্য পাথরমহালের সংখ্যা	ইজারা প্রদত্ত পাথরমহালের সংখ্যা	অ-ইজারাকৃত পাথরমহালের সংখ্যা	মোট রাজস্ব প্রাপ্তি	মন্তব্য
১.	১৪১৬ বঙ্গাব্দ	৭টি	৭ টি	--	৮,৪০,৪০০/-	বি,এম,ডি কর্তৃক ইজারা প্রদত্ত। ইজারার সময় ব্যতীত খাস আদায় করা হয়েছে।
২.	১৪১৭ বঙ্গাব্দ	৭টি	৭ টি	--	২২,০১,৮৯৫/-	ওই
৩.	১৪১৮ বঙ্গাব্দ	৭টি	৭ টি	--	৩,৯৮,৮৮,৭৬৬/-	ওই
৪.	১৪১৯ বঙ্গাব্দ	৭ টি	---	৭টি	৪,১৩,৩১,৪৭০/-	বিএমডি-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অ-ইজারাকৃত পাথরমহাল থেকে উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় খাস
৫.	১৪২০ বঙ্গাব্দ	৭টি	--	৭টি	৩,৫৬,০৫,১৩০/-	ওই
৬.	১৪২১ বঙ্গাব্দ	৮ টি	--	৮টি	৩,৬৩,৯৫,২০০	ওই
৭.	১৪২২ বঙ্গাব্দ	৮টি	০১	৭টি	৩,৬৮,৭৩,৭০০/-	ওই
৮.	১৪২৩ বঙ্গাব্দ	৮টি	০৩	৫	৫,৭২,০০,৬৪০/-	ওই

সিলেট জেলার বালুমহাল সিলেট জেলায় মোট ৩৭টি বালুমহাল রয়েছে। এসব বালুমহাল বিভিন্ন উপজেলায় অবস্থিত। উক্ত বালুমহালের মধ্যে হিলুয়াছড়া বালুমহাল সদর উপজেলা এবং এওলাছড়া বালুমহাল ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। সিলেটের বালুমহাল ইজারা প্রদানের মাধ্যমে সরকার প্রচুর রাজস্ব আদায় করে থাকে। বালুমহালসমূহ বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ অনুযায়ী ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে। উক্ত আইন বলবৎ হওয়ার আগে কোনো বালুমহাল ইজারা না হলে খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হতো। উক্ত আইনের ১১ ধারায় ইজারা প্রদান ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিতে বালু বা মাটি উত্তোলন, পরিবহণ, বিপণন ও সরবরাহ করা যাবে না এবং এই মর্মে কোনো রাজস্ব আদায় করা যাবে না বলেও বর্ণিত রয়েছে। ফলে উক্ত আইন অনুযায়ী ইজারা ব্যতীত রাজস্ব আদায় বা খাস কালেকশন সম্ভব নয়।

সিলেট থেকে প্রতিবছর কী পরিমাণ বালু উত্তোলন করা হয় তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে ইজারাকৃত বালুমহাল থেকে উত্তোলিত বালু সিলেটসহ সারা দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তা'ছাড়া ভিটি বালু নামে পরিচিত বালু দিয়ে কোনো জায়গা উঁচু বা ভরাট কাজেও ব্যবহার করা হয়। বালুমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতি বাংলা সালের পহেলা বৈশাখ থেকে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত মেয়াদ হিসাব করা হয় এবং ইজারা মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ের পর সংশ্লিষ্ট ইজারাগ্রহীতাকে বালুমহালের দখল হস্তান্তর করা হয়।

সিলেট জেলার বালুমহালসমূহ হতে আয় ও বালুমহালের তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

সারণি-৩৫

একনজরে সিলেট জেলার ইজারাকৃত বালুমহালের তথ্য

ক্রমিক নং	ইজারার সন	ইজারাযোগ্য বালুমহালের সংখ্যা	ইজারা প্রদত্ত বালুমহালের সংখ্যা	অ-ইজারাকৃত বালুমহালের সংখ্যা	মোট রাজস্ব প্রাপ্তি	মন্তব্য
১.	১৪১৬ বঙ্গাব্দ	৪৬টি	১৪টি	৩২টি	১,৪৭,১৬,০০০/-	--
২.	১৪১৭ বঙ্গাব্দ	৪৭টি	১৪টি	৩৩টি	২,০৪,২৫,৯২৯/-	ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ১ (এক)টি বালুমহাল নবসৃষ্ট হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
৩.	১৪১৮ বঙ্গাব্দ	৩৭টি	১৪টি	২৩টি	২,৪৫,৪১,২০৩/-	সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাসমূহ নদীগর্ভে বিলীন, নদীভাঙন, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও বৈদ্যুতিক টাওয়ার নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার কারণে ইজারা পঞ্জিকা হতে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	ইজারার সন	ইজারাযোগ্য বালুমহালের সংখ্যা	ইজারা প্রদত্ত বালুমহালের সংখ্যা	অ-ইজারাকৃত বালুমহালের সংখ্যা	মোট রাজস্ব প্রাপ্তি	মন্তব্য
৪.	১৪১৯ বঙ্গাব্দ	৩৭টি	১১টি	২৬টি	১,৬৩,৯৭,৬১৫/-	--
৫.	১৪২০ বঙ্গাব্দ	৩৭টি	১১ টি	২৬টি	২,০১,৫০,১৫০/-	--
৬.	১৪২১ বঙ্গাব্দ	৩৭টি	১৩ টি	২৪টি	২,৯৮,৯৩,৩৫১/-	
৭.	১৪২২ বঙ্গাব্দ	৩৫টি	০৮টি	২৭টি	৩,৪৬,৯৭,২০০/-	--
৮.	১৪২৩ বঙ্গাব্দ	৩৫টি	১৬টি	১৯টি	৩,১৮,৭১,৬০০/-	--
৯.	১৪২৪ বঙ্গাব্দ	৩৫টি	১২ টি	২৩ টি	২,৬৯,৫৭,১৫২	--

সূত্র : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট

সারণি-৩৬
সিলেট জেলার বালুমহালের উপজেলাওয়ারি তথ্য (১৪২১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	বালুমহালের নাম	আয়তন (একরে)	অবস্থান	মন্তব্য
০১.	সিলেট সদর	ঝুনিয়া ছড়া	১.২৪	বড়োশালা	--
০২.		গোয়ালীছড়া	৫.৯৫	সাদিপুর গং	--
০৩.		বড়োছড়া	৯.৩৮	দেবপুর গং	--
০৪.		মালনীছড়া	২.০৪	আম্বরখানা	--
০৫.		গুদামছড়া	১১.৯০	বহরআম্বরখানা,	--
০৬.		হিলুয়াছড়া	৩.৮০	কেওয়াছড়া	সিলিকা বালি সমৃদ্ধ
০৭.		বড়োচর (আঞ্জারুয়া)	৬.২০	আঞ্জারুয়া	--
০৮.		তেলনীছড়া	০.৪৮	আম্বরখানা	--
০৯.		মঞ্জালীছড়া	০.৬৭	মঞ্জালীছড়া	--
১০.		ছোটোচর	১৩.১১	চাতল	--
১১.		কুইটুক	৩৬.৯০	কুইটুক	--
১২.		পেশনেওয়াজ	৩৫.৬৩	পেশনেওয়াজ গং	--
১৩.		হাজিরাই	২৪.৮৪	হাজিরাই	--
১৪.		ললিছড়া	৪.৫৯	খিদিরপুর	--
১৫.		তিলকপুর শিবেরখলা	৪৪.৪৭	তিলকপুর গং	--
১৬.	গোলাপগঞ্জ	সুরমা নদী হাতিমনগর	৪২.২৫	হাতিমনগর গং	--
১৭.	কানাইঘাট	সুরাই নদী	১৬.৪৮	সুনাতলপুঞ্জি১গং	--
১৮.		লোভা সুরমা	২৮৪.৪২	ছোটোদেশ গং	--
১৯.		সুরমা নদী নিজদলইকান্দি	১১.৮৮	নিজদলইকান্দি	--
২০.		সুরমা নদী (রাজাগঞ্জ)	৫১.৪৭	রাজাগঞ্জ গং	--
২১.	বিয়ানীবাজার	আঞ্জুরা মোহাম্মদপুর	১.৫০	আঞ্জুরা মোহাম্মদপুর	--

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	বালুমহালের নাম	আয়তন (একরে)	অবস্থান	মন্তব্য
২২.		গজুকাটা	০.৭৫	গজুকাটা	--
২৩.		সোনাই নদী	৬৪.০৪	আব্দুল্লাপুর গং	--
২৪.		আঙ্গারজোর	৮.৫৮	আঙ্গারজোর	--
২৫.		নয়াদুবাগ	২.০০	নয়াদুবাগ	--
২৬.		কুশিয়ারা নদী (ভাগ.দ)	২.৩০	দক্ষিণভাগ	--
২৭.	জকিগঞ্জ	সুরমা নদী (নওয়াগাঁও)	২.৪৫	নওয়াগাঁও	--
২৮.	ফেঞ্চুগঞ্জ	কুশিয়ারা নদী	৬.২৫	সুলতানপুর গং	--
২৯.		এওলাছড়া	১০.৪৮	নিজামপুর গং	সিলিকা বালি সমৃদ্ধ
৩০.	বিশ্বনাথ	কাপনা নদী	৯.০০	নওধার গং	--
৩১.		মাকুন্দা নদী	৪.৮৬	সিঙ্গেরকাছ	--
৩২.	গোয়াইনঘাট	১১৭গোয়াইন নদী , চেঙ্গেরখাল	১৯৫.১০	সালুটিকর গং	--
৩৩.	কোম্পানীগঞ্জ	ধলাই নদী	৪৪৫.০৮	কালাসাদক গং	--
৩৪.		পিয়াইন নদী	১১৫.৬৯	শেরপুর গং	--
৩৫.		ভাটরাই	২০০.০০	ভাটরাই	--
৩৬.	জৈন্তাপুর	সারি নদী	৪২৪.০৯	সরুফৌদ গং	--
৩৭.		বড়োগাং	১৮১.৭৭	নিজপাট গং	--

উৎস: জেলা প্রশাসক সিলেট

জলমহাল বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মোট আয়তন ৪০.৪৭ লাখ হেক্টর। সিলেটের জলাশয়ের পরিমাণ ২.৪৩ লাখ হেক্টর অর্থাৎ বাংলাদেশের মোট জলাশয়ের ৬%। তার মধ্যে ২০৮০২ হেক্টর নদনদী এবং ৩২৭০০ হেক্টর বিল রয়েছে। অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলোর মধ্যে পুকুর এবং কৃত্রিম হ্রদ ব্যতীত অন্যান্য প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহের (নদী, খাল, বিল হাওর ইত্যাদি) মালিকানা সম্পূর্ণভাবে সরকারের ওপর ন্যস্ত হওয়ায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে জেলা প্রশাসন-কর্তৃক এগুলো ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে। সরকারের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনাধীন এই জলাশয়সমূহকে জলমহাল বলা হয় এবং এগুলো কালেক্টরের দপ্তরে রাজস্ব বিভাগে সংরক্ষিত ৬ নম্বর রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ থাকে।

জলমহাল দু-প্রকার : ক. বদ্ধ জলমহাল খ. উন্মু ক্ত জলমহাল।

বদ্ধ জলমহাল যেসব জলমহালের চতুর্সীমা নির্দিষ্ট এবং যেগুলোতে কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাছের সংরক্ষণ, পরিচর্যা ও পালন করার পর মৎস্য আহরণ করা হয়, সে সব জলমহালকে বদ্ধ জলমহাল বলা হয়। জলমহালভুক্ত ভূমি মৎস্য আহরণ পেশা ব্যবসা বা শিল্প করার নিমিত্তে বছরব্যাপী মাছচাষ মাছ ধরার মতো পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণের সুবিধাদি প্রাপ্ত হতে হবে (২০ ডি.এল.আর পৃ. ৪৩৫)।[৭] হাওর, বিল, ঝিল, হ্রদ বাঁওড় ইত্যাদি বদ্ধ জল মহাল।

---

[7] সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা, মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, সিলেট, ১৯৯৮, পৃ. ১৯৪।

উন্মু ক্ত জলমহাল

যেসব জলমহালে পানি বদ্ধ থাকে না , মাছের চাষ বা পালন করা হয় না সেগুলোকে উন্মু ক্ত জলমহাল বলেযেমন নদী, নদীর সাথে স্বভাবত সংযুক্ত খাল, সমুদ্র ইত্যাদি।

জলমহাল সংক্রান্ত তথ্য

সিলেট জেলায় ২০ একরের উর্ধ্বে মোট বদ্ধ জলমহালের সংখ্যা ১৯৬টি। জলমহালসমূহের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের রাজস্ব আদায়সংক্রান্ত তথ্য পেশ করা হলো :

সারণি-৩৭(১)

বিগত ৫(পাঁচ) বছরের ২০ একরের উর্ধ্বে জলমহালের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্য (১৪২৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)

ক্র. নং	উপজেলার নাম	মোট জল-মহালের সংখ্যা	১৪১৯ বঙ্গাব্দ প্রাপ্ত রাজস্ব	১৪২০ বঙ্গাব্দ প্রাপ্ত রাজস্ব	১৪২১ বঙ্গাব্দ প্রাপ্ত রাজস্ব	১৪২২ বঙ্গাব্দ প্রাপ্ত রাজস্ব	১৪২৩ বঙ্গাব্দ প্রাপ্ত রাজস্ব
০১.	সিলেট সদর	২১	২৫৬২৪৩১/-	২২৮০১১৪/-	২৩৩১৬৮৮/-	২২৯৪৬১০/-	২১৪৪৮২৭/-
০২.	দক্ষিণ সুরমা	১৪	২২৮৫৯৮৫/-	২০১৩৪১৬/-	১২৮২২২৪/-	১৩০৭১৮৪/-	২০৮৯৯৪/-
০৩.	কোম্পানীগঞ্জ	২৩	১০০১১২০৬৯/-	১২৭৪১৩৭০/-	১২২৫১২৩৬/-	১২৮৭০৬১৭/-	১২৩০৮৩০৫/-
০৪.	গোয়াইনঘাট	৩৪	৬৫৮৩১৩৫/-	৭০১৬২৯৫/-	৭৩৭৮৫৫৬/-	৭৬৪৬৮৪৭/-	৭২৭৯৩০৬/-
০৫.	জৈন্তাপুর	১৯	৪১৮৯৪৮৪/-	৪৫১২০৬৬/-	৪৮৭৪৮৭২/-	৫০৯০৩৮৯/-	৬৭০৯০৬০/-
০৬.	কানাইঘাট	১২	২৫৮৩০১২/-	২৮৩৬৩০৮/-	২৯৮৮৪৮৩/-	৩১৮৯২৭৪/-	৩৭১৭৪৬৫/৭৫
০৭.	জকিগঞ্জ	৯	২৭৮৩৩৬১/-	২৭৬০০২৬/-	২৭৭৫৮৩৭/-	৩২৭৯০২৭/-	২৫৬৪২৩৮/-
০৮.	বিয়ানীবাজার	১৮	৩২৩২৯৫৯/-	৩৭১৩৭৮৮/-	৪৩১৫১০১/-	৪৫৫৬৬২৩/-	৩৯৯৬১১৮/-
০৯.	গোলাপগঞ্জ	১১	৩০৩০৯৫৫/-	৩৩৯৭১৩১/-	২৭১৬৩৩৬/-	২৮৬৫৮৭৭/-	৩৮৮৭৮০২/-
১০.	ফেঞ্চুগঞ্জ	৮	২৮৫০৮৭১/-	২৯৫৪৮২১/-	২৭৮৯০৮৯/-	২২৯৩৬৬৭/-	৪৩৭৩৯৭৯/-
১১.	বালাগঞ্জ	১৪	৫৭০২৭৫৩/-	৬৬৪৮৪৮৫/-	৬৫২৬৬৯৮/-	৪৬৪৭৪২৪/-	৪৬৭৩৫৩৪/-
১২.	ওসমানীগঞ্জ	১৩				২১৮০২৭৫/-	২২৪৭২৭৫/-
১৩.	বিশ্বনাথ	২		২৫০০০০/-	৩৬০৩৭০/-	৪২২৮৭০/-	৪২২৮৭০/-
	সর্বমোট	১৯৬	৪৬১৬৬৬২৩/-	৫১২৮৩৮২০/-	৫০৫৯০৪৯০/-	৫২৬৪৫৫৬৪/৫০	৫৬৩৯৮৭৭৩/৭৫

সূত্র : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট

সিলেট জেলায় ২০ একরের নিম্নের মোট বদ্ধ জলমহালের সংখ্যা ৪৫৪টি। নিচে জলমহালসমূহের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্য পেশ করা হলো:

সারণি-৩৭(২)

বিগত ৫(পাঁচ) বছরের ২০ একরের নিম্নে জলমোলের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্য (১৪২৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)

ক্র. নং	উপজেলার নাম	মোট জলমহালের সংখ্যা	১৪১৯ বঙ্গাব্দ প্রাপ্ত রাজস্ব	১৪২০ বঙ্গাব্দ প্রাপ্ত রাজস্ব	১৪২১ বঙ্গাব্দ প্রাপ্ত রাজস্ব	১৪২২ বঙ্গাব্দ প্রাপ্ত রাজস্ব	১৪২৩ বঙ্গাব্দ প্রাপ্ত রাজস্ব
০১.	সিলেট সদর	২৩	৬৮৭৬০/-	৬৮৭৬০/-	৬৮৭৬০/-	৯৭৫২৫/-	৯৭৫২৫/-
০২.	দক্ষিণ সুরমা	২৮	৪৪৩৪১২/-	৪৫২২২২/-	৩৮৭৮০০/-	৪৯৩২৪১/-	২৩২১০৮/-
০৩.	কোম্পানীগঞ্জ	২৩	২৯১৪৫২/-	১৯০৪২৫/-		৩০৬১২২/-	৮৭৯১০৩/-
০৪.	গোয়াইগঘাট	১২০	১০৪৭৯১৬/-	৬৫০৯৪১/-	৩৫০০২৫/-	১৯২৩৩১৭/-	১৭২০৮৩৭/-

০৫.	জৈন্তাপুর	৬৮	৬০৯১০০/-	৫১৬৩৩০/-	২১১৪০০/-	৩২৪৮১০/-	২১০৫১০/-
০৬.	কানাইঘাট	৯৯	৫৫২৭২/-	৪৫০১৩৯/-	২৯২৯৭১/-	১২২৯৫৩/-	১৪১০৩৩/-
০৭.	জকিগঞ্জ	৪৯	৫৫৭৫১/-	৫২০৭৫৩/-	৭৬২৮৪/-	৭০৩১৩৬/-	৫২৩৩১/-
০৮.	বিয়ানীবাজার	২৫	৫১৪৯৮৪/-	৫৮২৬৩৯/-	৫২৬০৬৩/-	৬০১০০৯/-	৬৫৭৫৭৪/-
০৯.	গোলাপগঞ্জ	১৮	৫১৭৮৯৫/-	৩৮৪২০০/-	১৯২৫৫০/-	৫৮৯০১০/-	২৬৩৪৮৫/-
১০.	ফেঞ্চুগঞ্জ	৯	১১৩৪১৬০/-	১১৯৯৬৩৫/-	১১৭৫১৩৫/-	১১৭৯০০৫/-	১৪৬৯৪০২/-
১১.	বালাগঞ্জ	১৪	৫৭৮৪০২/-	৭৭৬৮৭২/-	৩৩৯১৪৫/-	২৩৯৪৫৫/-	২১৪৮০৮/-
১২.	বিশ্বনাথ	১২	--	--	--	--	--
১৩.	ওমানীনগর	১৩	--	--	--	--	--
	সর্বমোট	৪৫৪	৫৮১৭১০৪/-	৫৭৯২৯২৪/-	৩৬২০১৩৩/-	৬৫৭৯৫৮৩/-	৬০২৩০৯০/-

সূত্র : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট

হাটবাজার ব্যবস্থাপনা বর্তমানে সিলেট জেলায় স্থানীয় সরকার পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-কর্তৃক গত ১৪.১০.১৯৯৬ তারিখের স্মারক প্রজেই-২/২৫/৯৬/২৮৪(৫০৫৫) মূলে জারিকৃত নীতিমালা মোতাবেক হাটবাজারের ইজারা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সিলেট জেলার হাট/বাজারের ইজারা ও দোকান লাইসেন্স সংক্রান্ত

সারণি-৩৮
সিলেট জেলার হাট/বাজারের ইজারা ও দোকান লাইসেন্স সম্পর্কিত তথ্য
(১৪১৬ বঙ্গাব্দ থেকে ১৪২০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)

ক্র. নং	উপজেলার নাম	মোট হাটবাজারের সংখ্যা	ইজারা মূল্য (টাকা)					দোকান লাইসেন্সের সংখ্যা	মন্তব্য
			১৪১৬	১৪১৭	১৪১৮	১৪১৯	১৪২০		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	সিলেট সদর	২০	৯০৯৫,২৩,	৯৪৮১,৯১,	১১১৬৯,৯৬,	১৪০৫১,৬৫,	১০৪৮৭,৫৯,	৯৮	-
০২	দক্ষিণ সুরমা	২৪	৩০২৭০,০৮,	২৮৯৫০,৬৪,	৩৩৩০৪,৫৬,	৩৭৭০১,০৫,	৩২৬০০,৮৯,	০০	-
০৩	কোম্পানীগঞ্জ	১	১৮২৬০,৬৫,	১৮৫২৪,৫১,	২০১৪৪,১২,	২১৩৬০,৬৬,	২৩৮৫০,৬৬,	০০	-
০৪	গোয়াইনঘাট	১৫	৯৩৬৬,৬১,	১০২৩৬,৬৮,	১৩২২৫,৬৭,	২১৬৫০,২২,	১৬৬০০,১২,	১৩০	-
০৫	জৈন্তাপুর	০৪	২০৫২০,৮৩,	১৫৬৭২,২৪,	১৭৪৫৫,৬৫,	৩৭৬২৬,৬৩,	৩৮৫০৩,৪০,	১১৩	-
০৬	কানাইঘাট	১৮	৭১০০,৮৯,	৯২০৩,৪৬,	১০৬৫৯,৬৩,	১১২৯০,৭৭,	১৩০৩১,৫০,	৯৯	-
০৭	জকিগঞ্জ	২৪	৪৬৮১০,৩৭,	৪৯৫০৯,৯৩,	৪৬৬৪৫,৯১,	৫৩১৩৪,৭২,	৩৯০৪৫,৩৪,	২৫	-
০৮	বিয়ানীবাজার	২৪	৩৯২০০,০৪,	৪০৬৫০,৩৬,	৩৯৮১৭,৭২,	৩১৮৫০,৩৭,	৩৩৮৯৯,১৯,	১৩২	-
৯	গোলাপগঞ্জ	২৫	২১৩৮৯,৭৪,	১৮২৯২,৩৪,	২০০৮২,৪২,	২০১৪৮,৬২,	২০৯৬১,১৫,	৩৯	-
১০	ফেঞ্চুগঞ্জ	০৭	৩৪৪৫৫,১৭,	৫১২১৫,৮৪,	৬৪৭০৯,৬৭,	৫০৩১৫,০৫,	৫৬৫০০,০৬,	০০	-
১১	বালাগঞ্জ	০৭	৭৬৭০০,১০,	৮৪৬১০,০৮,	৯০৩২০,২৫,	৭৩২৫০,৪২,	৮৮১৫০,৪০,	৬০	-
১২	বিশ্বনাথ	২৭	৩৯৬০০,৬০,	৪০৩৩৩,৯৫,	৪৩৪৫৭,২৩,	৪৪২৪৮,০৭,	৪৪৩৫২,৩৬,	৩৩	-
১৩.	ওসমানীনগর	১৮						১০	
	সর্বমোট	২৩৬	৩৭৬৫,৩৫,৫৩,	৩৬৭৫,৯৯,৭৭,	৪৯৮৬,৮৩,১২,	৪৬২৩,২৭,১৭,	৪৯৭৮,৭১,১৬,	৭৩৯	-

সূত্র : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট

চা-বাগান ১৮৫৬ সালে সিলেটে প্রথম চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছর জানুয়ারি মাসে মোহাম্মদ ওয়ারিস এগারসতী পরগনায় চাঁদখানি পাহাড়ে ও চাঁদখাট পরগনায়

বন্য চা-গাছ আবিষ্কার করেন। সিলেটের তৎকালীন কালেক্টর ই এ গ্লোভার মোহাম্মদ ওয়ারিসকে ৫০/- টাকা পুরস্কার দেন। ১৮৫৭ সালে মালনীছড়াতে প্রথম চা-বাগান শুরু করা হয়।[৮]

সিলেট জেলায় মোট ২০টি চা-বাগান রয়েছে। এ চা-বাগানসমূহের মালিকানা সরকারের। চা-চাষের জন্য এ সমস্ত খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। অধিকাংশ চা-বাগান ৯৯ বছরের সাধারণ বন্দোবস্তের আওতায় বন্দোবস্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভালো শ্রেণিভুক্ত চা-বাগানসমূহ ১৫ আগস্ট ১৯৭২ সাল হতে ৩৫ বছর মেয়াদি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। এ বন্দোবস্ত ২০০৭ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত বলবৎ থাকে। পরে চা-বাগানের জমির জন্য আলাদা খতিয়ানভুক্ত (নম্বর ৫) করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে চা-বাগানকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে বিভিন্ন মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে যা নিম্নরূপ :

শ্রেণি	চা-উৎপাদন (বছর)	ইজারা মেয়াদ
A	১২৫০ কিলোগ্রাম প্রতি হেক্টর	৪০ বছর
B	৯৫০ কিলোগ্রাম/হেক্টর	৩০ বছর
C	৯৪৯ কিলোগ্রামের কম হেক্টর	২০ বছর

বর্তমানে চা-বাগানের ইজারা একর প্রতি ৫০০(পাঁচশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক আদায়ও করা হয়। তবে উল্লেখ্য যে, ইজারা চুক্তি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর কালেক্টর কর্তৃক ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং ইজারা মূল্য আদায় করা হয়। চা-বাগানের উন্নয়নকাজ বিনিয়োগ যথেষ্ট ব্যয়বহুল এবং তাঁর বিপরীতে মুনাফা অর্জন বেশ সময়সাপেক্ষ। সিলেটের অনেক বাগানে পুরোনো ধাঁচে চাষ হয় এবং ফ্যাক্টরির যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি আধুনিক নয়। এজন্য চা-বাগান ব্যবস্থাপনায় আধুনিকীরণ জরুরি।

সিলেট জেলার চা-বাগানসমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো :

১. মোট চা-বাগানের সংখ্যা : ২০টি;
২. ইজারা/ ইজারা নবায়নকৃত চা বাগানের সংখ্যা : ১৪টি;
৩. ইজারাবিহীন চা-বাগানের সংখ্যা : ০৪টি;
৪. ইজারার মেয়াদোত্তীর্ণ চা-বাগানের সংখ্যা (ইজারা প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে) ০২টি;
৫. চা-বাগানের মোট জমি : ২৯,৫৭৩.৪০ একর;

[8] Bangladesh District Gazetteers. Sylhet 1975, Page 135.

৬. ইজারাবিহীন জমির পরিমাণ : ১,৫৪৫.৪৩ একর;

৭. ইজারাকৃত জমির পরিমাণ : ২৮,০২৭.৯৭ একর;

৮. নিষ্কণ্টক ইজারাকৃত ভূমি ২৬,৮৩২.৩২ একর;

৯. মামলাজনিত কারণে ইজারামূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে না : ১২১৬.৯২ একর (দি মেঘালয় টি এস্টেট-এর অধিভুক্ত ভূমি);

১০. তৈল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য শেভরন লি.-এর অনুকূলে ইজারা প্রদান করা : ৮.৭৭৩ একর;

১১. একর প্রতি ৫০০/-টাকা হিসেবে মোট বার্ষিক ইজারা মূল্য : ১,৩৪,০১,১৩৮/৫০ টাকা;

১২. ইজারা মূল্যের ওপর ৫% আয়কর ও ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য।

একনজরে সিলেট জেলার চা-বাগান

নং	বিষয়	সংখ্যা	বিবরণ
১.	মোট চা-বাগানের সংখ্যা	২০টি	ক. সিলেট সদর উপজেলার আওতাধীন ৭(সাত)টি। (১) লাক্কাতুরা, (২) মালনীছড়া, (৩) আলী বাহার, (৪) ডালিয়া (৫) খাদিমনগর (৬) বড়োজান, (৭) তারাপুর খ. জৈন্তাপুর উপজেলার আওতাধীন-০৬(ছয়)টি। (৮) লালাখাল, (৯) হাবিবনগর, (১০) আফিফানগর, (১১) শ্রীপুর (১২) খান চা-বাগান (১৩) দি মেঘালয় টি এস্টেট। গ. গোয়াইনঘাট উপজেলার আওতাধীন ২ (দুই)টি (১৪) ফতেহপুর, (১৫) জাফলং ঘ. কানাইঘাট উপজেলার আওতাধীন-০২(দুই)টি। (১৬) লোভাছড়া (১৭) ডোনা। ঙ. ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার আওতাধীন ০৩(তিন) টি। (১৮) মণিপুর, (১৯) মোমিনছড়া, (২০) ডালুছড়া
২.	ইজারা/ ইজারা নবায়নকৃত চা বাগানের সংখ্যা	১৪টি	(১) লাক্কাতুরা,(২) মালনীছড়া,(৩) আলী বাহার,(৪) লালাখাল, (৫) হাবিবনগর, (৬) খাদিমনগর (৭) বুরজান (৮) শ্রীপুর (৯) জাফলং (১০) ফতেহপুর (১১) খান (১২) দি মেঘালয় টি এস্টেট (নবসৃষ্ট) (১৩) মণিপুর (১৪) লোভাছড়া।
৩.	ইজারাবিহীন চা-বাগানের সংখ্যা	০৪টি	(১) তারাপুর (২) ডালিয়া (৩) ডালুছড়া (৪) ডোনা।

নং	বিষয়	সংখ্যা	বিবরণ
৪.	ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ চা-বাগানের সংখ্যা (ইজারা প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে)	০২টি	(১) মোমিনছাড়া (২) আফিফানগর
৫.	চা-বাগানের মোট জমি	--	২৯৫৭৩.৪০ একর
৬.	‘এ’ শ্রেণিভুক্ত চা-বাগানের সংখ্যা (প্রতি হেক্টরে গড় উৎপাদন ১২৫০কেজি বা তার বেশি, ইজারার মেয়াদ ৪০ বছর)	৮টি	মালনীছড়া, (২) বুরজান, (৩) আফিফানগর, (৪) লালাখাল,(৫) হাবিবনগর (৬) মণিপুর (৭) মোমিনছড়া (৮) খান চা-বাগান।
৭.	‘বি’ শ্রেণিভুক্ত চা-বাগানের সংখ্যা (প্রতি হেক্টরে গড় উৎপাদন ৯৫০ কেজি বা তার বেশি, ইজারার মেয়াদ ৩০বছর)	০১টি	জাফলং
৮.	‘সি’ শ্রেণিভুক্ত চা-বাগানের সংখ্যা (প্রতি হেক্টরে গড় উৎপাদন ৯৪৯ কেজির কম, ইজারার মেয়াদ ২০ বছর)	০৭টি	(১) লাক্কাতুরা, (২) শ্রীপুর, (৩) খাদিমনগর, (৪) ফতেহপুর, (৫) লোভাছড়া, (৬) আলী বাহার (৭) ডালিয়া।
৯.	নতুন করে কোনো শ্রেণি বিভাজন করা হয়নি	০৩টি	(১) ডালুছড়া (২) তারাপুর (৩) ডোনা
১০.	নবসৃষ্ট (কোনো শ্রেণি বিভাজন করা হয়নি)	০১টি	দি মেঘালয় টি এস্টেট।

চা-বাগানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. মালনীছড়া চা-বাগান

সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন ৭৪ নং জেএলস্থিত মালনীছড়া মৌজায় ১৭৫৪.৮৬ একর এবং ৭২নং জেএলস্থিত তেলিহাটী মৌজায় ৭৩৬.০৫ একর মোট ২৪৯১.০৫ একর ভূমি নিয়ে সিলেট শহরের সন্নিকটে মালনীছড়া চা-বাগান অবস্থিত।

চা-বাগানের ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় যে, ১৮২৩ সালে আসাম জেলায় সর্বপ্রথম চা-বৃক্ষ পাওয়া যায়। তাতে আসামের ভূমি চা-চাষের উপযোগী বিবেচিত হলে ১৮৩৫ সালে সর্বপ্রথম লক্ষীপুরে চা-বাগান সৃজন করা হয়। পরবর্তীকালে সিলেটে চা চাষ হওয়ার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা হয়। বর্ণিত অনুসন্ধানে ১৮৫৬ সালে সিলেটের জঙ্গলে স্বভাবজাত চা বৃক্ষ পাওয়া যায়। তৎপর ‘নর্থ সিলেট টি কোম্পানি’ নামে একটি কোম্পানি গঠন করে ১৮৫৭ সালে মালনী চা বাগানের প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এটি সিলেট জেলার প্রথম

প্রতিষ্ঠিত চা-বাগান। এর পর হতে সিলেটে ক্রমশ সিলেটে চা-চাষ সম্প্রসারিত হয়। বর্ণিত চা বাগানের মালিকানা 'নর্থ সিলেট টি কোম্পানি' হতে মেসার্স ওয়ালটার ডানকান অ্যান্ড গড্রিক কোম্পানী লিমিটেড মালিকানা অর্জন করে। উক্ত কোম্পানি নিকট হতে সিলেট টি কোম্পানি লিমিটেড মালিকানা অর্জন করে। পরবর্তীকলে সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে ১৫, আগষ্ট ১৯৭২ হতে ১৪ আগস্ট, ২০০৭ সাল পর্যন্ত ৩৫(পঁয়ত্রিশ) বছরের জন্য মালনীছড়া চা-বাগান সিলেট টি কোম্পানির অনুকুলে ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত ইজারার মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর ১৫ আগস্ট, ২০০৭ হতে ১৪ আগস্ট, ২০৪৭ সাল পর্যন্ত ৪০(চল্লিশ) বছরের জন্য উল্লিখিত ইজারার মেয়াদ নবায়ন কর হয়।

একনজরে মালনীছড়া চা-বাগান

চা বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	চা বাগানের শ্রেণি	ইজারা/ ইজারা নবায়ন চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা/ইজারা চুক্তির মেয়াদ
মালনীছড়া	সিলেট সদর	২৪৯১.০৫	এ	২৫/০৭/২০১২	৪০ বছর	১৫/০৮/২০০৭ হতে ১৪/০৮/২০৪৭

২. স্টার (তারাপুর) চা-বাগান

ব্রিটিশ টি প্লান্টার সি কে হার্ডসন চা-বাগানটি প্রতিষ্ঠা করেন। সি কে হার্ডসনের মৃত্যুর পর তার পুত্র ডাব্লিউ হার্ডসন বাগানের মালিকানা লাভ করেন। ১০-০৬-১৮৯২ সালে ডাব্লিউ হার্ডসন রেজিস্ট্রি দলিলমূলে বাগানটি বৈকুন্ঠ গুপ্তের নিকট হস্তান্তর করেন। বৈকুন্ঠ গুপ্ত ০২-০৭-১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ দেবতার অনুকূলে রেজিস্ট্রি দলিল মুলে বাগানটি দান করে তার ছেলে রাধা লাল গুপ্তকে সেবাইত নিযুক্ত করেন এবং বাগানটি পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। উক্ত ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় ছিল আসাম রাজ্যের শিলচর। ১৯৫৬ সালের এস এ জরিপে বাগানটি শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ জিউ দেবতার পক্ষে সেবাইত রাধা লাল গুপ্ত, পিতা বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুপ্ত এর নামে চূড়ান্ত স্বত্বলিপি প্রকাশ হয়। সেবাইত রাধালাল গুপ্ত ২১. ০২. ১৯৬৯ সালে মৃত্যুবরণ করলে তার দুই ছেলে রবীন্দ্রলাল গুপ্ত ও রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত যৌথভাবে সেবাইতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনী-কর্তৃক রবীন্দ্রলাল গুপ্ত ও রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত নিহত হলে পরিবারের সদস্য সবিতা রানী গুপ্ত গং সেবাইতের দায়িত্ব পালন করেন। পরিবারের একমাত্র পুরুষ উত্তরাধিকারী পঙ্কজকুমার গুপ্ত সাবালকত্ব অর্জন করলে ৩০. ০৬. ১৯৭৬ খ্রি. ২১৩৮৫ নং রেজিস্ট্রিকৃত স্মরণলিপির মাধ্যমে পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে সেবাইত নিযুক্ত করা হয়। সেবাইত পঙ্কজলাল গুপ্ত বাগানটি জনৈক আব্দুল হাইয়ের বরাবরে বাগানটি হস্তান্তর করেন।

একনজরে স্টার (তারাপুর) চা-বাগান

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	চা-বাগানের শ্রেণি	ইজারা/ ইজারা নবায়ন চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা/ইজারা চুক্তি সময়কাল
তারাপুর	সিলেট সদর	৩৯২.৯৬	-	ইজারবিহীন নোট ১	--	তারাপুর চা-বাগান নিয়ে বিভিন্ন আদালতে একাধিক মামলা মোকদ্দমা থাকায় কোনো ইজারা-চুক্তি হয়নি।

৩. খান চা-বাগান

সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলায় ১৫৭৯.৪১ একর ভূমি নিয়ে খান চা-বাগান গঠিত। বাগানটির রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন খান সাহেব আতা মোহাম্মদ খান। কিন্তু ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন মোতাবেক উক্ত রেকর্ডীয় মালিকের ভূমির পরিমাণ ৩৭৫ বিঘার সীমা অতিক্রম করে। বর্ণিত সীমাতিরিক্ত ১৬০১.৮৬ একর ভূমি সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ২০(৩) ধারা মোতাবেক রিটেইনেবল সার্টিফিকেট মূলে ১২৩.৯৬ একর এবং ২০(৪) (এ) ধারা মোতাবেক নন-রিটেইনেবল সার্টিফিকেট মূলে ১৪৬২.৮৩ একর সর্বমোট ১৫৮৬.৭৯ একর ভূমি এপ্রিল ১৯৭২ খ্রি. পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য আতা মোহাম্মদ খানের অনুকূলে চা-চাষের জন্য ভোগদখলে রাখার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

একনজরে খান চা-বাগানের তথ্য

চাবাগানের-নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	চা-বাগানের শ্রেণি	ইজারাইজারা / নবায় চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারাইজারা / চুক্তির সময়কাল
খান চা-বাগান	জৈন্তাপুর	১৫৭৯.৪১	এ	০২.০৫.২০১৩	--	২০.০৬.২০১২ থেকে ১৯.০৬.২০৫২

৪.আলী বাহার চা-বাগান

সিলেট জেলার সদর উপজেলার মালনীছড়া চা-বাগানের পাশে ৬৮৩.৫০ একর ভূমি নিয়ে আলীবাহার চা-বাগান অবস্থিত। চা-বাগানটির গোড়াপত্তনের সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। তবে অফিসে রক্ষিত নথিপত্র হতে জানা যায় ১৮৮৫ সালে চা-বাগানটি সৃজন করা হয়। অনুমান করা যায় যে, আলীবাহার চা-বাগানটি সিলেট জেলায় সৃজনকৃত দ্বিতীয় চা-বাগান। পরে বিভিন্ন সময়ে চা-

বাগানের মালিকানা পরিবর্তন হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ হতে আলীবাহার চা-বাগানটি মেসার্স আলী বক্স অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে।

একনজরে আলী বাহার চা-বাগানের তথ্য

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মৌজাভিত্তিক ও মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারাচুক্তি / সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা/ইজারা চুক্তির মেয়াদ
আলী বাহার	সিলেট সদর	৬৮৩.৫০	সি	১১ .০৪ . ২০১৩	২০ বছর	১৫.০৮.২০০৭ থেকে ১৪.০৮.২০২৭

৫. লাক্কাতুরা চা-বাগান

লাক্কতুরা চা-বাগানটি সিলেট শহরের একেবারে পাশ ঘেঁষে ৩১৭২.২৮ একর ভূমি নিয়ে অবস্থিত। উক্ত বাগানটি সরকারি মালিকানাধীন এবং ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে।

চাবাগানের নাম	উপজেলা	মৌজাভিত্তিক ও মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারাচুক্তি / সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা/ইজারা চুক্তির মেয়াদ
লাক্কাতুরা	সিলেট সদর	৩১৭২.২৮	সি	১৩.১২.২০১২	২০ বছর	১৫.০৮.২০০৭ থেকে ১৪.০৮.২০২৭

৬. ডালিয়া চা-বাগান

সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন জেএল নং ৭৯, মৌজা মালনীছড়া দ্বিতীয় খন্ড, পরিমাণ মোট ১৫২.১৪ একর, জেএল নং ৮০, মৌজা কুমারগাঁও, পরিমাণ ২৩.০৪ একর সর্বমোট ১৭৫.১৮ একর ভূমি নিয়ে ডালিয়া চা-বাগান গঠিত। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৭৯ নং জেএলস্থিত মালনীছড়া দ্বিতীয় খন্ড মৌজার এসএ ২ নং খতিয়ানের বিভিন্ন দাগে ১২৩.০৯ একর ভূমি মেয়র উইন্টন সাহেবের ট্রাস্ট দখল আমিনা খাতুন, জং মোস্তাকিম আলী, সাকিন কাজী ইলিয়াছের নামে রেকর্ডভুক্ত। নামজারি মামলা নং ৪৭৯৪/৯৯-০০-এর আদেশে আমিনা খাতুন জং মোস্তাকিমের নাম রেকর্ড থেকে কর্তন করে উত্তরাধিকারী মতছিম আলী গং-এর নামে ১২৩.০৯ একর জমি নামজারি করা হয়। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০-এর ২০(৩) এবং ২০(৪)(এ) ধারা মোতাবেক আমিনা খাতুন ১-৫-১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সংশোধিত রিনোয়াল সনদপত্রের মাধ্যমে রিটেইনেবল হিসেবে ১২৩.৯৬ একর ও সার্টিফাইড ল্যান্ড হিসেবে ৫১.২২ একর ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্ত হন। উক্ত অনুমতিপত্রের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় পর বিবিধ ৭১/৭২-৭৩ নং মামলা মূলে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও

প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ২০(৪)(এ) ধারা মোতাবেক পুনরায় ১৯৭২-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য রিনোয়াল সনদপত্রপ্রাপ্ত হন। উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আর কোনো সনদ প্রদান করা হয়নি। ডালিয়া চা-বাগান বাংলাদেশ চা বোর্ডের নিবন্ধিত চা-বাগান যার নিবন্ধন নং পি ১১২। বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমার কারণে ডালিয়া চা-বাগানটি ইজারাবিহীন রয়েছে।

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মৌজাভিত্তিক ও মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারাচুক্তি / সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারাইজারা / চুক্তির মেয়াদ
ডালিয়া	সিলেট সদর	১৮৬.০০	সি	নোট ২	--	--

৭. খাদিম চা-বাগান

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারা/চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা/ইজারা চুক্তির মেয়াদ
খাদিমনগর	সিলেট সদর ও গোয়াইনঘাট	৩৬২৯.৬০	সি	১৮.১১.২০১২	২০	০৮.০৮.২০১২ থেকে ০৭.০৮.২০৩২

৮। বুরজান চা-বাগান

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারা/চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা/ইজারা চুক্তির মেয়াদ
বুরজান	সিলেট সদর	৩২৬৩.৩১	এ	০৭.০৪.২০১৩	৪০	০৩.০৪.২০১৩ থেকে ০২.০৪.৫৩

৯.আফিফানগর চা-বাগান

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারা/চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা/ইজারা চুক্তির মেয়াদ
আফিফা নগর	জৈন্তাপুর	৮৬৮.৪৬	এ	১৫.০৮.৭২ মেয়াদোত্তীর্ণ নোট ৩	৩৫ বছর	১৪.০৮.২০০৭

১০. লালাখাল চা-বাগান

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারা/চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা/ইজারা চুক্তি মেয়াদ
লালাখাল	জৈন্তাপুর	১৩১৭.৩৪	এ	০২.০৫.২০১৩	৪০ বছর	১৫.০৮.২০০৭ থেকে ১৪.০৮.২০৪৭

১১. হাবিবনগর চা-বাগান

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারা/চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা/ইজারা চুক্তির মেয়াদ
হাবিব নগর	জৈন্তাপুর	১৫৮৩.৩৫	এ	২৫.০৭.২০১২	৪০	১৪.০৮.২০০৭ থেকে ১৪.০৮.২০৪৭

১২. শ্রীপুর চা-বাগান

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণী	ইজারা/চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা/ইজারা চুক্তির মেয়াদ
শ্রীপুর	জৈন্তাপুর	মোট ১০১৭.৫২	সি	১৮/০৬/২০১২	২০	১০/০৫/২০১১ হতে ০৯/০৫/৩১

১৩. দি মেঘালয় টি এস্টেট

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারা/চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা/ইজারা চুক্তি মেয়াদ
দি মেঘালয় টি এস্টেট	জৈন্তাপুর	১২১৬.৯২	সি	১৫.০২.২০১১	০৫	১৫.০২.২০১১ থেকে ১৪.০২.১৬

১৪. ফতেপুর চা-বাগান

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার চিকনাগুল পাহাড়, ফতেপুর দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড মৌজায় ৫৩৩.১৫ একর ভূমি জনাব মদরিছ আলী ২০.০৮.১৯৬১ সালে বাংলাদেশ চা বোর্ডের পি-১৩২ নং রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করে চা-বাগানটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাগানের ভূমি নিজেদের নামে রেকর্ডভুক্ত রাখেন। পরে মদরিছ আলী ৪৪৪.৭৯ একর জমি জনৈক হামিদুর রহমান, হাফিজুর রহমান, আজিজুর রহমান, মিনারা খানম, ও সমজা খাতুনের অনুকূলে হস্তান্তর করেন। হস্তান্তরের পর তাদের পক্ষে জনৈক হোসেন আহমদ ভূমি মন্ত্রণালয়ে ১২.০১.১৯৮৫ তারিখে পিও-৯৮/৭২ এবং চা-নীতির শর্তসাপেক্ষে হস্তান্তর পরবর্তী অনুমোদন গ্রহণ করেন। পরে তাদের প্রত্যেকের পক্ষে চা-বাগানটি পরিচালনার জন্য আব্দুল কাদিরকে আমমোক্তার নিয়োজিত করেন। বর্ণিত আমমোক্তারের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আব্দুল কাদির উক্ত ভূমি ইয়াছিন ওসমানের অনুকূলে হস্তান্তর করেন। বর্ণিত হস্তান্তরের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০-এর ৮৮(২) ধারার পরিপন্থী হওয়ায় উক্ত আইনের ৯০(৫) ধারায় তা স্বাভাবিকভাবে সরকারের ওপর অর্পিত হয়, ফলে ৫/২০০৪-০৫ রিজাম্পশন মামলা মূলে ৪৩৭.০৪ একর ভূমি খাস খতিয়ানভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, ৭.৭৫ একর ভূমি বিভিন্ন স্বত্ব মামলায় বিভিন্ন ব্যক্তি রায় ও ডিক্রি হাসিল করায় তা রিজাম্পশন মামলা বাদ দিয়ে ৪৩৭.০৪ একর ভূমি খাস

খতিয়ানভুক্ত করা হয়। হামিদুর রহমান প্রমুখের অনুকূলে হস্তান্তর-বহির্ভূত ৮৮.৩৬ একর জমি মদরিছ আলী প্রমুখ ৬ জনের নামে রেকর্ডভুক্ত ছিল।

একনজরে ফতেপুর চা-বাগান

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারাচুক্তি / সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা-ইজারা / চুক্তির মেয়াদ
ফতেহপুর	গোয়াইনঘাট	৫২১.২৮	সি	১৬.০১.২০১৩	২০	১৬.০৬.১২ থেকে ১৩.০৬.২০৩২

১৫. জাফলং চা-বাগান

জাফলং চা-বাগানের পূর্বতন মালিক ছিল যুক্তরাজ্যস্থ কনসোলিটেড টি কোম্পানি লি.। ১৯৮৩ সালে সরকারি অনুমতিক্রমে প্লানটেশন সার্ভিসেস লিমিটেড জাফলং চা-বাগানটি ক্রয় করে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক জনাব মো. রফিক ও বেগম নুরুন্নেছা রফিক পরে জাফলং টি কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে বাগানটি পরিচালনা করেন। পরে বর্ণিত কোম্পানির শতভাগ শেয়ার জনাব সালমান করিম ও বেগম আরজুদা করিমের অনুকূলে হস্তান্তর করেন।

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারা/চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা-ইজারা চুক্তির মেয়াদ
জাফলং	গোয়াইনঘাট	২১৬৪.১৪	বি	১৩/০৬/২০১২	৩০	২৫.০৩.২০১২ থেকে ২৪.০৩.২০৪২

১৬. মণিপুর চা-বাগান

সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলাধীন মণিপুর মৌজায় ১৬৯৪.৬৯ একর ভূমি নিয়ে মণিপুর টি এস্টেট অবস্থিত। নথি পর্যালোচনায় জানা যায় যে, মণিপুর টি এস্টেট-এর পূর্বতন মালিক ছিলেন এ্যামুলগেমেইট টি এস্টেট কোম্পানি লিমিটেড, ২২ ওয়েস্ট নিল স্ট্রিট, গ্লাসগো, স্কটল্যান্ড। বর্ণিত কোম্পানি ০৯.০৯.১৯৫৫ তারিখে রেজিস্ট্রি দলিলমূলে ১৮০৩.০০ একর ভূমি মণিপুর টি এস্টেট কোম্পানির অনুকূলে হস্তান্তর করেন। এ-পর্যন্ত বাগানটি মণিপুর টি এস্টেটের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে।

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারা-চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা/ইজারা চুক্তির মেয়াদ
মণিপুর	ফেঞ্চুগঞ্জ	১৬৯৪.৬৯ একর	এ	১৯.০২.২০০৭	৪০	১৫.০৮.২০০৭ থেকে ১৪.০৮.২০৪৭

১৭. মোমিনছড়া চা-বাগান

সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলাধীন ৯৮৬.১২ একর ভূমি নিয়ে মোমিনছড়া চা-বাগান গঠিত। চা-বাগানটি ১৯৮৯ সাল হতে তাজ টি অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। অদ্যাবধি চা-বাগানটি বর্ণিত কোম্পানি পরিচালনা করছে।

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারা/চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা-ইজারা চুক্তির মেয়াদ
মোমিনছড়া	ফেঞ্চুগঞ্জ	৯৮৬.১২	বি	১৯৯৯ মেয়াদোত্তীর্ণ নোট ৪	১৩ বছর	২০১২

১৮. ডালুছড়া চা-বাগান

ডালুছড়া চা-বাগানটি সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার কায়স্থগ্রাম, ধারণ, মোমিনছড়া ও মণিপুর মৌজার ৩২৩.৫৩ একর জমি নিয়ে দুই ভ্রাতা জয় নারায়ণ দেব চৌধুরী ও বিরোজা দেবনাথ চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করেন। জয়নারায়ণ দেব চৌধুরী মৃত্যুবরণ করলে জিতেন্দ্রনারায়ণ দেব ও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ দেবচৌধুরী উত্তরাধিকারী হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন এবং অপর ভ্রাতা বিরোজা দেব নাথ চৌধুরীর ছেলে বিনয়কৃষ্ণ দেব, আশুতোষ দেব, মহিতোষ দেব, শৈলেন্দ্র দেব, নীরেন্দ্র দেবসহ মোট ৫(পাঁচ) জন উত্তরাধিকারী রেখে মৃত্যুবরণ করেন। উল্লিখিত উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে জিতেন্দ্রনারায়ণ দেব ও মহীতোষ দেব এ দেশে বসবাস করেন অপর সকল উত্তরাধিকারী ১৯৬৪ সালে ভারতে চলে যান এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। জিতেন্দ্রনারায়ণ দেব মৃত্যুবরণ করলে ছেলে জে এন দেব, জগৎজ্যোতি দেব ও জয়ব্রত দেব উত্তরাধিকারী হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন। বাগানটি এখনো তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বাগান সম্পর্কে একাধিক মামলা-মোকদ্দমা থাকায় বাগানের ভূমি নিয়ে কোনো ইজারা চুক্তি হয়নি।

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারা/চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা-ইজারা চুক্তি মেয়াদ
ডালুছড়া	ফেঞ্চুগঞ্জ	মোট ৩২৩.৫৩	সি	ইজারাবিহীন	--	--

১৯. লোভাছড়া চা-বাগান

সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার ১৮৩৯.০০ একর ভূমি লোভাছড়া চা-বাগান অবস্থিত। চা-বাগানটি প্রতিষ্ঠা করেন ব্রিটিশ নাগরিক জেমস লিও ফারগুসন। তিনি দীর্ঘদিন বাগানটি পরিচালনা করে এলেও বাগানের উৎপাদন কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে পারেননি। পরে বিশিষ্ট চা-কর রাগীব আলীর (মালনীছড়া চা-বাগানের ইজারাগ্রহীতা) নেতৃত্বাধীন লোভাছড়া টি কোম্পানির অনুকূলে

হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে লোভাছড়া টি কোম্পানির অধীনে বাগানটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারা/চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা-ইজারা চুক্তির মেয়াদ
লোভাছড়া	কানাইঘাট	১৮৩৯.০০	সি	১৭.১২.২০১২	২০ বছর	১১.১০.১২ হতে ১০.১০.২০৩২

২০. ডোনা চা-বাগান

বাগানটি ভারতের নাতানপুর চা-বাগানের ফাড়ি বাগান ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বাগানাটি পূর্ব পাকিস্তান অংশে পড়ে। ১৯৫২ সালে এস এ জরিপে জনৈক ছগির আলী, মখলিছুর রহমান চৌধুরী ও আব্দুর রহমান বাগানটি তাদের নামে রেকর্ড করান। বর্তমানে চা-বাগানটি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে এবং সম্পূর্ণ চা-চাষের অযোগ্য। বাগানের ভূমির মধ্যে ৩/২ অংশ ভূমি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হয়। তারা বাসস্থান তৈরি করে বাগানের অধিকাংশ ভূমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তর করে চাষাবাদ করছেন।

চা-বাগানের নাম	উপজেলা	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণি	ইজারা/চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ইজারার মেয়াদ	ইজারা-ইজারা চুক্তির মেয়াদ
ডোনা	কানাইঘাট	৬৪২.৯৪	পরিত্যক্ত	ইজারাবিহীন	--	ডোনা

সিলেট জেলার অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

১৯৬৫ সালের ৬ সেপটেম্বর পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এ-যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সরকার একটি অধ্যাদেশ ১৯৬৫ জারি করেন। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখে উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা জারি করা হয়। উক্ত তারিখে যেসকল পাকিস্তানের নাগরিক ভারতে ছিলেন বা জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়া পর্যন্ত সময়ে ভারতে চলে গিয়েছেন বা সেখানে অবস্থান করছেন সে সমস্ত নাগরিকের সম্পত্তি সরকারি ব্যবস্থাপনায় আনা হয়। পরে ৮ জানুয়ারি ১৯৬৬ তারিখে The East pakistan Enemy property (Land and Buildings) Ad-ministration and Disposal order.1966 জারি করা হয়।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রত্যেক জেলায় শত্রু সম্পত্তি (বর্তমানে অর্পিত সম্পত্তি)-এর তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেয়। সেই অনুযায়ী একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয় এবং প্রত্যেক জেলা প্রশাসক অফিসে তা সংরক্ষণ করা হয়। এই তালিকার ভিত্তিতে জেলা বা মহকুমা প্রশাসক সম্পত্তি বর্তমান দখলকারকে নোটিশ প্রদান করে মালিক বা দখলকারের বক্তব্য শ্রবণপূর্বক উক্ত সম্পত্তি শত্রুসম্পত্তি কি না, তা নির্ধারণ করতেন। শত্রুসম্পত্তি বলে বিবেচিত হলে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির

আদেশবলে মুক্ত সম্পতি নাম পরিবর্তন করে অর্পিত সম্পত্তি করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৪ সালে মুক্ত সম্পত্তি আইন বাতিল করা হয়। এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনও জারি করা হয়।

সারণি-৩৯

সিলেট জেলার ‘ক’ ও ‘খ’ তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির জমির পরিমাণ

(উপজেলাওয়ারি)

জেলার নাম	উপজেলার নাম	তফসিলভূক্ত 'ক' অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ (একর)	'খ' তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির (একর পরিমাণ)	মোট সম্পত্তির পরিমাণ (খ+ক)	মন্তব্য
সিলেট	সদর	১৫০.৫৩৪৫	৩২৮.৬৫৯৮	৪৭৯.১৯৪৩	
	বিশ্বনাথ	৭৬৭.৬৮৫৮	২৬২৯.৮৩৫	৩৩৬২.০৮	
	বিয়ানীবাজার	৮০৪.৮৮	২৩৫৭.২০	৩১৬২.০৮	
	দক্ষিণ সুরমা	২৪২.৮৫	৭৯৫.৫৬	১০৩৮.৪১	
	জকিগঞ্জ	৪৪১.৩৫২৫	২২১৮.৪৯৫৮	২৬৫৯.৮৪৮৩	
	কানাইঘাট	১০৯.৫৯	১৭৫.৪১	২৮৫.০০	
	কোম্পানীগঞ্জ	৪৫৩.৯৬	১০৮৬.৩৩	১৫৪০.২৯	
	ফেঞ্চুগঞ্জ	২৪৯.৯২	০০	২৪৯.৯২	
	জৈন্তাপুর	১৯৫.৭৩৭৫	৫২১.৪১	৭১৭.১৫	
	গোলাপগঞ্জ	৫০০.৩৭৫০	১১৮৯.১৮০০	১৬৮৯.৫৫৫০	
	গোয়াইনঘাট	৫৪৪.৩৪	১৪১৫.০২৫	১৯৫৯.৩৬৫	
	বালাগঞ্জ	১৫২৮.৮৬১০	৪৪০৮.১২৫০	৫৯৩৬.৯৮৬০	
	জেলার মোট=	৫৯৯০.০৮৫৫	১৭১২৫.২৩০৬	২৩১১৫.৩১৮৬	

সিলেট জেলার ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

যে সমস্ত সম্পত্তি তার মালিক কর্তৃক ইসলাম ধর্মের বিধানমতে জনগণের কল্যাণ ও ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করা হয় এগুলোকে ওয়াকফ্ সম্পত্তি বলে। আর যে সমস্ত সম্পত্তি তার মালিক কর্তৃক পূজা-পার্বণ ও হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনার্থে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় এগুলোকে দেবোত্তর সম্পত্তি বলা হয়ে থাকে। ওয়াকফ্ সম্পত্তির বৈধ তত্ত্বাবধায়ককে মোতাওয়াল্লি এবং দেবোত্তর সম্পত্তির বৈধ তত্ত্বাবধায়ককে সেবায়েত বলা হয়। উল্লিখিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মোতাওয়াল্লি/সেবায়েতের নিকট ন্যস্ত থাকে। তবে মোতাওয়াল্লি বা সেবায়েতগণ সম্পত্তির মালিক নন, তারা তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। তাদের অধিকার ও দায়িত্বাবলি ওয়াকফ্ বা দেবোত্তর দলিলে নির্ধারিত থাকে। ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক ওয়াকফ্ ও দেবোত্তর সম্পত্তি পরিচালনা এবং মোতাওয়াল্লি ও সেবায়েত নিয়োগ ও অন্যান্য কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয়। সিলেট জেলার ওয়াকফ্ এস্টেটের মধ্যে খান বাহাদুর আবু নছর মোহাম্মদ এহিয়া ওয়াকফ্ এস্টেট (কে.বি ওয়াকফ্ এস্টেট), সিলেট অন্যতম। এর একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যবিবরণী উপস্থাপন করা হলো:-

খান বাহাদুর আবু নছর মোহাম্মদ এহিয়া ওয়াকফ্ এস্টেট

সিলেটের বিখ্যাত জমিদার খান বাহাদুর আবু নছর মোহাম্মদ এহিয়া ১৮৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জিতু মিঞা নামে পরিচিত ছিলেন। তার পূর্বপুরুষ মৌলভী ইদ্রিছ সিলেটস্থ কাজির বাজারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। খান বাহাদুর আবু নছর মোহাম্মদ এহিয়া নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ১৯২৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তার বিরাট জমিদারি ধর্মীয় কাজে এবং জনগণের কল্যাণে দান করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯২২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আসাম সরকারের অনুমোদনক্রমে সরকারকে সমস্ত সম্পত্তির ট্রাস্টি এবং সিলেট জেলার জেলা প্রশাসককে মোতাওয়াল্লি নিয়োগ করে ১১৬ নং রেজিস্ট্রি দলিলমূলে ওয়াকফ্ করে দেন। ওয়াকফ্ দলিলে উল্লেখ করা হয় যে, ওয়াকিফের মূল বসতবাড়ি (যা সিলেট শহরের অবস্থিত) যে সর্বোচ্চ রাজস্ব কর্মকর্তার কতৃত্বাধীন থাকবে, তিনি এ ওয়াকফ্ এস্টেটের মোতাওয়াল্লি হবেন। এই সম্পত্তি ওয়াকফ্ প্রশাসক অফিসে ইসি নং-১৩০৭১ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। পরে কয়েকজন বেনিফিসিয়ারীর ১৬. ০৭. ১৯৯৬ খ্রি. তারিখে ধর্মসচিব মহোদয়ের নিকট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াকফ্ প্রশাসক, বাংলাদেশের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় কমিশনার সিলেট খান বাহাদুর ওয়াকফ্ এস্টেটের মোতাওয়াল্লি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এস্টেটের সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক. বর্তমান সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলাতে এস্টেটের সম্পত্তি আছে। নিম্নবর্ণিত থানাসমূহে সম্পত্তি রয়েছে :

সিলেট : সিলেট সদর থানা।
হবিগঞ্জ : বানিয়াচং, আজমিরিগঞ্জ ও নবীগঞ্জ থানা।
মৌলভীবাজার : কুলাউড়া থানা।
সুনামগঞ্জ : দিরাই ও শাল্লা থানা।

খ. মোট জমির পরিমাণ : ২৪,৪১৬.৯০ একর।
প্রজাবিলি : ১৮,১৪৬.২৩ একর।
খাসজমি : ৬,২৭০.৬৭ একর।
জলমহাল : ৬৪টি।
বাজার : ৪টি।
পশুর হাট : ১টি (কাজির বাজার, সিলেট)

সারণি-৪০

সিলেট জেলার ওয়াকফ্-সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	ওয়াকফ্ এস্টেটের সংখ্যা	এস্টেটের শ্রেণি	মোট ভূমি (একর)
১.	সিলেট সদর	১৪২	পাবলিক ৯৬ টি আওলাদ-৪৪ টি লিল্লাহ-২ টি	১৭৯৮.৫৪৬৬ একর
২.	দক্ষিণ সুরমা	২	পাবলিক-২ টি আওলাদ-০ টি	৯১.৩২ একর
৩.	ফেঞ্চুগঞ্জ	২	পাবলিক-২ টি আওলাদ-০ টি	৮.৪৬ একর

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	ওয়াকফ্ এস্টেটের সংখ্যা	এস্টেটের শ্রেণি	মোট ভূমি (একর)
৪.	জকিগঞ্জ	৪	পাবলিক-২ টি আওলাদ-২ টি	৬.২৩ একর
৫.	গোলাপগঞ্জ	৬	পাবলিক-৫ টি আওলাদ-১ টি	১৪৫.৭২ একর
৬.	বিয়ানীবাজার	৫	পাবলিক-৪ টি আওলাদ-১ টি	১৫.১২ একর
৭.	বিশ্বনাথ	১১	পাবলিক-৯ টি আওলাদ-২ টি	৩৪০.৫২২ একর
৮.	বালাগঞ্জ	১৫	পাবলিক-১০ টি আওলাদ-৫ টি	৯৪.২৬২৯ একর
৯.	গোয়াইনঘাট	০৫	পাবলিক-৪ টি আওলাদ-১ টি	২০০.৩৩ একর
১০.	জৈন্তাপুর	০১	পাবলিক-১ টি আওলাদ-০ টি	৪.৯৬ একর
১১.	কোম্পানীগঞ্জ	০১	পাবলিক- ১ টি আওলাদ- ০ টি	৩.৪৯ একর
১২.	কানাইঘাট	০৩	পাবলিক- ৩ টি আওলাদ- ০ টি	৩৬.৯৬ একর
সর্বমোট = ১৯৭ টি				

সারণি-৪১
সিলেট জেলার দেবোত্তর-সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	দেবোত্তরের সংখ্যা	মোট ভূমি (একর)
১.	সিলেট সদর	৭২	২৩৬৯.২৯৯১
২.	দক্ষিণ সুরমা	২৪	১৭৬.৭৩৫
৩.	ফেঞ্চুগঞ্জ	১২	২৯.৩৭৪
৪.	জকিগঞ্জ	২৭	৬৯.৯৮১
৫.	গোলাপগঞ্জ	৮	১৪৪.৭৩০
৬.	বিয়ানীবাজার	৪০	৬৮.১০৪
৭.	বিশ্বনাথ	৪	১৪.১৫১
৮.	বালাগঞ্জ	৩১	১৭৫.৯৮১
৯.	গোয়াইনঘাট	১৪	১৩০.৬৮১
১০.	জৈন্তাপুর	৩৯	-
১১.	কোম্পানীগঞ্জ	১৫	৭.১১৫
১২.	কানাইঘাট	৩৩	১৮৬.৩৩৯

অধ্যায়-৬

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

হাওর, বাঁওড়, টিলা ও সমতলভূমি নিয়ে গঠিত সিলেট একটি বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। সিলেট জেলায় গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৩৩৪ মি.মি.। সিলেট অঞ্চলের বিগত এক দশকের মাসিক গড় তাপমাত্রা এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বৃষ্টিপাতের এই হার অসম এবং নভেম্বর-মার্চ পর্যন্ত সময়ে বৃষ্টিপাত খুবই কম। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.২^{o} সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন ১৩.৬^{o} সেলসিয়াস। এ অঞ্চলের অধিকাংশ জমির মাটি এঁটেল প্রকৃতির। এ অবস্থায় সিলেটের অনেক এলাকায় কৃষক বৃষ্টিনির্ভর রোপা আউশ ও রোপা আমন ধান চাষ করে। অন্যদিকে বেশ কিছু কৃষক রোপা আউশ ধান চাষাবাদের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা চাষাবাদ না করে জমি পতিত রাখে। চাষিরা স্থানীয় জাতের রোপা আউশ ও রোপা আমন ধানের চাষাবাদ করে। এসব জাতের ধান কর্তনে দেরি হয় এবং বিশেষ করে রোপা আমন ধান সংগ্রহ করতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময় লেগে যায়। এই অবস্থায় আমন ধান কাটার পর দীর্ঘ ৪-৫ মাস (নভেম্বর-মার্চ/মধ্য অগ্রহায়ণ-মধ্য চৈত্র) অর্থাৎ রবি মৌসুমে জমিতে রসের অভাবে অধিকাংশ জমি পতিত থাকে। অন্যদিকে পুকুর, নদীনালা ও খালবিলের পানি ব্যবহার করে কিছু পরিমাণ জমি বোরো চাষের আওতায় আসে। বোরো চাষে বেশি পানির প্রয়োজন হয়, ফলে সম্পূরক সেচের অভাবে ফসল ভালো হয় না। সিলেট জেলার শতকরা ৬০-৬৪ ভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল নিট অস্থায়ী ফসলাধীন জমির পরিমাণ ২০৮,৮০০ হেক্টর। শস্য নিবিড়তার হার ১৭৬%।

সারণি-৪২

শস্য-বিন্যাসভিত্তিক জমি

ক্রমিক নং	শস্যবিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	শতকরা হার
১.	বোরো-পতিত-রোপা আমন	৩৫৪০০	১৭%
২.	পতিত-পতিত-রোপা আমন	৪১৭৬০	২০%
৩.	পতিত-পতিত-রোপা আমন	৬২৬৫	৩%
৪.	বোরো-পতিত-রোপা আমন	৪১৭৬০	২০%
৫.	পতিত-আউশ-রোপা আমন	৪১৭৬০	২০%
৬.	রবি সবজি-পতিত-রোপা আমন	২২৯৭০	১১%
৭.	রবি শস্য-পতিত-রোপা আমন	১০৪৪০	৫%
৮.	সবজি-আউশ-রোপা আমন	৪১৭৫	২%
৯.	সবজি-পতিত-পতিত	৪১৭০	২%

উপরিউল্লিখিত শস্য-বিন্যাস ছাড়াও আরও ২টি শস্য-বিন্যাস সিলেট জেলার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে যুক্ত হয়েছে, সেগুলো হলো :

১০. আলু-রোপা আউশ-রোপা আমন, ১১. ছোলা-রোপা আউশ-রোপা আমন

এই শস্য-বিন্যাস অনুসরণ করে স্বল্প সেচে রবি মৌসুমে অধিক আলু ও ছোলা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

এই জেলায় মূলত দুইটি ভূ-প্রকৃতি (topographical) অঞ্চল বিদ্যমান। একটি হলো পাহাড়ি/টিলা যা একটু উঁচু, অন্যটি হলো খুবই নিচু অর্থাৎ হাওর এলাকা। এই জেলার মধ্যভাগ অর্থাৎ central portion হলো সমতল ভূমি যেখানে মূলত অধিক চাষাবাদ হয়। বর্ষা মৌসুমে নদনদী, খালবিলগুলো পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। এতে জমি পলিমাটি সমৃদ্ধ ও উর্বর হয় ও অধিক ফসল জন্মানো সম্ভব হয়। এই জেলার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল হলো তুলনামূলকভাবে অনেক উঁচু, এ জন্য তেমন ফসল ফলানো সম্ভবপর হয় না। জেলার পশ্চিমাঞ্চল বর্ষা মৌসুমে বন্যাকবলিত হয় তবে শীত ও গ্রীষ্মকালে সেখানে কিছু ফসল জন্মে, বিশেষত গ্রীষ্মে উঁচু জমিতে অর্থাৎ বিল ও খাল/জলাশয়ের ধারে বোরো ধান বপন করা হয়। বোরো ফসলটিই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই জেলার দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড় ও টিলা চা উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী।

শীত ও গ্রীষ্মকালীন ফসল

এই জেলায় পাটের উৎপাদন খুব একটা হয় না। তবে তামাক এবং আলু উৎপাদন হয়। এই জেলার প্রধান অর্থকরী (cash crop) ফসল হলো চা। অন্যান্য ফসলের মধ্যে গ্রীষ্মকালে ধান (আউশ), পাট, ডাল (ফরাস) ও শাকসবজি জাতীয় ফসল এবং শীতকালে আমন ধান, সরিষা, শীতকালীন সবজি যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, সীম ইত্যাদি চাষ করা হয়। ইক্ষু জাতীয় ফসল বসন্তকালের শেষে রোপণ/বপন করা হয় আর এই ফসল শীতকালে সংগ্রহ করা হয়। বেশির ভাগ জমিই জলমগ্ন থাকে। সেখানে নলখাগড়া ও বনজ ঘাস জন্মায়। সমতল ভূমিতে ধানের উৎপাদন হয়ে থাকে। এছাড়া এ জেলায় অল্প পরিমাণে পাট, আলু, ইক্ষু ফসলের চাষ ও হয়।

উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল, ভারী বৃষ্টিপাত ও মৌসুমি বৃষ্টিপাত বর্ষাকালে ফসল উৎপাদনে বিরাট বাধা। সময় সময় ফসলি জমি পানিতে তলিয়ে যায়।

ফসল সংগ্রহকালেও বন্যায় অনেক ফসল বিনষ্ট হয়। পাহাড়ি ঢলের কারণে এই জেলার পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে বপনকৃত আমন ধান সংগ্রহ করা অনেক সময়ই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ কারণে এই অঞ্চলে সাধারণত শীতকালেই ফসল উৎপাদন করা হয়। বন্যায় প্রচুর পলি মাটি জমে বলে শীতকালে প্রচুর শাকসবজিসহ ভালো ফসল উৎপাদন হয়ে থাকে।

এই জেলায় উঁচু ১১%, মাঝারি উঁচু ২৮%, মাঝারি নিচু ২১% এবং নিচু ৪০% ভূমি রয়েছে। **ভূমির বিভাজন**

সারণি-৪৩

একনজরে সিলেট জেলার কৃষিবিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ
১.	জেলার আয়তন (আদমশুমারি ২০১১)	৩৪৫২.০৭ বর্গকি.মি.
২.	মোট উপজেলা	১৩ টি
৩.	মোট ইউনিয়ন	১০৫ টি
৪.	মোট ব্লক	৩২১ টি
৫.	মোট জনসংখ্যা (আদমশুমারি ২০১১)	৩৪,৩৪,১৮৮
৬.	কৃষক পরিবার	৩২৮০৬৪ টি
৭.	বড়ো কৃষক	১২৭৯০
৮.	মাঝারি কৃষক	৪৩৯৭৫
৯.	ক্ষুদ্র কৃষক	৭৪২৬৪
১০.	প্রান্তিক কৃষক	১৪৭৫০৭
১১.	ভূমিহীন	৪৯৫২৮
১২.	নিট ফসলি জমি	২১৪৩৩৩ হেক্টর
১৩.	এক ফসলি	৮৩১১৮ হেক্টর
১৪.	দুই ফসলি জমি	১০৪২৩২হেক্টর
১৫.	তিন ফসলি জমি	২৬৯৮৩ হেক্টর
১৬.	ফসলের নিবিড়তা	১৭৪%
১৭.	স্থায়ী পতিত	৩০৫১৪ হেক্টর
১৮.	সাময়িক পতিত	২১৯২৪ হেক্টর
১৯.	সেচকৃত জমি	৫০১৫৭ হেক্টর
২০.	গভীর নলকূপ	০৬টি
২১.	অগভীর নলকূপ	১৫৬টি
২২.	এলএলপি	৬৮০৮টি
২৩.	অন্যান্য	৮৮৯০
২৪.	ব্রিকোয়েট মেশিন	০৫ টি
২৫.	বিসিআইসি সার ডিলার	৯০ জন
২৬.	খুচরা সার বিক্রেতা	৩৭৫জন
২৭.	বালাইনাশক ডিলার (খুচরা)	৪০৮ জন
২৮.	বালাইনাশক ডিলার (পাইকারি)	২৮ জন
২৯.	বীজ ডিলার (খুচরা)	৯৬ জন
৩০.	বালাইনাশক ডিলার (পাইকারি)	৬৬ জন

সূত্র : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ৯ জুলাই ২০১৮ সিলেট।

কৃষিকাজে অধিক ফলন পেতে বা শস্যের উৎপাদনব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সেচ অপরিহার্য। সেচ ব্যতীত উঁচু জমিতে রবিশস্য ও বোরো ধান উৎপাদন করা যায় না। সিলেট জেলায় রবিমৌসুমে ব্যবহার উপযোগী সেচযন্ত্রের তথ্য সারণি-৪৫ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো : **কৃষিকাজে ব্যবহৃত সেচযন্ত্র**

সারণি-৪৪

রবি মৌসুমে ব্যবহারযোগ্য সেচযন্ত্রের তথ্য

এলএলপি			অগভীর নলকূপ			গভীর নলকূপ			অন্যান্য
বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	দৌন, সেউতি
৭৮	৯৯৭০	১০৪৮	৭৮	১৫৭	২৩৫	০২	০৩	০৫	১৫৫০০

এই জেলায় চাষাবাদের জন্য বর্তমানে লাঙলের প্রচলন কম, তবে আধুনিক যন্ত্রপাতি হিসেবে পাওয়ার-টিলার ও ট্রাকটরের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফসলভিত্তিক ধান ও গম ফসল-মাড়াই যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

ধান : ধান এই জেলার প্রধান ফসল। বছরে তিন মৌসুমে তিন বার বা তিন মৌসুমে তিন ধরনের ধান উৎপাদন হয় যথা- ১. বোরো, ২. আউশ ও ৩. আমন।

চাষাবাদ পদ্ধতি আগাম ধান হিসেবে হাওর অঞ্চলে বোরো ধানের চাষাবাদ হয় এবং বন্যা বা পাহাড়ি ঢল আসার আগেই সংগ্রহ করা হয়। তবে জেলার সাধারণ কৃষি জমিতেও এখন সেচের সাহায্যে বোরো ধানের চাষ করা হয়। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ধানের চারা উৎপাদনের জন্য ধান বীজতলায় ছিটিয়ে দিতে হয়। পরে ৩০-৪৫ দিনের চারা মূল জমিতে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত রোপণ করা হয়। এই রোপণকৃত ধান এপ্রিল এবং মে মাসে কেটে ফেলা হয়। বোরো ফসল সেচনির্ভর এবং অন্যান্য ধানের তুলনায় বোরো ধানের উৎপাদন হয় অধিক। সাধারণত তিন ধরনের বোরো ধানের আবাদ হয়ে থাকে—যেমন উফশী (ব্রি ধান-২৮, ২৯, ৪৫) যার গড় ফলন ৩.৮১ টন/হেক্টর; বোরো হাইব্রিড (হীরা, সম্পদ, এস.এল ৮ এইচ) যার গড় ফলন ৪.৭৪ টন/হেক্টর; বোরো স্থানীয় (টেপি, খৈয়া) যার ফলন ১.৯৪ টন/হেক্টর।

আউশ আউশ ফসলের জমি মূলত দোফসলি। এই ফসল জমিতে দুভাবে চাষাবাদ করা যায়—১. বপন ও ২. রোপণ করে। এই ফসল সাধারণত চাষাবাদ হয় গ্রামের পাশে হাওরের প্রান্তে ও নদীর তীরের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে। আউশ ফসল গ্রীষ্মকালীন ফসল। এই ফসল জমিতে এপ্রিল ও মে মাসে বপন ও রোপণ করা হয় আর জুলাই এবং আগস্ট মাসে কর্তন করা হয়। আউশ ধান কাটার পরে ওই একই জমিতে আমন ধান রোপণ করা হয় এবং তা কাটা হয় শীতকালে। এই ফসলের লম্বা ফুল হয় না এবং তার আয়ু ৮৫-১১০ দিন। আউশ ফসলকে দুভাগে ভাগ করা যায় যেমন—১. উঁচু জমির আউশ ও ২. নিচু জমির আউশ। উঁচু জমিতে এপ্রিল মাসে আউশ ধান বপন করা হয়, কর্তন করা হয় জুলাই এবং আগস্ট মাসে। নিচু জমিতে আউশ ধান ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে বপন করা কাটা হয় আগস্ট এবং সেপটেম্বর মাসে তখন মাঠ পানিতে ভরে যায়।

আমন ধান শীতকালের ফসল। এই ধান ছিটানো ও রোপণ এই দু-পদ্ধতিতে আবাদ করা যায়। নিচু জমিতে মৌসুম শুরুর সময় আমন ধান ছিটিয়ে বপন করা যায়। উঁচু জমিতে চারা উৎপাদন করে আউশ ধান কাটার পর রোপণ করতে হয়। ছিটিয়ে ও রোপণকৃত উভয় জাতই শীতকালে সংগ্রহ করা হয়। ছিটিয়ে বোনা আমন এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে জমিতে ৪-৫টি চাষ দিয়ে বপন করতে হয়। এই বোনা আমন ধানের জমিতে মৌসুমে ৩-৪ ফুট পানি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, প্রয়োজনে ১০-১২ ফুট পানিতেও শস্য টিকে থাকতে পারে। এই ছিটিয়ে বোনা আমন ধানের সাথে মিক্সড ফসল হিসেবে আউশ ও পাটের চাষ করা যায়। এ জেলায় স্থানীয় তিনটি জাত রয়েছে যেমন- বগ ধান, পারিসক এবং বাদল। এই জাতগুলো শুকনো মৌসুমে বপন করতে হয় তবে সংগ্রহ হয় নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে। অন্যান্য স্থানীয় জাতগুলো হলো : লেংড়ি, হিরামন, ঘাইটা, কালাকুরা, পারিযা, দুধ বালাম, জুরি লংমুর এবং বিরাম। এই জাতগুলোর মধ্যে কালাকুরা এবং হিরামনের কালম্বা হয়, ফলে গভীর পানিতে তা আবাদ করা যায়। বাদল, পারিযা, লেংড়ি এবং গুটাক উচ্চতায় মধ্যমপর্যায়ের, তাই এই জাতগুলো মাঝারি জমিতে বপন করা যায়। **আমন ধান**

সারণি-৪৫

২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ সময়ে সিলেট জেলায় ধানের উৎপাদন

	২০১১-২০১২ (মে. টন)	২০১২-২০১৩ (মে. টন)	২০১৩-২০১৪ (মে. টন)
আমন	৩৫৩৪১৯	৩৩৫৬৭৩	৩৫৬৯৮৬
বোরো	১৯০০৯৩	২০৬৩২৩	১৯৯৮৩২
আউশ	৭৮০৬৬	৭৭৬৭৪	১০০৫৫০
মোট =	৬২১৫৭৮	৬১৯৬৭০	৬৫৭৩৬৮

সূত্র: জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সিলেট।

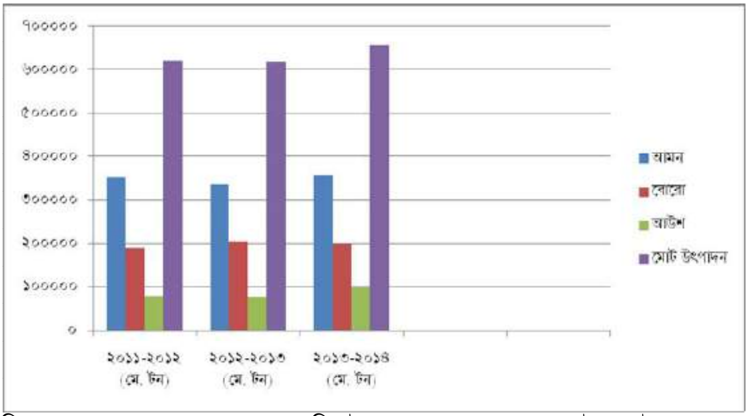

চিত্র : ১ ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ সময়ে সিলেট জেলায় আমন, বোরো এবং আউশ এর উৎপাদন

রবি ও খরিপ সবজি সিলেট জেলায় রবি মৌসুমে আলু, মিষ্টি আলু, শিম, মুলা, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, বেগুন ও মিষ্টিকুমড়ার চাষাবাদ হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৬৬০ হেক্টর জমিতে আলু ও ২৩,২৫০ হেক্টর জমিতে শাকসবজি আবাদ হয়েছে। সিলেট অঞ্চলে রবি মৌসুমে বহু জমি পতিত থাকে। এই অবস্থায়, স্বল্প জীবনকালের আউশ ও আমন ধান পর্যায়ক্রমে কাটার পর জমিতে বিদ্যমান আর্দ্রতা ব্যবহার করে সফলভাবে আলু চাষাবাদ চলছে। এখানে দেখা যাচ্ছে শীতকালে আমন ধান কাটার সাথে সাথে জমিতে যে আর্দ্রতা থাকে, সেই আর্দ্রতাকে ব্যবহার করে উন্নত জাতের ডায়মন্ড, কার্ডিনাল ও গ্রানোলা জাতের আলুর চাষ করে কৃষক লাভবান হচ্ছে। এই অঞ্চলের কৃষক বসতবাড়ির পার্শ্ববর্তী ও নদীতীরবর্তী এলাকায় শিমের আবাদ হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩৫৬৫ হেক্টর জমিতে শিমের চাষাবাদ হয়েছে। ফলে সিলেট অঞ্চলের কৃষককুল আগাম শিম বাজারে বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে। মুলা সাধারণত শুষ্ক উঁচু জমিতে নভেম্বর মাসে বপন করে সংগ্রহ করা হয় জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত। বেগুন বর্তমানে সারা বছরই চাষাবাদ করা যায়। তবে শুষ্ক জমিতে ডিসেম্বর মাসে বপন করলে সংগ্রহ শুরু হয় ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। বেশিরভাগ সবজিই শীতকালে চাষাবাদ হয়ে থাকে। সাতকরা এমন একটি সবজি যা খাদ্যে বিশেষ ধরনের সুগন্ধ ছড়ায় এবং এটি ডাল ও অন্যান্য খাদ্যের রুচি বৃদ্ধি করে। এই সবজি চাষ সাধারণত হয়ে থাকে বসতবাড়ির আঙিনায় অথবা গ্রামের পার্শ্ববর্তী এলাকায়। সারণি ৪৭ ও সারণি ৪৮ থেকে সিলেট জেলার সবজি ফসল উৎপাদনের তথ্য পাওয়া যাবে।

সারণি-৪৬

রবি সবজি ফসল (২০১৬-১৭)

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আলু (হেক্টর)	মিষ্টি আলু (হেক্টর)	শাকসবজি (হেক্টর)
১.	সিলেট সদর	৯৫	০৯	২২৫১
২.	দক্ষিণ সুরমা	২০৫	০৭	২৭৩৪
৩.	গোয়াইনঘাট	৯৫	৩০	১৫৬৭
৪.	বালাগঞ্জ	১২০	৩০	১৭০১
৫.	কোম্পানীগঞ্জ	৬৫	২৬	১১৬৩
৬.	বিশ্বনাথ	৩২৫	২০	৩৩১৪
৭.	ফেঞ্চুগঞ্জ	৫০	০৫	৮৪১
৮.	গোলাপগঞ্জ	১৫০	১৩	২৫৬৩
৯.	জৈন্তাপুর	১৪৫	৪০	১৬৮৬
১০.	কানাইঘাট	১৬০	৬৬	২৬৬২
১১.	জকিগঞ্জ	১০২	০০	১১৯১
১২.	বিয়ানীবাজার	১৪৬	১০	১৪৯৪
১৩.	মেট্রোপলিটন	০২	০০	৮৩
	মোট =	১৬৬০	২৫৬	২৩২৫০

সারণি-৪৭

প্রধান রবি সবজি ফসল (২০১৬-১৭)

ক্র. নং	উপজেলার নাম	শিম হে.	মুলা হে.	টমেটো হে.	ফুলকপি হে.	বাঁধাকপি হে.	লাউ হে.	বেগুন হে.	মিষ্টি কুমড়া হে.
১.	সিলেট সদর	২০৫	২১৫	৪৭০	১৫০	১৫০	২৭০	১৮৫	১৯০
২.	দক্ষিণ সুরমা	২৭৫	২৩৫	৪৯৫	৩২০	৩০০	২১০	২৭৫	৩২৫
৩.	গোয়াইনঘাট	২১০	১৭০	১৬৮	৯৫	১০৬	১৮৫	১২৫	২১০
৪.	বালাগঞ্জ	২৭০	১৪৫	১৭৫	১০৭	১২৪	১৭০	১৬২	১৭৫
৫.	কোম্পানীগঞ্জ	১৭০	৯৮	১৭৫	৯০	৯০	৯৫	৯৩	৯৫
৬.	বিশ্বনাথ	৩৮৫	৩৪০	৪৯০	২৭০	২৪০	৩৮০	২২০	৩৭০
৭.	ফেঞ্চুগঞ্জ	৭৫	৮৫	৯০	৪৫	২৫	৭৫	৮০	১৬০
৮.	গোলাপগঞ্জ	৮৯৫	২২৪	২০০	৬০	৩০	২৫২	১৩০	২৭৫
৯.	জৈন্তাপুর	২৫০	১৯৫	১৪০	৯০	৭০	১৭০	১০৫	১৯০
১০.	কানাইঘাট	৪৫৭	২৯০	১৮০	২৯৫	২৪৫	১০০	১২০	১৯৮
১১.	জকিগঞ্জ	১৬৫	১২০	১০৫	১২০	১২০	৯৫	৯৫	১২০
১২.	বিয়ানীবাজার	১৯৫	১৫০	১০০	১২৫	৯০	১৯০	৮৫	১৮৫
১৩.	মেট্রোপলিটন	১৩	৮	১৩	৫	৫	১৩	৯	২
	মোট =	৩৫৬৫	২২৭৫	২৮০১	১৭৭২	১৫৯৫	২২০৫	১৬৮৪	২৪৯৫

ডাল জাতীয় ফসল

সিলেট জেলার ডাল ফসলের উৎপাদন খুবই কম। তবে সাম্প্রতিক অনেক আগ্রহী কৃষক আমন ধান কর্তনের পর পতিত জমিতে ডাল জাতীয় ফসলের চাষ করে থাকে। সিলেট জেলায় ফরাস জাতীয় ডাল ফসলের আবাদ বেশি করে থাকে। তবে ছোলা, মসুর, মাষকলাই, মুগ, মটর ও অড়হর চাষাবাদও হয়ে থাকে। অড়হর এবং মাষকলাই বেশি চাষ করে থাকে। খেসারি ও ছোলা এই দুইটি ডাল জাতীয় ফসল আমন ধান কর্তনের ৭-১০ দিন আগেই সাথী ফসল হিসেবে আবাদের কার্যক্রম চলছে, যা বিনা চাষে আবাদ হয়ে থাকে। খেসারি ও মাষকলাই গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত। মাষকলাই খরিপ ২ মৌসুমের ফসল। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রতি বছরেই প্রতিটি ডাল ফসলের আবাদ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, ফলে পতিত জমিতে ডাল ফসলের আবাদ বাড়ছে। এই জেলার মোট ডাল ফসলের সিংহভাগই ফরাসজাতীয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪২৫০ হেক্টর জমিতে ফরাসের চাষাবাদ হয়েছে, যা সারণি-৪৯ এর মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-৪৮

ডাল জাতীয় ফসল (২০১৬-১৭)

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	ফরাস হে.	ছোলা হে.	মসুর হে.	মাষকলাই হে.	মুগ হে.	মটর হে.	অড়হর হে.
১.	সিলেট সদর	২০৭	০০	৩৫	১৫	০১	০২	০১
২.	দক্ষিণ সুরমা	১৫৫	০৩	০০	৩৫	০০	০২	০৫
৩.	গোয়াইনঘাট	৬৫০	০৩	০৩	১০৪	০৩	০২	০০
৪.	বালাগঞ্জ	৩৬৫	০২	০৬	৪৫	০৭	০২	০১
৫.	কোম্পানীগঞ্জ	২৮০	০১	১২	৪০	০০	০১	০০

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	ফরাস হে.	ছোলা হে.	মসুর হে.	মাষকালাই হে.	মুগ হে.	মটর হে.	অড়হর হে.
৬.	বিশ্বনাথ	৩২৫	০১	০০	১৫	০০	০২	০০
৭.	ফেঞ্চুগঞ্জ	২৪০	০১	০০	১০	০০	০১	০০
৮.	গোলাপগঞ্জ	৩৫০	০২	০১	১২	০০	০২	০০
৯.	জৈন্তাপুর	২৫০	০৩	১০	৫০	০৫	০১	১০
১০.	কানাইঘাট	৪৪০	০১	০০	১২	০১	০২	০০
১১.	জকিগঞ্জ	৩৪০	০০	০০	০৭	০০	০১	০০
১২.	বিয়ানীবাজার	৬৫০	০১	০১	১৫	০১	০২	০৪
১৩.	মেট্রোপলিটন	০৩	০০	০০	০০	০০	০০	০০
মোট =		৪২৫০	১৮	৬৮	৩৬০	১৮	২০	২১

তেল জাতীয় ফসল সিলেট জেলায় তেল জাতীয় ফসল হলো সরিষা, তিসি, বাদাম ও গর্জন তিল। সরিষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরিষা শুষ্ক ও হালকা জলাযুক্ত জমিতে চাষ করা যায়। শুষ্ক জমিতে আমন ধান কাটার পরে নভেম্বরে বীজ বপন করতে হয়। যদি ওই জমিতে স্বল্পদিনের আমন ধান (অর্থাৎ বিনা ধান-৭, ব্রি ধান-৪৯) চাষ হয়ে থাকে তাহলে ডিসেম্বর মাসে হালকা নিচু জমিতে সরিষা বপন করা যায়। তিল খরিপ-১ও শীতকালে চাষাবাদ করা যায়। বারি তিল-৩ ও বারি তিল-৪ আবাদ করলে কৃষক অধিক লাভবান হতে পারে। তিল খরিপ-২ মৌসুমে অর্থাৎ আগস্ট-সেপটেম্বর মাসে বপন করলে সংগ্রহ করা হয় নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে। সিলেট জেলার ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন তালিকা সারণি-৫০ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৪৯

তেল জাতীয় ফসল

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	সরিষা (হে.)	বাদাম (হে.)	তিসি (হে.)	গর্জন তিল (হে.)
১.	সিলেট সদর	১০০	০	০	০
২.	দক্ষিণ সুরমা	৬৫	০	০	০৩
৩.	গোয়াইনঘাট	৩৯০	০১	০	০
৪.	বালাগঞ্জ	১০৫	০৩	০	১২
৫.	কোম্পানীগঞ্জ	৩৬৯	৩৫	০	১০
৬.	বিশ্বনাথ	১৩৮	০	০	০
৭.	ফেঞ্চুগঞ্জ	১১০	০	০	০
৮.	গোলাপগঞ্জ	৩১০	০৭	০	০৮
৯.	জৈন্তাপুর	২৮০	০১	০	২০
১০.	কানাইঘাট	৮০	০	০	১০৫
১১.	জকিগঞ্জ	৮২	০	০	০৭
১২.	বিয়ানীবাজার	১৪০	০৫	০	২০
১৩.	মেট্রোপলিটন	০১	০	০	০
মোট =		০১	৫২	০	১৮৫

বৃহত্তর সিলেট জেলার পাহাড়-টিলায় অনেক ফলের বাগান রয়েছে। এ সকল **ফল** বাগানে কমলা, মাল্টা, লেবু, বাতাবি লেবু, সাতকরা, নারকেল ও সুপারি পাওয়া যায়। সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলায় টিলায় হানিকুইন, টপডুকি জাতের সুস্বাদু মিষ্টি আনারস উৎপাদন হয়ে থাকে। তা ছাড়াও এই উপজেলায় রফতানিযোগ্য জারালেবুর ব্যাপক চাষাবাদ হয়। সিলেটে বাতাবি কাগজি ও এলাচি লেবু উৎপাদন হয়ে থাকে। সিলেটের পর্যটন এলাকাখ্যাত জাফলংয়ে কমলা ও আনারসের দৃষ্টিনন্দন বাগান রয়েছে। গ্রাফটিং পদ্ধতিতে বাতাবি লেবুতে মালটার উন্নতজাত প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে জৈন্তাপুর এলাকায় কৃষকদের মাঝে সাড়া ফেলেছে। নতুন জাতের কমলার চাষাবাদ বিয়ানীবাজার, জাফলং এবং জৈন্তাপুর উপজেলার টিলা ও পাহাড়ি ঢালে দেখা যায়। ম্যান্ডারিন জাতীয় কমলা শীতকালে অর্থাৎ ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে পাওয়া যায়। লেবু এই জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফল। কাগজি লেবু, পমেলো এবং টক জাতীয় লেবু বছরব্যাপী পাওয়া যায়। তবে জুন-জুলাই ও আগস্ট মাসে বেশি লেবু সরবরাহ হয়ে থাকে। বর্ষার শেষ দিকে অর্থাৎ আগস্ট এবং সেপটেম্বর মাসে পমেলো লেবু পাওয়া যায়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উৎপাদিত ফলের তথ্যাদি সারণি-৫১ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৫০

২০১৫-১৬ অর্থবছরে উৎপাদিত ফলের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	ফলের নাম	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	মন্তব্য
১.	আম	১০৭০	৭৭০৪	
২.	কাঁঠাল	৭৪০	৮৫১০	
৩.	জাম	২১৫	৩৮৭	
৪.	লিচু	১৬৫	৯২৪	
৫.	পেয়ারা	৩৮০	২২৮০	
৬.	কলা	৫৭০	৭৪১০	
৭.	পেঁপে	৩১০	১৪২৬	
৮.	কুল	৩০৮	৯২৪	
৯.	নারকেল	৪১০	২০৫০	
১০.	সুপারি	২২২৫	২০০২৫	
১১.	তাল	৩০	২৪০	
১২.	খেজুর	২০	২২	
১৩.	তরমুজ	২৩৪	৮০৭৩	
১৪.	কমলা	২৮৭	১৫৫০	
১৫.	মালটা	২৫	৩৫৫	
১৬.	জলপাই	৮৫	২২১	

ক্রমিক নং	ফলের নাম	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	মন্তব্য
১৭.	আনারস	২১২	১৪৮৪	
১৮.	আমড়া	৬৭	১৮৯	
১৯.	আমলকী	২৫	৬৬	
২০.	কামরাঙা	৭০	৩৮৫	
২১.	বাতাবি লেবু	১৩৫	৯৪৫	
২২.	লেবু	৩৬৫	৩২৮৫	
২৩.	জাড়া লেবু	৮০	৪৪৮	
২৪.	বেল	৩৪	১৬৫	
২৫.	কতবেল	৩.৭০	৯.৬২	
২৬.	ড্রগনফ্রুট	০.০৬	০.০৫	
২৭.	দেশি গাব	২.৫০	১৫	
২৮.	সফেদা	৯.২০	৬৭	
২৯.	আতা	২২.৫০	১১০.২৫	
৩০.	সরিফা	১১.৫০	৪৬	
৩১.	ডেউয়া	১৫	২২.৫০	
৩২.	ডালিম	১৭	২৫.৫০	
৩৩.	লটকন	৫৯	৩০০.৯০	
৩৪.	কাউফল	১৬.৫০	২১.৪৫	
৩৫.	জামরুল	১০	৩০	
৩৬.	করমচা	৪.৫০	১২.৫১	
৩৭.	চালতা	৩০	১৪৪	
৩৮.	বিলাতি গাব	৭.৭০	৪৯	
৩৯.	বাঙ্গি	৫৭.৫০	৩৩৩.৫০	
৪০.	তেঁতুল	২২	৩৩	
৪১.	অরবরই	১৯.৬০	২৩	
৪২.	বিলম্বী	৯১	১০৯	
৪৩.	অন্যান্য	২.৯০	১৩৩৪	
৪৪.	স্ট্রবেরি	০০	০০	
৪৫.	সাতকরা	৫	১২.৫০	
৪৬.	তৈকর	২	৩০	
মোট =		৮৪৭১	৭১৭৯৭	

ফুল সিলেট জেলায় বাণিজ্যিকভাবে কোনো ফুলের চাষ হয় না। তবে সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য বাড়ির আঙিনায় সৌখিন শ্রেণির লোকজন চাষাবাদ করে থাকে। ২০১৫-

১৬ অর্থবছরে ফুল উৎপাদনের তথ্যাদি সারণি-৫২ এর সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো :

সারণি-৫১

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ফুল উৎপাদনের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	ফুলের নাম	আবাদকৃত জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (সংখ্যা)
১.	গোলাপ	১০.৬৫	১৫৯৭৫০
২.	গাঁদা	১২.৫০	২২৫০০০
৩.	ডালিয়া	৪.৫০	৬৭০৫০
৪.	অন্যান্য	২৪.১০	৮২৭৭৭৫
৫.	রজনীগন্ধা	১০	২১০০০০
মোট =		৬১.৮০	১৪৮৯৫৭৫

সিলেট জেলায় মসলার তেমন বেশি চাষাবাদ হয় না। যে সকল মশলার চাষ হয় সেগুলো হলো : পিঁয়াজ, রসুন, ধনিয়া, মরিচ ও গোলমরিচ, তেজপাতা, দারুচিনি। বসতবাড়ি ও নদীতীরবর্তী এলাকায় মরিচের চাষ হয়ে থাকে। জৈন্তাপুর উপজেলায় তেজপাতা, দারুচিনি ও গোলমরিচের আবাদ হয়। পিঁয়াজ, রসুন ও ধনিয়া সিলেট জেলায় সর্বত্র অল্পবিস্তর চাষাবাদ হয়ে থাকে। পিঁয়াজ ও রসুন সামান্য নিচু জমিতে চাষাবাদ হয় অর্থাৎ যেখানে পানি সেচের সুযোগ রয়েছে। আমন ধান কাটার পর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পিঁয়াজ ও রসুনের বীজ বপন করলে সংগ্রহ করে মার্চ ও এপ্রিল মাসে। সারণির সাহায্যে মশলাজাতীয় ফসলের তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৫২

মসলা জাতীয় ফসল (২০১৬-২০১৭)

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	পিঁয়াজ (হে.)	রসুন (হে.)	ধনিয়া (হে.)	মরিচ (হে.)
১.	সিলেট সদর	১৮	০৫	১৩৫	১০০
২.	দক্ষিণ সুরমা	২০	০৩	১০০	৯০
৩.	গোয়াইনঘাট	২৫	১৩	১০০	১০০
৪.	বালাগঞ্জ	০৫	০১	১০০	১০৫
৫.	কোম্পানীগঞ্জ	৩০	২০	৫০	৯৫
৬.	বিশ্বনাথ	১২	১৩	১৬০	১৪০
৭.	ফেঞ্চুগঞ্জ	১৫	১০	১২৫	৫৫
৮.	গোলাপগঞ্জ	১৫	০৯	২১০	১৫০
৯.	জৈন্তাপুর	২৫	৩০	১১০	১৮৫
১০.	কানাইঘাট	৩০	০৭	৭৮	১০১
১১.	জকিগঞ্জ	০০	০০	৪০	৭০
১২.	বিয়ানীবাজার	২২	০৫	১৮০	৮০
১৩.	মেট্রোপলিটন	০১	০০	০২	০৪
	মোট =	২১৮	১১৬	১৩৯০	১২৭৫

চা বাংলাদেশের মোট ১৬৬টি চা-বাগানের মধ্যে ২০টি চা-বাগান রয়েছে সিলেট জেলায়। সিলেট জেলার জৈন্তাপুর, কানাইঘাট, গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও সিলেট সদর উপজেলায় বেশ কয়েকটি চা-বাগান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চা-বাগান হলো মালনীছড়া চা-বাগান, লাক্কাতুড়া চা-বাগান, তারাপুর চা-বাগান, দলদলী চা-বাগান, হাতিম চা-বাগান, বড়োজান চা-বাগান, গুল্মি চা-বাগান, আলী বাহার চা-বাগান, হাবিব নগর চা-বাগান, আহমদ টি এস্টেট, খান চা-বাগান, লালাখাল টি এস্টেট, শ্রীপুর চা-বাগান ইত্যাদি। ২০১৫ সালে সিলেট জেলায় ৫০৭২.২৭ মেট্রিকটন চা উৎপাদিত হয় (প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট, বাংলাদেশ চা বোর্ড, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার)।

মৎস্য সিলেটে রয়েছে অসংখ্য নদনদী, খালবিল, ও প্লাবনভূমিসহ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জলজ ইকো সিস্টেম-হাওর। এসব প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। সর্বোপরি সিলেট অঞ্চলের প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে প্রাকৃতিক মাছের প্রাচুর্যের ফলে এ অঞ্চলের মৎস্যক্ষেত্রগুলো মাদার ফিশারি হিসেবে সুপরিচিত।

মৎস্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার বিচারে সিলেট অঞ্চলের মৎস্যসম্পদ দুধরনের:
ক. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়;
খ. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়

আমাদের দেশে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ ও মুক্ত জলাশয়ে প্রায় ২৬৬ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ১২ প্রজাতির বিদেশি মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি রয়েছে (IUCN-2000)। উল্লিখিত ২৬৬ প্রজাতির স্বাদু পানির মাছের মধ্যে সিলেট অঞ্চলে ৮০-৯০ প্রজাতির মাছ, ১০-১২ প্রজাতির চিংড়ি এবং ৬-৭ প্রজাতির কাঁকড়া/কচ্ছপ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার পরিবেশগত দূষণের কারণে সিলেট অঞ্চলে মাছের উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান এবং অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হতে চলেছে। ২০১৬ সালে সিলেট জেলায় মৎস্য উৎপাদনক্ষম জলায়তন ১,০৭,৭৫৫ হেক্টর, যা হতে বাৎসরিক মাছের মোট উৎপাদন ৫৭,৯০৩.৮১ মে.টন।

সূত্র: জেলা মৎস্য অফিস, সিলেট।

ক. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়

মুক্ত জলাশয় বলতে নদী, খালবিল, হাওর ও প্লাবনভূমিকে বোঝানো হয়ে থাকে। সিলেট জেলার এ উন্মু ক্ত জলাশয়ের আয়তন১,০০,৯৫১ হেক্টর এবং উক্ত জলাশয়গুলো হতে মাছের উৎপাদন ৩৮,২১৪ মে. টন। সামগ্রিকভাবে সিলেট জেলার মাছ উৎপাদনের সিংহভাগই আসে এ সমস্ত উন্মু ক্ত জলাশয়ে (প্রধানত হাওর, বিল, প্লাবনভূমি) প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণশীল মাছ আহরণের মাধ্যমে। এ উন্মু ক্ত জলাশয় বিশেষ করে প্লাবনভূমি ও হাওর মাছের

প্রাকৃতিক প্রজনন, বিচরণ ও বৃদ্ধির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বন্যা নিয়ন্ত্রণ/পানি নিষ্কাশন ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে উন্মু ক্ত জলাশয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপত্তি ঘটছে। এছাড়া নদীনালার সাথে সংযুক্ত অভ্যন্তরীণ নিম্নাঞ্চলের জলাশয় যেমন বিল, ঝিল ও হাওরে পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে একদিকে যেমন প্লাবনভূমিতে মৎস্য প্রজনন, বিচরণ ও বৃদ্ধি চক্র বিনষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে প্লাবনভূমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় মৎস্য বিচরণক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

নদনদী

সিলেট জেলায় ছোটো-বড়ো মিলিয়ে প্রায় ৩৭টি নদনদী রয়েছে। এর মধ্যে সুরমা ও কুশিয়ারা দুইটি বড় নদী। আসামের লুসাই পাহাড় হতে বরাক নদী উৎপত্তি হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জকিগঞ্জ এসে দুভাগে বিভক্ত হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামধারণ করে সিলেটের বিভিন্ন উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। স্মরণাতীতকাল হতে এ নদী দুটোতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত। এগুলো মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র ছিল। বর্তমানে এ জেলার নদীর আয়তন ১১,১৪৫ হেক্টর এবং তা হতে বাৎসরিক মাছের উৎপাদন ২,৮৯৬ মে. টন।

খাল

সিলেট জেলায় বর্তমানে খালের সংখ্যা ১৮৪টি, আয়তন ১,৮৫৬ হেক্টর এবং এ উৎস হতে বাৎসরিক মাছের উৎপাদন ১৬৬.৫০ মে. টন।

বিল

এ জেলায় মাছ উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে বিল। এ জেলার বিভিন্ন হাওর, নদী, উপনদী, শাখানদী, খাল ইত্যাদি জালের ন্যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ ছাড়াও আরো কিছু অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকা আছে যেখানে সারা বছর কমবেশি পানি থাকে। এ রকম জলাশয়কে বিল বলা হয়। এ বিলই হচ্ছে সিলেট জেলার মাছ উৎপাদনের বৃহত্তম প্রাকৃতিক ভাণ্ডার। এ জেলায় ছোটো-বড়ো মিলিয়ে সর্বমোট ৬৮৭টি বিল রয়েছে যেগুলোর আয়তন হচ্ছে ১০,৭৬০ হেক্টর এবং বাৎসরিক মাছের উৎপাদন ১০,০৬১.৮৬ মে. টন। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণ এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে বিলগুলো দিন দিন ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

হাওর

সিলেট জেলায় ছোটো-বড়ো মিলিয়ে সর্বমোট প্রায় ৩৯টি হাওর রয়েছে। মোট আয়তন ২৭,৯৬৪ হেক্টর এবং এখানে বছরে মাছের উৎপাদন প্রায় ১০,৬১৭.২৬ মে. টন। সিলেট জেলার উল্লেখযোগ্য হাওরগুলো হচ্ছে বাঘা হাওর, ঝিলকার হাওর, পাথর চাউলী হাওর, চাউলধনি হাওর, মুড়িয়া হাওর, বাদাউরা হাওর, মেদল হাওর, বীরমঙ্গল হাওর, দামড়ি হাওর ও নিয়াগুল হাওর ইত্যাদি। এ ছাড়া বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য হাকালুকি হাওর মৌলভীবাজারের বড়োলেখা, জুড়ি, কুলাউড়া উপজেলা এবং সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। হাকালুকি হাওরের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ এলাকা গোলাপগঞ্জ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। এ দুটি উপজেলায় হাকালুকি হাওরের আয়তন প্রায় ৩২০০ হেক্টর এবং এ অঞ্চলে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ২,৫৭৬ মে. টন। এ হাকালুকি হাওরে এক সময় সর্বমোট ১০৭ প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত, এর মধ্যে ৩২ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে হাকালুকি

হাওরে যে সমস্ত মাছ পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে: বোয়াল, আইড়, ঘনিয়া, লাছো, কালিবাউশ, রুই, মৃগেল, কাতলা, বাইম, সরপুঁটি, ঘাঘলা, রিটা, পাবদা, বাচা, শোল, গজার, টাকি, কই, শিং, মাগুর, ফলি, কাকিয়া, গলদা চিংড়ি, পুটি, ট্যাংরা, মলা, চাপিলা, দারকিনা, পাটাবাইম, কেচকি, ছোটো চিংড়ি। এছাড়া বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহ হচ্ছে- চিতল, বাঘাআইড়, দেশিপুঁটি, খারিশ, ভেটকী, খলিশা, রানী, ঘোলা ট্যাংরা, রিটা, নাপিতকই, চেকা, বাঁশপাতা, কুচিয়া ও পাঙাস এবং বিলুপ্ত প্রজাতি সমূহ : নান্দিল, মহাশোল, বামোশ ইত্যাদি।

প্লাবনভূমি সাধারণত বর্ষা মৌসুমে ৪-৬ মাসের মতো পানি থাকে অথচ শুস্ক মৌসুমে সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায় বা এর অংশবিশেষে পানি থাকে এমন এলাকাই প্লাবনভূমি হিসেবে পরিচিত। প্লাবনভূমি বছরের বেশিরভাগ সময় শুষ্ক থাকায় এখানে ধানসহ বিভিন্ন কৃষি ফসল উৎপাদনে সার ব্যবহার করা হয়। প্লাবনভূমি রুই জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, ঘনিয়া ইত্যাদি) মাছসহ সকল দেশীয় প্রজাতির ছোটো-বড়ো মাছ উৎপাদনের জন্য উৎকৃষ্ট চারণভূমি ও আবাসস্থল। মুক্ত জলাশয় হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন মাছের সিংহভাগই উৎপাদিত হতো প্লাবনভূমিতে। নির্বিচারে ডিমওয়ালা মাছ ও পোনামাছ নিধন, কারেন্ট জাল ও কাপড়ি জাল দিয়ে পোনাসহ মাছ আহরণ এবং অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণের ফলে প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। সিলেট জেলায় বর্তমানে প্লাবনভূমির আয়তন হচ্ছে ৪৯,২২৬ হেক্টর এবং এ উৎস হতে বাৎসরিক মাছের উৎপাদন ১৪,৪৭১.৭৭ মে. টন।

মৎস্যজীবী/জেলেরা মুক্ত জলাশয়ের তীরবর্তী গ্রামেগঞ্জে বসবাস করে এবং প্রধানত প্রাকৃতিক মৎস্য আহরণ করে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। সিলেট জেলায় বর্তমানে প্রকৃত মৎস্যজীবী জেলের সংখ্যা ৩০,৫৪১ জন। এ সমস্ত মৎস্যজীবী ও জেলে পরিবারের সদস্যগণ যে সমস্ত সরঞ্জামাদি বা বিভিন্ন ধরনের জাল দিয়ে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বেড়জাল, কাপড়ি জাল, দলজাল, ফাঁসজাল (কারেন্ট জাল), বেলজাল, বেহন্দি জাল, ধর্মজাল, ঠেলা জাল, ঝাকিজাল, কোনাজাল ইত্যাদি এবং মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদিগুলো হচ্ছে- চাই, পলো, বানা, কোচা, বড়োশি ইত্যাদি। সকল মাছ ধরার সরঞ্জামাদি ও বিভিন্ন প্রকারের জাল দিয়ে যে মাছ আহরণ করা হয় এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রজাতিসমূহের নাম হলো- বোয়াল, আইড়, গুচি, কৈ, শিং, মাগুর, মলা, ঢেলা, চান্দা, পুঁটি , টেংরা, গুলশা টেংরা, পাবদা, ফলি, বাচা, রিটা, চেকা, রুই, কাতলা, মৃগেল, গ্রাসকার্প, সরপুঁটি, বাইম, খলিশা, মেনি, শোল, টাকি, গজার ইত্যাদি।

এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে আগে অনেক প্রজাতির ঝিনুক পাওয়া যেত। বর্তমানে এগুলো বিলুপ্তির পথে। তবে বর্তমান সরকার বিশ্বব্যাপী মুক্তার কদর বাড়ায় ঝিনুক চাষের ওপর দৃষ্টি দিয়েছে এবং এর চাষ বৃদ্ধিকল্পে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

খ) অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়

বদ্ধ জলাশয় বলতে পুকুর দিঘিকে বোঝানো হয়ে থাকে। সিলেট জেলার বদ্ধ জলাশয়গুলোও মাছের উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উৎস। বর্তমানে সিলেট জেলায় ছোটো-বড়ো মিলিয়ে প্রায় ৫১,২৮২টি পুকুর-দিঘি রয়েছে। এগুলোর মোট আয়তন ৪,৯৯৩ হেক্টর এবং এগুলো থেকে বাৎসরিক ১২,৪৪০ মে.টন মাছ উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও সিলেটের বিভিন্ন উপজেলায় প্রায় ২৫০টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামার রয়েছে। এগুলোর আয়তন প্রায় ৮৫৫.৯৮ হেক্টর এবং বাৎসরিক মাছের উৎপাদন ৫,২১২.৬০ মে.টন। সিলেট জেলায় মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ মাছ আসে এ বদ্ধ জলাশয় থেকে। এছাড়া সিলেট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের রাস্তার পার্শ্বস্থ ডোবানালা, বরোপিট, ক্রিক, পাহাড়ের ছড়া এবং ধানক্ষেতে মাছচাষের মাধ্যমে বছরে অতিরিক্ত ~~১,০৭২~~ ৭৪২.২৪ মে. টন মাছ পাওয়া যায়। অন্যদিকে সিলেট জেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে গোলাপগঞ্জ উপজেলায় এবং খাদিমনগরে ২টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার রয়েছে যেগুলো থেকে কৃত্রিম উপায়ে রুই জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন করে মাঠপর্যায়ে চাষিদের নিকট সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। আবার রেণু থেকে পোনা উৎপাদন করেও মৎস্যচাষিদের মাঝে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও এ খামারগুলোর মাধ্যমে মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ মাছ চাষের বিভিন্ন কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হয়। সিলেট জেলায় এ সমস্ত পুকুর দিঘি ও বাণিজ্যিক খামারে যে সমস্ত দেশি ও বিদেশি প্রজাতির মাছ চাষ করা হয় এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রজাতিগুলো হচ্ছে-রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, সরপুঁটি, ঘনিয়া, কমনকার্প, মিররকার্প, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, গ্রাসকার্প, তেলাপিয়া, কৈ, শিং, মাগুর ইত্যাদি। উপরিউক্ত কার্যক্রম ছাড়াও সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় বিগত ২০১২ সালে একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন শিং মাছের মৎস্য হ্যাচারি স্থাপিত হয়েছে। উক্ত হ্যাচারিতে প্রতিবছর গড়ে ১০-১৫ কেজি শিং মাছের রেণু উৎপাদিত হয়ে থাকে। উক্ত রেণু হতে শিং মাছের পোনা উৎপাদন করে উৎপাদিত পোনা মৎস্য চাষিদের মাঝে বিক্রয় করা হয়। ফলে সিলেট জেলায় মৎস্য চাষিদের মাঝে শিং মাছ চাষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লিখিত জলাশয়গুলোতে এক নজরে মাছের উৎপাদনের পরিসংখ্যান সারণিতে দেখানো হলো:

ক্র.নং	মৎস্য সম্পদ উৎসের বিবরণ	সংখ্যা (টি)	আয়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)
১	২	৩	৪	৫
১.	বদ্ধ জলাশয় ক) পুকুর/দিঘি (সরকারি ও বেসরকারি)	৫১,২৮২	৪,৯৯৩.০০	১৩,৭৩৪.৯৩
	খ) মৎস্য খামার (বাণিজ্যিক)	২৫০	৮৫৫.৯৮	৫,২১২.৬০
	উপমোট=	৫১,৫৩২	৫৮৪৮.৯৮	১৮,৯৪৭.৫৩
২.	মুক্ত জলাশয় ক) নদী	৩৭	১১,১৪৫.০০	২,৮৯৬.৬৫

ক্র.নং	মৎস্য সম্পদ উৎসের বিবরণ	সংখ্যা (টি)	আয়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)
১	২	৩	৪	৫
	খ) খাল	১৮৪	১,৮৫৬.০০	১৬৬.৫০
	গ) বিল	৬৮৭	১০,৭৬০.০০	১০,০৬১.৮৬
	ঘ) হাওর	৩৯	২৭,৯৬৪.০০	১০,৬১৭.২৬
	ঙ) প্লাবনভূমি	৩৯৪	৪৯,২২৬.০০	১৪,৪৭১.৭৭
	উপমোট=	১,৩৪১	১,০০,৯৫১.০০	৩৮,২১৪.০৪
৩.	বিবিধ ক) ধানক্ষেতে মাছ চাষ	১৯০	৫৬২.০০	৫৩২.২৪
	খ) বরোপিট/ক্রিক/পাহাড়ে মাছ চাষ	৩৩৫	৩৯৪.০০	২১০.০০
	উপমোট=	৫২৫	৯৫৬.০০	৭৪২.২৪
	সর্বমোট=	৫৩,৩৯৮	১,০৭,৭৫৫.০০	৫৭,৯০৩.৮১

সূত্র : জেলা মৎস্য অফিস, সিলেট (২০১৬ সাল)

মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম

সিলেট জেলায় বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো :

১. মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তি, ২. বিল নার্সারি স্থাপন, ৩. মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, ৪. পুকুর-দিঘিতে উন্নত প্রযুক্তিতে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ, ৫. মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ৬. মৎস্যজীবী/জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান এবং ৭. মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন।

১. মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রম

সিলেট জেলার মুক্ত জলাশয়গুলো ছিল মৎস্য উৎপাদনের প্রধান উৎস এবং দেশের মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় শতকরা ৭০-৮০ ভাগ পাওয়া যেত এসব অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাথাপিছু মাছের প্রাপ্যতা আগের তুলনায় অনেক কমে সিলেট জেলায় বিগত কয়েক বছরে মাছের পোনা মজুদের পরিমাণ এবং এতে মাছের উৎপাদন ছকে দেখানো হলো :

সাল	জলাশয়ের সংখ্যা	জলাশয়ের আয়তন (হেক্টর)	ব্যয়কৃত অর্থ (লাখ টাকা)	অবমুক্তকৃত পোনার সংখ্যা (লাখ)	অতিরিক্ত মাছ উৎপাদনের পরিমাণ (মে.টন)	সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা (জন)
	১	২	৩	৪	৫	৬
২০১০-২০১৬	৩৩৬টি	৪২,৫১৩.৭৮	২৭১.৩৩	৫৩.৪৫	১৪৩৩.০৩	২,৯৩,৭৭০

সূত্র: জেলা মৎস্য অফিস, সিলেট

২. বিল নার্সারি স্থাপন কার্যক্রম

হাওর, প্লাবনভূমি, খাল বিল ও নদীতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলাশয়ের জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন তথা হাওর এলাকার দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু নির্বাচিত জলাশয়ে মৎস্য অধিদপ্তর

প্রতি বছর বিল নার্সারি স্থাপন করছে। এ সকল বিলে এক থেকে দুই হেক্টর আয়তনের বিল নার্সারি স্থাপন করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক জলাশয়ে মৎস্য বীজের ঘাটতি পূরণ করে স্বল্প খরচে মাছের পোনা অবমুক্ত করাই হলো বিল নার্সারি করার মূল উদ্দেশ্য। বিল নার্সারিতে মূলত দেশীয় কার্প জাতীয় মাছের রেণু মজুদের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা হয়। সিলেট জেলায় বিগত কয়েক বছরে বিল নার্সারি কার্যক্রমের মাধ্যমে রেণু মজুদের পরিমাণ এবং এতে অতিরিক্ত মাছের উৎপাদন নিম্নরূপ :

সাল	বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিল/ জলাশয়ের সংখ্যা (টি)	জলাশয়ের আয়তন (হেক্টর)	ব্যয়কৃত অর্থ (লাখ টাকা)	উৎপাদিত/ অবমুক্তকৃত পোনার সংখ্যা (লাখ)	অতিরিক্ত মাছ উৎপাদনের পরিমাণ (মে.টন)	সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা (জন)
	১	২	৩	৪	৫	৬
২০১০-২০১৬	১৯৩	১৩৮১১.৩৩	১৭১.৫৪	৪৬০.৫৩৮৫	২৯৭৮.১৫	২১৯৮২৮

৩. মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন

মৎস্য অভয়াশ্রম হচ্ছে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো জলাশয়ের এমন এলাকা যেখানে মাছ অবাধে বংশ বিস্তার, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া এবং বসবাস করতে পারে এবং যেখানে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। সাধারণত নদী, বিল, হাওর ও প্লাবনভূমির গভীর অংশ যেখানে পানির স্রোত কম, পলি মাটি জমার সম্ভাবনা কম এবং জলযান ও মানুষের যাতায়াত কম এমন স্থানেই অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। অন্যদিকে অভয়াশ্রম হচ্ছে মা-বাবা মাছসহ সকল প্রকার পোনা ও মাছের নিরাপদ আবাসস্থল।

সিলেট জেলায় বর্তমানে কোম্পানীগঞ্জ ও বালাগঞ্জ উপজেলায় ২টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। ফলে উক্ত এলাকায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

৪. পুকুর-দিঘিতে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ

বর্তমানে সিলেট জেলায় ৪,৯৯৩ হেক্টর আয়তনের পুকুর-দিঘিতে মাছের উৎপাদন ১৩,৭৩৪.৯৩ মে. টন এবং বার্ষিক হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ২.৭৫ মে.টন। মৎস্য অধিদপ্তর তার প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে মৎস্যচাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী মৎস্য খামার পরিচালনা, মৎস্য ঋণ বিতরণ এবং মাঠপর্যায়ে পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

৫. মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সিলেট জেলার জনগণকে নিরাপদ ও ফরমালিনমুক্ত মাছ সরবরাহ করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ সিলেট জেলায় ১টি ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল ও সেন্সর পদ্ধতির অত্যাধুনিক কিট (kit) সরবরাহ করা হয়েছে। সিলেট জেলায় এ পর্যন্ত ফরমালিন সম্পর্কে মোবাইল কোর্ট/জেল জরিমানার বিবরণ :

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা	ব্যয়কৃত অর্থ	পরীক্ষিত নমুনার মাছের বিবরণ	ফরমালিনের উপস্থিতি সনাক্তকৃত মাছ এবং গৃহীত কার্যক্রম	জেল (জন)	জরিমানা
৯৭	১,১৪,৫০০/- (এক লাখ চৌদ্দ হাজার পাঁচশত টাকা)	১৬৯৩ কেজি রুই, কাতলা, মৃগেল, কালি বাউস, ইলিশ মাছ পরীক্ষা করা হয়।	১৬৬ কেজি মাছে ফরমালিন পাওয়া যাওয়ায় বর্ণিত পরিমাণ মাছ ধ্বংস করা হয়েছে।	-	৩৬,০০০/- (ছত্রিশ হাজার টাকা)

প্রকৃত জেলেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুবিধার্থে এ জেলার প্রকৃত জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কারণ প্রকৃত জেলেদের তালিকা বা স্বীকৃতি না থাকায় প্রায়শ জেলে পরিচয়ে অমৎস্যজীবীরা বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করে থাকে।

ফলে প্রকৃত জেলেরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বর্তমানে সিলেট জেলায় ৩০,৫৪১ জন প্রকৃত জেলেদের নিবন্ধন করা হয়েছে।

৭.মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন সিলেট জেলার বিভিন্ন মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য লালন/প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ, পোনা মাছ ও ডিমওয়ালা মাছ নিধন রোধ করে পোনা মাছকে বড়ো হওয়া এবং বড়ো মাছকে বংশ বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া, কারেন্ট জালের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

প্রাণিসম্পদ

অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে খামারে গবাদি প্রাণী ও হাঁস-মুরগি পালন করা হয়। সিলেটের গবাদি প্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গোরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া। এগুলো যে-কোনো দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, কারণ এসব প্রাণী কৃষি কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কাজে চালিকা শক্তি (draft), চামড়া ও সারের জোগান দেয় এবং জনসংখ্যার বৃহৎ অংশের জন্য

মাংস ও দুধের প্রধান উৎস। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পালিত প্রাণিসম্পদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাণিসম্পদের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে জড়িত রয়েছে গবাদি প্রাণীর স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, উৎপাদন-উপাত্তগুলোর মান এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাবসা-উদ্যোগ প্রসারে কার্যকর ব্যবস্থা। পরিসংখ্যান অনুসারে মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপির) প্রায় ৩.৪৯% যোগায় প্রাণিসম্পদ খাত এবং এটির বার্ষিক (২০১২-২০১৩) বৃদ্ধির হার ০.৩৫%। বাংলাদেশের প্রায় ২০% লাখ গবাদি প্রাণী ও হাঁস-মুরগি পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। জমি চাষ, ভার বহন এবং গোবর সার ও জ্বালানি সরবরাহ প্রাণিসম্পদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তদুপরি, প্রাণীর চামড়া, হাড়, নাড়িভুঁড়ি, পালক ইত্যাদি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সহায়ক। প্রাণিসম্পদ ভূমিহীন মানুষের জীবিকারও বড়ো একটি অবলম্বন।

২০১৪ সালে সিলেট জেলায় ৩,৫১,৪৭০টি গাভী, ৩,৬২,৩৮৫টি বলদ, ৯৫,২৯৮টি ষাঁড়, ১,১৩,৬০৯ টি বকনা, ১,১৬,৪১৮টি বাছুর, ৮০,০১২টি মহিষ, ১,৫৪,৯১০টি ছাগল, ৭৪,৯৪০টি ভেড়া, ৩৭,০১,৯৬০টি মোরগ-মুরগি ও ৯,৮১,১০০টি হাঁস রয়েছে। প্রতি বর্গকিলোমিটার জমিতে প্রাণীর ঘনত্ব ৩৩৮ এবং পাখির ঘনত্ব ১১৭৩।

সিলেট জেলায় শতকরা ২৫.৮০ ভাগ পরিবার গবাদি প্রাণী ও ৩৫.০৯ ভাগ পরিবার হাঁস-মুরগি প্রতিপালন করছে। তবে শুধু গোরু-মহিষ প্রতিপালন করছে শতকরা ১৭.৯০ ভাগ পরিবার। এ ছাড়া ছাগল-ভেড়া প্রতিপালন করছে শতকরা ৭.৮৯ ভাগ এবং হাঁস-মুরগি শতকরা ৩৫.০৯ ভাগ পরিবার । প্রতিটি পরিবারে গড়ে ১.০৪ টি গোরু-মহিষ, ০.৩৭ টি ছাগল-ভেড়া ও ৫.২৬ টি হাঁস-মুরগি রয়েছে।

সারণি-৫৩

সিলেট জেলার প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য

(২০১৫-২০১৬ সালের পরিসংখ্যান)

ক্র. নং	উপজেলার নাম	পশুপাখির সংখ্যা (হাজারে)									
		গোরু	মহিষ	ছাগল	ভেড়া	শূকর	হাঁস	মুরগি	কবুতর	কোয়েল	অন্যান্য
১	সিলেট সদর	৯৯.৮৩	৬.৫৩	২২.৫৯	১৪.৭১	৩.১০	৫১.৩২	৫১.১২	২৭.৩৫	২৪.৬৬	০.০২
২	বিশ্বনাথ	১১৭.৭৩	২.৫২	১.৭৬	২.৪২	--	৫০.৯০	১৫.২৩	২.৭৩	০.৩৪	২.৮০
৩	বালাগঞ্জ	১১৭.৭৩	২.৫২	১.৭৫	২.৪২	--	৫০.৯০	১৫.২৩	২.৭৩	০.৩৪	২.৮০
৪	ফেঞ্চুগঞ্জ	২২.৭৪	৩.৯২	৫.৪৩	০.৭৩	--	২২.৪০	১২৩.২০	১৫.৩৪	--	--
৫	গোলাপগঞ্জ	৮৬.৬৬	১.৫৭	১৫.০০	১.৩৫	--	২৬.৫৪	৩৪১.৬০	১১.৪২	৭.২৮	--
৬	বিয়ানীবাজার	৫৯.৯৪	৬.৮৯	১১.৫২	৫.৩৫	--	৭০.৪৩	৩৩০.০০	২৯৬.১৩	১৩.৭৮	৮.৬৭
৭	জকিগঞ্জ	১৩১.৯৭	২৯.৫৫	১৯.৬৯	১৬.৭১	--	৮২.৬৮	২৪০.০৭	১৪.৮৩	২০.৪৯	০.০৪
৮	কানাইঘাট	৯০.০৫	৯.৭৫	১৪.৮৫	০.৮১	--	১৯৫.৫৫	৩২১.০৪	১.২৪	--	০.০৩
৯	জৈন্তাপুর	৫৩.০৭	৩.০৫	৩০.৮৮	৬.৯২	০.১১	৬৬.০২	২৩.৩৬	৩.১২	--	৩.১১
১০	গোয়াইনঘাট	১৪৩.৮৬	২২.৮৯	৩০.৬৭	১৩.২৫	০.০৫	৩৪.৭৫	৫৯.৯০	১০.৩২	--	--
১১	কোম্পানীগঞ্জ	১৯৬.৫০	১.৩৮	১৬.০৫	১৯.৬২	--	৩৬৪.৯৫	২০৭০.৩৬	--	--	০.০২

ক্র. নং	উপজেলার নাম	পশুপাখির সংখ্যা (হাজারে)									
		গোরু	মহিষ	ছাগল	ভেড়া	শূকর	হাঁস	মুরগি	কবুতর	কোয়েল	অন্যান্য
১২	দক্ষিণ সুরমা	২৮.৫৯	.০৪৭	৩.২৮	০.৬৬	০.২৬	৭১.৭১	১১৩.৩৯	২২.৭৯	৩.৬৮	০.১৭
১৩	ওসমানীনগর	৫৯.৯৪	১.৯৭	১০২.৮৪	১.৩৮	-	৪৫.৩৭	১৪০.৮৭	১.৩৮	০.২৮	০.৩২
	সর্বমোট	১২০৮.৬৫	৯২.৫৯	২৭৬.৩১	৮৬.৩৩	৩.৫২	১১০৩.৫২	৩৮৪৫.৭৩	৪০৯.৩৮	৭০.৮৫	১৭.৯৮

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নানা উপাত্তনির্ভর। এগুলো হলো গবাদি প্রাণী স্বাস্থ্যসেবা, প্রাণিসহায়ক কার্যক্রম, প্রাণিসম্বন্ধীয় জীববস্তুর বিলিব্যবস্থা, মানসম্পন্ন উৎপাদনের বিস্তারণ, প্রাণিসম্প্রসারণ সেবা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা। প্রাণীর বিবিধ স্বাস্থ্যসমস্যা, যেমন রোগ শনাক্তকরণ, চিকিৎসা, রোগ নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ মোকাবিলা ইত্যাদি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি প্রধান দিক। এগুলো ছাড়াও আরও কিছু অপরিহার্য দিকও রয়েছে, যেমন জাত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণীর শ্রীবৃদ্ধি, কৃত্রিম প্রজনন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি। সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত খাতসহ সিলেটে নানা সংস্থা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। সিলেটে ১টি জেলা দুগ্ধখামার আছে।

বৈধ পথে আসা অ্যানিমেল বা প্রাণির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর, সুতারকান্দি স্থল বন্দর, জকিগঞ্জ স্থলবন্দর এবং তামাবিল স্থল বন্দরে ১টি করে সিলেট জেলায় মোট ৪টি প্রাণিসম্পদ কোয়ারেন্টাইন স্টেশন রয়েছে।

সিলেটে ২০১৭-২০১৮ সালে উৎপাদিত দুধের পরিমাণ ছিল ১.২৬ লাখ মে. টন, মাংস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ লাখ মে. টন এবং ডিম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০.৮৯ কোটি । (সূত্র: জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস, সিলেট।)

ক্র. নং	উৎপাদন	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৮
১	দুধ	১.২৬ লাখ মেট্রিক টন
২	মাংস	১.২৫ লাখ মেট্রিক টন
৩	ডিম	৩০.৮৯ কৌটি

সূত্র: জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস, সিলেট।

সিলেটের প্রাণির জাতগুলো নিম্নরূপ :

গোরু : ১. দেশি-সিলেটের ছোটো গোরু; ২. বিদেশি-হরিয়ানা, সিন্ধি, শাহীয়াল, জের্সি ও হোলস্টেন ফ্রিসিয়ান; ৩. সংকর

মহিষ-১. নদী জাতের; ২. বাদা জাতের; ৩. নদী-বাদা জাতের; ছাগল: ১. ব্লাক বেঙ্গল; ২. যমুনা পাড়ি; ৩. ব্লাক বেঙ্গল যমুনা পাড়ির সংকর;

ভেড়া: শ্রেণিহীন দেশি জাতের;

মুরগি : ১. শ্রেণিহীন দেশি জাতের—আসিল, উদলা গলা; ২. বিদেশি— সাদা লেগহর্ন, রোড আইল্যান্ড রেড, ফাওমি, অস্ট্রালোপ, কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্রয়লার ও ডিমপাড়া জাত; ৩. সংকর-স্থানীয় বিদেশি;

হাঁস: ১. দেশি জাতের—সিলেটি মাটিহাঁস, নাগেশ্বরী, মস্কভি, রাজহাঁস; ২. বিদেশি—খাঁকি ক্যাম্বেল, ভারতীয় রানার, জিনডিং, চেরি ভ্যালি; ৩. সংকর—দেশি বিদেশি।

শূকর : দেশি জাত।

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়নের জন্য সিলেটে ১টি সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উন্নত জাতের পাঁঠা (Buck) গ্রামের নির্বাচিত কৃষকদের মধ্যে এবং উন্নতজাতের ছাগী আয় উপার্জনের জন্য ভূমিহীন দরিদ্র কিষানিদের মধ্যে বিলি করা হয়। সরকারি খাতের পাশাপাশি দেশে ব্যক্তিগত খাতেও ব্যবসায় উদ্যোক্তা আছেন যারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন খামার পরিচালনা করেন।

দেশি জাতের হাঁস-মুরগি আকারে ছোটো, ডিম পাড়ে কম। সিলেটে ১টি সরকারি হাঁস-মুরগি খামার আছে। এ ফার্ম হতে ফাওমি জাতের মোরগ-মুরগি কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। দুটি সংকর জাতের মোরগ ‘রূপালি’ (সাদা লেগহর্ন মুরগি ফাওমি মুরগি) ও ‘সোনালি’ (আর আই আর মুরগা ফাওমি মুরগি) গ্রামীণ পরিবেশে সুঅভিযোজিত হয়ে আছে।

বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হাঁস-মুরগির অনেক জাতই এখন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিভিন্ন খামারে লাভজনকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সরকার ও হাঁস-মুরগি ব্যবসায়ীদের গৃহীত সম্প্রসারণ উদ্যোগের ফলে এই জাতীয় খামার ক্রমাগত বাড়ছে। সিলেটে ১টি সরকারি হাঁস-মুরগি খামার ছাড়াও ব্যক্তিমালিকানাধীন রেজিস্টার্ড ৪৯টি লেয়ার (ডিম-পাড়া মুরগি) ফার্ম, ৬৬০টি ব্রয়লার (মাংস উৎপাদনকারী) ফার্ম এবং ১১৬টি হাঁসের খামার আছে।

সিলেটের কয়েকটি এলাকায় অধিবাসীরা ভারবাহী হিসেবে ঘোড়া পোষে। সিলেটে কত ঘোড়া আছে, তা আজও হিসাব করা হয়নি।

দুধ, মাংস ও ডিমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং গ্রামের দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশে সরকার সম্প্রতি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বর্ধিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সংকর দুধেল গাই পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বিভিন্ন সহায়তা দিয়ে থাকে। টিকা এবং কৃত্রিম গর্ভধারণেও সরকার যথেষ্ট সহযোগিতা করে।

প্রাণিজাত সামগ্রী (Livestock Products)

সিলেটে ২০১২-২০১৩ সালে উৎপাদিত দুধের পরিমাণ ছিল ০.৮৮ লাখ মে. টন, মাংস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ০.৬৪ লাখ মে. টন এবং ডিম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮২০ লাখ । এদেশে গবাদি প্রাণীর বৃদ্ধির হার সামান্য, ২০০5

থেকে ২০১৩ পর্যন্ত মাত্র গড়ে ১.৮৫%। কম জন্মহার, রোগবালাই, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বিপুল সংখ্যক গবাদি প্রাণী কোরবানি এবং অপরিকল্পিত প্রাণী জবাই গবাদি প্রাণী বৃদ্ধির হার কম থাকার প্রধান কারণ।

প্রাণীর ত্বক ও চামড়া মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। সিলেটের প্রাণীজাত এ সম্পদের উৎপাদন সন্তোষজনক নয়। সিলেটে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের এবং চামড়ার সামগ্রী তৈরির প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানা নেই।

গোবর প্রাকৃতিক সার ও জ্বালানির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সিলেটে বছরে প্রায় ২.০৩ লাখ মে. টন গোবর পাওয়া যায়। গোবর বায়োগ্যাস তৈরিতেও এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া গবাদি প্রাণীর হাড়, শিঙ, খুর ইত্যাদি দ্রব্যও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। চূর্ণ হাড় ইত্যাদি রফতানির মাধ্যমে দেশে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

অধ্যায়-৭

অর্থনৈতিক অবস্থা

সিলেট জেলার একটি মহকুমা হিসেবে ১৮৬৭ সালে সিলেট সদর মহকুমার সৃষ্টি হয়। কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর দেশের মহকুমাগুলো জেলায় রূপান্তরিত করা হলে ১৯৮৪ সালে বর্তমান সিলেট জেলার সৃষ্টি হয়।

১৯৮১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আদমশুমারি অনুযায়ী সিলেট জেলার লোকসংখ্যা হলো :

সারণি-৫৪

সিলেট জেলার লোকসংখ্যা

সাল	মোট	পুরুষ	মহিলা	অনুপাত	পরিবারের আকার	বৃদ্ধির হার	ঘনত্ব বর্গকিলোমিটার
১৯৮১	১৭,৭৭,৭৮৪	৯১৬২০৩	৮৬১৫৮১	১০৬	৬.৩৫	১.৮৬	৫০৯
১৯৯১	২১৫৩৩০১	১১০১৫৩৩	১০৫১৭৬৮	১০৫	৬.৩২	১.৯৩	৬১৭
২০০১	২৫৫৫৫৬৬	১৩১৪৩১৭	১২৪১২৪৯	১০৫	৬.০২	১.৭৩	৭৩২
২০১১	৩৪৩৪১৮৮	১৭২৬৯৬৫	১৭০৭২২৩	১০১	৫.৭৪	২.৯৫	৯৯৫

আদমশুমারি-২০১১ অনুযায়ী এ জেলায় প্রতি ১০০ জন মহিলার বিপরীতে ১০১ জন পুরুষ রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৯৫%, যা আদমশুমারি-২০০১ অনুযায়ী ছিল ১.৭৩%। সিলেট জেলায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাংলাদেশের গড় (১.৪৮%) হারের চেয়ে বেশি। এতে জন্মহার বৃদ্ধির সাথে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ভূমিকা ব্যাপক। এ জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৯৫ জন লোক বাস করে। এক দশক আগে এ সংখ্যা ছিল ৭৩২। সিলেট জেলায় ২১.৯৪ শতাংশ লোক নগরবাসী। এক দশক আগে এ সংখ্যা ছিল ১৬.৯৭%।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে সিলেটে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ইতোমধ্যে জেলাটি তুলনামূলকভাবে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হতে শুরু করেছে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে নগরায়ন। তবে পরিবারের আকার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

২০১০ সালে অনুষ্ঠিত শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী সিলেট জেলার শ্রমশক্তির হিসাব সারণিতে দেওয়া হলো :

সারণি-৫৫

শ্রমশক্তির হিসাব (হাজারের অঙ্কে)

লোকসংখ্যা ১৫+	অর্থকরী কাজে নিযুক্ত	কাজে অংশগ্রহণের হার
মোট ১৬৭৫	৯৮২	৫৮.৬%
পুরুষ ৮৩৯	৭০০	৮৩.৪%
নারী ৮৩৯	২৮২	৩৩.৭%

সিলেট জেলায় মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৫৯% কাজে নিয়োজিত থাকলেও প্রায় ৪১% হয় বেকার, না হয় নির্ভরশীলদের অন্তর্ভুক্ত। পুরুষের ক্ষেত্রে এ হার প্রায় ১৭% এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৬৬%। নারীদের বিপুল সংখ্যক ঘরকন্নার কাজে নিয়োজিত থাকেন বলে অর্থকরী নিয়োগের বাইরে বলে বিবেচিত হন।

সিলেট জেলার শ্রমশক্তির পেশাগত অংশগ্রহণ সারণিতে প্রকাশ করা হলো :

সারণি-৫৬

বিভিন্ন পেশায় জনশক্তির অংশ

খাত	অংশ (শতাংশ)
কৃষি	৩০.৮২
কৃষি শ্রমিক	১৫.৫৯
অকৃষি শ্রমিক	৭.৩৩
ব্যবসা	১২.২
মৎস্যজীবী	৩.৬
পরিবহণ	২.২১
নির্মাণ	১.৬৬
চাকরি	৭.৫
বাড়িভাড়া	৩.১১
অন্যান্য	২৩.৪৮

বাংলাদেশের শ্রমশক্তির ৪৫.৬ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। সিলেট জেলায় শ্রমশক্তির প্রায় ৪৬.৪১ শতাংশ কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট। এর পরেই ব্যবসায়ীদের স্থান। এ জেলার প্রায় ৪ শতাংশ জনশক্তি মাছ ধরা ও বিক্রয়ের সাথে জড়িত। চাকরিজীবীর পরিমাণ মাত্র সাড়ে সাত শতাংশ।[১]

২০১১ সালের আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী এ জেলায় ৭ বছর ও তদূর্ধ্ব জনসংখ্যার শিক্ষিতের হার ৫১.২%। এর মধ্যে পুরুষ ৫৩.৫% এবং নারী ৪৮.৯%। মেয়েরা এখনও লেখাপড়ায় পিছিয়ে আছে। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি।

কৃষি ও মৎস্য সিলেটের আবহাওয়া গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও আর্দ্র হলেও নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তা শীতল ও মনোরম। সাধারণত মার্চ মাস থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয়। গত কয়েক বছরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতাবিষয়ক তথ্য সারণিতে দেওয়া হলো।

---

[১] বাংলাপিডিয়া, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩, দশম খন্ড, পৃ. ১৯৪।

সারণি-৫৭
২০০৮-২০১৬ পর্যন্ত সিলেট জেলার তাপমাত্রা ও আর্দ্রতাবিষয়ক তথ্য

সাল	তাপমাত্রা		বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)	আর্দ্রতা
	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন		%
২০০৮	৩৬.৮	৯.৪	৩৩৫৬	৭৬.০
২০০৯	৩৬.৮	১১.১	২৫৬৫	৭৪.০
২০১০	৩৭.১	১০.০	৩৯৯৭	৩৩.২
২০১১	৩৭.৮	৭.৭	৩১০১	৬৮
২০১২	৩৮.০	৯.৫	৪৬৪৭	৭০
২০১৩	৩৭.৫	৬.৪	৩৮২০	৬৮
২০১৪	৩৯.২	৯.৬	৩৩৮৫.৭	৬৮
২০১৫	৩৭.৮	৯.৯	৩৯৪১	৭০
২০১৬	৩৭.৬	১০.৩	৪২৯৫.২	৭১

সূত্র : আবহাওয়া অফিস, সিলেট থেকে সংগৃহীত।

আবহাওয়ার আর্দ্রতা বেশি থাকায় অন্য জায়গার তুলনায় এ অঞ্চলের মানুষ শ্রমবিমুখ। সিলেট জেলা একটি বৃষ্টিবহুল এলাকা। বার্ষিক বৃষ্টিপাত কখনও কখনও ৪৬১৭ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে এ অঞ্চল কৃষিকাজের অনুকূল। মাঝে মাঝে অকালবন্যাও দেখা দেয় এবং ফসলহানি ঘটে।

সিলেটে অস্থায়ী ফসলাধীন নিট জমির পরিমাণ ২০৮৮ বর্গকিলোমিটার। **কৃষি** সংরক্ষিত বন এলাকা ২০০ বর্গকিলোমিটার।

২০০৮ সালের কৃষিশুমারি অনুযায়ী সিলেটে চাষাবাদে ব্যবহৃত জমি তথ্য সারণিতে উল্লেখ করা হলো :

সারণি-৫৮
সিলেটে জমির ব্যবহার (একরে)

বর্তমান পতিত	এক-ফসলা	দো-ফসলা	তিন ফসলা	অস্থায়ী ফসলাধীন নিট জমির পরিমাণ
৪৪৮১২	১৭১৯১২	২৯৩৬৮৩	৪৮৭২০	৫১৫৭৩৬

২০১৫-১৬ সালে সিলেটে ধান ও গমচাষের অধীন এলাকা ছিল সারণি ৬০-এর অনুরূপ :

সারণি-৫৯
প্রধান খাদ্য উৎপাদন (২০১৫-১৬)

আউশ ধান		আমন		বোরো		গম	
এলাকা (একর)	উৎপাদন (মে.টন)	এলাকা (একর)	উৎপাদন (মে.টন)	এলাকা (একর)	উৎপাদন (মে.টন)	এলাকা (একর)	উৎপাদন (মে.টন)
১১৬০৪৯	১২৫৬৩৭	৩১৫৮৫৫	২৭৯৯৩৯	১৭২৮০২	২০১৪৯০	৪০৩	৩০০

সূত্র: জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সিলেট।

২০১৫-১৬ সালে জলসেচের অধীন মোট এলাকা ছিল ১৯৮৪৫৫ একর। রবি মৌসুমে সিলেটে প্রচুর জমি অনাবাদি থাকে। জল সেচের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কৃষি সম্প্রসারণ-কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করতে পারলে সিলেটে ফসল উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

সিলেটে কৃষিকাজ করার জন্য শ্রমশক্তির অভাব রয়েছে। এর একটি কারণ কর্মক্ষম লোকের মধ্যে বিদেশ গমনের প্রবণতা। ঘাটতিপূরণের জন্য বহু অস্থানীয় শ্রমিক এই অঞ্চলে নিয়োজিত রয়েছে। ধারণা করা হয়, প্রায় ৪০% কৃষিশ্রমিকই অস্থানীয়। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় খামারে কাজ করতে স্থানীয় শ্রমিকদের অনীহা এবং অস্থানীয়দের মজুরি তুলনামূলক কম।

সিলেট জেলায় বেশ কিছু খাসজমি রয়েছে। মোট খাসজমির হিসাব নিচে দেওয়া হলো :

সারণি-৬০

খাসজমির পরিমাণ (একরে)

বিবরণ	বন্দোবস্তযোগ্য	বন্দোবস্ত অযোগ্য	বন্দোবস্ত প্রদত্ত
কৃষি জমি	২০১৯৯.৫৮	১৩৫২৪.৮৮	১৩৪৯৮.২৫
অকৃষি জমি	৭১৯৮.৩৭	৪৮৫৩৭.৪৯	১৯.৬৯

সূত্র : মো. হাফিজুর রহমান ভূঞা, সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমিব্যবস্থা-১৯৯৮- পৃ. ১৫

সিলেটে প্রাপ্ত খাসজমির আকর্ষণে ইতোমধ্যে বিভিন্ন জেলার অনেক ভূমিহীন লোক এখানে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে বসবাস করছে। বর্তমানে সিলেটের লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে ভূমিহীনদের সংখ্যা। তাদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

সিলেট জেলার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যই প্রধান। এখানে নানা জাতের ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ, আখ ও আলু জন্মে। এছাড়া পান, সুপারি, তেজপাতা, সাতকরা, লেবু প্রভৃতি এ জেলার উৎপন্ন দ্রব্য। সিলেট জেলায় উৎপাদিত ফলফলাদির মধ্যে রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস ও কমলালেবু। অতীতে সুমিষ্ট কমলালেবু উৎপাদনের জন্য সিলেটের সুনাম ছিল। কিন্তু পাকিস্তান আমলে বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে অযত্ন ও অবহেলায় এবং কমলাচাষিদের অনীহার কারণে কমলা বাগানগুলো প্রায়-ধ্বংস হয়ে যায়। সম্প্রতি নতুন করে বিয়ানীবাজার এলাকায় কমলাবাগান গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে।

মৎস্য উৎপাদন

২০১০-২০১১ সালে এ জেলার ৬৭১৯৮ জন মৎস্যজীবী মোট ২৬১৬৮.০১ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন করে। ২০১৬ সালে এ জেলায় মাছের মোট উৎপাদন ৫৭৯০৩.৮১ মে. টন (জেলা মৎস্য অফিস, সিলেট)। জেলায় ধৃত মাছের একটি অংশ যায় শুঁটকি উৎপাদনে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পর এ জেলার মৎস্য সম্পদ দেশের অন্যান্য জেলায় এবং বিদেশেও রফতানি করা হয়।

বনভূমি

প্রয়োজনের তুলনায় সিলেটে বনভূমি কম। সিলেটের বনভূমিতে নানা জাতীয় মূল্যবান গাছ যথা: সেগুন, মেহগনি, শাল, গামার, চাম, গর্জন, সুন্দি প্রভৃতি পাওয়া যায়। এছাড়া রয়েছে নানা জাতীয় ঔষধি গাছগাছড়া। বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান কাঠ, জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত, প্রভৃতি বনজ উৎপন্ন দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত।

পিট কয়লা, পাথর, নুড়ি, বোল্ডার ইত্যাদি খনিজ দ্রব্যও সিলেটে পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলো সংগ্রহ করা হয় প্রধানত জাফলং, কোম্পানীগঞ্জ ও ভোলাগঞ্জ নদী থেকে। পাথর সংগ্রহ ও পাথর ব্যবসার সাথে বহুলোক নিয়োজিত রয়েছে। যেসব শ্রমিক পাথর সংগ্রহ করে তাদের বার্কি শ্রমিক বলা হয় এবং যে বিশেষ ধরনের নৌকায় পাথর বহন করা হয়, সেগুলো বার্কি নৌকা নামে পরিচিত। নৌকা, বার্কি, কার্গোবোট, লঞ্চ এবং ট্রেনে করে সিলেটের পাথর রাস্তাঘাট ও গৃহ নির্মাণকাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন স্থানে চালান হয়। পাথর ও চুনাপাথর বহনের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৮৫ সাল থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ থেকে খাসিয়া পাহাড়ের খারিয়াঘাট পর্যন্ত একটি ন্যারোগেজের রেল লাইন চালু ছিল। পরে ভূমিকম্পে লাইনটি ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়া রয়েছে ভোলাগঞ্জ থেকে সুনামগঞ্জের ছাতক পর্যন্ত সোয়া ১১ মাইল লম্বা রজ্জুপথ।

চা উৎপাদন

চা একাধারে কৃষি ও শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। চা উৎপাদনের জন্য বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ হিসেবে পরিচিত। অধিকাংশ চা-বাগান সিলেট জেলার বাইরে অবস্থিত থাকলেও এ জেলায়ও রয়েছে ২০টি বাগান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সিলেটে চা শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়। সিলেট শহরের অদূরে অবস্থিত মালনীছড়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী এটি সিলেটের প্রথম চা-বাগান এবং এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৪ সালে। অন্যদিকে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের মতে সিলেটে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত বাগানের নাম লালিছড়া। বাগানটি ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের প্রারম্ভে অতি উৎসাহে যত্রতত্র প্রচুর বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব বাগানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে গোটা চশিল্পে ধস নামে। তবে নব্বইয়ের দশকে চা-শিল্প দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চা-ব্যবসায়ী ও জাহাজ মালিকেরা প্রচুর বিত্তশালী হন।

চা-বাগানগুলোর জন্য শ্রমিক সংগ্রহ করা হতো ভারতের ছোটো নাগপুর, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে। আড়কাঠিরা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে জোগাড় করে চা শ্রমিক হিসেবে নিয়ে আসত। তাদের প্রচুর খাটানো হতো অথচ পারিশ্রমিক দেওয়া হতো খুবই কম। এভাবে শ্রমিকদের শোষণের মাধ্যমে চা-বাগানমালিকদের বিত্তের পাহাড় গড়ে উঠত। বর্তমানে কর্মরত শ্রমিকেরা সে সব শ্রমিকেরই উত্তরপুরুষ। এসব শ্রমিক এখনও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

প্রাকৃতিক গ্যাস সিলেটের যে সম্পদটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তা হচ্ছে এর প্রাকৃতিক গ্যাস। ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে দেশের অন্যান্য স্থানেও গ্যাসের সন্ধান মেলে। বর্তমানে বাংলাদেশে আবিস্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২৩টি। তার মধ্যে সিলেট জেলায় রয়েছে ৫টি ক্ষেত্র আর কূপের সংখ্যা ৮৪টির মধ্যে সিলেটে ১৬টি।

সারণি-৬১

সিলেট জেলায় গ্যাসক্ষেত্র ও গ্যাস রিজার্ভ

Unit in Billion Cubic Feet (BCF)

ক্র. নং	গ্যাস ফিল্ড	কূপের সংখ্যা	Total Reserve/ GIP (Proven+ Probable)	Reserve (Recoverable)	Production 2015-16	Cumulative Production (June '16)	Net Recoverable Reserve (July 2016)
১	হরিপুর (১৯৫৫)	২	৩৭০	৩১৮.৯	৩.০০	২০৯.৮১	১০৯.১
২	কৈলাশটিলা (১৯৬২)	৫	৩৬১০	২৭৬০	২৬.১৫	৬৩৪.৯৬	২১২৫.০
৩	বিয়ানীবাজার (১৯৮১)	১	২৩০.৭	২০৩	৩.৪৬	৯২.৯২	১১০.১
৪	ফেঞ্চুগঞ্জ (১৯৮৮)	৩	৫৫৩	৩৮১	১২.৮৮	১৪৪.৪৬	২৩৬.৫
৫	জালালাবাদ (১৯৮৯)	৬	১৪৯১	১১৮৪	৯৫.২২	১০৪৫.০৪	১৩৯.০
মোট (০৫) =		১৭	৬২৫৪.৭	৪৮৪৬.৯	১৪০.৭১	২১২৭.১৯	২৭১৯.৭

সূত্র: B.B.S. Statistical Year Book-2016, p-171

সিলেটের গ্যাসকূপগুলো থেকে উত্তোলিত গ্যাস মুখ্যত সারকারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও গৃহস্থালির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্যাসের উপজাত হিসেবে পাওয়া যায় পেট্রোলিয়াম, ডিজেল ও কেরোসিন, মোটর স্পিরিট ও এলপি গ্যাস। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে জানা যায় কৈলাশটিলা গ্যাসকূপ থেকে ঘনীভূত তৈল উপজাত (পেট্রল, ডিজেল, অকটেন ইত্যাদি) থেকে প্রতিদিন প্রায় ৭০০ ব্যারেল তেল উত্তোলন করা হয়। এর মধ্যে স্থানীয়ভাবে কৈলাশটিলায় ৩০০

ব্যারেল পরিশোধন করে বিতরণ করা হয় এবং বাকি তেল বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন পরিশোধন শেষে বিতরণ করে।

এ ছাড়া গোলাপগঞ্জে অবস্থিত রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড থেকে প্রতিদিন গড়ে ঘনীভূত তৈল উপজাত (পেট্রল, ডিজেল, অকটেন ইত্যাদি) প্রায় ৩ হাজার ব্যারেল, মোটর স্পিরিট ৬০০ ব্যারেল, হাইস্পিড ডিজেল ৯০ ব্যারেল উত্তোলন করা হয়। এই তেল লরির সাহায্যে প্ল্যান্ট থেকে বিভিন্ন ডিপো ও তেল পাম্পে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

১৯৮৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর হরিপুরের ৭ নম্বর কূপে দেশের প্রথম তেল খনি আবিষ্কৃত হয়। ১৯৮৭ সালে এ খনি থেকে বাণিজ্যিকভাবে তেল উৎপাদন শুরু হয় এবং প্রথম দিকে প্রতিদিন ৬০০ ব্যারেল তোলা হলেও ধীরে ধীরে তা হ্রাস পেতে থাকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তা পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়।

সিলেটের আঞ্চলিক আয়ে শিল্পের অবদান নগণ্য। এখানে বৃহৎ শিল্প বলতে **শিল্প** একমাত্র ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানাকেই বোঝায়। ১৯৬১ সালে দেশের এই প্রথম সারকারখানাটি প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়। ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১ লাখ ৬ হাজার টন ইউরিয়া এবং ১২০০০ টন অ্যামোনিয়া সালফেট সার। এর পাশাপাশি স্থাপিত হচ্ছে জালালাবাদ সার কারখানা।

১৯৭৮ সালে সিলেট শহরের ইসলামপুরে ২৮.৮১ একর জমির ওপর স্থাপিত হয় সিলেট টেক্সটাইল মিল। এর টাকুর সংখ্যা ছিল ২৫০৫৬টি এবং এ মিলে বিভিন্ন ধরনের সুতা উৎপাদিত হতো। ১৯৮৪ সালে চালু হলেও কয়েক বছরের মধ্যে মিলটি রুগণ্ শিল্পের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ে এবং বন্ধ হয়ে যায়।

সিলেট জেলায় শিল্প বলতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকেই বোঝায়। সিলেটে রয়েছে দুইটি শিল্পনগরী। সিলেটে ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে রয়েছে অটোমেটিক বয়লার, বেকারি, সিরামিক, ফ্রুট প্রসেসিং প্ল্যান্ট প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে আটা, ময়দা ও চালের কল, রাসায়নিক দ্রব্য ও হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, হিমাগার প্রভৃতি।

সিলেটে তৈরি কৃষি-যন্ত্রপাতি বিদেশেও রফতানি হয়ে থাকে। এখানকার বাঁশ ও বেতের তৈরি আবসাবপত্র অনেক আগে থেকেই সুনামের অধিকারী। কাঁচামালের অভাবে এ শিল্প এখন সমস্যার ভারে জর্জরিত। সিলেটে বাঁশ ও বেতের কারখানার সংখ্যা ৩৮৪৮টি এবং এতে ৬৩৫৭ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। এখানে মোট কুটির শিল্পের সংখ্যা ৯৭১টি এবং এর শ্রমিকের সংখ্যা ৩৫৩৭ জন। সিলেটে উন্নতমানের শীতলপাটি উৎপন্ন হয় এবং দেশজুড়ে এর ব্যাপক সুনাম রয়েছে।

সিলেটের হস্তচালিত তাঁতের কাপড় দেশজোড়া সুনামের অধিকারী। বিশেষ করে মণিপুরি সম্প্রদায় তাঁতবস্ত্র তৈরিতে পারদর্শী। সিলেটে হস্তচালিত তাঁতের কারখানার সংখ্যা ৫২টি এবং এতে তাঁতের সংখ্যা ৭৩ এবং কাজ করে ১২৮ জন লোক।

সিলেটে বাণিজ্যিকভাবে বেশ কিছু হাঁস-মুরগি ও মৎস্যখামার বেসরকারিভাবে গড়ে উঠেছে। এককালে মনে করা হতো সিলেট দুগ্ধ-খামার গড়ে ওঠার অনুকূল নয়। ইদানীং বেশ কটি দুগ্ধখামারও গড়ে উঠেছে।

সিলেটে পর্যটনশিল্প বিকাশের সম্ভাবনা প্রচুর । এখানকার পাহাড়, নদী, হাওর, চা-বাগান প্রভৃতি প্রতি বছর প্রচুর পর্যটক আকর্ষণ করে। ইদানীং বেশ কয়েকটি ট্যুরিস্ট রিসোর্ট চালু হওয়ায় এ সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বিদ্যুৎ উৎপাদনে সিলেট জেলা উদ্বৃত্ত এলাকা। ২০১১-১২ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের তথ্য সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র গ্যাসভিত্তিক।

সারণি-৬২

সিলেট জেলায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০১৫-১৬

Sl. No.	Name of Power Plant	Type of Fuel	Installed Capacity (MW)	Gross Energy Generation (Gwh)
1	Sylhet 150MW CCPP, Kumargaon, Sylhet	Gas	142	295.228800
2	Fenchuganj CCPP-1 Fenchuganj, Sylhet	Gas	97	880.269600
3	Fenchuganj CCPP-2 Fenchuganj, Sylhet	Gas	104	
4	Barakatullah Electro Dynamics, Fenchuganj, Sylhet	Gas	51	298.047816
5	Fenchuganj Energy Pirma, Fenchuganj, Sylhet	Gas	50	251.460672
6	Sylhet Energy Pirma, Kumargaon, Sylhet	Gas	50	258.101520
7	Shahjahanullah power plant, Kumargaon, Sylhet	Gas	25	112.049976
8	Sylhet 20 MW power plant, Kumargaon, Sylhet	Gas	20	16.931520
9	Desh Energy Kumargaon, Sylhet	Gas	10	52.136172
			549 MW	2164.226076

Source: Chief Engineer, Distribution Zone, PDB, Sylhet

উৎপাদিত বিদ্যুতের সাহায্যে স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অংশ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয়।

রাস্তাঘাটের দিক থেকে সিলেটের অবস্থান সারণিতে উপস্থাপিত হলো :

যোগাযোগ ব্যবস্থা

সারণি-৬৩

উপজেলাওয়ারি এলজিইডি/এলজিআই-এর আওতাধীন সড়কের বিবরণ

ক্র. নং	সম্পূর্ণ পাকা সড়ক		আংশিক পাকা সড়ক				কাঁচা সড়ক		মোট	
	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	সংখ্যা	পাকা অংশের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	কাঁচা অংশের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
১	৩৯৮	১৩৫৬	৭৬৫	৯৫৭	১৩০৯	২২৬৬.০০	১৬৩৩	৩০১৫	২৭৯৬	৬৬৩৭

সিলেটে ৫৭ কিলোমিটার রেলপথ থাকলেও মূল রেললাইন জরাজীর্ণ হওয়ায় সংঘটিত রেল দুর্ঘটনার কারণে যাতায়াত প্রায়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সিলেটের জলপথ খুব উন্নত ছিল। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীতে নিয়মিত স্টিমার চলাচল করত। কিন্তু পরবর্তীকালে নদীগর্ভ ভরাট হয়ে পড়ায় এখন হেমন্তকালে নৌকার চলাচলই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। সিলেটে ওসমানী বিমানবন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সমাপ্ত হওয়ায় এ বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মর্যাদালাভ করেছে। বিমানে যাত্রী বহনের পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলো।

সারণি-৬৪

গন্তব্যস্থল, সাল-ও যাত্রীসংখ্যা

গন্তব্যস্থল	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
সিলেট-ঢাকা	৮৬৫১৬	২৯২১০	১০২২৯৫	৮৪২১৪	৯৫০৩০	১২৫৬১৫
ঢাকা-সিলেট	২৮২৮১	২৪৪৪২	৫০১৭৭	২২৯০৬	১৭২৯১	২৮৭২৬
আবুধাবি-সিলেট	১০৬৩	৪৫৫৩	৫৫৮৯	৭০৯৬	৮০৭৫	১১৭৮৭
দুবাই-সিলেট	১২৩৭৪	১২০৪০	১১৮৭৮	১৩৫১৪	৪৯৮৪৯	১১১৭১
লন্ডন-সিলেট	২৩২৫৬	২৯১৫২	১২৬৪৫	১৯৮২০	৩১৯৪৭	৪২৮২৬
দোহা-সিলেট	২১০৪	১৫২৬	২১৭৯	২৫১৮	২৯৮৯	৪৭১০

সূত্র:B.B.S. Statistical Year Book-2015, p-232

গন্তব্যস্থল	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০
সিলেট-ঢাকা	৩১৫৪৭	২৩২১৪	২৭৭০৩	২৮২৮১
আবুধাবি-সিলেট	২০২৯	-	-	১০৬৩
দুবাই-সিলেট	১২৪২০	১৫২৪০	৯৪৬৮	২৭০৭৮
লন্ডন-সিলেট	২৪০৮১	২৪০৯৩	২৫১৩১	২৩২৫৮
দোহা-সিলেট	-	-	১৪০৭	২১০৪

সূত্র:B.B.S. Statistical Year Book-2012.

বিমানে ঢাকা-সিলেট রুটে যে-পরিমাণ যাত্রী বহন করা হয় অন্যান্য সব রুটেই তার চেয়ে কম।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমাদের প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ১৯৮২-৮৩ সালে দেশে প্রেরিত প্রবাসী অর্থের পরিমাণ ছিল ১৪৭৩ কোটি টাকা। ২০১৪ হতে ২০১৭ সালে সিলেট বিভাগে যে পরিমাণ রেমিটেন্স এসেছে তা সারণিতে উপস্থাপন করা হলো। এছাড়া প্রবাসীরা বেসরকারিভাবেও রেমিটেন্স পাঠিয়ে থাকেন।

২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সিলেট বিভাগে তফসিলি ব্যাংকসমুহে প্রবাসী কর্তৃক প্রেরিত মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণ নিম্নছকে উল্লেখ করা হলো।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শুরুতে সিলেট থেকে বিলাত গমনের হিড়িক পড়ে যায়। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকা, জাপান, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বহু দেশে সিলেটিরা রুজিরোজগারের আশায় যাতায়াত করছেন। তাঁরা স্বাগতিক দেশে ব্যাবসাবাণিজ্য, বিশেষ করে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় সুনাম কুড়িয়েছেন।

সিলেট জেলার বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ প্রবাসী এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। এক জরিপে জানা যায় যে, প্রবাসী পরিবারের আয়ের ৭০% এবং ব্যয়ের ৬৩%-এর উৎস প্রবাসী অর্থ। মোট ব্যয়ের প্রায় ৬৬% অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয়। জৌলুসপূর্ণ ঘরবাড়ি তৈরি, জমি ক্রয় ও বিলাসব্যসনে এ অর্থের বিপুল অংশ ব্যয় হয়। এক হিসাব অনুযায়ী সিলেট জেলার আয়ের ৭% এর উৎস প্রবাসী অর্থ। সিলেটের ব্যাংকগুলোতে যে বিপুল পরিমাণ টাকা জমা সঞ্চিত আছে তার উৎসও প্রবাসীঅর্থ।

সারণি-৬৫

সিলেট জেলাস্থিত ব্যাংক শাখাসমূহের আমানত ও ঋণের পরিসংখ্যান ২০১৪-২০১৬

ক্র. নং	ব্যাংকের নাম	শাখার সংখ্যা	আমানতের পরিমাণ (কোটি টাকায়)			প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)		
			২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১০	২,৫১৩.০৪	২,৬৭৩.৩০	২,৭৮৯.৩৫	৬০০.৮২	৭১৮.১২	৮৪৯.৬৮
২	বেসিক ব্যাংক লি.	২	২৪৭.১৮	১৭৩.৭১	৭৬.২০	৭০.৩৮	৬৮.৩৬	৬৩.৭৩
৩	ন্যাশনাল ব্যাংক লি.	১২	৮৪৩.৫৮	৮৯৩.৮১	৮৭৯.৮৬	৫৮.৪২	৫০.৭৫	৫৭.০৯
৪	আই এফ আই সি ব্যাংক লি.	৬	৩১৬.৭৯	৩৪০.৯২	৩৪৮.১৬	৬০.৯৫	৫৯.২৫	৭২.৭০
৫	উত্তরা ব্যাংক লি.	১১	৪৬৩.৭৩	৫১২.৯৬	৫৪৪.০৩	৭৬.৬৭	৭৯.৫৯	৮৬.৬৯
৬	এবি ব্যাংক লি.	৫	৭৬৫.১১	৮৪৬.১০	৮৯১.২৩	১০৩.১২	১১০.০১	১০০.৭৫
৭	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি.	২	১২০.৭৩	১৪৩.৬৯	১১৬.৮৪	৭.৩৩	৩.৮২	৪.৩৯
৮	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৩	১৪২.৮৬	১৮৫.৬৪	১৬১.৮২	২৯.২৩	৩৭.০০	৪৭.৬২

ক্র. নং	ব্যাংকের নাম	শাখার সংখ্যা	আমানতের পরিমাণ (কোটি টাকায়)			প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)		
			২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৪	২০১৫	২০১৬
৯	দি সিটি ব্যাংক লি.	৬	৪১৭.৮১	৪৮৮.৯১	৫৬৯.০০	৩৫.৩৬	৩৭.২৯	৪৪.৩১
১০	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লি.	১	৪৪.৪৬	৩২.৭৪	২৯.৪৬	২৩.১৭	২৫.৭৪	২২.৯৮
১১	ব্যাংক এশিয়া লি.	৫	৩৫৬.১১	৪২৩.১৩	৪৬১.৩০	৮৩.২২	১১৫.৮০	১২৮.০৫
১২	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	১৩	৫৩৪.৩৩	৫৫৫.৯৮	৫৫৮.১৬	৯০.৭৯	১১৮.৫২	২১২.৪৭
১৩	ঢাকা ব্যাংক লি.	৪	২৩৮.৯৫	২৩৩.৮৬	২৫০.৮৫	৫৭.৭২	৫৯.৫৮	৭২.০৩
১৪	ডাচ্ বাংলা ব্যাংক	১৫	৮১১.১২	৯০৮.৮১	৯৮৩.৫৬	৩৮.৪৭	৩৯.৩০	৬৫.৫৫
১৫	ইস্টার্ণ ব্যাংক লি.	৪	২১৯.৪৮	২৬৯.৮১	২৮৮.৩০	২৭.৫৭	৩৭.২৯	৪৯.৪২
১৬	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	৯	৬৪৪.৪৪	৭০২.৪০	৭৭৩.৬৪	৯৫.৬৯	৮৭.২৯	৮৯.৭০
১৭	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৪	৪৮৫.৩২	৫৫৫.৫২	৬০১.৪১	৬৯.৬৬	৬৬.৬৫	৬৯.৭৮
১৮	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি.	৩	২২৫.৬৯	২৫৬.৫৯	২৫৪.১৬	৫১.৯৯	৬৫.১০	৬৬.২৮
১৯	প্রাইম ব্যাংক লি.	১১	৯৪৪.২৬	৯৪৮.৪১	৯৪৪.৮১	৯১.৩৬	৭৫.২৭	৮৩.৭৯
২০	সাউথইস্ট ব্যাংক লি.	১০	৭৯৭.৬৮	৮৬৯.১৫	৯৭৬.৫৯	৩২৪.৬৫	৩৪৭.৮৪	৪৩৬.০২
২১	যমুনা ব্যাংক লি.	৩	২৩০.০৯	১৬৪.১৪	২৫৭.৩৫	১১৬.২৭	১১৪.১৯	১৩১.৯৬
২২	ইউসিবিএল	১০	৬২৯.৯০	৬৭৪.২৬	৭০৮.৮৩	১৬১.৮১	১৩০.২৭	১২৪.৭০
২৩	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৪	৭২.৭০	৬১.২৬	৬৬.৫২	৪৫.১৬	৪৪.৩২	৪৮.৪৪
২৪	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১	২৫.০১	২৫.৯৫	২২.০৩	১১.১৩	১১.৩৬	৯.৯১
২৫	ওয়ান ব্যাংক লি.	৩	২৩৪.০১	২৫৩.৪৯	২৫৮.২৭	৭৯.৩৫	৯৯.১৯	১০৩.৪৯
২৬	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন	১	৩৪.১১	৩৪.৭০	৩১.৫৪	২১.৪২	৩২.৯৪	২৩.৩২
২৭	এইচএসবিসি	১	৮১.৮২	৬৪.৬৮	৫২.৭০	৩.৯৩	৮.২১	৫.৯৪
২৮	সোস্যাল ইসলামি ব্যাংক লি.	৪	২৪৯.৫০	৩০০.৮৩	৩৮২.৩৬	৪০.০০	৮৩.০৭	৮৭.৯১
২৯	স্ট্যান্ডার্ড চ্যার্টার্ড ব্যাংক	১	১০৮.১৭	৯৫.৬৮	৯৪.৭১	৫৮.৯৮	৫৩.৪৭	৪৭.২১
৩০	ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১০	৪২০.৪১	৫১৭.৭১	৫৯৯.৫৯	২৭৪.৫৫	২২৯.৭৭	২৯৫.৫৬
৩১	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি.	৫	১১৭.১৫	১০৪.৯২	৯৮.৮৭	১০.৮২	১১.৮৪	১০.৮২
৩২	এক্সিম ব্যাংক লি.	৭	৭৫৭.৯৫	৮৭৭.৭৯	৯২৫.৬৫	১২৪.০২	১১৮.১৬	১২৫.৫০
৩৩	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৫	৬৪৮.২৮	৭০৫.৯১	৭৩৫.৬৪	১০১.৮৮	১১৩.২৫	১২৮.৪৩
৩৪	ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লি.	৩	১৭০.২২	২১০.৯৬	১৯৫.৮১	৫৩.৬০	১৩৯.০০	১৩৮.২৬
৩৫	ব্যাংক আল ফালাহ লি.	১	৫০.৭০	৫৬.৮৮	৬৬.৭২	২৫.২৭	২২.৬৪	২২.৯৫
৩৬	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	২	১১০.৭৩	১১৩.২৩	১০৯.৬৪	১৬.৬৪	১৭.৭৮	২২.৫৯
৩৭	হাবিব ব্যাংক লি.	১	২২.৯৬	২১.০৭	২৩.৫৯	৭.৭৩	৯.০০	৮.২১
৩৮	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	১	৬.৭৬	৯.০৮	১৬.৩০	৮.৮৮	৭.০৪	৬.৬৪
৩৯	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	২৬	৩৭৭.১২	৩৪৯.৭৫	৪০৬.৯৬	৪৩.৫২	৩৯.০৬	৫৩.৫১
৪০	সোনালী ব্যাংক লি.	৩২	১,৬৬১.০০	১,৮৯৬.০০	২,০৭৮.০০	১১৯.০০	১৩২.০০	১৬৮.০০
৪১	জনতা ব্যাংক লি.	২৫	৫২৩.১৫	৫৪৪.৪২	৭০৯.৪৮	৬৩.৬০	৭২.৬৮	১০১.৫০
৪২	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৩৬	১,৩৯৫.০৩	১,৪৭৩.৮৩	১,৫১১.৯৯	২০৩.৬০	২২৫.০৩	২৬১.৩৩
৪৩	রূপালী ব্যাংক লি.	৩৪	৭১৬.৬৩	৭৬৩.২০	৭৩৪.৬৫	৭৮.৫১	৮৩.২৩	৯৪.৬১
৪৪	পূবালী ব্যাংক লি.	৪২	১,৩৯১.০৪	১,৫৫৩.৬৬	১,৭০৮.৪০	৫০৩.৩৯	৫৩৫.৫৫	৫৫৮.৩০
৪৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	১	২৯.৮১	৫৭.৩০	৬৪.৮০	৬.০৭	১২.৫৩	১০.৮৩
৪৬	দি ইউনিয়ন ব্যাংক লি.	৩	৬৭.৮৩	৯০.৮৯	১৩৭.৯৯	০.৫৭	৪.০৫	৫.০২
৪৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	৫	৩৮.০০	৬৫.০০	১৩৪.০০	০.২২	২.৭৮	১৩.৭০
৪৮	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	২	৫৫.৫৩	৯৬.৪৯	১২৭.৪০	১৮.৫৩	৩২.৭৩	৭৫.৭০

ক্র. নং	ব্যাংকের নাম	শাখার সংখ্যা	আমানতের পরিমাণ (কোটি টাকায়)			প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)		
			২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৪	২০১৫	২০১৬
৪৯	এনআরবি গ্লবাল ব্যাংক লি.	১	-	২০.৭০	৪৪.০৬	-	০.৩১	১.২০
৫০	সাউথবাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লি.	২	৪২.২৮	৫৫.৭৮	৭৩.৬৭	৬.৫৬	১০.২৩	২০.৫০
৫১	মেঘনা ব্যাংক লি.	২	-	৩.৮৩	৩১.০২	-	০.৩৮	১০.৪২
৫২	দি ফারমার্স ব্যাংক লি.	১	-	০.৯২	২১.০০	-	-	১.২০
	মোট =	৩৯৮	২১,২৬৪.৭৯	২৩,০৩৭.০৩	২৪,৪৯৭.১২	৪,১৭৬.২৭	৪,৫৫২.২০	৫,২১৭.৯৭

সারণিতে লক্ষ করলে দেখা যাবে ২০১৪ থেকে ২০১৬ সময়ে সিলেট জেলায় মোট ব্যাংক জমা ও আগাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জীবনযাত্রা ব্যয়ের বিবেচনায় সিলেট অন্যান্য অনেক জেলার চেয়ে ব্যয়বহুল এলাকা। দেশ বিভাগের পর থেকেই দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে শুরু করে। ১৯৫০ সালে সিলেটে সাধারণ মানের চাল টাকায় ৩ সের ৭ ছটাক এবং লবণ ৪ সের পাওয়া যেত। ১৯৮২-৮৩ সালে সিলেট শহরে মোটা চাল ৬.৩২ টাকা সের এবং লবণ ২.২৭ সের দরে বিক্রি হতো। ১৯৮২-৮৩ সালে সিলেটে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের গড় খুচরা দাম সারণিতে দেওয়া হলো।

সারণি-৬৬

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা দাম ১৯৮২-৮৩

দ্রব্য	একক	দাম (টাকা)
চাল	সের	৭.৫৪
চাল (মাধ্যম)	সের	৬.৮৮
চাল (মোটা)	সের	৬.৩২
মসুর ডাল	সের	১২.০৪
খেসারি	সের	৭.৩৭
রুই মাছ (বড়ো টুকরা)	সের	৩২.৯৮
গোরুর মাংস (উন্নত)	সের	২৫.৭১
খাসির মাংস	সের	৩০.৯৮
মুরগির ডিম	হালি	৫.৭০

১৯৯২ সালে চালের দাম সের প্রতি ৮.৭৫ টাকা এবং লবণ ৭.০০ টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য জিনিসপত্রের দামও আনুপাতিক হারে বেড়েছে। ১৯৯৩ সালে ১ কেজি চালের দাম ছিল ৯ টাকা থেকে ১৩ টাকা পর্যন্ত। সরিষার তেল প্রতি লিটার ৫৬.০০। গোরুর মাংস ১ কেজি ৬০ টাকা এবং খাসির মাংস ১২০.০০ টাকা।

২০১৫-১৬ সালে ঢাকা ও সিলেটে (Divisional Head Quarters) কিছু নির্বাচিত দ্রব্যের বার্ষিক গড় খুচরা মূল্য সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

সারণি-৬৭

কিছু নির্বাচিত দ্রব্যের বার্ষিক গড় মূল্য

দ্রব্য (পরিমাণ)	ঢাকা	সিলেট
সরু চাল (কেজি)	৫৪.৪২	৫৪.৯২
মধ্যম চাল 〃	৫২.২৫	৫২.১৭
মোটা চাল 〃	৩৬.৭৫	৩৭.৫৮
গমের আটা (খোলা) 〃	৩৭.৯২	৪০.০০
মসুর ডাল (খোলা, উত্তম) 〃	১৩৫.৫৮	১৩৩.৫০
খাসির মাংস 〃	৫৮২.৫০	৪২৮.৩৩
মুরগির ডিম (ডজন)	৯৩.৮৭	৯৬.২৭
দুধ (লিটার)	৭৪.৫৮	৭৫.০০
মরিচ (শুকনা)	২০০.০০	২১৫.০০
রসুন (উত্তম)	১২৮.৫৮	১১৭.৫০
সয়াবিন তেল (লিটার)	৮৮.০৮	৮৭.৫০
সরিষা তেল (লিটার)	১৭৭.৫০	১৬৪.১৭
লবণ (কেজি)	৩০	২৬
সাদা চিনি (কেজি)	৪৮.৯২	৪৮.০০
গুড় (কেজি)	৮২.৫০	৮২.৭৫
চা-পাতা (খোলা, উত্তম) (কেজি)	৩৪২.১৭	৩৬২.৫০
কেরোসিন (লিটার)	৭৬.৬৭	৭৪.০০
পেনসিল (চায়নিজ)	১৪.৫০	১৪.০০
কাগজ (দিস্তা)	২৫.৫০	২৪.৩৩

সূত্র : B.B.S. Statistical Pocket Book-2016, p=257-265

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচিত পণ্যের কয়েকটির খুচরো দাম ঢাকা শহরের চেয়ে বেশি। অন্যগুলোর দামও ঢাকার কাছাকাছি।

সিলেটে মজুরির হার অনেক ক্ষেত্রেই দেশের গড় হারের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৮২-৮৩ সালে একজন কৃষিশ্রমিকের মজুরি সিলেটে ছিল গড়ে দৈনিক ২২ টাকা। অথচ বাংলাদেশে কৃষিশ্রমিকের গড় মজুরির হার ছিল ১৬.৯৩ টাকা। ১৯৮৭-৮৮ সালে বাংলাদেশে কৃষিশ্রমিকের দৈনিক মজুরির গড় হার ছিল ৩১.১৫ টাকা। তখন সিলেটে তা ছিল ৩৩ টাকা। ১৯৯১-৯২ সালে ঢাকা শহরে যখন একজন রাজমিস্ত্রির দৈনিক গড় মজুরি ছিল ১২৪.১৭ টাকা, তখন সিলেট শহরে তা ছিল ১৪৫.৮৩ টাকা। ২০১১ সালে একজন পুরুষ পেত ২২৮ টাকা, মেয়ে ১৭৪ টাকা এবং ২০১১ সালে একজন রাজমিস্ত্রির মজুরি ছিল ৩৪৯ টাকা, জোগালি ২০৯ টাকা এবং রংমিস্ত্রি ৩৬৪ টাকা।

সিলেটিদের প্রবাসগমনের আরেকটি দিক লক্ষণীয়। এসব লোক দেশে থাকলে তাদের কর্মসংস্থান করতে হতো। কাজেই বিদেশগমন প্রবণতা দেশে

বেকারসমস্যা হ্রাসে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া বিপুলসংখ্যক লোক বিদেশ চলে যাওয়ায় খাদ্যঘাটতিও হ্রাস পাচ্ছে। দেশে শিক্ষা বিস্তারে তাদের অবদান রয়েছে। ইদানীং সিলেটে নারীশিক্ষার যে প্রসার লক্ষ করা যাচ্ছে, তার পেছনেও প্রবাসী-অর্থের অবদান অনস্বীকার্য। দেশে দারিদ্র্যমোচন কর্মসূচির সুফল লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত খানার আয় ব্যয় জরিপ ১৯৯১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান।

সারণি-৬৮

Head Count Rates of Incidence of Poverty (CBN Method), 1991-92 to 2010 (National Figure)

(HIES) জরিপ বছর	অতি দরিদ্র (%)	দরিদ্র (%)
১৯৯১-৯২	৪১.১	৫৬.৭
১৯৯৫-৯৬	৩৫.২	৫০.১
২০০০	৩৪.৩	৪৮.৯
২০০৫	২৫.১	৪০.০
২০১০	১৭.৬	৩১.৫
২০১৬	১২.৯	২৪.৩

সূত্র: খানার আয়-ব্যয় জরিপ- ২০১০, পৃষ্ঠা-৬১ এবং খানার আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬

চিত্র ২

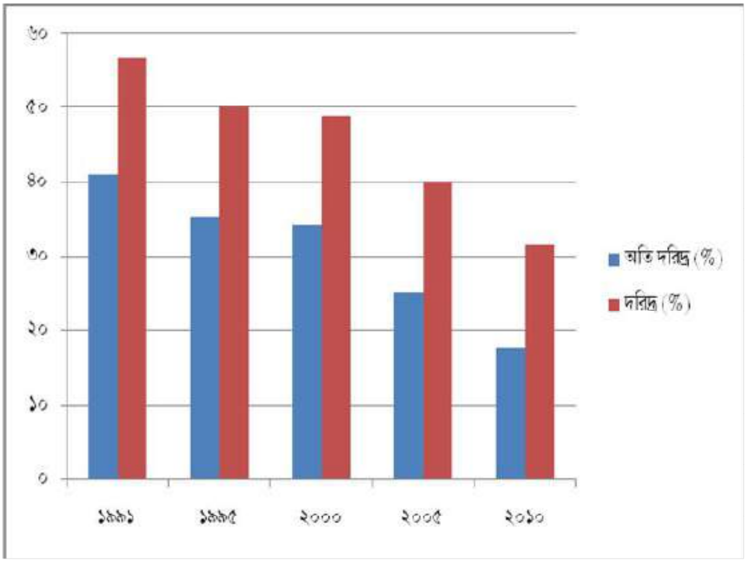

সিলেটেও এর প্রভাব অনুভূত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত খানার আয় ব্যয় জরিপ-২০১৬ (Household Income and Expenditure Survey (HIES) 2016 অনুযায়ী অনুযায়ী সিলেট জেলায় দারিদ্র্যের হার ১৩.০ (Head Count Rate, Using Upper Poverty Line)।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নিয়মিত জরিপ Sample Vital Registration System-এর ২০১১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী সিলেট জেলার অর্থনৈতিক অবস্থার একটি চিত্র সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-৬৯

সিলেট জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা

জেলা	সর্বদা অভাব অনটন (%)	সাময়িক অভাব অনটন (%)	আয় ব্যয় সমান (%)	সচ্ছল (%)	সঞ্চয় হয় (%)	মোট (%)
সিলেট (খানার শতকরা হার)	১৯.২২	৯.২৯	৩২.৬৮	২৩.৪৯	১৫.৩২	১০০

(BBS- Sample Vital Registration System 2011, p-184)

চিত্র ৪ : সিলেট জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা, ২০১১

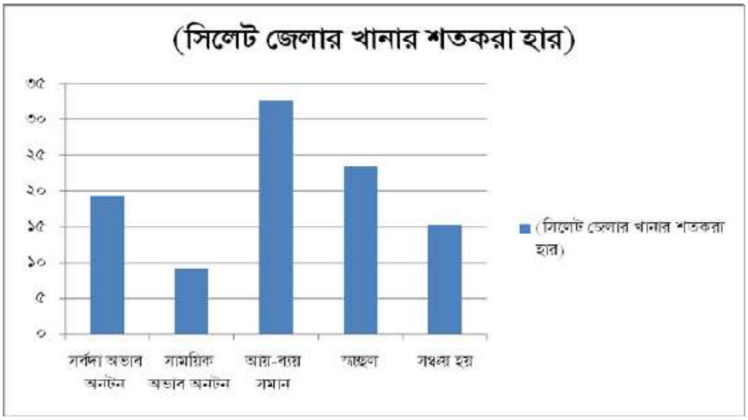

সিলেট জেলায় SVRS-2011 অনুযায়ী সর্বদা অভাব অনটন, সাময়িক অভাব অনটন, আয়-ব্যয় সমান, সচ্ছল এবং সঞ্চয় হয় এমন খানার শতকরা হার যথাক্রমে ১৯.২২%, ৯.২৯%, ৩২.৬৮%, ২৩.৪৯ এবং ১৫.৩২%।

অধ্যায়-৮

যোগাযোগ ব্যবস্থা

দুপাশে ভারতের পাহাড়ি অঞ্চল থাকায় পানির অসংখ্য উৎস হতে নিঃসৃত পানি ছড়া, খাল এবং নদীর মাধ্যমে সিলেট জেলায় প্রবেশ করার ফলে একসময় জলপথই ছিল যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু নাব্যতার সংকটের কারণে এই জলপথ দিন দিন সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

ভারত সীমান্তে অমলসীদ পয়েন্টে আসামের বরাক নদী দুভাগে বিভক্ত হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা, সীমান্তবর্তী জাফলং পয়েন্ট থেকে উৎপন্ন হয়ে পিয়াইন, চেঙ্গের খাল, ভোলাগঞ্জ পয়েন্ট থেকে সোনাই ইত্যাদি নদীগুলো সিলেট জেলার নৌপথের প্রধান মাধ্যম। ছাতক থেকে নিম্নদিকে কিছুটা নাব্যতা থাকায় সুরমা নদীর এ অংশে লঞ্চ, কার্গো ভেসেল এবং ইঞ্জিনচালিত নৌকা চলাচল করে। যদিও কুশিয়ারা নদী দিয়ে একসময়ে কলকাতাগামী জাহাজ চলত নিয়মিত। এখন শেরপুর থেকে নিম্নদিকে লঞ্চ, ছোটো কার্গো ভেসেল এবং ইঞ্জিন নৌকা ছাড়া বড়ো কোনো জাহাজ চলাচলের মতো নাব্যতা নেই।

চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে আসামের সংযোগ প্রদান করে এ অঞ্চলের উৎপাদিত চা-পরিবণের সুবিধার্থেই আখাউড়া-সিলেট রেল অংশটি আসাম বেঙ্গাল রেলওয়ে কর্তৃক ১৮৯২ সালে নির্মিত হয়। ২০০৫ সালে আখাউড়া বাইপাস নির্মাণ ছাড়া এর আর কোনো বিস্তৃতি হয়নি, বরং কুলাউড়া-লাতু অংশটি বন্ধ রয়েছে। রেলপথ যোগাযোগ নিরাপদ, কম ব্যয়বহুল বিধায় মাধ্যমটি যোগাযোগের জন্য জনপ্রিয় মাধ্যম। কিন্তু প্রয়োজনীয় রেল সার্ভিস না থাকার কারণে জনগণ চাহিদা মোতাবেক এর সুফল পাচ্ছে না। সিলেট-ছাতক রেল পথটি প্রায় বন্ধ হতেই বসেছে, উক্ত রুটে মালামাল পরিবহণ চালু থাকলেও যাত্রী পরিবহণে দুটো লোকাল ট্রেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

যদিও স্বাধীনতার আগে নৌপথ এবং রেলপথ ছাড়া যোগাযোগের অন্য মাধ্যমগুলোর সামান্যই অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সড়ক যোগাযোগ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। যেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে সড়ক যোগাযোগ, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে যানবাহনের সংখ্যা এবং ধরন। সিলেট মহানগর থেকে দেশের অনেক জেলা শহর, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যন্ত আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস চালু রয়েছে। জেলার অভ্যন্তরেও প্রত্যেকটি উপজেলার সঙ্গো, অনেক ক্ষেত্রে গ্রোথ সেন্টারের সঙ্গো নিয়মিত বাস চলাচল করে। তা ছাড়া রয়েছে অসংখ্য সিএনজিচালিত অটো, লেগুনা সার্ভিস এবং ব্যাটারিচালিত টমটম। মালামাল পরিবহণের জন্য রয়েছে অসংখ্য

ট্রাক/ট্রলি, যাতে ১.৫ টন থেকে ৩০.০০ টন পর্যন্ত মালামাল বহন করা হয়ে থাকে।

আকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। যদিও ১৯৬৬ সালে প্রতিদিন একটি মাত্র বিমান ঢাকা-সিলেট-ঢাকা রুটে চলাচল করত, কিন্তু সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরিত করায় ফ্লাইটের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে ফ্লাইট অপারেটিং সংস্থার সংখ্যাও। বিদেশ থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সরাসরি আগমন করে তবে অভ্যন্তরীণ রুটে একমাত্র ঢাকাগামী ফ্লাইট এখান থেকে ছাড়ে। রিফুয়েলিংয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ার ফলে এখান থেকে সরাসরি ফ্লাইট লন্ডনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে যাচ্ছে। সিলেট থেকে আকাশপথে ভ্রমণ জনপ্রিয় হলেও ফ্লাইটের সংখ্যা এবং রুটের স্বল্পতার কারণে জনসাধারণ এর পরিপূর্ণ সুফল পাচ্ছে না।

সড়ক যোগাযোগ (Road way Communication) ইতিকথা

ব্রিটিশ শাসনের আগে সিলেট জেলা তথা বৃহত্তর সিলেট জেলায় কোনো পাকা সড়কই ছিল না। ১৭৯৪ সালে ব্যক্তি- উদ্যোগে সিলেট শহরের মধ্যে সামান্য একটু পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়। ১৮৫৩ সালের আগে শহরের বাইরে কোনো পাকা সড়ক নির্মিত হয়নি। ১৯05 সালে বৃহত্তর সিলেট জেলায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৯৩ কি.মি. এবং লোকাল বোর্ডের মাধ্যমে ১৯৩০ কি. মি. সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (লোকাল বোর্ড) সড়ক নির্মাণের দায়িত্ব পায়।

উপজেলা (তৎকালীন থানা) সংযোগ সড়কসমূহ নির্মাণ করে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আন্তঃজেলা থেকে সংযোগকারী সড়ক, জেলা সড়ক, মহকুমা, বিভাগ, রাজধানী কিংবা স্থল এবং নৌবন্দরের সাথে সংযোগপ্রদানকারী সড়ক নির্মাণের দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত হয়।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত বৃহত্তর সিলেট জেলা গেজেটিয়ারের তথ্য মতে ১৯৬১ সালে সিলেট জেলাধীন সড়কের পরিসংখ্যান সারণিতে উল্লেখ করা হলো :

সারণি-৭০

১৯৬১ সালে সিলেট জেলাধীন সড়কের পরিসংখ্যান

ক্র. নং	সড়কের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)
১	সিলেট-শিলং ভায়া তামাবিল সড়ক	৫৪.৯৫
২	সিলেট-সালুটিকর সড়ক ভায়া এয়ারপোর্ট সড়ক	১০.৬৩
৩	সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ সড়ক ভায়া কোম্পানীগঞ্জ সড়ক	৪৯.৭৫
৪	সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক	৬৭.৭২
৫	সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়ক	২৪.১৫
৬	সিলেট-তেলিয়াপাড়া সড়ক	১৪৪.২২
৭	সিলেট-সুতারকান্দি সড়ক	৪৩.৮৭
৮	সিলেট-রেলস্টেশন সংযোগ সড়ক	০.১১
৯	এমসি কলেজ অ্যাপ্রোচ সড়ক	২.৫৮
১০	এসটি সড়ক (পূর্ব কিনব্রিজ)	০.৬৯
১১	মোনারই টিলা অ্যাপ্রোচ সড়ক	০.১৪
১২	চাঁদনীঘাট অ্যাপ্রোচ সড়ক	১৯.৩২
১৩	ঢাকাদক্ষিণ-মোগলা বাজার সড়ক	১৫.৩০
১৪	চারখাই-আটগ্রাম-জকিগঞ্জ সড়ক	৫৭.১৬
১৫	উত্তরভাগ-আনন্দপুর সড়ক	৩.২২
১৬	বিশ্বনাথ-রামপাশা সড়ক	৬.৭০
১৭	ফেঞ্চুগঞ্জ-স্টিমারঘাট সংযোগ সড়ক	১.৬১

এর মধ্যে সিলেট-শিলং ভায়া তামাবিল সড়ক, সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ ভায়া কোম্পানীগঞ্জ সড়ক এবং সিলেট সুতারকান্দি সড়ক যথাক্রমে তামাবিল, ভোলাগঞ্জ এবং সুতারকান্দি ৩টি স্থলবন্দরকে সংযোগ প্রদান করেছে বলে অর্থনৈতিকভাবে সড়ক ৩টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়ক।

সারণি-৭১

সওজ-এর আওতাধীন সড়কসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	সড়কের ধরন	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
০১.	জাতীয় (এন)	০৭	১৪০.৩৫
০২.	আঞ্চলিক (আর)	০৮	১৬২.০০
০৩.	জেলা (জেড)	১১	১৮৭.০০
	মোট =	২৬	৪৮৯.৩৫

সারণি-৭২

সওজ-এর আওতাধীন সড়কসমূহের তালিকা (ডিসেম্বর, ২০১৭)

জাতীয় মহাসড়ক (এন)

ক্রমিক নং	সড়কের নাম	সড়ক নং	সড়কের দৈর্ঘ্য
০১.	ঢাকা (কাঁচপুর) ভৈরব-জগদীশপুর-শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট-তামাবিল-জাফলং সড়ক (সড়ক উপ-বিভাগ সিলেট=২৪২ তম কি. মি. হতে ২৮৪ তম কি. মি.)	এন -২	৯৫.০০ কি.মি.
০২.	চণ্ডীপুল-কিনব্রিজ সড়ক	এন-২০৫	২.০০ কি.মি.
০৩.	কিনব্রিজ-নাইওরপুল সড়ক	এন-২০৬	২.০০ কি.মি.
০৪.	মৌলভীবাজার-ফেঞ্চুগঞ্জ-রাজনগর-সিলেট সড়ক	এন-২০৮	২৭.০০ কি.মি.
০৫.	সিলেট রেলওয়েস্টেশন বাইপাস সড়ক	এন-২০৯	১.০০ কি.মি.
০৬.	সিলেট শহর বাইপাস সড়ক	এন-২১০	১১.০০ কি.মি.
০৭.	তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেকটিং সড়ক	এন-২১২	০.৪৯ কি.মি.

আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর)

ক্রমিক নং	সড়কের নাম	সড়ক নং	সড়কের দৈর্ঘ্য
০১.	শাহী ঈদগাহ-কুমারপাড়া-নাইওরপুল সড়ক	আর -২৪৭	১.০০ কি.মি.
০২.	আম্বরখানা-শাহী ঈদগাহ-এমসি কলেজ-টিলাগড় সড়ক	আর-২৪৮	৪.০০ কি.মি.
০৩.	চৌহাট্টা-কুমারপাড়া-নাইওরপুল সড়ক	আর-২৪৯	২.০০ কি.মি.
০৪.	সিলেট-গোলাপগঞ্জ-চারখাই-জকিগঞ্জ সড়ক	আর-২৫০	৯০.০০কি.মি.
০৫.	গোলাপগঞ্জ-ঢাকা দক্ষিণ-ভাদেশ্বর সড়ক	আর-২৫১	১৪.০০কি.মি.
০৬.	সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক	আর-২৮০	২০.০০কি.মি.
০৭.	রাজনগর-কুলাউড়া-জুড়ি-বড়লেখা-বিয়ানীবাজার-শেওলা-চারখাই সড়ক	আর-২৮১	২৫.০০কি.মি.
০৮.	সিলেট-সুনামগঞ্জ বাইপাস সড়ক (তৃতীয় হজরত শাহজালাল (র.) সেতু অ্যাপ্রোচ সড়ক)	আর-২৮৩	৭.০০ কি.মি.

জেলা সড়ক (জেড)

ক্রমিক নং	সড়কের নাম	সড়ক নং	সড়কের দৈর্ঘ্য (কি.মি)
০১.	দরবস্ত-কানাইঘাট-শাহবাগ সড়ক	জেড-২০১১	২৫.০০
০২.	সারি-গোয়াইনঘাট সড়ক	জেড-২০১২	১৬.০০
০৩.	সিলেট-সুলতানপুর-বালাগঞ্জ সড়ক	জেড-২০১৩	২৫.০০
০৪.	শেওলা-সুতারকান্দি সড়ক	জেড-২০১৪	৪.০০
০৫.	রশিদপুর-বিশ্বনাথ-রামপাশা-লামাকাজী সড়ক	জেড-২০১৬	১৭.০০
০৬.	ফেঞ্চুগঞ্জ-মাইজগাঁও-পালবাড়ী সড়ক	জেড-২০২০	১০.০০
০৭.	সিলেট-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ক	জেড-২৮০১	৩০.০০
০৮.	বিমানবন্দর-বাদাঘাট-কুমারগাঁও (টুকের বাজার) সড়ক	জেড-২৮০৮	১২.০০
০৯.	ওসমানী বিমান বন্দর বাইপাস সড়ক	জেড-২৮০৯	৮.০০
১০.	কোম্পানীগঞ্জ-ছাতক সড়ক	জেড-২৮১০	১২.০০
১১.	বিয়ানীবাজার(বৈরাগীবাজার)-কুরেরবাজার-বুধবারীবাজার-বাদেপাশা ইউনিয়ন-গোলাপগঞ্জ (শরীফগঞ্জ)-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়ক	জেড-২৮১২	৫২.০০
১২.	ভাদেশ্বর-মীরগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়ক	জেড-২৮৩১	১৬.০০
১৩.	দাউদাবাদ-দাউদপুর- ভাদেশ্বর (ঢাকাদক্ষিণ)	জেড-২৮৩২	১৬.০০
সড়ক সমুহের মোট দৈর্ঘ্য (জাতীয় + আঞ্চলিক + জেলা)			৫৪৪

উৎস : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ), সিলেট।

সারণি-৭৩

এলজিইডি/এলজিআই-এর আওতাধীন সড়কের বিবরণ

ক্রমিক নং	সড়কের ধরন	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)
০১.	উপজেলা	৮৯	৭৬৪.০০
০২.	ইউনিয়ন	১৩৫	৭৯৬.০০
০৩.	গ্রামীণ এ	৯৬৮	২৪২০.০০
০৪.	গ্রামীণ বি	১৭৯৫	২৬৫৬.০০
	মোট =	২৯৪৭	৬৬৩৬.০০

উৎস : রোড অ্যান্ড স্ট্রাকচার ডাটা বেইজ ম্যানেজমেন্ট, সিস্টেম (আরএসডিএমএস), এলজিইডি।

সারণি-৭৪

উপজেলাওয়ারি এলজিইডি/এলজিআই-এর আওতাধীন সড়কের বিবরণ

ক্র. নং	উপজেলার নাম	সম্পূর্ণ পাকা সড়ক		আংশিক পাকা সড়ক				কাঁচা সড়ক		মোট		পাকা সড়কের পরিমাণ (%)
		সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	সংখ্যা	পাকা অংশের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	কাঁচা অংশের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য কি.মি.)	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	
১	বালাগঞ্জ	৪৫	১৭২	৬৬	৯৫	১১৪	২০৯	২১০	৩২৯	৩২১	৭১০	৩৮
২	বিয়ানীবাজার	৩৭	৭৭	৯৮	১১৬	১৩২	২৪৮	১৭৩	২২৬	৩০৮	৫৫১	২৭
৩	বিশ্বনাথ	২৪	১৩০	৫৭	৮৭	১০৭	১৯৪	১০৭	২২২	১৮৮	৫৪৬	৩১
৪	কোম্পানীগঞ্জ	৯	২৪	৩৬	৫৪	১০৩	১৫৭	৪৯	১৩৬	৯৪	৩১৭	১১
৫	ফেঞ্চুগঞ্জ	২৩	৫০	২১	৩৬	১৯	৫৫	৬০	৮৭	১০৪	১৯২	১২
৬	গোলাপগঞ্জ	৭৩	১৮৮	১১২	১১৫	১২৬	২৪১	১৭১	২০৭	৩৫৬	৬৩৬	৪৩
৭	গোয়াইনঘাট	৯	৬১	৩৭	৬৩	১১৮	১৮১	১৩৯	৩৯২	১৮৫	৬৩৪	১৭
৮	জৈন্তাপুর	৭	২০	৩৪	৫০	৬৫	১১৫	৭৮	১৬৬	১১৯	৩০১	১০
৯	কানাইঘাট	১৩	৭০	৪৭	৬৭	১৩৪	২০১	২০৭	৫১৭	২৬৭	৭৮৮	১৯
১০	সিলেট-সদর	৭৪	১৩৯	৮৬	৮৮	১১২	২০০	১৮৫	২৮৮	৩৪৫	৬২৭	৩২
১১	জকিগঞ্জ	১৩	৪৫	৬২	১০১	১৬২	২৬৩	১১০	২৫৮	১৮৫	৫৬৬	২১
১২	দ. সুরমা	৭১	১৬৩	১০৯	৮৫	১১৭	২০২	১৪৪	১৭৫	৩২৪	৫৪০	৩৫
১৩	সিটি করপোরেশন		২১৭						১২		২২৯	৯৫
		৩৯৮	১৩৫৬	৭৬৫	৯৫৭	১৩০৯	২২৬৬.০০	১৬৩৩	৩০১৫	২৭৯৬	৬৬৩৭	

উৎস : রোড অ্যান্ড স্ট্রাকচার ডাটা বেইজ ম্যানেজমেনট সিসটেম (আরএসডিএমএস), এলজিইডি

সারণি-৭৫

উপজেলাওয়ারি ব্রিজ ও কালভার্টের বিবরণ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	ব্রিজ কালভার্ট		বিদ্যমান গ্যাপ		মোট	
		সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (মি.)	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (মি.)	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য(মি.)
১	বালাগঞ্জ	১০০৪	৪১২২	৪৪৫	২০২৯	১৪৪৯	৬১৫১
২	বিয়ানীবাজার	৪৯১	২২১৯	১৯২	১১৩৬	৬৮৩	৩৩৫৫
৩	বিশ্বনাথ	৬২৬	২৪৯৭	৫১	৩২৪	৬৭৭	২৮২১
৪	কোম্পানীগঞ্জ	২২৯	১৯৬৩	১৩৯	৩০৩৪	৩৬৮	৪৯৯৭
৫	ফেঞ্চুগঞ্জ	৩৩০	৮২৫	২৮	৯৫	৩৫৮	৯২০
৬	গোলাপগঞ্জ	১২৬৮	৩৫২৯	২৮৩	২৬৭৬	১৫৫১	৬২০৫
৭	গোয়াইনঘাট	৩০৪	৩৬৮৪	৯৭	২৯৭৩	৪০১	৬৬৫৭
৮	জৈন্তাপুর	২৭৭	১৬৫৯	১৪৭	১৫১৯	৪২৪	৩১৭৮
৯	কানাইঘাট	৪২৭	২৬৭৮	৫১৯	৪৭৮৪	৯৪৬	৭৪৬২
১০	সিলেট-সদর	৫৯৮	২৬৩৪	১৬১	৯৯৭	৭৫৯	৩৬৩১
১১	জকিগঞ্জ	৩৮৯	১৬৪৭	৫৭	৭৫	৪৪৬	১৭২২
১২	দ. সুরমা	৫৮৫	১৯৩১	৪৭	৫২০	৬৩২	২৪৫১
	সর্বমোট =	৬৫২৮	২৯৩৮৮	২১৬৬	২০১৬২	৮৬৯৪	৪৯৫৫০

উৎস : রোড অ্যান্ড স্ট্রাকচার ডাটা বেইজ ম্যানেজমেন্ট সিসটেম (আরএসডিএমএস), এলজিইডি

সারণি-৭৬

সওজ-এর ও এলজিইডি-কর্তৃক নির্মিত/নির্মাণাধীন/নির্মিতব্য উল্লেখযোগ্য ব্রিজসমূহ

ক্র. নং	ব্রিজের নাম	নদীর নাম	ব্রিজের দৈর্ঘ্য (মি.)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	২	৩	৪	৫
১	কিন ব্রিজ	সুরমা	৩৯৫	-
২	শাহজালাল ব্রিজ		৩১৭	সওজ
৩	শাহপরান ব্রিজ ১		৩৯২	
৪	শাহপরান ব্রিজ ২		২৬১	
৫	এমএখান ব্রিজ		২১৭	
৬	কাজিরবাজার ব্রিজ (নির্মাণাধীন)		৩৯১	
৭	কানাইঘাট ব্রিজ		২৯৪	এলজিইডি
৮	শেওলা ব্রিজ	কুশিয়ারা	২২৬	সওজ
৯	ফেঞ্চুগঞ্জ ব্রিজ		২৬৭	
১০	শেরপুর ব্রিজ		২৮৫	
১১	সাদীপুর ব্রিজ		১৬৩	
১২	চন্দরপুর ব্রিজ (নির্মাণাধীন)		২৪৯	
১৩	শিবপুর ব্রিজ (প্রক্রিয়াধীন)		৩১৫	এলজিইডি
১৪	বালাগঞ্জ ব্রিজ (প্রক্রিয়াধীন)		৩১৫	
১৫	গোয়াইনঘাট ব্রিজ	চেঙ্গোর খাল	২১৭	সওজ
১৬	সালুটিকর ব্রিজ		২১৮	
১৭	বাধাঘাট ব্রিজ		২১৭	
১৮	পূর্ব জাফলং ব্রিজ (নির্মাণাধীন)	পিয়াইন	৩৬০	এলজিইডি
১৯	ভোলাগঞ্জ ব্রিজ	ধলাই	৪৩৫	সওজ
২০	কাটাখাল ব্রিজ	কাটা খাল	১৫৫	
২১	কাকরখালী ব্রিজ	কাকর খালী	১৮০	এলজিইডি

উৎস : সওজ এবং এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত।

সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক সমাপ্তকৃত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সমূহ :

- ❖ সুরমা নদীর ওপর পুরাতন ক্বীন ব্রিজের সন্নিকটে কাজির বাজার নামক স্থানে পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ।
  - সেতুটির দৈর্ঘ্য ৩৯১.০০ মিটার
  - প্রস্থ ১৮.৯০ মিটার
  - ১০ স্প্যান-বিশিষ্ট পিসি গার্ডার সেতু
  - প্রকল্প ব্যয় ১৮৯ কোটি টাকা
  - সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৬
- ❖ চন্দরপুর-সুনামপুর সেতু নির্মাণ।
  - সেতুটির দৈর্ঘ্য ২৪৯.৩৭ মিটার
  - প্রস্থ ৭.৬০ মিটার
  - ৭ স্প্যান-বিশিষ্ট পিসি গার্ডার সেতু
  - সেতুটির নির্মাণ ব্যয় ২৪.৬২ কোটি টাকা
  - সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৫
- ❖ সদাখাল সেতু নির্মাণ
  - সেতুটির দৈর্ঘ্য ১৪৮.৬৮ মিটার
  - প্রস্থ ৭.৬০ মিটার
  - ৫ স্প্যানবিশিষ্ট পিসি গার্ডার সেতু
  - সেতুটির নির্মাণব্যয় ৬.১০ কোটি টাকা
  - সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৫
- ❖ দরবস্ত-কানাইঘাট সড়ক।
  - ১৮.০০ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন
  - প্রকল্প ব্যয় ১৮.০০ কোটি টাকা
  - সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৭
- ❖ রশিদপুর-বিশ্বনাথ-রামপাশা-লামাকাজী সড়ক।
  - ৭.০০ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন
  - প্রকল্প ব্যয় ৪.৭৩ কোটি টাকা
  - সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৭

- সিলেট-দাউদাবাদ-দাউদপুর-ভাদেশ্বর-মীরগঞ্জ-মানিকোনা-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন।
    - ৩.৩৫ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন
    - প্রকল্প ব্যয় ৪.৭৮ কোটি টাকা
    - সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৭
- ৭টি সেতু নির্মাণসহ বিয়ানীবাজার শহর এলাকার সড়ক উন্নয়ন।
    - ৪.৩৫ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণসহ ৭টি সেতু (১৮৪.২৬ মিটার) পুনর্নির্মাণ
    - প্রকল্প ব্যয় ৩৮.৯৯ কোটি টাকা
    - সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৬
- সিলেট-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়কে ১০টি সেতু নির্মাণ
    - ১০টি সেতু (৫৪২.৮৩ মিটার) সেতু নির্মাণ
    - প্রকল্প ব্যয় ৩৮.২৪ কোটি টাকা
    - সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৩

তাছাড়া বিগত ৫ বছরে পিএমপি (সড়ক) এর আওতায় ১৯৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট সড়ক বিভাগের অধীন ২৯৩.০০ কি.মি. সড়ক মেরামত ও পুনর্বাসন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য চলমান প্রকল্পসমূহ :

- বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প।
    - প্রকল্প মূল্য : ৬২৬৯২.৬০ লাখ টাকা।
    - প্রকল্প দৈর্ঘ্য : ৩০.৮৫০ কি.মি.
    - অগ্রগতি : ৪০% (১৩.০০ কি.মি. রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে)।
- গুরুত্বপুর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ(সিলেট জোন) প্রকল্পের আওতায়
  উক্ত প্রকল্পে সিলেট সড়ক বিভাগে ২ টি প্যাকেজ রয়েছে
    - প্যাকেজ ১: সিলেট-গোলাপগঞ্জ-চারখাই-জকিগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন
        - প্যাকেজ মূল্য :- ১৮৬০০.০০ লাখ টাকা

- ➢ দৈর্ঘ্য : ৬১.৬৭ কিলোমিটার
- ➢ অগ্রগতি : ৫%

- প্যাকেজ ২ : গোলাপগঞ্জ-ঢাকাদক্ষিণ-ভাদেশ্বর সড়ক এবং বিয়ানীবাজার -শেওলা-চারখাই সড়ক উন্নয়ন
  - ➢ প্যাকেজ মূল্য : ২৮৮৪.০০ লাখ
  - ➢ দৈর্ঘ্য : ৯.৩০ কিলোমিটার
  - ➢ অগ্রগতি : ৫%

❖ সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
উক্ত প্রকল্পে সিলেট সড়ক বিভাগে ২টি প্যাকেজ রয়েছে

- প্যাকেজ পিডাব্লিউ-১ (বি) এর আওতায় ১০.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট-সুানমগঞ্জ বাইপাস সড়কের ৩.৯২৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে।
- প্যাকেজ পিডাব্লিউ-১ (এ) : সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের টুকের বাজার হতে গোবিন্দগঞ্জ পর্যন্ত সড়কাংশ প্রশস্তকরণসহ টুকের বাজারে ১টি নতুন সেতু নির্মাণ ও ৯টি কালভার্ট পুনর্নি ´মা
  - ➢ প্যাকেজ মূল্য : ৩৫৭৭.৪৪ লাখ টাকা
  - ➢ সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের ১৪.১৭৫ কিমি হার্ড সোল্ডার নির্মাণের মাধ্যমে সড়ক প্রশস্তকরণ
  - ➢ সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে ১৭৫ মিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ
  - ➢ সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে ১টি সেতু ও ৯টি কালভার্ট নির্মাণ
  - ➢ দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে

❖ ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়করে জৈন্তা হতে জাফলং র্পযন্ত (তামাবিল ল্যন্ডপোর্ট কানেক্টিং ও বল্লাঘাট সংযোগ সড়কসহ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

- প্রকল্প মূল্য : ১৯০৭৬.৭৪ লক্ষ টাকা
- প্রকল্প দৈর্ঘ্য: ১৬.৩৪৬ কিলোমিটার
- দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে

তাছাড়া পিএমপি (সড়ক) এর আওতায় ৬৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট সড়ক বিভাগের অধীন ৪০.০০০ কি.মি. সড়ক মেরামত ও পুনর্বাসন এবং পিএমপি (সেতু/কালভার্ট) প্রকল্পের আওতায় ৩.৭০

কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি (৫১ মিটার) কালভার্ট ও ৮.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি সেতু (৬৫.৫৩২ মিটার) সেতু নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

বর্তমানে সিলেট থেকে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে প্রতিদিন ৩১টি রুটে আন্তঃজেলা যাত্রীবাহী বাস চলাচল করে।

সারণি-৭৭

আন্তঃজেলা সড়কপথে যোগাযোগের রুট এবং যানবাহনের সংখ্যা

(ডিসেম্বর ২০১৪)

ক্রমিক নং	রুটের নাম	পরিবহণ সংস্থার সংখ্যা	দৈনিক বাসের সংখ্যা
১.	সিলেট-ঢাকা	১০	২৬২
২.	সিলেট-চট্টগ্রাম	৪	১২
৩.	সিলেট-খুলনা	১	২
৪.	সিলেট-খুলনা-সাতক্ষীরা	১	৪
৫.	সিলেট-বরিশাল	২	৪
৬.	সিলেট-পাবনা-কুষ্টিয়া	২	৪
৭.	সিলেট-কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ	১	২
৮.	সিলেট-দিনাজপুর	৩	৬
৯.	সিলেট-রংপুর	২	৪
১০.	সিলেট-রংপুর-কুড়িগ্রাম	১	৪
১১.	সিলেট-রংপুর-জলঢাকা	১	২
১২.	সিলেট-গাইবান্ধা	১	২
১৩.	সিলেট-রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১	২
১৪.	সিলেট-জয়পুরহাট-ফুলবাড়ি	২	৪
১৫.	সিলেট-কুমিল্লা	৩	৬০
১৬.	সিলেট-সোনাপুর	১	২
১৭.	সিলেট-লক্ষ্মীপুর	১	২
১৮.	সিলেট-চাঁদপুর	২	১৪
১৯.	সিলেট-ময়মনসিংহ-জামালপুর	৫	২০
২০.	সিলেট-টাঙ্গাইল-ঘাটাইল	৩	৬
২১.	সিলেট-নেত্রকোণা-কলমাকান্দা	১	২
২২.	সিলেট-হবিগঞ্জ-মৌলভীবাজার	১	১৮০
২৩.	সিলেট-পঞ্চগড়-ঠাকুরগাঁও	১	২
২৪.	সিলেট-জয়পুরহাট-ফুলবাড়ী	১	২
২৫.	জাফলং-কুমিল্লা	১	২
২৬.	পূর্ব জাফল-টাঙ্গাইল	২	৪
২৭.	সিলেট-সুনামগঞ্জ	-	২৪০
২৮.	সিলেট-দিরাই	-	৪০
২৯.	সিলেট-বিশ্বনাথ-জগন্নাথপুর	-	৬৪
৩০.	সিলেট-ছাতক	-	৪০
৩১.	সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ-কুলাউড়া	-	২৪
৩২	সিলেট-নওগাঁ	১	১

উৎস : বিভিন্ন পরিবহণ সংস্থা থেকে সংগ্রহকৃত।

অভ্যন্তরীণ রুটের (আন্তঃজেলা) বাস সার্ভিস

সোহাগ পরিবহণ এবং গ্রীন লাইন পরিবণের বাসগুলো বিলাসবহুল এবং ব্যয়বহুল বাস সার্ভিস। এতে ভলভো এবং স্কেনিয়া দু-ধরনের সার্ভিস চালু রয়েছে।

সিলেট জেলা শহর থেকে প্রায় প্রত্যেকটি উপজেলায় বাস সার্ভিস চালু রয়েছে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যন্তও বাস সার্ভিস চালু আছে। তাছাড়া উপজেলা থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্তও বাস সার্ভিস আছে। তবে উপজেলার অভ্যন্তরে প্রচুর সংখ্যক লেগুনা এবং সিএনজি, ইজিবাইকও চলাচল করে।

সারণি-৭৮

অভ্যন্তরীণ রুটের বাসের সংখ্যা

ক্রমিক নং	রুটের নাম	দৈনিক বাসের সংখ্যা
০১.	সিলেট-জকিগঞ্জ-বরাইগ্রাম	২০০
০২.	সিলেট-দরবস্ত-কানাইঘাট	৬০
০৩.	সিলেট-গোয়াইনঘাট	১২
০৪.	সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ	২০
০৫.	সিলেট-ঢাকাদক্ষিণ-ভাদেশ্বর	১৩০
০৬.	সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ	৬০
০৭.	সিলেট-বালাগঞ্জ-শেরপুর	৬৪
০৮.	সিলেট-তামাবিল	৪০
০৯.	সিলেট-কানাইঘাট	৩৬

উৎস : বাস সার্ভিস সংস্থা থেকে সংগ্রহকৃত।

সারণি-৭৯

নিবন্ধনকৃত রিকশা, ভ্যান, ইজিবাইক এবং অটোরিকশার সংখ্যা

ক্র. নং	উপজেলা/ সিটি করপোরেশন	রিকশা	ভ্যান	ইজিবাইক এবং অটোরিকশা	টেম্পো
১	বালাগঞ্জ	৩৫০	৭৫	১৭৬	৬৫
২	বিয়ানীবাজার	১৩০০	২৬৪	২০৫	৪৫
৩	বিশ্বনাথ	১৮৫৫	৯৮২	১২৮৫	৬৭৮
৪	কোম্পানীগঞ্জ	৭৫০	৭১	৫০	৬৭
৫	দক্ষিণ সুরমা	৫০০	১০০	১৫০	২০
৬	ফেঞ্চুগঞ্জ	৩০৭	১০১৭	২৭০	১৮৭
৭	গোলাপগঞ্জ	২৮০	২০০	১০০	৮০
৮	গোয়াইনঘাট	১৬৭	২৫	৫৭	২৫
৯	জৈন্তাপুর	৩০০	২০	১৩০	৭১
১০	কানাইঘাট	৫০০	১০০	১৫০	২০
১১	সিলেট সিটি করপোরেশন	২৪৪৩১	৫০০	১২৫০	৪৯
১২	সিলেট সদর	৬২১৩	১৯০	৮৯৩	৬৭৯
১৩	জকিগঞ্জ	৫৬	০	৪৫	৫
	সর্বমোট =	৩৭০০৯	৩৫৪৪	৪৭৬১	১৯৯১

উৎস : জেলা পরিসংখ্যান, ২০১১

সারণি-৮০

অনিবন্ধনকৃত রিকশা, ভ্যান, ইজিবাইক এবং অটোরিকশার সংখ্যা

ক্রমিক নং	উপজেলা/ সিটি করপোরেশন	রিকশা	ভ্যান	ইজিবাইক এবং অটোরিকশা	টেম্পো	নছিমন/ করিমন/ ভটভটি
১	বালাগঞ্জ	৮৫	৩২	৭৮	৩৩	১৯
২	বিয়ানীবাজার	১৪০	৫০	২৮	২২	৬৬
৩	বিশ্বনাথ	৯৯২	৩৮০	১৭৩	১২৮	১১
৪	কোম্পানীগঞ্জ	৩১২	৭১	১৫	১৭	৮
৫	দক্ষিণ সুরমা	১৫০	৭০	৯০	৬৭	৪২
৬	ফেঞ্চুগঞ্জ	১০০	৭০	৬৯	২৯	১২
৭	গোলাপগঞ্জ	১০৯	১০৮	৩৫	২০	১০
৮	গোয়াইনঘাট	৮০	১২	৩৩	৬	১৩
৯	জৈন্তাপুর	২০০	৫৯	২৫	১৯	২০
১০	কানাইঘাট	১০০	৬৫	৯০	১০	৪৩
১১	সিলেট সিটি করপোরেশন	৭৫২	৬৭	২১৯	১৬৩	৩
১২	সিলেট সদর	৪০৫	১২১	৯১	৭৩	২১
১৩	জকিগঞ্জ	৫০০	২৭	৫	১৬	৩৭
	সর্বমোট =	৩৯২৫	১১৩২	৯৫১	৬০৩	৩০৫

উৎস : জেলা পরিসংখ্যান, ২০১১

বর্তমানে সিলেট জেলায় সিলেট মহানগরীতে ২২৯ কি.মি. এবং ১২টি উপজেলায় সওজ এবং এলজিইডি/এলজিআই-এর আওতায় ৭১২৫ কি. মি. সড়কের এক বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে। এর মধ্যে মহানগরীতে ২১৭ কি. মি. পাকা সড়ক এবং জেলায় মোট ২৫৭০ কি. মি. পাকা সড়ক । মহানগরীতে ৯৫% সড়ক পাকা এবং জেলায় ৩৬% সড়ক পাকা। জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের মোট ৪৮৯ কি. মি. সড়কের মধ্যে ৪৮৪ কি. মি. (৯৯%) পাকা সড়ক রয়েছে। উপজেলা সড়কের ৮০% ইউনিয়ন সড়কের ৫৭% এবং গ্রামীণ সড়কের ১৭% পাকা সড়ক। উপজেলা পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি পাকা সড়ক দক্ষিণ সুরমা উপজেলায় ৪৩%, বালাগঞ্জ উপজেলায় ৩৮% এবং সিলেট সদর উপজেলায় ৩২%। সবচেয়ে কম পাকা সড়ক জৈন্তাপুরে ১০%, কোম্পানীগঞ্জে ১১% এবং ফেঞ্চুগঞ্জে ১২%।

জেলায় ১৫০ মি.এর অধিক দৈর্ঘ্যের ব্রিজ রয়েছে ১৯টি। এর মধ্যে সুরমা নদীর ওপর ৬টি ব্রিজ, কুশিয়ারা নদীর ওপর ৪টি ব্রিজ, ২টি ব্রিজ নির্মাণাধীন। কুশিয়ারা নদীর ওপর নির্মিতব্য ২টি ব্রিজ প্রক্রিয়াধীন। এলজিইডির আওতাধীন ব্রিজ/কালভার্টের মোট দৈর্ঘ্য ২৯৯৮৮ মি.। এখনো ২০১৬২ মি. গ্যাপ রয়েছে। অর্থাৎ ৬০% ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সড়ক যোগাযোগের এই বিশাল নেটওয়ার্কের ফলে ৩১টি আন্তঃজেলা রুটে দৈনিক ১০১৮টি এবং অভ্যন্তরীণ রুটে দৈনিক ৬২২টি বাস চলাচল করে। সর্বমোট ১৬৪০টি বাসে দৈনিক প্রায় ৫০,০০০ যাত্রী পরিবহণ করে।

তামাবিল স্থলবন্দর, ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর, সুতারকান্দি স্থলবন্দর, বিছানাকান্দি পাথর কোয়ারি এবং লুভাছড়া পাথর কোয়ারি থেকে কয়েক হাজার পাথর এবং কয়লাবাহী ট্রাক/লরি দৈনিক চলাচল করে। জেলায় নিবন্ধনকৃত রিকশা, ভ্যান, ইজিবাইক/অটোরিকশা এবং টেম্পোর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭০০৯টি, ৩৫৪৪টি, ৪৭৬১টি এবং ১৯৯১টি।

এছাড়া অনিবন্ধিত রিকশা, ভ্যান, ইজিবাইক/অটোরিকশা এবং টেম্পোর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৯২৫টি, ১১৩২টি, ৯৫১টি এবং ৬০৩টি।

সড়ক যোগাযোগের এই কর্মকাণ্ড স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে একটি বিপ্লব ঘটিয়েছে যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেছে।

রেললাইন স্থাপনের ইতিকথা

আসামের চা-উদ্যোগের উন্নয়ন হিসেবে আসাম বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানি ১৮৯১ সালে গঠিত হয়। আসাম বেঙ্গাল রেলওয়ে আসাম চা-বাগান এবং কয়লাখনি অধ্যুষিত অঞ্চলকে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সংযোজিত করে, যাতে সহজে আসামের চা এবং কয়লা বিদেশে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেই লক্ষ্যে চা-উৎপাদনকারী এ অঞ্চলে রেললাইন স্থাপন করা হয়। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর পর্যন্ত সহজে চা পরিবণের সুবিধার্থে চা-বাগান ঘেঁষে উক্ত রেললাইন স্থাপন করা হয়। যেসব রেল স্টেশনে প্রচুর পরিমাণে চা বুকিং করা হতো সেগুলো হলো শ্রীমঙ্গাল, শমশের নগর, লংগাই, চারগোলা এগুলো বর্তমানে মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত। শ্রীমঙ্গাল চা-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান, এমনকি তৎকালীন পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কেন্দ্র ছিল। কুলাউড়া-ছাতক বাজার শাখা লাইনটি স্থাপন করা হয়েছিল পাথর, চুনাপাথর, সার, সিমেন্ট এবং পাল্প পরিবণের জন্য।

রেল যোগাযোগ (Railway Communication)

সিলেট রেলওয়ে স্টেশন

ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব অংশে মিটার গেজ এবং পশ্চিম অংশে ব্রড গেজ রেল লাইন নির্মিত হয়। তিনটি সেকশনে মিটার গেজ অংশ নির্মাণ করা হয়। প্রথমটি বেঙ্গল সুরমা সেকশন যা সমতল এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা দিয়ে অতিবাহিত। দ্বিতীয়টি পাহাড় এবং গহীন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত। আর তৃতীয় সেকশনটি ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে।

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃক ১৮৯২ সালে কাজ শুরু হয় এবং ১৮৯৫ সালের ১ জুলাই সমাপ্ত হয়। এর মধ্যে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা (১৪৯ কি.মি.) এবং লাকসাম-চাঁদপুর (৬০ কি.মি.)। কুমিল্লা-আখাউড়া এবং আখাউড়া-করিমগঞ্জ লাইন ১৮৯৬ সালে উন্মুক্ত হয়। বদরপুর-শিলচর শাখা রেললাইন ১৮৯৮ সালে উন্মুক্ত হয়। ব্রিটিশ ভাইসরয় (Viceroy) লর্ড কার্জন ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ সর্বমোট ১২০০ কি.মি. রেললাইনের উদ্বোধন করেন।

কুলাউড়া-সিলেট শাখা লাইনের কাজ ১৯১২ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে সমাপ্ত হয়। শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ (১৪ কি. মি.) লাইন উন্মুক্ত হয় ১৯২৮ সালে এবং শায়েস্তাগঞ্জ-বাল্লা (২৭ কি. মি.) লাইনের কাজ শেষ হয় ১৯২৯ সালে। কুলাউড়া-লাতু (৩৮ কি. মি.) মূল রেললাইনটি পরবর্তী সময়ে শাখা লাইন হিসেবে বিবেচিত হয় যা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। সিলেট-ছাতক রেললাইনটির কাজ ১৯৫৩ সালে সমাপ্ত হয়।

৯.৬৫ টন এক্সেল লোডের জন্য সর্বোচ্চ গতিসীমা ৩০ এমপিএইচ (MPH)., লোড ১১.৭৫ হলে গতিসীমা ২৫ এমপিএইচ (MPH), কুশিয়ারা ব্রিজ এ গতিসীমা ১০ এমপিএইচ (MPH) নির্ধারিত ছিল।

১৯৪২ সালে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ব্রিটিশ ভারত সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে নবগঠিত বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে চালু করা হয়। ১৯৪৭ সালে বেঙ্গল-আসাম রেলওয়েকে বিভক্ত করে পাকিস্তান এবং ভারত সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অংশে থাকা ২৬০৩.৯২ কি. মি. রেল লাইন ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৯৬১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ইস্টার্ন-বেঙ্গল রেলওয়ে (EBR)কে পাকিস্তান রেলওয়ে (PR)এবং ১৯৬২ সালে পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে (PER) এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রেলওয়ে (BR)হিসেবে নামকরণ হয় যা এখনো বহাল রয়েছে।

রেল যোগাযোগের বর্তমান অবস্থা :

আখাউড়া বাইপাস লিংক রেললাইন

নতুনভাবে রেললাইনের কোনো সম্প্রসারণ না হলেও ৩ কি. মি. আখাউড়া বাইপাস লিংক রেললাইন নির্মাণের ফলে ঢাকা-সিলেট রুটে ভ্রমণ সময় দেড় ঘণ্টা কমেছে। তা ছাড়া রেল স্টেশনের সুদৃশ্য টার্মিনাল ভবনসহ আনুষঙ্গিক কাজ ১৯৯৮ সালে শুরু হয়ে ২০০৪ সালে সমাপ্ত হয়।

সিলেট জেলায় ৬টি রেল স্টেশন এবং ৪৯.৬৯ কি.মি. রেললাইন আছে। জেলার ১২টি উপজেলার মধ্যে কেবলমাত্র ৩টি উপজেলা এবং সিটি করপোরেশন মধ্যে দিয়ে রেললাইন রয়েছে।

সিলেট স্টেশন থেকে বর্তমানে ৪টি গন্তব্যে প্রতিদিন ১২টি ট্রেন ছেড়ে যায় এবং একইভাবে ১২টি ট্রেন সিলেটের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসে। এর মধ্যে ৬টি আন্তঃনগর ট্রেন, ৩টি মেইল ট্রেন, ২টি লোকাল ট্রেন এবং ১টি কমিউটার ট্রেন রয়েছে। ১২টি যাত্রীবাহী ট্রেনে সপ্তাহে ৫০টি ট্রিপে (১০ দিন বন্ধ বাদে) গড়ে দৈনিক ৫০০০ জন যাত্রী পরিবহণ করে।

সারণি-৮১

ঢাকা-সিলেট রুটে ট্রেনের সময়সূচি

আপ ট্রেন			ডাউন ট্রেন		
ট্রেনের নাম	প্রারম্ভিক স্টেশন	সিলেট পৌঁছে	সিলেট ছাড়ে	ঢাকা পৌঁছে	সাপ্তাহিক বন্ধ
উপবন	২১.৫০	৫.৩০	২২.০০	৫.৩০	বুধবার
পারাবত	৬.৪০	১৩.৩৫	১৫.০০	২২.৩০	মঙ্গলবার
জয়ন্তিকা	১২.০০	১৯.৫০	৮.২০	১৬.০০	বৃহস্পতিবার
কালনী	১৬.০০	২২.৪৫	৬.৪০	১৩.২৫	শুক্রবার
সুরমা মেইল	২২.৫০	১২.০০	২০.৪৫	১০.০৫	বন্ধ নেই

উৎস : ব্যবস্থাপক, সিলেট রেলওয়ে স্টেশন, সিলেট।

সারণি-৮২

সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে চলাচলকারী ট্রেনের সময়সূচি

আপ ট্রেন			ডাউন ট্রেন		
ট্রেনের নাম	প্রারম্ভিক স্টেশন	সিলেট পৌঁছে	সিলেট ছাড়ে	গন্তব্যে পৌঁছে	সাপ্তাহিক বন্ধ
উদয়ন	২১.৩০	৬.৩০	২১.২০	৬.১০	শনিবার
পাহাড়িকা	৮.১৫	১৭.৩০	১০.১৫	২০.০০	সোমবার
জালালাবাদ	১৯.৩০	১১.১০	২২.৫০	১৪.৪৫	বন্ধ নেই

উৎস : ব্যবস্থাপক, সিলেট রেলওয়ে স্টেশন, সিলেট।

সারণি-৮৩

সিলেট-আখাউড়া রুটে চলাচলকারী ট্রেনের সময়সূচি

আপ ট্রেন			ডাউন ট্রেন	
ট্রেনের নাম	প্রারম্ভিক স্টেশন	সিলেট পৌঁছে	সিলেট ছাড়ে	গন্তব্যে পৌঁছায়
সি. কমিউটার	১৩.৪৫	১৯.১০	৭.১০	১২.৩০
কুশিয়ারা মেইল	২২.৫০	১২.০০	১৬.২৫	২৩.০০

উৎস : ব্যবস্থাপক, সিলেট রেলওয়ে স্টেশন, সিলেট।

সারণি-৮৪

সিলেট-ছাতক রুটে চলাচলকারী ট্রেনের সময়সূচি

আপ ট্রেন			ডাউন ট্রেন	
ট্রেনের নাম	প্রারম্ভিক স্টেশন	সিলেট পৌঁছে	সিলেট ছাড়ে	প্রারম্ভিক স্টেশন
লোকাল	৭.০০	৮.১০	৮.৩০	৯.৪০
লোকাল	১৬.৩০	১৭.৪০	১৮.৩০	১৯.১০

উৎস : ব্যবস্থাপক, সিলেট রেলওয়ে স্টেশন, সিলেট।

সারণি-৮৫

উপজেলাভিত্তিক রেললাইন এবং স্টেশন

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	রেল লাইনের দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	স্টেশনের নাম
১।	বিশ্বনাথ	১৫	সৎপুর, খাজাঞ্চিগাঁও,
২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	১৪	মাইজগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ
৩।	দক্ষিণ সুরমা	২৬	মোগলাবাজার
৪।	সিটি করপোরেশন	২	সিলেট

উৎস : ব্যবস্থাপক, সিলেট রেলওয়ে স্টেশন, সিলেট।

সিলেট থেকে দৈনিক ২টি মাল পরিবহণকারী ট্রেন চলাচল করে। সপ্তাহে ৮০০ প্যাকেজ মালামাল বুক করা হয়, যার পরিমাণ ২৫০০০ কেজি। সাধারণত পুরাতন আসবাবপত্র, বাংলাদেশ ব্যাংকের পুরাতন খালি কাঠের বাক্স, পুরাতন টায়ার, বরফযুক্ত মাছ, তেজপাতা, বিভিন্ন ওষুধ, মাশরুমসহ বিভিন্ন ধরনের মালামাল পরিবহণ করা হয়। পার্শেল সেকশন থেকে এসব মাল পরিবহণ করা হয়।

গুডস সেকশন থেকে শুধু তৈলজাতীয় পদার্থ পরিবহণ করা হয়। প্রতি সপ্তাহে চট্টগ্রাম থেকে আনুমানিক ১৪,৪০,০০০ লিটার জ্বালানি তৈল আসে এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ড থেকে আনুমানিক ১২০০০০০ লিটার জ্বালানি তৈল চট্টগ্রাম পাঠানো হয়।

জ্বালানি তৈল পরিবাহী লঞ্চ

জেলার প্রধান দুটি নদী হলো সুরমা এবং কুশিয়ারা। আসামের বরাক নদী আন্তর্জাতিক সীমান্ত অমলসিদ নামক পয়েন্টে দু-ভাগে ভাগ হয়ে সুরমা এবং কুশিয়ারা নদীর সৃষ্টি। সুরমা নদী উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে কানাইঘাট, গোলাপগঞ্জ উপজেলা শহর অতঃপর সিলেট জেলা শহর হয়ে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আর কুশিয়ারা নদী দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জেলার জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ উপজেলার ওপর দিয়ে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় প্রবেশ করেছে। সুরমা নদী বিভিন্ন স্থানে ধনু, গোরাউত্রা ইত্যাদি নামধারণ করেছে অন্যদিকে কুশিয়ারা নদী বিবিয়ানা, কালনী, ধলেশ্বরী ইত্যাদি নামধারণ করে কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ার চর ও ভৈরব উপজেলার সন্ধিক্ষণে ত্রি-মোহনা নামক স্থানে দুটি নদী একত্র হয়ে মেঘনা নামধারণ করেছে।

১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বর্ষা মৌসুমে আইজিএন (IGN) এবং আরএসএন কোম্পানি (RSN C0) পরিচালিত কার্গো শিপ ভারতের কলকাতা থেকে ছেড়ে এসে হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ, মার্কুলী, ইনাতগঞ্জ, শেরপুর মৌলভীবাজার জেলার মনুমুখ, সিলেট জেলার বালাগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ আসামের করিমগঞ্জ

হয়ে বদরপুর পর্যন্ত যাতায়াত করত। শুষ্ক মৌসুমে ছোটো কার্গো ভেসেল মার্কুলীর ক্ষেত্রে নিম্ন দিকে চলাচল করত। সুরমা নদীর ক্ষেত্রে ছাতক থেকে নিম্নদিকে কার্গো ভেসেল চলাচল করত।

সিলেট জেলার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদীগুলো হলো পিয়াইন, গোয়াইন, চেঙ্গের খাল, সোনাই নদী ইত্যাদি। উক্ত নদী ছাতকের আগে (UP Stream) সুরমা নদীর সাথে মিলিত হওয়ায় ছাতকের নিম্নদিকে নদীর পানির প্রবাহ অনেক বেশি। ফলে নদীর ওই অংশের নৌপথ সারা বছর কার্গো ভেসেল চলাচল-উপযোগী থাকে। ভোলাগঞ্জ, বিছনাকান্দি, জাফলং থেকে নদীপথে ইঞ্জিন নৌকায় পাথর এবং বালি পরিবহণ করে ছাতকে বড়ো কার্গোতে লোড করা হয়। অতঃপর দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবহণ করা হয়।

সারণি-৮৬

উপজেলাভিত্তিক নদী ও খালের দৈর্ঘ্যের বিবরণ

ক্র. নং	উপজেলার নাম	বর্ষা মৌসুমে জলপথ (নদী ও খাল) কি.মি.	বছরের অবশিষ্ট সময়ে জলপথ (নদী ও খাল) কি.মি.
১	বালাগঞ্জ	৮৮	৫
২	বিয়ানীবাজার	২৬.৮	১১.৭০
৩	বিশ্বনাথ	৪০	০
৪	কোম্পানীগঞ্জ	২২	১০
৫	ফেঞ্চুগঞ্জ	২৫	০
৬	গোলাপগঞ্জ	২৫	১৮
৭	গোয়াইনঘাট	১৫০	৪০
৮	জৈন্তাপুর	৭২.২৮	৭২.২৮
৯	কানাইঘাট	৪০	২০
১০	সিলেট-সদর	-	-
১১	জকিগঞ্জ	৬০	৬০
১২	দ. সুরমা	১৬২	১৮
১৩	সিটি করপোরেশন	৭	৭

উৎস : জেলা পরিসংখ্যান, ২০১১।

পাথর ও বালি পরিবাহী কার্গো ভেসেল

বর্তমানে বর্ষাকালে নৌপথের দৈর্ঘ্য ৭১৮ কি. মি. এবং বছরের অবশিষ্ট সময়ে উক্ত দৈর্ঘ্য থাকে ২৬২ কি.মি.। একমাত্র শেরপুর লঞ্চঘাট থেকে ভৈরব বাজার পর্যন্ত লঞ্চ সার্ভিস চালু আছে। নৌপথে যাত্রী পরিবহণ খুব কমই হয়। নৌপথে ইঞ্জিন নৌকা এবং ছোটো-ছোটো কার্গো ভেসেলের মাধ্যমে পাথর, বালিসহ মালামাল পরিবহণ করা হয়ে থাকে। নৌপথে নাব্যতা সংকটের কারণে দিন দিন নৌযোগাযোগ সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সিলেট

আজকের সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের গোড়াপত্তন ঘটে মূলত ৪০ (চল্লিশ) দশকের প্রথমার্ধে। সিলেট শহর থেকে ৯.৫০ কি. মি. উত্তর-আগে ২৪°৫৭'৪৮' উত্তর দ্রাঘিমাংশে এবং ৯১°৫২'০১" পূর্ব অক্ষাংশে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি ১৫ মিটার AMSL Elevation এ অবস্থিত। ব্রিটিশশাসিত ভারতীয় উপমহাদেশকে বার্মা থেকে জাপানি আক্রমণ আংশিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য এ বিমান বন্দর নির্মাণ করা হয়। তারপর থেকে বেসামরিক বিমানবন্দর হিসেবে উক্ত বিমানবন্দর পরিচালিত হয়ে আসছে। রানওয়ে, পার্কিং অ্যাপ্রোন ও অন্যান্য অপ্রতুল সুবিধা নিয়ে বিমানবন্দরটি ছোটো পরিসরে ছিল। টার্মিনালটি ছিল টিনের চালাবিশিষ্ট একতলা একটি ভবন। ফলে সকল প্রকারের সুপরিসর বিমান যাত্রী ও কার্গোসহ পূর্ণ লোডে উড্ডয়ন/অবতরণ করার উপযুক্ত না হওয়ায় এ বিমানবন্দরটি একটি পূর্ণাঙ্গ অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারেনি।

১৯৬১ সাল থেকে পাকিস্তান এয়ারওয়েজ (পিআইএ)-কর্তৃক বিমানবন্দরটিতে এয়ারবাস সার্ভিস চালু করা হয়। পিআইএ ঢাকা সিলেট রুটে এয়ারবাস সার্ভিস চালু করে যা সে সময়ে ছিল খুব জনপ্রিয় এবং পরিপূর্ণভাবে এটি ব্যবহৃত হতো। সপ্তাহের প্রতিদিনই একটি ফ্লাইট ঢাকা থেকে ছেড়ে আসত এবং ঢাকা ফেরত যেত।

সারণি-৮৭

সাপ্তাহিক ফ্লাইট শিডিউল (১৯৬৬)

বার	ঢাকা ছাড়ে	সিলেটে পৌঁছায়	ঢাকা ছাড়ে	সিলেট পৌঁছায়
শনিবার সোমবার বুধবার	১৩:০০	১৩:৪৫	১৪:১৫	১৫:০০
রবিবার মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার শুক্রবার	১৩:০০	১৪:১০	১৪:৩০	১৫:৪০

উৎস : জেলা গেজেটিয়ার, ১৯৭০

ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিমানবন্দরটি ১৯৮০ সাল থেকে ৬০০০ ফুট রানওয়ে, ৩০০ ফুট x ২২৫ ফুট অ্যাপ্রোন ও অন্যান্য সুবিধাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছিল। তবে পিসিএন ছিল ৪০ যা পূর্ণ লোডে এয়ারবাস, ডিসি ১০ ইত্যাদি জাতীয় সুপরিসর বিমান চলাচলের উপযোগী ছিল না। এছাড়া পার্কিং এপ্রোনের শক্তি ও আয়তন, টার্মিনাল ভবনের আয়তন ও সুবিধাদি উপরিউক্ত সুপরিসর বিমানের চলাচল ও বিমানযাত্রী হ্যান্ডলিংয়ের জন্য অপ্রতুল ছিল।

এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই অঞ্চলের প্রবাসী ও দেশীয় জনগণের অবদান, ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়াবলি বিবেচনায় ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে একটি পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তকরণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে, এ বিমানবন্দরের রানওয়ে, পার্কিং অ্যাপ্রোন, টার্মিনাল বিল্ডিং ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে স্বল্পপরিসরে বর্ধিত করে সীমিত লোডে এয়ারবাস উড্ডয়ন/অবতরণ চালু করা হয়। কিন্তু সকল প্রকারের সুপরিসর বিমান যাত্রী ও কার্গোসহ পূর্ণ লোডে উড্ডয়ন/ অবতরণ করার উপযুক্ত না হওয়ায় এ বিমানবন্দরটি একটি পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। এ অবস্থায় ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিদ্যমান রানওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ (পিসিএন ৭০), বর্ধিত রানওয়ে নির্মাণ, নতুন টেক্সিওয়ে ও নতুন এপ্রোনের পিসিএন ৭০-এ উন্নীতকরণ, ডিসি ১০সহ সকল ধরনের সুপরিসর বিমান উড্ডয়ন/অবতরণ এবং লন্ডন ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে সিলেট পর্যন্ত সরাসরি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে একটি হলো ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে সুপরিসর বিমান চলাচল উপযোগীকরণ এবং অন্যটি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবন সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও দ্বিতীয় তলা নির্মাণ প্রকল্প। উক্ত প্রকল্প দুটি ২০০৮

সালে সমাপ্ত হয়। বিমানবন্দরকে সুপরিসর বিমান চলাচল-উপযোগীকরণ কাজে ১০৭৭৯.১০ লাখ টাকা এবং বিমানবন্দরে টার্মিনাল ভবন সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও দ্বিতীয় তলা নির্মাণকাজে ৫৬২৫.০০ লাখ টাকা ব্যয় হয়।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য ১০২৫০ ফুটে উন্নীত হয়েছে। কার্যসমাপ্তির ফলে বিমান বন্দরের রানওয়েতে বর্তমানে সুপরিসর বিমানসমূহের অপারেশনাল কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চালু রয়েছে।

বর্তমানে সপ্তাহে ৪টি রুটে ৮টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট আসে। তা ছাড়া অভ্যন্তরীণ রুটে সপ্তাহে ১৯টি ফ্লাইট আগমন করে এবং ছেড়ে যায়। শুধু বিমান বাংলাদেশ এয়ার ওয়েজের ৪টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট লন্ডন-সিলেট-ঢাকা, ১টি জেদ্দা-সিলেট-ঢাকা, ১টি আবুধাবি-সিলেট-ঢাকা এবং ১টি দোহা-সিলেট-ঢাকা রুটে চলাচল করে। তবে অভ্যন্তরীণ রুটে ৪টি সংস্থার ফ্লাইট চলাচল করে। এগুলো হলো বিমান বাংলাদেশ, ইউএস বাংলা এয়ার ওয়েজ, রিজেন্ট এয়ার ওয়েজ এবং নভো এয়ার ওয়েজ।

সারণি-৮৮

বিমান বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সাপ্তাহিক সূচি

বার	রুট				
শনিবার	দুবাই	-	সিলেট	-	ঢাকা
রবিবার	লন্ডন	-	সিলেট	-	ঢাকা
	আবুধাবি	-	সিলেট	-	ঢাকা
সোমবার	লন্ডন	-	সিলেট	-	ঢাকা
	দোহা	-	সিলেট	-	ঢাকা
বুধবার	লন্ডন	-	সিলেট	-	ঢাকা
বৃহস্পতিবার	জেদ্দা	-	সিলেট	-	ঢাকা
	লন্ডন	-	সিলেট	-	ঢাকা

উৎস : বিমানবন্দর সূত্রে প্রাপ্ত

ঢাকা-সিলেট-ঢাকা রুটে ৪টি বিমান সংস্থার ১টি করে ফ্লাইট চলাচল করে।

সারণি-৮৯

ঢাকা-সিলেট-ঢাকা রুটে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের সাপ্তাহিক সূচি

বার	পরিবহণকারী সংস্থার নাম
শনিবার	বিমান বাংলাদেশ। ইউনাইটেড এয়ার ওয়েজ। রিজেন্ট এয়ার ওয়েজ। নভো এয়ার ওয়েজ।
রবিবার	ইউনাইটেড এয়ার ওয়েজ
সোমবার	রিজেন্ট এয়ার ওয়েজ।ইউনাইটেড এয়ার ওয়েজ। নভো এয়ার ওয়েজ।
মঙ্গলবার	বিমান বাংলাদেশ। ইউনাইটেড এয়ার ওয়েজ। নভো এয়ার ওয়েজ।
বৃহস্পতিবার	রিজেন্ট এয়ার ওয়েজ। ইউনাইটেড এয়ার ওয়েজ ।নভো এয়ার ওয়েজ।
শুক্রবার	বিমান বাংলাদেশ। ইউনাইটেড এয়ার ওয়েজ।

উৎস : বিমানবন্দরসূত্রে প্রাপ্ত।

১৯৬৬ সালে ঢাকা-সিলেট রুটে বিমান ভাড়া ছিল ২৫.০০ রুপি, যা বর্তমানে সর্বনিম্ন ৩,৫০০.০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৬,২৫০.০০ টাকা। ইদানীং প্রাইভেট হেলিকপ্টার সার্ভিস সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের জন্য একটি প্রিয় যোগাযোগমাধ্যম। আকাশপথে দেশের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, বিদেশি ডেলিগেট এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ হেলিকপ্টারযোগে সিলেটে যাতায়াত করে থাকেন। প্রায় ৭-৮টি সংস্থার এই হেলিকপ্টার সার্ভিস পরিচালনা হচ্ছে। এতে ঢাকা-সিলেট-ঢাকা রুটে প্রতি ঘণ্টার জন্য ভাড়া সর্বনিম্ন ২৫,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত। তা ছাড়া প্রতি ঘণ্টা অপেক্ষার জন্যে আরো অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হয়।

কয়েকটি সংস্থা এয়ার অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু করেছে। জরুরিভাবে রোগী পরিবণের জন্য আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের জন্য এ মাধ্যমটির প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। এসব সার্ভিসে লাইফ সাপোর্টের ব্যবস্থা থাকে, প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং নার্সেরও ব্যবস্থা থাকে।

অধ্যায়-৯

শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্য

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে শিল্প এবং ব্যাবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সিলেটের অগ্রগতি হচ্ছে। একসময় শুধু কৃষিই ছিল এই অঞ্চলের জীবিকার অন্যতম মাধ্যম, আর গ্রামাঞ্চলই ছিল এখানকার অর্থনীতির ভিত্তি। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবিকার মাধ্যম যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনি পরিবর্তন ঘটেছে অর্থনৈতিক ভিত্তির শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্যের সম্প্রসারণ মানুষের জীবনযাত্রায় এনেছে পরিবর্তন। এতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে জীবনযাত্রা হয়েছে সহজতর। আকসাদুল আলমের লেখায় তারই প্রমাণ পাওয়া যায় :

মধ্যযুগে সিলেটের মানুষের শিল্প-বাণিজ্যিক জীবনে উত্তরণের পথে কৃষিই ছিল প্রধান প্রেরণা। প্রাচীন কাল থেকেই সিলেটের কৃষিক্ষেত্রের অগ্রগতি বেশ উল্লেখযোগ্য। এই কৃষিই উৎপাদনের ক্ষেত্রে বয়ে আনে উদ্বৃত্ত। অনুমান করা যেতে পারে যে-কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত উৎপাদনই সিলেটে একটি অবকাশ শ্রেণির উদ্ভব ঘটায়, যারা বিভিন্ন কারিগরি পেশায় ও ব্যাবসাবাণিজ্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন।

প্রাচীন কাল থেকেই ব্যাবসাবাণিজ্যের সাথে সিলেট অঞ্চলের মানুষের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ আমলে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাবসাবাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। সেই সময় সিলেট অঞ্চলে বিভিন্ন গঞ্জ, বাজার এবং হাটের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এগুলোর সংখ্যা ও কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। সেই সময়ের আমদানি-রফতানির চিত্র থেকে সিলেটের ব্যাবসাবাণিজ্যের বিপুল প্রবাহের প্রমাণ পাওয়া যায়। সিলেট থেকে বিভিন্ন জেলায় ধান, চাল, তৈলবীজ, চুনাপাথর, বাঁশ, শুঁটকি মাছ, মাদুর, কমলা, আলু প্রভৃতি রফতানি হতো। আর আমদানি হতো লবণ, চিনি, তুলা, তামাক, তৈল প্রভৃতি সামগ্রী। আশফাক হোসেনের ভাষ্যে সেই চিত্র ফুটে উঠেছে :

বিশ শতকের শুরুতে সিলেটের আমদানি রফতানির তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আমদানির চেয়ে রফতানির পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। ১৯০৩-০৪ সালে শুধু শুঁটকি থেকে রফতানি আয় হয়েছিল ২০,০০০ টাকা। মূলত নৌপথে ব্যাবসা বাণিজ্য হতো। নৌপথের পর রেলপথ ও সড়কপথে মালামালের পরিবহণ হতো। ১৯০২-০৩ সালে রেলপথে মোট আমদানি-রফতানির পরিমাণ ছিল ১৮%।

নৌপথে ব্যাবসাবাণিজ্যের কারণে নদী তীরবর্তী অনেক গঞ্জ, বাজার ও হাটের সৃষ্টি হয়। আবার রেল ও সড়কপথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও কিছু বাণিজ্যিক কেন্দ্র

গড়ে ওঠে। গঞ্জ, বাজার ও হাট ছাড়াও চলতি শতকের গোড়ার দিকে সিলেটে ১১টি রাজস্ব অফিস ছিল।

ব্রিটিশ আমলে এই অঞ্চলে ব্যাবসাবাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটলেও সিলেট জেলায় বৃহদায়তন কোনো শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি। উপনিবেশে শিল্প স্থাপনে ব্রিটিশদের অনাগ্রহের কারণেই অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও এ লক্ষ্যে তারা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। উপনিবেশে মূলত নিজেরা উপকৃত হয় না এমন কোনো কিছুতে পৃষ্ঠপোষকতা করার পক্ষপাতী ছিল না ব্রিটিশরা। সিলেটের শিল্প বলতে প্রথমেই যে চা-শিল্পের নাম আসে ব্রিটিশরা সেই চা শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় নিজেদের প্রয়োজনেই।

পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার অন্যান্য স্থানের মতো সিলেটও বৈষম্যের শিকার হয়। ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারাখানা এবং গোটাটিকর বিসিক শিল্প এলাকা গড়ে তোলার উদ্যোগ ছাড়া সিলেটে শিল্পক্ষেত্রে আর কোনো উদ্যোগই নেয়নি পাকিস্তান সরকার। স্বাধীনতার পর সরকারিভাবে এবং ব্যক্তিউদ্যোগে যেসব শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে তা-ও নগণ্য। শিল্পে পশ্চাদপদ এলাকা হিসেবেই সিলেট সারা দেশে পরিচিত। সিলেটের মোট আয়ে শিল্পের অবদান মাত্র ৫.৭ ভাগ।

সরকারি খাতে শিল্প :

ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা

দেশে ক্রমবর্ধমান সারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৪২০ একর জায়গার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রকল্পটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়। বার্ষিক ১ লাখ ৬ হাজার মেট্রিক টন সার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চালু হয় ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা।

১৯৬০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক সিলেটের হরিপুর গ্যাস ফিল্ড থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে ইউরিয়া সার উৎপাদনের লক্ষ্যে জাপানের মেসার্স কোবে স্টিল লিমিটেড ফেঞ্চুগঞ্জে এই সারকারখানাটি স্থাপন করে। এ কারখানার ইকোনমিক লাইফ ছিল ২০ বছর। কিন্তু দীর্ঘদিন কারখানা থেকে নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন হওয়ায় এটি ‘বাংলাদেশ ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসির) মাতৃশিল্প প্রতিষ্ঠান’ উপাধিতে ভূষিত হয়।

নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানায় স্থাপিত যন্ত্রপাতির নিঃশেষিত আয়ুষ্কাল বিবেচনা করে সরকার কারখানাটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সিলেটবাসীর তীব্র আন্দোলনের মুখে ওই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয় সরকারকে। এই সারকারখানার স্থলে নতুন আরেকটি সারকারখানা স্থাপনের

পূর্বপর্যন্ত এটি চালু রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে কারখানার দৈনিক উৎপাদন ১০০ মেট্রিক টন, শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৫৯১ জন।

শাহজালাল সার কারখানা

জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় ৬২ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শাহজালাল সারকারখানা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা। ২০১২ সালের ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সার কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই সার কারখানায় উৎপাদন শুরু হয় ২০15 সালে।

শিল্প মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, শাহজালাল সারকারখানা প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হয়েছে ৫,৪০৯ কোটি টাকা। চীন ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। চীন সরকার ও চীনের এক্সিম ব্যাংক প্রকল্প ব্যয়ের ৭০ শতাংশ অর্থাৎ ৩ হাজার ৯৮৬ কোটি টাকা ঋণসহায়তা প্রদান করে। প্রকল্পের অবশিষ্ট ১ হাজার ৪২৩ কোটি টাকা সরবরাহ করেছে বাংলাদেশ সরকার। যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ডস প্রকল্পটির প্রযুক্তিগত কারিগরি সহায়তা দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন ১ হাজার ৭৬০ টন করে বছরে ৫ লাখ ৮০ হাজার ৮০০ টন ইউরিয়া ও প্রতিদিন ১ হাজার টন হিসেবে বছরে ৩ লাখ ৩০ হাজার টন অ্যামোনিয়া উৎপাদনক্ষমতা রয়েছে কারখানাটির। গ্যাসনির্ভর এই সার কারখানার জন্য প্রতিবছর শূন্য দশমিক ৩৬৩ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাস প্রয়োজন ।

সিলেট টেক্সটাইল মিল

সিলেটে শিল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে সরকার সিলেটে টেক্সটাইল মিল চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ মিলের জমির পরিমাণ ২৮.৮১ একর। ১৯৮৩ সালের জুন মাস থেকে শুরু হয় উৎপাদন। মিলটিতে ২৫০৫৬টি টাকু রয়েছে, এর বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ১৮.৬২ লাখ কেজি সুতা (দৈনিক প্রায় ১২০০০ পাউন্ড সুতা)। মিলটিতে বিভিন্ন কাউন্টের সুতা তৈরি হতো। ফ্যাক্টরি শেডের আয়তন ১৩৮০০০ বর্গফুট।

অব্যাহত লোকসানের কারণে তৎকালীন সরকার কর্তৃক মিলটি ১৯৯১ সালে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর টেক্সটাইল মিলটি পুনরায় চালু হয়। ২০০১ সালে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের সাথে সাথে আবারো মিলটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর শ্রমিকদের বেতনও বকেয়া পড়তে থাকে। ২০০৩ সালের ৩০ জুন রগণ্ শিল্প বিবেচনায় মিলটিতে লে অফ ঘোষিত হয়। মিলের মোট দৃশ্যমান সম্পদের মূল্য ২৬৬ কোটি ১৩ লাখ ২৬ হাজার টাকা ধার্য করে বেসরকারিকরণের জন্য মিলটি প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে।

বেসরকারি খাতে শিল্প :

বিসিক শিল্প এলাকা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন (বিসিক) সিলেটের আওতায় সিলেটে দুটি শিল্প নগরী রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ১. বিসিক শিল্প নগরী গোটাটিকর, ২. বিসিক শিল্পনগরী খাদিমনগর।

গোটাটিকর বিসিক সুরমা নদীর দক্ষিণ কোল ঘেঁষে সিলেট-জকিগঞ্জ সড়কের গোটাটিকর এলাকায় ২৪ দশমিক ৮৯ একর জমিতে গড়ে উঠেছে গোটাটিকর বিসিক শিল্পনগরী। জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, ড্রেন ও অবকাঠামো উন্নয়নের পর ১৯৬৯ সালে বিসিক যাত্রা শুরু করে। সব মিলিয়ে খরচ হয় ৪৯ লাখ ৩৯ হাজার টাকা। বর্তমানে বরাদ্দকৃত ১৩৪টি প্লটে ৬২টি ইউনিট চালু রয়েছে। মূলত খাদ্য ও খাদ্যজাত খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোই টিকিয়ে রেখেছে গোটাটিকর বিসিককে। একসময় প্রতিযোগিতা করে ১৭টি টেক্সটাইল মিল গড়ে উঠলেও বর্তমানে এগুলোর অস্তিত্ব নেই। টেক্সটাইল মিল বন্ধের কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্টরা কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত অদক্ষতা, চলতি মূলধনের অভাব ও মূলধন প্রদানে ব্যাংকের অনীহা, কাঁচামালের পরিবহণ ব্যয় বেড়ে যাওয়া, যন্ত্রপাতি মেরামতে স্থানীয় ব্যবস্থা না থাকা এবং দক্ষ কারিগরের অভাব। এক সময়ে ১০ থেকে ১২ হাজার শ্রমিক কর্মরত থাকলেও বর্তমানে এখানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ২০১২ জন।

এদিকে, বিগত ৩ বছরে সিলেট জেলায় বিসিকের সহায়তায় ১০২টি ক্ষুদ্র শিল্প এবং ৮৭টি শিল্প স্থাপিত হয়েছে। এতে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২৫০.৫০ লাখ টাকা। এর ফলে ১৬৮০ জন মানুষের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

বিসিক শিল্প এলাকা, গোটাটিকর

১.	শিল্পনগরীর নাম ও ঠিকানা	বিসিক শিল্প নগরী গোটাটিকর ডাকঘর-কদমতলী উপজেলা, দক্ষিণ সুরমা জেলা; সিলেট।
২.	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	০৮ ডিসেম্বর ১৯৬২; সংশোধিত ১৮ এপ্রিল ১৯৭২
৩.	প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয়	৪৯.৩৯ লাখ টাকা
৪.	প্রকল্পের কাজ শুরুর তারিখ	১৯৬৪
৫.	প্রকল্পের নির্মাণকাজ সমাপ্তির তারিখ	৩০ জুন ১৯৭৮;
৬.	প্রকল্পের মোট জমির পরিমাণ	২৪.৮৯ একর;
৭.	শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত জমির পরিমাণ	১৯.৯০ একর;
৮.	প্রকল্পের মোট প্লট সংখ্যা	১৩৭টি;
৯.	বরাদ্দযোগ্য প্লট সংখ্যা	১৩৪টি;

১০.	বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা	১৩৪টি;
১১.	বরাদ্দকৃত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৭৩টি;
১২.	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	খাদ্য ৩২; প্রকৌশল ১৭; বস্ত্র ০২; পেপার প্রিন্টিং প্যাকেজিং ০৩;কেমিক্যাল ০৩; বিবিধ ০৩ = মোট ৬২টি
১৩.	নির্মাণাধীন শিল্প ইউনিট সংখ্যা	০১টি;
১৪.	উৎপাদনরত শিল্পকারখানার মোট বিনিয়োগ	৪৯৫০.৪৫ লাখ টাকা;
১৫.	বর্তমানে কর্মরত মোট জনবল	২০১২ জন (পুরুষ ১৩৫৭ ও মহিলা ৬৫৫);
১৬.	বর্তমানে উৎপাদিত পণ্যের বার্ষিক গড় মূল্য	১০৭২৫.৭৫ লাখ টাকা

সূত্র: ডিজিএম, গোটাটিকর বিসিক, সিলেট

খাদিমনগর বিসিক

১৯৮৯ সালে যাত্রা শুরু করে খাদিমনগর বিসিক। সিলেট-তামাবিল সড়কের পাশে ২৭.৭৫ একর জমিতে এর অবস্থান। পূর্ণ শিল্পনগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৬৩ লাখ ৫৮ হাজার টাকা। খাদিমনগর বিসিকে বরাদ্দকৃত ১১৯টি প্লটে ৭৬টি শিল্প ইউনিট গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে চালু রয়েছে ৬৫টি। উৎপাদন উপযোগী আছে ৫টি। খাদিমনগর বিসিক এ উদ্যোক্তারা প্রায় ৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন।

খাদিমনগর বিসিকে প্রায় ১৭০০ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গোটাটিকরের মতো খাদিমনগরেও খাদ্যজাত শিল্প ইউনিটের সংখ্যা বেশি। এর পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের যন্ত্রাংশ, বিদেশে রফতানিযোগ্য কুকিং বার্নার, কাঠ ও মেলামাইনের উপকরণ এবং ইলেকট্রিক ক্যাবল তৈরির প্রকৌশল শিল্পও গড়ে উঠেছে। ওষুধ, ফোম ও সাবান শিল্প ইউনিটও রয়েছে। এখানে ৩টি টেক্সটাইল শিল্প স্থাপন হলেও বর্তমানে চালু রয়েছে ১টি।

বিসিক শিল্প এলাকা খাদিমনগর

১.	শিল্পনগরীর নাম ও ঠিকানা	বিসিক শিল্পনগরী খাদিমনগর, ডাকঘর-খাদিমনগর, উপজেলা: সিলেট সদর জেলা: সিলেট;
২.	প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের তারিখ	২৩ সেপটেম্বর ১৯৮৯;
৩.	মোট জমির পরিমাণ	২৭.৭৫ একর;
৪.	শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত জমির পরিমাণ	১৯.১৬ একর;
৫.	প্রকল্পের মোট প্লট সংখ্যা	১২২টি;

১.	শিল্পনগরীর নাম ও ঠিকানা	বিসিক শিল্পনগরী খাদিমনগর, ডাকঘর-খাদিমনগর, উপজেলা: সিলেট সদর জেলা: সিলেট;
৬.	বরাদ্দযোগ্য প্লট সংখ্যা	১১৯টি;
৭.	বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা	১১৭টি;
৮.	অনুমোদিত শিল্প ইউনিট	৭৬টি;
৯.	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	খাদ্য ২৫; প্রকৌশল ১৪; বস্ত্র ০৫; পেপার প্রিন্টিং প্যাকেজিং ০২; কেমিক্যাল ০৫; লেদার ও রাবার ০২; মেলামাইন বোর্ড ফার্নিচার ০২; প্লাস্টিক ০২ বনজাত ০৩; ওয়েস্টেজ পেপার বোর্ড ০১; বিভিন্ন সরকারি অফিস ০৩ বিবিধ ০১; = মোট ৬৫টি
১০.	নির্মাণাধীন শিল্প ইউনিট সংখ্যা	০৩টি
১১.	উৎপাদনরত শিল্পকারখানার মোট বিনিয়োগ	১১৯৪৩.৬০ লাখ টাকা;
১২.	বর্তমানে কর্মরত মোট জনবল	৪৩৪২ জন (পুরুষ ৪০৩৪, মহিলা ৩০৮)
১৩.	বর্তমানে উৎপাদিত পণ্যের বার্ষিক গড় মূল্য	১৪৩২৩.৫৮ লাখ টাকা

সূত্র: ডিজিএম, খাদিম বিসিক, সিলেট

মণিপুরি তাঁত শিল্প সিলেট বলতেই যে কয়েকটি বিষয় সবার আগে চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তার অন্যতম মণিপুরি তাঁত শিল্প। দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশে এর চাহিদা ও খ্যাতি ছড়িয়েছে অনেক আগেই। সিলেট নগরীর মাছিমপুর, লালদিঘির পাড়, লামাবাজার, জল্লারপাড়, মির্জাজাঙ্গাল, বাগবাড়ি, সাগরদিঘির পাড়, সুবিদবাজার, মিরের ময়দান, আম্বরখানা, কুশিঘাট, গোয়াইপাড়া, খাদিমনগর, গঞ্জানগর এলাকায় বসবাসরত মণিপুরি সম্প্রদায়ের মহিলারা এই শিল্পের সাথে জড়িত। তাদের নিপুণ হাতে তৈরি বৈচিত্র্যময় নকশাখচিত মণিপুরি বস্ত্র দেশের পাশাপাশি বিদেশেও সমাদৃত। ২০০৪ সালে জার্মানি ও ইতালিতে এবং ২০০৭ সালে দুবাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় মণিপুরি তাঁতবস্ত্র ব্যাপক সাড়া জাগায়।

এসব দোকানে মণিপুরিদের তৈরি শাড়ি, চাদর, বিছানার চাদর, গামছা, মাফলার, ওড়না, থ্রিপিস, ব্যাগ, টেবিল ক্লথ পাওয়া যায়। এসব পণ্যের আলাদা বিশেষত্ব রয়েছে। নান্দনিক তাঁতের পণ্য বিদেশেও রফতানি হচ্ছে। এ থেকে আয় হচ্ছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

চা শিল্প চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ও রফতানি পণ্য। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে প্রতিবছর ৫ মিলিয়ন কেজি চা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি হচ্ছে। আর এ থেকে আয় হচ্ছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

বাংলাদেশে চা চাষ শুরু হয় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। ১৮৫৭ সালে সিলেটের মালনীছড়ায় দেশের প্রথম চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশের প্রধানত দুটি অঞ্চলে চায়ের ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে; একটি সুরমা ভ্যালিস্থ বৃহত্তর সিলেট এলাকা ও অন্যটি হালদা ভ্যালির চট্টগ্রাম এলাকা। তবে দেশের অধিকাংশ চা-বাগানই সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত। এর মধ্যে সিলেট জেলায় রয়েছে ২০টি চা-বাগান। জেলার ২৯৫৭৩.৪০ একর জমিতে চা চাষ হচ্ছে।

১৮৪০ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষে পূর্ববাংলার চট্টগ্রামে প্রথম চা আবাদের উদ্যোগে নেওয়া হয়। চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর মি. স্কন কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে সংগৃহীত চীনা চায়ের চারা লাগিয়ে এটি চাষের চেষ্টা করেন। মি. হুগ ব্যক্তিগতভাবে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে কোদালায় বাগান তৈরি করে চা আবাদ শুরু করেন। ১৮৪৩ সালে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে এই পাতা থেকে চা তৈরি করা হয়। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে সর্বপ্রথম চা-বাগান প্রতিষ্ঠা ও চা উৎপাদন শুরু হয় ১৮৫৭ সালে সিলেটের মালনীছড়ায়। ১৮৬০ সালে মৌলভীবাজার জেলার মিরতিঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলার লালচান্দ এলাকায় চা-বাগান প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদন শুরু হয়।[১০]

চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দ্রুত বদলে যেতে থাকে এ অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থা। এ শিল্পের বিকাশ অব্যাহত রাখতে বহু সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ওই সময় ভারতের আসাম, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বহুসংখ্যক চা-শ্রমিককে এখানে নিয়ে আসে। যাদের ভূমিসহ নানা সুযোগসুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ব্রিটিশরা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। মূলত অল্প দামে তাদের শ্রম কিনে নেওয়াই ছিল ব্রিটিশ বেনিয়াদের মূল পরিকল্পনা। তবে, সময়ের সাথে বদলে গেছে দৃশ্যপট। চা-শ্রমিকদের জীবন মানের যেমন উন্নতি হয়েছে, তেমনি তাদের বদৌলতে এই শিল্প হয়েছে সমৃদ্ধ।

২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী সিলেট জেলায় চা-চাষের অধীন জমি ও উৎপাদনের বিবরণ সারণিতে দেওয়া গেল।

সারণি-৯০

সিলেটে চা-উৎপাদন (হেক্টরে)

ক্র. নং	বাগানের নাম	মোট বরাদ্দকৃত ভূমি (হেক্টর)	চাষের অধীন ভূমি (হেক্টর)	উৎপাদন (কেজি)
১.	আফিফানগর	৪৬৮.০৭	১৫৬.৫৪	১৭৯৩০৪
২.	আলী বাহার	২৭৬.৬০	১৮৮.৬০	১০২০৪৫
৩.	বারজান	১৩২৯.২৯	৭০০.১৮	৮০৪০০০
৪.	ডলু ছড়া	১৩১.৭৯	৬৫.৭৫	১৫০৫৪
৫.	হাবিবনগর	৬৪১.০৩	৩২৩.৫৭	৪৫৮৩১৫

ক্র. নং	বাগানের নাম	মোট বরাদ্দকৃত ভূমি (হেক্টর)	চাষের অধীন ভূমি (হেক্টর)	উৎপাদন (কেজি)
৬.	জাফলং	৮৭৫.৭৮	৩২৮.৫৪	৩০৮০৬৭
৭.	খাদিম	১৪৬৯.৪৭	৬৫৮.৮০	৫৩১৬৭০
৮.	খান টি এস্টেট	৬৩৮.৭২	৩০৬.৮১	৪১৭৮৯
৯.	লাক্কাতুরা	১২৭৪.৭০	৬১৬.৬৩	৫২৯৪০০
১০.	লালাখাল	৪৮৩.৯৫	২২৯.৩৩	১৯৬৬১৪
১১.	মালনীছড়া	১০০৮.৫২	৫৪৮.৬৯	৭৮৬৬০০
১২.	মণিপুর	৬৬৬.১১	৪১১.৯৬	৩৮৯১২০
১৩.	মোমিনছড়া	৩৯৯.২৪	২৮২.৯০	৩৫৬৮৮২
১৪.	শ্রীপুর	৪১৪.৮১	১১৪.৩১	১০৩০০৯
১৫.	স্টার (তারাপুর)	১৩৭.১১	৭৫.৩৮	৬৯৯৯৮
১৬.	দাদনগর	বর্তমানে পরিত্যক্ত		
১৭.	ডলিয়া	১৭৪.৭৮	১০১.২৭	১৮৮৬০
১৮.	দোনা	বর্তমানে পরিত্যক্ত		
১৯.	ফতেহপুর	২১১.০৪	১১৪.৫০	২৯৬১০
২০.	লুভা ছড়া	৭৪৪.৫৪	২৭৪.২৪	১৫১৯২৯
		১১৩৪৫.৫৫	৫২২৩.৭৬	৫০,৭২,২৬৬

সূত্র : ২০১৫ সালে সিলেট জেলায় ৫০৭২.২৭ মেট্রিক টন চা উৎপাদিত হয় (প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট, বাংলাদেশ চা বোর্ড, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার)।

চা-বাগানগুলোর নামে বরাদ্দকৃত জমির অর্ধেকেরও কম জমি চা-চাষে ব্যবহৃত হচ্ছে। চায়ের উৎপাদনশীলতাও কম। ২০১০-১১ সালে চা-চাষের অধীনে জমির পরিমাণ ছিল ২১১৪৭ একর এবং উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ ছিল ৪৮৩৭ মেট্রিক টন।

বর্তমানে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিদেশ থেকেও চা আমদানি শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় চা-বাগানগুলোর ব্যবস্থাপনা উন্নত করে উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত চায়ের গুণগত মানোন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া না হলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী চা-শিল্প সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে।

পাথর শিল্প দেশের নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত পাথর ও বালুর সিংহভাগই সিলেট থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সিলেট জেলার ৫টি পাথর কোয়ারি রয়েছে। এই কোয়ারিগুলো থেকে উত্তোলিত পাথর ভাঙা শিল্পের সাথে লক্ষাধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। কোয়ারি থেকে উত্তোলিত পাথর ভেঙে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়। দেশের নির্মাণশিল্পে ব্যবহৃত পাথর ও বালুর সিংহভাগই সিলেট অঞ্চল থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কোয়ারিগুলো থেকে প্রতিদিন কয়েক কোটি টাকার পাথর ও বালি উত্তোলিত হয়ে থাকে।

দেশের বৃহত্তম পাথর কোয়ারি ভোলাগঞ্জের ধলাই নদী থেকে পাথর উত্তোলনে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। তা ছাড়া জাফলং কোয়ারির পিয়াইন ও ডাউকি (জাফলং নদী) নদীতে ২৫ হাজার, শ্রীপুর কোয়ারিতে ১৫ হাজার, রাংপানি কোয়ারিতে ৫ হাজার ও বিছনাকান্দি কোয়ারির বগাইনদীতে (বিছনাকান্দি নদী) প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক প্রতিদিন পাথর উত্তোলন করে জীবিকা নির্বাহ করছে। সারি ও বড়োগাং মহাল থেকে বালু উত্তোলন করে আরো প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিক।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য

'সেভেন সিস্টার' হিসেবে পরিচিত ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। সিলেট জেলার ৩টি শুল্ক স্টেশন দিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক পণ্যসামগ্রী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রফতানি হচ্ছে। ভারতের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সিলেটের সীমান্তবর্তী ভারতের আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মণিপুর ও অরুণাচল রাজ্য 'সেভেন সিস্টার' নামে পরিচিত। ভারতের রাজধানী দিল্লির সাথে দূরত্ব বেশি ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এ সাতটি রাজ্যের ব্যাবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন রকমের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আমদানি করে থাকেন। বাংলাদেশ থেকে আমদানিতে পরিবহণ খরচ কম পড়ায় 'সেভেন সিস্টার'-এর বাজার অনেকটা বাংলাদেশি পণ্যনির্ভর। সিলেটের শেওলা, জকিগঞ্জ, তামাবিল শুল্ক-স্টেশন দিয়ে 'সেভেন সিস্টার' এ বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রী রফতানি হয়। উল্লেখযোগ্য রফতানি পণ্য হচ্ছে- সিমেন্ট, তুলা, প্লাস্টিক সামগ্রী, ইলিশ মাছ, পাঙ্গাস মাছ, চিনামাটির আসবাব, ড্রাইসেল ব্যাটারি, তৈরি পোশাক, ভাঙা পাথর, ইট, প্লাস্টিক সিট অব পলিমার, প্লাস্টিকের জুতা, মশারির কাপড়, প্রাণ কোম্পানির বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য, মেলামাইন সামগ্রী, চিটাগুড়, সিনথেটিক ফাইবার, কটন ওয়াস্ট, ক্রচেট ফেব্রিক্স, শুঁটকি, টিউবওয়েল, ফার্নিচারসামগ্রী প্রভৃতি।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো সূত্রে জানা যায়, ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে ভারতে 'সেভেন সিস্টার'-এ ৪৮ লাখ ৯২ হাজার ৩৭৮ মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রফতানি হয়। বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ প্রায় সোয়া ৩৪ কোটি টাকা। পরের বছর ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে এ পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৭৯ লাখ ৪ হাজার ৬৬১ মার্কিন ডলার অর্থাৎ প্রায় ৫৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকায়। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে 'সেভেন সিস্টার' এ রফতানি হয় ৮১ লাখ ৫ হাজার ৯৬০ মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য, বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ প্রায় ৫৬ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। তবে গত ২০১০-১১ অর্থবছরে ভারতের 'সেভেন সিস্টার'-এ কমে আসে রফতানির পরিমাণ। গতবছরে ২৬ লাখ ২৭ হাজার ৭৪৪ মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রফতানি হয়, বাংলাদেশি টাকায় যা প্রায় ১৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা।

অন্যদিকে, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাড়ছে সিলেট থেকে যুক্তরাজ্যে পণ্য রফতানির পরিমাণ। সিলেট থেকে যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন জাতের মৌসুমি ফল, হিমায়িত মাছ, লাউ, কচুর লতি, বিভিন্ন ধরনের শাক, তেঁতুল, নারকেল, স্টিল বক্স, বিস্কুট, সেমাই, প্লাস্টিক কনটেইনার, চানাচুর প্রভৃতি রফতানি হয়ে থাকে। ২০১০-১১ অর্থবছরে সিলেট থেকে যুক্তরাজ্যে ৮০ কোটি ৮৬ লাখ ৬৫ হাজার ৯৯০ টাকার পণ্য রফতানি হয়। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে রফতানি হয় ৬ লাখ ৮ হাজার ৪শ'৪৭ পাউন্ড মূল্যের পণ্য, বাংলাদেশি টাকায় যার মূল্য দাঁড়ায় ৭ কোটি ৩৬ লাখ ২২ হাজার ৮৭ টাকা। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে যুক্তরাজ্যে রফতানি হয় ৬ লাখ ৪ হাজার ৪৩৬ পাউন্ড মূল্যের পণ্য, বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ ৭ কোটি ৩১ লাখ ৩৬ হাজার ৭৫৬ টাকা।

সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এসসিসিআই) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত একটি অলাভজনক বাণিজ্য সংগঠন। সিলেট জেলার ব্যাবসায়ীদের শীর্ষসংগঠন হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৬ সাল থেকে ব্যাবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, ব্যাবসাবাণিজ্যের উন্নয়ন, সরকারের সাথে ব্যাবসায়ীদের সমন্বয় সাধনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রেখে আসছে। সিলেট চেম্বার বাংলাদেশের ব্যাবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংগঠন দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর তালিকাভুক্ত 'এ' ক্লাস চেম্বার।

সিলেট মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

২০১৩ সালে সিলেট মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যাত্রা শুরু করে। নগরীর বিশিষ্ট ব্যাবসায়ীদের অনেকেই এই সংগঠনের সদস্য। এতে অ্যাসোসিয়েট মেম্বার, অর্ডিনারি মেম্বার, ট্রেড গ্রুপ মেম্বার, টাউন অ্যাসোসিয়েশন মেম্বার এই চার ধরনের সদস্য রয়েছে। বর্তমানে ব্যাবসায়ীদের এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৭০ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ২১।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

সিলেটের ১২টি উপজেলার মধ্যে কেবল গোলাপগঞ্জ উপজেলাতেই চেম্বার রয়েছে, যার প্রতিষ্ঠা ২০১০ সালে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫০, এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ১১ জন। শামীম আহমেদ রাসেল এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। চেম্বারটি গোলাপগঞ্জের ব্যাবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে।

পর্যটন শিল্প

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সিলেট বিভাগ প্রকৃতির লীলানিকেতন। এ জনপদের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রকৃতির অফুরান সম্ভার, নয়নাভিরাম দৃশ্য, পাহাড়ি ঝরনার কলতান, আঁকাবাঁকা নদী, বিস্তীর্ণ হাওর, সবুজ সুউচ্চ টিলাভূমি, দেশি বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। সারি সারি চা গাছ, রাবার বাগান আর সুদৃশ্য দৃষ্টিনন্দন বৃক্ষরাজি পর্যটকদের সহজেই আকৃষ্ট করে। সবুজ প্রকৃতির স্বপ্নীল ভুবনে হারিয়ে যেতে সৌন্দর্যপিপাসুরা ছুটে আসেন সিলেটে। বহুকাল থেকে সিলেটের এ নয়নভুলানো, প্রাণজুড়ানো দৃশ্যরাজি ও সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ দেশি

বিদেশি বহু বেনিয়া ও ব্যাবসায়ীকে সিলেটে আগমন ও স্থায়ীভাবে বসবাসে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন পরিপূর্ণ ভান্ডার বাংলাদেশের কম জায়গাতেই আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেটের রূপসুষমায় মুগ্ধ হয়ে এর নাম দিয়েছিলেন 'শ্রীভূমি'।

বিকাশমান একটি শিল্পের নাম পর্যটন। এই শিল্পের বদৌলতে সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হচ্ছে। সিলেটের উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্পটগুলো হচ্ছে, জাফলং, খাদিম উদ্যান, রাতারগুল, ড্রিমল্যান্ড পার্ক, লোভাছড়া, এমসি কলেজ, শ্রীচৈতন্যের বাড়ি, নাজিমগড়, পাংথুমাই, ভোলাগঞ্জ, ওসমানী জাদুঘর, মিউজিয়ামস অব রাজাস, হজরত শাহজালাল (র.) মাজার, হজরত শাহপরান (র.) মাজার, হাকালুকি হাওর, লালাখাল, অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ড, জাকারিয়া সিটি, মণিপুরি রাজবাড়ি, ওসমানী শিশু পার্ক, পর্যটন পার্ক, শ্রীপুর পার্ক, জৈন্তাপুর রাজবাড়ি প্রভৃতি।

আবাসন শিল্প

সিলেটের দ্রুত বিকাশমান একটি শিল্পের নাম আবাসন শিল্প। ১৯৯০ সালের শুরুতে সিলেটে আবাসন ব্যাবসার বিস্তার ঘটে। ২০০০ সাল থেকে সিলেট অঞ্চলের আবাসন সংকট পূরণে গড়ে ওঠে একের পর এক আবাসিক প্রকল্প। প্রবাসীরা দেশে নাড়ির টানে একখন্ড ভূমি ক্রয়ে হাউজিং প্রকল্পের দিকে ঝুঁকে পড়েন। পাশাপাশি মাসিক কিস্তিতে প্লট ক্রয়ের সুযোগে ব্যাংকার, শিক্ষক, ডাক্তার, চাকরিজীবীসহ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষও বিনিয়োগে এগিয়ে আসেন। ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশি ও প্রবাসী বিনিয়োগে আবাসন সেক্টরে ছিল রমরমা অবস্থা।

সিলেট অ্যাপার্টমেন্ট অ্যান্ড রিয়েল এস্টেট গ্রুপ (সারেগ) সূত্রে জানা যায়, সিলেটে ছোটো-বড়ো মিলিয়ে বর্তমানে দেড়শতাধিক আবাসন প্রকল্প রয়েছে। তবে সংগঠনের সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প রয়েছে ৭০টি। এখানে আবাসনখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা, যার ৭৫ শতাংশই প্রবাসী বিনিয়োগ। এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ।

অন্যান্য শিল্প

উল্লিখিত শিল্প ছাড়াও অনেক ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প সিলেটের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রেখেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সিরামিক, ইটভাটা, ব্রেড ও বিস্কুট এবং মিষ্টান্ন শিল্প।

সিলেটে উৎপাদিত ইট দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি ভারতেও রফতানি হচ্ছে। সিলেট জেলায় মোট ১০৪টি ইটভাটা রয়েছে। তার মধ্যে বালাগঞ্জে ১২টি, বিয়ানীবাজারে ৮টি, বিশ্বনাথে ৬টি, কোম্পানীগঞ্জে ১টি, দক্ষিণ সুরমায় ২২টি, ফেঞ্চুগঞ্জে ৬টি, গোলাপগঞ্জে ১৩টি, গোয়াইনঘাটে ৬টি, জৈন্তাপুরে ১টি, কানাইঘাটে ৩টি, সিলেট সদর উপজেলায় ২১টি, জকিগঞ্জে ৫টি রয়েছে।

ব্রেড ও বিস্কুট এবং মিষ্টান্ন শিল্পেও সিলেট বেশ অগ্রসর। এখানকার উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে বনফুল অ্যান্ড কো., স্বাদ, মধুবন, ফুলকলি, রসমেলা, ফিজা অ্যান্ড কো., পুষ্টি ফুডস, মঞ্জিল ফুড, রাজমহল, মোহনলাল, মধুমিতা এবং চেরীফুড। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জড়িত রয়েছে কয়েক হাজার মানুষ।

বিনিয়োগ বিকাশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগের মধ্যে একটি হলো বিনিয়োগ বিকাশ। সিলেট জেলার স্থানীয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রতিটি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রোথ সেন্টার সৃজনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নতুন আইডিয়া উদ্ভাবন ও তার বাস্তবায়নে স্থানীয় দক্ষ উদ্যোক্ত শ্রেণি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও বিকাশে অবদান রাখার জন্য সিলেট জেলার সংশ্লিষ্ট স্টেক-হোল্ডারদের নিয়ে সভা করা হয়েছে।

সিলেট জেলায় কার্যরত ব্যাংকসমূহ সিলেট জেলায় কার্যরত ব্যাংকের সংখ্যা ৩৯। প্রধান প্রধান সব ব্যাংকের শাখা আছে সিলেটে। বিভাগীয় শহর থেকে শুরু করে উপজেলা সদর এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে এসব ব্যাংকের শাখা রয়েছে মোট ২৬৯টি। এসব ব্যাংকে মোট জমাকৃত টাকার পরিমাণ ২৬৪১৯.৪২ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ৪৭৭২.৭৬ কোটি টাকা। মাত্র ১৮ শতাংশ (১৮.০৬৫%) ঋণ প্রদান করা হয়েছে। বাকি ৮২% ভাগ টাকার উল্লেখযোগ্য অংশ অন্য অঞ্চলের কাজে লেগেছে কিংবা অলস অবস্থায় পড়ে আছে। অথচ এই বিপুল পরিমাণ অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োজিত হলে সিলেটের অর্থনীতির চাকা যেমন গতিশীল হতো তেমনি সৃষ্টি হতো অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান।

চিত্র : ৫

Number of Establishments by Type

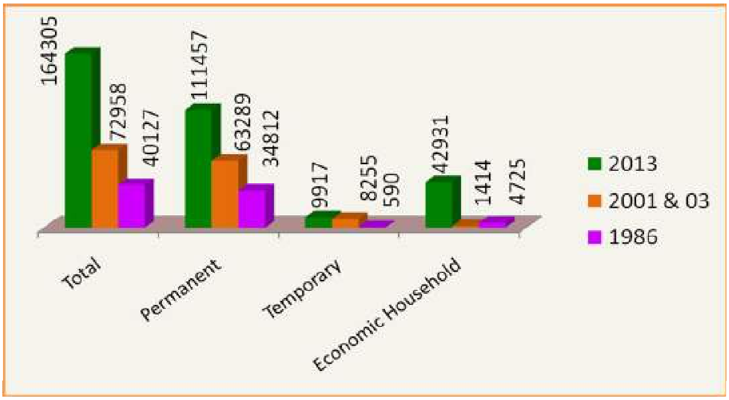

Source : Economic Census 2013, BBS

চিত্র ৫-এ দেখা যায় মোট অর্থনৈতিক ইউনিট বা Total Establishments ১৯৮৬ সালে ছিল ৪০১২৭ টি যা ২০১৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৪৩০৫ টি তে এবং

চিত্র ৬-এ কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত জনসংখ্যা ১৯৮৬ সালে ১১০৮১১ জন এবং ২০১৩ সালে যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৩৫৩৪ জনে দাঁড়ায়। চিত্র ৭-এ দেখা যায় কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩ সালে মোট কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত জনসংখ্যা'র ১১.৮০% ছিল মহিলা যা ২০০১ এবং ২০০৩ সালে মাত্র ৪.৫৬% ছিল। অর্থনীতির গতি ত্বরান্বিত করতে হলে অর্থনৈতিক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

চিত্র: ৬

Total Persons Engaged (TPE) by Type of Establishments

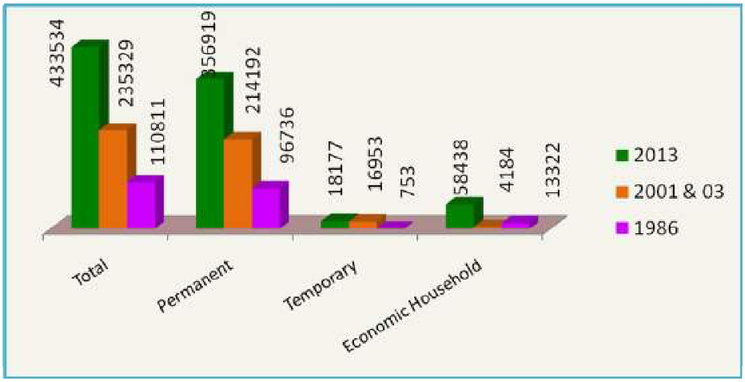

Source : Economic Census 2013, BBS

চিত্র : ৭

Total Persons Engaged (TPE) by Sex

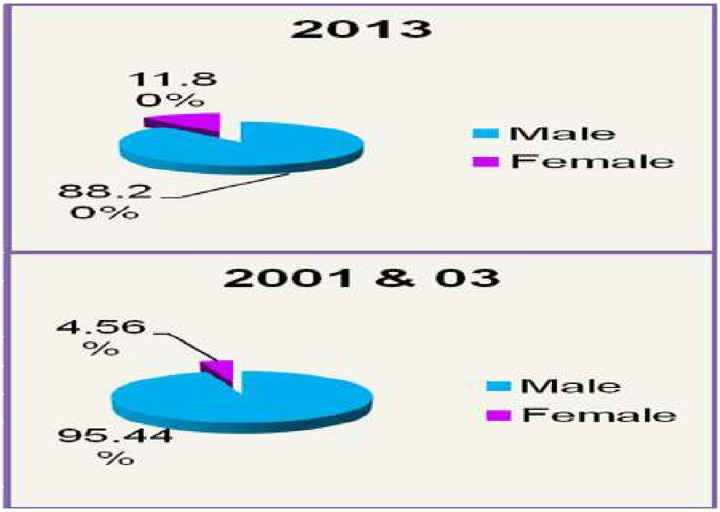

Source : Economic Census 2013, BBS

সারণি-৯১

Establishments and TPE by Major Economic Activities, 2013

Major Economic Activities	Establishments		Total Persons Engaged	
	Number	%	Number	%
Total	164305	100	433534	100
Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles....	83320	50.71	176316	40.67
Manufacturing	13006	7.92	59942	13.83
Accommodation and Food Service Activities	8196	4.99	22255	5.13
Transportation and Storage	20384	12.41	27394	6.32
Education	4029	2.45	31542	7.28
Human Health and Social Work Activities	1413	0.86	7572	1.75
All Other Economic Activities	33957	20.66	108513	25.02

Source : Economic Census 2013, BBS

সারণি ১৯ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সিলেট জেলার মোট অর্থনৈতিক ইউনিট এর ৫০.৭১ % Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles.... এই গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত যেখানে মোট কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত জনসংখ্যা’র ৪০.৬৭% নিয়োজিত।

চিত্র : ৮

Establishments by Inception Period, 2013

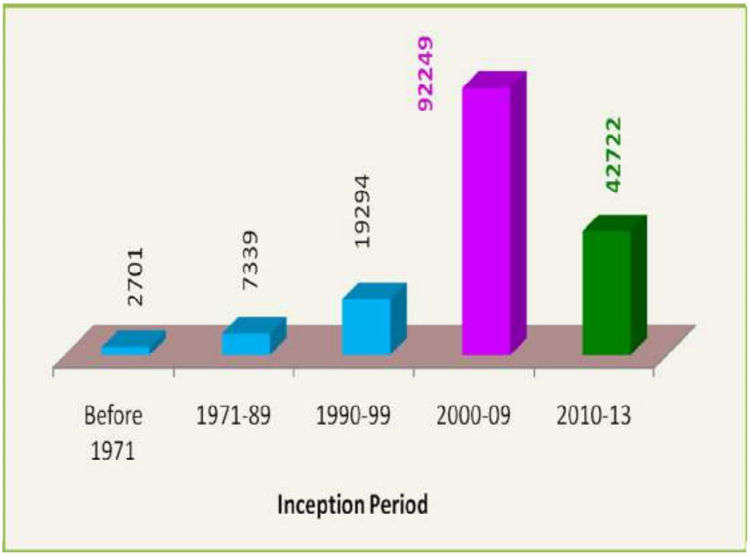

Source : Economic Census 2013, BBS

চিত্র ৮ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে ১৯৯০ সালের পূর্ব পর্যন্ত সিলেট জেলায় কর্মকাণ্ডে অনেকটা স্থবির ছিল। ১৯৯০'র দশকে অর্থনৈতিক ইউনিট ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে যা ২০০০ সালের পর থেকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০১০-২০১৩ সময়ে সিলেট জেলায় কৃষিবহির্ভূত মোট ৪২৭২২টি নতুন অর্থনৈতিক ইউনিট সৃষ্টি হয়।

সারণি-৯২

Establishments and TPE by Upazila, 2013

Upazila	Establishments	TPE
Balaganj	13400	30265
Beani Bazar	9397	20874
Bishwanath	11847	22584
Companiganj	12938	40057
Dakshin Surma	8271	21208
Fenchuganj	3427	10868
Golapganj	12518	30998

Upazila	Establishments	TPE
Gowainghat	11655	36527
Jaintiapur	5828	18788
Kanaighat	15176	27747
Sylhet Sadar	49123	151078
Zakiganj	10725	22540
Total	164305	433534

Source : Economic Census 2013, BBS

চিত্র : ৯

Percentage of Establishments by Upazila, 2013

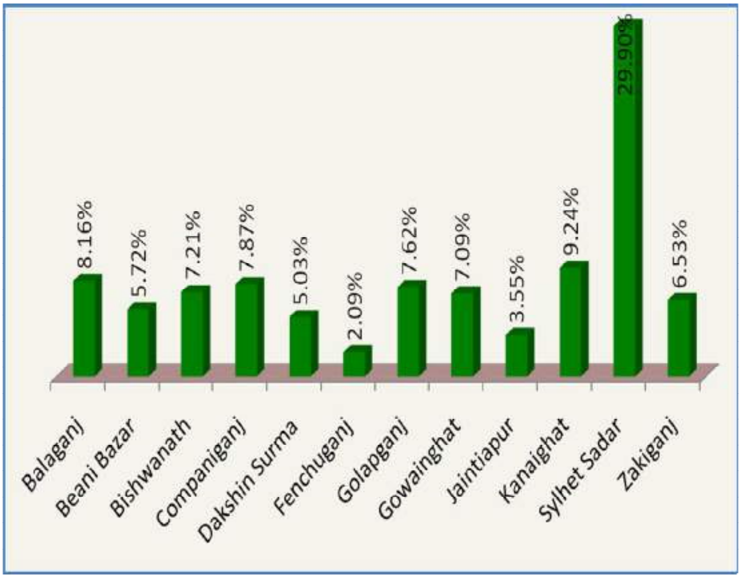

Source : Economic Census 2013, BBS

চিত্র : ১২

Shares of Establishments by Location

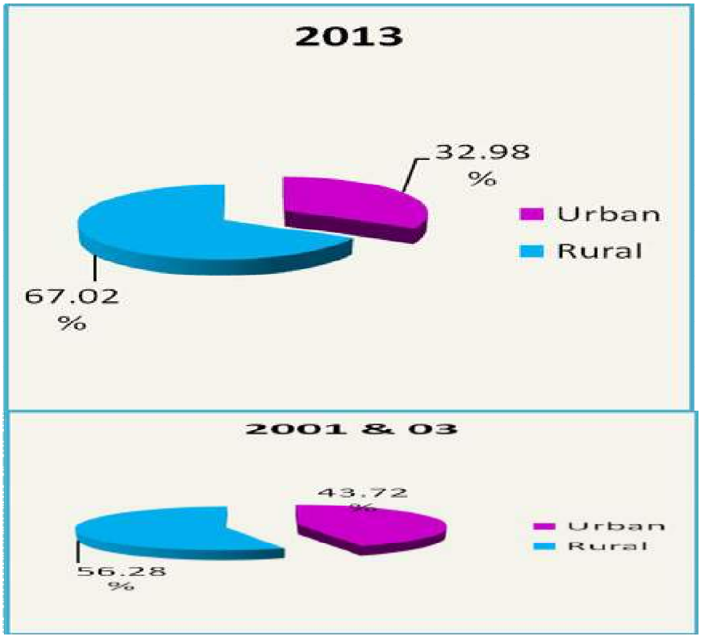

Urban - 54185 Rural - 110120	Urban - 31897 Rural - 41061

Source : Economic Census 2013, BBS

জেলার প্রায় ৩০ % কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক ইউনিট সিলেট সদর উপজেলায় অবস্থিত। ২০০১ এবং ২০১৩ এর কৃষিবহির্ভুত অর্থনৈতিক শুমারিতে প্রাপ্ত মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের ৫৬.২৮% এর অবস্থান ছিল পল্লি এলাকায় এবং ৪৩.৭২% এর অবস্থান ছিল শহর এলাকায়। কিন্তু ২০১৩ সালের কৃষিবহির্ভুত অর্থনৈতিক শুমারিতে দেখা যায় প্রাপ্ত মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের ৬৭.০২% এর অবস্থান পল্লি এলাকায় এবং ৩২.৯৮%-এর অবস্থান শহর এলাকায়। অর্থাৎ শহরের তুলনায় গ্রামীণ অর্থনীতি দ্রুতহারে বিকাশমান। কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর ফলাফল বিশ্লেষণ করলে সারা দেশের মতো সিলেট জেলার অর্থনৈতিক অগ্রগতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

অধ্যায়-১০

স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও জনস্বাস্থ্য

সিলেটে অতীতে আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণ বংশগত পেশা হিসেবে বৈদ্য উপাধিধারী এবং ইউনানি বা মুসলিম চিকিৎসা পদ্ধতিতে হেকিম উপাধিকারীগণ চিকিৎসক হিসেবে পেশাজীবী ছিলেন। এই দুই পদ্ধতি ব্রিটিশ শাসনেরও মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ১৭৯১ সালে সিলেটের কালেক্টর জন উইলিসের চিঠি ও ১৮৩৭ সালের ঢাকার সিভিল সার্জন জন টেইলরের বিবরণ থেকে জানা যায় মোগল আমলে সুবে বাংলায় সকল প্রধান শহরগুলোতে সরকারিভাবে হাসপাতালসহ চিকিৎসক নিয়োজিত ছিল।

ব্রিটিশ আমল

ব্রিটিশ শাসনামলের নানা বিবরণ থেকে জানা যায় প্রথমদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও বিভিন্ন রোগের সময় ভারতীয় ডাক্তারের শরণাপন্ন হতেন, এমনকি এই ডাক্তারদের চাকরিতে নিয়োগও দেওয়া হতো। শাসনব্যবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে নেওয়ার পর থেকে ক্রমান্বয়ে এই দেশে ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতি বিস্তার লাভ করে। মূলত শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত নীতিমালা আঞ্চলিক পর্যায়ে বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে সামাজিকভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্রমরূপান্তর ঘটে।

সিলেটের ব্রিটিশ কালেক্টর রবার্ট লিন্ডসের লেখা থেকে জানা যায়, তার নিয়োগের কয়েক বছর পর সিলেটে একজন সরকারি ডাক্তার নিযুক্ত হন। তৎকালীন প্রচলিত বিধানমতে, প্রতি জেলায় বা সামরিক ঘাঁটিতে একজন সিভিল অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন বা সার্জন থাকার নিয়ম ছিল। কিন্তু সিলেটে সিভিল সার্জন পদ কোনো সময় কার দ্বারা পূরণ হয় তার বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ১৮১৩ সালে ডাক্তার জন স্মিথ-এর দায়িত্ব পালনের বিবরণ পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ চিকিৎসা প্রশাসন

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার শাসনক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। তারা নিজেদের সৈন্য ও সিভিল প্রশাসনের স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধানের জন্য ১৭৬৪ সালে মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট চালু করে। ১৭৭৫ সালে হাসপাতাল মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। হাসপাতাল পরিচালনার জন্য রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির ‘সার্জন জেনারেল’ ও ফিজিশিয়ান জেনারেল দু’টি পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৭৮৫ সালে ২৩৪ জন সার্জন সহকারে ‘প্রাদেশিক মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট’ বেঙ্গল, মাদ্রাজ ও বোম্বে চালু হয়। ১৭৯৬ সালে হাসপাতাল বোর্ড মেডিকেল বোর্ডে রূপান্তরিত হয়ে সিভিল পার্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। মূলত এ সকল কার্যক্রমই ব্রিটিশ সৈন্য ও সিভিল ডিপার্টমেন্টসহ ইন্ডিয়াতে বসবাসরত ব্রিটিশ নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পরিচালিত হয়। এরপরেও সৈনিক ও ইউরোপীয়দের মৃত্যুহার হাজারে প্রায় ৭০-এর কাছাকাছি ছিল। ইংল্যান্ডে এ বিষয়ে উদ্বেগের কারণে ১৮৬৪ সালে স্যানিটারি কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৮৬৬ সালে

মেডিকেল বোর্ডের পাশাপাশি স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের সৃষ্টি করা হয়। ১৮৮৪ সালে মিউনিসিপ্যাল ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মাধ্যমে স্যানিটেশন হাসপাতাল পরিচালনা ও স্থাপনাসহ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের দায়িত্ব পালনের আইন (সেলফ গভর্নমেন্ট রুল) চালু হয়। ১৮৯৬ সালে মাদ্রাজ, ক্যালকাটা ও বোম্বের পৃথক মেডিকেল বিভাগ একীভূত করে ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস গঠিত হয়।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিভিন্ন নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৩০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন গ্রান্টের মাধ্যমে চেরিটেবল ডিসপেনসারি চালু হয়।

১৯২৭ সালে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড নতুন স্কিমের অধীনে প্রতি থানাতে রোরাল হেলথ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। জেলা সদরে পাবলিক হাসপাতালসহ স্যানিটারি কাজ পরিদর্শনের জন্য জেলা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার পদ সৃষ্টি করা হয়। এতে সমস্ত বাংলা প্রদেশে ৫৭৪ থানার মধ্যে ৫১৭টিতেই রোরাল হেলথ সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়, যার কর্তৃত্ব স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও অ্যাসিস্টেন্ট হেলথ অফিসারের ওপর ন্যস্ত হয়। ম্যালেরিয়া সেকশনে একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন এন্টোমলজিস্ট ও একজন প্রশিক্ষিত সহকারী নিযুক্ত থাকেন। অন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি স্কুল হেলথ কার্যক্রমের আওতায় প্রতি মাসে শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সিলেট জেলার গভর্নমেন্ট পাইলট স্কুলে ১৯৩৭ সাল থেকে একটি ক্লিনিক নেটিভ ডাক্তারের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল।

সিলেটে ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বপ্রথম ১৮৬৩ সালে একটি চেরিটেবল ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৭৯৮ সালে জেল ও জেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। সিলেটের সিভিল হাসপাতাল ১৯৩৬ সালে স্থাপিত হয়। হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজারের দক্ষিণপার্শ্বে বর্তমান শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালের স্থানে এই কমিউনিটি হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সিলেটে সর্বপ্রথম আধুনিক কমিউনিটি চিকিৎসা বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মা ফ্রন্টের ব্রিটিশ ও মিত্র বাহিনী সেনাদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য তা উন্নীত করা হয়। ১৯০৫ সালে সিভিল সার্জন অফিস ও পুলিশ হাসপাতাল নির্মাণ সম্পন্ন হয়। এতে যথাক্রমে ৩৬৫৬ ও ৬৫২৯ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৯৮ সালে কুষ্ঠ আশ্রম নির্মিত হয়। এতে ৭৪টি শয্যা ছিল, প্রতিদিন ৪১-৭৫ জন রোগী আসত। ১৮৬৭ থেকে ১৯০৩ এর মধ্যে সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, শ্রীমঙ্গলে ডিসপেনসারি চালু হয়।

১৮৬৭ সাল ও ১৯৬৪ সালের গেজেট থেকে সিলেটের সাধারণ জনগণের বসতবাড়ি ও বসতবাড়ির পরিবেশের যে চিত্র পাওয়া যায় তা হলো:

বাঁশের বেড়া ও ছনঘাসের ছাউনির ছোট্ট কুঠির, গাছপালার নিশ্ছিদ্র বেড়ায় ঘেরা, আলো-বাতাসের অভাবে স্যাঁতস্যাঁতে, কোনোরূপ পয়ঃনিষ্কাশনের অভাব (ফলস্বরূপ ময়লা আবর্জনা বাড়ির কিনারেই পচন ধরে, দুর্গন্ধে বাতাস ক্লিষ্ট) দূষিত পানীয় জলের ব্যবস্থা (বাড়ির নিকটস্থ পুকুর বা নদী থেকেই হয়ে থাকে) অস্বাস্থ্য ও রোগছড়ানোর অন্যতম কারণ। এসকল পুকুর ও ডোবায় বৃষ্টির সাথে আশপাশ থেকে ময়লা-আবর্জনা গিয়ে জমে এবং গৃহস্থালি কাজ যেমন গোসল, গোরুবাছুর ধোয়ানো, কাপড়-কাচা, হাঁড়িপাতিল ধোয়া সবকিছু একজায়গায় সংঘটিত হওয়ার ফলে পানি ব্যবহারের অনুপযোগী ও বিষময় হয়ে ওঠে। নদীতেও নির্বিচারে চলে দূষণপ্রক্রিয়া, এতে জীবজন্তুর মৃতদেহ এবং দাহশেষে মানবদেহের অবশিষ্টাংশের সাথে মৃতের ব্যবহার্য সবকিছু ফেলা হয়।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মহামারি ও আঞ্চলিক রোগগুলো সিলেটেও এমনি প্রকোপ সৃষ্টি করে। কলেরা মহামারি আকারে সিলেট ১৮৩৪, ১৮৭০ ও ১৮৮০ সালে বিপুল প্রাণহানি ঘটায়। এছাড়াও ১৭৮০ সালে ম্যালেরিয়া ধরনের রোগে এলাকার জনসংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। সিলেটে অন্যতম প্রধান রোগ হিসেবে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, ফাইলেরিয়াসিস, নানা ধরনের চর্মরোগ, ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, বাত, চোখের ছানিপড়া ও বিশেষ করে মানসিক রোগ উল্লেখযোগ্য। ঢাকার লোনাটিক এসাইলেম-এর ১৮২৭-২৮ সালের পরিসংখ্যানে ও ১৮৬৭ সালের গেজেটে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের যে কোনো অঞ্চলের তুলনায় সিলেটে মানসিক রোগী ছিল বেশি।

১৮৩৭ সালে সিলেটে ম্যালেরিয়া রোগীর চিত্র :

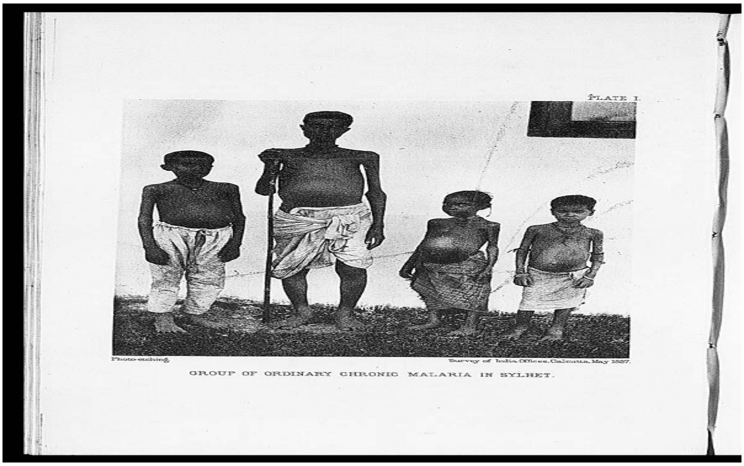

পাকিস্তান আমল

১৯৪৬ সালে বোহর কমিশনের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সদ্যস্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানে স্বাস্থ্যবিভাগের সংস্কার কাজ শুরু হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৪৭ সালে লাহোর ও ১৯৫১ সালে ঢাকায় কনফারেন্সের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ

করেন। সে অনুযায়ী পরবর্তীকালে প্রতি থানায় ১টি হেলথ সেন্টার ও তিনটি সাব সেন্টার প্রতিষ্ঠা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত ও কলেরা নির্মূল কার্যক্রম এবং যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে বিসিজি টিকা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে 'ডাইরেক্টর পাবলিক হেলথ' ও 'সার্জন জেনারেল অব হসপিটাল' পদ দুটোকে একীভূত করে ১৯৫৮ সালে 'ডাইরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস' পদ গঠিত হয়। এই পরিকল্পনার অধীনে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ মিত্রশক্তির সেনাদের ব্যবহৃত হাসপাতালকে মেডিকেল স্কুলে ও ১৯৫০ সালে কুষ্ঠাশ্রমকে ৮০ শয্যার কুষ্ঠ হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়। ১৯৫৬ সালে ৩৩ শয্যার যক্ষ্মা হাসপাতাল, ১৯৬২ সালে ২০ শয্যার সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল এবং ১৯৫৮ সালের ডিস্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ড আইনের আওতায় অসংখ্য রোরাল ডিসপেনসারি ও সাবসেন্টার প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয়। ১৯৭০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া ও বসন্ত প্রায় নির্মূল হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বসন্তের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং প্রায় ২০০,০০০ লোকের মৃত্যু হয় এবং আরও ৩০০,০০০ লোক আক্রান্ত হয়। সিলেটের মেডিকেল স্কুল ১৯৬২ সালে কলেজে রূপান্তরিত হয়। পাকিস্তান আমলে সিলেটে স্বাস্থ্য খাতের কিছু তথ্যাদি ছকে দেখানো হলো :

সারণি-৯৩

জন্ম ও মৃত্যুর ছক

সাল	মোট জন্ম	অনুপাত প্রতি হাজারে	মোট মৃত্যু	অনুপাত প্রতি হাজারে
১৯৪৮	৪৫৫৬৪	১৫.৯	২৭৫৩৮	৯.৬
১৯৫১	৩৫৯৭১	১১.৭	২৫০২৬	৮.১
১৯৫৪	৫০২৪৮	১৬.৪	২৮২৫৩	৯.২৩
১৯৫৬	৫২৬৫২	১৬.৬	২৬৬৯৮	৯.০০

সূত্র: সিভিল সার্জন অফিস সিলেটের প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী

সারণি-৯৪

অনূর্ধ্ব ১ বছরের শিশু ও মাতৃমৃত্যুর ছক

সাল	পুরুষ	মহিলা	মোট	মোট জন্ম	অনুপাত প্রতি হাজারে	মোট মাতৃমৃত্যু	অনুপাত প্রতি হাজারে
১৯৪৮	৩০৪৯	২৩৬১	৫৪১০	৪৫৫৬৪	১১৭.৬%	৭৩৩	১৬.০০%
১৯৫১	২৫২১	১৯৬৭	৪৪৮৮	৩৫৯৭১	১২৪.৭৬%	৪০৪	১১.২০%
১৯৫৪	৩৫১১	২৫৫৭	৬০৬৮	৫০২৪৮	১২০.৭৬%	৮১৩	১৬.১৭%
১৯৫৬	৩৩৯৯	২৬১৭	৬০১৬	৫২৬৫২	১১৪.৭%	৮০৫	১৫.২৮%

সূত্র: সিভিল সার্জন অফিস সিলেটের প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী

সারণি-৯৫

বিভিন্ন রোগের মৃত্যুর ছক

রোগের নাম	১৯৪৮	১৯৫১	১৯৫৪	১৯৫৬
কলেরা	২৯৮	১৩৪২	১১৫০	১১৫
গুটি বসন্ত	১২৫	২০৮১	০৩	১৮
কালাজ্বর	১৪৬৪	২৩৮	৮৪	৯৯
যক্ষ্মা	৭১	১৩৮	২৪৪	৩৬৯
ম্যালেরিয়া	১০২০	৪৭০৬	৩৬১৭	২৭৭৬
টাইফয়েড	---	২৪	১১৮	১৬৬
আমাশয় ডায়রিয়া	---	১৬২২	---	---
জ্বর	---	---	১৪৬২৭	১৬৫০৭
অন্য জ্বর	---	---	১০৪৬৫	৯৩৪৬
আমাশয়	---	---	১২৫৫	২২৮৮
ডায়রিয়া	---	---	৯৬৫	১২০৯
নিউমোনিয়া	---	---	৪১২	---
কুষ্ঠ	---	---	৪৭	৫৫

সূত্র: সিভিল সার্জন অফিস সিলেটের প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী।

সারণি-৯৬

সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকদের সংখ্যা

বছর	১৯৭৩-৭৪	৭৪-৭৫	৭৫-৭৬	৭৬-৭৭	৭৭-৭৮	৭৮-৭৯	২০১৪	২০১৮ (মে)
চিকিৎসক সংখ্যা	৫২	৫২	৭০	৭০	১১২	৩৫৬	৩৪৪	৩৬৬

সূত্র: সিভিল সার্জন অফিস সিলেটের প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী।

বাংলাদেশ আমল

১৯৮৬ সালে সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নামে নামকরণ করা হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে ১০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়। বর্তমান সিলেট জেলার তথ্য দুটি ছকে দেখানো হলো :

সারণি-৯৭

অনূর্ধ্ব ১ বছরের শিশু ও মাতৃমৃত্যুর ছক

সাল	জীবিত জন্ম	মৃত জন্ম	অনুপাত প্রতি হাজারে	মাতৃ মৃত্যু	অনুপাত প্রতি লাখে
২০০৯	৮২৮৮৭	১৩০৯	১৪	১৫৮	১৯১
২০১০	৮২৯৯৮	১৩৮৭	১৫	১৬৩	১৯৬
২০১১	৮৩০৩৩	১৪৮৭	১৮	১৩৭	১৬৫

সাল	জীবিত জন্ম	মৃত জন্ম	অনুপাত প্রতি হাজারে	মাতৃ মৃত্যু	অনুপাত প্রতি লাখে
২০১২	৮৩৪৫১	১৫৬৭	১৯	১২৯	১৫৫
২০১৩	৯২৯২১	১৬৯৬	১৮	১৩২	১৪২
২০১৪	৯৯০১০	২৬৩১	২৭	১৪৭	১৪৮
২০১৫	৯৯৩০৯	২৮৯১	২৯	১৩৪	১৩৫
২০১৬	৯৯৮৯৭	২০৯৭	২১	১২৮	১২৮
২০১৭	৯৮৯৮৬	৮৫৪	৮.৬২	১০৬	১০৭

সূত্র: সিভিল সার্জন অফিস সিলেটের প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী, লোকাল হেলথ বুলেটিন (ডিস্ট্রিক্ট হেলথ ইনফারশন সফটওয়্যার-২)

সারণি-৯৮

উপজেলা হাসপাতালসমূহে ভর্তি রোগী অনুসারে প্রথম দশটি রোগের ছক

ক্র. নং	রোগের নাম	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
১	ডায়রিয়া	৫৫৯৬	১০৬৩৫	১০২৬৩	১১৫২৪	১২৭১০	১২০৬০	১২৯৮৮
২	নিউমোনিয়া	১৪০১	৩৭৭২	২২৪৯	৫৩১৪	৫৫৯৭	৭৫০৯	৭৯০৮
৩	জখম	১২৫৬	৩১১৪	২৯১৪	৩১৪২	২৩৮২	২৪৩২	২৫৬৯
৪	টাইফয়েড	১০৬৯	১৪৮১	১৪০৫	১২২০	১০৮৩	১০৪৫	১১১৬
৫	পেপটিক আলসার	৯১৭	১৭২৪	১৬৯৫	১৯৬৪	২৬৫৭	২৮৫৯	৩১২২
৬	শ্বাসকষ্ট	৮৪০	১১১৭	১৩৪৩	১৭৩৬	২০২৮	২১৩৪	২২৮৩
৭	গর্ভপাত	৪৪৯	৪৫৩	৪০১	০	৩৭১	৩৬১	৩৩১
৮	হাঁপানি	৪৪৯	০	০	০	৭৮৬	৬৪৬	৭০১
৯	মনোরোগ	৩৯২	৫৩২	৪৮৪	৫৬৭	২৬২	৩৪৮	৪৬১
১০	গর্ভজটিলতা	৩৩৫	০	০	০	১৪৫৫	১২৬৮	১৩৭২
১১	জ্বর (অনির্দিষ্ট)	০	৫৯৭	৬৭৮	১১০৮	১০৩৬	৮১২	৯১১
১২	যানবাহন দুর্ঘটনা	০	৪৮৩	৫০০	৪৩৯	৫১৯	২৯৫	৩২১
১৩	অন্ত্র ও পাকস্থলীর প্রদাহ	০	০	০	৬৩১	৮৮১	৯৫৬	৮৯২

সূত্র: সিভিল সার্জন অফিস সিলেটের প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী, লোকাল হেলথ বুলেটিন (ডিসট্রিক্ট হেলথ ইনফারশন সফটওয়্যার-২)

সারণি-৯৯

উপজেলা হাসপাতালসমূহে ভর্তি রোগীর মৃত্যু অনুসারে প্রথম দশটি রোগের ছক

ক্র. নং	রোগের নাম	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
১	নিউমোনিয়া	৩৪	২৮	৪৩	৪৪	৪১	৩৩	৩৯
২	কিডনিজনিত জটিলতা (CRF)	২৭	১৫	১১	২৩	১২	৮	৯
৩	হাঁপানি	১২	২৭	১৪	৬	৬	২	৭
৪	মারাত্মক সংক্রমণ	৬	১২	২০	৫	০	০	৩
৫	ডায়রিয়া	৫	০	০	০	১	০	০
৬	হৃদরোগ	৪	০	১২	৬	১৪	১২	৭
৭	নবজাতকের শ্বাসকষ্ট	৩	১২	৭	৭	৯	৮	৭
৮	মেনিনজাইটিস	২	১০	০	০	০	১	০
৯	মৃগী	১	০	০	০	০	০	০
১০	শ্বাসনালীর মারাত্মক প্রদাহ	০	৫	৮	৩	২১	১৩	৫
১১	নবজাতকের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ	০	৬	৪	৮	৮	১০	৮
১২	মস্তিষ্কের সংক্রমণ	০	৪	৩	৩	০	০	০

সূত্র: সিভিল সার্জন অফিস সিলেটের প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী, লোকাল হেলথ বুলেটিন (ডিসট্রিক্ট হেলথ ইনফারশন সফটওয়্যার-২)

এক নজরে সিলেট জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ : ২০১৭

১. জেলার মোট জনসংখ্যা : ৩৬,৫৬,২৪১ জন (পুরুষ-১৮,৬২,৬২০, মহিলা-১৭,৯৩,৬২১ সিটি করপোরেশন সহ)

- ০-১১ মাসের শিশুর সংখ্যা-৯৮,৪১৮ জন (পুরুষ-৫০,২৯৩, মহিলা-৪৮,১২৫ জন)
- ০-৫ বছরের শিশুর সংখ্যা- ৫,৩৭,০৩২ জন (পুরুষ-২,৭৪,৩৯২, মহিলা-২,৬২,৬৪০ জন)
- ১৫ বছরের কিশোরী- ৪৭,৩১৫ জন, গর্ভবতী মহিলা- ১,০৮,৮১৫ জন, ১৫-৪৯ বছর মহিলা- ৮,৭৬,৭৩৭ জন

২. মোট উপজেলা-১৩টি

৩. মোট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স- ১১টি, ৫০ বেড-০৪টি, ৩১ বেড-০৭টি, ইএমওসিভুক্ত উপজেলা-০৪টি

- ০৩টি ৫০ শয্যায় উন্নীত হওয়ার কার্য্যক্রম চলছে।

৪. মোট ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২৫টি

৫. মোট ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও প. প. কেন্দ্র : ৬৪টি

৬. সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল : ০১টি

- এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট। শয্যা সংখ্যা-৯০০

৭. বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল : ০৪টি, শয্যা সংখ্যা-২৩৭৫

- জালালাবাদ রাগীব রাবেয়া মেডিকেল কলেজ, সিলেট, বেড সংখ্যা-১০০০

- সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বেড সংখ্যা-৬২৫
- নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দক্ষিণ সুরমা ,সিলেট,বেড সংখ্যা-৬০০
- পার্ক ভিউ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট, বেড সংখ্যা-৩৫০

৮. সদর হাসপাতাল : ০১টি,

- শহীদ সামছুদ্দিন আহমদ হাসপাতাল (সদর হাসপাতাল) শয্যা সংখ্যা : ১০০

৯. সরকারি ইউনানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল : - ০১টি

১০.৩১ শয্যাবিশিষ্ট খাদিমপাড়া হাসপাতাল, সদর সিলেট: - ০১টি (শীগগিরই জনবল পদায়নসহ কার্যক্রম চালু করা হবে।)

১১. সরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠান -০১টি

১২. প্রাইভেট মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ম্যাটস)শয্যা : ০৩টি।

১৩. নার্সিং কলেজঃ ০৪টি (সরকারি ০১ টি, প্রাইভেট-০৩টি)

১৪. সরকারি বক্ষ ব্যাধি হাসপাতাল : ০১টি বেড সংখ্যা-৫৬ (MDR টিবি রোগীদের চিকিৎসার জন্য জিন এক্স পার্ট মেশিন ০১ টি।

১৫. বক্ষব্যাধি ক্লিনিক-০১ টি।

১৬. সরকারি কুষ্ঠ হাসপাতাল : ০১ টি বেড শয্যা : -৮০টি

১৭. প্রাইভেট ক্লিনিকঃ ৫৫টি (সিটি করপোরেশন রেজিঃ প্রাপ্ত), ১১টি উপজেলা পর্যায়ে মোটঃ ৬৬

১৮. ডায়াগনষ্টিক সেন্টার (সিটি করপোরেশন রেজিঃ প্রাপ্ত)৬১টি, উপজেলা পর্যায়ে ৪৩টি মোটঃ ১০৪টি

১৯. ব্লাড ব্যাংকের শয্যা : ০৩টি

২০. মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র : ০৭টি

১৬/০৫/২০১৭ ইং পর্যন্ত জনবলের তথ্যঃ (সিভিল সার্জন নিয়ন্ত্রনাধীন)

২১. ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা অনুমোদিত: ২৫৮ জন, কর্মরত-১৬৫ জন, শূন্য পদ-৯৩জন

২২. ২য় শ্রেণী কর্মকর্তা (নার্স সহ অন্যান্য)- অনুমোদিত-২২৫, কর্মরত-১৫১ জন, শূন্য পদ-৭৪ জন

২৩. ৩য় শ্রেণী কর্মচারী : অনুমোদিত-১৩১৭, কর্মরত-৯৭২ জন, শূন্য পদ-৩৪৫ জন

২৪. ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী : অনুমোদিত-৩২১, কর্মরত-২০৬ জন, শূন্য পদ-১১৫ জন

সর্বমোট : অনুমোদিত-২১২১, কর্মরত-১৪৯৪ জন, শূন্য পদ-৬২৭ জন

২৫.এ্যাম্বোলেন্সঃ মোট ২২টি, সচল-১১টি, অচল-১১টি।

২৬. এক্স-রে মেশিন : মোট ১৩টি, সচল-০৫টি, অচল-০৮টি।

২৭. চালুকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকঃ ২৫৬টি, প্রস্থাবিত সিসিঃ ২৮৭, স্থান নির্বাচনঃ ২৭৭, সম্পূর্ণ নির্মিত : ২৬০ হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন : ০৩টি ক্লিনিক।

২৮. সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ২০১৬ সাল : (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ টিবি ও কুষ্ট হাসপাতাল) বহিঃবিভাগ ৬,৬৫,৮৬৯, জরুরী বিভাগ-৮৮,৩৯৬, সাব-সেন্টার ৪,৫২,৪৬১, অর্ন্তঃবিভাগ-৪৭,৬২৯জন, সর্বমোটঃ ১২,৫৪,৩৫৫ জন

২৯. কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ২০১৬ সালঃ

মোটঃ ২৩,৮৮,৯১৭ জন (পুরুষ-৮,১২,৭২৩ জন, মহিলা-১৩,৩৯,৩৬৫, শিশু-২,৩৬,৮২৯) ৩১.সি.সি তে ডেলিভারীর শয্যা : ২০১৬ইং ৫৮জন। মোট ডেলিভারীর সংখ্যা ২০১৬ইং-

৯০,০০৩ জন এ, এন, সি সেবা গ্রহীতার সংখ্যাঃ ১,১৪,৯৮৯ জন পি,এন,সি সেবা গ্রহীতার সংখ্যাঃ ৪৭,১৩৪ জন

৩০. আই এম সি আই সেবা প্রাপ্ত রোগী (০-৫ বছর)- ৩,৭৭,৫৫৮ জন, মোট জীবিত জন্ম সংখ্যা- ৯৯৮৯৭ জন, মাতৃ মৃত্যুর সংখ্যা-১২৮ জন, M M R : 128/100000 live births Under 5 deaths: 1687, 917/1000 live births)

৩১. ই পি আই শিশুর লক্ষ্য মাত্রঃ (০-১১ মাস) ৮৬,৯৬৬ জন ২০১৬ইং সালে অর্জিত হার বিসিজি- ১০০%, পেন্টা-২: ৯৯%, পেন্টা-৩: ৯৯%, পিসিভি-১: ১০০%, পিসিভি-২: ৯৯%, পিসিভি-৩: ৯৬%, হাম-৮৫%, এম আর-২:৮৪%, টি টি-৫ এর লক্ষ্যমাত্রা-৫৫২৫৪ জন অর্জিত হার-৯৬%

৩২. ভিটামিন এ ক্যাপসুল প্রদানের হারঃ ২০১৬ইং,

১ম রাউন্ড (০-১১ মাস) লক্ষ্যমাত্রা - ৪৫৭৭২, অর্জিত ৪৫৫১৯, হার ৯৯.৪৪%, (১২-৫৯ মাস) লক্ষ্যমাত্রা-৩৯৬১০৬ অর্জিত- ৩৯৫১৬৩, হার ৯৯.৭৬%

২য় রাউন্ড (০-১১ মাস) লক্ষ্যমাত্রা- ৪৫৭৭২, অর্জিত ৪৫৫২২, হার ৯৯.৪৫% (১২-৫৯ মাস) লক্ষ্যমাত্রা-৩৯৬১০৬, অর্জিত- ৩৯৫৩০৫, হার ৯৯.৭৯%

সিলেটের সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি অন্য কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম:

রেড ক্রিসেন্ট মাতৃ মঙ্গল হাসপাতাল

এই প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৭৫ বছর থেকে মা ও শিশুদের সেবায় অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। হাসপাতাল স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৩২ সালে। সিলেটের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. এজি প্যাটন, সিভিল সার্জন ডা. জ্যোতি পাল সেন, রেডক্রস সিলেট জেলা শাখার সেক্রেটারি ডা. পি. গুপ্ত ও ডা. পরিমল করসহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সিলেট শহরে একটি বেসরকারি মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এজি প্যাটন এবং আসাম প্রাদেশিক সরকারের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য রায়বাহাদুর পি সি দত্তের প্রচেষ্টায় ১৯৩৫ সালের ১৫ জুলাই আসাম প্রাদেশিক সরকার সিলেট শহরে প্রায় এক একর জমি সিলেট মাতৃমঙ্গাল হাসপাতাল ও দাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য রেডক্রস শাখা বরাবরে বরাদ্দ করেন। ১৯৩৬ সালের ১৮ ডিসেম্বরে সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায়। ঐদিন আসাম প্রদেশের প্রাদেশিক গভর্নর স্যার মাইকেল কিনের পত্নী লেডি কিন সিলেটে মাতৃমঙ্গল হাসপাতালের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। প্রথমে ৫টি কেবিন ও দুই ওয়ার্ডে ৮টি বেড নিয়ে শুরু হয় হাসপাতাল। দাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুই ব্যাচে ২০ জন করে ১ বছর মেয়াদি কোর্সে প্রতি ৬ মাস অন্তর নতুন ব্যাচ নেওয়া হয়। ১৯৮৭ সালে রেডক্রস নাম বদলে রেড ক্রিসেন্ট নামকরণ করা হয়। বর্তমানে হাসপাতাল বর্ধিত ও আধুনিকীকরণের ফলে এখন এখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোগে অপারেশন চালানো সম্ভব হচ্ছে। রোগীর নিকট থেকে নেওয়া ন্যূনতম ফি ও বিভিন্ন সংগঠনের অনুদানে হাসপাতালের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হয়। এ হাসপাতাল পরিচালনায় নয়াদিল্লিস্থ ভিক্টোরিয়া স্কলারশিপ ফান্ড, সিলেট জেলা পরিষদের অনুদান, কানাডিয়ান রেডক্রিসেন্টের

অনুদান, সিলেট পৌরসভা, সিলেট জেসিস ইন্টারন্যাশনাল, সিলেট লায়ন্স ক্লাব, সিলেট রোটারি ক্লাবের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

লায়ন্স শিশু হাসপাতাল সিলেটের মনোরম স্থান মানিকপীর রোডে ছোট্ট একটি টিলায় অবস্থিত লায়ন্স শিশু হাসপাতালটি সিলেটের বিত্তবান লায়ন্স ক্লাবের সদস্যগণের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ ক্লাবের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালে। প্রথমে ১৯৮৪ সালে ফ্রি সানডে ক্লিনিক থেকে কার্যক্রম শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে চাহিদার তাগিদে সদস্যগণ ২৫ বেডবিশিষ্ট শিশু হাসপাতালটি স্থাপন করেন। ৫জন ডাক্তার ১২ জন নার্স ও ৩২ জন সাধারণ কর্মচারী প্রতিদিন ২০-২৫ জন ভর্তিকৃত ও ৬০-৭০ জন বহির্বিভাগের রোগীর সেবা দিয়ে থাকেন।

জালালাবাদ প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র ৩২ বেড-বিশিষ্ট এই অনন্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০১ সালে। রোটারি ক্লাব অব জালালাবাদের নিজস্ব অর্থায়নে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ৪ জন ডাক্তার, ৪জন নার্স ও ৪৭ জন অন্যান্য কর্মচারী প্রতিদিন ৫০জন আউটডোর ও ২০জন ইনডোর রোগীর সেবা দেওয়া হয়।

জালালাবাদ অন্ধ কল্যাণ সমিতি চক্ষু হাসপাতাল ১৯৬৪ সালে চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে শুরু হয়ে সমিতির কার্যক্রম বর্তমানে নিজস্ব ভূমিতে বৃহৎ আকারের স্থায়ী চক্ষু হাসপাতালে উন্নীত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে সিলেটে ইসলামপুর এলাকার নৈসর্গিক পরিবেশে এই চক্ষু হাসপাতালটি চালু করা হয়। ১৫ শয্যার হাসপাতালে ৩ জন ডাক্তার, ৩ জন নার্স ও ২৫ জন সহযোগী কর্মচারী সার্বক্ষণিক বহির্বিভাগ ও আন্তঃবিভাগে আগত রোগীর সেবা দিয়ে থাকেন। প্রয়োজন অনুসারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের রোগী দেখার ব্যবস্থা আছে । প্রতি সোম ও শুক্রবার চক্ষুর বিভিন্ন ধরনের অপারেশন হয়ে থাকে। গরিব রোগীরা বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। বহির্বিভাগে প্রতিদিন গড়ে ১০০-১৫০জন ও আন্তঃবিভাগে ১৫-২০ জন রোগী চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকেন।

সিলেট সরকারি তিব্বিয়া কলেজ ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে এ দেশীয় পদ্ধতি হিসেবে ইউনানি চিকিৎসার মূল্যায়ন হলেও পরবর্তী সময়ে অবহেলার শিকার হয়। অবশেষে ২০ শতকে বিকল্পধারার চিকিৎসা ও সুলভ দেশজ ব্যবস্থা হিসেবে এর স্বীকৃতি মেলে, ফলে ১৯৪৫ সালে সিলেট তিব্বিয়া কলেজ চালু হয়। বর্তমানেও এটি সিলেটের সুবহানীঘাট এলাকায় চালু আছে। প্রতিবছর ৫০ জন ছাত্র ভর্তি হয়ে ডিপ্লোমা শেষে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত হন। এর সাথে একটি ডিসপেনসারি রয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ৬০ জন রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসাসহ ওষুধ পেয়ে থাকেন।

জালালাবাদ হোমিও মেডিকেল কলেজ সিলেটে বেসরকারিভাবে ডা. হোসেন রাজা চৌধুরীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সহায়তায় ১৯৬৭ সালে হোমিও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান হতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে প্রচুর ছাত্রছাত্রী ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়ে হোমিও ডাক্তার হিসেবে গ্রামেগঞ্জে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার কাজে নিয়োজিত আছে। কলেজের সাথে একটি ডিসপেনসারিতে রোগীদের

বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবস্থা আছে। প্রতিমাসে ৫০০-৬০০ রোগী এখানে চিকিৎসা গ্রহণ করে। ২০১৪ সালে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৬০০। প্রতিবছর গড়ে ১০০/১২০ জন ডিপ্লোমা হোমিও চিকিৎসক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

ব্রিটিশ সরকার প্লেগ কমিশন গঠন করে কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯০৫ সালে 'জনস্বাস্থ্য দপ্তর' হিসেবে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩৬ সাল থেকে এটি 'জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর' হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন নির্মাণ, জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি এবং শহর অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ সম্পাদনে এ প্রতিষ্ঠান Lead Agency হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্যানিটেশন নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। স্বাধীনতার পর ইউনিসেফের সহায়তায় স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিচালিত হলেও অর্জন ছিল খুবই সামান্য, কয়েক যুগে যা মাত্র ৫% থেকে ১০% ছিল। বৃহৎ আকারে কার্যক্রম পরিচালিত হয় ২০০৩ সাল থেকে। ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে সাউথ এশিয়ান কনফারেন্স অন স্যানিটেশন (SACOSAN) অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ সরকার অংশগ্রহণ করে এবং ২০১০ সালের মধ্যে ১০০% স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে। ২০০৩ সালে বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে সিলেট জেলার স্যানিটেশন কাভারেজ ৩১.৭৬% পাওয়া যায়। এ লক্ষ্যে উপজেলার উন্নয়নখাতের শতকরা ২০% অর্থ স্যানিটেশন খাতে ব্যয় হচ্ছে। ফলে গত ১০-১১ বছরে স্যানিটেশন কার্যক্রমে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে সিলেট জেলার লেট্রিনাইজেশন কাভারেজ শতকরা ৮৬% ভাগ এবং স্যানিটেশন কাভারেজ প্রায় ৬৫%।

সিলেট জেলার নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা

পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকে (১৯৫০-১৯৬০) সরকার গ্রামাঞ্চলে নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে পানিসরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং লক্ষাধিক নলকূপ স্থাপন করে যার বেশির ভাগই কারিগরি ত্রুটিবিচ্যুতি এবং যথাযথভাবে স্থাপন না হওয়ায় বিনষ্ট হয়ে যায়। স্বাধীনতা পরবর্তীতে সারা বাংলাদেশে ১ লাখ নতুন নলকূপ স্থাপন এবং ৬০ হাজার পুরাতন নলকূপ পুনঃস্থাপন ব্যয়ভার বহন করে। অতঃপর ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ আমাদের দেশে আবারও ২.৫০ লাখ নলকূপ স্থাপনের সহায়তা প্রদান করে। সরকার তৎপরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের সহায়তায় এবং জিওবি খাত হতে দেশে সরকারিভাবে নলকূপ স্থাপন করে। বেসরকারিভাবে আরও কয়েকগুণ বেশি নলকূপ স্থাপন করা হয়। এতে দেশের ৯৭% মানুষ নিরাপদ পানীয় জল পাওয়ার সুবিধা পেয়ে যায়, যা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মধ্যে সর্বাধিক। কিন্তু ১৯৯০-

২০০০ সালের মধ্যে লক্ষ্য করা হয় স্থাপিত অগভীর নলকূপের প্রায় ৩০%=এর মধ্যে সহনীয়মাত্রার অধিক পরিমাণে আর্সেনিক বিদ্যমান। ফলে গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির হার ৭৩% এর মধ্যে চলে আসে। উল্লেখ্য সিলেট জেলায় আর্সেনিক আক্রান্ত নলকূপের শতকরা হার ১১.১৩%। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সিলেট জেলার নলকূপের পানি পরীক্ষা করে অসহনীয় মাত্রায় আর্সেনিক আক্রান্ত নলকূপ লাল রং এবং সহনীয় মাত্রায় আক্রান্ত/আর্সেনিক আক্রান্ত নয় এমন সব নলকূপে সবুজ রং লাগিয়ে দেয় এবং এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত আছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সিলেট জেলায় ২০০৩ সাল থেকে প্রায় ২৮,৮৬৮টি আর্সেনিকমুক্ত বিভিন্ন প্রকার নলকূপ স্থাপন করে দরিদ্র পরিবারসমূহে পানি সরবরাহের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম এখনও চলমান।

সিলেট পৌরসভার স্বাস্থ্যতথ্য

পৌর এলাকার বসবাসরত নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা, সুন্দর পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ে তোলা, স্যানিটারি বিষয় এবং পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশনসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৮৭৮ সালে সিলেট পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর দুলালচন্দ্র দেব। তৎকালে দরগা মহল্লা, লামাবাজার, তোপখানা, কাজীটুলা এবং কুমারপাড়া এই ৫টি এলাকা নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। তখন পৌরসভার আয়তন ছিল সোয়া তিন বর্গমাইল। সে সময়ে গোরুর গাড়ির মাধ্যমে নগরবাসীর পয়ঃনিষ্কাশন পরবর্তী ময়লা পরিষ্কার করা হতো। পৌরসভার স্বাস্থ্যবিভাগের মাধ্যমে কলেরা, বসন্ত ও জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক দেওয়া হতো। জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বাজারে যাতে ভেজাল খাদ্য বিক্রি বা পরিবেশন না করা হয় তার জন্য তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ব্রিটিশ শাসনামলে খাজাঞ্চী বাড়ির জমিদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর শাশুড়ি বিনোদিনী দেবী নিজ অর্থব্যয়ে পৌরএলাকার গরিব অসহায় জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য ধোপাদিঘির পূর্বপাড়ে বিনোদিনী দাতব্য চিকিৎসালয় নামে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র চালু করে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও প্রসূতি সেবা চালু করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯২২-২৫ সালে নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী পৌরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালে এই প্রতিষ্ঠানটি বিনোদিনী দেবীর নামে ভূমিসহ সিলেট পৌরসভাকে দান করেন। সিটি করপোরেশন বিনোদিনী দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে জনসাধারণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে। এ ছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাকেন্দ্র রয়েছে। ওয়ার্ডভিত্তিক এগুলো হলো :

সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় সীমান্তিক, সিলেট-এর পরিচালনায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা

ক্র. নং	ওয়ার্ড	কেন্দ্রর নাম	ঠিকানা	মন্তব্য
১।	১.	মেরীস্টোপস ক্লিনিক	দর্শন দেউড়ী, সিলেট।	পরিবার পরিকল্পনা, ইপিআই, মা ও শিশুসহ সকল প্রকার ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।
২।	৫.	নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র -১	সৈয়দা মঈন উদ্দিন নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বড়ো বাজার আম্বরখানা	পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুসহ সকল প্রকার ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।
৩।	৫.	সূর্যের হাসি ক্লিনিক	মজুমদারি, সিলেট।	ওই
৪।	৮.	নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ২	বীরেশচন্দ্র নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নয়া বাজার, আখালিয়া।	ওই
৫	৯.	নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৩	বর্ণমালা নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র,বাগবাড়ি	ওই
৬।	১০.	সূর্যের হাসি ক্লিনিক	কলাপাড়া, সিলেট।	ওই
৭।	১৩.	নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৫	তোপখানা নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, তোপখানা	ওই
৮।	১৩.	সূর্যের হাসি ক্লিনিক	মাছু দিঘির পাড়, সিলেট।	প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাসহ নরমাল এবং সিজারিয়ান ডেলিভারি ও যাবতীয় প্রসূতিসেবা প্রদান করা হয়।
৯।	১৩	মেরীস্টোপস প্রিমিয়াম	লামাবাজার	ওই
১০।	১৩	এফপিএবি	মির্জাজাঙ্গাল	ওই
১১।	১৫.	নগর মাতৃসদন কেন্দ্র	ধোপাদিঘির পাড়, সিলেট।	ওই
১২।	১৭.	সূর্যের হাসি ক্লিনিক	কাজীটুলা, সিলেট।	পরিবার পরিকল্পনা, ইপিআই, মা ও শিশুসহ সকল প্রকার ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।
১৩।	২০.	নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র	টিলাগড়, সিলেট।	পরিবার পরিকল্পনা, ইপিআই, মা ও শিশু সহ সকল প্রকার ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।
১৪।	২০	সূর্যের হাসি ক্লিনিক	টিলাগড়, সিলেট।	ওই
১৫।	২২	সূর্যের হাসি ক্লিনিক	টিলাগড়, সিলেট।	ওই
১৬।	২২	নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র	টিলাগড়, সিলেট।	ওই
১৭।	২৩	সুর্যের হাসি ক্লিনিক	মেন্দিবাগ	ওই
১৮।	২৫	সুর্যের হাসি ক্লিনিক	চাঁদনীঘাট	ওই
১৯।	২৭	নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র	গোটাটিকর, আলমপুর	ওই

১৯৮৭ সালে জাতীয়ভাবে ইপিআই কর্মসূচি চালু করা হয়। সিলেট পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব আ.ফ.ম কামালের উদ্যোগে সিলেট পৌরসভার স্বাস্থ্যবিভাগের মাধ্যমে ১৯৮৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর থেকে পৌর এলাকার ৫টি ওয়ার্ডে ইপিআই কর্মসূচি চালু করা হয়। পরে ২৭টি ওয়ার্ড নিয়ে ২০০২ সালের ২২ জুলাই প্রায় ৬ লাখ জনসংখ্যা এবং ২৬.৫০বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে সিটি করপোরেশন গঠিত হওয়ার পরও যা আজ পর্যন্ত সিটি করপোরেশন এলাকার ২৭টি ওয়ার্ডে চালু আছে। বর্তমানে সিলেট সিটি করপোরেশন

এলাকা/নগরীসংলগ্ন একটি সরকারি এবং চারটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রয়েছে। সরকারি মেডিকেল কলেজ হলো এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হলো জালালাবাদ রাগীব রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নর্থইস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পার্কভিউ হাসপাতাল। এসব হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনাসেবাও দেওয়া হয়।

পরিবার পরিকল্পনা

জাতীয় কার্যক্রমের আওতায় পাকিস্তান আমলে বৃহত্তর সিলেট জেলায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের দায়িত্বরত কর্মকর্তার পদবি ছিল Executive cum Publicity Officer। তিনি জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে কাজ করতেন। বৃহত্তর জেলার বাদবাকি মহকুমাগুলোতে পরিবার পরিকল্পনার কোনো কর্মকর্তা ছিলেন না। শুধু ৩২টি থানার ৩২ জন থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্মরত ছিলেন। মাঠের কাজে ৩ জন টিএফএ, তার মধ্যে ১জন মহিলা নিয়োজিত ছিলেন। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের নিজস্ব ডাক্তার না থাকায় সিলেট রেডক্রস হাসপাতালের ডা. মমতাজ বেগম কর্তৃক ক্লিনিকেল কাজ সীমিত আকারে করা হতো। জুলাই ’৬৯ সালে ‘আরবান ক্লিনিক’ নামে পরিবার পরিকল্পনার জন্য ডাক্তারের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং সিলেটের বাসিন্দা ডা. লতিফা আক্তার প্রথম ডাক্তার হিসেবে যোগদান করেন। ভেসেকটমি করার কোনো ডাক্তার না থাকায় সিলেট মেডিকেল কলেজের কয়েকজন চিকিৎসককে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। লাইগেশন অপারেশন অধ্যাপক ডা. এরশাদ আলী ও তার সহকর্মীবৃন্দের মাধ্যমে সীমিত আকারে সম্পন্ন হতো। লাইগেশন গ্রহীতার জন্য বিশেষ প্রণোদনা হিসেবে ২০ টাকা, চিকিৎসকগণও ২০ টাকা হারে পেতেন। আইইউডি গ্রহীতারা ২.৫০ টাকা হারে এবং উদ্বু দ্ধকারীও২ টাকা হারে বিশেষ সম্মানি পেতেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী ’৭৫ সাল পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রম প্রচারণা ও মোটিভেশনই মুখ্য ছিল। ১৯৭৬ সালে ইউনিয়ন ওয়ার্ড পর্যায়ে মাঠকর্মী নিয়োগে কার্যক্রমের বিস্তৃতি আনে। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রম ও অর্জন ছকসমূহের মাধ্যমে দেখানো হলো :

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি

স্থায়ী	অস্থায়ী	
	দীর্ঘমেয়াদি	স্বল্পমেয়াদি
পুরুষদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি এনএসভি বা ভ্যাসেকটমি মহিলাদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি টিউবেকটমি বা লাইগেশন।	ইমপ্ল্যান্ট, আইইউডি	খাবার বড়ি, কনডম, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইনজেকশন।

সিলেট জেলার জনমিতি তথ্য

আয়তন	: ৩,৪৫২.০৭ বর্গকি. মি.
জনসংখ্যা	: ৩৪,৩৪,১৮৮ জন
মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র	: ০২টি
ইউ. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	: ৬৫টি
মান উন্নীত ইউ. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	: ৩৭টি

ইউনিয়ন ক্লিনিক	: ১৪টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	: ২২০টি
নির্মিত উপজেলা প. প. স্টোর	: ০৮টি
মোট প. ক. সহকারী ইউনিট	: ৫০২টি
কর্মরত বেসরকারি সংস্থা	: ০৯টি
মোট সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	: ৪,৯২,৯৫৭ (জুন/১৪ পর্যন্ত)
মোট পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	: ৩,৬৮,০৭৫ (জুন/১৪পর্যন্ত)
পদ্বতি গ্রহণকারীর হার (CAR)	: ৭৪.৬৭% (জুন/১৪)
মোট গর্ভবতীর সংখ্যা	: ১৬৪৫০ (জুন/১৪)
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	: ৮০৭টি
মোট ইউনিয়নের সংখ্যা	: ৯৯টি
পরিবার কল্যাণ সহকারী মাঠপর্যায়ে	: ৪৬৮জন

কমিউনিটি ক্লিনিক

এটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বিশেষ উদ্যোগ। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তৈরি করা হচ্ছে এই কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা। প্রস্তাবিত ২৮৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়। সিলেট জেলায় কমিউনিটি ক্লিনিকের তথ্যাদি তুলে ধরা হলো।

সারণি-১০০

কমিউনিটি ক্লিনিকের তথ্যাদি

প্রকল্পের নাম	নির্ণায়ক	তথ্য	ব্যায়িত টাকার পরিমাণ	সুবিধা ভোগীর সংখ্যা					মন্তব্য
				সাল	পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট	গ্রামীণ প্রান্তি
কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট	প্রস্তাবিত ২৮৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ এর কাজ চলছে। (১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নির্মিত ১৮৫টি + ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত ৭৭টি) বর্তমানে ২৫৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১টি কমিউনিটি ক্লিনিক এর পুন: নির্মাণকাজ চলিতেছে এবং ১৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক এর মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১টি কমিউনিটি ক্লিনিক এর পুন: নির্মাণকাজ চলিতেছে এবং ১৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক এর মেরামত ও সংস্কার কাজ বাবদ ১০১.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যায়িত হয়েছে।	২০০৯	৬২৩৬৯	৯২৪২৬	৪১৫৩৬	১৯৬৩৩১	জনগণ স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে
				২০১০	৬৯৪২৩	৯৬৬৪৩	৫২১৮৯	২১৮২৫৫	
				২০১১	২০০৪৫৯	২৩৭৮৫২	১০৫৪৬৯	৫৪৩৭৮০	
				২০১২	৩৬৬০৬১	৬৮৬০০০	৬০০৬৫৪	১৬৫২৭১৫	
				২০১৩	৭৩৩৮৩৫	১৩৫৪৮২২	৩১২৩২০	২৪০০৯৭৭	
				২০১৪	৭০০৫৯২	১৩৯০০৩১	৩১৩৪৪১	২৪০৪০৬৪	
				২০১৫	৭৫১২১৩	১৪০০৪৪৭	৩০৫৭০৯	২৪৫৭৩৬৯	
				২০১৬	৭৬১৪৯২	১৪০৯৪৮২	৩৪১২২২	২৫১২১৯৬	
				২০১৭	৭৭৬৭৬৪	১৪১২৫২৪	৩৫৫৪৮১	২৫৪৪৭৬৯	

অধ্যায়-১১

শিক্ষা

সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলা নিয়ে বর্তমান সিলেট বিভাগ গঠিত। ব্রিটিশ শাসনামলে বর্তমান ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিমগঞ্জ জেলা সিলেটের একটি মহকুমা ছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এঅঞ্চলের মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। তাই যুগে যুগে সংস্কৃত, আরবি-ফারসি ভাষার চর্চা ও অধ্যয়নের ফলে দেশের অপর অঞ্চল থেকে সিলেটের শিক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, সিলেট অঞ্চলের হিন্দু জনগোষ্ঠী ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় অনুশীলনে মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি জ্ঞানকেন্দ্রে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, অন্যদিকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিদ্বানগণ মোগল ও নবাবি আমলে আরবি-ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ পৃত্থিমপাশার জমিদার মৌলবি রবি খাঁ ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারের গৃহশিক্ষকতায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন। লস্করপুরের সৈয়দ শাহ ইসরাইল দিল্লি থেকে 'মুলক-উল-উলামা' এবং সৈয়দ ইবরাহিম 'মালিক-উল-উলামা' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে এ অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারে টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদরাসার ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

সিলেটের শিক্ষা ও শিক্ষাব্রতী

গবেষকদের মতে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর আগেই সিলেট জেলায় সংস্কৃতচর্চার সুব্যবস্থা বিরাজমান ছিল। এখানে প্রাপ্ত পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এ অঞ্চলের অনেক পণ্ডিত সিলেটের বাইরে খ্যাতি অর্জন করেন। মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, মুরারি গুপ্ত, পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি, অন্নদাকুমার সাংখ্যতীর্থ, করুণাময় তর্কবাগীশ, কামাখ্যাচরণ তর্কস্মৃতিতীর্থ, কুলচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ পণ্ডিত তাঁদের প্রতিভাগুণে দেশ-দেশান্তর উজ্জ্বল করে তোলেন। অন্যদিকে মুসলিম শাসন আমলে প্রায় ছয়শ' বছর ধরে বাংলার রাজভাষা ছিল ফারসি। হজরত শাহজালাল (র.)-এর সিলেট বিজয়ের পর (১৩০৩) থেকে ধর্মপ্রচারক, পির ও আলিমগণের মাধ্যমে আরবি-ফারসি শিক্ষার প্রসার ঘটে। আবু মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, তাফাজ্জুল আলী, আবু নসর ওহিদ, আঞ্জব আলী শওক, মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন, আবুল হুসাইন আবদুর রহমান জিয়া, আল্লামা মুহাম্মাদ মুশাহিদ, এলাহী বকশ হামেদ মজুমদার, মুহাম্মদ হাসান, সাঈদ বখত মজুমদার, হামিদ বখত মজুমদার, তোফাজ্জুল আলী ফজলী, আবু ইসমাইল খলীলুল্লাহ খলীল প্রমুখ বিদ্বানগণ আরবি-ফারসি ভাষাচর্চায় এ অঞ্চলকে মহিমা দান করেন। এই ধারা ব্রিটিশ শাসন আমল পর্যন্ত যেমন বিদ্যমান ছিল ঠিক তেমনি এখনও কমবেশি তা বলবৎ রয়েছে। বাংলাই এখন এদেশের প্রধান ভাষা। প্রাচীন-মধ্যযুগে

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রসার থাকলেও এখন এর ব্যবহার সীমিত। বিপরীতে ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত ফারসি রাজভাষারূপে বিদ্যমান থাকলেও কালক্রমে এ ভাষার প্রচলন থেমে যায়। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবির স্থান এখনও সর্বমহলে বিদ্যমান।

ইংরেজি শিক্ষা ও প্রচলিত শিক্ষাধারা

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে আমাদের দেশে ইংরেজরাই শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত করে যাকে অনেকেই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ইউরোপীয় মিশনারিদের প্রচেষ্টায় এদেশে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার পর আমাদের পুরোনো শিক্ষাব্যবস্থা একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। টোল ও মাদরাসাগুলো তখন ছিল এদেশের উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। আর পাঠশালা ছিল প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। পাঠশালায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্মের ছেলেমেয়ের পড়াশোনার সুযোগ ছিল। নবদ্বীপ, মিথিলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান ছিল সংস্কৃত শিক্ষার বড়ো বড়ো কেন্দ্র। পাটনা, মুর্শিদাবাদ, দেওবন্দ, দিল্লি প্রভৃতি স্থানে আরবি-ফারসি চর্চাকেন্দ্র ও মক্তব-মাদরাসা ছিল। উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রচলিত ধারার উচ্চশিক্ষা তখন ছিল অবৈতনিক ও রাজ সরকার, জমিদার বা ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য-সহযোগিতায় পরিচালিত হতো। এই ধারাবাহিকতায় সিলেট অঞ্চলেও সংস্কৃত ও আরবি-ফারসি ভাষাচর্চার সূত্রপাত ঘটে।

ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা:

নানামুখী পালাবদল

ইউরোপীয় মিশনারি ও কিছুসংখ্যক বিদ্যানুরাগীর প্রচেষ্টায় উনিশ শতকজুড়ে একদিকে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রসার লাভ করে এবং অন্যদিকে তেমনি প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। মিশনারিরা নতুন শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মুদ্রণযন্ত্র, স্থানীয় ভাষা এবং সেই ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য গ্রন্থ ছেপে খ্রিস্টের বাণী প্রচার শুরু করেন উল্লেখ্য, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সম্প্রদায়ের উইলিয়াম কেরি কয়েকজন সহকর্মীসহ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আসেন। মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত এই স্কুল প্রাচীন পাঠশালাগুলো থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র ছিল। খ্রিস্টধর্মের শিক্ষাদানের পাশাপাশি তারা ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ও পাঠদান করতেন। প্রচলিত ধারার পাঠশালাগুলো হিসাব-নিকাশ, জমাখরচ, চিঠিপত্র লেখা ও নামতা ইত্যাদি রপ্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এভাবেই প্রাচীনধারার শিক্ষার বিপরীতে উনিশ শতকজুড়ে মিশনারিদের পরিচালনায় নতুন শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে।

গোটা উনিশ শতক এবং বিশ শতকের সূচনায় অবিভক্ত সিলেট জেলায় অনেক নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার সূত্রে ১৯০৫ সালে অবিভক্ত সিলেট জেলায় প্রতিষ্ঠিত এম.ই. স্কুল সংখ্যা ছিল ৫৯টি। এর মধ্যে বর্তমান সিলেট জেলার ১৮টি স্কুল এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্কুলগুলো হচ্ছে, আখালিয়া এম.ই. স্কুল, বালাগঞ্জ এম.ভি. স্কুল, শরৎসুন্দরী এম.ই. স্কুল, বেগমপুর, বুরুঞ্জা এম. ভি. স্কুল, দত্তরাইল এম.ই. স্কুল,

ঢাকাদক্ষিণ, জৈন্তা এম.ভি. স্কুল, কানাইঘাট এম.ই. স্কুল, মঙ্গলচণ্ডী এম.ই. স্কুল, মোগলবাজার এম.ই. স্কুল, নইখাই এম.ভি. স্কুল, রণকেলী এম.ই. স্কুল, গিরিশ এম.ই. স্কুল, সিলেট, মডেল গার্লস এম.ভি. স্কুল, সিলেট, ভাটেরা এম.ই. স্কুল, পঞ্চখন্ড এম.ই স্কুল, বিয়ানীবাজার, ঢাকাউত্তর এম.ভি. স্কুল, বীরশ্রী এম.ই. স্কুল, লাউতা এম.ই স্কুল।

ইংরেজি শিক্ষাপ্রসারে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৮৭১ সালে লাউতা উচ্চবিদ্যালয় (বিয়ানীবাজার), ১৮৭২ সালে জমসেদ আহমদ উচ্চবিদ্যালয় (বিয়ানীবাজার), ১৮৭৮ সালে রাজনগর পোর্টিয়াস হাইস্কুল, ১৮৮২ সালে গুরুসদয় হাইস্কুল (জকিগঞ্জ), ১৮৮৩ সালে হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, ১৮৮৬ সালে রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুল, ১৮৮৬ সালে গিরিশ চন্দ্র মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় (পরবর্তীকালে দি এইডেড হাইস্কুল), ১৮৮৬ সালে শরৎসুন্দরী উচ্চবিদ্যালয় (বালাগঞ্জ), ১৮৮৭ সালে সুনামগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, ১৮৯১ সালে মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, ১৮৯৫ সালে কালীপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয় (কমলগঞ্জ), ১৮৯৬ সালে এল.আর. সরকারি উচ্চবিদ্যালয় (বানিয়াচং), ১৮৯৯ সালে ঢাকাদক্ষিণ উচ্চবিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯২১ সালে মন্টেগো-চেমসফোর্ডের পরিকল্পিত সংস্কার প্রবর্তনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দ্বৈতশাসন শুরু হয়। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশে প্রথম এ আইন করা হয় ১৯১৯ সালে। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থার কারণে পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার আইন শেষপর্যন্ত ১৯৩০ সালে পাস হয়। এ আইন পাসের ফলে দেশজুড়ে নানা মতভেদ দেখা দেয় এবং এর প্রতিবাদস্বরূপ ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় অসংখ্য ছাত্রছাত্রী সরকারি এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় ছেড়ে আসে। শিক্ষার জন্য আরও একবার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এ আন্দোলনের ফলে ১৯২১ সালে আবার অনেক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পায়। জাতীয় মেডিকেল কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়। পাটনা, কাশী, গুজরাট, আলীগড়, ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পায়। সিলেটে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে চিন্তাভাবনার সূত্রপাত ঘটে। শ্রীহট্ট সাহিত্য সম্মিলনী (১৮৭৭), কোলকাতার উদ্যোক্তারা জানতে পারেন যে, সিলেটের একমাত্র বিদ্যালয় মুফতি স্কুলটি অর্থ ও পরিচালনার অভাবে প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তাই শ্রীহট্ট সম্মিলনীর পক্ষে এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য বিপিনচন্দ্র পাল ও রাজচন্দ্র চৌধুরী ১৮৭৯ সালে কলকাতা থেকে সিলেটে আসেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ১৮৮০ সালের ৫ জানুয়ারি সিলেটে সর্বপ্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সিলেটের ডেপুটি কমিশনারের অফিসের সামনের মাঠে বৃহৎ লম্বা একটি ছনের ঘর প্রস্তুত করে জাতীয় বিদ্যালয় শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করে। বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন প্রধান

শিক্ষক, রাজচন্দ্র চৌধুরী দ্বিতীয় শিক্ষক এবং ঢাকা নিবাসী ব্রজেন্দ্রসেন তৃতীয় শিক্ষকরূপে দায়িত্ব পালন করেন। তখনও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন নামেই বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়। সে বছরই ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ২৮১ জনে। ১৮৮৬ সালে রাজা গিরিশচন্দ্র কর্তৃক মুরারিচাঁদ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার পরও জাতীয় বিদ্যালয়টি সগৌরবে চলতে থাকে। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে স্কুলটি বিনষ্ট হয়। রাধানাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর এই স্কুলটি মুরারিচাঁদ স্কুলের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। এ সময় জানকীনাথ সেন জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি পরিবর্তিত অবস্থায় মুরারিচাঁদ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে অভিষিক্ত হন।

১৯০৭ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত সিলেটে আরও একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সিলেট শহরের তাঁতিপাড়ার রাজাগোবিন্দ মুনশির বাড়িতে এটি প্রতিষ্ঠা পায়। পরে এ স্কুলটি দি এইডেড হাইস্কুল নামে রূপান্তরিত হয়। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীশচন্দ্র দত্ত। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কুলত্যাগী ছাত্রদের নিয়ে সিলেট কাজিরবাজারের এক গুদামঘরে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সিলেটে সফরকালে এই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে দুই হাজার টাকা দান করেন। ওই অর্থ দিয়ে চৌহাট্টার হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের বাসভবনের পাশে একটি ছনের ঘর নির্মাণ করা হয়। কাজিরবাজার হতে সেখানেই বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়। জাতীয় বিদ্যালয়ে চর্কায় সুতা কাটা, তাঁতবোনা ইত্যাদি চালু ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজিবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের আঞ্চলিক ঘাঁটি ছিল এই বিদ্যালয়গুলো। ছাত্রশিক্ষকরা একযোগে সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদির নেতৃত্ব দান করতেন। এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন, নূর মোহাম্মদ, যতীন্দ্রনাথ ভদ্র, শিশির রাহা, অশ্বিন পাল, মৌলবি আবদুল গফুর, নিরোধকুমার গুপ্ত প্রমুখ দেশকর্মী। সিলেটের গোটাটিকরে কর্মযোগাশ্রম নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন দুর্গেশচন্দ্র দাশ। বিয়ানীবাজারের অবলাকান্ত গুপ্ত খাদিমঙ্গাল নামে একটি সংস্থা এবং কুলাউড়ার রঙ্গিরকুল গ্রামে ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও পূর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্তের প্রেরণায় বিদ্যাশ্রম নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। রঙ্গিরকুল আশ্রমটি এখনও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। সিলেট শহরের শেখঘাটে জোবেদা খাতুন চৌধুরী ও সরলাবালা দেবের নেতৃত্বে মহিলা সংঘ নামে একটি সংস্থা দীর্ঘদিন কাজ করেছে। এ সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাবিস্তার, চরকা, তাঁত, তেলের ঘানি ও অন্য স্বাবলম্বীমূলক শিক্ষাবিস্তারকর্ম সাধিত হয়। কিন্তু স্বদেশি যুগের মতোই এ আন্দোলনও প্রায় থেমে যায়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রম সংস্কারও এ আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল।

শিক্ষাব্যবস্থা:

সিলেট অঞ্চলের শিক্ষাঙ্গন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৭৬৫ সালে এই অঞ্চল ব্রিটিশ অধীনে যাওয়ার পর তৎকালীন বাংলা প্রদেশের আওতাধীন ঢাকা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে বড়োলাট নর্থব্রুকের সময় ১৮৭৪ সালে সিলেটকে আসাম প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে কিছুটা খণ্ডিত অবস্থায় সিলেট যুক্ত হয় চট্টগ্রাম বিভাগের সঙ্গে।

এই অঞ্চলে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত জেলাভিত্তিক মাদরাসাগুলোর মধ্যে হবিগঞ্জ জেলায় ৩০টি, মৌলভীবাজার জেলায় ২৫টি, সিলেট জেলায় ৬১, সুনামগঞ্জ জেলায় ৪১টি এবং সিলেট অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১৬টি। এছাড়াও আরও ৯টি টোল-চতুষ্পাঠী রয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা মুসলমান সমাজে যে সর্বজনীন আবেদন রেখেছে টোল-চতুষ্পাঠী ঠিক সেভাবে হিন্দুসমাজকে টানতে পারেনি। এ-প্রসঙ্গে রসময় মোহান্ত লেখেন :

> 'জাত্যাভিমানী পণ্ডিতেরা একদিন সাধারণ হিন্দুসমাজকে ধর্মীয় শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন অধিকারের প্রশ্ন তুলে। আজ তাদের শাস্ত্রচর্চার শূন্য দেউলে হতাশা আর উপেক্ষার অবাধ বিচরণ। উচ্চবিত্তশ্রেণির আর্থিক অর্থানুকূল্যে পণ্ডিতপরম্পরায় টোল-চতুষ্পাঠীর যে শিক্ষা এতদঞ্চলে চলে আসছিল, বাস্তব জীবনের প্রাসঙ্গিকতা, প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার অভাবে তা আজ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে।' (মোহান্ত : ১৯৯০, পৃ. ৯৬)।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, কনৌজ হতে মিথিলা হয়ে ত্রিপুরারাজের অনুরোধে একদল পণ্ডিত সিলেটে এসেছিলেন। মুসলমানদের আগমনের আগে শিক্ষাক্ষেত্রে এরাই ছিলেন পথিকৃৎ। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও মিথিলা থেকে সিলেট এসেছিলেন। নবদ্বীপে নব্যন্যায় শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ শিরোমণি, মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারও সিলেটের পঞ্চখণ্ডের সন্তান। শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র সিলেট থেকে নবদ্বীপ গিয়ে বসবাস শুরু করেন। অদ্বৈত আচার্য, মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস প্রমুখ শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণ সিলেটেরই সন্তান। সিলেটের পঞ্চখণ্ড, বুরুঙ্গা, তরফ, দিনারপুর, বানিয়াচং ইত্যাদি স্থানে টোল ও চতুষ্পাঠী গড়ে উঠেছিল।

হজরত শাহজালাল (র.) এর সিলেট আগমন হয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। মোগল আমলে সিলেটের তরফ অঞ্চলের নরপতি, লস্করপুরের সুলতানশী, পৈল, গোলাপগঞ্জের ফুলবাড়ি, কানাইঘাটের ঝিঙ্গাবাড়ি ও গাছবাড়ি, নবীগঞ্জের ইমামবাড়ি, ধূলছাতল, জগন্নাথপুরের সৈয়দপুর প্রভৃতি স্থানে মাদরাসা গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের সিলেটে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে সৈয়দ মুর্তাজা আলী প্রণীত 'শিক্ষা অঙ্গানে সাবেক সিলেট' শীর্ষক প্রবন্ধের মর্মকথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। সিলেট শহরের এহিয়া ভিলার আবদুল কাদির প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ছাত্রদের পড়াতেন। মজুমদারিতে হাজি সৈয়দ বক্স

মজুমদার এক উচ্চাঙ্গের মাদরাসা স্থাপন করেন। এই মাদরাসার প্রধান ছিলেন সামসুল ওলামা মাওলানা আবু আলী আবদুল ওয়াহাব। দরগাহ মহল্লাতেও মুফতি পরিবারের মাওলানা জিয়াউদ্দিন একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদরাসার জন্য মোগল বাদশাহরা লাখেরাজ ভূমি দান করেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক এই মাদরাসায় ফারসি ও আরবি ভাষা শিক্ষা করতেন। ১৮২৭ সাল পর্যন্ত এই মাদরাসা চালু ছিল বলে জানা যায়। মোগল আমলে সিলেট শহর, ফুলবাড়ি ও তরফে কয়েকটি মাদরাসা ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি কর্তৃক পাইকারিভাবে লাখেরাজ ভূমি বাতিল করায় মক্তব-মাদরাসা শিক্ষা ব্যবসা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পঞ্চখণ্ড, তরফ, ইটা, ঢাকাদক্ষিণ প্রভৃতি স্থানে টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮৩৬ সালে সিলেট শহরে ইংরেজি শেখানোর জন্য প্রবেশনারি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৫০ সালে ডব্লিউ এইচ ফকস হেড মাস্টার নিযুক্ত হলে স্কুলটির উন্নতি হয় এবং এ স্কুল থেকে তিনজন ছাত্র সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় পাস করে। ১৮৫৪ সালে এই স্কুলে ১৯জন মুসলমান ছাত্র ও ১১৫ জন হিন্দু ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করে। ১৮৫৪ সালে এই স্কুল জিলা স্কুলে রূপান্তরিত হয়। আবার ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় স্কুলটি ওঠে যায়। এ স্কুল ওঠে যাওয়ার পরে রেভারেন্ড প্রাইজ সিলেট শহরের নয়াসড়ক ও শেখঘাট (কাজির বাজার) মহল্লায় দুটো স্কুল স্থাপন করেন। তিনি নিজে এ দুটো স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৮৫৯ সালে নবকিশোর সেন পাদ্রি প্রাইজের স্থাপিত বিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রাইজ ১৮৬৩ সালে কাছার জেলার শিলচরে একটি হাইস্কুল স্থাপন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সেখানে তিনটি মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শেষ জীবনে রেভারেন্ড প্রাইজ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস নেন। এই আত্মত্যাগী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের অর্থে ১৮৯৭ সালে প্রাইজ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি সিলেটে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই লাইব্রেরি কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ লাইব্রেরির সঙ্গে একীভূত করা হয়। ১৮৬৭ সালে চৌহাট্টা মহল্লায় রাসবিহারী দত্ত 'রাসবিহারী মধ্য ইংরেজি স্কুল' স্থাপন করেন। প্রায় ১০ বছর চলার পর ১৮৭৭ সালে স্কুলটি ওঠে যায়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবদুল করিম এই স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৯ সালে সিলেটে গভর্নমেন্ট হাইস্কুল স্থাপিত হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী রায় সাহেব দুর্গাকুমার বসু (১৮৪৯-১৯২০) এই স্কুল স্থাপনের সময় হেডমাস্টার নিযুক্ত হন এবং একাধিক্রমে ৩৪ বছর শিক্ষকতা করে এই স্কুলকে উচ্চশ্রেণির হাইস্কুলে রূপান্তরিত করেন। ১৮৭৬ সালের ১ জানুয়ারি মুফতি জালাল উদ্দিন ও মুফতি নুর উদ্দিন দরগামহল্লায় মুফতি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮০ সালের জানুয়ারি মাসে বিপিনচন্দ্র পাল, রাজচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ উদ্যমশীল শিক্ষাব্রতীরা এই স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন- একথা ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। রাধানাথ চৌধুরী এই স্কুলের

স্বনামখ্যাত হেডমাস্টার ছিলেন। ১৮৯৭ সালে গিরিশচন্দ্র রায় জাতীয় বিদ্যালয়টি খরিদ করে মুরারিচাঁদ কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করেন। ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্র ১৮৮৬ সালে মুরারিচাঁদ স্কুল স্থাপন করেন। আসাম সরকার ১৯১২ সালে মুরারিচাঁদ কলেজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করলে এই স্কুলের নাম গিরীশভঙ্গা হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। জানকীনাথ সেন ১৮৮৬ সালে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়োজিত হন। তিনি প্রায় ৪০ বছর এই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। একজন স্বাধীনচেতা ও সার্থক শিক্ষাব্রতী হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ১৮৭০ সালে চৌয়াল্লিশ পরগণার কাজি মোহাম্মদ আহমদ তার নিজ গ্রাম দুর্লভপুরে একটি মধ্যভঙ্গা স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৭৮ সালে রাজনগরে পোর্টিয়াস মধ্য ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯২৮ সালে এটি হাইস্কুলে উন্নীত হয়।

সিলেটের প্রথম স্নাতক ডিগ্রিধারী মোহাম্মদ দাইম ১৮৬৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি উপমহাদেশের দ্বিতীয় এবং বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম স্নাতক। জয়গোবিন্দ সোম ১৮৬৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে প্রথম স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। নবীনচন্দ্র শর্মা, রায়বাহাদুর দুলালচন্দ্র দেব, তারাকিশোর চৌধুরী, মৌলবি আবদুল করিম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইংরেজি শিক্ষাক্ষেত্রে এ অঞ্চলের অগ্রণীপুরুষ।

১৯৪০ সালে সিলেট শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় মদনমোহন কলেজ। কলেজ-প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রমোহন দাস ও মোহিনীমোহন দাসের বাবা মোদনমোহন দাসের স্মৃতিরক্ষার্থে এ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৮০ সালের পর সিলেট জেলার প্রায় প্রত্যেকটি উপজেলায় এক বা একাধিক কলেজ প্রতিষ্ঠা পায়।

শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা পায়। কলেজের ভূমিদাতারা হচ্ছেন রায়বাহাদুর নলিনীকান্ত দস্তিদার, রায়বাহাদুর রজনীকান্ত দস্তিদার, যামিনীকান্ত রায় দস্তিদার, বিরাজকান্ত রায় দস্তিদার ও ধরণীকান্ত রায় দস্তিদার। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এটি সরকারি কলেজরূপে কার্যকর ছিল। বর্তমানে বেসরকারিভাবে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এই ধারাবাহিকতায় সিলেটে প্রতিষ্ঠিত হয় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, লিডিং ইউনিভার্সিটি, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, নর্থইস্ট ইউনিভার্সিটি ও সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সরকারি তিব্বিয়া কলেজ, রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ, নর্থ-ইস্ট মেডিকেল কলেজ, উইমেন্স মেডিকেল কলেজ এবং সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ অনেক প্রতিষ্ঠান বহুমাত্রিক জ্ঞানচর্চাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সিলেট

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সিলেটের নারীদের স্বর্ণোজ্জ্বল ভূমিকার কথা আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে পাই। অঞ্জলী পালিত, অন্নদাসুন্দরী দেবী, চিত্রলেখা দত্ত, বিষ্ণুপ্রিয়া

দেবী, সুফিয়া বেগম, সাহিফা বানু, কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরাণী, লীলা নাগ, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, সৈয়দা হাবিবুন্নেসা, জোবেদা খাতুন (রহিম) চৌধুরী, সৈয়দা শাহার বানু চৌধুরী, জিল খান, জ্যোস্না চন্দ, সিরাজুননেসা চৌধুরী, অনুরাধা চন্দ, নাজমা চৌধুরী, সুহাসিনী দাস, সামসি খানম চৌধুরী, হেনা দাস, হেমন্ত কুমারী চৌধুরাণী, আসমা কিবরিয়া, রোকেয়া সুলতানা, সুমিত্রা দাস, নজমুন আরা সুলতানা, জেবা রশীদ চৌধুরী, শাহলা খাতুন প্রমুখ নারী শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজসেবা, ললিতকলা ও অধ্যাত্ম চেতনা, সিভিল সার্ভিস, চিকিৎসা ও প্রকৌশল বিষয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে সিলেট অগ্রগামী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় (১৯০৩), কিশোরিমোহন বালিকা বিদ্যালয়, মইনুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়, আম্বরখানা গার্লস হাইস্কুল, কাজি জালাল উদ্দিন গার্লস হাইস্কুল এবং সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ, মইনউদ্দিন মহিলা কলেজের কথা এখানে উল্লেখের দাবি রাখে।

সিলেটে নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কলকাতার শ্রীহট্ট সম্মিলনীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৬-৭৭ সালে সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, রাজচন্দ্র দাস, রাজচন্দ্র পালচৌধুরী, তারাকিশোর চৌধুরী, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখ সিলেটের প্রথম এম.এ. ডিগ্রিধারী জয়গোবিন্দ সোমের সভাপতিত্বে এই সংস্থা গঠন করেন। তৎকালীন নারীশিক্ষা সম্পর্কে নরেন্দ্রকুমার গুপ্তচৌধুরী লিখেছেন :

সেই সময়ে শ্রীহট্ট জেলায় স্ত্রী শিক্ষার জন্য কোনোও স্কুল ছিল না। তদুপরি স্কুলের ছাত্রী সংগ্রহ করা এবং তাহাদের বিবাহ দেওয়া এক দুষ্কর ব্যাপার ছিল। পিতামাতা বাড়ীতেই সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন। সমাজমনে এই প্রতীতিও দৃঢ়মূল ছিল যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে তাদের চরিত্র নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এবং এসব মেয়েকে ঘরে আনাও ন্যায়বিরোধী। তখনকার দিনে সাত আট বছরের মেয়েকে রাস্তায় দূরের কথা বাড়ির সম্মু খের পুকুরে স্নানে যেতে দেওয়া হত না। বহু চেষ্টার পর শ্রীহট্টের তদানীন্তন স্পেশিয়েল সাব রেজিস্ট্রার-রাজচন্দ্র চৌধুরীর বিদূষী পত্নী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণীর অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীহট্ট বর্তমান বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের উত্তরার্ধে দুই বার টিনের একটি ক্ষুদ্রগৃহে ১৯০৩ সালে ইংরাজিতে বালিকাদের জন্য একটি নিম্ন প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হয়। হেমন্তকুমারী স্কুলের সেক্রেটারী ও অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি বালিকাবস্থায় পাঞ্জাবে থাকিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়েছিলেন। তাঁর পিতা নবীনচন্দ্র রায় পাঞ্জাবে চাকরি করতেন। হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী সম্পাদিত ‘অন্তঃপুর’ মাসিক পত্রিকা ১৩০৮ বাংলায়, মোতাবেক ১৯০১ ইংরাজিতে কলিকাতা হতে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাই শ্রীহট্টের মেয়েদের সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা।

এরপর হেমন্তকুমারী বিদ্যালয়টিকে মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে উন্নীত করে পাতিয়ালা রাজ্যে লেডি সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হয়ে চলে যান এবং পরে সারদাচরণ শ্যাম প্রমুখের চেষ্টায় এটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে উন্নীত হয়।

এছাড়া ১৮৮৬ সালে ওয়েলস প্রেসবিটারিয়ান মিশন সিলেটে প্রতিষ্ঠা করেন মিশন বালিকা বিদ্যালয়। পরে বিদ্যালয়টি মীরাবাজারের কিশোরীমোহন সেনের পরিচালনায় আসে। এটি বর্তমানে কিশোরীমোহন বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে সুপরিচিত।

স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের আনুকূল্যে ১৯২৮ সালে চালিবন্দরে প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মধ্য ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়। এটি বর্তমানে উচ্চবিদ্যালয় হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ১৯৩৫ সালে শেখঘাটে শেখ মো. সিকন্দর আলী প্রতিষ্ঠিত মইনুন্নেসা প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও ১৯৭৬ সালে উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে।

এ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে অবরোধবাসিনী মহিলাদের (বিশেষত মুসলিম মহিলাদের) শিক্ষার জন্য এক বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ফাতেমা চৌধুরী 'নারী শিক্ষায় সিলেট' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছেন, গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হিন্দু-মুসলিম মেয়েরা যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন, তাই ব্রিটিশ সরকার জেনানা ক্লাসের প্রবর্তন করেন। কয়েকজন প্রগতিশীল মহিলাকে জেনানা ক্লাসের শিক্ষিকা নিযুক্ত করা হয়। এদের বলা হত গভর্নেস। এরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। সিলেটে তিনজন গভর্নেস ছিলেন- তারা হলেন সরযুবালা বর্মণ, ইন্দুবালা চৌধুরী এবং মিসেস পি. ব্যানার্জী। সিলেটে নারীশিক্ষা প্রসারে মিসেস সূর্যমুখী দাস নামে একজন খ্রিস্টান মহিলার দান অনন্য। তিনি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সদস্যা ও মইনুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী ছিলেন। তাঁর কন্যা মিসেস বিলকিস জায়গীরদারেরও সিলেটে নারীশিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভূমিকা রয়েছে।

সিলেটে নারীশিক্ষা বিস্তারে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সিলেট মহিলা কলেজ। পাইলগাঁওয়ের জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বসন্তকুমার দাস, বৈদ্যনাথ মুখার্জি, রায়বাহাদুর ধর্মদাস দত্ত এবং এ.এ. আবদুল হাফিজ প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৯৩৯ সালে বর্তমান বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মহিলা কলেজ হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রথম অবৈতনিক অধ্যক্ষ হিসেবে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলেজটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হলেও ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে এর পরিচালনা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। মহিলা কলেজের সে দুঃসময়ে প্রথমে অধ্যক্ষ গিরিন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও পরে অধ্যক্ষা হুসনে আরা আহমদ এর হাল ধরেন। এ পর্যায়ে কলেজটি টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট অবদান রাখেন অধ্যক্ষ সলমান চৌধুরী, শরফউদ্দিন চৌধুরী, এডভোকেট এ.এ.

হাফিজ, সিরাজুন্নেসা চৌধুরী, জোবেদা খাতুন চৌধুরী প্রমুখ। ১৯৮০ সালে পুনরায় কলেজটি সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়।

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের তুলনামূলক অনগ্রসরতার কথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই। সাবেক চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়া চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলের নারীশিক্ষার হার ছিল সিলেট অঞ্চলের এই হারের যথেষ্ট উপরে। সারণিতে ১৯৭৪, ১৯৮১ এবং ১৯৯১ সালের আদমশুমারির হিসাব মতে এতদঞ্চলের নারীশিক্ষার হারের একটি তুলনামূলক সংখ্যাচিত্র প্রদত্ত হলো।

সারণি-১০১

চট্টগ্রাম বিভাগীয় অঞ্চলের নারীশিক্ষার তুলনামূলক হার

অঞ্চল	১৯৭৪ (৫ বছর+)	১৯৮১ (৫ বছর+)	অঞ্চল	১৯৯১ (৭ বছর+)
বাংলাদেশ	১৪.৮	১৬.০	বাংলাদেশ	২৫.৫
সিলেট	১২.৬.	১৩.১	চট্টগ্রাম বিভাগ	২৭.০
নোয়াখালী	১৫.৮	১৯.৩	সুনামগঞ্জ জেলা	১৬.৭
কুমিল্লা	১৪.৮	১৬.৬	সিলেট জেলা	২৭.৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৯.০	১০.৩	মৌলভীবাজার জেলা	২৪.৬
চট্টগ্রাম	১৫.৮	১৮.১	হবিগঞ্জ জেলা	১৮.৫

সূত্র : (১) বাংলাদেশ এডুকেশন ইন স্টেটিস্টিকস্, ১৯৯১; পৃ. ১৭৭ এবং (২) বাংলাদেশ পপুলেশন সেন্সাস এনালাইটিক্যাল রিপোর্ট, ১৯৯৪; পৃ. ২৬৪।

এখানে উল্লেখ্য, বিভিন্ন আদমশুমারিতে সাক্ষরতার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। যে কোনো ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারাকে ১৯৭৪ সালের সংজ্ঞায় সাক্ষরতা বলা হলেও যে কোনো ভাষায় চিঠি লেখার যোগ্যতাকে ১৯৮১ সালের সংজ্ঞায় সাক্ষরতা বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে ১৯৮১ সালের সংজ্ঞাই অনুসৃত হয়েছে।

সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭৪ ও ১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে নোয়াখালী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চল নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় হারেরও উপরে রয়েছে। ১৯৮১ সালের শুমারিতে নোয়াখালী অঞ্চল চট্টগ্রাম অঞ্চলকেও এক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে নারীশিক্ষার জাতীয় হার ১.২% বাড়লেও সিলেট অঞ্চলের ক্ষেত্রে বেড়েছে মাত্র ০.৫%। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে নারীশিক্ষায় জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায় যে এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বিভাগের হার (২৭.০%) জাতীয় হারের (২৫.৫%) উপরে হলেও বর্তমান সিলেট জেলা ব্যতীত বাকি তিনটি জেলাই জাতীয় হারের নিচে রয়েছে। হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলার নারীশিক্ষার হার এমনকি ২০%-এরও নিচে।

সিলেট জেলার নারীশিক্ষার থানাভিত্তিক হার হচ্ছে (১) বালাগঞ্জে ২৬.৭%, (২) বিয়ানীবাজারে ৩৭.৬%, (৩) বিশ্বনাথে ২৮.১%, (৪) কোম্পানীগঞ্জে ৭.০%, (৫) ফেঞ্চুগঞ্জে ৩৩.৬%, (৬) গোলাপগঞ্জে ৩৩.২%, (৭) গোয়াইনঘাটে ৮.৬%, (৮) জৈন্তাপুরে ১৩.৭%, (৯) কানাইঘাটে ১৩.৭%, (১০) সিলেট সদর থানায় ৩৭.৬% এবং (১১) জকিগঞ্জে ২২.০% মাত্র। স্বাভাবিকভাবে এ জেলার সদর থানা ও বিয়ানীবাজারে নারীশিক্ষার হার সর্বোচ্চ। সর্বনিম্নে রয়েছে কোম্পানীগঞ্জ থানা। কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট থানার নারীশিক্ষার হার এমনকি সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজারের হারেরও নিচে। একেই হয়ত বলে প্রদীপের তলায় অন্ধকার।

সিলেট জেলার শিক্ষার বর্তমান চিত্র বোঝার জন্য সারণিতে তথ্য উপস্থাপিত হলো :

প্রাথমিক শিক্ষা

সারণি-১০২

সিলেট জেলায় উপজেলাভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়

ক্র. নং	উপজেলা	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (সপ্রাবি.)	সদ্য জাতীয়করণকৃত সপ্রাবি (০১.০১.১৩)	১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন	বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (বেসপ্রাবি)	কিন্ডারগার্টেন (কে.জি) স্কুল	মোট
০১	সিলেট সদর	৯৭	২৬	২	৫	১৭৩	৩০৩
০২	বিশ্বনাথ	৯৮	২৯	৩	০	৪৫	১৭৫
০৩	বালাগঞ্জ	১৪৩	৩৭	১	৪	৩৭	২২২
০৪	ফেঞ্চুগঞ্জ	৩৬	৮	০	৩	২২	৬৯
০৫	গোলাপগঞ্জ	১৪০	৩৪	৪	৪	৭০	২৫২
০৬	বিয়ানীবাজার	১১৩	৩২	৫	৩	৩৭	১৯০
০৭	জকিগঞ্জ	১০৭	২৫	৪	০	৪৩	১৭৯
০৮	কানাইঘাট	৯২	৩৪	৩	০	৩৬	১৬৫
০৯	জৈন্তাপুর	৪১	২৫	৬	০	২	৭৪
১০	কোম্পানীগঞ্জ	৩২	৩৪	৪	১	১২	৮৩
১১	গোয়াইনঘাট	৮৫	৩৩	৬	২৩	৩৫	১৮২
১২	দক্ষিণ সুরমা	৮২	২৯	৩	৫	৭৫	১৯৪
মোট		১০৬৬	৩৪৬	৪১	৪৮	৫৮৭	২০৮৮

সূত্র : জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট। ২৫ মে ২০১৭।

সারণি ২ বিশ্লেষণে সিলেট জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ৫৮৭টি কিন্ডারগার্টেন (কে.জি) স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষণীয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

সারণি-১০৩
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

উপজেলা	প্রাথমিক স্কুল*	মাধ্যমিক স্কুল*	স্কুল ও কলেজ*	কলেজ*	মাদরাসা*
সিলেট সদর	৩০৩	৪৬	৯	২৪	১০১
দক্ষিণ সুরমা	১৯৪	২৪	২	৫	১৮
ফেঞ্চুগঞ্জ	৬৯	১১	১	১	১৯
গোলাপগঞ্জ	২৫২	২৮	৭	৫	১১৩
বিয়ানীবাজার	১৯০	৪২	১	৫	৬৬
জকিগঞ্জ	১৭৯	২৪	-	৪	২৬
জৈন্তাপুর	৭৪	১৫	-	৪	৬১
কানাইঘাট	১৬৫	১৯	৩	৫	৪১
বালাগঞ্জ	২২২	১৪	১	২	২১
বিশ্বনাথ	১৭৫	২৯	১	৩	৫২
গোয়াইনঘাট	১৮২	২৬	৩	৫	৯৩
কোম্পানীগঞ্জ	৮৩	১৩	৩	১	৩৮
ওসমানীনগর	বালাগঞ্জের সাথে	২০	১	৪	২২
মোট	২০৮৮	৩১১	৩২	৬৮	৬৭১

সূত্র: i) জেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস *(সরকারি + বেসরকারি)
ii) ব্যানবেইস, ঢাকা।

সারণি-১০৪
সিলেট জেলার শিক্ষাহার, ১৯৮১-২০১১

উপজেলা/এলাকা	শিক্ষার হার ৭ বছর ও তদূর্ধ্ব (%)			
	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
বালাগঞ্জ	২২.৭	৩১.৪	৪৭.৮	৫০.২
বিয়ানীবাজার	৩১.৪	৪৩.৪	৫২.৫	৫৯.৭
বিশ্বনাথ	২১.৭	৩৩.৬	৩৩.৯	৪৬.৯
কোম্পানীগঞ্জ	০৯.৩	১২.৩	২৭.৭	২৮.৮
দক্ষিণ সুরমা	-	-	-	৫৬.০
ফেঞ্চুগঞ্জ	৩৩.০	৩৯.০	৪৬.৩	৫০.৫
গোলাপগঞ্জ	২৬.৮	৩৩.৭	৪৮.২	৫৭.০
গোয়াইনঘাট	১২.১	১৫.১	২২.৮	৩২.৭
জৈন্তাপুর	১৫.৪	২৪.৭	৩৫.১	৪১.২
কানাইঘাট	১৪.১	২১.৮	২৯.৬	৪৩.৫
সিলেট সদর	৩৭.৫	৪৪.১	৫৯.১	৬১.৩
সিলেট সিটি করপোরেশন	-	-	-	৬৭.৮
জকিগঞ্জ	২২	৩০.৮	৪৫.২	৪৯.৪
সিলেট জেলা	২৫.০২	৩৩.৮৫	৪২.৩৪	৫১.০২

উৎস : জেলা পরিসংখ্যান ২০১১ সিলেট, বিবিএস।

সিলেট জেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে শিক্ষার হার। ১৯৮১ সালে সিলেট জেলায় শিক্ষার হার ছিল ২৫.০২ % আর ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৫১.০২%। শিক্ষার হার আরও দ্রুতহারে বৃদ্ধি এবং সেই সাথে শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। যেমন, প্রথম শ্রেণি থেকে এসএসসি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক করা, উপবৃত্তি, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিফিন সরবরাহ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিত্র-২

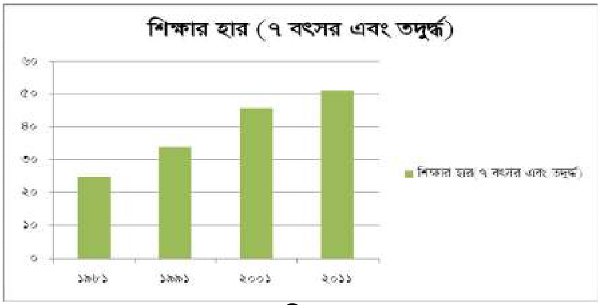

সারণি-১০৫

সিলেট জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-শিক্ষক-বিদ্যার্থী (২০১৬-২০১৭)

উপজেলা	প্রাথমিক স্কুল	মাধ্যমিক স্কুল	স্কুল ও কলেজ	কলেজ	মাদরাসা	মোট
	শিক্ষক	শিক্ষক	শিক্ষক	শিক্ষক	শিক্ষক	
	বিদ্যার্থী-সংখ্যা	বিদ্যার্থী-সংখ্যা	বিদ্যার্থী-সংখ্যা	বিদ্যার্থী-সংখ্যা	বিদ্যার্থী-সংখ্যা	
সিলেট সদর	৩০৩	৪৬	৯	১২	১৭	৩৮৭
	৮২১	৮০৯	৪২৮	৪২৭	২৯২	২৭৭৭
	১০১২১৭	৪২২৫৭	১১০১৯	৪৩৩৮৬	৭৪৬৪	২০৫৩৪৩
দক্ষিণ সুরমা	১৯৪	২৪	২	৪	১২	২৩৬
	৬৯৫	২৯৯	৪৫	১৮৬	১৫২	১৩৭৭
	৫১৪১১	১৫৬৯৩	২৪৫৫	৫৯৯৬	৩৪০৭	৭৮৯৬২
ফেঞ্চুগঞ্জ	৬৯	১১	১	১	৬	৮৮
	২৬৯	১৫৯	২০	৩০	৭১	৫৪৯
	১৪৭৩০	৭৬৩৯	৮৯৭	২২৪৭	২০৯১	২৭৬০৪
গোলাপগঞ্জ	২৫২	২৮	৭	৪	১৭	৩০৮
	৯৮৬	৩২২	১৮৪	১৩৯	১৫৬	১৭৮৭
	৪৮১৭৩	১৪১১০	৯৭৩১	৩৫৪৫	৫০৩৬	৮০৫৯৫
বিয়ানীবাজার	১৯০	৪২	১	৪	১৩	২৫০
	৮৬২	৪৪৩	৩৬	৯১	১৫৮	১৫৯০
	৩৪৬৭৯	১৯৮৪৪	৮২৪	৭০৪৯	৩৫৫৮	৬৫৯৫৪

উপজেলা	প্রাথমিক স্কুল	মাধ্যমিক স্কুল	স্কুল ও কলেজ	কলেজ	মাদরাসা	মোট
	শিক্ষক	শিক্ষক	শিক্ষক	শিক্ষক	শিক্ষক	
	বিদ্যার্থী-সংখ্যা	বিদ্যার্থী-সংখ্যা	বিদ্যার্থী-সংখ্যা	বিদ্যার্থী-সংখ্যা	বিদ্যার্থী-সংখ্যা	
জকিগঞ্জ	১৭৯	২৪	-	৪	১৯	২২৬
	৭৮৪	২৫৩	-	৭৬	২০৬	১৩১৯
	৪০৫০২	১৭৬৬৭	-	৩০১৩	৬৩০৬	৬৭৪৮৮
জৈন্তাপুর	৭৪	১৫	-	৪	৩	৯৬
	৪২৯	১৫৫	-	১১১	৩৫	৭৩০
	২৪০৫২	৯২১১	-	৩৬৫৩	৭৭১	৩৭৬৮৭
কানাইঘাট	১৬৫	১৯	৩	২	১০	১৯৯
	৭৪৬	২০৬	৫১	৭৩	১১৫	১১৯১
	৬২৭০০	১৩৭৩৯	২৪৪৮	২৬২২	৪৬২৫	৮৬১৩৪
বালাগঞ্জ	২২২	১৪	১	২	৭	২৪৬
	১০২৪	১৩৪	২০	২২	৭৪	১২৭৪
	৫১১২১	৭৫১৪	৯৫৬	৯৭৩	২১১৬	৬২৬৮০
বিশ্বনাথ	১৭৫	২৯	১	৩	১৫	২২৩
	৭২৯	৩০৩	১৮	৭২	১৭১	১২৯৩
	৩৫১৭১	১৪০৫০	৯৯০	৩০৪৮	৪৭৬৩	৫৮০২২
গোয়াইনঘাট	১৮২	২৬	৩	৫	৮	২২৪
	৬৯৪	২৫৩	৩৪	৮১	৭৭	১১৩৯
	৫৩৫৬১	১৭৪৩৭	২৪৬১	৩১০১	১৯১৭	৭৮৪৭৭
কোম্পানীগঞ্জ	৮৩	১৩	৩	১	৪	১০৪
	৩৯৩	৯৩	৫৬	১৬	২৫	৫৮৩
	২৯৫৪০	৬০২২	৩৯৮৩	৬৯৬	৯৬৪	৪১২০৫
ওসমানীনগর	-	২০	১	৪	৯	৩৪
	-	১৯৭	১৯	৯২	১০৬	৪১৪
	-	১০৫১৫	১৩৮৩	৩৫৯৪	৩০৭৪	১৮৫৬৬

সূত্র : সিলেট জেলা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তর।

সারণি-১০৬
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট-এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ২০১০-২০১৭

		২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
অবতীর্ণ পরীক্ষার্থী	ছাত্র	১৯০৮৮	২১৯২৭	২৫৮৬২	২৫৯৪২	৩০১৭৪	৩২৪১৩	৩৭৬৭২	৪১৬২৬
	ছাত্রী	২২১৪৫	২৬৫৫১	৩২৫১৪	৩২৫৬৪	৩৭৯১১	৩৯৬১১	৪৬৭৭৬	৫২২৮৯
	মোট	৪১২৩৩	৪৮৪৭৮	৫৮৩৭৬	৫৮৫০৬	৬৮০৮৫	৭২০২৪	৮৪৪৪৮	৯৩৯১৫
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	ছাত্র	১৫৫৫৩	১৮৫৮৩	২৩৮৯৩	২৩৪৮৮	২৭৩৯৯	২৬৯৬৬	৩২৩১৮	৩৩৬৫৫
	ছাত্রী	১৬৭৮৩	২০৭৯৫	২৯৬৮৬	২৮৫৫৭	৩৩৩৫১	৩১৯৬৬	৩৯২৬৮	৪১৭১৯
	মোট	৩২৩৩৬	৩৯৩৭৮	৫৩৫৭৯	৫২০৪৫	৬০৭৫০	৫৮৯৩২	৭১৫৮৬	৭৫৩৭৪
পাসের শতকরা হার	ছাত্র	৮১.৪৮	৮৪.৭৫	৯২.৩৯	৯০.৫৪	৯০.৮০	৮৩.০২	৮৫.৭৯	৮০.৮৫
	ছাত্রী	৭৫.৭৯	৭৮.৩২	৯১.৩০	৮৭.৭০	৮৭.৯৭	৮০.৭০	৮৩.৯৫	৭৯.৭৯
	মোট	৭৮.৪২	৮১.২৩	৯১.৭৮	৮৮.৯৬	৮৯.২৩	৮১.৮২	৮৪.৭৭	৮০.২৬
প্রাপ্ত জিপিএ ৫	ছাত্র	১১৪৮	১২৪০	১৫৭১	১৬৮৩	১৭৩২	১৩৩৮	১২২৫	১৪২৭
	ছাত্রী	৮২৯	৯০৮	১০৪০	১১০৬	১৬০৯	১১১৪	১০৪১	১২৩৬
	মোট	১৯৭৭	২১৪৮	২৬১১	২৭৮৯	৩৩৪১	২৪৫২	২২৬৬	২৬৬৩

			২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
বিভাগওয়ারী শতকরা হার	বিজ্ঞান	ছাত্র	৯২.১৯	৯০.৩৫	৯৬.৮০	৯৪.১২	৯১.৭৬	৯৫.১৫	৯৩.৯৪	৯১.৯৫
		ছাত্রী	৮৯.৫৭	৮৮.২৩	৯৬.৪৭	৯১.৫৪	৯১.৪৯	৯৫.০৮	৯৩.৬০	৯০.২১
		মোট	৯১.০৫	৮৯.৪১	৯৬.৬৫	৯২.৯৮	৯১.৬৪	৯৫.১২	৯৩.৭৮	৯০.৯২
	মানবিক	ছাত্র	৭৬.৪৫	৮১.৮৬	৯০.৬৩	৮৮.৬৬	৮৯.৭২	৭৬.৯৭	৮১.১০	৭৫.২১
		ছাত্রী	৭২.১৬	৭৫.৭৮	৯০.১৯	৮৬.৫৭	৮৬.৭৬	৭৬.১১	৮০.৯০	৭৬.৪৭
		মোট	৭৩.৯১	৭৮.২৩	৯০.৩৬	৮৭.৩৯	৮৭.৯৩	৭৬.৪৬	৮০.৯৮	৭৫.৯৭
	ব্যবসায় শিক্ষা	ছাত্র	৮৫.২১	৮৯.৯৪	৯৩.৯৩	৯৩.৭৪	৯৪.০০	৮৮.২৮	৯১.৭০	৮৮.৯৩
		ছাত্রী	৮৫.৭৩	৮৯.২৮	৯৪.৪৮	৯৩.৪১	৯৩.২৬	৯০.৭৩	৯০.৫৫	৮৮.৯৪
		মোট	৮৫.৩৮	৮৯.৭১	৯৪.১৩	৯৩.৬১	৯৩.৭০	৮৯.২৮	৯১.২২	৮৮.৯৪
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০০% পাস		৪৩	৪২	১২১	৮৪	৬৭	৩৬	৬২	৩৭
	০% পাস		০১	০০	০০	০০	০০	০০	০১	০০
বহিস্কৃত পরীক্ষার্থী			০৪	০১	০২	০১	১০	২৬	০৭	০৫
বহিস্কৃত শিক্ষক			-	-	-	-	-	-	-	-

সূত্র : মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, সিলেট

সারণি-১০৭
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, সিলেট-এর
মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ২০১০-২০১৬

			২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
অবতীর্ণ পরীক্ষার্থী	ছাত্র		৯,৪২৪	১৪,৩৭৮	১৭,৪৮৭	২০,১১৪	২৬,২৮৪	২৬,৬৫৭	২৯,৫৫৩
	ছাত্রী		১০,৩৯৬	১৬,৫১৬	১৯,৮৮৫	২২,৮৬৬	৩১,২৭৭	৩১,০৪৫	৩৪৪০৫
	মোট		১৯,৮২০	৩০,৮৯৪	৩৭,৩৭২	৪২,৯৮০	৫৭,৫৬১	৫৭৭০২	৬৩৯৫৯
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	ছাত্র		৭,৩৯১	১১,১৭২	১৫,০১৮	১৬,০৪৬	২০,৮১৫	১৯৭২১	২০৭৭৯
	ছাত্রী		৭,৬৯৬	১২,২০৯	১৬,৮৮৫	১৭,৯৬৩	২৪,৭৫৩	২৩৩০৭	২৩০৯১
	মোট		১৫,০৮৭	২৩,৩৮১	৩১,৯০৩	৩৪,০০৯	৪৫,৫৬৮	৪৩০২৮	৪৩৮৭০
পাসের শতকরা হার	ছাত্র		৭৮.৪৩	৭৭.৭০	৮৫.৮৮	৭৯.৭৮	৭৯.১৯	৭৩.৯৮	৭০.৩১
	ছাত্রী		৭৪.০৩	৭৩.৯২	৮৪.৯১	৭৮.৫৬	৭৯.১৪	৭৫.০৭	৬৭.১১
	মোট		৭৬.১২	৭৫.৬৮	৮৫.৩৭	৭৯.১৩	৭৯.১৬	৭৪.৫৭	৬৮.৫৯
প্রাপ্ত জিপিএ ৫	ছাত্র		৩৫২	৪৯২	১,০৩৭	৭৬৭	১১৮৭	৭৯৮	৭৯৪
	ছাত্রী		২৪৫	৩৯৫	১,০২৮	৭৬৮	৮৮৩	৫৫৮	৫৩৬
	মোট		৫৯৭	৮৮৭	২,০৬৫	১,৫৩৫	২০৭০	১৩৫৬	১৩৩০
বিভাগওয়ারি শতকরা হার	বিজ্ঞান	ছাত্র	৭১.১৯	৭৮.৬০	৮৪.০৪	৭৬.২৭	৯০.৫৫	৮৯.৪৩	৮৭.৪৯
		ছাত্রী	৭২.৭২	৮২.৪৬	৮৫.৮৭	৭৬.২৮	৮৪.৭৪	৮৭.৮৮	৮৬.৯২
		মোট	৭১.৮১	৮০.১৬	৮৪.৮০	৭৬.২৭	৮৮.০৪	৮৮.৭৫	৮৭.২৩
	মানবিক	ছাত্র	৭৫.৮৪	৭৩.৩৩	৮৩.০৫	৭৬.৩৪	৭২.৬৭	৬৭.৯৯	৬৩.০৪
		ছাত্রী	৭২.৩২	৭০.৬৭	৮৩.৮৩	৭৭.৩৭	৭৭.২৪	৭২.৪৩	৬২.৩১
		মোট	৭৩.৬৩	৭১.৬৪	৮৩.৫৩	৭৬.৯৭	৭৫.৪৮	৭০.৬৪	৬২.৬১
	ব্যবসায় শিক্ষা	ছাত্র	৮৯.৮৫	৮৫.০৯	৯২.২২	৮৮.৩২	৮৬.০৭	৭৮.৯৩	৭৬.৭২
		ছাত্রী	৮৮.৯৯	৮৬.৮০	৯০.৬৩	৮৬.৯৫	৮৫.৪৫	৮০.০৭	৭৬.৫০
		মোট	৮৯.৬০	৮৫.৬২	৯১.৭০	৮৭.৮৪	৮৫.৮৪	৭৯.৩৮	৭৬.৬৩
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০০% পাস			০৪	১২	০৮	১০	১৩	০৫
	০% পাস			০০	০০	০০	০০	০০	০০
বহিস্কৃত পরীক্ষার্থী				১৩	২৯	২৪	৪৩	১৪	১৪
বহিস্কৃত শিক্ষক				-	-	-	-	-	-

সূত্র : মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, সিলেট

সারণি-১০৮

উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠা সাল	উচ্চবিদ্যালয়ে উন্নীত	বর্তমান জেলা
০১	সিলেট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়	১৮৪০-৪১		সিলেট
০২	লাউতা উচ্চবিদ্যালয়	১৮৭১	১৯৫৯	সিলেট
০৩	জমসেদ আহমদ উচ্চবিদ্যালয়	১৮৭২	১৯৬৫	সিলেট
০৪	গিরিশ মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় (এইডেড হাইস্কুল)	১৮৭৬	১৯৪২	সিলেট
০৫	গুরুসদয় উচ্চবিদ্যালয় (বীরশ্রী)	১৮৮২	১৯৭১	সিলেট
০৬	মঙ্গলচন্ডী নিশিকান্ত উচ্চবিদ্যালয়	১৮৮৫	১৯৩০	সিলেট
০৭	রাজা গিরিশচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় (মুরারিচাঁদ উচ্চবিদ্যালয়)	১৮৮৬		সিলেট
০৮	শরৎসুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়	১৮৮৬	১৯১৭	সিলেট
০৯	কিশোরীমোহন বালিকা বিদ্যালয়	১৮৮৬/৮৭		সিলেট

সূত্র : (১) সিলেট জেলা গেজেটিয়ার, ১৯৭০। পৃ. ৪২৩-৪৩৭ এবং (২) মো. আবদুল আজিজ, মুরারিচাঁদ কলেজের ইতিকথা, সিলেট, ১৯৯২; পৃ. ১৫।]

সারণি-১০৯

উনিশ শতকের বিশিষ্ট মুসলিম স্নাতকগণ

8.5	নাম	পরীক্ষার সাল	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
০১	মোহাম্মদ দাইম	১৮৬৫	উপমহাদেশের দ্বিতীয় এবং বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম স্নাতক; আইনজীবী; সিলেট।
০২	মৌলভি আবদুল করিম	১৮৮৬	লেখক; বিদ্যালয় পরিদর্শক; সিলেট।
০৩	খানবাহাদুর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ	১৮৮৭	একস্ট্রা অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার; সিলেট
০৪	আহমদ উল্লাহ	১৮৮৮	ই.এ.সি; সাংবাদিক ও মন্ত্রী আলতাফ হোসেনের পিতা; মৌলভীবাজার
০৫	মোহাম্মদ হাসন	১৮৮৮	আইনজীবী; মৌলভীবাজার।
০৬	হাবিব উল্লাহ	১৮৮৯	আইনজীবী; চৌয়াল্লিশ, মৌলভীবাজার
০৭	খানবাহাদুর সৈয়দ আবদুল মজিদ	১৮৯২	আসামের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও আইনজীবী; মৌলভীবাজার।
০৮	খানবাহাদুর আবদুর রহিম	১৮৯৩	ই.এ.সি; সিলেট
০৯	গজনফর আলী খান	১৮৯৭	বিভাগীয় কমিশনার, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ৪র্থ আইসিএস; সিলেট
১০	নূরউদ্দিন আহমদ	১৮৯৪	আইনজীবী; হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারক সালাউদ্দিন আহমদের পিতা
১১	সৈয়দ হোসেন আলী	১৮৯৪	কলকাতা মাদরাসার শিক্ষক; বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
১২	শামসুল ওলামা আবুনসর ওহীদ	১৮৯৭	প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও মন্ত্রী; সিলেট।
১৩	খানবাহাদুর নসীর উদ্দিন আহমদ	১৮৯৭	ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট; ভাদেশ্বর, সিলেট।
১৪	খানবাহাদুর তজম্মু ল আলী চৌধুরী	১৯০০	ডেপুটি কমিশনার; প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ব্যারিস্টার আবদুল মন্তকিম চৌধুরীর পিতা; মৌলভীবাজার

[সূত্র : (১) হজরত শাহজালাল (র.) ও সিলেটের ইতিহাস, ১৯৭০; পৃ. ২১১ এবং (২) শ্রীহট্ট প্রতিভা, ১৯৬১; পৃ. ৫০)]

সারণি-১১০

উনিশ শতকের বিশিষ্ট হিন্দু স্নাতকগণ

ক্র. নং	নাম	পরীক্ষার সাল	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
০১	জয়গোবিন্দ সোম	১৮৬৫	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রথম স্নাতকোত্তর; আইনজীবী
০২	নবীনচন্দ্র শর্মা	১৮৬৭	আইনজীবী, সুনামগঞ্জ
০৩	রায়বাহাদুর দুলালচন্দ্র দেব	১৮৬৯	আইনজীবী; মুরারিচাঁদ কলেজের প্রথম সম্পাদক; শিক্ষাব্রতী।
০৪	তারাকিশোর চৌধুরী	১৮৭৯	আইনজীবী; সন্তেসজী নামে পরিচিত সন্ন্যাসী, বামৈ, হবিগঞ্জ।
০৫	সারদাচরণ শ্যাম	১৮৮৩	আইনজীবী ও ব্যবসায়ী; ইন্দেশ্বর, মৌলভীবাজার
০৬	শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	১৮৮৪	‘দেবীযুদ্ধ’ ও অন্যান্য গ্রন্থপ্রণেতা এবং শিক্ষক; বেগমপুর, সিলেট।
০৭	কামিনীকুমার চন্দ	১৮৮৪	বিশিষ্ট আইনজীবী ও শিক্ষাব্রতী; ছাতিয়াইন, হবিগঞ্জ।
০৮	গিরিশচন্দ্র নাগ	১৮৮৫	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; বিপ্লবী নেত্রী লীলা নাগের পিতা; রাজনগর, মৌলভীবাজার।
০৯	লালা প্রসন্নকুমার দে	১৮৮৫	প্রধান শিক্ষক; প্রখ্যাত সাংবাদিক, সিলেট।
১০	রমণীমোহন দাস	১৮৮৮	ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট; সিলেট।
১১	কেদারনাথ চৌধুরী	১৮৮৮	জেলা জজ।
১২	গোপালচন্দ্র দাস	১৮৯০	ই.এ.সি (একস্ট্রা অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার)
১৩	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য	১৮৯০	মহামহোপাধ্যায়; বিদ্যাবিনোদ; অধ্যাপক, গবেষক ও গ্রন্থকার; বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
১৪	শ্যামাচরণ দেব	১৮৯০	শিক্ষাব্রতী; হবিগঞ্জ।
১৫	প্রমোদচন্দ্র দত্ত	১৮৯৪	রায়বাহাদুর; সিআইই; আসামের প্রাক্তন মন্ত্রী ও আইনজীবী; মিরাশী, হবিগঞ্জ।
১৬	মহেন্দ্রনাথ দে	১৮৯৪	বিপ্লবী ও শিক্ষাব্রতী; জগৎসী, মৌলভীবাজার।
১৭	দেবীচরণ রায়	১৮৯৫	ইএসি।
১৮	রজনীকান্ত রায়স্তিদার	১৮৯৫	ইএসি. সিলেট।
১৯	নিকুঞ্জবিহারী দত্ত	১৮৯৬	আইনজীবী; বেজুড়া, হবিগঞ্জ।
২০.	দ্বারিকানাথ চৌধুরী	১৮৯৭	ইএসি।
২১.	কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী	১৮৯৮	ইএসি ও সাহিত্যসেবী; ছয়চিরি, মৌলভীবাজার।
২২.	গিরিশচন্দ্র নন্দী	১৮৯৯	ইএসি।

[সূত্র : (১) হজরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, ১৯৭০; পৃ. ২১১]

সারণি-১১১

সিলেট জেলার উপজেলাসমূহের আয়তন, জনসংখ্যা ও শিক্ষিতের হার, ২০১১

ক্র.নং	থানার নাম	আয়তন বর্গ কি.মি	জনসংখ্যা (মোট)	পুরুষ	মহিলা	শিক্ষিতের হার (৭ বছর +)
১	বালাগঞ্জ	৩৮৯.৫১	৩২০২২৭	১২৯৯৬৭	১৩৫২৩৮	৫০.২
২	বিয়ানীবাজার	২৫৩.২২	২৫৩৬১৬	১০২৪৪৬	১০৮৯৫৮	৫৯.৭
৩	বিশ্বনাথ	২১৪.৫০	২৩২৫৭৩	৯৫২৩৭	৯৭১৭৫	৪৬.৯
৪	কোম্পানীগঞ্জ	২৭৮.৫৫	১৭৪০২৯	৬৮৩১৫	৬৩৯২২	২৮.৮
৫	ফেঞ্চুগঞ্জ	১১৪.৪৮	১০৪৭৪১	৪১৮৯৬	৪৪৬১৬	৫০.৫
৬	গোলাপগঞ্জ	২৭৮.৩৪	৩১৬১৪৯	১২৭৪৮৮	১৩৬৫২০	৫৭.০
৭	গোয়াইনঘাট	৪৮৬.১০	২৮৭৫১২	১১১৫৯৭	১১২১৪৭	৩২.৭
৮	জৈন্তাপুর	২৫৮.৬৯	১৬১৭৪৪	৬৩৫৫৯	৬৪১৭৩	৪১.২
৯	কানাইঘাট	৪১২.২৫	২৬৩৯৬৯	১০১৬৩২	১০৭৭৩৮	৪৩.৫
১০	সিলেট সদর	৫১৭.৪৩	৮২৯১০৩	৩৭১৭০২	৩৩০৭৯৭	৬১.৩
১১	জকিগঞ্জ	২৮৭.৩৩	২৩৭১৩৭	৯৫১৪৪	৯৮১২৪	৪৯.৪

[সূত্র : বাংলাদেশ পপুলেশন সেন্সাস : এনালাইটিক্যাল রিপোর্ট, ১৯৯৪; পৃ. ২৭১।]

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ ১০ (দশ)টি উদ্যোগের মধ্যে ১টি হলো শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম। উক্ত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিলেট জেলার ‘শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি’ প্রকল্পের আওতাধীন প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি (২০১৭-১৮ অর্থ বছর) তুলে ধরা হলো:

প্রকল্পের নাম	নির্ণায়ক	তথ্য	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ	সুবিধাভোগীর সংখ্যা
শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি	বিনামূল্যে বই বিতরণ	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৭০টি		প্রাথমিক স্তরে ৫,৫১,১৯৩ জন
		মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৬০টি মাদরাসা ২০৭টি		মাধ্যমিক স্তর ২৯৫৭৩৫
	উপবৃত্তির	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য ১৪৫৭ টি	১৩,৬০,০১,৪৫০/-	প্রাথমিক স্তরে ২,৬৭,৯১৪ জন।
		মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৬০টি মাদরাসা ২০৭টি	২১১৬৬০৪০০ টাকা	মাধ্যমিক স্তর ১৫১১৮৬

এ ছাড়াও এ জেলায় ১৪৫৭ টি প্রাথমিক স্কুলে মিড ডে মিল কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২,০৪,০৭৪ জন।

অধ্যায়-১২

ভাষা ও সাহিত্য

সিলেটের প্রায় সব অধিবাসীই বাংলা ভাষায় কথা বলেন। অবশ্য এই বাংলা ভাষা আঞ্চলিক বাংলা, সর্বত্র তা 'সিলেটি উপভাষা' নামে পরিচিত। তবে লিখিত ভাষা হিসেবে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার সর্বত্র। সুপ্রাচীন কাল থেকে সিলেটের লোকসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে উপভাষাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শুধু তাই নয় এককালে 'সিলেটি নাগরী' নামক বিশেষ লিপিতে রচিত শত শত পুথি এই অঞ্চলের ঐতিহ্যের অংশ হয়ে আছে। অন্যদিকে সিলেটে বসবাসরত যেসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন মাতৃভাষার পাশাপাশি তারা সিলেটিকে 'দ্বিতীয় ভাষা' হিসেবে ব্যবহার করেন। সিলেটের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মণিপুরি, খাসি, সিন্টেং, পাত্র প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে একমাত্র মণিপুরি ভাষার লিপি ও সাহিত্য আছে। সিলেটের চা-বাগানে লাদরিসহ অন্যান্য ভাষাভাষী নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে।

১. সিলেটের ভাষা পরিস্থিতি বোঝার জন্য এর প্রাচীন ও নিকট অতীতের ভূরাজনৈতিক ইতিহাস খুবই প্রাসঙ্গিক। কেননা ব্রিটিশ সিলেট জেলার চারটি মহকুমা সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ বর্তমানে চারটি জেলায় পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া ১৯৪৭ সালের রেফারেন্ডামে সিলেটের অপর অংশ করিমগঞ্জ এখন ভারতভুক্ত হয়েছে । সিলেট কখনো আসাম এবং কখনো বাংলার অংশ ছিল। তা ছাড়া সিলেট অঞ্চল অন্তত দশম শতাব্দী পর্যন্ত ঐতিহাসিক কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভাটেরা ও নিধনপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন থেকে প্রমাণ হয় যে, এ অঞ্চলটি সপ্তম শতকে কামরূপের অধীন ছিল। সুদূর অতীত থেকে শ্রীহট্ট নামক অঞ্চলটির মানুষ সামগ্রিকভাবে একটি বিশেষ ভাষাভঙ্গিই ব্যবহার করে আসছে। তাদের বুলিভাণ্ডার ওই একই। যদিও সময়ের ব্যবধানে, বিস্তৃত জনপদের উপ-আঞ্চলিক ছোটো ছোটো অঞ্চলে উপভাষাটির বৈচিত্র্যও তৈরি হয়ে গেছে, ভাষীদের অগোচরেই। তাই বলে সে বৈচিত্র্য অনুসারে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক অঞ্চলভেদে 'শিলচরের উপভাষা', 'করিমগঞ্জের উপভাষা' বা 'মৌলভীবাজারের উপভাষা' প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা যায় না। অন্তত ভাষার বেলায় এ-ধরনের বিভক্তি একেবারেই অচল। তবে উপরোক্ত অঞ্চলগুলোর সকলেই একই মূলভাষায় কথা বলে, যাকে 'সিলেটি' নামে অভিহিত করা হয়। বলা বাহুল্য 'সিলেটি' বিশেষণটি যুগপৎ সমাজ-সাংস্কৃতিক ও ভাষিক। অন্যদিকে বাংলা ভাষার জন্মলগ্ন থেকেই যেখানে সিলেটির অস্তিত্ব পণ্ডিতেরা অনুমান করে আসছেন; অন্তত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বাংলা ব-দ্বীপ অঞ্চলের নিজস্ব কোনো উপভাষা নেই, বিভিন্ন উপভাষার পারস্পরিক প্রভাবে এ অঞ্চলের বাংলা ভাষা গড়ে উঠেছে' (Chatterji 1986 : 139) তা-ই

প্রমাণ করে। সপ্তম শতক থেকে রচিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিনিদর্শন চর্যাপদের সঙ্গে সিলেটি উপভাষার এতটাই ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্য রয়েছে যে, গবেষক মুহম্মদ আসাদ্দর আলী (আলী, মু.আ : ১৯৯৩) ও সৈয়দ মুর্তাজা আলী (আলী, সৈ.মু. : ১৩৭০) প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন চর্যাগুলো সিলেটি উপভাষার ছাঁচেই লিখিত। তা যদি সত্য হয়, বাংলার অন্যান্য উপভাষার মতো সিলেটি উপভাষাও বাংলা ভাষার জন্মলগ্ন থেকেই স্বতন্ত্র ছিল অর্থাৎ ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক কারণে অপভ্রংশের স্তর পেরিয়ে পৃথকভাবেই এর জন্ম সম্ভব।

১.২. সিলেটি উপভাষা বাংলা ভাষারই একটি আঞ্চলিক রূপ। পূর্ববঙ্গীয় ভাষার পূর্বান্ত ও প্রান্তীয় উপভাষা হিসেবে এর অবস্থান। বাংলা ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে গৌড়ীয়, নদীয়া ও কলকাতা–এই তিন যুগের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, গৌড়ীয় যুগের ভাষাই একদা সমগ্র বাংলার আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা ছিল। সিলেটি উপভাষার ছাঁচ গৌড়ীয় বাংলায় অনুকৃত হওয়ায় নদীয়া যুগের ভাষার সঙ্গে তা কিঞ্চিৎ দূরবর্তী হয়ে পড়ে। এরূপ দূরত্ব লক্ষ করে কারো কারো ধারণা সিলেটের বাক্য ব্যবহার বাংলা ভাষা হতে স্বতন্ত্র। এদের মধ্যে স্যার এডওয়ার্ড গেইট-এর মন্তব্য নিম্নরূপ :

Had sylhet ever acquired a literature we might have been entitled to speak of the vernacular of that district as a district tongue; as we do of Assamese. (Gait 1892: 189)

১৯০৯ সালে এম্পিরিয়েল গেজেটিয়ারেও সিলেটিকে বাংলা থেকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয় :

Though the local dialect known as ‘Sylheti’ differs materially from the language spoken in Bengal proper. (উদ্ধৃত, কর ১৯৯৯ : ১৫৭)

অবশ্য স্বতন্ত্র হওয়ার কারণও ছিল। ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে সিলেট কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী হওয়ায় ভাষার পুরাতন স্রোতকে (গৌড়ীয় ধারা) অবলম্বন করেই স্বখাতে বাহিত হতে থাকে। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, সিলেটি উপভাষা বাংলা ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র ভাষা কিংবা অন্য কোনো ভাষার উপভাষা। এ-প্রসঙ্গে ভুবন মোহন দেবশর্ম্মার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

শ্রীহট্টের কথ্যভাষা পুরাতন গৌড়ীয় বঙ্গভাষারই প্রতিকৃতি। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি, ধর্মনীতি, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতির সংস্কার সংগঠন ও পরিবর্তনে ভাষার দ্রুত গতিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ‘শ্রীহট্টে তেমনভাবে সংস্কারের স্রোত বহে নাই’ আমাদের কথ্যভাষার প্রবাহ অদ্যাপি বহুলাংশে সেই গৌড়ীয় খাতেই প্রবাহিত হইতেছে। (দেবশর্ম্মা ১৯৯৯ : ১৬০)

সুতরাং, জটিল ও বিচিত্র ভূরাজনৈতিক প্রতিবেশের কারণেই হোক আর ঐতিহ্য ও শিকড়ের প্রতি সহজাত সম্পৃক্ততার কারণেই হোক, জন্মলগ্ন থেকে নানান মিশ্রণ ও প্রভাবে কালক্রমে সিলেটি উপভাষা বাংলার অন্যান্য উপভাষা থেকে স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। এই স্বাতন্ত্র্য যেমন তার আঞ্চলিক রূপে, তেমনি উচ্চারণগত পার্থক্যে, ধ্বনি-শব্দে-বাক্যে ও বিশিষ্টার্থক প্রয়োগেও। সিলেটি উপভাষার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে ভাষাবিদ জর্জ গ্রিয়ার্সনের মন্তব্য নিম্নরূপ :

There are peculiarities of pronunciation, which tend to render it unintelligible to stranger. The inflections also differ from those of regular Bengal. (Grierson 1903: 221)

গ্রিয়ার্সনকে অনুসরণ করে *Assam district Gazetter*-এ সিলেটি উপভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'there are several peculiarities of pronunciation'(Allen 1905: 73) বলা হয়েছে। *Bangladesh district Gazetter (Sylhet)*-এ বিষয়টি এভাবে প্রতিফলিত হয়েছে :

The people of sylhet are very fond of their dialect. They hardly use any language other than their own dialect for a conversation with the people of their own district, whatever they may be and whatever be their own education and cultural attainments. (Rizvi 1907: 303)

অর্থাৎ, বিষয়টি হচ্ছে সিলেটি উপভাষা বাংলা ভাষারই একটি স্বতন্ত্র রূপ। এ প্রসঙ্গে অপরাপর গবেষকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। সিলেটি উপভাষার বিশিষ্ট দিক সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলীর মন্তব্য :

আমার বিশ্বাস সিলেটী tonal language, আমার জানা মতে ইন্দোজার্মেনিক আর কোনো ভাষাতে এ ধরনের influence নেই। শুনেছি টিবেটো-বর্মন, চীনা ভাষা tonal, খুব সম্ভব সিলেটিদের ওপর এই tonal influence নিকটবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলের টিবেটো-বর্মন থেকে এসেছে। তাই গবেষণা হওয়া উচিত (১) সিলেটী tonal ভাষা কি না? (২) যদি হয়, তবে সে প্রভাব এলো কোথা থেকে? (আলী, মুজতবা ১৯৬২ : ৪৭২)

সিলেটি উপভাষার বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মন্তব্য :

(পূর্ববঙ্গীয়) প্রতিটি উপভাষার মধ্যেই কিছু না কিছু বৈচিত্র্য আছে কিন্তু সিলেটের উপভাষায়—আমার মনে হয় তা সবচেয়ে বেশি। ... সমস্ত সিলেট ভূ-খণ্ডের উপভাষার এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাকে সমানভাবেই ভাষাতাত্ত্বিক ও অভাষাতাত্ত্বিক সিলেটী বলে মানতে বাধ্য হন। (হাই ১৯৬২ : ৫৮৭)

উপর্যুক্ত বক্তব্য আরও কিছু গবেষণা দ্বারা স্বীকৃত :

বাংলাদেশের মধ্যে পূর্বপ্রান্তের দিকে অবস্থিত দক্ষিণের টেকনাফ থেকে উত্তরের আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগই বাংলাদেশের প্রাচীনতম ভূভাগ হিসেবে চিহ্নিত। চট্টগ্রামের ভাষা, নোয়াখালীর ভাষা, কুমিল্লার ভাষা বা ত্রিপুরার ভাষা এবং সিলেটের ভাষা নামের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত রয়েছে সে ভূখণ্ডের ভিতরে। ওই চারটি আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে ছিলোটি ভাষা নানা কারণে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুণেই স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। (আলী, আসাদ্দর ১৯৯৮ : ১৭০)

সিলেটি উপভাষার এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্য এক সময় এই অঞ্চলে এক বিশেষ ধরনের লিপির উদ্ভব ও বহুল ব্যবহার হয়। এ লিপির নামকরণ হয়েছে সিলেটি নাগরী লিপি। সিলেটের শিকড় পর্যায়ে লালিত ও বিকশিত হওয়ার কারণে ‘সিলেটি নাগরী লিপি’তে রচিত পুথিসাহিত্যে সিলেটি উপভাষার রূপ-বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমানে এই লিপি প্রায় অবলুপ্ত হলেও প্রাচীন লিপি হিসেবে এর মূল্য অনেক। দেশের একাংশে লিপি ব্যবহারের এই প্রকৃতি স্কটল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলেও লক্ষণীয়।

১.৩. নিজেদের উপভাষা ও তার ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্বিত সিলেটিরা। তাদের বুলির ব্যাপারে খুবই রক্ষণশীল। সুপ্রাচীন কাল থেকেই সিলেটে বহু ভাষাভাষীর আগমন-নির্গমন হলেও নিজেদের ভাষার ব্যাপারে তারা যে সচেতন ছিলেন এমন প্রমাণ দুর্লক্ষ নয়। সিলেটে প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলো থেকে জানা যায় প্রাচীন কালে সিলেটের রাজভাষা ছিল সংস্কৃত। এমনকি ওড়িয়া ভাষার উল্লেখও কোনোটিতে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন ও ভাটেরা তাম্রশাসনের কথা বলা যায়: ‘পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত আছে শ্রী শ্রী চন্দ্র দেবাহ’ (মুসা ১৯৯৯ : ৪৬১)। ভাটেরা তাম্রশাসনে মুদ্রিত আছে চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দকেশব দেবের নাম ও পরিচয়। ৫৫ লাইনের তাম্রশাসনটি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর নাগরী লিপিতে লেখা। বাংলা লিপির খানিকটা আভাস এই লিপিতে বিদ্যমান বলে ধরা হয়। শুধু তাই নয়, এতে স্থানীয় বাংলা ও ওড়িয়া উপভাষার ছাপও দেখতে পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও, সিলেটে ওড়িয়া ভাষার প্রভাব নেই বললেই চলে। অ-ভাষাতাত্ত্বিক কারণ ছাড়া এ-প্রভাব না থাকাই স্বাভাবিক। ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে ওড়িয়ার সঙ্গে সিলেটি উপভাষার চেয়ে বাংলা ভাষার সম্পর্ক বরং গভীর। অন্তত লিখিত ওড়িয়ার দিকে তাকালে এ সত্য উপলব্ধি করা যাবে। শব্দবিভক্তি, ক্রিয়াবিভক্তি এবং কিছু আঞ্চলিক রূপমূল ছাড়া ওড়িয়ার সঙ্গে বাংলার কোনো পার্থক্য দেখা যাবে না। এমনকি বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের ভাষার সঙ্গে বাংলা চলিত ভাষার পার্থক্য যতখানি, ওড়িয়ার সঙ্গে পার্থক্য ততখানি নয় (পুরাকাইত ১৯৮৯ : ১৩৯)। তার চেয়ে সিলেটি উপভাষায় অহমীয়া ভাষার প্রভাব ভাষাতাত্ত্বিক-অ-ভাষাতাত্ত্বিক উভয়বিদ কারণেই সম্ভব। এই অহমীয়ার উৎপত্তির মূলে আছে কামরূপ উপভাষাগুচ্ছ।

সিলেট এক সময় কামরূপ রাজ্যের অধীনে ছিল। ভারত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বকালে সিলেট আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল- কিন্তু দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও সিলেটি উপভাষা অহমীয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়নি। এমনকি কাছাড়ের বুলির সঙ্গেও সিলেটি উপভাষার পার্থক্য রয়েছে। তাই বলে প্রভাব যে একেবারেই নেই এমনটা বলা যাবে না—দুটি ভাষা পরস্পর সহাবস্থানে থাকলে একের প্রভাব অন্যের ওপর পড়বে এটাই স্বাভাবিক। সেই হিসেবে সিলেটিতে অহমীয়া উচ্চারণ, ধ্বনি, রূপমূল ও বাক্যবন্ধের প্রভাব কিছুটা লক্ষণীয়।

সিলেটি উপভাষার স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পেছনে ক্রিয়াশীল উপাদান বা প্রভাবকগুলোকে মনিরুজ্জামান নির্দেশিত (মনিরুজ্জামান : ১৯৯৪) বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিম্নোক্ত সমীকরণ করা যায় :

১. ভূরাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশে অপরাপর ভাষার/উপভাষার প্রভাবজাত ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশিষ্টতা।

২. রূপমূলগত দিক থেকে প্রাচীন কাল থেকে বহুজাতি মিশ্রজাত এবং বহুস্থানীয় আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি ও ধর্মপ্রভাবজাত বিশিষ্টতা। এ মিশ্রণ/প্রভাব দ্বিধারিক হওয়া সম্ভব।

   ক. ইতিহাস বিস্তৃত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত রূপমূল এবং

   খ. আগত জাতির ভাষার রূপমূল।

৩. আর্য-সংস্কৃতি, বিভিন্ন সময়ে শাসিত ও অভিবাসিত উচ্চবর্ণ হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবজাত বিশিষ্টতা।

৪. আফগান সংস্কৃতির প্রভাবজনিত বিশিষ্টতা।

৫. পশ্চিম ভারত ও ওড়িষ্যার মেদিনীপুর থেকে অভিবাসনপ্রাপ্ত লোকদের ভাষিক প্রভাবজনিত বিশিষ্টতা।

১.৪. সিলেটি উপভাষার আলোচনায় যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হলো উপভাষিক অঞ্চলটির স্থান বিশেষে ভাষিক পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য। বৃহত্তর সিলেটের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও আয়তনের বিস্তৃতির ফলে অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলোর ভাষা সমপ্রকৃতি সম্পন্ন নয়। বিশাল আয়তন ছাড়াও পার্বত্য অঞ্চল, বনাঞ্চল, নদনদী, হাওর-বাঁওড় ও যোগাযোগের অভাবহেতু এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের ভাষায় সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষণীয়। সিলেটি উপভাষার প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশ্লেষক গ্রিয়ার্সনের চোখেও এ পার্থক্য এড়ায়নি। এখানে স্মর্তব্য যে, গ্রিয়ার্সন সিলেটকে *Assam District of Sylhet* হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, সিলেটের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা পূর্ববঙ্গ ঘেঁষা এবং উত্তরপূর্বাঞ্চল বঙ্গীয়-প্রভাবমুক্ত এবং অধিক বিকৃত (Grierson 1903: 221)। সেই হিসেবে গ্রিয়ার্সন সিলেটি উপভাষাকে পূর্ববঙ্গীয় উপশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করে *Western Sylhet* এবং *Eastern Sylhet*বা *Ujania* এই দুইভাগে বিভক্ত করেছেন (Grierson 1903: 221-225):

সারণি-১১২

জর্জ গ্রিয়ার্সনের সিলেটি উপভাষার বিভাগ

সিলেটিয়া

পশ্চিমা সিলেট

১. সুনামগঞ্জ
২. হবিগঞ্জ
৩. জৈন্তাপুর

পূর্ব সিলেট (উজানীয়া)

১. সিলেট
২. মৌলভীবাজার
৩. কাছাড় (কিয়দংশ)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রিয়ার্সন আঞ্চলিক সিলেটির ভাষাতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নিরূপণের প্রয়াসী হয়েছেন। বিশেষভাবে উজানিয়া অঞ্চলের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কথা উল্লেখ করা যায়। আবার প্রায় একই রকম অঞ্চলবিন্যাস করেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অনেকাংশেই শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও গোপাল হালদার।

পরবর্তীকালে সিলেটি উপভাষার এই আঞ্চলিক বিভাগ নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন মুহম্মদ আবদুল হাই। তিনি সিলেটি উপভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য প্রধানত উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের পার্থক্য বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর আঞ্চলিক বিভাগটি নিম্নরূপ (হাই ১৯৬২ : ৫৮৭-৫৮৮) :

সারণি-১১৩

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সিলেটি উপভাষার অঞ্চল বিভাগ

সিলেটি উপভাষা

উত্তরাঞ্চল

১. সুনামগঞ্জের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল
২. সিলেট
৩. করিমগঞ্জ

দক্ষিণাঞ্চল

১. মৌলভীবাজার
২. হবিগঞ্জের পূর্বাঞ্চল

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ডেভিট ও ন্যাস্পিপ্রাট সিলেটি উপভাষার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন (David & Spratt: 1987)। অন্যদিকে আবদুল হাইয়ের শ্রেণিকরণে আংশিক সম্মতি প্রকাশ করে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের বক্তব্য হচ্ছে, সিলেটের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে করিমগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জকে একত্র করে

শ্রেণিকরণ করা সম্ভব হলেও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য এই শ্রেণিকরণের মধ্যে সবসময় লভ্য নয় বরং বৃহত্তর সিলেটের মধ্যে উত্তর সিলেট, দক্ষিণ সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ—এই পাঁচটি অঞ্চলের ভাষাবৈচিত্র্যের জন্য সিলেটি উপভাষাকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন (মোরশেদ ১৯৯৯ : ৪২২)।

অঞ্চলবিশেষে উচ্চারণভঙ্গি, রূপমূলগঠন ও বাক্যগঠনকে বিচার করে সিলেটি উপভাষাকে সিলেট, জৈন্তাপুর, জকিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ—এই ছয়টি পৃথক অঞ্চলে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। এরূপ শ্রেণিকরণে আঞ্চলিক বিভিন্নতা সহজেই ধরা পড়ে। সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানিক অবস্থান, ভৌগোলিক ব্যবস্থা, ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট অনেকটাই পরস্পরের সঙ্গে ভিন্ন। এখনও এদের কোনো কোনোটির মধ্যে আঞ্চলিক রেষারেষি বর্তমান রয়েছে। একে অন্যের ভাষা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে। সুতরাং উচ্চারণ প্রবণতা, নিজস্ব রূপমূলের ব্যবহার, বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা, শেষ, চুটকি, ডাক ও ডিঠান, পই ও ছিলক প্রভৃতিতে ভাষাভাষী অঞ্চল নিজস্ব গণ্ডি তৈরি করে নিয়েছে।

অন্যদিকে সিলেটের উপভাষা ব্যবহারে মধ্যযুগের মোগলশাসন কেন্দ্রিকতাও ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে। উত্তর সিলেটের একজন নিরক্ষর গ্রাম্য লোকও ভাষা ব্যবহারের এই বিশেষ প্রবণতার ব্যাপারে সজাগ। অর্থাৎ এই অঞ্চলের ভাষা *জৈন্তাপুরি* ভাষা ও *মোগলানি* ভাষা—এ দুভাগে বিভক্ত। অন্যরূপ বিভক্তি ঔপভাষিক অঞ্চলের অন্যত্র থাকতে পারে। তার কারণ উপভাষা তত্ত্বীয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের দূরত্ব পঞ্চাশ মাইলের বেশি হলে দুই অঞ্চলের ভাষাভঙ্গির তারতম্য ঘটে যায়। সুতরাং, ভাষা সংগঠন ও ভাষা প্রয়োগের সার্বিক প্রক্রিয়া বিচারে সিলেটি উপভাষার বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ দ্বিরাঞ্চলীয় রূপভেদ প্রকল্পে দূর অন্বয়যুক্ত এবং অধিকতর বিশ্লেষণেযোগ্য। সার্বিক বিবেচনায় আমরা সিলেটি উপভাষার অঞ্চলবিন্যাস করতে পারি :

সারণি-১১৪

সিলেটি উপভাষার আঞ্চলিক বিন্যাস

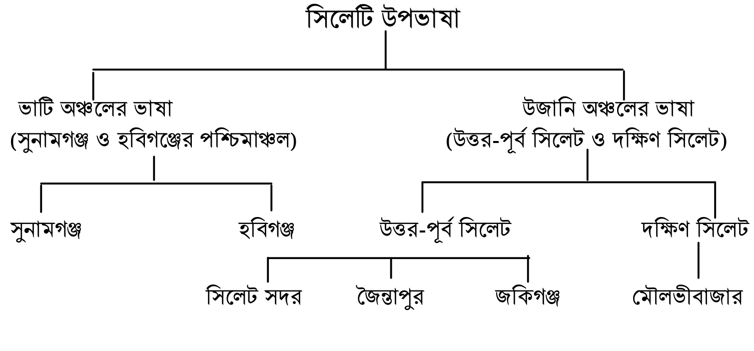

এরূপ আঞ্চলিক বিভাগে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের শ্রেণিকৃত সিলেটি উপভাষার অঞ্চলভেদের সূক্ষ্ম সমীকরণও সম্ভব। একটি উদাহরণের মাধ্যমে সিলেট জেলার বিভিন্ন ভাষিক পার্থক্য লক্ষ করা যেতে পারে :

সারণি-১১৫

সিলেট জেলার ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য

অঞ্চলের নাম	উপভাষার আঞ্চলিক নমুনা
সিলেট (সদর)	*বিয়ান অইগেছে' আর সখ'ল ফা'ক-কিনতে ডাকিরা*
সিলেট শহর	*বিয়ানইগেছে' আর সখ'ল ফা'ক-কিনতে ডাকিরা*
জৈন্তাপুর	*বিয়ান তাইগেছে' আর হক্কল ফা'ক-কিএ ডাকিতরা*
জকিগঞ্জ	*বিআন ছা'ইগেছে' আর ফা'কি হাবিগুলিনতে ডাখো'রা*

মান বাংলা : ভোর হয়ে গেছে আর সব পাখি ডাকছে।

সূত্র : Rizvi 1970: 305

১.৬. সিলেটি উপভাষার আঞ্চলিক রূপভেদে এর অনাবাসী রূপও বিশ্লেষণযোগ্য। অনাবাসী রূপ বলতে বিগত শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশক থেকে ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিবাসিত সিলেটি ঔপভাষীদের মুখের বুলিকে বোঝানো হচ্ছে। প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধানে স্থানীয় সিলেটিদের ভাষার সাথে ব্রিটেনে প্রবাসী বা অনাবাসী সিলেটিদের মুখের ভাষার ব্যবধান সূচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ-ধরনের পার্থক্য বার্মিংহাম ও লন্ডনের সিলেটিদের বুলির মধ্যেও থাকা সম্ভব বলে মনে করা হয়।

১.৭. আমাদের আলোচনা বৃহত্তর সিলেটের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের ভাষা ছাঁচ নিয়ে, কেননা এই অঞ্চলটিই বর্তমান 'সিলেট' জেলা নামক প্রশাসনিক ভাগে পড়েছে। মান বাংলা কিংবা অন্যান্য উপভাষা থেকে সিলেটির স্বকীয় ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপমূলতত্ত্ব ও বাগর্থতত্ত্বে উপভাষাটির নিজস্ব রূপমূল ও শব্দভাণ্ডার একে যে কোনো উন্নত ভাষার বৈশিষ্ট্যের সূচক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

২
ধ্বনিতত্ত্ব
(Phonology of Sylheti Dialect)

২.১. স্বরধ্বনি

সিলেটি উপভাষার মৌখিক স্বরধ্বনির সাত (৭)টি। মৌখিক স্বরধ্বনিগুলোর প্রকৃতি ও স্বরূপ নিম্নরূপ :

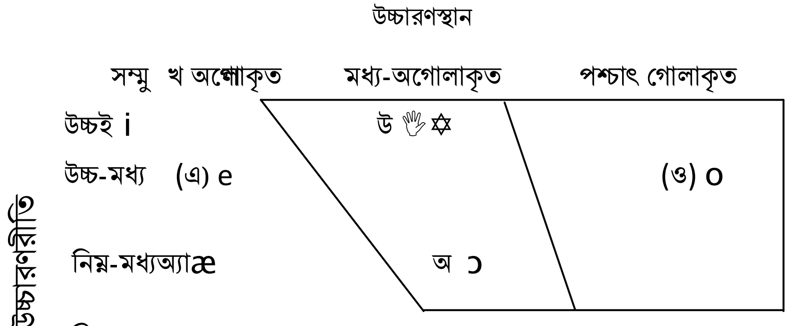

নিম্নআ ধ
( ) = প্রামত্মীয়

সারণি-১১৬
সিলেটি উপভাষার মৌখিক স্বরধ্বনি

ধ্বনিচিহ্ন	আদ্য অবস্থান		মধ্য অবস্থান		অন্তঃ অবস্থান	
	শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ই	ইকা	পাঁজর	ফে’দইল	কাদা	দ’জি	কাঠি
এ	এংকা	একা	খে’ছ’মা	কচি	মাদানে	মধ্যাহ্নে
অ্যা	অ্যাবলা	এখন	ব্যাঞ্জা	ঝগড়া	ফুইয়্যা	শুষ্ক
আ	আতরি	প্রসূতি	হালাখ’	রোগা	উতারা	খ্যাপা
অ	অশ	চাষ	বছ’ন	লিঙ্গা(পুং)	হর’	সরো
ও	ওলা	এভাবে	এওলা	আমলকি	আও	এসো
উ	উত	সন্ধান	লুদ	কাদা	বাউ	বাম

স্বরধ্বনি বিচারের মানদণ্ড অনুযায়ী সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনি

সারণি-১১৭

জিভের উচ্চতা ও অবস্থান অনুসারে সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনি

[মান বাংলার অনুরূপ]

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থা		
	সম্মু খ	মধ্য	পশ্চাৎ
উচ্চ	ই i		উ u
উচ্চ মধ্য	এ e		ও o
নিম্ন মধ্য	অ্যা æ		অ ɔ
নিম্ন		আ a	

ঠোঁটের অবস্থা

সারণি-১১৮

ঠোঁটের অবস্থা অনুসারে সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনি

	অগোলাকৃত		গোলাকৃত
সংবৃত	ই		উ
অর্ধ-সংবৃত	এ		ও
অর্ধ-বিবৃত	অ্যা		অ
বিবৃত		আ	

কোমল তালুর অবস্থা অনুযায়ী সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনি

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর মতে সিলেটি উপভাষায় আনুনাসিক স্বর অনুপস্থিত কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উপভাষাটিতে চারটি আনুনাসিক স্বরধ্বনি পাওয়া যায়।*

সারণি-১১৯

কোমল তালুর অবস্থা অনুসারে সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনি

ধ্বনি	ধ্বনিচিহ্ন
আনুনাসিক	এঁ, আঁ, অঁ, উঁ

ẽ, ã, ɔ̃, ũ

সারণি-১২০

সিলেটি উপভাষার আনুনাসিক স্বরধ্বনি

ধ্বনিচিহ্ন	সি.উ.	আ.ধ্ব.ব.	অর্থ
এঁ	*এঁড়ি*	*ẽˑṛi̯*	*পালায় এমন (স্ত্রী)*
আঁ	জাঁতা	ɟãt̪a	চাপানো
অঁ	অঁঙ্কু	ɔ̃ŋku	এখন
উঁ	উঁরা	ũra	ঝুঁপড়ি

সিলেটি উপভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শব্দের আনুনাসিক স্বরধ্বনির পরিবর্তে নাসিক্য ব্যঞ্জনের ব্যবহার।

সারণি-১২১

সিলেটি উপভাষার আনুনাসিক ব্যঞ্জনধ্বনি

মান বাংলা	আ.ধ্ব.ব.	সি.উ.	আ.ধ্ব.ব.
কাঁদা	kãd̪a	খা'ন্দা	xaˑnd̪a
রাঁধা	rãd̪ʱa	রান্দা	rànd̪a
চাঁদ	cãˑd̪	ছা'ন্দ্	ҫaˑnd̪
চাঁদনি	cãd̪ni	ছ'ন্দনি	ҫɔ̀nd̪ɔni

চার্লস ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী অনুসরণে সিলেটি উপভাষায় চারটি অর্ধ-স্বরধ্বনি **অর্ধ-স্বরধ্বনি** পাওয়া যায়।

সারণি-১২২

সিলেটি উপভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি

ধ্বনিচিহ্ন	সি.উ.	আ.ধ্ব.ব.	অর্থ
ই~	ছি'য়াই	ҫiaʸi̯	কালি
এ~	টায়	taʸe̯	ধীরে
ও~	ছা'ও	ҫaʷo̯	বাচ্চা
উ~	লউ	lɔʷu̯	রক্ত

যৌগিক স্বরধ্বনি পবিত্র সরকার নির্দেশিত মান বাংলার যৌগিক স্বরধ্বনিগুলোর মধ্যে (সরকার, পবিত্র ২০০৬ : ৪৯-৫৭) সিলেটি উপভাষায় প্রাপ্ত যৌগিক স্বরধ্বনি নিম্নরূপ :

সারণি-১২৩

সিলেটি উপভাষার যৌগিক স্বরধ্বনি

ক্র. নং	যৌগিক স্বর		উদাহরণ		অর্থ/ মা.বা.
	ধ্বনি চিহ্ন	আ.ধ্ব.ব.	সি.উ	আ.ধ্ব.ব.	
১	ইউ	i̯u	ছি'উ	èi̯u	মোরগের বাচ্চার ডাক
২	উই্	ui̯	মুই	mui̯	আমি
৩	এই্	ei̯	লেই	lei̯	ক্ষির
৪	এউ্	eu̯	মেউ	meu̯	মিউ
৫	ওই্	oi̯	ফ'ই	foi̯	ধাঁধা
৬	ওউ্	ou̯	ত'উ	t̪ou̯	তবে
৭	আই্	ai̯	লাই	lai̯	আস্কারা
৮	আউ্	au̯	বাউ	bau̯	বাঁকদ-
৯	অ্যাও্	ço̯	ল্যাও	lço̯	লেহন কর
১০	অ্যায়্	çe̯	ল্যায়	lçe̯	লেহন করে
১১	আও্	ao̯	টাও	tao̯	তাওয়া
১২	আয়্	ae̯	যায়রা	ɲae̯	যাচ্ছেন
১৩	অয়্	ɔe̯	বয়	bɔe̯	গন্ধ
১৪	অও্	ɔo̯	দও	d̪ɔo̯	ধৌত কর
১৫	ওয়	oe̯	দোয়	d̪oe̯	ধৌত করে

তাছাড়া উপভাষিক বৈচিত্র্য হিসেবে সিলেটিতে স্বতন্ত্র কিছু যৌগিক স্বরধ্বনি পরিলক্ষিত হয়।

সারণি-১২৪

সিলেটি উপভাষার স্বাতন্ত্র্যসূচক যৌগিক স্বরধ্বনি

ক্র. নং	যৌগিক স্বর		উদাহরণ		অর্থ/ মা.বা.
	ধ্বনিচিহ্ন	আ.ধ্ব.ব.	সি.উ	আ.ধ্ব.ব.	
১	ইআ	i̯a	বিয়া	b i̯a	বিয়ে
২	ইঅ	i̯ɔ	ছা'নিও্	çani̯ɔ	এলোমেলো করো

ক্র. নং	যৌগিক স্বর		উদাহরণ		অর্থ/ মা.বা.
	ধ্বনিচিহ্ন	আ.ধ্ব.ব.	সি.উ	আ.ধ্ব.ব.	
৩	ওআ	oa̯	তোয়া	t̪oa̯	রাখা
৪	এএ	ee̯	তেএ	t̪ee̯	তাহলে
৫	উআ	ua̯	ফু’আ	fua̯	ছেলে
৬	অই	ɔi̯	ছ’ই	çɔi̯	ছাউনি

তাহলে দেখা যাচ্ছে মান বাংলার অনুরূপ পনেরো (১৫)টি এবং স্বতন্ত্র ছয় (৬)টিসহ সিলেটিতে প্রাপ্ত যৌগিক স্বর মোট একুশ (২১)টি।

সারণি-১২৫

সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনিগত পরিবর্তন (পরিবর্তন রীতি)

ধ্বনি পরিবর্তনের স্বরূপ	মান বাংলা		সিলেটি	
	শব্দ	আ.ধ্ব.ব	শব্দ	আ.ধ্ব.ব
ই > অ	সিন্দুক	šind̪uk	সন্দুক	šɔnd̪uk
ই > আ	চিমটি	cimti	ছি’মটা	çimta
ই > উ	ইদুর	id̪ur	উন্দুর	undur
ই > এ	ইনি	ini	এইন	ein
উ > অ	সুরমা	šurma	হরমা	hɔrma
উ > আ	উরু	uru	উরাত	urat̪
উ > ই	একুশ	ekuš	এখ’ইশ	exɔiš
উ > এ	তুন্ন	t̪unnɔ	তেনা	t̪ena
উ > ও	তবু	t̪ɔbu	তেও	t̪eo
এ > ই	জেদ	ɟed̪	জিদ	zid̪
এ > অ (এ> এ্যা>অ)	এখন	exɔn	অখ’ন	ɔxɔʼn
এ > ও	দাঁতে	d̪ãt̪e	দাতো	d̪at̪o
এ > আ	খেজুর	k^{h}eɟur	খাজুর	k^{h}aɟur
এ > অ্যা	জেলে	ɟele	জাউল্যা	ɟaullæ

ধ্বনি পরিবর্তনের স্বরূপ	মান বাংলা		সিলেটি	
	শব্দ	আ.ধ্ব.ব	শব্দ	আ.ধ্ব.ব
এ > উ	গেঞ্জি	genɟi	গুঞ্জি	gunɟi
এ > ওই	আছেন	ac^{h}en	আছ’ইন	açoɟin&
অ্যা > এ	ব্যয়	bæe	বেয়	be^{y}e̯
আ > অ	রাবার	rabar	রবট	rɔbɔt
আ> ই	মটকা	mɔtka	মটকি	mɔtki
আ > উ	মাগরেব	magreb	মুগরিব	mugrib
আ > এ	পাঁক	pãk	ফে’খ	fe^{y}e̯x
অ > আ	অন্ধকার	ɔnd̪^{ɦ}ɔkar	আন্দাইর	and̪air
অ > উ	যদি	ɟɔd̪i	যুদি	ɟud̪i
অ > এ	খড়	k^{h}ɔr̩	খের	xer
ও > অ	হোটেল	hotel	অ’টল	ɔˑtɔl
ও > আ	ভালো	b^{ɦ}alo	বা’লা	baˑla
ও > ই	মিটানো	mitano	মিটানি	mitani
ও > উ	ওজন	ɔɟɔn	উজন	uɟɔn
ও > অ্যা	গেঁয়ো	gẽo	গাইয়্যা	gai^{y}æa

সারণি-১২৬

সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র

ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র	মান বাংলা		সিলেটি	
	শব্দ	আ.ধ্ব.ব	শব্দ	আ.ধ্ব.ব
স্বরাগম	ছিল	c^{h}ilɒ	আছিল	açilo
	হাঁক	hãk	হাউক	hauk
	দুনিয়া	d̪unia	দুনিয়াই	d̪uni^{y}ae̯
স্বরলোপ	উজর	uɟɔr	জর	ɟɔr
	বাদল	bad̪ɔl	বাদ্লি	bad̪li
	চাকা	caka	ছা’ক	çák

ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র	মান বাংলা		সিলেটি	
	শব্দ	আ.ধ্ব.ব	শব্দ	আ.ধ্ব.ব
স্বরসঙ্গতি	পিঞ্জর	pinɟɔr	ফি'ন্জিরা	finɟira
	ইঁদুর	ĩd̪ur	উন্দুর	und̪ur
	এঁটেল	ẽtel	আটালু	atalu
স্বরঅসঙ্গতি	অলস	ɔlɔš	আলিয়া	ali^{y}a̪a
অপিনিহিতি	অগ্নি	[illegible]gni	আগুইন	aguin
	বান্ধা	band̪^{ɦ}a	বাইন্দা	bainda
	কাল	ka'l	খা'ইল	xail

ব্যঞ্জনধ্বনি

২.২. সিলেটি উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ উপভাষায় মোট ২৬টি ব্যঞ্জনধ্বনি পাওয়া যায়। নিচে উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণরীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো বিবৃত হলো:

সারণি-১২৭

উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি

উচ্চারণস্থান	ধ্বনিচিহ্ন
দ্বি-ওষ্ঠ্য	প্, ফ্, ব্, ম্
দন্ত্	ত্, থ্, দ্
দন্তমূলীয়	ন্, র্, ল্, স্, য
তালব্য-দন্তমূলীয়	ট্, ঠ্, ড্, চ্, ছ্, জ্, শ্, ড়
জিহ্বামূলীয়	ক্, খ, গ্, ঙ্, য়
কণ্ঠনালীয়	হ্

সারণি-১২৮

উচ্চারণরীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি

উচ্চারণরীতি	ধ্বনিচিহ্ন
স্পর্শ	ক্, গ্, ট্, ঠ্, ড্, ত্, থ্, দ্, প্, ব্
নাসিক্য	ম্, ন্, ঙ্
কম্পনজাত	র্
তাড়নজাত	ড়
ঘর্ষণজাত	ফ্, খ্', ছ্', য্, শ্, স্, হ্
ঘৃষ্ট	চ্, জ্
নৈকট্যমূলক	য়
পার্শ্বিক নৈকট্যমূলক	ল্

আদি, মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে সিলেটি উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর ব্যবহার

সারণি-১২৯

আদি মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে সিলেটি উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি

ধ্বনিচিহ্ন	আদ্য অবস্থান		মধ্য অবস্থান		অন্ত্য অবস্থান	
	শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ক্	কুটি	ছোটো	ছু'কলা	খোলস	বারিক	চিকন
খ্'	খে'শ	আত্মীয়	আখ্'তা	হঠাৎ	ডেখ'	কলার থোড়
গ্	গাবুর	বর	উগার	ভাঁড়ার	লাগ্	শত্রুতা
চ্	-	-	কুইচ্চা	কুঁচে মাছ	-	-
ছ্'	ছি'য়াই	কালি	বিছ'রা	ক্ষেত	খা'ছ'	খাঁটি
জ্	জির	কেঁচো	ফাজুইন	কঞ্চি	বেজ	বেদে
ট্	টফ'কি	লাফ	বটলা	মোটা	ডিট	কুনজর
ঠ্	ঠুআ	ফোসকা	ঠেংঠেংগি	রোগা	খা'ঠ	কাঠ
ড্	ড'র	খাদ	ডেন্ডুরা	লাঞ্ছনা	-	-
ত্	তু'ক্	রাগ	আতশ	টক	জুইত	উপযুক্ত
থ্	থরম্ন	জঙ্ঘা	বথর্	বাজে	-	-
দ্	দুর্মুস	মুগুর	উন্দাল্	চুলা	অজুদ	শরীর
প্	-	-	সাপ্পর	প্রমাণ	-	-
ফ্'	ফা'শ	কৃষিসার	আফা'ল	ঢেউ	লফ'	লালা
ব্	বাউগর	শক্তিশালী	বেবাট	কান্ড জ্ঞানহীন	তালাব	পুকুর
ঙ্	-	-	বেঙ্গা	গোলমাল	জেঙ্	ঝাঁঝ
ন্	নিরজু	নীরবতা	গরদনা	ঘাড়	ছা'ইন	স্বস্তি
ম্	মুরা	বেঁকে বসা	মামলত	স্বার্থপরতা	সাম	চামড়া
য	যিদ	জেদ	রেযিল	দুষ্ট	সিয	অলঙ্কার
র্	রাখ'	রোগা	লরাদাইয়া	ছন্নছাড়া	বুর	ডুব দেওয়া
ড়্	-	-	রাড়ি	বিধবা	লাউড়	পাছা
ল্	লুকমা	গ্রাস	ললই	লোভ	সইল	সঙ্গা
শ্	শয়	অভ্যাস	বৈশাল	ভূমিকম্প	নাশ	নষ্ট
স্	সফা	পরিষ্কার	সেসরি	ঘষে চলা	ফু'স্	মোছা
য়	-	-	সয়াল	পৃথিবী	বয়	গন্ধ
হ্	হসুবা	আনাড়ি	-	-	-	-

সিলেটি ধ্বনিতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

ক) প্ ধ্বনিটি শব্দের মধ্য অবস্থানে এবং যুক্তব্যঞ্জন হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন : তেপ্পান্ন।

খ) চ্, ড্, থ্, প্, হ্ ধ্বনির ব্যবহার শব্দের অন্ত্যঅবস্থানে অনুপস্থিত।

গ) ঙ্, ড় ধ্বনি দুটি আদ্য অবস্থানে অনুপস্থিত।

ঘ) চ্ ধ্বনি কেবল যুক্তব্যঞ্জনের বেলায় প্রযুক্ত হয়। যেমন : সাইচ্চা। অন্যত্র এটি ছ্’ ধ্বনি হিসেবেই ব্যবহৃত।

ঙ) সিলেটিতে ছ্’ (ç)একটি বিশেষ ধ্বনি। মান বাংলার ছ্ কেবল যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। অন্যত্র এটি বিশেষ ধ্বনি হিসেবেই ব্যবহৃত।

চ) খ্’ (x) সিলেটিতে বিশেষ একটি ধ্বনি। ধ্বনিটি আরবি খে ধ্বনির প্রভাবজাত।

ছ) সিলেটের পূর্বাঞ্চলে য্ (z) ধ্বনিটি বেশি পাওয়া যায়। অন্যত্র জ্ (ɟ)ধ্বনিটি বিদ্যমান।

জ) শ্ ধ্বনিটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দের আদিতে হ্ ধ্বনিতে পরিণত হয়। কিন্তু সর্বত্র নয়। যেমন : শাত > হা’ত্।

ঞ) হ্ ধ্বনিটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দের আদিতে অ ধ্বনিতে রূপান্তরিত, তবে সর্বত্র নয়। যেমন : হাত > আ’ত্।

ট) মহাপ্রাণ ধ্বনি সিলেটিতে অল্পপ্রাণ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা স্বতঃসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যের মতো। এবং ন্যূনতম শব্দজোড়ের মাধ্যমে তার ব্যবহার দেখানো যায়। এক্ষেত্রে কেবল স্বরাঘাত ব্যবহারের মাধ্যমে এদের অর্থপার্থক্য হয়ে থাকে।

সারণি-১৩০

সিলেটি ন্যূনতম শব্দজোড়ের স্বরাঘাতজনিত অর্থপার্থক্য

শব্দজোড়	আ.ধ্ব.ব	উৎস	অর্থ
গু’ড়া	gùrǎ	< ঘোড়া	horse
গুড়া	guˑṛ̟a	< গুড়ো	powder
ফা’ল	faˑl	< পাল	flock
ফাল	fà:l	< লাফ	jump
বা’লা	bàla	< ভালো	welfare
বালা	balaˑ	< বালা	bangle
গ’র	gɔr	< ঘর	house
গর	gɔ̀ˑr	< মুগুর	hard wood

সারণি-১৩১
সিলেটি উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগত পরিবর্তন (পরিবর্তনরীতি)

সিলেটি উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগত পরিবর্তন (পরিবর্তনরীতি)

ধ্বনি পরিবর্তনের স্বরূপ	মান বাংলা		সিলেটি	
	শব্দ	আ.ধ্ব.ব	শব্দ	আ.ধ্ব.ব
ক্ > খ্’	বাঁকা	bãka	বেখা	bexa
ক্ > গ্	বক	bɔk	বগলা	bɔgla
খ্ > ক্	খুদ	kʰud	কুদি	kud̪i
খ্ > গ্	দস্তখত	d̪ɔstɔkʰɔt̪	দস্তগত	d̪ɔstɔgɔt
গ্ > ক্	মৃগী	mrigi	মির্কি	mirki
গ্ > খ্’	দেমাগ	d̪emag	ডিমাখ’	dimax
গ্ > ০	গঙ্গা	gɔŋga	গাং	gaŋg
ঘ্ > গ্	মেঘ	megʱ	ম্যা’গ	mǽg
চ্ > ছ’	চামচ	camɔc	ছা’মুইছ’	çamuiç
চ্ > জ্	কবচ	kɔbɔc	খ’বজ	xɔ́bɔɟ
ছ্ > খ্’	ছাল	cʰal	খা’ল	xal
ছ্ > ফ্’	ছেঁড়া	cʰẽra	ফা’রা	fa'ra
জ্ > য্	দুজন	d̪uɟɔn	দুইযন	d̪uizɔn
জ্ > ব্	জলপাই	ɟɔlpai	বেলখ’ই	belxɔ'i
ঝ্ > জ্	ঝাড়	ɟʱar̩	জার	ɟar
ট্ > ত্	পুটলা	putla	ফু’ত্ল	fu't̪la
ট্ > র্	পুটিকা	putika	ফু’রিয়া	fu'ria
ঠ্ > ট্	কাঁঠাল	kãtʰal	খা’টল	xa'tɔl
ড্ > ট্	ব্লেড	bled	বেলেট	belet
ড্ > দ্	ডজন	dɔɟɔn	দর্জন	d̪ɔrɟɔn
ঢ্ > দ্	ঢেলা	dʱela	দলা	d̪ɔla
ত > ছ্’	সত্য	šɔt̪t̪ɔ	হাছা’	haça'
ত্ > ট্	নুনতা	nunt̪a	নুনটা	nunta

ধ্বনি পরিবর্তনের স্বরূপ	মান বাংলা		সিলেটি	
	শব্দ	আ.ধ্ব.ব	শব্দ	আ.ধ্ব.ব
ত্ > ল্	ভাংতি	b^{ɦ}aŋt̪i	বাংলা	ba'ŋla
দ্ > ড্	দেমাগ	d̪emag	ডিমাখ’	dimax
দ্ > ন্	ননদ	nɔnɔd̪	ননন্	nɔnɔn
ধ্ > দ্	দুধ	d̪ud^{ɦ}	দু’দ	d̪u'd̪
ন্ > র্	ছিটকিনি	c^{h}itkini	ছি’টকারি	çitkari
ন্ > ল্	নরম	nɔrɔm	লরম	lɔrɔm
প্ > ফ্’	মাপ	map	মাফ’	maf
প্ > ব্	কপি	kɔpi	খ’বি	xaɔbi
ফ > ব্	হাফিজ	hafiɟ	হাবিজ	habiɟ
ফ্ > ম্	মফস্বল	mɔfɔššɔl	মমস্বল	mɔmɔššɔl
ব্ > গ্	বোয়াল	boal	গুয়াল	gual
ব্ > ফ্	দূর্বা	d̪urba	দুফ’রা	d̪ufra
ম্ > ন্	বিষম	bišɔm	বিন্	bin
ম্ > ফ্’	চিমনি	cimni	ছি’ফ্’নি	Çi'fni
র্ > ন্	পরিল	pɔrilɔ	ফি’ন্ল	finlɔ
র্ > ল্	ভাঁড়ার	b^{ɦ}ãṛar	বা’ড়াল	ba'ṛal
ল্ > ন্	লোনা	lona	নুনা	nuna
ল্ > ফ্’	লালা	lala	লফ্’	lɔ'f
শ্, স্ > হ	শাশুড়ি	šašuṛi	হড়ি	hɔri
শ্, ষ্, স্ > ছ্’	বরষ	bɔrɔš	বরছ্’	bɔrɔç
হ্ > অ	হয়	hɔ^{y}e̯	অয়	ɔ^{y}e̯
হ্ > ফ্	বেহুলা	behula	বেফু'লা	befuu'la
ড্ > র্	বড়োশি	bɔrši̯	বরি	bɔri
ঢ় > ড়	আষাঢ়	aṣaṛ^{ɦ}	আ’ড়	a'ṛ

সারণি-১৩২

সিলেটি উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র

সিলেটি উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র

ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র	মান বাংলা		সিলেটি	
	শব্দ	আ.ধ্ব.ব	শব্দ	আ.ধ্ব.ব
ব্যঞ্জনাগম	আটা	ata	লাটা	lata
	উই	ui	উলু	ulu
	সূর্য	šurɟɔ	সুরুজ	šuruɟ
ব্যঞ্জনলোপ	হেমন্তিক	hemɔnt̪ik	এ’ওতি	e'ot̪i
	শূকর	šukɔr	শর্	šɔr̟
	সোজা	šoɟa	স’ই	šoi
সমীভবন	উমর	umɔr	উম্মর	ummɔr
	তিক্ত	t̪ikt̪ɔ	তিত্তা	t̪it̪t̪a
	চিকিৎসা	cikit̪ša	ছি’কিশ্শা	çikišša
বিষমীভবন	লাঙ্গল	laŋgɔl	নাঙ্গাল	naŋgɔl
ঘোষীভবন	চুপ	cup	ছু’ব	çub
অঘোষীভবন	দিঘি	d̪igʱi	দিকি	d̪iki
মহাপ্রাণিভবন	কাল	kal	খা’ইল	Xail
অল্পপ্রাণিভবন	চোখ	cok	ছ’উক	çɔ'uk
ল-কারিভবন	জনম	ɟɔnɔm	জলম	ɟɔlɔm
	কর্পূর	kɒrpur	খ’র্ফু’ল	xɔrful
যুগ্মীভবন	কুলি	kuli	কুল্লি	kulli
	ছুটি	cʰuti	ছু’ট্টি	çutti
ধ্বনি বিপর্যাস	লাফ	laf	ফা’ল	fal
	আলগা	alga	আগ্লা	agla

৩. রূপমূলতত্ত্ব
(Morphology of Sylheti Dialect)

৩.১. রূপমূল গঠনপ্রক্রিয়া

একটি মাত্র রূপমূলের সাহায্যে

ছু’ক্ [রাগ], আইব [দোষ], খে’ছা’ [ভীষণ], জান [প্রাণ]।

একাধিক রূপমূলের সাহায্যে

মুক্ত রূপমূল	+ বদ্ধ রূপমূল	= গঠিত শব্দ	অর্থ
তাইন	+ অর	= তাইনর	তাঁর
বয়ার	+ এ	= বয়ারে	বাতাসে
নিউর	+ আ	= নিউরা	ঋণী
উর	+ অ	= উরো	কোলে

বদ্ধ রূপমূল	+ মুক্ত রূপমূল	= গঠিত শব্দ	অর্থ
বে	+ সেব	= বেসেব	অসুবিধা
আ	+ খা’ম্	= আখা’ম	অকাজ
নি	+ মুর	= নিমুর	নিরব/অতল
বি	+ নাল	= বিনাল	বিফল

বদ্ধ রূপমূল	+ বদ্ধ রূপমূল	= গঠিত শব্দ	অর্থ
তা	+ রে	= তারে	তাহাকে
ম	+ রে	= মরে	আমাকে
নাট্	+ আ	= নাটা	মন্দ
ছা’ট্	+আ	=ছা’টা	ঝামেলা

মুক্ত রূপমূল	+ মুক্ত রূপমূল	=গঠিত শব্দ	অর্থ
মিছা’	+ মাত	= মিছা’মাত	মিথ্যাকথা
গিরছ’	+ গর	= গিরছ’গ’র	গৃহস্থ ঘর
মানু	+ গুইঠ	= মানুগুইঠ	মানুষের দল
জিকা	+ বুলা	= জিকাবুলা	জিজ্ঞাসাবাদ

৩.২

শব্দরূপ

শব্দবিভক্তি (কারক-বিভক্তি) :

সারণি-১৩৩

সিলেটি শব্দবিভক্তি (কারক বিভক্তি)

	একবচন	*বহুবচন*
প্রথমা	অ, এ	রা, আরা, হখল/তাইন/টাইন, ইন, গুইন,
দ্বিতীয়া	রে, (এ)	বারে, আরারে, ইন্রে
তৃতীয়া	রে, দিয়া, দি, য়	বারে/হখ'লরে/তাইনরে দিয়া/দি
চতুর্থী	রে	রারে
পঞ্চমী	অন্তে, অনে, অইতে, তন্ তনে, তাকি, তাকিয়া, তাইক্যা, তাকি/তাকিয়া/তাইক্যা মান্তে, মানে	রার/হখ'ল/তাইন/টাইন
ষষ্ঠী	র, অর, এর	রার, আরার, হখ'লর, তাইনর
সপ্তমী	ও, ত, এ, য়, এর মইদ্দে/মাজে	র, গুইনতো, গুইনে, [ও, ত, এ, য়]-এর মাজে

বিভিন্ন কারকে বিভক্তি :

সারণি-১৩৪

বিভিন্ন কারকে বিভক্তি প্রয়োগ

বিশেষ্যমূলক রূপমূল

কারক	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ	১মা	গাইএ বাছ' ফা'লাইছে'	ফু'ড়িগইন নিরাই অইগেছ'ইন
কর্ম	২য়া	আমারে ক'ওছা'ইন	আমরারে তুকা'ইয়া ফা'ইতায় নায়।
করণ	৩য়া	টেখা'য় হক্কলতা অয় না	আম্রারে দি কুমত্মা অইতো নায়।
সম্প্রদান	৪র্থী	হকিররে বি'ক দেও	হকিরঅখ'লরে বি'ক দিয়া বিদায় খ'র।
অপাদান	৫মী	বাড়ি তন্ রুয়ানা দিলাইছি'।	মানুষটাইন তাকি দুক্‌উ ফা'ইলাম।
সম্বন্ধ	ষষ্ঠী	মাউগর বা'ই খ'রি খ'তা	ফাগলঅখ'লর খ'তা।
অধিকরণ	৭মী	ছা'টিত্ তা'কি মাটিত খা'ই	বুতল গুইনতো তেল নাই।

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য :

মুক্ত রূপমূল	+ বদ্ধ রূপমূল	=সমীভূত রূপমূল	অর্থ/মান বাংলা
ছি’লট	+অর	=ছি’লটর	সিলেটের
বা’ই	+র	=বা’ইর	ভাইয়ের
বুনি	+ত	=বুনিত্	স্তনে
তিল	+অ	=তিলঅ	তিলে

সামান্যবাচক বিশেষ্য :

মুক্ত রূপমূল	+ বদ্ধ রূপমূল	=সমীভূত রূপমূল	অর্থ
দা’ন	+র	=দা’নর	ধানের
মাটি	+র	=মাটির	মাটির
মছ’লমান	+অর	=মছ’লমানর্	মুসলমানের
ই’ন্দু	+র	=ই’ন্দুর	হিন্দুর

ভাববাচক বিশেষ্য :

মুক্ত রূপমূল	+ বদ্ধ রূপমূল	=সমীভূত রূপমূল	অর্থ
শরম	+অর	=শরমর্	শরমের
দুক্ক	+অর	=দুক্কর	দুঃখের
আফইতাফই	+র	=আফইতাফইর	উচাটনের
ছু’ক	+এ	=ছু’কে	রাগে

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য :

মুক্ত রূপমূল	+ বদ্ধ রূপমূল	=সমীভূত রূপমূল	অর্থ
গুশঠি	+র	=গুশটির	গোষ্ঠীর
সবা’	+র	=সবা’র	সভার
জা’খ’	+অর	=জা’খ’র	ঝাঁকের
ফা’ঞ্চাইত	+অর	=ফা’ঞ্চাইতর	পঞ্চায়েত

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য :

মুক্ত রূপমূল	+ বদ্ধ রূপমূল	=সমীভূত রূপমূল	অর্থ
লেখ’	+রা	=লেখ’রা	লিখছেন
খা’	+ইবা	=খা’ইবা	খাবেন
খা’ন্দা	+য়	=খা’ন্দায়	ক্রন্দনে
তুল	+ইয়া	=তুলিয়া	তুলে

সাধিত রূপমূল

বিশেষ্যমূলক শব্দগঠন

আদি প্রত্যয় যোগে :

আদি প্রত্যয়	+মুক্ত রূপমূল	=পদ/সাধিত রূপমূল	অর্থ/মান বাংলা
আ	+খা’ম	=আখা’ম	কুকর্ম
	+খা’ল	=আখা’ল	আকাল
খ’ম	+জুর্	=খ’মজুর্	কমজোর
	+বখত্	=খ’মবখত	কমবখত
কু	+খা’ম	=কুখা’ম	কুকর্ম
	+ফু’ত	=কুফু’ত	কুপুত্র
নি	+লাজ	=নিলাজ	নির্লজ্জ
	+কুজ	=নিকুজ	নিখোঁজ

অন্ত্য প্রত্যয় যোগে :

অন্ত প্রত্যয়	মুক্ত রূপমূল	=সাধিত রূপমূল	অর্থ/মান বাংলা
আমি	পাতলা	=পাতলামি	হ্যাংলামো
	বু’তলামি	=বু’তলামি	দুষ্টু মি
আল	বুড়/বুর	=বুড়াল/বুরাল	ডুবুরি
	দক্কিন	=দক্কিনাল	দক্ষিণমুখি
গার	গুনা	=গুনাগার	গুনাহগার
	ফ’রেজ	=ফ’রেজগার	পরহেজগার
জি	বাবা	=বাবাজি	আব্বাজান
	মই	=মইজি	খালা

বিশেষণমূলক

অন্ত্য প্রত্যয় যোগে :

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্ত রূপমূল	=সাধিত রূপমূল	অর্থ
আ	আকাম	=আকামা	অকর্মা
	আছা’ট	=আছা’টা	ফালতু
ই	ফে’রত	=ফে’রতি	ঘৃণ্য
	গুলাব	=গুলাবি	গোলাপি
আরা/অ্যারা	গা’স	=গা’ইস্যারা	ঘাস কাটে যে
	খা’ইস	=খা’সিয়ারা	প্রিয়
টি	লাল	=লালটি	লালচে
	দ’লা < ধবল	=দ’লট	সাদাটে
	খা’ল	=খা’লটি	কালচে

আদি প্রত্যয় যোগে :

আদি প্রত্যয়	+মুক্ত রূপমূল	=সাধিত রূপমূল	অর্থ
অ	+ছি’ন	=অছি’ন	ছিল
	+কুফ’	=অকুফ’	প্রত্যন্ত
আ	+জান্ডা	=আজান্ডা	অজানা
	+বুলি	=আবুলি	বোকা
বদ	+বখ্’ত	=বদবখত	দুর্ভাগ্য
	+আমল	=বদআমল	খারাপ অভ্যাস
বি’ন্	+ছি’না	=বি’ন্ছি’না	অচেনা
	+দ্যাশ	=বি’ন্দ্যাশ	অন্যদেশ
	+বালিক	=নাবালিক	অপ্রাপ্ত বয়স্ক
নি	+মেনতি	=নিমেনতি	অলস
	+ছু’ছা’	=নিছু’ছা’	অমিশ্রণ

সর্বনামমূলক রূপমূল

পুরুষবাচক সর্বনাম :

সারণি-১৩৫

সিলেটি উপভাষার পুরুষবাচক সর্বনাম

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম (আমি/মুই)	কর্তৃ : আমি/মুই/মই/ময় কর্ম : আমারে/মুইরে/মরে আমারে দি/ আমারে দিয়া/মুইরে দিয়া/মরেদি সম্প্র. : আমারে অপা. : আমা তাকি/আমার কাকি সম্বন্ধ : আমার/মর অধি. : আমার মইদ্দে	আম্রা আম্রারে/মুইরারে আম্রারে দি/মুইরারে দিয়া/আম্রার দ্বারা আমরারে আমরা তাকি/আম্রার তাকি/মুইরার তাকি আম্রার আম্রার মইদ্দে
মধ্যম (তুই/তুমি/ আপনি)	তুই/তুইন/তুমি/আফ’নে/আফ’নি তরে/তুমারে/আফ’নারে/আফ’নেরে তরে দি/তরে দিয়া/তুমারে দি/আফ’নারে দি ত তাকি/তুমা তাকি/আফ’নার তাকি তর/তুমার/আফ’নার/আফ’নের তরমাজে/তুমার মাজে/আফ’নার	তুরা/তরা/তুম্রা/তুমিতাইন/আফ’নাইন/ আফ’নেরা/আফ’নারা তরারে/তুম্রারে/তুমারতানরে/আফ’নারা রে/ আফ’নাইন্তরে। আফ’নারারে/আফ’নারারে দি/আফ’নাইন্তরে দি/তুমরারে দি/ তুমারতানরে দি। তরার তাকি/তুমরার তাতি/তুমারতানরতাকি/ আফ’নাইন্তরতাকি/আফ’নারা তাকি তরার/তুমরার/তুমাতানর/আফ’নারার/ আফ’নেরার/আফ’নাইন্তর।

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
	মইদ্দে	তরার মাজে/তুমাতানর মাজে/আফ'নাইন্তর মাজে।
প্রথম (সে/হে, তাই, তিনি/তাইন)	হে/তাই/তাইন হেরে/তারে/তাইরে/তাইনরে হেরে দি/তারে দি/তাইরে দি/তাইনরে দি/হের দ্বারা/তাইনর দ্বারা হেরে/তারে/তাইরে/তানরে হে তাকি/হে তাইক্যা/হের তাকি/হের তাইক্যা/তার তাকি/তার তাইক্যা/তাইনর খা'ছ'তাকি/তাইনর খা'ছ'তাইক্যা/তাইনর খা'ছ'তাকি/তাইনর গেছ'তাকি। তাইনর গাছ'তা'কি। হের/তার/তাইর/তান/তাইনর। হের মাজে/তার মাজে/তাইর মাজে/তান মাজে/তাইনর মাজে	হেরা/তারা/তাইন তাইন/হেইন তাইন। হেরারে/তারারে/তান তানরে। হেরারে দি/তারারে দি/তান তানরে দি। হেরারে/তারারে/তান তানরে। হেরা তাকি/তারার তাকি/তাইন তাইন তাকি/তারার খা'ছ তাকি/তাইনতাইন গেছ' তাকি। হেরার/তারার/তান তানর। হেরার মাজে/তারার মাজে/তাইন তাইনর মাজে।

উত্তম পুরুষবাচক সর্বনাম :

সারণি-১৩৬

সিলেটি উপভাষার উত্তম পুরুষবাচক সর্বনাম

বচন	মুক্ত রূপমূল/বদ্ধ রূপমূল (প্রাতিপদিক)	+বদ্ধ রূপমূল (বিভক্তিবাচক)	= পদ
একবচন	আমা আমা ম ম আমা মুই ম	র রে ই র ০ ০ য়	আমার আমারে মই মর আমা মুই ময়
বহুবচন	আম্রা মুই মুইরা আম্রা আম্রা	০ রা রে রে র	আম্রা মুইরা মুইরারে আমরারে আমরার

মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম :

সারণি-১৩৭

সিলেটি উপভাষার মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম

বচন	মুক্ত রূপমূল/বদ্ধ রূপমূল (প্রাতিপদিক)	+বদ্ধ রূপমূল (বিভক্তিবাচক)	= পদ
একবচন	ত	০	ত
	ত	র	তর
	ত	রে	তরে
	তু	ই	তুই
	তু	ইন	তুইন
	তুম	ই	তুমি
	তুম ~ তুমা	রে	তুমারে
	আফ'ন	ই	আফ'নি
	আফ'ন	এ	আফ'নে
	আফ'না/আফ'নে	রে	আফ'নারে/আফ'নেরে
বহুবচন	ত	র	তরা
	তু	রা	তুরা
	তুম	রা	তুমরা
	তুরা	রে	তুরারে
	তুমরা	রে	তুমরারে
	তুরা	র	তুরার
	আফ'নে	রা	আফ'নেরা
	আফ'নে	আইন	আফ'নেইন
	আফ'নে	রার	আফ'নেরার

প্রথম পুরুষবাচক সর্বনাম :

সারণি-১৩৮

সিলেটি উপভাষার প্রথম পুরুষবাচক সর্বনাম

বচন	মুক্ত রূপমূল/বদ্ধ রূপমূল (প্রাতিপদিক)	+বদ্ধ রূপমূল (বিভক্তিবাচক)	= পদ
একবচন	হে তাই তাই হে হে তার তার হে তান তান তাইন	— — ন ন/ইন র ০ এ রে রে অর অর	হে তাই তাইন > তান হেন/হেইন হের্ তার তারে হেরে তানরে > তাইনরে তানর তাইনর
বহুবচন	হে তারা হেরা হেরা তাইন তান তারা	ওা রে র রে তাইন তানর ও	হেরা তারারে হেরার হেরারে তাইনতাইন তানতানর তারার

নির্দেশক সর্বনাম :

সারণি-১৩৯

সিলেটি উপভাষার নির্দেশক সর্বনাম

নির্দেশক সর্বনাম	একবচন	বহুবচন
সমীপ্যবাচক	অখ'টা, অখ'নকু, অতা, অন [অ], অমলা, অনকু, অলা, এরে, এইন, ই, ইটা, ইতা, ইগু	এইনতান, ইকনাইন। ইগুইন, এরা, এইনতাইন,
দূরত্ববাচক	ওবায়, ওই, ঐতা, ওউ, ওগু, ওতা, হবায়, হখ'টা, হিতা, হিগু, হেরে, হমলা, হেই, হেত, হউ	ওগুইন, হেরা, হিকনাইন। হগুইন, হিগুইন,

অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক সর্বনাম :

সারণি-১৪০

সিলেটি উপভাষার অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক সর্বনাম

সর্বনামের প্রকৃতি	রূপ
অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	খে'উ
	খে'উরে
	কুনুদিন
	কুন্তা
	কুনুখা'নঅ
	কুন্

প্রশ্নবাচক সর্বনাম :

খে' [কে], খা'রা [কারা], খা'র [কার], খে'রা [কেরা], খা'রারে [কারারে], খা'রে [কারে], খে'উ [কেউ], খে'উরে [কেউরে] প্রভৃতি প্রশ্নবাচক সর্বনাম ছাড়াও বিভিন্ন প্রসঙ্গে সিলেটিতে প্রশ্নবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।

সারণি-১৪১

সিলেটি উপভাষার প্রশ্নবাচক সর্বনাম

প্রসঙ্গ				
সময়	দিন	স্থান	কারণ	পরিমাপ
খ'টা, কুনবালা	খ'দিন, কুনদিন	খা'ন (-অ) কুয়াই, কুবায়, কুনান (- অ), কুবাই,	কিলা। কিয়র, খে'নে, কিতা,	খ'ত, খ'গু। খ'টা, খ'জন,

সর্বনামজাত বিশেষণ :

সারণি-১৪২

সিলেটি উপভাষার সর্বনামজাত বিশেষণ

দেশবাচক	কালবাচক	পরিমাণবাচক	সাদৃশ্যবাচক
অউ, অউটা, অখটা, ইকটা, কুনটা, কুয়ারির।	এল্লা, হেল্লা, অনকু, তখ'নকু, জাখা'ন, হেত্, কুনসমকুর।	অত্তো, কত্তো।	অলা, অমলা, জেমলা, জেলা, জেসা, তেমলা।

ক্রিয়া বিশেষণ

সারণি-১৪৩

সিলেটি উপভাষার ক্রিয়া বিশেষণ

ক্রিয়া বিশেষণ	অর্থ
বছা'ত্তি	দ্রুত
টফ্'	দ্রুত
ফ'ট্	তাড়াতাড়ি
লায় লায়	আস্তে আস্তে
বক্	হঠাৎ
গুরুত-গারুত	ঘড়্ ঘড়্

লিঙ্গ

লিঙ্গাকেন্দ্রিক সর্বনাম :

সারণি-১৪৪

সিলেটি উপভাষার লিঙ্গাকেন্দ্রিক সর্বনাম

সমলিঙ্গের সর্বনাম	পুংলিঙ্গের সর্বনাম	স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম
আমি, মুই, তুই, তুমি, আফ'নে, তান, তাইন ইত্যাদি	হে, তার	তাই, তাইর

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয় :

সারণি-১৪৫

সিলেটি উপভাষার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয়

পুরুষবাচক প্রত্যয়	স্ত্রীবাচক প্রত্যয়
আ	ই, ইন, নি, আনি

পুংলিঙ্গের শব্দগঠন প্রক্রিয়া :

সারণি-১৪৬

ক) সিলেটি উপভাষার পুংলিঙ্গের শব্দগঠন প্রক্রিয়া

স্ত্রীবাচক রূপমূল	+ পুরুষবাচক রূপমূল	= পুরুষবাচক রূপমূল
নাতিন	+জামাই	= নাতিনজামাই
বইন	+ফু'ত	= বইনফু'ত

স্ত্রীলিঙ্গের শব্দগঠন প্রক্রিয়া :

খ) সিলেটি উপভাষার পুংলিঙ্গের শব্দগঠন প্রক্রিয়া

পুরুষবাচক রূপমূল	+ স্ত্রীবাচক রূপমূল	= স্ত্রীবাচক রূপমূল
বা'ই	+বউ	= বা'ইর বউ
নাতি	+বউ	= নাতি বউ
ফু'ত	+বউ	= ফু'তর বউ

ভিন্ন শব্দের দ্বারা স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়ে থাকে :

সারণি-১৪৭

সিলেটি উপভাষার ভিন্ন শব্দের দ্বারা স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
হন্দিক	ননহড়ি
তালৈ	মাঐ
দামান্দ	খ'ইন্যা

বিশেষ্যমূলক রূপমূলের লিঙ্গান্তর :

সারণি-১৪৮

সিলেটি উপভাষার বিশেষ্যমূলক রূপমূলের লিঙ্গান্তর

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্ত রূপমূল	লিঙ্গান্তর
ই	ছু'ড়া	ছু'ড়ি
	ডেমা	ডেমি
	ইন	নাতি/নাতিন
	ফু'তি	ফু'তিন
আনি	ফি'র	ফি'রানি
	চদ্রি	চদ্রানি
নি	বা'গ	বা'গনি
	চাড়াল	চাড়ালনি

উভয়লিঙ্গা নির্দেশক রূপমূল :

সারণি-১৪৯

সিলেটি উপভাষার উভয়লিঙ্গা নির্দেশক রূপমূল

রূপমূল	অর্থ
বতাই	নবজাতক/শিশু
বৈরাতি	বরযাত্রী
হরুতা	শিশু
রায়বার	ঘটক

বচন

একবচন ও বহুবচন নির্দেশক বিভক্তি :

সারণি-১৫০

সিলেটি উপভাষার একবচন ও বহুবচন নির্দেশক বিভক্তি

একবচন নির্দেশক বিভক্তি	বহুবচন নির্দেশক বিভক্তি
গু, টা, খা’ন, গেছি’, গেছা’	অখ’ল/হগল, আইন, আন, আরা, তাইন, টাইন, ইন, গুইন, গুলা, গুলাইন, ন, রা

একবচনের পদগঠন

অন্ত্য প্রত্যয়যোগে :

মুক্ত রূপমূল	+ বদ্ধ রূপমূল	= পদ
গরু	+ গু	= গরুগু
নাও	+খা’ন	= নাওখা’ন
হুরুইন	+খান	= হুরুইনখা’ন
দড়ি	+গেছি	= দড়িগেছি’
উন্না	+গেছা	= উন্নাগেছা’

মুক্ত রূপমূলের সাথে মুক্ত রূপমূল সহযোগে :

মুক্ত রূপমূল	+মুক্ত রূপমূল	=পদ
অ্যাখ’	+আদল	= অ্যাখ’ আদল
অ্যাখ’	+দিনের	=অ্যাখ’দিনের

বহুবচনের পদগঠন

অন্ত্য প্রত্যয় যোগে :

মুক্ত রূপমূল	+ বদ্ধ রূপমূল	= পদ
বই	+গুইন	= বইগুইন
দামান্দ	+অখ’ল	= দামান্দঅকল
টেখা’	+ইন	= টেখা’ইন
মাছ’	+টাইন	= মাছ’টাইন

বহুবচন জ্ঞাপন মুক্ত রূপমূলযোগে :

বহুবচন জ্ঞাপন মুক্ত রূপমূল	+ মূল রূপমূল	= পদ
হখ’ল	ফা’কি	= হখ’ল ফা’কি
হগল	মানুষ	= হগলমানুষ
হারা	দেশ	= হারা দেশ
তামাম	দুনিয়া	= তামাম দুনিয়া

পদাশ্রিত নির্দেশক

সারণি-১৫১

সিলেটি উপভাষার পদাশ্রিত নির্দেশক

একবচনে	বহুবচনে	স্বল্পতা বোঝাতে
গু, লা, টা, খা'ন,	গুইন, গুলুইন,	টিন, টা, টুক, ফু'টা,
গেছা', গেছি'	খা'নিন	ফু'টি, কিনি

৩.৩

ধাতুরূপ

উৎসভিত্তিক ধাতু :

সারণি-১৫২

সিলেটি উপভাষার উৎসভিত্তিক ধাতু

সংস্কৃতজাত	প্রাকৃতজাত	বাংলাজাত	আরবি-ফারসি	অন্যান্য
যা [জা]	খা'ট্	অ্	খ'ম্	উন
খা'	বাছ্'	আস্	দাগ	খু'লা
ছ'ল্	ঠেল	হছ্'	টুক	ছা'ব
ছ'র্	জু'ল	হুন্	ফে'ছ'	

ধাতুরূপে ধ্বন্যাত্মক শব্দ :

√ জিন্ জিন্

√ তির্ তির্

√ বখ' বখ'

√ ফি'র্ ফি'র্

ধ্বন্যাত্মক শব্দজাত ধাতু :

√ খি'ল্লা < খ'ল্ খ'ল

√ দুলা < দুল্ দুল্

√ জুফ্'ড়া < ঝুপ ঝুপ

√ ফে'রা < ফের ফের

সিলেটি নিজস্ব ধাতু :

সারণি-১৫৩

সিলেটি উপভাষার সিলেটি নিজস্ব ধাতু

ধাতু	সাধিত শব্দ
√ ফা'র	ফা'রও
√ মাত্	মাতা
√ হামা	হামানি
√ তুকা	তুকানি

ক্রিয়া বিভক্তি:

সারণি-১৫৪

সিলেটি উপভাষার ক্রিয়া বিভক্তি

বর্তমানকাল

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ	
		সাধারণ/ সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	সাধারণ/ সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে
নিত্যবৃত্ত বর্তমান	ই	অ/ ও, অইন	অস, স	-ইন	য়, এ
ঘটমান বর্তমান	(হ)য়ার, ইয়ার	রা, রায়, ত্রায়, তাছ', তাছ'ইন	রে, তাছ'স	রা, ত্যাছ'ইন	র, এর, তাছে'
পুরাঘটিত বর্তমান	ছি'	ছ', ছ'ইন	ছ'স্, ছি'স্	ছে'	ছ'ইন

অতীতকাল

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ	
		সাধারণ/ সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	সাধারণ/ সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে
সাধারণ অতীত	লাম	লায়, লা	লে, লাইন	লা	ল
নিত্যবৃত্ত অতীত	তাম	তায়, তা	তে	তা	তো, তইন
ঘটমান অতীত	আত্, আছ'লাম	আত্ আছ'লায়, আত্ আছ'লা	আত্ আছ'লে	আত্ আছি'ল	আত্ আছ'লে
পুরাঘটিত অতীত	ইছ'লাম/ ছি'লাম	ইছ'লায়/ ছি'লায়, ছি'লা/ ছি'লাইন্	ছি'লে, ছ'ল্	(হ) ছি'ল	(হ) ছ'লা

ভবিষ্যৎকাল

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ
		সাধারণ/ সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	
সাধারণ ভবিষ্যৎ	মু	বায়, বা	বে	-ব, -ইব, ইবা
ঘটমান ভবিষ্যৎ	আত্/ তাম তা'খমু	তে তা'খায়, তে তা'খা, তা তা'খ্'বা	তে তাখ্'বে	-তে তা'খ
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	আত্ তা'খ'মু	আত্ তা'খ'বায়, আত্ তাখ্'বা	আত্ তাখ্'বে	আত্ তা'খ্'ব

অনুজ্ঞার বিভক্তি

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ
		সাধারণ/ সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	সাধারণ/ সম্ভ্রমার্থে তুচ্ছার্থে
বর্তমান	--	অ,অও, অইন, অউক্কা	--	অউক্
ভবিষ্যৎ		অওগি, অইবা,	ইস	ব, অইব

$\sqrt{}$ তুকা (= $\sqrt{}$ খোঁজ, to Search) ধাতুর রূপ :

সিলেটি উপভাষার $\sqrt{}$ তুকা (= $\sqrt{}$ খোঁজ, to Search) ধাতুর রূপ

সূত্র : লাহিড়ী ১৩৬৮ : ৭৯

বর্তমানকাল

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		নাম পুরুষ
		সাধারণ/ সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	
সাধারণ বর্তমান	তুকাই	তুকাও, তুকাইন	তুকা, তুকাস	তুকায়, তুকাইন
ঘটমান বর্তমান	তুকাইয়ার, তুকাইরাম	তুকাইরায়, তুকাইত্রায়, তুকাইরা, তুকাইতাছ'ইন	তুকাইরে, তুকাইত্রে	তুকার, তুকাইরা
পুরাঘটিত বর্তমান	তুকাইছি	তুকাইছ', তুকাইছ'ইন	তুকাইছি'স্, তুকাইছ'স্	তুকাইছে'

অতীতকাল

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		নাম পুরুষ
		সাধারণ/ সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	
সাধারণ অতীত	তুকাইলাম	তুকাইলায়/ তুকাইলা, তুকাইলাইন, তুকানিত আছ’লায়	তুকাইলে	তুকাইল
ঘটমান অতীত	তুকানিত আছ’লাম	তুকানিত আছ’লা, তুকানিত আছ’লাইন	তুকানিত আছ’লে	তুকানিত আছি’ল
নিত্যবৃত্ত অতীত	তুকাইতাম	তুকাইতায়, তুকাইতা, তুকাইতাইন	তুকাইতে	তুকাইত
পুরাঘটিত অতীত	তুকাইছ’লাম	তুকাইছ’লায়, তুকাইছ’লা, তুকাইছ’লাইন	তুকাইছ’লে	তুকাইত, তুকাইছি’ল্

ভবিষ্যৎকাল

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		নাম পুরুষ
		সাধারণ/ সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	
সাধারণ ভবিষ্যৎ	তুকাইমু	তুকাইবায়, তুকাইবা, তুকাইবাইন	তুকাইবা, তুকাইবে	তুকাইন
ঘটমান ভবিষ্যৎ	তুকাইতে তাখ’মু	তুকাইতে তাখ’বায়, তুকাইতে তাখ’বা, তুকাইতা তাখ’বাইন, তুকাইতে তাক্বাইন	তুকাইতে তাখ’বে, তুকাইতে তা’খ’বে	তুকাইতে তাখ’
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	তুকাই তাখ’মু, তুকাইয়্যা তাখ’মু	--	--	--

বর্তমান অনুজ্ঞা

উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ
	সাধারণ/ সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	
-	তুকাউকা,তুকাও, তুকাউক্কা, তুকাইন	তুকা	তুকাউক

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		নাম পুরুষ
	সাধারণ/ সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	
--	তুকাওগি, তুকাওগা, তুকাইবা, তুকাইবাইন	তুকাইবে	তুকাইব

অসমাপিকা ক্রিয়া :

সারণি-১৫৫

সিলেটি উপভাষার অসমাপিকা ক্রিয়া

অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি	বাক্যে প্রয়োগ
ইতে স্থানে প্রায় ক্ষেত্রে *ইত*	হে জাইতো খ'ইছিল।
ইলে	মাল্লে বা'লা অইত নায়।
ইয়া	ইটা খ'রিয়া/খ'ইর‍্যা জাইবায়।
প্রায়ই ইয়া স্থানে ই	হে 'আরি গেছে'গি।

এরূপ বিভক্তি সহযোগে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ বইয়া/বই [< বসিয়া], বি'জিয়া/বি'জি [< ভিজিয়া], বু'লিয়া/বু'লি [< ভুলিয়া], হুকাইয়া/হুকাই [< শুকাইয়া], হুতিয়া/হুতি [< শুইয়া], লাগিয়া/লাগি [< লাগিয়া], ফা'লাইয়া/ফা'লাই [< ফেলাইয়া] ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়া দুইপদী, তিনপদী, চারপদী ক্রিয়া বাক্যাংশ নিয়ে গঠিত হতে পারে।

দুইপদী ক্রিয়া বাক্যাংশ :

তুই মুকুইড় মারিয়া আয়। [তুই উঁকি মেরে আয়।]

আত দ'ইয়া জা-তে। [হাত ধুয়ে যা-না।]

তিনপদী ক্রিয়া বাক্যাংশ :

তুই গাই কিরাইয়্যা লইয়্যা আন। [তুই দুধ দোহন করে নিয়ে আয়।]

নয়া তবন ফি'ন্দিয়া হুইয়্যা আছস্ কেনে? [নতুন লুঙ্গি পরে শুয়ে আছিস কেন?]

চারপদী ক্রিয়ার বাক্যাংশ :

ছ’প খ’রি খা’টিয়া লইয়্যা আয়। [তাড়াতাড়ি কেটে নিয়ে আয়।]
মামিজিএ আমারে মেন্দি তুলিয়া আনিয়া দিয়া গেছ’ইন।
[মামি আমাকে মেহেদি তুলে এনে দিয়ে গেছেন।]

প্রযোজক ক্রিয়া প্রযোজক ক্রিয়ার গঠন :

প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু = মূল ক্রিয়ার ধাতু + আ।

মূলধাতু $\sqrt{}$ আস + আ = $\sqrt{}$ আসা

প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু $\sqrt{}$ আসা + ইরা (বিভক্তি) = আসাইরা (প্রযোজক ক্রিয়া)।

প্রযোজক কর্তা	প্রযোজ্য কর্তা	প্রযোজক ক্রিয়া
মায়	ফু’ড়িরে	ছা’ন দেখাইরা
(তুমি)	বতাইরে খা’ন্দাইও	না
হাফ’ড়িয়ায়	হাফ’	নাছা’য়

অসত্ম্যর্থ ক্রিয়া :

সিলেটিতে অসত্ম্যর্থ ক্রিয়ার ধাতু $\sqrt{}$ আছ্’, $\sqrt{}$ রঅ, $\sqrt{}$ অ, $\sqrt{}$ তাখ্’ ইত্যাদি।

সিলেটি উপভাষার $\sqrt{}$ অ < $\sqrt{}$ হ < সং. $\sqrt{}$ অস্ ধাতুর অসত্ম্যর্থক ক্রিয়ারূপ

কাল	ক্রিয়ারূপ
বর্তমানকাল	অই, অও, অইন, অস
অতীতকাল	অইলাম, অইলায়, অইলা, অইল
ভবিষ্যৎকাল	অইমু, অইবায়, অইবা, অইব
অনুজ্ঞা	অও, অইন, অ

নাসত্ম্যর্থ ক্রিয়া :

সিলেটিতে অসত্ম্যর্থ ক্রিয়ার ধাতু নায়, নাই, না ইত্যাদি।

সিলেটি উপভাষার নায় < $\sqrt{}$ নি + অয় ধাতুতে নাসত্ম্যর্থ ক্রিয়ার রূপ

পুরুষ	নাসত্ম্যর্থ ক্রিয়ারূপ
উত্তম পুরুষ	আমি নায়, তুমি খ’রবায়।
মধ্যম পুরুষ	হিদিন বাদে শুনি তুমি নায়, আরো কিগু।
প্রথম পুরুষ	তাইন নায়, তান হড়িএ দিছ’ইন।

নাম অনুসর্গ : **অনুসর্গ**

সারণি-১৫৬

সিলেটি উপভাষার নাম অনুসর্গ

নাম অনুসর্গ	অর্থ/উৎস	বাক্যে প্রয়োগ
আগে	< অগ্র = সম্মুখে	হকলর আগে তাই উবাইছে’।
কামে	< কর্ম = নিমিত্তে	কুনকামে তুইন নিশারাইতঅ আইলে।
অন্তে	< অন্তে = তরে	শরম অন্তে মরন বা’লা।
টাইন	< ঠাঁই = নিকট	কেউরোটাইন টেখা ফা’ইতায় নায়।
তবে	< থুন্ = থেকে, হতে	তুমারতান তনে বা’লা ছ’লিয়ার বা।
মাজে	< মধ্যে = অধিকরণ অর্থে	আফ’নার কতা’র মাজে ফাঁক্ আছে।
মানতে	< অবধি	তুমি আইছ’ মান্তে ম্যাগ ফ’ড়ের্।
বাজু	< বাজু = পাশ/দিক	বি’তরবাজু মুকা হামারে গ।

ভাব অনুসর্গ:

সারণি-১৫৭

সিলেটি উপভাষার ভাব অনুসর্গ

ভাব অনুসর্গ	উৎস/অর্থ	বাক্যে প্রয়োগ
দি, দিয়া	< দিয়ে; করণ অর্থে	বাছা’র তেল দি বাছা’ বিরান।
লই, লইয়া	< লওয়া = গ্রহণ	আলি লইয়া কুনবায় গেল?
করি	< কর্ +ই = জন্য/নিমিত্ত	তাই ছা’উল নিত খ’রি আইছে’।
সকারে	<বাং. সহকারে = সহিত	হে ডালসখা’রে বাং’গি ফড়ছে’।

বর্তমান অনুজ্ঞার *খ’র্* ধাতুর রূপ :

সারণি-১৫৮

সিলেটি উপভাষার বর্তমান অনুজ্ঞার ‘খ’র্’ ধাতুর রূপ

পুরুষ		ধাতুরূপ
মধ্যম পুরুষ	সাধারণ/সম্ভ্রমার্থে	খ’রঅ/খ’রইন্
	তুচ্ছার্থে	খ’র্
প্রথম পুরুষ	সাধারণ/সম্ভ্রমার্থে	খ’রউকা
	তুচ্ছার্থে	খ’রউক্

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার *খ’র্* ধাতুর রূপ :

সারণি-১৫৯
সিলেটি উপভাষার ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার ‘খ’র্’ ধাতুর রূপ

পুরুষ		ধাতুরূপ
মধ্যম পুরুষ	সাধারণ/সম্ভ্রমার্থে	খ’রিও/খ’রইনজে
	তুচ্ছার্থে	খ’রিছ’রে/খ’রিছ’বে

সমাসবদ্ধ পদ

যৌগিক শব্দ

সারণি-১৬০
সিলেটি উপভাষার সমাসবদ্ধ পদ

সমাসের নাম	সমাসবদ্ধ পদ
দ্বন্দ্ব সমাস	ফু’আফু’ড়ি, রইদবান, মাতখ’তা, হাজাফা’ড়া, আখা’ফে’ন্দা, ফা’নিখা’ঞ্জি, আরিফ’রি, অবায়-হবায়
বহুব্রীহি সমাস	গরবাওআনি, বার্বাওআনি, উলছা’রানি, খ’রানিফু’ক, নিফুটি, উগাউগি, আতাআতি, থুতামুখি, উপরিখাউরি, তিনফা’ইয়া
তৎপুরুষ সমাস	খলইধরা, বা’তেমারা, শনিবারি, বাজারবাও, বনরউ, ফে’রকুটি,
কর্মধারয় সমাস	তেড়ামাত, ছি’কডাল, উদ্লাফু’তা, ইছা’রাংগা, ফা’টিবলা, মানুবান্দর, নলবাড়ি, বিরইনফি’টা, নলতল, ডুববেত।
দ্বিগু সমাস	তিমুখি’, বারোমুনি, ফা’ছ’ফি’রি
উপসর্গীয় সমাস	নিনাইয়া, নিকামলা, নাবাছা, বেফানা, বিজালা।

শব্দদ্বৈত দ্বিগুণিত শব্দ :

সারণি-১৬১
সিলেটি উপভাষার দ্বিগুণিত শব্দ

ব্যঞ্জনা	শব্দদ্বৈত
বহুত্ব	জে জে, জাইন জাইন, মুইট মুইট, উড়া উড়া
ব্যাপকতা	গাউ গাউ, গ’রঅ গ’রঅ, মাতে মাতে
প্রগাঢ়তা	লাল লাল, মুরে মুরে
সংযোগ	চুরে চুরে, মানে মানে
মৃদুতা	ফা’নি ফা’নি, আসি আসি, তাফ’ তাফ’
দ্বিধা	খ’ইতা খ’ইতা, বইতা বইতা
অনতিক্রম	হাইনজায় হাইনজায়, ফ’তায় ফ’তায়

অনুকার শব্দ :

বা’তউত, চিন্তাউন্তা, টেখা’উকা, রইদউইদ, গ’রউর, মাতউত, কুটাকাটা, সাফ’কুফ’, গিলাগিলি, লতলুত।

অনুগামী শব্দ :
খা'নদাকুটা, কুটুমখে'শ, গাতগাড়া, গুশটিগাড়া, জিগারফু'ছ', তশলাখ'ড়াই, নাতিনশা, হাইমাউগ, ময়মুরবিব, বেমারআজার।

ধ্বনাত্মক শব্দ :
আইটাই, খ'ড়খ'ড়, হিরহির, ফে'রফে'র, জিনজিন, খ'ট্খ'ট্, খু'কখু'ক, খ'শ্খ'শ্, গম্গম্, গ্যা'নগ্যা'ন, জ'ম্জ'ম্, মিন্মিন্, টশটশ, টিমটিমা, টন্টনা।

আত্মীয়বাচক শব্দ

মাই, মাইজি, মায়জি, আম্মা, আম্মাজান, আম্মাজি; বাসাব; বাজান, বাবাই, বাবাজি, বাবাজান, বাবাইয়, আবাবা, বাবা; বাই ; বাইসাব ; বুবু, বুবাই।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাচক শব্দ

আঙ্গুইল; নৌক; নখ; আউয়া; অলকম (মুহের হা), চৌকের পাত্তি, নাখর ফা'ই; -পাই ; গা'র; গরদানা, কান।

গৃহপালিত পশু

আশ, আশা; আই, আওয়া; মুরকি, মুরগি, মারক; ডেমা, ডেমি; ডেখা, ডেখি; বিসাল; হাড়; ছাগল ; বকরি ; বরকি, ছাগিছা ; পাঠিবাচ্চা; মেড়া; ভেরা; দামা; বলদ; মেকুর; বিলাই, মেকুন্নি, পারো, পারা; কইতর, পাকি; পরিন্দা/পইক, পইক্কা; পাককি; হাপ; হাফ, ঘুড়া/গুরা/গুড়া, অরিণ/অরিঙ্গা, ভইশ/বইশ; কুড়া, কুড়ি; বগলা; জাটিয়া; ডুপি, ডুফি; হারো।

তরিতরকারি ও ফল ফলাদি

উদইয়া (উচ্ছে), অরতকি (হরীতকী), অনুয়ার (ডালিম); (চিচিঙ্গা); ডেফল; জারা লেম্বু; কাউ ; কপল/কয়ফল (পেঁপে), কেরেলা; কুইয়ার (আখ)।

ঋতু-মাস-সময় ইত্যাদি

আইজ (অদ্য); জইট; আশ্বিন/আশিন, আইন (জৈন্তিয়া); আড়; কাতি; আগন; পু'শ; চৈৎ; এয়ৎকাল/এয়োত (হেমন্ত অর্থে) ; এ্যাওতর সময় (গ্রীষ্মকাল; জৈন্তিয়া) ; ডাওবর দিন; দুফুর; দুইপর; বাদো (জৈন্তিয়া)।

দ্রব্যনাম ও বিবিধ

উন্দাল; উন্দাকাল (জৈন্তিয়া); চুলা/উন্দাইল (চুলা), উবানি/খা'রানি (সামনে উপস্থিত), এরি/এরা মাগি (স্বামী পরিত্যক্তা), উছরা/আইৎনা; পেটনা; দা'ইর (ঘরের ছোটো বারান্দা বা ধার); এন্ডা, বইদা; কুদাল, কইলা; কল; হাচি (কলস), খিড়কি/খিকরি (খিড়কি); গছ, গছলা/ছিন্ডা।

কিছু অব্যয়শব্দ

ক. একরে (একদম); ইগু ; ইগুইন; ইলা ; ইটা (এই); ওগ; হিগু (ঐটা); এবে/ওবে (হে), ওবা; অবায়/ওরে ব'; কিতা বা (কি)।

কিছু বিশেষণ শব্দ

খ. অকল (যেমন, গোরু অকল), আইন (যেমন, পুইরাইন, বেটাইন); গুইন ; গু (যেমন, মানুষগুইন ; পুরিগু)।

সাহিত্য:

প্রাচীন যুগ

সিলেটে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছে সুপ্রাচীন কালে। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্রাহ্মণশূন্য অনার্যভূমি ছিল, কিন্তু সিলেট অঞ্চলে ব্রাহ্মণবসতি ছিল। সুরেশচন্দ্র

সমাজপতির মতে 'যখন আমাদের সমগ্র বঙ্গাদেশ সমুদ্রগর্ভে বিলীন ছিল, তখন সিলেটে আর্যজাতির বিজয় বৈজয়ন্তী উড়ছিল।'

প্রাচীন যুগে তাম্রফলক, ভূমিদান বা বৃত্তিদানসংক্রান্ত দলিলাদি হলো সাহিত্যনিদর্শন। তবে সপ্তম শতাব্দী থেকে সিলেটে যে সাহিত্যচর্চা হয়েছে তার প্রমাণ আছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদ* । চর্যাপদের সকল কবি এক কালের বা এক স্থানের নয়। নানা কালে নানা স্থানে বসবাস করে তাঁরা চর্যা রচনা করেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের ভাষা বঙ্গ কামরূপী ভাষা। সিলেট তখন কামরূপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের ভাষার মিল আছে। চর্যাপদে ব্যবহৃত বহু শব্দ (রুখ, সাঙ্কম বা হাকম, নাঠা, কাউয়া, সামায়, আলাজালা, উভায়, সুতিলা ইত্যাদি) এখনো সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়, যেগুলো বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলে প্রচলিত ছিল না- এখনও নেই। সৈয়দ মুর্তাজা আলী এবং মুহম্মদ আসাদ্দর আলী এ-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। **কাহ্নপা, ভুসুকু পা, সরহ পা, লুইপাসহ** অধিকাংশ চর্যাকার সিলেটের সন্তান ছিলেন।

মধ্যযুগ মধ্যযুগে মুসলিম আগমনের পর বাংলাসাহিত্যে নবযুগের উন্মেষ ঘটে। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, চিন্তার প্রসারে রচনার লালিত্যে ও সংখ্যাধিক্যে মধ্যযুগের সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা ফার্সি সাহিত্যের প্রভাবজাত। এসময় বেশকিছু ফারসি কাব্য বাংলায় অনূদিত হয়। অধিকাংশ অনুবাদ ভাবানুবাদ। ফারসি কাহিনিকে বাঙালি কবির নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নবরূপ দান করেছেন।

হজরত শাহজালাল (র.)-এর আগমনের পর ফারসি সাহিত্যের সুফি মতবাদ সিলেটে প্রচারিত হয় এবং মরমি গান বা মরমি সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। সুফিশাস্ত্র বিষয়ক কাব্যও সিলেটে রচিত হয়েছে। আর মরমি সাহিত্যের স্বপ্নরাজ্য সিলেটে মধ্যযুগ অতিক্রম করে একুশ শতকে এসেও এর রেশ প্রবহমান। মরমি কবিগণ অনিত্য সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত জীবনের জন্য হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করেছেন। এখানে সুফি সাহিত্য ও পদাবলি সাহিত্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃভূমি সিলেট। তাঁর বেশ কয়েকজন পার্ষদ সিলেটবাসী। ফলে জীবনীসাহিত্য ও পদাবলি সাহিত্য সিলেটে চর্চা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য জীবনী রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে জীবনী সাহিত্য রচনার সূচনা হয়। মধ্যযুগের দেবদেবীপ্রধান সাহিত্যকে অতিক্রম করে মানুষের জীবনকথা রচনা করার প্রয়াস সাহিত্যক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে উত্তরণ। আর এক্ষেত্রে পথিকৃৎ হলেন সিলেটের মুরারি গুপ্ত। নবদ্বীপে বসে যাঁরা চৈতন্যজীবনী বা পদ রচনা করেছেন তাঁদের অনেকেই সিলেটের সন্তান। রাধাকৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনায় সিলেট

অগ্রণী। এসকল পদ কেবলমাত্র হিন্দু কবিরাই রচনা করেননি, মুসলমান কবিগণও করেছেন। সুফি মতবাদ ও বৈষ্ণবীয় মতবাদের সম্মিলনে এ সাহিত্য এগিয়ে চলেছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবির *পদমঞ্জুষা* (১৯৮৪) গ্রন্থে একশত বিশজন মুসলিম পদকর্তার পদ আছে। এর মধ্যে চৌষট্টি জন সিলেট অঞ্চলের। সিলেটে রামায়ণ, মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের বেশ কয়েকটি শাখা থাকলেও সিলেটে মনসামঙ্গলই বেশি রচিত ও প্রচারিত হয়েছে। এখনো শ্রাবণ মাসব্যাপী গ্রামাঞ্চলে মনসামঙ্গল ভক্তিভরে পঠিত হয়। মধ্যযুগে লোকগীতিকা রচিত হয়েছে সিলেটে। রচিত হয়েছে জনপ্রিয় বারমাসি গান। নাগরি লিপির উদ্ভবও এসময়ে। নাগরি হরফে ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থ ও লৌকিক বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

মধ্যযুগে সিলেটের কাশীনাথ দ্বিজ, গোপীকান্ত দ্বিজ, জগন্নাথ বৈদ্য, ত্রিলোচন দ্বিজ, ভানুদাস শুক্লবৈদ্য, মালী ধর্মদাস, মুরারি মিশ্র ও হরিহর দত্ত *মনসামঙ্গল* বা *পদ্মপুরাণ* রচনা করেছেন।

রামায়ণ অনুবাদ করেছেন সিলেটের অনন্তরাম। রামায়ণের কাহিনি নিয়ে দ্বিজ ভবানী রায় লিখেছেন '*লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়*'।

প্রাক-চৈতন্যযুগে সিলেটের বাণেশ্বর চক্রবর্তী ও শুক্রেশ্বর চক্রবর্তী ১৪৫৮ সালে পয়ার ছন্দে রচনা করেন ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস *রাজমালা*।

শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন কবি মুরারি গুপ্ত (দুলালী) চৈতন্য-জীবনী সংস্কৃতে রচনা করলেও বাংলায় বহু বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন সিলেটের কবি জগজ্জীবন মিশ্র (*মনঃসন্তোষিনী*) পুরন্দর মিশ্র (*চৈতন্য বিলাস*), ব্রজমোহন দত্ত (*গৌরাঙ্গগীতি*) ও রামরত্ন ভট্টাচার্য (*শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী*)।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন—মদনচাঁদ (*কলঙ্ক ভঞ্জন*), জগন্নাথ বৈদ্য (*কলঙ্কোদ্ধার*), জগন্নাথ দাস (*কলঙ্ক উদ্ধার*), কুঞ্জকিশোর পাল (*বৃন্দাবন বর্ণন*), কৃষ্ণদাস (*দণ্ডাত্মিকা লীলাবর্ণন*), মনোহর সেন (*কৃষ্ণবিজয়, কৃষ্ণ সংগীত*), রামদাস (*কৃষ্ণচরিত*), গঙ্গারাম (*গোপালচরিত*) শিবানন্দ দত্ত (*গোবিন্দবিজয়*), পরশুরাম (*সুদাম চরিত*)।

বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন জৈন্তার রাজা রাজেন্দ্র সিংহ, ধর্মদাস বৈষ্ণব (*শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা*) রামানন্দ মিশ্র (*রসতত্ত্ব বিলাস*), আনন্দরাম লালা, জগবন্ধু গুপ্ত (*অপূর্ব দর্শন*), চৈতন্য চরণ পাল (*শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত লহরী*) তারক চন্দ্র কৃতিরত্ন (*স্তুতিমালা*), যদুনাথ কবিচন্দ্র (*১৬শ শতক*), রত্নগোবিন্দ চৌধুরী, রাসবিহারী দত্ত (*রসতত্ত্ব বিলাস*), শঙ্কর ঘোষ, কিশোর রায়, ব্রজকিশোর গুপ্ত (*গোবিন্দভোগের গান*), চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন প্রমুখ।

মধ্যযুগের সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা পাঁচালি কাব্য। গণেশরাম শিরোমণি রচিত '*হট্টনাথের পাঁচালি*' সাতখণ্ড ছত্রিশ হাজার পঙক্তিতে পয়ার ছন্দে লিখিত। এই পাঁচালিতে কামরূপ রাজ কামসিন্ধু থেকে শুরু করে তাঁর পঞ্চবিংশতিতম অধস্তন পুরুষ রাজা গৌড় গোবিন্দের পতন পর্যন্ত কাহিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য পাঁচালি রচয়িতা হলেন, জগন্নাথ বৈদ্য (*শ্রীচৈতন্যের পাঁচালি*), বিপ্রনাথ সেন (*সত্যনারায়ণের পাঁচালি*), মনোহর সেন (*হাস্যনাথের পাঁচালি*) রঘুনাথ দত্ত (*বাবাম্বর পাঁচালি*), জয়কৃষ্ণ দত্ত (*হাস্যনাথের পাঁচালি*) প্রমুখ।

মধ্যযুগে বা আধুনিক যুগের শুরুতে সিলেটে লোককবিদের অনেক রচনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ভট্ট কবিতা রচনা করেছেন দুলালী হাউস পুরের শরৎচন্দ্র ভট্ট (*রাম বনবাস*) ও বিশ্বনাথের (সিঙ্গোর কাছ) প্যারীমোহন ভট্ট (*শুভ কামনা, আশিস*)।

সিলেটে রচিত গীতিকা বা পালাগানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *তিলাই রাজা, চান্দরাজা, মণিবিবি, রঙ্গমালা, ছুরতজান বিবি, আলিপজান সুন্দরী, সোনামণি কন্যা, জমির সওদাগর* ইত্যাদি। বারমাসির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *শান্তি কন্যার বারমাসি, কোকিলা কন্যার বারমাসি, মনের বারমাসি* ইত্যাদি। এছাড়া সিলেটের লোকসাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গজল, ক্বাসিদা, মালসি গান, ধামাইল গান, জারিগান, সারি গান, বিয়ের গান, ভাটিয়ালি গান, আরি গান, বাউল গান, প্রবাদ ধাঁধা, ছড়া ইত্যাদি।

মননশীল গদ্য

আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগে শিল্পিত ও মননশীল গদ্যচর্চায় সিলেটের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। প্রাক-বিদ্যাসাগর যুগের দুটি গদ্যগ্রন্থ সিলেটে রচিত হয়েছিল বলে মুদ্রিত প্রমাণ আছে। ১৮২৭ সালে কৃষ্ণচন্দ্র শর্মা শিরোমণির *পুরাণ বোধোদ্দীপনী* প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ড ১৯৪৭ সালে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় পুনঃপ্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন, 'পুরাণের পদ্যানুবাদ সাহিত্য নহে, সাহিত্যের জন্যে প্রস্তুতি, ইহা নবজাত পদ্য শিশুর ভারসাম্যের অনুসন্ধান। সেই দিক দিয়ে পুরাণ বোধোদ্দীপনী গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য আছে। ইহাতে পূর্ণ পরিণতি নাই, আছে তাহার সম্ভাবনা ও পূর্বসূচনা।'

উনিশশতকের নবজাগরণের ফলে বাঙালি চৈতন্যে যে আত্মচেতনা জাগে তার ফলে শুরু হয় শিকড়ের সন্ধান। এ সন্ধানে বিশ শতকে শুরু হয় ইতিহাসচর্চা। অচ্যুতচরণ চৌধুরীর। *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত* (পূর্বাংশ ১৯১০, উত্তরাংশ ১৯১৭) সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, 'ইউরোপে ইতিহাস লিখিতে আজকাল যেরূপ সুশৃঙ্খল প্রণালী ও সমবেত চেষ্টা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' বঙ্গদেশে তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত। জেলার ইতিহাস দেশময়

জাগিয়া উঠিয়াছে, সেটা শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করি। এই কার্যে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' লেখক যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং যে শ্রেণির গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে।' (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮)।

১৮৩৫ সালে প্রকাশিত হয় জয়গোপাল রায়ের '*বিদ্যোদয়*'। উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে মননশীল গদ্য সাহিত্য রচনায় যাঁরা মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- জগদ্বন্ধু গুপ্ত (*জীবন কথা*), মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ (*শ্রীহট্ট দর্পণ*), আবদুর রহিম (শ্রীহট্ট নূর), রজনীকান্ত রায় দস্তিদার (স্বাস্থ্যসুখ ও চির যৌবন লাভের সহজ উপায়), গুরুসদয় দত্ত (পল্লী সংস্কার, পল্লী সংগঠন, গোড়ায় গলদ, ব্রতচারী সখা ইত্যাদি), মুফতি আজহার উদ্দিন আহমেদ সিদ্দিকী (শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি), আবদুল আজিজ মাস্টার (জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস), ক্ষীরোদ চন্দ্র দেব (দারিদ্র্য ও সমবায়), আবদুল করিম (ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস), রমণীমোহন দাস (সমবায় সমিতির কথা, পল্লী সংস্কারে সমবায়), অমিয়াংশু কর (ভক্তিরসতত্ত্ব)।

পরবর্তীকালে মননশীল সাহিত্যচর্চা করেছেন প্রেমদাময়ী আদিত্য, নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী *(শ্রীহট্ট প্রতিভা)*, মতীন উদ-দীন আহমদ, *(হৃদয় দিয়ে দেখা, নেতানামা)*, গোবিন্দ চন্দ্র দেব *(আমার জীবন দর্শন, তত্ত্ব বিদ্যাসার)*, মুহম্মদ নুরুল হক (বিশ্বনেতা, সংবাদপত্র সেবায় সিলহেটের মুসলমান*)*, কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী *(শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ববর্তী শ্রীহট্টের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা)*, আকাদ্দস সিরাজুল ইসলাম *(বন্দী জীবনের কিছু কথা)*, ইউসুফ চৌধুরী *(সন্ধানী কথা)*, জাতীয় অধ্যাপক আব্দুল মালিক *(জীবনের কিছু কথা)*, ফজলুর রহমান *(শতাব্দীর দর্পণ, সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ, সিলেটের ১০১ একজন, সিলেটের আরও ১০১ একজন, জৈন্তিয়া দর্পণ, সিলেট পরিক্রমা)*, হেনা দাস *(স্মৃতিময় দিনগুলো, আমার শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবন, চার পুরুষের কাহিনী)*, মো. শামসুল হক *(মানব জীবনের মৌলিক সমস্যা ও সমাধান, সৌভাগ্য সোপান)*, মিলাউ সিংহ লৈচম্বন *(শ্রীকৃষ্ণপ্রীতে শ্রাদ্ধসমাচার)*, সৈয়দ ইসলাহ উদ্দিন আহমদ *(বাংলাদেশ রাজনীতির গূঢ়কথা, দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রাম)*, আবদুল মতীন জালালাবাদী *(মহাশক্তির সন্ধানে, ইসলাম ও কৃষি, মুসলিম বিশ্বের কৃষি, ইসলাম ও সমাজকল্যাণ, জীবন মৃত্যু পরকাল)*, আতিকুর রহমান *(পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি, প্রেক্ষিত : পার্বত্য সংকট, পার্বত্য তথ্যকোষ)*, শহীদ অলিউর রহমান *(ধর্ম কর্মে নারীর স্থান, শোষণমুক্ত সমাজ)*, নুরুল ইসলাম *(প্রবাসীদের কথা)*, বোরহান উদ্দিন খান *(ইসলামী সংস্কৃতির কথা, কা তব কান্তা, স্বগত সংলাপ)*, আবুল মাল আবদুল মুহিত *(The Deputy Commissioner in East Pakistan, Bangladesh : Emergence of a Nation, Bangladesh : Emergence of a Nation, Revised Second Edition, Thoughts on Development Administration, Problems of*

Bangladesh-An Attempt at Survival, Development Strategies-Lessons from Experience. বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য (Bangladesh: Reconstruction and National Consensus), American Response to Bangladesh Liberation War, স্মৃতি অম্লান ১৯৭১ (Unblemished Memories-1971), রাজনৈতিক ঐকমত্যের সন্ধানে (In Search of Political Consensus), Bangladesh in the Twenty-first Century: Towards An Industrial Society, বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব (Bangladesh : Development of a nation State), Issues of Governance in Bangladesh, মহাপুরুষের কথা : কাছে থেকে দেখা (Stories of Great Men : Seen From Close Quarters), নানা দেশ নানা জাতি (Many Countries Many Nations), ছোট সীমানা বৃহৎ বিকাশ (Small Circle Huge Development) (সম্পাদিত), জেলায় জেলায় সরকার : স্থানীয় সরকার আইনসমূহের একটি পর্যালোচনা (Government for District : Discussion of all Local Government Laws), A Rigged Election : An Illegitimate Government, কারচুপির নির্বাচন অবৈধ সরকার (Rigged Election Illegitimate Government) (সম্পাদিত, An Agenda for Good Governance: From lawlessness and corruption to a caring and prosperous democracy, The State Language Movement in East Bengal 1947-56, এই দেশ এই মাটি (This Country, This Land) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বাণী, নির্দেশ ও সাক্ষাৎকারের সংকলন (যৌথ সম্পাদনা), তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাতাশ মাস (Twenty Seven Months of Caretaker Government), বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ (Bangabandhu and Bangladesh), স্মৃতির মণিকোঠায় (In the Bejewelled Memory Casket), বাংলাদেশের অভ্যুদয়, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৫, বসবাসের উপযুক্ত বাংলাদেশ চাই, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৫, সোনালি দিনগুলো, চন্দ্রাবতী একাডেমী, ঢাকা, ২০১৬, রচনাসমগ্র, দশখণ্ডে, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, স্মৃতিময় কর্মজীবন, চন্দ্রাবতী একাডেমী, ঢাকা, ২০১৭), মো. আবদুল আজিজ *(মুরারিচাঁদ কলেজের ইতিকথা, সিলেট জনমানস ও অর্থনীতি, অমর্ত্য সেন : ব্রাত্যজনের অর্থনীতিবিদ, স্মৃতি বিস্মৃতির প্রজন্ম, মহাবিশ্বের মহাবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, উত্তরাধিকারের ঋণ, সাগরপারের দিনগুলো, ফাইনম্যানের অন্তরঙ্গ কাহিনী, কালের যাত্রার ধ্বনি, বার্ট্রান্ড রাসেল যখন অকপট, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সর্বাধিনায়ক ওসমানী, চেনা লোক জানা মানুষ),* মোহাম্মদ আবুল বশর *(বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ, স্মৃতির ভুবনে বসবাস ও অন্যান্য),* বিজিত কুমার দে *(শ্রীহট্ট প্রদীপ),* ফারুক চৌধুরী *(দেশ দেশান্তর, নানাক্ষণ নানা কথা, স্বদেশ স্বকাল স্বজন, সময়ের আবর্তে),* নসীর উদ্দীন আহমদ *(হজরত শাহজালাল র., সিলেটের সংক্ষিপ্ত ফোকলোর*

পরিচিতি, সিলেট ইতিহাসের স্বরূপ সন্ধান), আবদুল মতিন চৌধুরী *(গোলাপগঞ্জ, সত্যের মাপকাঠি)*, আবদুল মতিন চৌধুরী *(বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ দর্পণ, বিয়ানীবাজারের কথা)*, ওবেইদ জাগীরদার *(মুক্তির অন্বেষায় মধ্য এশিয়া, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য নিবন্ধ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ)*, ইনাম আহমদ চৌধুরী *(ভাবনায় বাংলাদেশ, ধায় গাড়ি ধুম ছাড়ি)*, মঈনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম *(এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য স্বাধীনতার প্রথম দশক, দেশটা কেমন করে এমন হলো)*, মাহবুব আলী *(সংগ্রামী রেল শ্রমিক)*, আতাউর রহমান *(পরদাদার ভ্রমণ কাহিনী, নঞ তৎপুরুষ, চিত্রবিচিত্র)*, নুরুল ইসলাম নাহিদ *(বাঙালি রুখে দাঁড়াও, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লক্ষ্য ও সংগ্রাম, শিক্ষানীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রাজনীতির সুস্থধারা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম)*, নুরুন্নেছা চৌধুরী রুনী *(হৃদয়জুড়ে বাংলাদেশ)*, কুদরতে এলাহী *(মোল্লাপুর একটি প্রাচীন জনপদ)*,সালেহ উদ্দিন আহমদ জহুরী *(অপসংস্কৃতির বিভীষিকা, ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন, শব্দ সংস্কৃতির ছোবল, স্বজন যখন দুশমন হয়, তথ্য সন্ত্রাস)*, আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী *(মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা, জীবন সন্ধ্যায় মানবতা, ইসলাম ও রাজনীতি)*, জাহেদা আহমদ *(সময়ের দর্পণে বাংলাদেশ)*, মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান *(বঙ্গবীর ওসমানী, হজরত শাহজালাল র.)*, শুভাগত চৌধুরী *(চিকিৎসা বিজ্ঞানে আবিষ্কারের কাহিনী, আপনার কুশল, মনের এ দুয়ারটুকু, স্বাস্থ্য বিচিত্রা, শিশুর জগৎ, সুখে অসুখে, শরীর ভালো রাখতে হলে, সুস্থ থাকার সহজ উপায়, ভালবাসার ধন)*, মো. আজিজুর রহমান লস্কর *(নাইজেরিয়ার দিনগুলো, ইউরোপের এখানে ওখানে)*, জুবায়ের সিদ্দিকী *(স্মৃতির অলিন্দে, কালের কথামালা, আমার জীবন আমার যুদ্ধ)*, আফতাব চৌধুরী *(ইদানীং, সত্যের মুখোমুখি, আলোর সন্ধানে, ইতিকথা, জীবন ও জগত, নির্বাচিত কলাম, নজরুল প্রতিভার নানা দিগন্ত, প্রত্যাশার দিগন্তে কালো মেঘ, প্রকৃতি ও জীবন, একের ভিতর একুশ)*, নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ *(বাংলাদেশের হিন্দু নারীর অধিকার ও পারিবারিক আইন, মুক্তিমঞ্চে নারী)*, রেহানা রহমান *(ঘুরে এলাম আন্দালুশিয়া, প্যালেস্টাইনিরা কেন গৃহহারা)*, শামসুল করিম কয়েস *(বাংলা সাহিত্যে সিলেট ১২ খণ্ড, জীবনশিল্পী দিলওয়ার, মরমি কবি শিতালং শাহ, সৈয়দ মুজতবা আলীর বৈচিত্র্যময় সাহিত্যভুবন)*, হাসানুজ্জামান চৌধুরী *(পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূরাজনীতি ও বিপন্ন সার্বভৌমত্ব, ধর্ম নিরপেক্ষতা পরিচয় ও ঠিকানা)*, অরূপ রতন চৌধুরী *(আর ধূমপান নয়, মুখ ও দাঁতের স্বাস্থ্য)*, এ কে শেরাম *(মণিদীপ্ত মণিপুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়া বিতর্ক ইতিহাসের দর্পণে দেখা, বাংলাদেশের মণিপুরী: ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে)*, আমেনা আফতাব *(সুখে দুঃখে রবীন্দ্রনাথ)*, আবদুল হামিদ মানিক *(সিলেটে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি, চলতে চলতে দেখা, স্মৃতি ও ঐতিহ্যে বহমান বাংলা)*, শামসাদ হুসাম *(ছায়া প্রচ্ছায়া পথে পথে, ইতিহীন ইতিকথা, অন্তবিহীন পথ, কালজয়ীদের জীবন কথা, দেশ বিদেশের বিচিত্র ঐতিহাসিক কাহিনী)*, মহিউদ্দিন শীরু *(সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, প্রবাসে বালাগঞ্জবাসী, ক্লান্ত*

রাতের ধ্রুবতারা, পাখির স্বজন নেই), মুহাম্মদ ফয়জুর রহমান *(বৃটেনে বাংলাদেশী)*, ড. মোহাম্মদ আবদুর রব *(বাংলাদেশের ভূরাজনীতি কয়েকটি সাম্প্রতিক সমস্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম : বিপন্ন সার্বভৌমত্ব ও ভূরাজনীতি, পর্যটন ভূগোল বাংলাদেশ)*, ড. রেণু লুৎফা *(কালের কণ্ঠ, স্পর্ধিত আত্মবোধ)*, আ.ফ.ম. সাঈদ *(জীবন যুদ্ধে বিলাত প্রবাসীরা, বিলাতে বাংলাদেশী অর্জন ও অবদান, শব্দে মিল অর্থে অমিল)*, ইসহাক আল মাদানী *(স্পেনে আরবি সাহিত্যের বিকাশ, মিশরে আধুনিক আরবি সাহিত্যের বিকাশ)*, আবু তাইয়্যিব সৎপুরী *(বিশ্বনবীর মর্যাদা, সাহাবীদের মর্যাদা)*, এ. কে. এম. বদরুদ্দোজা *(নিজকে জানো নিজকে গড়ো)*, কানন পুরকায়স্থ *(বিষয় বিজ্ঞান, ক্যানসার, তৃতীয় বিজ্ঞান)*, মুকুল চৌধুরী *(পথিকৃৎ দশ মনীষী, বাংলাদেশের স্বতন্ত্র সাহিত্য ও অন্যান্য প্রবন্ধ)*, শাহজাহান সিরাজ *(ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিকথা, আমেরিকায় ইসলাম ও মুসলমান : হাজার বছরের চালচিত্র)*, গিয়াস উদ্দিন আহমদ *(মহাকবি শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর জীবন ও কাব্য, বালাগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য)*, আবদুল হাই মোশাহিদ *(বালাগঞ্জের মাটি ও মানুষ)*, নাজির আহমদ (সমকালীন ভাবনা), ফতেহ ওসমানী *(লন্ডনীদের সুখ দুঃখ, প্রবাসীদের দিনকাল)*, মুহিত চৌধুরী *(আমেরিকায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি)*, তাপসী চক্রবর্তী লিপি *(অন্য রকম যুদ্ধ)*, আমান উদ্দিন *(দিলওয়ার : কাব্য ধর্ম ও মানব দর্শন, হাছন রাজার উচ্চানুভূতি, প্রেম ও বৈরাগ্য ভাবনা)*, ফারুক আহমদ *(গোলাপগঞ্জে ইসলাম, বিলাতে বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা, বিলাতে বাংলার রাজনীতি)*, সেলিম আউয়াল *(সিলেট বিষয়ক লেখাজোখা)*, মো. ইমরানুল বারী *(মহাকালে নজরুল, রকীব শাহ : জীবন ও সাহিত্য)*, পুলিন রায় *(কষ্টের নোনাজলে যাপিত সবুজজীবন, ওরা সবুজ ওরা জীবনযোদ্ধা)*, শাকুর মাজিদ *(আমিরাতে তেরো রাত, কালাপানি, পাবলো নেরুদার দেশে, হোচিমিনের দেশে, সক্রেটিসের বাড়ি)*, ড. সেলু বাসিত *(বাংলাদেশের গবেষণা সাহিত্য, দিলওয়ার : অব্যাহত কবিতার ধারায়, সিলেটের উপভাষা সাংগঠনিক বিশ্লেষণ)* মো. নিয়াজ উদ্দিন *(প্রসঙ্গ : সমাজ ও সাহিত্য)*, হাবিব আহমদ দত্ত চৌধুরী *(বঙ্গবীর ওসমানী : বাংলার স্বাধীনতার রূপকার, গুরুসদয় দত্ত বাঙালি জাতিসত্তার আবিষ্কারক স্বাধীনতার পথিকৃৎ, প্রাচ্যের সক্রেটিস পঞ্চখণ্ডর রঘুনাথ শিরোমণি, কৃষি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ)*, আবদুর রশীদ লুলু *(হৃদয়ে মম)*, এনামুল মুনিম শামীম লোদী *(বিয়ানীবাজারের হারিয়ে যাওয়া সোনার সন্তানেরা)*, মো. ফয়জুল হক *(জৈন্তা রাজ্যের পৈরাণিক ইতিহাস)*, শিকদার মুহাম্মদ কিব্রিয়াহ *(মুক্তবুদ্ধির সমীক্ষা ও শুভবুদ্ধির আদর্শ, তৃতীয় বিশ্বে বিশ্বায়ন ও উত্তরাধুনিকতা, সাহিত্যে আধুনিকতা উত্তরাধুনিকতা)*, মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী *(দেওয়ান একলিমুর রাজা জীবন ও কাব্য, বিশ্বনাথের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ভাটির দেশের গানের রাজা, নন্দলাল শর্মা কৃতী ও কীর্তি, মিশরের পথে পথে)*, লুৎফর রহমান রুনো *(নিঃস্ব নারী ও চেতনাবাদ)*, মো. নওয়াব আলী *(আমার দেখা হিমালয় সুকন্যা নেপাল, দক্ষিণ সুরমার ইতিহাস ও ঐতিহ্য)*, জফির সেতু *(লোক পুরাণের বিনির্মাণ ও*

অন্যান্য প্রসঙ্গ), আনোয়ার শাহজাহান *(গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বিলেতের দিনগুলো ও অন্যান্য প্রসঙ্গ),* আবদুল হান্নান তুরুকখলী *(কলমকণ্ঠ, কলম জীবন, কলম বিজয়, কলম গিরি),* সৈয়দ মোহাম্মদ তাহের *(সিলেট মনীষা),* আনোয়ারুল ইসলাম অভি *(জলচুপ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য)* ইত্যাদি।

সৃজনশীল গদ্য উপন্যাস

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার সূচনা হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে। বঙ্কিমচন্দ্রের '*দুর্গেশনন্দিনী* প্রকাশের পাঁচ বছর পরে সিলেটের প্রথম ঔপন্যাসিক আর্জুমান্দ আলীর জন্ম ১৮৭০ সালে। আর বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় সিলেটের প্রথম ঔপন্যাসিক আর্জুমন্দ আলী (১৮৭০-১৯৩০)-এর উপন্যাস *প্রেমদর্পণ* (১৮৯১)। এটি বাঙালি মুসলমান রচিত প্রথম উপন্যাস। সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাসটিকে আত্মপ্রক্ষেপজনিত দুঃখ বর্ণনার প্রয়াস বলে অভিহিত করা হয়েছে।

দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরীর (১৮৮৯-১৯৬৪) *ভোলন মিয়ার ভুল* উপন্যাসটি মাসিক আল ইসলাহ (১৯৫৭-১৯৫৮) তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আবদুল মালীক চৌধুরীর (১৮৯১-১৯৬৭) '*স্বপ্নের ঘোর*' (১৯২৩, পরিবর্তিত নাম '*পরদেশী*' ১৯৫৮) উপন্যাসে খাসিয়াদের জীবনের আলেখ্য ফুটে উঠেছে। লাবণ্য কুমার চক্রবর্তীর ঐতিহাসিক উপন্যাস *মহারানী ইন্দুপ্রভা* ১৩২২ বঙ্গাব্দে 'শ্রীভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শেখ মোহাম্মদ সিকন্দর আলীর (১৮৯১-১৯৬৪) *পাহাড়ী মেয়ে* (১৯৫৩) এবং মতীন উদ দীন আহমেদ (১৯০০-১৯৮০)-এর *বুদ্বু* (১৯৬১) উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের নাম ও তাঁদের উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা হলো- আবু জাফর আবদুল্লাহ (*জোয়ারের মুখে, পথ ও পথিক, সাগরের ডাক* (আল ইসলাহ-এ প্রকাশিত), অজয় ভট্টাচার্য *(এঘর ওঘর, অরণ্যানী, কুলিমেম, বাতাসীর মা, রাজনগর),* আকাদ্দস সিরাজুল ইসলাম *(নয়া দুনিয়া, রাক্ষুসে বন্যা এবং, জাহাজী দাদুর মজলিস, কিছু দিন রাত্রির খসড়া),* নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ *(অচেনা পৃথিবী, বঙ্গ আমার জননী আমার),* লাভলী চৌধুরী *(ভালো থেকো),* নাজমা তাশমীন *(তোমার জন্য, ফেরারী চন্দ্রিমায়, সেদিন দুজনে, আসে বসন্ত ফুলবনে, তারায় তারায় খচিত),* সালেহ আহমদ *(ঝরো পাতা ঝরো, পাখিবাস),* আমেনা আফতাব *(কাল তুমি নিষ্ঠুর),* আবদুস সোবহান *(হেনা, বৃষ্টি চাতক মন),* এম.এ.সালাম *(অভিনয়, দুই দিগন্ত, সৈকতে শৈবাল),* ওয়াসি আহমদ *(মেঘ পাহাড়),* শাববীর জালালাবাদী *(জ্যোৎস্নার অন্ধকারে যাত্রা),* মাহবুব আহসান চৌধুরী *(নদীর শিয়রে বৃষ্টি, বাঁশরীয়ার নিশিভোর),* নিজাম উদ্দিন সালেহ *(অভিযাত্রীর স্বপ্ন),* মনোয়ারা শাহনূর *(ভাটিয়ালী সোহাগ, জ্বেলে দাও প্রদীপ),* মুহিত চৌধুরী *(ফিরে আসা),* মো. আব্দুস সাত্তার *(কাষ্ঠহাসি),* সেলিম আউয়াল *(যুবতীর লাশ ও একটি চিঠির উত্তর),* রুহুল আমিন রুহেল *(এইতো জীবন, জীবনের সাত রং),* শাহ ফারহানা রহমান *(কষ্টের আঙ্গিনায়),* শিউল মনজুর *(প্রণয়ের মৌমাছি),* সোলায়মান আহসান *(সুদূরের ভালোবাসা, অলক্ষ্যে অগোচরে, লোহালিয়ার বাঁকে),* সাঈদ

চৌধুরী *(ছায়াপ্রিয়া)*, মো. আকদ্দুছ আলী *(অবশেষে তুমি এলে হৃদয়ে)*, স্বাগতা ভট্টাচার্য চম্পা *(কথা রেখেছি)*, দেলোয়ার হোসেন মঞ্জু *(জ্যোৎস্নার বেড়াল)*, মোস্তাফিজ আহমেদ *(বেদনার নীল মেঘ)*, মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম (শেষ পাওয়া), শেখ আতাউর রহমান *(নিয়তির চক্র)*, জালাল খান ইউসুফী *(তোমার ভালোবাসা চাই, ফিরিয়ে দিও না, প্রেম নিয়ে প্রেম দাও, তোমাকেই ভালোবেসে মরবো, শুধু একবার ভালোবাসো, তোমাকে পেয়ে পৃথিবী পেয়েছি, ফুলের কাঁটা বিঁধলো বুকে, ভালোবাসা কাঁদালো মোরে, তোমারে লেগেছে এতো যে ভালো)*, ফয়জুল আলম বেলাল *(স্বপ্নের প্রেয়সী, বৃটেনের আকাশ মেঘে ঢাকা)*, শাহ সোহেল *(টাওয়ার ব্রিজের মেয়ে)*, মো. সেলিম আহমদ *(অনেক আশা ছিল তোমাকে পাব বলে)*, জিল্লুল হক *(দহন)*, নাজির আহমদ আকাশ *(অনামিকার মন পেলাম ভালোবাসা পেলাম না, পলাতকার পুনর্মিলন)*, নেছার আহমদ জামাল *(মরীচিকার ঢেউ)* ইত্যাদি।

ছোটোগল্প ছোটোগল্প আধুনিক যুগের সৃষ্টি। ছোটোগল্প রচনায়ও সিলেটের লেখকরা পিছিয়ে নেই। সাময়িকপত্রে প্রকাশের মাধ্যমেই সিলেটে ছোটোগল্পের যাত্রা শুরু। শ্রীভূমি, কমলা, দেশবন্ধু, আল ইসলাহ প্রভৃতি পত্রিকা ছোটোগল্প প্রকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। সাময়িক পত্রে যাঁরা গল্প লিখতেন তাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক লেখকের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

সিলেটের ছোটোগল্প লেখকদের নাম ও তাঁদের গ্রন্থের নাম : আবু জাফর আবদুল্লাহ (১৯০৮-১৯৭৭, *সপ্তক*), অজয় ভট্টাচার্য (১৯১৪- ১৯৯৯), *নীড়, ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা*), আকাদ্দস সিরাজুল ইসলাম *(নীরব নদী, পঞ্চবিংশতি, চালচিত্র, মাতৃভূমি, পাশাপাশি)*, আবদুল মতীন জালালাবাদী *(মত বদল)*, রেহানা খাতুন *(দহন)*, মুহাম্মদ আবদুল হান্নান *(বিহিতা আর ফিরে আসবে না)*, মুহাম্মদ আবদুল জলিল চৌধুরী *(আশা পল্লব*) সুনন্দা সিংহ *(সমুদ্র স্নান)*, নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ *(পাঁচমিশালী, শরবিদ্ধ নারী)*, লাভলী চৌধুরী *(আকাশপ্রদীপ)*, আমেনা আফতাব *(রুমাল, সময়ের গল্প, বৃত্ত, স্বপ্ন এবং কয়েকটি মুহূর্ত, জ্যোতির্ময় সময় ও ক্ষয়িত মাংসপিণ্ড, ডোরাকাটা লালশাড়ি)*, নাসরীন আবেদীন *(লালশাড়ি)*, সালেহ আহমদ *(রানাপিং থেকে)*, সালমা বখত চৌধুরী *(হৃদয় সৈকতে পূর্ণিমা)*, ওয়াসি আহমদ *(ছায়াদণ্ডী ও অন্যান্য, বীজমন্ত্র, ত্রিসীমানা, তেপান্তরের সাঁকো)*, রেণু লুৎফা *(ইতরের মতো সত্য)*, মাহবুবা সামসুদ *(জল বালিকা, আরণ্যক মন)*, আবদুল হাই মিনার *(জামশেদ মুস্তফির হাড়, কোনো বাতাসের গান, সব পাখি নীড়ে ফেরে না, জলদেবতা)* সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী *(রাজার চোখে বানের পানি)*, তাপসী চক্রবর্তী লিপি *(তবুও)*, ময়নুর রহমান বাবুল *(প্রত্যাশার প্রতিধ্বনি)*, তাঁবেদার রসুল বকুল *(আমি এবং সে)*, আতাউর রহমান আফতাব *(পানসী নৌকার জেলে)*, ওয়াহিদ সারো *(আনন্দ গাড়িতে সেও আছে)*, শিউল মনজুর *(মাধবী তোমার জন্য)*, শিকদার মুহাম্মদ কিব্রিয়াহ *(বুকের ভেতরে ডাহুকী ডাকে, বইমেলায় এসেছিলেন বনলতা সেন,*

প্রজ্ঞাবতী মেয়েটি), সুলতানা সাদিক রোজী *(নিষ্পেষিতা),* জফির সেতু *(বাবেলের চূড়া),* মাহবুব লীলেন *(উঁকুন বাছা দিন, নিম নাখারা),* খন্দকার শাহীন আহমদ *(পাশার ভালোবাসা),* জুয়েই রিয়াহ মউ *(টিলাগড়ের রহস্য, সোনাপুরের মিলা, অস্তিত্বে কুহেলিকা কিংবা টুকরো টুকরো প্রাণের কথকতা),* সাঈদ চৌধুরী *(অথবা অপুরুষ, অদ্যনীল, বিলাতের গল্প)* ইত্যাদি।

নাটক

নাট্যচর্চায় সিলেটের অতীত ও বর্তমান ঐতিহ্য প্রশংসনীয়। বাংলা নাট্যাভিনয়ের আদিপুরুষ শ্রীচৈতন্য। তাঁকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্যের ভবনে শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হতো। শ্রীচৈতন্য নিজে অভিনয় করতেন। এটি বাংলা নাটকের ইতিহাসে স্বীকৃত বিষয়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এখন পর্যন্ত সিলেটে পদকীর্তন ও রাসলীলা উৎসব (মণিপুরি সমাজে) উপলক্ষে যে নৃত্য পরিবেশিত হয় তা নৃত্যনাট্য। উনিশ শতকে সিলেটে ইংরেজদের উদ্যোগে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ শতকের সূচনালগ্নে সিলেটে নাটক মঞ্চায়নে কুমার গোপিকারমণ রায় ও তাঁর পত্নী সুরুচিবালা রায়ের নাম স্মরণীয়।

স্বাধীনতাউত্তরকালে সিলেটে যেসব নাট্যসংগঠন নাটক মঞ্চায়নে এগিয়ে আসে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সিলেট থিয়েটার, নাট্যালোক, লিটল থিয়েটার, নাট্যায়ন, সন্ধানী নাট্যচক্র, সুরমা থিয়েটার, কথাকলি, সিলেট নাট্যম, দর্পণ থিয়েটার, প্রতিবেশী, উদীচী, নাট্যবিভাগ, লেখক শিবিরের নাট্যবিভাগ কম্পাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বলে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর সিলেটে নাট্যচর্চা অতীত ও বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

সিলেটের প্রবীণতম নাট্যকার তারকচন্দ্র কৃতিরত্ন (১৮৫৮-১৯২৯)। তাঁর *রুক্মিনী হরণ* নাটক সমকালে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রশংসিত হয়েছে। অন্যান্য নাট্যকার ও তাঁদের নাটকের নাম—গিরিজাভূষণ দে (১৮৬৭-১৯৩৬, *অজামিল, বাদল, বেজায় প্রেম*), কুমার গোপিকারমণ রায় *(পুনরাগমন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, মোগল প্রতিভা),* আজিজুর রহমান মোখতার *(ভারতে মোগল),* বিনোদবিহারী চক্রবর্তী *(রাজমাতা পরিচয়, রক্তের লেখা, সংঘাত),* ইসহাক রেজা চৌধুরী *(চক্রজাল, মাতৃবিয়োগ, কলঙ্কমোচন, একালে সেকালে),* আহমদ উজজামান *(নিঃসঙ্গ এই যাত্রায়, তরঙ্গ উদ্বেল, এই নিদাঘে, নীরবে প্রদীপ জ্বলে, তিন ঘণ্টা বিরতি),* ফণীন্দ্রনাথ দত্ত *(সিলেটিকা —তিনটি ইলেকশন, বিয়াত বেরা, মোক্তারী মাইর),* মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী *(শিল্পীর গ্রাম),* রুহুল আহমদ চৌধুরী (মধ্যরাতের বৃষ্টি, স্বপ্নলোকের চাবি; ঢাকা ও সিলেট বেতারে তাঁর অর্ধশতাধিক নাটক প্রচারিত হয়েছে), লাভলী *চৌধুরী (টিভি নাটক —নতুন মুখের তৃষ্ণায়),* বিদ্যুৎ কর *(স্বীকৃতি, বিড়ম্বিত আর্তনাদসহ বহু বেতার ও পথনাটক রচয়িতা),* নুরুজ্জামান মনি *(বেতার নাটক —ফান্দ দেখছোনি, লাখ টাকা ও একটি কফিন, নোঙর ছিঁড়ে যায়, সুখের দিনের পাখি; শিশুতোষ নাটক —পটলার অভিনয়,*

গল্পে গল্পে শেখা, সূর্যকুমার; মঞ্চনাটক —মাকড়সা), মুহিত চৌধুরী *(প্রতিশোধ নেব না),* শাহীন ইবনে দিলওয়ার *(ক্যাবী)* ইত্যাদি।

কবিতা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সিলেটের অবদান যেমন উল্লেখযোগ্য আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রযাত্রায়ও সিলেটের ভূমিকা তেমনি প্রশংসনীয়। বাংলা গদ্যের সূচনালগ্নে যেমন সিলেটের গদ্য লেখকদের রচনা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তেমনি উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রযাত্রায়ও সিলেটের কবিরা বিশেষ অবদান রেখেছেন। শরচ্চন্দ্র চৌধুরী রচিত *দেবীযুদ্ধ* মহাকাব্যে পরাধীন মাতৃভূমি মুক্তিচেতনা পরিস্ফুট। গ্রন্থটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল।

আবু যেকারিয়া মোহাম্মদ ইব্রাহীম আলী (১৮৭৪-১৯৪৮)*শ্রীহট্ট বিজয়* কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির স্বাক্ষর আছে। উত্তর তিরিশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কবি সিলেটের অশোকবিজয় রাহা।

সিলেটের প্রথম আধুনিক গীতিকবি প্যারীচরণ দাস (১৮৫০-১৯০১)। তাঁর কবিতা গ্রন্থ হলো- *পদ্যপুস্তক* (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, *রণরঙ্গিনী ও ভারতেশ্বরী*। উনিশ শতকে জন্মগ্রহণকারী অন্যান্য কবি ও তাঁদের গ্রন্থ—কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরানী (১৮৫১-১৯৩৩ *নারীমঙ্গল, শোকস্মৃতি, সংসার পরিহার*), শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫২-১৯২৭ *দেবীযুদ্ধ, চিতোরের বীরগাথা, আর্যসংগীত),* রাজীব লোচন দাস (পদ্য প্রসূন), আর্জুমন্দ আলী (১৮৭০-১৯৩০ হৃদয় সঙ্গীত), গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১ ভজার বাঁশী) এবং দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী (১৮৮৯-১৯৬৪)। বিশ শতকে জন্মগ্রহণকারী কবিরা হলেন- রসময় দাস (*অন্তঃশীলা,সোনার হরিণ*), আবদুর রাজ্জাক *(পথ সন্ধানী),* অশোক বিজয় রাহা *(ডিহাং নদীর বাঁকে, রুদ্রবসন্ত, জল ডম্বরু পাহাড়, রক্তসন্ধ্যা, শেষচূড়া, ভানুমতীর মাঠ),* ইসহাক রেজা চৌধুরী *(তিমির বিদায়, মরুকল্লোল),* উবেদ উল্লাহ *(সদাই খালের বাঁধ),* গিরিশঙ্কর দাশ *(আকাশ ও অঞ্জন),* কুৎবুদ্দিন আহমদ (মা), ফজলুর রহমান *(জেহাদ, অর্ধ শতবর্ষ, কবিতা গুচ্ছ),* আবদুল মতিন চৌধুরী *(তিনপ্রস্থ),* দিলওয়ার *(জিজ্ঞাসা, ঐকতান, উদ্ভিন্ন উল্লাস, স্বনিষ্ঠ সনেট, রক্তে আমার অনাদি অস্থি, সপৃথিবী রইবো সজীব),* রেহানা খাতুন *(জীবনের সঞ্চয়, সাদা বক নীল পাখি),* করামত আলী *(সৎকাজে রক্তদান, কাজল গীতি),* কাওসার আহমদ চৌধুরী *(ঘুম কিনে খাই),* কুদরতে এলাহী *(ধুলো মরীচিকা, আলোর সংকেত),* নূরুন্নেছা চৌধুরী রুনী *(স্রষ্টার পানে, পাঁজর ভাঙার শব্দ),* মুহম্মদ আবদুল হান্নান *(মেঘে থেকে রোদ্দুর, গণমানুষের কবিতা),* আবু ছয়িদ বজলুর রহিম *(বিশীর্ণ হৃদয় কাঁপে, শ্যামল মাটির দেশে),* কালাম আজাদ *(সম্পাদক সমীপেষু, নগ্নতার নিজস্ব প্রতিমা, আত্মজা শুনে রাখো আত্মজা গুণে রাখো, শতাব্দীর বৈশাখে আমার বর্ণমালা, মৃত্তিকার ছাইভস্ম),* অরুণভূষণ দাশ *(পদধ্বনি),* বীরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী *(অস্তিত্বের গৃহবাসে),* নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ *(সামান্য শব্দের ভেলা),* লাভলী চৌধুরী *(পুষ্পিতা, আনন্দ কারাগার),* সিরাজ চৌধুরী *(রক্ত মদিরা, জ্বলো),* আলতাফ হোসেন চৌধুরী *(নন্দিনী তবু বেঁচে*

আছি), সালেহ আহমদ *(নক্ষত্রের আর্তনাদ),* এ.কে. শেরাম *(চৈতন্যে অধিবাস; প্রেমে অপ্রেমে আছি, আছি দ্রোহী চেতনায়, শুধু তোমারই জন্যে),* ফয়জুল ইসলাম *(বিদীর্ণ পদাবলী)* সালমা বখত চৌধুরী *(ঝরা পাতার কষ্ট, নীল বেদনায় সুখের ছোয়া),* সিকদার কামাল *(উদভ্রান্ত নীল তৃষ্ণা, জলের গভীরে বৃষ্টি),* মহিউদ্দিন শীরু *(পাখির স্বজন নেই),* ড. রেণু লুৎফা *(হে ঈশ্বর তোমার যবনিকা, জীবন বলাকা),* আব্দুল বাসিত মোহাম্মদ *(যেখানে নদী থমকে দাঁড়ায়, মাইজি ঘুমন্ত সুন্দর, পাখিদের লাশ লাভা হয়ে যায়),* নুরুজ্জামান মণি *(রাজার টোপর পড়ে গেছে, স্বেচ্ছা নির্বাসনে আছি),* লায়লা রাগিব *(কিংখাবে মোড়া, বৃষ্টি আমার জন্মাবধি দুঃখ মুছে নাও),* নাজনীন খলিল *(পাথরের সাঁকো, মন জোগাতে নয় মন জাগাতে, বিষাদের প্রখর বেলুনগুলো),* মাহবুবা সামসুদ *(বিরহে অবেলায়, আরণ্যক মন),* রুহুল আমীন *(ভালোবাসার এ্যালবাম),* সোলায়মান আহসান *(দাঁড়াও স্বকাল বিরূপতা, কৃষ্ণস্বর প্রত্যুষের, নক্ষত্রের বিলাসিতা, শূন্য ও শূন্যতা, যুদ্ধের বিপক্ষে জিঘাংসা),* গিয়াস উদ্দিন আহমদ *(এখানে জীবন, পথভ্রান্ত),* মুকুল চৌধুরী *(বন্দর, ফেলে আসা সুগন্ধি রুমাল, এককোটি পুষ্পের ঘ্রাণ, চা বারান্দার মুখ, সোয়া শ কোটি কবর),* তমিজ উদ্দিন লোদী (কখনো নিঃসঙ্গ নই, এক কণা সাহসী আগুন), নিজাম উদ্দিন সালেহ *(এই দেশ এই মাটি, সবুজের আগ্নেয় প্রপাত, শাশ্বত প্রত্যয়),* মনোয়ারা শাহনূর *(বিজনে বিরহে সুদূর প্রবাসে),* লুৎফুন্নেছা লিলি *(উচ্চারণে অনাগত প্রসঙ্গ, অন্তরে অন্তরায়),* রোকেয়া খাতুন রুবী *(তুমি যদি ভালো থাকো আমি থাকি ভালো),* হোসেনে আরা হেনা *(সূর্যের বৈভব দাও, অরণ্যের দুঃসময় গান, স্রোত),* মুহিত চৌধুরী *(সানাই কথা বললো না, নির্লজ্জের লজ্জা, যদি ভালোবাসা মরে যায়, কসম সিনাই পর্বতের),* ফজলুল হক *(পৃথক দংশন, কবির জন্মদিন ও অন্যান্য কবিতা),* কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার *(সুষম দৃষ্টিতে, সংঘর্ষ : আলো অন্ধকার, ছায়া শরীরীর গান, পাখির রাজার কাছে, চিবোয় প্রকৃতি),* আহমদ হোসেন হেলাল *(বিশ্ব মানবতার কাব্য, পৃথিবীর শান্তি)* সালাম মশরুর *(চোখ),* এ.এইচ. ইরশাদুল হক *(বসন্তের পদাবলী ও অন্যান্য কবিতা),* তাঁবেদার রসুল বকুল *(সুনয়নার কথা, ইদানিং তোমাকে, একলা আঁধারে কাঁদি),* শুয়েব আহমেদ শওকতি *(প্রলয়ঙ্কর, ফেরদৌসে বাহার, শুভঙ্কর),* আতাউর রহমান আফতাব *(বাউল বসতি),* নাজমা বেগম *(চন্দ্রাহতের কথা),* শাববীর জালালাবাদী *(অতএব অসহায় অনির্বাণ, ভালোবাসার ফেনিল ঢেউ, ভালোবাসা তারে কয়),* সালাহ উদ্দিন সেলিম *(সুন্দর আমি তোমাকে নেবো, সুতনুকা সামনে সন্ত্রাস),* পুলিন রায় *(স্বপ্ন যাবে সমুদ্র স্নানে, কালের পালকে আঁকা),* শিকদার মুহাম্মদ কিব্রিয়াহ *(নিসর্গে নান্দনিক, গহীন গাঙের নাইয়া),* মালেক ইমতিয়াজ *(বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি আপাদমস্তক, নিঃসঙ্গ সময়ের জার্নাল),* ইমরান আহমদ চৌধুরী *(কার কি নষ্ট করেছিলাম),* চৌধুরী চপল *(কুয়াশা সামান্য হাসলে),* ফজলুররহমান বাবুল *(ঋণী হবো সোহাগী জলে, সখিকাব্য, সপ্তস্ফুট, থেঁতো ফর্দ),* স্বাগতা ভট্টাচার্য (চলো নিভৃতে ভালোবাসি), নাজমুল হক নাজু (*পাথরচাপা কষ্ট বুকে, তিনখণ্ড জলের নেশা, আমাকে স্পর্শ করে কোথায়*

সে রৌদ্র), আনোয়ার হোসেন মিছবাহ *(টিলে কাব্য),* আবদুল মুমিন মামুন *(তবুও সুন্দর পৃথিবী সুন্দর)* আহমাদ সেলিম *(মুক্তহীন মানুষের দেশে, বুকের গ্রামে বিনাশের বড়ো সড়ক),* আহমেদুর রশীদ *(নীল বিষে শিস কাটে ঠোঁট),* কবির য়াহমদ *(রাত আর ঘুমের কৃষ্ণপাঠ),* দেলোয়ার হোসেন মঞ্জু *(ইস্পাতের গোলাপ, মৌলিক ময়ূর),* মনিরুল ইসলাম টিটু *(এক দাগে ভালোবাসা, একটি নির্বাচিত কবিতা),* সীমা কর *(ছুঁয়ে দিলে বদলে যাবো),* আজিজ ইবনে গনি *(তুমি এসো রুমাল নেবে),* আনিছুর রহমান আনিছ *(আগুন ঝরা দিন, হৃদয়ের স্পর্শ থেকে, একটি নীল তুমি),* ছায়ফুল আলম খান *(বিপন্ন পৃথিবী),* শেরাম নিরঞ্জন *(স্বপ্ন জন্ম ব্যর্থ হলে),* জফির সেতু *(বহুবর্ণ রক্তবীজ, সহস্র ভোল্টের বাঘ, স্যানাটোরিয়াম, তাঁবুর নিচে দূতাবাস, সিন্ধু দ্রাবিড়ের ঘোটকী, জাতক ও দন্ডকারণ্য, সুতো দিয়ে বানানো সূর্যেরা, ময়ূর উজানে ভাসো, ডুমুরের গোপন ইশারা),* ইকবাল হোসেন বুলবুল *(তোমার সীমানার বাইরে নরক, বাতিহীন তিমির নিশি, সুখহীন সুখের সাথে),* ওয়ালি মাহমুদ *(যৈবতী শোন, ভালবাসার পোয়াতি, একটি দীর্ঘশ্বাসের মৃত্যু, আমি এক উত্তর পুরুষ, নির্বাসনে নির্বাচিত দ্রোহ),* নাসরীন আবেদীন *(একটি রাত, পদ্ম পাতায় জল, কাঁটার ক্যাকটাসে),* মাহবুব লীলেন *(কবন্ধ জিরাফ, মাংস পুতুল, বাজারিবাটু, খেরো খাতা),* ফয়জুল ইসলাম *(বিদীর্ণ পদাবলী, স্মৃতিভাস্বর দিনগুলো, বোবা কান্নায় রক্ত ঝরে, পথিকের ডায়েরি),* ফয়জুল আলম বেলাল *(বৃটেনের বৈরী বাতাস),* জুয়েইরিয়াহ মউ *(কষ্টি পাথর তোমাতেই ঈশ্বর),* খালেদ উদ্দিন *(রঙিন মোড়কে সাদাকালো),* সুমা জায়গীরদার *(ক্ষত বিক্ষত স্বাধীনতা, আকাশলীনা, স্বপ্নের পরশ, রাতের শিশির),* মুতুম অপু *(এক বসন্তের ভালবাসা),* অয়েকপম অঞ্জু *(বিরহী প্রণয়),* ফায়সাল আইয়ুব *(হিয়ার হিন্দোল),* মঈন উদ্দিন মিছবাহ *(কষ্টে ভরা বুকের জমিন),* সেবুল আহমদ *(স্বপ্ন),* বেলাল আহমদ *(স্বপ্নভুক শালিক),* মুসা আল হাফিজ (*মুক্তির আনন্দে আমিও হাসবো, সৃজনে রক্ত চাই*) ইত্যাদি।

সিলেটের বেশ কয়েকজন গীতিকবি গান রচনা করেছেন এবং করছেন। সকল কবির গান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। সুন্দরীমোহন দাসের পত্নী হেমাঙ্গিনী দাসের গানের সংকলন *সঙ্গীত সুধা* ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য গীতিকার ও তাঁদের গ্রন্থ—আবু যেকারিয়া মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলী (১৮৭৪-১৯৪৮ *চয়নিকা, কাকিনা*), দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী (১৮৮৯-১৯৬৪, *প্রাণের কথা গানে ১৯৪৯),* আবদুর রাজ্জাক *(গুঞ্জরণী, জীবন গাঙের নাইয়া, শামা পরওয়ানা, পথসন্ধানী),* আবদুল গফফার চৌধুরী *(মুনাফাখোরের কবি, গরীবের গান, শেরোয়া, দীওয়ানা, ভোটের লড়াইর কবি, হেলাল, মিতালীর গান, মোজাহিদের গান),* দেওয়ান তৈমুর রাজা চৌধুরী, ইসহাক রেজা চৌধুরী *(কৃতাঞ্জলি)* প্রাণেশ দাস *(গোধূলির বাঁশি),* মঈন উদ্দিন আহমদ *(মুরলীয়া),* দিলওয়ার *(পূবাল হওয়া, বাংলা তোমার আমার),* মো. মুসলিম আলী *(সখী তুমি কার, ফুটন্ত জীবন, কলির যুগের উল্টা চাল, টাকার বড়াই),* লাভলী চৌধুরী *(গীতিগুচ্ছ),* সিরাজ চৌধুরী *(বাংলাদেশের গান),* মহিউদ্দিন শীরু *(ক্লান্ত রাতের*

ধ্রুবতারা), রুহুল আমিন রুহেল *(রুহেল সংগীত)*, সালাহ উদ্দিন সেলিম *(প্রিয়া প্রেমে বসন্ত)*, মো. নওয়াব আলী (*সুরমা গাঙের নাইয়া*) ইত্যাদি।

মরমি গান

সিলেটে অনেক মরমি কবি জন্মগ্রহণ করেছেন। যাঁদের কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি তাঁরা হলেন—আকসার বক্স, আকরম উল্লাহ, আচন ফকির, আবজল, আবু মোহাম্মদ শাহ আজিজুল হক, আশিকুর রহমান, ইদন শাহ, ঈশান শাহ, গনাই শাহ ফকির, গোলোক চন্দ্র গোস্বামী, ছইফা ফকির, জবান আলী, ফকির রহিমুদ্দিন, ফকির সদাই শাহ, বদল শাহ, মিনারা বেগম, মো. আক্রম উল্লাহ, মো. আদিল বালক শাহ, মো. তৈমুছ আলী, মোহাম্মদ মোস্তফা খান, রহিমুদ্দিন এবং হবি শাহ। অন্যান্য মরমি কবি ও তাঁদের গানের বইয়ের নাম : গোপাল ঠাকুর (*গোপাল ঠাকুরের পদাবলী*), ছহিফা বানু (*ছহিফা সংগীত*), হাফিজ মোহাম্মদ হাতিম চৌধুরী *(এশকুল বাহার)*, শেখ আবদুল ওয়াহেদ *(তওক্কুলিয়া প্রেম ভাণ্ডার)*, আরকুম শাহ *(হকিকতে সিতারা)*, ইবরাহীম আলী তশনা *(অগ্নিকুণ্ড, নূরের ঝংকার)* উছমান আলী *(হকিকতে মারিফত)*, মুন্সী হুছন আলী *(প্রেমসতী)*, সৈয়দ আকবর আলী ছাবাল শাহ *(এস্কে দেওয়ানা, ফানায়ে জান)*, উম্মর আলী *(এস্কের বাগান)*, দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী *(গীতি মেখলা)*, কারি উছমান আলী *(হকিকতে মারিফত)*, সৈয়দ আনোয়ার আলী *(মরমী কবি আনোয়ার আলীর কবিতা ও সঙ্গীত)*, আসরফ আলী *(সমছুল ইসলাম আসিকে বারাম)*, আবদুল আজিজ মাস্টার *(রাগ বাউল এস্কে মওলা, রাগ বাউল ভবতরান)*, শাহ মো. তোফাজ্জল হোসেন *(প্রেম ভাণ্ডার)*, রকীব শাহ *(বোস্তান উল মারিফত, মারিফতের কিস্তি, হকিকতে গুলজার, সাধকের মর্মকথা, রকীব গীতিকা, খাকের পিঞ্জর, আশিক দেওয়ানা)*, আরিজা খাতুন *(বিনয় করে কাতর স্বরে)*, শফিকুল হক *(দিল নওয়াজ)*, শেখ ওয়াহিদুর রহমান *(গীতিসমগ্র)*, আবদুছ ছাত্তার *(ছাত্তার গীতি)*, এ.কে. আনাম *(সুরমা নদীর তীরে)*, মো. সিদ্দিকুর রহমান *(ভাবসাগর পল্লীগীতি)*, মো. আজম আলী *(ভক্তের আরাধনা, দাওয়াত)*, মো. আবদুল হাফিজ সিদ্দিকী *(কাছিদা মদিনার জ্বালা)*, মো. নছিবুর রহমান *(গোলজারে দেওয়ানা)*, মো. সিদ্দিকুর রহমান *(ভাবসাগর পল্লীগীতি)*, শাহ মোহাম্মদ খোয়াজ মিয়া *(প্রেম স্বর্গীয় পল্লীগীতি, গীতিবিচিত্রা)*, শামসুল হুদা চৌধুরী মায়া শাহ *(মনঃপীড়া)*, মোহাম্মদ আফরোজ বখত *(গীতিকবিতার ছন্দে অন্তত অসীমের সন্ধানে)*, মো. মুসলিম আলী *(ভক্তির বিলাপ)*, মমতাজ জালাল *(হৃদয়বীণার প্রতিধ্বনি, কাঁকনের সুর, হৃদয়তরী)*, মো. শেখুল ইসলাম *(শাদী কালের তীরে)*, মো.জালাল উদ্দিন মথুহরী *(গজলে রহমত, গজলে মারফত)*, মোহাম্মদ আবদুস সোবহান *(বাঁকা গাঁয়ের পথে, কুশিয়ারার ঢেউ)*, শাহ মদরিছ আলী *(প্রেমের পরিচয়)*, দীন মোজাহিদ আলী *(প্রাণের কথা গানে)*, ফকির ইলিয়াস *(বাউলের আর্তনাদ, বাউল সঙ্গীত, হৃদে গাঁথা মালা, অন্তত আত্মার গান)*, মো. নবীন সিদ্দেক আলী *(নবীন সঙ্গীত বন্ধের বাঁশী, নবীন সঙ্গীত সুখ-দুঃখের সুর)*, কানুলাল সূত্রধর *(শেফালী নারী সঙ্গীত)*, ফারুক আহমদ *(এ মাটির বাউল)*, সেলিম আহমদ *(সেলিম সঙ্গীত)*, মো. খালেদ মিয়া *(প্রেমগীতি, জাগ্রত দৃষ্টি, সামনে ভরা নদী, উড়াল পাখি, ফুলের হাসি)*, মোহাম্মদ ইলিয়াস

আলী *(মনের আগুন কেউ না দেখে)*, মোহাম্মদ আছাব আলী (*সারেগামা*) ইত্যাদি।

শিশুসাহিত্য শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (*বর্ণশিক্ষা প্রণালী*), গুরুসদয় দত্ত (*ভজার বাঁশি*), দিলওয়ার *(দিলওয়ারের শতছড়া)*, মাহমুদ হক *(ছু মন্তর ছু, মিষ্টি ছড়া)*, শামসুল করিম কয়েস *(ঠোকাঠুকি, সুরমা নদীর সবুজ তীরে)*, রোকেয়া খাতুন রুবী *(রাজপথের রাজা, আমাদের একটা ছাদ ছিল, কামিনী ফুল কিশোর মেলা, এক পকেটে মার্বেল আর অন্য পকেট খালি, পায়রা যদি টায়রা পরে, ছড়া আপন নয়কো পর, আজ তোমাদের ছুটি, চালতা গাছের আলতা পরি)*, ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ *(বড়োমা)*, আব্দুল হাই মিনার *(নীলদরজার রহস্য, কুটি কবিরাজের বিচিত্র কাণ্ড)*, শাহাদাত করিম *(উল্টোসিধে)*, ফতেহ ওসমানী *(একুশের ছড়া)*, সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী *(নিধিরাম সর্দার)*, হীরা শামীম *(নতুন বউয়ের পাল্কি চলে)।*

সাহিত্য-সংগঠন উনিশ শতকের নবজাগরণের ফসল হিসেবে বাঙালি মানসে যে জ্ঞানতৃষ্ণা জন্মে তার প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সাহিত্যসংগঠন গড়ে তোলা এর অন্যতম। ১৯০৫ সালে সিলেটে সাহিত্যানুশীলনী নামে একটি সংস্থা গঠনের প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে সিলেটে The Sylhet Cultural Association প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে এর শাখা শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ আত্মপ্রকাশ করে। এই সংগঠনের মুখপত্র শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪৩ থেকে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। সংগঠনটি থেকে সাতটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ সালের ১৬ সেপটেম্বর প্রতিষ্ঠিত সিলহেট মুসলিম সাহিত্য সংসদ এখনো (কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ নামে) সক্রিয়। বাংলাদেশে এত দীর্ঘজীবী সাহিত্য সংগঠন আমাদের জানামতে আর নেই। সংগঠনের মুখপত্র আল ইসলাহ এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংগঠনে প্রতি বৃহস্পতিবারে সাহিত্যসভা হয়। প্রতি দুবছর পর সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেসময় একজন লেখককে কেমুসাস সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সিলেট অ্যাকাডেমি, মদনমোহন কলেজ সাহিত্য পরিষদ, সংলাপ সাহিত্য সংস্কৃতি ফ্রন্ট, জালালাবাদ লোকসাহিত্য পরিষদ, বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ, শিকড়, প্রথম দিনের সূর্য প্রভৃতি প্রবীণ সাহিত্য সংগঠনের পাশাপাশি অন্যান্য বহু সাহিত্য সংগঠন সিলেটে সক্রিয় রয়েছে। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত অগ্রণী লেখক ও শিল্পী সংঘ সিলেটের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চাকে এগিয়ে নিয়েছিল। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় দিলওয়ারের নেতৃত্বে গঠিত সমস্বর সমকালে যুগোপযোগী অবদান রেখেছে।

সাহিত্য সম্মেলন সিলেটে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে কোনো গবেষণা এখনো হয়নি। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই

সম্মিলনীতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ভারতচন্দ্র চৌধুরীর বক্তৃতা শ্রীহট্ট সাহিত্যচর্চা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৪৪ সালে সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলন। এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৬১ সালে শ্রীহট্টে ৭দিনব্যাপী রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পালিত হয়। মেডিকেল হলে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন সৈয়দ মর্তুজা আলী, এতে সভাপতিত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল। উৎসব কমিটির সভাপতি সফফুল আলম খান স্বাগত ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাপানি প্রকৌশলী টি ইয়ামোমোটা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল হাই, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আইনজীবী ধরনীমোহন পাল, অধ্যাপক কৃপেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী প্রমুখ। এতে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশ করেন কলিম শরাফী ও ভক্তিময় দাশগুপ্ত। ১০ থেকে ১৬ মে পর্যন্ত এই উৎসব চলে। উৎসব কমিটির যুগ্মসম্পাদক ছিলেন আমীনুর রশীদ চৌধুরী ও হিমাংশু ভট্টাচার্য। এই উৎসবে মুসলিম সাহিত্য সংসদ সম্পাদক মুহম্মদ নূরুল হক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬১ সালের ২৮-৩০ জুলাই নজরুল সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, কবি খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, আশরাফ সিদ্দিকী, কবি আবদুল কাদির প্রমুখ গুণিজন এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৮৩ সালের ২১ ও ২২ জানুয়ারি সিলেটে একটি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ অনুপস্থিত।

১৯৯৩ সালের ১৫ অক্টোবর শাববীর শিশুসাহিত্য ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট ও কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলার উদ্যোগে সিলেটে অনুষ্ঠিত হয় বৃহত্তর সিলেট শাববীর শিশুসাহিত্য সম্মেলন। এর আয়োজন করেছিল সিলেট প্রান্তিক কচিকাঁচার মেলা।

২০০১ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে ছয়টি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০০১ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি প্রথম সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। মূলপ্রবন্ধ ‘বাংলা সাহিত্য সাধনায় সিলেট’ পাঠ করেন আবদুল হামিদ মানিক। ২০০৪ সালের ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন এম শমশের আলী। মূলপ্রবন্ধ ‘সিলেটের মরমী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ’ পাঠ করেন লে. কর্নেল সৈয়দ আলী আহমেদ (অব.)। ২০০৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত তৃতীয় সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর এরশাদুল বারী। মূলপ্রবন্ধ ‘সাহিত্য ও প্রযুক্তি’ পাঠ করেন শিকদার মোহাম্মদ কিব্রিয়াহ। ২০০৮ সালের ২৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত চতুর্থ সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি

ছিলেন বিচারপতি মোস্তফা কামাল। মূলপ্রবন্ধ ‘সিলেট অঞ্চলের ইতিহাসচর্চা’ পাঠ করেন আবদুল হামিদ মানিক। ২০১০ সালের ৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পঞ্চম সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুস্তফা জামান আব্বাসী। মূলপ্রবন্ধ ‘সিলেটের লোকসাহিত্য : গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়’ পাঠ করেন প্রফেসর নন্দলাল শর্মা। ২০১৪ সালের ১ মার্চ অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সাহিত্যসম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি মোফাজ্জল করিম। মূলপ্রবন্ধ ‘আধুনিক বাংলা কবিতায় সিলেটের অবদান’ পাঠ করেন জেবা আমাতুল হান্না।

সিলেটি নাগরী লিপিতে রচিত সাহিত্য

সতেরো শতকে সিলেটি নাগরী লিপির উদ্ভব ঘটে। এখানকার আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োজনে নাগরি লিপির ওপর ভিত্তি করে কায়েথি, আরবি, ফারসি ও বাংলা লিপির প্রভাবে এই লিপির জন্ম। এই লিপি বাংলা লিপির চেয়ে সহজতর। তাই বাংলা লিপির বিকল্প লিপি হিসেবে এই লিপি সিলেটে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই লিপিতে বর্ণ মাত্র ৩২টি।

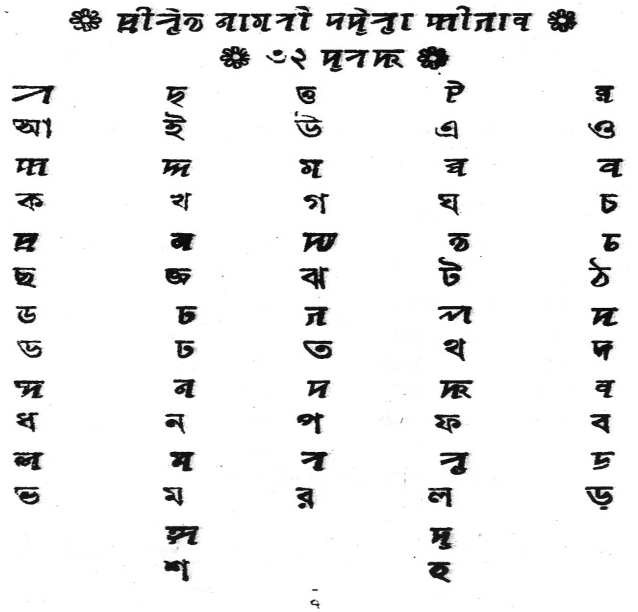

১৮৬০-১৮৭০ সালের দিকে সিলেটি নাগরি লিপির প্রথম ছাপাখানা *‘ইসলামিয়া প্রেস’* সিলেটের বন্দরবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে কলকাতায়ও নাগরি লিপির প্রেস স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ইসলামিয়া প্রেস বিধ্বস্ত হলে নাগরি লিপির মুদ্রণপ্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। নাগরি গবেষক গোলাম কাদির উনিশ শতককে সিলেটি নাগরীর সুবর্ণ যুগ বলে অভিহিত করেছেন। এখনো গ্রামাঞ্চলের নারীসমাজ ও পির ফকিরগণ নাগরি লিপিতে পুথি পাঠ করে থাকেন। সতেরো ও আঠারো শতকে এই লিপির উন্মেষ ও বিকাশ, উনিশ

শতকে সমৃদ্ধি এবং বিশ শতকে এর প্রায় পরিসমাপ্তি। এখন ব্রিটেনে এই লিপি চর্চা হচ্ছে এবং কম্পিউটারে লিপির ফন্ট তৈরি করা হয়েছে।

নাগরি লিপিতে রচিত গ্রন্থাদির নাম উল্লেখ করা হলো : (সতেরো শতকে রচিত তিনটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। দুটি মৌলভীবাজারে আর একটি সুনামগঞ্জে) আঠারো শতকে ভেলা শাহ রচনা করেন ইসলামি তত্ত্ব বিষয়ক রচনা '*খবর নিশান*'। উনিশ শতকে রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আব্দুল আজিজের '*মফিদুল আওয়াম*' ও '*শুনাধনের কবিতা*; আবদুল ওয়াহাব চৌধুরীর '*হাশর তরান*', '*ভব তরান*', '*উন্মি তরান*' ও '*ভেদকায়া*'; আবদুল করিমের '*ওজু নামাজের কবিতা* ও '*ওয়াজিবুল আমল*'; শাহ আবদুল কাদিরের '*আহকামে শরা*'; আবদুস ছমদের '*নছিহত নামা*'; আবদুল রহমানের '*হুমরতুল গিনা*'; আবদুল হাকিমের '*নছিহত নামা*'; আমানুল্লাহর '*মফিদুল ইসলাম*' ও '*ইবরত নামা*'; আরকুম শাহ-এর '*কবিনামা*' ও '*হকিকতে সিতারা*'; 'ইরফান আলীর '*মফিদুল মুমেনিন*', '*আখবারুল ইমান*', '*ছত্রফুল বেদাত*' ও '*কাশফুল বেদাত*'; হাজী ইয়াছিনের '*মাজেজাতুন্নবি*, '*প্রেম আরশি*, '*মায়ারশি*', '*তালেবে জান্নাত*', '*রমণী দর্পণ*'; ওয়াজিহ উল্লাহর '*হুশিয়ারে গাফেলিন*', '*মাহে রমজান*' ও '*হজনামা*'; মহম্মদ জাওয়াদের '*বাহরাম জহুরা*'; অধীন জাফরের '*আশক নামা*'; নছিম আলীর '*হরুফুল খাছলত*' ও '*দোয়া কালাম*'; বুরহান উল্লাহর '*হালতুন্নুর*', '*ইবরত নামা*' ও '*রাগনামা*', রফাছত আলীর '*ভেদ মারিফত*', রহমতুল্লাহর '*হুমরতুল* গিনা'; শিতালং শাহ-এর '*মুশকিল তরান*', '*হাশর তরান*', '*রাগ বাউল*', '*কিয়ামত নামা*' ও '*রাগ শিতালং শাহ*'; হরমুজ আলীর '*দিল নছিহত*', '*হরমুজ নছিহত*' ও '*মিছিলে দুনিয়া*'; চৌধুরী মহম্মদ হায়দরের '*আহওয়ালে জমানা*' এবং মুনশি মহম্মদ হুসন-এর '*আহকামুল ইসলাম*'।

বিশ শতকে রচিত গ্রন্থাদি হলো—সৈয়দ আকবর আলীর ছাবাল শাহ '*এশকে দেওয়ানা*'; আকবর আলীর '*আহকামে চরকা*'; আছান শাহের '*ইছরারোল হক*'; মুনশী আবদুল আজিজের '*গঞ্জে এশ্কে এলাহি*'; আব্দুল আজিজের '*রাগ বাউলা দিল দেওয়ানা*'; শেখ আবদুল ওয়াহেদের '*তওক্কুলিয়া প্রেম ভাণ্ডার*'; আবদুর রহমানের '*শাহজালালের পুথি*', '*বানের কবিতা*' ও '*জালালি কবিতা*'; আবদুল লতিফের '*বসন্ত ভ্রমরা*'; ছৈয়দুর রহমানের '*দেশ চরিত*'; মুনশী জাফর আলীর '*ওছিওতুন্নবি*'; ফাজিল উদ্দিন আহম্মদের '*ওলিগণের কবিতা*'; ফৈয়াজ আলীর '*ওলিগণের কবিতা*'; মজফর আলীর '*বাঘের কবিতা*'; মবারক আলীর '*জলের কবিতা*'; মুনশী মশাহেদ আলীর '*স্ত্রীপুরুষের আখবার*', '*জুলমত নামা*' ও '*কবিতা বাউলা দুখখিত*' এবং হাতেম আলীর '*মহববত নামা কিতাব*' ইত্যাদি।

নাগরি লিপিতে রচিত পুস্তকের বিষয়াদি *হলো—ইসলামি তত্ত্ব, মারেফতি সঙ্গীত, সাধারণ শাস্ত্র, জীবনী, ইহ বা পরকালে মুক্তির উপায় বর্ণনা, আইনশাস্ত্র (ফেকাহ), ফরজবিষয়াদি, যুদ্ধকাব্য, শরিয়ত, উপদেশ, ধর্মীয় উপদেশ,* ইমানের

মাহাত্ম্য, নবীর জীবন কথা, পারলৌকিক শিক্ষা, হজ, সুফিতত্ত্ব, মারিফত তত্ত্ব, উপদেশাবলী, হাদিস এবং লৌকিক বিষয়ের মধ্যে *প্রেমসঙ্গীত, স্ত্রীচরিত্র, সমকালীন সমাজের কথা, মানবিক প্রণয়োপাখ্যান* ইত্যাদি। সবগুলো গ্রন্থ মুদ্রিত হয়নি। কিছু গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। কয়েকটি বই বার বার মুদ্রিত হয়েছে। অধিকাংশ রচনা পাণ্ডুলিপি। এগুলোতে বাতেনি বিষয় আলোচিত হওয়ায় লেখক অনেক সময় প্রকাশ করতে বারণ করেছেন। নাগরি লিপিতে রচিত সাহিত্য সিলেটবাসীর গৌরব।

সংস্কৃত কাশী ও নবদ্বীপের পর সংস্কৃতচর্চায় সিলেটের নাম একদা উচ্চারিত হতো। একাদশ শতাব্দীতে জৈন্তরাজ কামদেবের সভাকবি *'রাঘব পা-বীয় কাব্য'* রচনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৫-১৫৩৩) রচনা করেছিলেন কলাপ ব্যাকরণের *'বিদ্যাসাগরী টিপ্পনী', 'ন্যায়ের টীকা', 'শিক্ষাষ্টক', 'শ্রীজগন্নাথাষ্টক', 'ভাগবতামৃত', 'তত্ত্বসার বেদান্ত', 'গোপালচরিত', 'হরিনাম কবচ'* ও *'প্রেমামৃত'*। সমকালে ঢাকা দক্ষিণের প্রদ্যুম্ন মিশ্র *'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী'* ও *'শূদ্রাহ্নিকাচার'; দুলালীর মুরারি গুপ্ত 'শ্রীচৈতন্য চরিতম' (কড়চা)* এবং *পঞ্চখণ্ডের রঘুনাথ শিরোমণি 'চিন্তামণি দীধিতি', 'প্রামাণ্যবাদ', 'নামার্থবাদ', 'ব্যুৎপত্তিবাদ', 'ক্ষণভঙ্গুরবাদ', 'আখ্যাতবাদ', 'পদার্থ খণ্ডন', 'আত্মতত্ত্ব বিবেক', 'লীলাবতী টীকা', 'গুণ কিরণাবলী টীকা,' 'পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ', 'পদার্থরত্নমালা'* প্রভৃতি রচনা করেন। দুলালীর তিলকচন্দ্র গুপ্ত শিরোমণি (১৭৭৭-১৮৪৫) *'সহজ চরিত্র'* ও *'শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থের টীকা'* রচনা করেন। পঞ্চখণ্ডের তারকচন্দ্র কাব্যসরস্বতী *'রক্ষীণী হরণ নাটক,' 'স্তুতিরত্নমালা,' 'মাতৃস্তুতি রসামৃতম,' 'ভক্তিরসাত্মক'* রচনা করেন। *'সুবর্ণাষ্টকম ও পাশাষ্টকম'* রচয়িতা পঞ্চখণ্ডের সূর্যকুমার তর্কসরস্বতী. (১৮৭১-১৯৩০) *'জাতি পুরাবৃত্ত', 'সম্বন্ধ চিন্তামণি 'জৈমিনিসূত্রম্', 'শবর ভাষ্য সমেতম', 'কাব্য কুসুম'* এবং *'কালীকমল কাব্যবিনোদ 'দশ মহাবিদ্যাপূজা পদ্ধতি'*, ও *'প্রমাণ তরঙ্গিনী'* রচনা করেন। *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত* চতুর্থভাগ পরিশিষ্টে দুইজন রামদাসের উল্লেখ আছে। একজন *'কৃষ্ণচরিত'* রচয়িতা এবং অপরজন *'স্বর্গারোহণ ও জ্যোতিষ বল্লভ'* রচয়িতা। ঢাকাদক্ষিণের কালীচরণ তর্কবাগীশ 'দায়াদর্শ' ও 'ভক্তিবাদ'; রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার *'আখ্যাতবাদ'*; ত্রিপুরানাথ তর্কোপাধ্যায় *'জপ রহস্য'* ও *'মহিম্নস্তব'*; বাণীনাথ বিদ্যাসাগর *'কাতন্ত্রে বিদ্যাসাগরী টীকা'*; রঘুদেব ভট্টাচার্য ন্যায়শাস্ত্রের *'পাতুড়া'*; ভবদেব পঞ্চানন *'ন্যায় দর্শনের টীকা'* এবং রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার *'আখ্যাতবাদ'* রচনা করেন। পঞ্চখণ্ডের প্রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ *'সটীক শুদ্ধ চিন্তামণি', 'নীতি শতকম', 'লঘুশুদ্ধি প্রদীপম', 'বিজয় কৃত্য কৌমুদী', 'জ্যোতিষ সংগ্রহ', 'জীবদ্বৃষোৎসর্গ পদ্ধতি', 'চন্দনধেনু বিচার', 'দশম্যাং বলিদানম', 'পূজায়া পশুবলিদানং'*; মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার *'ভাবার্থ চিন্তামণি', 'স্মৃতি ব্যবস্থা', 'দায়ভাগ টীকা'* ও *অষ্টাবিংশতি প্রদীপ'* এবং রামনাথ বিদ্যারত্ন *'স্মৃতি সন্দর্ভ'* রচনা করেন। বোয়ালজুরের দয়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ (১৮৭২-১৯৪৫) *'অনুমান চিন্তামণি'* ও *'গোভিল গৃহ্যসূত্র'* এবং রামরাম ভট্টাচার্য

'*তন্ত্ররত্নমালা*' রচনা করেন। গুটাটিকরের বিরজানাথ ন্যায়বাগীশ উনিশ শতকের শেষ দিকে রচনা করেন '*সর্বানন্দ প্রকাশ*' ও '*মোহচপটানুবাদ*'। লাউতার মথুরানাথ তর্কবাগীশের '*আখ্যাতের টীকা*' সুধী সমাজে আদৃত হয়েছিল। মৈনার রত্নগোবিন্দ চৌধুরী রচনা করেন '*স্তোত্রাবলী*'। রেঙ্গার রতিকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ '*কলাপের টীকা*', '*সিদ্ধান্ত দীপ*'; লক্ষ্মীপুরের রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন '*কাল নির্ণয়*', '*অশৌচ নির্ণয়*', '*প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয়*', '*প্রেতাধিকারী নির্ণয়*' ও '*সম্বন্ধ নির্ণয়*' রচনা করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ পুরীর জন্মস্থান উড়িষ্যা হলেও গোটাটিকর শক্তিপীঠে বাসকালে রচনা করেন '*মোহচপটম*'। সিলেটের অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাদি হল কৃষ্ণধন তর্কবাগীশের 'মুক্তি পরিভাষা' (বৈদান্তিক গ্রন্থ); গোপীনাথ ভট্টাচার্যের '*কারক রহস্য*'; জগদীশ তর্কালঙ্কারের '*দীধিতির টিপ্পনী*', '*অনুমান ময়ূখের ভাষ্য*' '*লীলাবতীর টীকা*', '*শব্দশক্তি প্রকাশিকা*' ও '*তর্কামৃত*' এবং রসময় ভট্টাচার্যের '*বিদ্যাপতি কালিদাসম*' ও '*প্রবুদ্ধ কৌশিকম*'। সিলেটে সংস্কৃত ভাষায় ভক্তিশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র, কাব্য-ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র, পুরাণ ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের চর্চা হয়েছে। রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রীর 'শ্রীভূমির সন্তানদের সংস্কৃত সাধনা প্রবন্ধে (শ্রীহট্ট সম্মিলনী রজতজয়ন্তী উৎসব স্মরণিকা, দিল্লি ১৯৮২) সিলেট বিভাগের ১০১ জন লেখকের ৩৫৯টি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম আছে।

আরবি

আরবি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও বহুলপ্রচলিত ভাষা। মধ্যযুগে আরবি ভাষার সঙ্গে সিলেটবাসীর পরিচয়। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখকের নাম ও তাঁদের গ্রন্থের নাম : আব্দুল *কাদির —আদ্দারুল আজহার ফি শরহিন ফেকহিল আকবর, আল জাওয়ামি আল কাদেরিয়া ফি-মুতাকাদে আহলিল সুন্নাতুল জামাত* (১৯১৮); *আরদ্দুল মকুল আলা নিসহুল মাকবুল, আল ফাওয়াইদুল কাদেরিয়া ফি শরহিল আকাইদান নাসাফি*; এলাহি বখশ হামিদ মজুমদার- *দেওয়ানে হামিদ (কাব্য)*, আবু নসর মোহাম্মদ ওহীদ— *বাকরাতুল আদব, সালসিতুল কিরাত, মাদারিজুল কিরাত, নুখাবুল উলুম, মিরকাতুল আদব, খুতাবুন্নবী ওয়াস সাহাবা*; মোহাম্মদ *হোসেন —শরহে তিরমিজি, তালিকুল খাওয়াজা আলা তাখলিছে সুনান ইবনে মাজাহ*; মছদ্দর *আলী —ইনশাউ'ল মাজামিন ওয়ার রাসাইল* (১৮৯৫); হরমুজ উল্লাহ শায়দা— *শরহে দেওয়ান হামাসা* (১৯২৯) ইত্যাদি।

ফারসি

মধ্যযুগে এদেশে রাজভাষা ছিল ফারসি। মোগল আমলে সিলেটে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। সিলেটের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ফারসি গ্রন্থকার ও তাঁদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো : আজীরুদ্দীন মুহাম্মদ— *রিয়াযুন নুর* (কাব্য ১৮৮১); আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদের- *রিসালা-এ রদ্দ-এ মা'কুল দর রদ্দ ফিরকা-এ-ওয়াহ-হাবিয়াহ, আল ফওআয়েদুল কাদেরিই —ইয়াহ ফি শরহিল আকায়ে দিন নাসাফিই ইয়াহ, আল জও সামিউল কাদিরিই ইয়াহ-ফী মু'তাকাদ্দাত-ই-আহলিস সুন্নাতি ওয়াল*

জামাআহ, আদ দুররুল আযহার ফী শরহিল আকবর; আবুল হুসাইন আবদুর রহমান যিয়া— *সাইফুল আবরার আল মাসলুলু আলাল ফুজজার;* সৈয়দ ইব্রাহিম মালিক উল উলামা— *মাদেনুল ফাওয়ায়েদ,* মোহাম্মদ আব্দুল কাদির— তাফসিরে কাদিরিয়া; আবুল হাসান মো. আব্দুর রহমান— *মসনবী এ দিল খুশা; সয়ফুল আবরার আলাল মাসআলুল ফুজ্জার;* আব্দুল মুনিম জওকী— *আখলাকে আহমেদী* (১২৯৮), *তাসবিবুল বয়ান ফি শারহীদ দিউয়ান মুতানবিব, দাবিস্তানে দানিশ;* আজির উদ্দিন আহমদ— *আকাইদে আজিরিয়া, গুল দাস্তায়ে আকাইদ;* সুফী আবদুল্লাহ চৌধুরী— *কলিমাতে ওয়ায়েজ;* এলাহি বখশ হামিদ মজুমদার— *দেওয়ান এ হামিদ, তুহফাতুল মুহসানিন;* শফিকুল হক চৌধুরী বাহাদুরপুরী— *আকাইদুল ইসলাম* (১৯০৭); হামিদ বখশ মজমাদার— *আয়না-এ হিন্দ;* ইব্রাহিম আলী— *তানজিমুদ্দার;* খলীলুর রহমান— *কসীদা এ নাযিয়া, তাযকিরাতুল যালযালাহ* ইত্যাদি।

উর্দু উনিশ শতকে সিলেটে উর্দু সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। আশরাফ আলী মস্ত (১৮২০-১৮৮৪) সিলেটের প্রবীণতম উর্দু লেখক। তাঁর গ্রন্থের নাম *'আশরাফুল বয়ান ফি হিকমত ই ঈমান'* (১৮৬৩), *'রিসালায়ে কুস্তি'* (১৮৫৭)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উর্দু লেখক ও তাঁদের গ্রন্থ; আবদুল কাদির— *খুলাসাতুল মাসায়েল* (১৮৬৫), *মাখুজুল আরেফান মান সানা;* এলাহী বখশ মজুমদার— *তোহফাতুল আহবাব* (১৮৪৫), *বুরহানুল মুয়াহহেদিন* (১৮৫৩); আজির উদ্দিন চৌধুরী- *রেওয়াজুল নুর;* আবদুর রহমান যিয়া— *আহসানুল আকাইদ* (১৮৮২); আব্দুল্লা হানফী চৌধুরী— *আরকানে আওলাইন;* আব্দুল করিম— *তাওয়ারিখে হিন্দ;* আঞ্জব আলী শওক (১৮৯৩-১৯৬২)— *গুলদাস্তায়ে শওক;* সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুস সমী— *ছাওয়ানেহে সমী;* কুতুব উদ্দিন — *ক্বাওফুস সিয়র মিন হাদয়ীন নেসার, বাহারে উর্দু (তিন খণ্ড), মজদুরৌকে হক ইসলাম কি নজর মে;* মুহম্মদ মোশাহিদ— *ফতহুল করিম ফি সিয়াসতিন নবিয়িল করিম, আল ফুরকান;* নেসার আলী— *মিসবাহুর রাশাদ শরহে বানাত সুয়াদ, আওয়াকে তাজবীদ;* মুবাশ্বির আলী দবির— *তারিখে জালালী;* মছদ্দর আলী— *মুনতাখাবুল আহাদীস, হিফজে মুসলিম;* হরমুজ উল্লাহ শায়দা— *মজমুযায়ে কালাম;* আব্দুল হক— *তারিখে ইলমে তাফসীর, হায়াতে ইমাম বোখারি;* আব্দুল জলীল বিসমিল— *তাসকিরায়ে শায়খ সৈয়দ জালাল মুজাররদ কুনিয়াবি র., সিলহেট মে উর্দু;* আব্দুল হাকিম— *দাওয়াঈ ওয়া আওয়ামীলে হিফজুল হাদিস;* ইদ্রিস আহমদ— *মিযানুত তুলস্নাব;* খলীলুর রহমান— *গুলিস্তা ই আখাই, অজাফত নামা;* ছহিফা বানু— *ইয়াদগারে ছহিফা;* নাযের মুহম্মদ আবদল্লাহ— *তামবীহুল গাফেলিন* (১৮৯৪); শাহ মুহম্মদ ইসমাইল ফজলুর রহমান— *দিওয়ান* (১৯১০); মজিদ আলী— *মারাবিবুদ্দিন* (১৮৯০); মোজাহিদ উদ্দিন চৌধুরী দুবাগী— *মানাছুল মুফতী;* শাহ সাজিদ আলী— *রিসালা-এ মারতিবুদ দীন;* হাফিজ আব্দুল মতিন— *আল মুতা ওয়াললিল বুরহান;* ফজলুল হক— *শরহে দিওয়ান মুতানাবিব;* মজিদ আলী— *মারাতিবুদ্দিন* (১৮৯০); খলিলুর রহমান— *গুল দস্তাই আকায়েদ, আজাফাতন :*

মা; নজির আব্দুল্লাহ— *আশুফতা;* উবায়দুল হক (সাবেক খতিব, বায়তুল মোকাররম)— *আযহারুল আযহার শরহে নুরুল আনোয়ার, নশরুল ফাওয়ায়েদ, তারিখে ইসলাম* (২য় খণ্ড), *ছেক্কায়া শরহে বেকায়া ঢাকা ফিক্কাহ, শিয়া সুন্নী ইখতিলাফ;* ইব্রাহিম আলী— *সহল উর্দু আমুজ;* মুফতি রহমতুল্লাহ— *হাদিয়াতুল মারজিয়া জালালি শরহে সিরাজি, এফাযত শরহে মোকামাত;* শফিকুল হক বুলবুল— *নাযলুল মুরাদ শরহে বা নাত সুয়াদ;* শফিকুর রহমান— *রিসালায়ে তাযকির ও তানিস, হায়াতে আতহার;* কাজী ইব্রাহিম— *আল বিদ আত ফি জুইইল কোরআন ওয়াস সন্নাহ ফিক্কাহ;* আব্দুল লতিফ ফুলতলী— *মুনতা খাবুস সিয়র, আনওয়ারুস সালিকিন, আল কওলুল সদিদ;* মাওলানা ইসহাক— *দরসে মিশকাত, দরসে বুখারি;* সালেহ আহমদ সালিক— *আমানিউল হাজাহ শরহে ইবনে মাজাহ, মুনিয়াতুল আদব, তাসহিলুল মুশকিলাত শরহে সাবে মুআল্লাকাত;* মাহমুদ হোসেন— *বুলগুল আমানি, শরহে মাকদ্দমা মুখতাসারুল মায়ানি;* জালাল উদ্দিন— *মিফতাহুল উলুম ওয়াল ফুনুন;* রিয়াজ উদ্দিন— *লামেউল মারজি;* শফিকুর রহমান— *তানকিহুল লাআলি ফি নজরে তাহাবি*। মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যাপনাকালে শামীম আহমদ ফিতরাত ওয়াস্তি প্রকাশ করেন হাদিস ই হাসু (কবিতা ১৯৩৫) মাজামিল ই-ফিরাত (প্রবন্ধ ১৯৪২)।

ইংরেজি

সিলেটের অনেক লেখকের ইংরেজিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম : শম্ভু চৌধুরী রায়—History of Sylhet (1875); মজিদ বখত মজমাদার—The Muzmadar Family of Sylhet (1894); আবদুল করিম (1863-1943)—The Prophet of Islam, Islam’s Contribution to Science and Civilization, Islam and Universal Religion of Peace and Progress, History of India; সূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতী— (1871-1935)—A Scheme for the Reformation of Sanskrit Education in Assam; গুরুসদয় দত্ত (1882-1941)—Village Reconstruction (1925), Indian Folk Dance and Folklore Movement (1933), Bratachari Synthesis (1937), A Woman of India (1941), The Folk Dance of Bengal, Folk Art and Crafts of Bengal : The Collected Papers; মুফতি আজহার উদ্দিন সিদ্দিকী (1883-1950)—History of Shahjalal and his Khadims (1913); হরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য (1890-1952)—Astrology and Karmaphala, Chanakya, Similarities of Indo-European Languages, Problems of Indian History, The Languages and Scripts of Ancient India, Ancient Indian Literature; গোবিন্দচন্দ্র দেব (1907-1971)—Idealism : A New Defence and a New Application (1958), Aspiration of the Common Man

(1963), The Philosophy of Vivekananda and the Future of Man (1963), Buddha, the Humanist (1969), Parabley of the East (1984), My American Experience (1993); কমলাকান্ত গুপ্ত (1911-2006)—Copper Plates of Sylhet (1967); অমরেশ দত্ত—Captive Movements (1952), Shakespear's Tragic Vision and Art (1963); কুৎবুদ্দিন আহমদ (1918-1998)—Fundamentals of Islam; আব্দুস সবুর চৌধুরী (1923-?)—Islamic Poems for Children; ইউসুফ চৌধুরী (1928-2002)—The Roots and Tales of the Bangladesh Settlers (1993), Sons of Empire (1995), An Album of 1971 Bangladesh Liberation; স্বামী শঙ্করানন্দ—Rigvedic Culture and Pre historic Indus, The Indus people Speak, Western Buddhism; সালমা চৌধুরী (b.1933)—Flowers to Pluck; আবুল মাল আবদুল মুহিত (b.1934) —The Deputy Commissioner in East Pakistan (1968), Bangladesh Emergence of a Nation (1978), Thoughts on Development Administration (1981), Problems of Bangladesh-An Attempt at Survival (1986), Development Strategies Lessons from Experience (1988), American Response to Bangladesh Liberation War (1996), Bangladesh in the Twenty First Century (1999), Issues of Governance in Bangladesh (2000), A Rigged Election: An Illegitimate Government (2002), State Language Movement in East Bengal 1947-1956 (2008); দিলওয়ার (1937-2013)— Facing the Music; জাহেদা আহমদ (b.1944)—Bangladesh Under the British, লালা প্রসন্ন কুমার দে—Indian Bouquet of Flowers; নাজমা চৌধুরী—Women and Politics World Wide; সিরাজ চৌধুরী—(b.1950)- Human Nature in the Light of Science (2000), The Love Poetry of Siraj Chaudhury; কারী সুলাইমান আহমদ (1953-2009)—Light of Allah: Patient Guide Lines Heart Disease; সেলু বাসিত (b1958)—Language Study and Linguist of Bangladesh (1987); কাওসার হুসাইন (1963-2002)—The Frogs: An Overview; দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা (b1967)—O General My General (2010); রেহানা রহমান—Gupsy of Bangladesh (1988); নাজির আহমদ- Contemporary Issues on British Law

and Politics; মো. মহিবুর রহমান—The Teachings of Islam: My Thoughts About Allah (1973); মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন—Modern Medicine in the Light of Islam (2009); রাবিনা খান—Rainbow Hands, A Yesha's Rainbow (2008); ফারহানা হক—Leaves of the Sun (Poems), The Eye of the Hear (Novel); জফির সেতু (b.1971)—Turtle Has No Wings (2014) এবং দ্বীনুজামান চৌধুরী (b.1975)—Phenomenon (2000), Broken Lyrics (2000) ইত্যাদি।

মণিপুরি সাহিত্য

সিলেটে যেসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করেন তার মধ্যে প্রথমেই মণিপুরি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সাহিত্য বেশ উন্নত। মণিপুরি ভাষার কবি ও কবিতা গ্রন্থ- ইমোদন রবিন (*ওয়াখলগী মঙাল, অঙকপা মালেম*), থোকচম মনিহার শোনী (*ওই লাই নীংবা চৎলে*), এ কে শেরাম (*বসন্ন কুন্নিপালগী লৈরাং, মঙালানগী অতিয়াদা নুমিৎ থোকপা*), শেরাম নিরঞ্জন (*মঙ্ মপৈ মরক্তা, অতোপ্পগী পিরাং, নাতৈ চাদ্রবা*), মাইস্নাম রাজেশ (*মোংফম থম্মোয়গী নুংশিবা*), মুতুম অপু (*লৈরাংগী লৈরোং-১, লৈরাংগী লৈরোং-২*); ছোটোগল্পকার—এ.কে শেরাম (*নোঙ্জৌবী*); উপন্যাস—এ কে শেরাম (*মৈরা পাইবী, লম্মাঙ্নবা*; পথভ্রষ্ট পথিক [অনুবাদ]), প্রবন্ধ—এ কে শেরাম (*অতোপ্পা লৈরাং*), শেরাম নিরঞ্জন (*ফরংজাই ওয়াখল*); ভ্রমণ কাহিনী—থোকচোম মনিহার শোনী (*থোঙচং, থওয়ানমিচাক, অরোইবা খোঙচৎ*)। আরো অনেক লিখেছেন, গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

লোকসাহিত্য

সিলেটের লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার খুবই সমৃদ্ধ। এখানকার লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস প্রাচীন ও তা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। সিলেটের লোকসাহিত্যে এমনসব বিষয় আছে, যা অন্য জেলায় নেই। এজন্য অনেকেই সিলেটকে লোকসাহিত্যের খনি বলে থাকে। শামসুজ্জামান খানের মতে, 'বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাবের গভীরতায় এবং পরিমাণের বিশালতায় সিলেটের লোকসংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির এক অমূল্য ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত'।[১]লোকসাহিত্যের গবেষক মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন এই ভাণ্ডারকে ৩৭ ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হচ্ছে : বারমাসী, গীত বা লাছাড়ী, গান, ছাইয়া (ছড়া), দৃষ্টান্ত, পই (ছোটো ছোটো পদ্য), বাউলগান, মারফতি গান, প্রবাদ, কথার কথা (কথার সঙ্গে যে কথা আসে), ধামালী, ডোরা, সারিগান, গাজির গান, জারি গান, হাজিরাত গান, ঘাটু গান, উলী (হোলী বা দোল) গান, দুঃখের গান, অচরিত (অদ্ভু)তগান, মর্সিয়া গান, বান্ধা গান, হেয়ালি শ্লোক, চুটকী গান, ভারত (বিবরণ) গান, ভাঙ্গানী ছিল্লক, বয়ান (বর্ণনা), রং-চং, ডাক (খেলার), ফাঁকি কথা (ঠেকান কথা), আউল কথা, প্যাঁচের কথা, টক্কর কথা, ইশারা কথা, হেঁয়ালি অঙ্ক বা হিসাব, লোকসাহিত্য বা চরিত্র গঠন ও শিক্ষামূলক গল্প, ভাট কবিতা (ভট্ট কাব্য) ও জনসাহিত্য। তবে, আসাদ্দর আলী উল্লিখিত বিভাগের

বাইরে সিলেটের লোকসাহিত্যের আরও ১২টি উপবিভাগের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর গবেষণায় আরিগান, বিয়ের গান, রূপকথা, উপকথা, মালজোড়া গান, ধরাটগান, পিরমুর্শিদি গান, ভাটিয়ালি গান, মেঘের গান, ফকিরালি গান, মন্ত্র ও হাপড়িয়া গীত[৩] সংযুক্ত হয়েছে নতুন অভিধায়।

উনিশ শতকের শেষলগ্নে সিলেট অঞ্চলে ফোকলোরচর্চার সূচনা হয়। কিন্তু এর বিকাশ হয়েছে বিশ শতকের শুরুতে। এক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন অচ্যুতচরণ চৌধুরী, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, প্রেমদাময়ী আদিত্য, রেবতী মোহন, আদিত্য চৌধুরী, প্রফুল্লকুমার দে চৌধুরী, প্রভাত দেবশর্মা, সুতপা দেবী, সৈয়দা নজিবুন্নেছা খাতুন, শৈলজা সুন্দরী দত্ত, কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী, তারিণী চরণ দাস, জগন্নাথ দেব, গুরুসদয় দত্ত, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন, আবদুল আজিজ মাস্টার, ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন, রাজমোহন নাথ, মতিনউদদীন আহমদ, মুহাম্মদ আবদুল বারী, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, আবদুল গফফার দত্তচৌধুরী, আবদুল জব্বার প্রমুখ।

প্রবাদ-প্রবচন সিলেটে প্রবাদ-প্রবচন, 'ডাকর কথা', 'ছিলক', 'ডিঠান' ইত্যাদি নামে পরিচিত। সুখ-দুঃখ, রাগ-অভিমানে, দ্বন্দ্ব-কলহে, হতাশা-নিরাশায়, দ্রোহ-বিদ্রোহে, চলাফেরায়, বৈঠকে-মজলিসে, কাজকর্মে সর্বত্রই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। তবে, পুরুষের তুলনায় এখানকার নারীমহলেই প্রবাদ-প্রবচনের প্রচলন বেশি। আসাদ্দর আলীর মতে, 'সিলেটের প্রবাদ প্রবচনগুলোর ভেতর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, শ্লেষ-কটাক্ষ, উপমা-উপদেশ, তত্ত্ব-দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে অনেক মূল্যবান প্রসঙ্গের বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে থাকে। কথাগুলোতে শব্দ কম থাকলেও সেগুলো ওজনে থাকে অনেক ভারী। ওসব গ্রাম্য প্রবাদ-প্রবচনকে লোক চরিত্রের নির্মম সমালোচক বললে অত্যুক্তি হয় না।'

সিলেটে লোকসাহিত্যের এই শাখাটি এতটাই সমৃদ্ধ, তা নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার। এ পর্যন্ত গ্রন্থভুক্ত হওয়া সিলেটের প্রবাদ-প্রবচনের সংখ্যা ১৬ হাজারেরও অধিক। এখানে জনপ্রিয় কয়েকটি প্রবাদ-প্রবচন উল্লেখ করা হলো :

১. চুরেচুরে আলি, এক চুরে বিয়া করেন আরক চুরর হালি

২. বাপ ভালা তার বেটা ভালা, মা ভালা তার ঝি
গাই ভালা তার বাছুর ভালা, দুধ ভালা তার ঘি

৩. ভাগ নাই বেটির লাম্বা কথা, আন্না কচুর দীঘল লতা

৪. বেটি আর মাটি কন্ডলর (বিপদের) ঘটি

৫. আলী আমজদর ঘড়ি, চান্নিঘাটর সিঁড়ি
চাপঘাটর বাড়ি, বিপিন বাবুর দাড়ি

৬. মা মরইন ঝি ঝি করিয়া, ঝি মরইন তান হাইর লাগিয়া

৭. বাঙ্গালরে বাঙ্গাল, পুঁটি মাছর কাঙ্গাল

৮. কাউয়ায় ধান খাইলোরে ডাকাইবার মানুষ নাই
খাইবার বেলায় আছইন মানুষ কাজর বেলায় নাই

৯. খাইয়া না ছইয়া
মাকখু মইলা ছলা বইয়া

১০. ছাগল পালে পাগলে, কৈতর পালে বৈতলে
আ'স পালে আন্ধে, দুয়ারে বৈয়া কান্দে

১১. অইবো পুতে ডাকবো বাপ, তে যাইবো মনের তাপ

১২. এমন কথা কইও কেউ না বলে ঝুট, এমন বওয়া বইও কেউ না বলে উঠ

১৩. যখন থাকে দুই পাও, যেমনি খুশি অমদি যাও
যখন অয় চাইর পাও, খানি কাপড় দিয়া যাও,
যখন অয় ছয় পাও, 'বাজি তুমি কোয়াই যাও?'

ছড়া লোকসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মানবমনের অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ ভাবাবেগই ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ছড়ার নির্দিষ্ট কোনো কাঠামো নেই। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করেই তার সৃষ্টি। ছড়া মূলত শিশুসাহিত্য, কিন্তু এর সর্বজনীনতা অনস্বীকার্য। সিলেটে প্রচলিত ছড়ার ভাণ্ডার খুবই সমৃদ্ধ। এখানকার খেলাধুলাসংক্রান্ত ছড়া, ধর্মীয় ছড়া, ঘুমপাড়ানো ছড়া, দুধ-খাওয়ানোর ছড়া, গোসল-দেওয়ার ছড়া, বৃষ্টির ছড়া, হাসিখুশির ছড়া অত্যন্ত জনপ্রিয়। সিলেটে প্রচলিত কয়েকটি ছড়া উল্লেখ করা হলো :

১. শীত করে গো বুড়া মাই, খেতার তলে জাগা নাই,
খেতা নিছেগি হিয়ালে আইন্যা দিবোনে বিয়ালে

২. আয় চান লইড়্যা, নীল ঘোড়া চইড়্যা
গাই দিমু দুধ খাইতে, দামা দিমু আল বাইতে

৩. এক ঘটি চুন কিচ্ছা হুন
এক ঘটি নুন কিচ্ছার গুণ
এক ঘটি পানি কিচ্ছা আনি
এক ঘটি তেল কিচ্ছা ফুরাই গেল

৪. ভুলা ছাড়, ভুলী ছাড়, বার মাইয়া পিছাইয়া ছাড়
ভাত খাইয়া লড়বড়ো, পানি খাইয়া পেট ভর

৫. দাঁতপড়া গেলো বাজারো বইলা গাছর গুড়িত,
চিরকা হারয় বিটি দিলো ভাংগা দাঁতর গুড়িত

৬. রইদ বেটা রাজা মানুষ করে তাজা,

আগুইন বেটা কুইড়্যা, মানুষ দেয় না ছুইড়্যা

ধাঁধা লোকসাহিত্যের জনপ্রিয় শাখা ধাঁধা। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিবিড়। ধাঁধার বিষয় প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত। গ্রামের মানুষেরাই ধাঁধার স্রষ্টা। গ্রামীণ জীবনে অবসরে সকল বয়সের মানুষই ধাঁধার চর্চা করে থাকেন। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের চর্চাও এর মধ্যে নিহিত। একসময় সিলেটে বিয়ের অনুষ্ঠানে বরপক্ষ ও কনেপক্ষের মধ্যে সারারাত ধাঁধার প্রতিযোগিতা চলত। বর্তমানে সেরকম প্রতিযোগিতা না হলেও ধাঁধার যুদ্ধ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ধাঁধার খেলা চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শালা-শালীরাই নতুন ভগ্নিপতিকে ধাঁধার মাধ্যমে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করে থাকে।

ধাঁধা মূলত প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত—সাহিত্যিক ধাঁধা ও লৌকিক ধাঁধা। তবে সিলেটের আঞ্চলিক ধাঁধা চারভাগে বিভক্ত—সাধারণ ধাঁধা, আক্রমণাত্মক ধাঁধা, বৈঠকি ধাঁধা ও হিসাব ধাঁধা। সিলেটের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধাঁধা—

১. তিন অক্ষরে নাম তার
জলে বাস করে
মাঝর অক্ষর ছাড়ি দিলে -চিতল
আকাশেতে উড়ে।

২. রাজার বাড়ির মেনা গাই
মেন মেনাইয়া চায়
হাজার টেকার মরিচ খাইয়া -পাটা
আরও খাইতো চায়।

৩. হাতে হাতে ধরাধরি মন করইন কালা
কোনোরকম ঢুকাইদিলে দুইজনের বালা। -চুড়ি

৪. ছয়চরণ, কৃষ্ণবরণ
পেট কাটলেও আ-টে
মুর্খয় ভাংগাইবো কিতা পিঁপড়া
প--তরঐ ফাটে।

৫. এখ্ বেটার এখ্ দাত
মাটি খাইয়া করে পাত। -খন্তি

৬. সাগরেতে জন্ম তার, নগরেতে বাস,
মায় ছৈলে পুত মরে একি সর্বনাশ। -লবণ

৭. দুইজন উবা, একজন কাইত - হোড়কাসহ কাঠের দরজা
লাগি থাকইন হারা রাইত।

৮. দুই আতো দুই থাল,
তারা খালি লাগায় তাল। -করতাল

৯. ধলা মুরগীর পুটকিত দাড়ি, -রসুন
তাই থাকে হকলর বাড়ি।

১০. ঘর আছে দুয়ার নাই
মানুষ আছে কথা নাই। -কবর

লোককথা

'লোকসমাজ কর্তৃক সৃষ্ট কাহিনিমূলক গদ্যসাহিত্য হচ্ছে লোককথা।' লিখিত এবং মৌখিক এই দুই রীতিতেই এর উৎপত্তি। লোককথা মূলত ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত-রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা।

সিলেটের লোককথার ভান্ডার খুবই সমৃদ্ধ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এখানকার লোককাহিনি দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অধিক। সিলেটে লোককথাকে গল্প, কিচ্ছা, পরেস্ত এবং পরস্তাব বলা হয়ে থাকে। এখানে সিলেটের আলোচিত অর্ধশত লোককাহিনির শিরোনাম উল্লেখ করা হলো—১. তেল তেলাইয়্যা, ২. মনভরতোর কিচ্ছা, ৩. দিনো দশ বেত, ৪. রূপরাম মেস্তরি আর মেহেরজান কন্যার কিচ্ছা, ৫. বেটিনতর আকল বেশ, ৬. বে-আকলর মেল, ৭. নিজের ভাগে, ৮. সাতকথা মাতাইলে বিয়ে, ৯. রাঢ়ির কৈলাস, ১০. ইক্ষু রসো মন্ত্র, ১১. নিজের ভাগে, ১২. চেংগোর বিপদ, ১৩. আংখির ভিতর পংকির বাসা, ১৪. আ-পুতার পুত, ১৫. বিচারে বর্তে যার, ১৬. হঠা ঠগ, ১৭. শাম আরমানের কিচ্ছা, ১৮. কার কথা কে হুনে, ১৯. মাতো না জিয়ার বাপ, ২০. টেপরা পির, ২১. আমজাদের দোকানদারি, ২২. রাজপুত ও ডাকাইত, ২৩. স্ত্রীলোকের কামভাব, ২৪. পাঁচ হাতাই, ২৫. খয়ের উল্লার চক (কিংবদন্তি), ২৬. আলী খাঁর পুকইর (কিংবদন্তি) ২৭. জওয়া খাঁর পুকইর (কিংবদন্তি), ২৮. বিলোর বন্দ (কিংবদন্তি), ২৯. শিয়ালছড়া, ৩০. গালিব খাঁর বন্দ, ৩১. বিলনী বিল, ৩২. পতন গোপালপুর (কিংবদন্তি), ৩৩. করাইয়া হাওর (কিংবদন্তি), ৩৪. পরীর জাঙ্গাল (কিংবদন্তি), ৩৫. রাজঘাট, ৩৬. তুই খা, ৩৭. জোড়বিল (কিংবদন্তি), ৩৮. সেটাও কি মাইন্না নিব?, ৩৯. ঘোড়ার দেওয়া, ৪০. জারি মামদর দিঘি, ৪১. উছে কিয়া হোগা, ৪২. বরাতর বউ, ৪৩. রংগমালার পুকইর (কিংবদন্তি), ৪৪. মধুমতি কন্যার কিসসা, ৪৫. ছালাম বে-আকলর কিসসা, ৪৬. হারুন খাঁর দিঘি (কিংবদন্তি), ৪৭. রূপ দিলো কে, ৪৮. গিরোছতর ভাগ, ৪৯. উচমান দিঘি (কিংবদন্তি), ৫০. মানুষটির পুকইর (কিংবদন্তি)।

লোকসংগীত

লোকসংগীত লোকসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা। লোকসংগীতের কোনো স্বরলিপি নেই। সব লোকই এই গান গাইতে পারে। গ্রামীণ মানুষ এর রচয়িতা। নিরক্ষর মানুষের অভিজ্ঞতাপ্রসূত গানকে অনেকে লোকসংগীত বলে থাকেন। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই গানের সৃষ্টি। লোকগানে ওঠে আসে প্রকৃতি, মানুষের ভালোবাসা, দুঃখ বেদনা ইত্যাদি। আচার অনুষ্ঠান উৎসব সব কিছুই

রয়েছে এই গানে। সাধারণের জীবন চিত্র ওঠে-আসা এই সংগীতে নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা না থাকলেও একটা সীমিত কাঠামো লোকসংগীতকে আবদ্ধ করে রেখেছে। অঞ্চলভেদে একটা নিজস্বতা আছে এই সংগীতের। আঞ্চলিকতাকে লোকগীতির প্রাণ বলা হয়ে থাকে। বৈশিষ্ট্যে ভরপুর এই সংগীতের মাধ্যমেই একসময় আবহমান বাংলার মানুষের যাপিত জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আনন্দ-বেদনা ও অগ্রসর চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল।[১০] রাধারমণ দত্ত, হাছন রাজা, শীতালং শাহ, দুরবীন শাহ, শাহ আবদুল করিম প্রমুখদের গীত মানুষকে যেমন আপ্লুত করেছে, তেমনি এই অঞ্চলের লোকসংগীতের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ।

সিলেটের লোকসংগীতের সংখ্যা নিরূপণ করা আদৌ সম্ভব নয়। তবে পণ্ডিত মথুরা নাথ চৌধুরীর বক্তব্য থেকে এর একটা অনুমান পাওয়া যায়। তাঁর মতে, সিলেটি লোককবিদের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। আগেকার দিনে সিলেটে প্রতিবছর অসংখ্য গান রচিত হতো। সিলেটে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের গান থেকে সেটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

সিলেটের লোকসংগীত নানা ধারায় বিভক্ত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো হচ্ছে-ভাটট্যলী, বাউল, ধামাইল, ঘাটু, সারি, জারি, আরি, বিয়ার গীত, ডোরাগান, গাজির গীত, হাজিরাত গান, উল্টা গান, আচরিত গান, দুঃখের গান, ভারত গান, বেংগাইপুতর গান, বেজ-বাইদ্যার গান ও হিরালির গান।
সিলেটের লোকসংগীতের ভাণ্ডার বিশাল। হাজার হাজার গান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানকার গ্রামীণ জনপদে। এখানে সিলেটের জনপ্রিয় ৫০টি লোকসংগীতের প্রথম লাইন উল্লেখ করা হলো :

সিলেটের জনপ্রিয় লোকসংগীতের তালিকা

১. আমি ভাবছিলাম কি ওই রঙ্গো দিন যাবেরে সুজন নাইয়া—দীন ভবানন্দ
২. গৌর তোরে ঘরের বাহির কে কৈল কে—দীন ভবানন্দ
৩. মাথায় পসরা লৈয়া হাটে চলে রাধা—দীন ভবানন্দ
৪. আইস বন্ধু প্রাণ কালিয়া রে—শিতালং শাহ
৫. খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধ মন—শিতালং শাহ
৬. আমার রসিয়া বিরস হইলা কিসে—শিতালং শাহ
৭. বিরহেতে ডাকিরে বন্ধু নব গুণমণি—শিতালং শাহ
৮. নিশিথে যাইও ফুল বনে রে ভমরা—শেখ ভানু
৯. শ্যামকে এনে দেখাও আমারে প্রাণ ললিতে—আব্দুল মান্নান
১০. ফাল্গুনও বসন্তকালে যৌবনে দিল উঁকি—গেদু মিয়া সরকার
১১. ও মাঝি বিনয় করি, পায়ে ধরি, ভিড়াই দে মোর ভাঙ্গা তরী—মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াছিন
১২. আসবে শ্যাম কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া—রাধারমণ দত্ত
১৩. আমি কৃষ্ণ কোথায় পাই গো—রাধারমণ দত্ত
১৪. শ্যামল বরণ রূপে মন নিল গো হরিয়া—রাধারমণ দত্ত

১৫. জলের ঘাটে দেইখ্যা আইলাম কী সুন্দর গো শ্যামরায়—রাধারমণ দত্ত
১৬. আর দাঁড়াব কতরে শ্যাম আর দাঁড়াব কত—রাধারমণ দত্ত
১৭. কই গেলে পাই তারে কই গেলে পাই—রাধারমণ দত্ত
১৮. সুবল যা রে বৃন্দাবন দেখে আয় রে রাধারাণী আছেরে কেমন—ছহিফা খাতুন
১৯. সুজন মন মনরে যাইও না তরী বাইয়া—দীননাথ বাউল
২০. লোকে বলে বলে রে ঘরবাড়ি ভালা না আমার—হাছন রাজা
২১. নিশা লাগিল রে বাঁকা দুই নয়নে নিশা লাগিল রে—হাছন রাজা
২২. মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়া রে—হাছন রাজা
২৩. হাছন রাজার কয়, আমি কিছু নয় রে আমি কিছু নয়—হাছন রাজা
২৪. বাউলা কে বানাইল রে, হাছন রাজারে বাউলা কে বানাইল রে—হাছন রাজা
২৫. আমি করিরে মানা অপ্রেমিকে গান আমার শুনবে না- হাছন রাজা
২৬. বন্ধু তোর লাগিয়া রে আমার তনু ঝরো ঝর—সৈয়দ শাহ নূর
২৭. কী সন্ধানে মওলা ধনে বসাইলা প্রেমের বাজার—কালা শাহ
২৮. কেন বাস ভিন রে বন্ধু গোকূলে বইল হাসি—আছিম শাহ
২৯. নির্জন যমুনার কূলে বসিয়া কদম্বতলে, বাজায় বাঁশি বন্ধু শ্যামরায়—দুর্বীন শাহ
৩০. জন্মে জন্মে অপরাধী তোমারই চরণে রে—দুর্বীন শাহ
৩১. আর কত রাখব যৌবন লোকের বৈরী হইয়া—দুর্বীন শাহ
৩২. আমি কূলহারা কলঙ্কিনী—শাহ আবদুল করিম
৩৩. মহাজনে বানাইয়াছে ময়ূর পঙ্খী নাও—শাহ আবদুল করিম
৩৪. সখী কুঞ্জ সাজাও গো—শাহ আবদুল করিম
৩৫. গ্রামের নও-জোয়ান হিন্দু-মুসলমান—শাহ আবদুল করিম
৩৬. বসন্ত বাতাসে সইগো বসন্ত বাতাসে—শাহ আবদুল করিম
৩৭. কৃষ্ণ আইলা রাধার কুঞ্জে ফুলে পাইলা ভমরা—আরকুম শাহ
৩৮. আজি দরশন মিলন এখন—আরকুম শাহ
৩৯. অকারণে তুলসীর মূলে জল ঢালিলাম—বিরহী মো. কালা মিয়া
৪০. দুই পাহাড়ের মাঝে মওলা মসজিদ বানাইছে—ক্বারী আমির উদ্দিন
৪১. আমি তোমার প্রেমের পাগল তুমি কিতা বুঝ না—বিরহী মো. কালা মিয়া
৪২. ও মোর প্রাণের বন্ধু রে তুমি কোথায় রইলায় রে—হেপী রাণী দাশ
৪৩. বল গো সখি আর আসবে কি চিত্ত চোরা মোর—উদাসী মুজিব
৪৪. কই যাওরে সুজনও নাইয়া ভাটির গাঙ বাইয়া—রুহি ঠাকুর
৪৫. মন পাখি তুই আমার কথা শুনলে না একবার—অন্নদারঞ্জন দাস
৪৬. মন তোর গেল গনার দিন, মনের ঘোড়া লাগাম ছাড়া দৌড়াইয়া যায় দিন—সূর্যলাল দাস
৪৭. আমার মন মজো রে রঙিয়ার চরণে আমার মন মজো রে—আজিম ফকির

৪৮. মরিলে কান্দিস না আমার দায় রে যাদু ধন—গিয়াস উদ্দিন আহমদ
৪৯. বাঁশি বাজিল রে, ভরা গাঙ্গের কূলে—একলিমুর রাজা
৫০. দয়াল গুরু গো ঘোর অন্ধকার দেখি—অজ্ঞাত

বারমাসী সিলেটের লোকসংগীতের আরেক অবিচ্ছেদ্য অংশ বারমাসী। পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক পটভূমিকায় রচিত বর্ণনামূলক এই গীত সিলেটে বেশ জনপ্রিয়।

বাংলা ভাষায় বারমাসী প্রথম কোথায় প্রণয়ন হয়েছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও লোক গবেষকদের অনুমান–মধ্যযুগে সিলেট থেকেই বাংলাদেশের সর্বত্র বারমাসী বিস্তার লাভ করে। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় 'শান্তির বারমাসী' প্রণেতা শ্রীধর বানিয়া সিলেটেরই লোক। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা তার লেখা দশটি বারমাসীর প্রমাণ পাওয়া যায়।

করুণ সুরই বারমাসীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। সিলেটি বারমাসী প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আশরাফ হোসেনের ভাষ্য—'বারমাসীর বহুলাংশই প্রেমকাহিনী নিয়া রচিত। তবে তাহাদের অধিকাংশ নিষ্কাম প্রেমের মধুময় চিত্র। এগুলো চরিত্র গঠনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রেমকাহিনী ব্যতীত শোক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিষয়েও বারমাসী রচিত হইয়াছে।'[১২] সিলেটের কবিদের লেখা বারমাসীর সংখ্যা শতাধিক। উল্লেখযোগ্য বারমাসীগুলো হচ্ছে : ১. দিলখোশ কন্যার বারমাসী, ২. শান্তিকন্যার বারমাসী, ৩. লিলাইর বারমাসী, ৪. কোকিলা কন্যার বারমাসী, ৫. শামার বারমাসী, ৬. খঞ্জন সুন্দরীর বারমাসী, ৭. কাঞ্চন সুন্দরীর বারমাসী, ৮. মনের বারমাসী, ৯. তনের বারমাসী, ১০. সীতার বারমাসী, ১১. নিমাই চান্দর বারমাসী, ১২. ফুল্লারার বারমাসী, ১৩. উদয়বালার বারমাসী, ১৪. ফসলের বারমাসী, ১৫. শামরুখ কন্যার বারমাসী, ১৬. বিরহিনী কন্যার বারমাসী, ১৭. শুয়ার বারমাসী, ১৮. শরার বারমাসী, ১৯. কলির বারমাসী, ২০. কালার বারমাসী, ২১. জুলেখার বারমাসী প্রভৃতি। এখানে অভাগীর বারমাসীর কয়েকটি লাইন উল্লেখ করা হলো:

বৈশাখ মাস না বড়ো সুখের সময়
অভাগীর হমান রৈদর তেজ শইলে নাই সয়।
চুয়া চন্দর আর ভাজা হইরোর তেল
ঠাণ্ডা পানিয়ে করাইমু গোছল লইয়া দাসীর মেল।
টানা হুতার গামছা দিয়া পুছাইয়া পানি
শীতল পাটি বিছাই দিয়া লৈয়া বইনু আবের পাংখা টানি।

পরবাস ছাড়িয়ারে নাথ আইসো নিজ পুর
তুমারে দেখিয়া আমার দুঃখ যাউক দূর।
নালি-শাগ তুলিয়ারে রান্দিমু বেঞ্জন
জলদি আও পরানের বন্ধু চাই না কুনু ধন।

সোনা রূপা কিও জুয়ায় কিছুনায় ভালা
ঝলমলি করে বন্ধু তুমার পাওয়ার ধুলা।
জষ্ঠি মাসের দিনে গাছে আম পাকে
উমনি কুলিয়ারে বন্ধু রইয়া রইয়া ডাকে
যে নারীর বন্ধুয়া ঘরে তাই বারে বইয়া
বাটি ভরি খাওয়ায় রস পাক না আম চিপিয়া
আমি নারী অভাগিনী পাইলো দৈব দুষে
এমন সুদিনর কালো প্রাণবন্ধু বৈদেশে।

লোক-গীতিকা

গীতিকা লোকসাহিত্যের অন্যতম একটি প্রধান অংশ। গীতিকা মূলত বর্ণনাপ্রধান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, প্রেমে ব্যর্থতা, রাজনৈতিক ঘটনা সবই থাকে গীতিকায়। মোহাম্মদ আশরাফ হোসেনের মতে, ‘কাহিনীমূলক সুদীর্ঘ গানগুলো লাছাড়ী (দীর্ঘ) গান বা গীত নামে পরিচিত। ইহার কতকগুলো সামাজিক সত্য ঘটনা পূর্ণপ্রেমকাহিনিমূলক। কতকগুলো ঐতিহাসিক সত্য ঘটনামূলক। কতকগুলি উপকথা ও অন্যান্য বিষয়ে।’

সিলেটের অধিকাংশ গীতিকাই বাস্তব ঘটনাকে আবর্তিত করে রচিত। এ পর্যন্ত সিলেটে প্রায় দুইশ’ গীতিকা সংগৃহীত হয়েছে। একটি অঞ্চলে এত গীতিকা উপমহাদেশের আর কোথাও নেই। সিলেট গীতিকা প্রসঙ্গে আবুল ফতেহ ফাত্তাহর ভাষ্য : ‘সিলেট অঞ্চলের নৈসর্গিক শোভা-সৌন্দর্য, মানুষের জীবন-চর্যা, প্রেম-ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ ও আনন্দ বেদনার কথা লোককবিদের বর্ণনায় হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয়। জানা-অজানা এই লোককবিদের রচিত গীতিকা সবাইকে ভাবাপ্লুত করে, চমৎকৃত করে।’ এখানে পাঁচ হাতনোর গীতিকার কয়েকটি লাইন উল্লেখ করা হলো :

সাতাইমার’র কথাকিনী মধুরসো বাণী
তলে দিয়া কাটে গাছ উপরে ঢালে পানি।
সদরখাঁ নয়াবোর নাম দিয়ারে পর্চার্
চোদ্দ পরগনা জুড়ি হুক্মত তাহার।
দেওয়ান চথ্রী কান্কই কতোজন তলুয়া
আঝারে বিজারে পর্জা বেপারী আর আলুয়া।
ঝালোর মাইমাল্ কতো নমসুত আবাদী
পাইক বরকন্তাজ আর ‘খেলনাও’র মাঝি।
ধন ছামানের সীমা নবাব সাবোর নাই
কে করে গণনা তা ধুড়িয়া না পাই।
পাচআল জুড়িয়া বাড়ী গড়খাই চৌধারে
বাড়ীর ছায়েে বড়ো দিকি পানিয়ে ঝলমল করে।

ধামাইল

ধামাইল সিলেটের জনপ্রিয় লোকগান। এই গান সিলেটের নিজস্ব সম্পদ। সমবেতভাবে নারীরা এই গান পরিবেশন করে থাকেন। মধ্যযুগ থেকে এই

অঞ্চলে ধামাইল গানের প্রচলন শুরু হয়। এই গানের সাথে নৃত্য যুক্ত করে পরিবেশন করা হলে সেটাকে ধামাইল নৃত্য বলে। শুধু যে নারীরাই ধামাইল গান পরিবেশন করে তা নয়, পুরুষরাও এ সংগীতে সমানভাবে পারদর্শী। বাদ্যযন্ত্রের সাথে তাল মিলিয়ে অথবা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া উভয়ভাবেই এই গান গাওয়া যায়। মোবারক হোসেন খানের ভাষায়: 'ধামাইল সিলেটের প্রসিদ্ধ নৃত্যগীত। যে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বিয়ের অনুষ্ঠানে এ গানের প্রচলন সমধিক। বিয়ের শুরুতেই স্ত্রী আচারের সঙ্গে সঙ্গে এ গান মেয়েদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে। বিয়ের পরও এ গান চলতে থাকে। যুবতীরা দুহাতে তালি বাজিয়ে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে এ গান পরিবেশন করে।'

ঘাটুগান সিলেট অঞ্চল ঘাটু গান ও নাচের প্রধান উৎসভূমি। নৃত্যের সঙ্গে ছোটো ছোটো ছেলেরা যে চুটকি গান পরিবেশন করে তাই সিলেটের ঘাটুগান। ঘাটুগান বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। একসময় সারা দেশে এই গান ও নাচের প্রচলন ছিল। রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমলীলাই এই নৃত্যগীতের বিষয়বস্তু। গানের ভাবার্থ ধরে নাচের ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলা হয়। এই সংগীতকে উপভোগ্য করতে হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা, করতাল, মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ ঘাটুগানের আকার ছোটো। ঘাটুগান রচনা করে সিলেটের অনেক কবি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাদের মধ্যে পঞ্চখণ্ডের কবি সত্যরাম অন্যতম। এখানে জনপ্রিয় একটি ঘাটুগান তুলে ধরা হলো :

জিউয়ায় না মানে সখী আরে প্রিয়া পরদেশীরে;
কোনো দেশে রইলারে প্রিয়া, আনিয়া মিলাওয়ে।
যেদিকে ফিরাই আঁখি সে দিকে আঁধার দেখি;
মোর কপালে ওই লিখিল হায় দারুণ বিধি
দুঃখিনী অভাগী রাধার দুঃখ গেল না;
কোনো দেশে রইলারে প্রিয়া নিলয় পাইলাম না।

অধ্যায়-১৩

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

১৮১১ সালে সিলেটের জেলা প্রশাসক তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে প্রথমবারের মতো সিলেট শহরের ১০৯৮টি বাড়ির মোট ৯২৬.০০ টাকা কর নির্ধারণ করেন। এটিই সিলেট জেলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সূচনা বলে ধরা হয়ে থাকে। ১৮৭২ সালে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিকে জেলার সড়কসমূহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৮৭৪ সালে যখন আসামকে (সিলেট তখন আসামেরই অংশ বিশেষ) পৃথক একটি প্রশাসনিক মর্যাদা প্রদান করা হয় তখন ভারত সরকার ভূমি রাজস্ব আয়ের ১/১৭ ভাগ স্থানীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ রাখে। ১৮৭৯ সালে আসাম লোকাল রেট রেগুলেশনের মাধ্যমে স্থানীয় রেটে কর ধার্যের ব্যবস্থা চালু করে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিহাস বেশ পুরানো। স্বাধীনতার পর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামো কার্যক্রমে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার সৃষ্টি ও কার্যকর করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে বলা আছে ‘প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে’ এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদের স্থানীয় শাসনে বলা হয়েছে ‘আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।’ এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর আরোপ, বাজেট প্রণয়ন ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদানের কথাও বলা হয়েছে। বর্তমানে দেশে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান, যা পরিচালিত হচ্ছে আইন অনুযায়ী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে। সিলেট জেলার প্রধানতম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হলো সিলেট সিটি করপোরেশন। এছাড়া সিলেট জেলা পরিষদ, ১৩টি উপজেলা পরিষদ, ৪টি পৌরসভা ও ১০৫টি ইউনিয়ন পরিষদ এ জেলার স্থানীয় সরকার কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত।

সারণি-১৬২

একনজরে সিলেট জেলায় স্থানীয় সরকার কাঠামো

ক্র. নং	ধরন	নাম	মন্তব্য
১.	সিটি করপোরেশন	সিলেট সিটি করপোরেশন	২৭টি ওয়ার্ড
২.	জেলা পরিষদ	সিলেট জেলা পরিষদ	সমগ্র সিলেট জেলা
৩.	পৌরসভা	গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার,	‘ক’ শ্রেণির, পৌরসভা ‘খ’ শ্রেণির পৌরসভা

ক্র. নং	ধরন	নাম	মন্তব্য
		কানাইঘাট জকিগঞ্জ	‘গ’ শ্রেণির পৌরসভা ‘গ’ শ্রেণির পৌরসভা
৪.	উপজেলা পরিষদ	উপজেলার নাম	উপজেলা পরিষদের আওতাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের নাম
		সিলেট সদর	ইউনিয়নসমূহ জালালাবাদ, হাটখোলা, খাদিমনগর, খাদিমপাড়া, টুলটিকর, টুকেরবাজার, মোগলগাঁও, কান্দিগাঁও
		দক্ষিণ সুরমা	ইউনিয়নসমূহ মোল্লারগাঁও, বরইকান্দি, তেতলী, সিলাম, জালালপুর, লালাবাজার, মোগলাবাজার, দাউদপুর, কুচাই, কামালবাজার
		বালাগঞ্জ	দেওয়ানবাজার, পূর্ব গৌরীপুর, পশ্চিম গৌরীপুর, বালাগঞ্জ।
		ওসমানীনগর	উমরপুর, সাদিপুর, পশ্চিম পৈলনপুর, বুরুঙ্গাবাজার, গোয়ালাবাজার, তাজপুর, দয়ামীর, উছমানপুর
		বিশ্বনাথ	লামাকাজি, খাজাঞ্চি, অলংকারী, রামপাশা, দৌলতপুর, বিশ্বনাথ, দেওকলস, দশঘর।
		বিয়ানীবাজার	আলীনগর, চারখাই, দুবাগ, শেওলা, কুড়ারবাজার, মাথিউরা, তিলপাড়া, মোল্লাপুর, মুড়িয়া, লাউতা।
		গোলাপগঞ্জ	বাঘা, গোলাপগঞ্জ, ফুলবাড়ী, লক্ষ্মীপাশা, বুধবারীবাজার, ঢাকাদক্ষিণ, লাখণাবন্দ, ভাদেশ্বর, পশ্চিম আমুড়া, উত্তর বাদেপাশা, শরীফগঞ্জ।
		জকিগঞ্জ	বারহাল, বীরশ্রী, কাজলসার, খলাছড়া, জকিগঞ্জ, সুলতানপুর, বারঠাকুরী, কসকনকপুর, মানিকপুর।
		জৈন্তাপুর	নিজপাট, জৈন্তাপুর, চারিকাটা, দরবস্ত, ফতেপুর, চিকনাগুল।
		কোম্পানীগঞ্জ	ইসলামপুর পশ্চিম, ইসলামপুর পূর্ব, তেলিখাল, ইছাকলস, উত্তর রণিখাই, দক্ষিণ রণিখাই।
		গোয়াইনঘাট	রুস্তমপুর, পশ্চিম জাফলং, পূর্ব জাফলং, লেংগুড়া, আলীরগাঁও, ফতেপুর, নন্দিরগাঁও, তোয়াকুল, ডৌবাড়ি।
		কানাইঘাট	লক্ষ্মীপ্রসাদপূর্ব, লক্ষ্মীপ্রসাদ পশ্চিম, দিঘিরপাড় পূর্ব, সাতবাঁক, বড়োচতুল, কানাইঘাট, দক্ষিণ বাণীগ্রাম, রাজাগঞ্জ, ঝিংগাবাড়ি।
		ফেঞ্চুগঞ্জ	ফেঞ্চুগঞ্জ, মাইজগাঁও, ঘিলাছড়া, উত্তর কুশিয়ারা, উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ।

সিলেট সিটি করপোরেশন ১৯ শতকের শেষভাগে সিলেট শহর এলাকা মিউনিসিপ্যাল আইনের আওতায় আসে এবং ১৮৭৮ সালে সিলেট পৌরসভা গঠিত হয়। মিউনিসিপ্যাল এডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৬০-এর আওতায় গঠিত মিউনিসিপ্যাল কমিটি চালুর পূর্ব পর্যন্ত এটি আসাম পৌরসভা আইন ১৯২৩ দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৬১ সালের শুমারি অনুযায়ী ৩ বর্গমাইল আয়তনের এ পৌরসভার জনসংখ্যা ছিল ৩৭,৪৯৭ জন। ২০০১ সালের ৯ এপ্রিল এটি সিটি করপোরেশনে রূপান্তরিত

হয়। সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রথম মেয়র জনাব বদরউদ্দিন আহমদ কামরান। ২০০৯ সালের স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) বিধিমতে সিলেট সিটি করপোরেশন কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে। সিটি করপোরেশনে ১ জন মেয়র, ২৭জন কাউন্সিলর এবং ৯জন মহিলা কাউন্সিলর রয়েছেন। বর্তমান মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী।

২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সিলেট সিটি করপোরেশনের বাজেট ছিল যথাক্রমে ৩৫৪,২২,৬৩,০০০/- টাকা ও ৩৫০,০১,২২,০০০/- টাকা।

বিয়ানীবাজার পৌরসভা

বিভাগীয় শহর সিলেট থেকে ৫১ কিলোমিটার আগে বিয়ানীবাজার পৌরসভার অবস্থান। ৩০-০৪-২০০১ তারিখে বিয়ানীবাজার পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮.১৭ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ পৌরসভার লোকসংখ্যা প্রায় ৪২০৩০ জন। এ জনপদের উল্লেখযোগ্য লোক প্রবাসী। ১৭-০৫-২০০৫ তারিখে এ পৌরসভা দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হয়।

গোলাপগঞ্জ পৌরসভা

গোলাপগঞ্জ পৌরসভাটি বিভাগীয় শহর সিলেট হতে প্রায় ১৭ কি. মি. আগে অবস্থিত। গোলাপগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়ন, ফুলবাড়ি (আংশিক) লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়ন (আংশিক) ও ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের আংশিক নিয়ে পৌরসভাটি গঠিত হয়। পৌর এলাকার উত্তরে বাঘা ইউনিয়ন ও গোলাপগঞ্জ ইউনিয়ন, দক্ষিণে লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়ন, আগে ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়ন ও আমুড়া ইউনিয়ন এবং পশ্চিমে ফুলবাড়ি ইউনিয়ন অবস্থিত। ২০০১ সালে এ পৌরসভা গঠিত হয়, ১২ নভেম্বর ২০০৯ সালে পৌরসভাটি 'খ' শ্রেণিতে এবং ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ সালে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত হয়। এ পৌরসভায় ২০০২ সালে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গোলাপগঞ্জ পৌর এলাকার ১ ও ৪নং ওয়ার্ডের পাশ দিয়ে বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী সুরমা প্রবহমান। এই পৌর এলাকার পূর্বদিকে অরণ্যসহ পাহাড়ি এলাকা রয়েছে। গোলাপগঞ্জ পৌর এলাকায় কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্রসহ ৪টি গ্যাসক্ষেত্র, মাঝারি ও ছোটো আকারের শিল্পকারখানা রয়েছে এবং নতুন নতুন শিল্পকারাখানা নির্মিত হচ্ছে। এটি ক্রমান্বয়ে জনবহুল ও ব্যস্ততম শহর এলাকা হিসেবে গড়ে উঠছে।

জকিগঞ্জ পৌরসভা

জকিগঞ্জ পৌরসভা ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত ৭.২ বর্গকিলোমিটার আয়তনের 'গ' শ্রেণির এ পৌরসভার বর্তমান লোকসংখ্যা ২৫,৩৩২ জন। ২.৪.২০০৬ তারিখে মো. ইকবাল আহমদ প্রথম নির্বাচিত মেয়র হিসেবে পৌরসভার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এটি সিলেট জেলা সদর থেকে ৯১ কি. মি. দূরবর্তী এবং সীমান্তবর্তী পৌরসভা। কুশিয়ারা নদীর তীরে জকিগঞ্জ পৌরসভা এবং নদীর ওপারে ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলা সদর অবস্থিত। জকিগঞ্জ পৌরসভার কাস্টমঘাট একটি দর্শনীয় স্থান। জকিগঞ্জ সুপারির জন্য প্রসিদ্ধ।

কানাইঘাট পৌরসভা ২০১৪ সালে ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ৪৬৭৩.৯৪ একর ভূমি নিয়ে কানাইঘাট পৌরসভা গঠিত হয়। কানাইঘাট পৌরসভার মোট লোকসংখ্যা ২২১৮৪ জন। মোট ভোটার সংখ্যা ১২৭৯৩ জন। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে 'গ' শ্রেণির এ পৌরসভার রাজস্ব আয় ছিল প্রায় ৪০ লাখ টাকা।

জেলাপরিষদ ১৮১৬ এবং ১৮১৯ সালে স্থানীয়ভাবে ফেরি ব্যবস্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ, সড়ক, সেতু নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কর নির্ধারণ করার জন্য আইন প্রণীত হয়। ১৮১৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে জিলা বোর্ড সেস সেন্সাস কমিটি উত্থাপিত হয় এবং ওই বছরই তা আইনে পরিণত হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে জেলা বোর্ড সেস সেন্সাস কমিটি গঠিত হয়। ১৮৭১ সালে দশম বেঙ্গল অ্যাক্ট -এর অধীনে একটি রোড কমিটি গঠিত হয়। ১৮৭১ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত এ কমিটির কার্যক্রম ছিল। ১৮৮৫ সালে লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট প্রণীত হয় এবং রোড সেস কমিটির পরিবর্তে জেলা বোর্ডের সৃষ্টি হয়। ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার আইনে সিলেট ব্যতীত বেঙ্গলের সকল জেলায় জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র চালুর আগে সিলেট জেলায় কোনো জেলা বোর্ড ছিল না। সেসময়ে প্রতিটি মহকুমায় গঠিত ছিল লোকাল বোর্ড এবং মৌলিক গণতন্ত্র চালুর পরে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৬০ সালে এগুলো একত্রিত হয়ে জেলা পরিষদ নামে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯ শতকের শেষভাগে সিলেট শহর এলাকা মিউনিসিপ্যাল ল-এর আওতায় আসে। ১৮৭৬ সালের ৫নং আইনের অধীনে ১৮৭৮ সালে সিলেট প্রথম পৌরসভা হয়। মিউনিসিপ্যাল এডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৬০-এর আওতায় গঠিত মিউনিসিপ্যাল কমিটি চালুর পূর্ব পর্যন্ত এটি আসাম পৌরসভা আইন ১৯২৩ দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৬১ সালের শুমারি অনুযায়ী ৩.১৯ বর্গমাইল পৌরসভার জনসংখ্যা ছিল ৩৭,৪৯৭ জন।

১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের অধীনে জেলা বোর্ডকে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নামকরণ করা হয়। ১৯৬৩ সালে জেলা পরিষদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ও সর্বশেষ ১৯৬৬ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে নির্বাচিত পরিষদ ভেঙে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে জেলা প্রশাসককে প্রশাসক করে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা অর্পণ করা হয় এবং ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের পরিবর্তে জেলা বোর্ড নামকরণ করা হয়। ১৯৭৬ সালে স্থানীয় অধ্যাদেশ জারির ফলে জেলা বোর্ডের নামকরণ পুনরায় জেলা পরিষদ করা হয়। উল্লেখ্য, ১৮৮৬ সালে সিলেট জেলা বোর্ড গঠিত হয়।

জেলা পরিষদ আইন ২০০০-এ পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে একজন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের ৫ জন মহিলা সদস্য সমন্বয়ে পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। জেলা পরিষদ আইনে উপসচিব পদমর্যাদার

একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন সচিব প্রেষণে পরিষদে ন্যস্ত রাখার বিধান রয়েছে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার বিভাগের জেলা পরিষদ অধিশাখার প্রজ্ঞাপন নং ৪৬.০৪২.০৩৩.০৩. ০০.১৪৭.২০১১-৪১৭৩ তারিখ ১৫/১২/২০১১ খ্রি. জারি হওয়ায় পরিষদ আইন-২০০০ এর ৮২ ধারা মোতাবেক জেলা পরিষদসমূহে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিগত ২৮/১২/২০১৬ তারিখে জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।। অ্যাডভোকেট মো. লুৎফুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত হন।

সারণি-১৬৩

জেলাপরিষদ, সিলেট কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প

(২০০৮-২০০৯ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত)

খাত	প্রকল্প সংখ্যা	অর্থবছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমাণ	
		অর্থবছর	মোট বরাদ্দ
এডিপি সাধারণ	১১৮	২০০৮-২০০৯	১,৭৩,৫৩,০০০/-
এডিপি বিশেষ	৪		২,০৬,৭৮,৮০০/-
নিজস্ব	৬১		১,১৪,৯০,০০০/-
মোট	১৮৩		৪,৯৫,২১,৮০০/-
এডিপি সাধারণ	১৭৭	২০০৯-২০১০	১,৯২,০০,০০০/-
এডিপি বিশেষ	১৩৯		৫,০০,০০,০০০/-
নিজস্ব	৩৩		১,০২,৬২,০০০/-
মোট	৩৪৯		৭,৯৪,৬২,০০০/-
এডিপি সাধারণ	১৯৪	২০১০-২০১১	৩,৮৪,১৯,০০০/-
এডিপি বিশেষ	-		-
নিজস্ব	১০৭		১,১৮,০৩,০০০/-
মোট	৩০১		৫,০২,২২,০০০/-
এডিপি সাধারণ	১৫০	২০১১-২০১১	৩,৩৮,০০,০০০/-
এডিপি বিশেষ	৪		৩৯,৮৩,০০০/-
নিজস্ব	৮৭		১,০৫,৮০,০০০/-
মোট	২৪১		৪,৮৩,৬৩,০০০/-
এডিপি সাধারণ	১৪৮	২০১২-২০১৩	৩,৪১,০০,০০০/-
এডিপি বিশেষ	৬৭		৪,২১,০০,০০০/-
নিজস্ব	১২৪		২,০৫,০০,০০০/-
মোট	৩৩৯		৯,৬৪,০০,০০০/-

অর্থমন্ত্রীর উল্লেখযোগ্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য
০১	কবি নজরুল ইসলাম অডিটরিয়াম সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজ	১,৯৯,৬৫,৭০৩/-
০২	সরকারি অগ্রগামী বালিকা বিদ্যালয়ের সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ	১,১০,৮৭,২১০/-
০৩	শ্রীহট্ট ব্রাহ্ম সমাজের ভবন সংস্কার ও পাঠাগার পুনঃনির্মাণ	২৬,২৩,৭২৪/-
০৪	টুকের বাজার ইউপির সৈয়দ শাহ খুররম মাজার কমপ্লেক্স উন্নয়ন	৩৯,০০,৯৪২/-
০৫	চালিবন্দর শ্মশানঘাট উন্নয়ন	৩৩,৮৯,১৬৪/-
০৬	শ্রীশ্রী কালীবাড়ি কালীঘাট উন্নয়ন	১৮,৩০,০০০/-
০৭	শ্রীশ্রী মহাপ্রভু আখড়ার নাটমন্দির উন্নয়ন, যতরপুর, সিলেট	১০,০০,০০০/-
০৮	সিলেট প্রেসিবিটারিয়ান চার্চ, নয়াসড়ক, সিলেট উন্নয়ন	৭,০০,০০০/-
০৯	কদমতলী পয়েন্ট জামে মসজিদ পুনর্নির্মাণ	১,১১,৫০,০১৬/-
১০	বাগবাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	১২,০০,০০০/-
১১	মদনমোহন কলেজ জামে মসজিদ উন্নয়ন	১০,০০,০০০/-
১২	সিলেট এমসি কলেজের মাঠের সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ ও কলেজ গেইট নির্মাণ	১,৪০,০০,০০০/-
১৩	এমসি কলেজের নিকটস্থ মুতালিব চত্বরে ভাস্কর্য নির্মাণ	৩০,০০,০০০/-
১৪	মিরের ময়দান ও বাগবাড়ি বর্ণমালা পয়েন্টে সৌন্দর্যবর্ধন	১০,০০,০০০/-
১৫	সুরমা পয়েন্টে ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ	১,৬০,০০,০০০/-
১৬	বালাগঞ্জ উপজেলার ওসমানীনগরে ৪০০ আসনবিশিষ্ট মাল্টিপারপাস অডিটরিয়াম নির্মাণ	২,০০,০০,০০০/-

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যে 'উপজেলা পরিষদ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর। সরকারের প্রশাসনিক ও উন্নয়নসংক্রান্ত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে ১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ১৯৯১

সালে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস রহিতকরণ) এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি বাতিল হয়। ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন হয় কিন্তু উক্ত সময়ে পরিষদের নির্বাচন হয়নি। ২০০৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ রহিত করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে উপজেলা পদ্ধতি পুনঃপ্রচলন হয়। ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ (রহিত পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন আইন ১৯৯৮) পাস ও জারি করা হয়। পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করতে ২০১১ সালে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন পাস হয়।

উপজেলা পরিষদ আইন, ২০০৯-এর ৬ ধারা অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান (একজন মহিলা), উপজেলার আওতাভুক্ত সকল ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলার আওতাভুক্ত সকল পৌরসভার মেয়র, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ (সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যের সংখ্যা উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (যদি থাকে) এর মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের সমান) নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠনের উল্লেখ রয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ের ১৭টি দপ্তর উপজেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়। উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল ও উন্নয়ন তহবিল নামে দুটি তহবিল রয়েছে। স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে গঠিত রাজস্ব তহবিলের অন্যতম উৎস হলো উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ি, বিভিন্ন কর/রেট/ফি/টোল, হাটবাজার ইজারালব্ধ অর্থ (অবশিষ্ট ৪১%), ভূমি হস্তান্তর করের ১%, ভূমি উন্নয়ন করের ২%, পরিষদে ন্যস্ত বা তৎকর্তৃক পরিচালিত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা, দানপ্রাপ্ত আয় এছাড়া সরকারি অনুদান/উন্নয়ন বরাদ্দও এ তহবিলের অন্যতম উৎস। উপজেলা পরিষদের সার্বিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে২০১০ সালে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

কিন্তু উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ পুনঃপ্রচলন করা হয় এবং বর্তমানে একটি নির্ধারিত উপজেলা পরিষদ দায়িত্ব পালন করছে। এ প্রেক্ষাপটে ১০ আগস্ট, ২০০৪ তারিখে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহারের একটি সুসমন্বিত নির্দেশমালা জারি করা হয়।

সারণি-১৬৪

সিলেট জেলার উপজেলাসমূহের ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের তথ্যাবলি

উপজেলার নাম	আয়ের খাত	অর্থবছর	
		২০১২-১৩	২০১৩-১৪
বিশ্বনাথ	বাসাবাড়ি হতে আয়	৬,০০,০০০.০০	৭,০০,০০০.০০
	ভূমি উন্নয়ন করের ২%	২,১৫,০০০.০০	২,৫৮,০০০.০০

উপজেলার নাম	আয়ের খাত	অর্থবছর	
		২০১২-১৩	২০১৩-১৪
	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১%	০০	০০
	হাটবাজার ইজারালব্ধ আয়	২৫,০০,০০০.০০	২৮,০০,০০০.০০
	জলমহাল	০০	০০
	শিডিউল বিক্রয়	০০	০০
	বিবিধ	০০	০০
জৈন্তাপুর	বাসাবাড়ি হতে আয়	১৭,৮১২.০০	৫১,৪৪২.০০
	দোকান ভাড়া	১২,০০০.০০	২৬,১০০.০০
	ভূমি উন্নয়ন করের ২%	০০	০০
	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১%	০০	২৯,৫৯,৯২০.০০
	হাটবাজার ইজারালব্দ আয়	১৫,০৯,৮৩৫.০০	১৩,৫০,৮৬৮.০০
	জলমহাল	০০	০০
	শিডিউল বিক্রয়	১,০৩,৭০০.০০	১,৬০,৩৯০.০০
	বিবিধ	০০	১১,৪০০.০০
সিলেট সদর	হাটবাজার ইজারা আয়	২৮,১০,৬৩৪.০০	৩৪,৬১,৮৯১.০০
	রক্ষণাবেক্ষণ	৬,৮৯,২৩০.০০	৭,৩২,৭৮৮.০০
	ভূমি উন্নয়ন করের ২%	৩,৬৫,১৪৫.০০	৪,৮৭,৫৭৮.০০
	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১%	০০	২,৯০,৯৪,৮৪০.০০
	জলমহাল	৭৮,৩০০.০০	৭৮,৩০০.০০
	শিডিউল বিক্রয়	০০	০০
	বিবিধ	০০	০০
ফেঞ্চুগঞ্জ	বাসাবাড়ি হতে আয়	৩২,৩৪,৮০৩.০০	১৬,০০,৩৫৪.০০
	হাটবাজার ইজারালব্ধ আয়	৫৫,৯৬,৪৪০.০০	৫৬,০০,০০৫.০০
	ভূমি উন্নয়ন করের ২%	০০	০০
	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১%	০০	৩২,৩৬,৬৬২.৭০
	জলমহাল হতে আয়	১১,৯৯,৬৩৫.০০	১১,৭৫,০৩৫.০০
	পুকুর হতে আয়	০০	২৮,৬৮০.০০
কোম্পানীগঞ্জ	বাসাবাড়ি হতে আয়	১৪,১১,৯৯২.০০	৭,৫২,৮৭০.০০
	হাটবাজার ইজারালব্ধ আয়	৯,২০,৬৩৪.০০	৮,৮০,৭৪০.০০
	পাথরমহাল হতে আয়	১,২৭,৮৫,৫৫০.০০	১,৪১,৯২,০০০.০০
	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১%	০০	১৯,২৩,২৫৭.০০
	জলমহাল হতে আয়	০০	০০
	পুকুর হতে আয়	০০	০০
বিয়ানীবাজার	বাসাবাড়ি হতে আয়	২০,৩৬,৪৫৪.০০	১৮,৩৯,৯৯৬.০০ (এপ্রিল, ২০১৪ পর্যন্ত)
	হাটবাজার ইজারালব্ধ আয়	১৩,৬১,৯৭৯.০০	১০,৮০,১৪৫.০০
	পাথর মহাল হতে আয়	০০	০০
	ভূমি উন্নয়ন করের ২%	১,২০,৩৬৫.০০	১,২৪,২৩১.০০
	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১%	০০	৫৫,০১,৭২০.০০
গোলাপগঞ্জ	বাসাবাড়ি হতে আয়	১১,৪২,১২৫.০০	০০
	হাটবাজার ইজারালব্ধ আয়	৮,৪৮,৬৮৪.০০	
	পাথরমহাল হতে আয়	০০	০০
	ভূমি উন্নয়ন করের ২%	১,৩৭,২৪৪.০০	০০
	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১%		
গোয়াইনঘাট	বাসাবাড়ি হতে আয়	৮,৫১,০০২.০০	০০
	হাটবাজার ইজারালব্ধ আয়	১০,০২,৫৮৯.০০	০০

উপজেলার নাম	আয়ের খাত	অর্থবছর	
		২০১২-১৩	২০১৩-১৪
	পাথরমহাল হতে আয়	০০	০০
	ভূমি উন্নয়ন করের ২%	৭৮,৫৮৫.০০	০০
	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১%	০০	০০
	দোকানভাড়া বাবদ আয়	২৪,৮৬৪.০০	০০
	ইঞ্জিনচালিত নৌকা হতে আয়	১১,৩৫,৮৩১.০০	০০
বালাগঞ্জ	বাসাবাড়ি হতে আয়	৪,৮৭,৬৪২.০০	৮,৪৭,৯৭৮.০০ (মে/২০১৪ পর্যন্ত)
	ভূমি উন্নয়ন করের ২%	৯৬,১২৯.০০	২,৫৮,৫৭১.০০ (মে/২০১৪ পর্যন্ত)
	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১%	০০	৬০,৭৯,০১৫.০০ (মে/২০১৪ পর্যন্ত)
	হাটবাজার ইজারালব্ধ আয়	৩৬,২৩,৩১৩.০০	৪৩,০৪,৩৮৪.০০
	জলমহাল হতে আয়	০০	০০
	শিডিউল বিক্রয়	০০	৫,৩৪,৬৮২.০০
কানাইঘাট	বাসাবাড়ি হতে আয়	১৩,৭৩,৯৪২.০০	১১,৪১,৬৯৯.০০
	হাটবাজার ইজারালব্ধ আয়	২,২০,৪৭৯.০০	২,২৩,০০০.০০
	ভূমি উন্নয়ন করের ২%	৩,১০,০০০.০০	৩,০৬,০০০.০০
	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১%	০০	৩১,৯৭,২৭৫.০০
জকিগঞ্জ	বাসাবাড়ি হতে আয়	৪,৫১,২১৮.০০	৪,৯৫,২৮৫.০০
	হাটবাজার ইজারালব্ধ আয়	২০,০৭,৩৪১.০০	১২,৫২,৬০৪.০০
	অস্থায়ী পশুর হাট ইজারা	০০	৬,৪০০.০০
	ভূমি উন্নয়ন করের ২%	৮৩,০০০.০০	৮৮,০০০.০০
	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১%	০০	১২,১৯,৯১৩.০০
	ক্যান্টিন ভাড়া	১১,৯৫০.০০	৭,৫০০.০০
	হেলিপ্যাডের চতুর্দিকে নালা ইজারা	০০	৭,৪৩২.০০
দক্ষিণ সুরমা	বাসাবাড়ি হতে আয়	০০	০০
	হাটবাজার ইজারালব্ধ আয়	০০	০০
	ভূমি উন্নয়ন করের ২%	০০	০০
	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১%	০০	০০

ইউনিয়ন পরিষদ

স্থানীয়ভাবে জনসাধারণের বহুমুখী সমস্যা সমাধান করে জনগণের সেবা ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজন পড়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের। ব্রিটিশ সরকার এ দেশে আসার আগেও গ্রামের গণ্যমান্য লোকের সমন্বয়ে গঠিত পঞ্চায়েত দ্বারা গ্রামের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিচালিত হতো। ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়োরের আমলে চৌকিদারি আইন পাস হয় এবংএই আইনের অধীনে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পঞ্চায়েত নিযুক্ত হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে অধিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল কাউন্সিলে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাস হয়। এই আইনের অধীনে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড ও জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। ৯-১৫জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে ২ বছরের জন্য একটি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হতো। পল্লি এলাকায় স্থানীয় সরকার

ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বমূলক নীতি এসময় সর্বপ্রথম গৃহীত হয়। ১৯১৯ সালে পল্লি স্বায়ত্তশাসিত আইনে চৌকিদারি পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন বোর্ড নামে একটিমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রাখা হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা পর্যায়ে থানা কাউন্সিল, জেলা পর্যায়ে জেলা কাউন্সিল এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়।

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭ বলে মৌলিক গণতন্ত্রের সবকটি সংস্থা ভেঙে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। এ সময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ইউনিয়ন পঞ্চায়েত। ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ রাষ্ট্রপতির ২২নং আদেশবলে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে পুনরায় ইউনিয়ন পরিষদ রাখা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে ৩টি ওয়ার্ডে ভাগ করে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতি ওয়ার্ডে ৩জন করে ৯জন সদস্য ও ইউনিয়নে ১জন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। ১৯৭৬ সালের ২২ নভেম্বর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারি হয়। এ অধ্যাদেশে ইউনিয়নপর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানাপর্যায়ে থানা পরিষদ, জেলাপর্যায়ে জেলা পরিষদসহ তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৮৩ সালের ১১ সেপটেম্বর ইউনিয়ন পরিষদের জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ২০০৯ সালে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ১৯৮৩ বাতিলপূর্বক ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ জারি করা হয়। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ বিধিমালা বাতিলপূর্বক ২০১০ সালে নতুন বিধিমালা জারি করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের বিবর্তন

সময়	আইন/অধ্যাদেশ	স্থানীয় সরকার সংস্থা	গঠন
ব্রিটিশপূর্ব	নিজ ব্যবস্থাপনায়, আইনগত কোনো ভিত্তি ছিল না	গ্রামপর্যায়ে পঞ্চায়েত	কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত ৫জন
ব্রিটিশ	১. গ্রাম চৌকিদার আইন ১৮৭০	ইউনিয়ন পর্যায়ে পঞ্চায়েত	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়োগকৃত ৫ সদস্য
	২. বেঙ্গল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার আইন ১৮৮৫	ইউনিয়ন কমিটি, পাশাপাশি পঞ্চায়েতপ্রথা চালু	ইউনিয়নের বাসিন্দা কর্তৃক নির্বাচিত ৫-৯ সদস্য এবং সদস্যদের মধ্যে থেকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত। লে. গভর্নরকে ইউনিয়ন কমিটির কর্তৃত্ব প্রদান
	৩. বেঙ্গল স্বায়ত্ত শাসিত সরকার আইন ১৯১৯	চৌকিদার পঞ্চায়েত এবং ইউনিয়ন কমিটির পরিবর্তে ইউনিয়ন বোর্ড	৬-৯ সদস্যবিশিষ্ট ২-৩ ভাগ নির্ধারিত এবং ১-৩ ভাগ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত। সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নিজেদের মধ্য হতে একজন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

সময়	আইন/অধ্যাদেশ	স্থানীয় সরকার সংস্থা	গঠন
		প্রতিস্থাপন	
পাকিস্তান	মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯	ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তে ইউনিয়ন পরিষদ নামকরণ	ব্যালটের মাধ্যমে সরাসরি জনগণের ভোটে ১০-১৫ সদস্য নির্বাচন। সদস্যগণের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নির্বাচন।
বাংলাদেশ	১. রাষ্ট্রপতির আদেশ ৭/১৯৭২	ইউনিয়ন পরিষদের পরিবর্তে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত নামকরণ	প্রশাসক নিয়োগ
	২. রাষ্ট্রপতির আদেশ ২২/১৯৭২	পুনঃ ইউনিয়ন পরিষদের নামকরণ	১জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রতি ওয়ার্ড হতে ৩জন করে ৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন।
	৩. স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৭৬	ইউনিয়ন পরিষদ	১জন চেয়ারম্যান, ৯জন সদস্য। (প্রতি ওয়ার্ড হতে ৩জন করে)। প্রত্যক্ষ ভোটে জনগণ কর্তৃক নির্বাচন। ২ জন মহিলা সদস্য ও ২জন কৃষক প্রতিনিধি মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত।
	৪. স্থানীয় সরকার (ইউপি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩	ইউনিয়ন পরিষদ	১জন চেয়ারম্যান, ৯জন সদস্য। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। ৩ জন মহিলা সদস্য মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত। তারপর উপজেলা পরিষদ ও সর্বশেষ জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত হতেন।
	৫. স্থানীয় সরকার (ইউপি) সংশোধন আইন, ১৯৯৩	ইউনিয়ন পরিষদ	১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সদস্য। (প্রতি ওয়ার্ড হতে ৩ জন করে) এবং ৩ জন মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত। সংরক্ষিত আসনের ৩জন মহিলা সদস্য ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কতৃক নির্বাচিত হতেন।
	৬. স্থানীয় সরকার (ইউপি) সংশোধন আইন, ১৯৯৭ (২য় সংশোধন)	ইউনিয়ন পরিষদ	১জন চেয়ারম্যান, ৯জন সদস্য, সংরক্ষিত আসন হতে ৩জন মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত। প্রতি ৩টি ওয়ার্ড হতে ১জন মহিলা সদস্য ইউনিয়নের ভোটারগণ কর্তৃক নির্বাচিত।

(সূত্র : পল্লী উন্নয়ন ওয়েবসাইট)

এলজিএসপি সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকার প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নে কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাচীনতম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী, কার্যকর ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ 'লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি)' সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের সাফল্য টেকসই ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার পাঁচ বছর (জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৬) মেয়াদি 'দ্বিতীয় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি : ২)' বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছিল, যা ইতোমধ্যেই সিলেট জেলায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে ৩য় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি – ৩, পরবর্তী পাঁচ বছর মেয়াদি, জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১) এর কাজ চলমান রয়েছে। জেলার ১০৫টি ইউনিয়ন পরিষদে এলজিএসপি – ৩ থেকে BBG (Basic Block Grant) ও PBG (Performance Based Grant) আকারে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন বলতে দেশের পল্লি এলাকার জীবনের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়ে থাকে। পল্লিউন্নয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে রয়েছে স্থানীয়ভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা। শহর এলাকার সাথে অনেক বিষয়ে মিল থাকলেও পল্লী এলাকার সঙ্গে একে-অপরের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে পল্লিউন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল ও রূপরেখা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত।

ভিলেজ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ববাংলা সরকার পল্লী এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশি দাতাদের সহযোগিতায় 'ভিলেজ এইড' নামে কর্মসূচি গ্রহণ করে। ভি-এইড কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন খাতে পল্লি এলাকায় উন্নয়নপ্রকল্প তৈরি ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা। সরকার প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে মাঠকর্মী নিয়োগ দেয়, যার দায়িত্ব ছিল এ প্রকল্পের ব্যাপারে পল্লি এলাকার জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। প্রকল্পটির সাথে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত না করার কারণে এ কর্মসূচি থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। অবশেষে ১৯৬২ সালে সরকার এ কর্মসূচি বাতিল করে এবং 'ওয়ার্কস প্রোগ্রাম' নামে একটি নতুন কর্মসূচি হাতে নেয়। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল রাস্তা, সেতু, কালভার্ট, বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং সেচব্যবস্থার জন্য খাল খনন ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা। এ নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারগুলোকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কারিগরি সহায়তা ও জনবল প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ছিল মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য বিশেষ করে গম বাজারদর থেকে কমমূল্যে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থে গ্রামীণ অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধের ব্যবস্থা করা। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের আওতায় যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় এগুলো ছিল

মাটির রাস্তা তৈরি, পুরোনো রাস্তা মেরামত, খাল খনন এবং বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের পল্লিউন্নয়নের সূতিকাগার হিসেবে খ্যাত বার্ড (বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপম্যান্ট)-এ পল্লিউন্নয়নের জন্য পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালানো হয়। আইসিএস অফিসার ড. আখতার হামিদ খান কুমিল্লা বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে ১৯৫৮ সালে দায়িত্ব নিয়ে পল্লিউন্নয়নের জন্য মূলত ৪টি উপাদান সমন্বিত কুমিল্লা মডেল প্রবর্তন করেন। এটি পরবর্তীকালে পৃথিবীব্যাপী পল্লিউন্নয়নের মডেল হিসেবে সমাদৃত হয়।

সবার জন্য বিদ্যুৎ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের বিশেষ ১০ টি উদ্যোগের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এটি বর্তমান সরকারের একটি বিরাট সাফল্য। এতোদ্দেশ্যে সরকার ‘সবার জন্য বিদ্যুৎ’ প্রকল্প গ্রহণ করে। সে ধারাবাহিকতায় সিলেট জেলায়ও ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি-১৬৫
২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের তথ্যাদি

প্রকল্পের নাম	নির্ণায়ক	তথ্য	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ	সুবিধাভোগীর সংখ্যা
সবার জন্য বিদ্যুৎ	মোট বিদ্যুৎ লাইন বিস্তৃত	১২,৯২২ কি.মি	৫৮৭.৪৮ কোটি	১৬,৩৬,৫৫৩ জন (প্রায়)
	বিদ্যুতের চাহিদা	২৩৫ মে: ও: (প্রায়)	-	১৩,০৪,০০০ জন (প্রায়)
	বিদ্যুৎ গ্রাহক/ভোক্তার সংখ্যা	৬৪৪,৭৪৪ মে.ও.(প্রায়)	-	১৩,০৪,০০০ জন (প্রায়)
	বিদ্যুৎ সরবরাহ	২৩৫ মে. ও. (প্রায়)	৮০ কোটি	১৬,৩৬,৫০৩ জন (প্রায়)

জেলার কার্যক্রম

১৯৭২ সালে সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলায় প্রথম আইআরডিপি (ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭৩ সালে সিলেট সদর উপজেলায় আইআরডিপি কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে এক এক করে অন্যান্য উপজেলায় আইআরডিপির কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৯৮২ সালে আইআরডিপির কার্যক্রম বিআরডিবিতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে সিলেট জেলার সকল উপজেলায় (বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড) বিআরডিবি’র কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিলেট জেলায় বিআরডিবি’র কার্যক্রমের তথ্য সারণিতে উপস্থাপন করা হলো :

সারণি-১৬৬

জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি (৩০ জুন ২০১৭)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	উপজেলার সংখ্যা	সমিতি/ দল গঠন	সদস্য সংখ্যা	মূলধন গঠন (লাখ টাকায়)		
					শেয়ার জমা	সঞ্চয় জমা	মোট
১	ইউসিসিএভিত্তিক কার্যক্রম	১২	১১১৪	২৪৮০৬	৫৬.২০	১৮৯.৩৩	২৪৫.৫৩
২	ঘূর্ণায়মান কৃষিঋণ কর্মসূচি (আবর্তক)	১২	০০	০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩	পল্লি জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ)	১০	৯১৮	২৬,৪৭৫	৩৫.৮৩	২২৭.৪৩	২৬৩.২৬
৪	পল্লি প্রগতি প্রকল্প (পপ্রপ্র)	১২	১২০	২,৮৬৮	০.০০	১২.৪৫	১২.৪৫
৫	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	১০	২৮৮	৬,১৩৭	০.০০	৪.০১	৪৭.০১
৬	মহিলা উন্নয়ন অণুবিভাগ (মউ)	০১	৪৮	২,১৪২	১৫.২৪	৪১.২০	৫৬.৪৪
৭	পল্লি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	০১	১০৪	১,৯৭৮	০.০০	১৪.১৬	১৪.১৬
৮	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	১২	০০	২৬১	০.০০	১৫.২৮	১৫.২৮
৯	সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে কৃষিজমি আবাদকরণ	০৭	০০	০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০	অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	০৬	৮৫	২,১৩২	০.০০	২.৯৬	২.৯৬
১১	গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প	০১	০২	৮৪	০.০০	০.৮৯	০.৮৯
	মোট	১২	২৬৭৯	৬৬,৮৮৩	১০৭.২৭	৫৫০.৭১	৬৫৭.৯৮

উৎস : উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন

২০০০ সাল হতে বিআরডিবি একটি বৃহৎ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একত্র করে বিত্তহীন পুরুষ ও বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতি সংগঠিত করে উপজেলাপর্যায়ে উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লি. গঠন করেছে। দক্ষিণ সুরমা নতুন উপজেলা হওয়ায় এবং জৈন্তাপুরে পল্লিদারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি নামে একটি প্রকল্প থাকায় এ দুটি উপজেলা ছাড়া বাকি ১০টি উপজেলায় পল্লি জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ)-এর কার্যক্রম চলছে। উপজেলাভিত্তিক তথ্য ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-১৬৭

পল্লি জীবিকায়ন প্রকল্পের তথ্য, ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত (লাখ টাকায়)

ক্র. নং	উপজেলার নাম	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	শেয়ার জমা	সঞ্চয় জমা	ঋণ বিতরণ	আদায়যোগ্য ঋণ	ঋণ আদায়	হার	মন্তব্য
১	বালাগঞ্জ	১০৪	২৭৭৬	৩.৮০	২৭.৭৪	৪৮৫.৩৬	৪৮৫.৩৬	৪২১.৭৮	৮৭%	
২	সিলেট সদর	১০০	৩২৪১	৩.০৫	২৩.৬৪	৮৩৪.৪২	৮১৭.২৭	৭৪৫.৬৯	৯১%	
৩	কোম্পানীগঞ্জ	৯৮	২৬৭৯	৩.৮৫	৩০.৬৪	১০০৬.৫২	১০০৬.৫২	৯১৬.৪৬	৯১%	
৪	গোয়াইনঘাট	৯৪	২৬৮৩	২.৪৫	১৮.৫৮	৪২৯.৬২	৪২৯.৬২	৩৭৯.১১	৮৮%	
৫	কানাইঘাট	৭৫	২৫৩৪	২.১২	১২.০৩	২৮৬.১২	২৮৬.১২	২১৮.৫৭	৭৬%	

৬	গোলাপগঞ্জ	৮৫	২১৬৩	২.৬৫	২২.৭৫	৬৮৫.৯৯	৬৮৫.৯৯	৬০৩.০৩	৮৮%	
৭	বিশ্বনাথ	৮৪	২২৮৩	৪.৬২	১৮.৩৭	৫০৪.৩৬	৫০৪.৩৬	৪০৪.১৬	৮০%	
৮	ফেঞ্চুগঞ্জ	৯৩	৩০১৫	৪.৯৩	২৪.৭৪	১১০৭.৩২	৯৯৭.৮৮	৯৫৪.৭১	৯৬%	
৯	বিয়ানীবাজার	৯০	২৩৫৩	৩.২২	১৭.৩৫	৫৪৭.৮২	৫৪৭.৮২	৪৫৯.২৮	৮৪%	
১০	জকিগঞ্জ	৯৫	২৭৪৮	৫.১৪	৩১.৫৯	৭২১.৮৩	৬৮৬.১৮	৬৩৫.৫০	৯৩%	
	মোট	৯১৮	২৬৪৭৫	৩৫.৮৩	২২৭.৪৩	৬৬০৯.৩৬	৬৪৪৭.১২	৫৭৩৮.২৯	৮৯%	

উৎস : উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি উদ্যোগের মধ্যে এটি একটি বিশেষ **সামাজিক** উদ্যোগ। সিলেট জেলায় ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা **নিরাপত্তা বেষ্টনী** বেষ্টনী কার্যক্রম নিম্নরূপ:

সারণি-১৬৮
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমসমূহ

প্রকল্পের নাম	নির্ণায়ক	তথ্য (মাসিক ভাতার হার)	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ	সুবিধাভোগীর সংখ্যা
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী	বয়স্ক ভাতা	৫০০	৪৪৮৩৮৬০০০	৭৪৭৩১ জন
	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুঃস্থ মহিলা ভাতা	৫০০	১২৮৫৫০০০০	২১৪২৫ জন
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	৭০০	১৩৮৯১০৮০০	১৬৫৩৭ জন
	হিজড়া (বয়স্ক) বিশেষ ভাতা	৫০০	১৩৮০০০	২৩ জন
	বেদে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা	৫০০	১৬৮০০০০	২৮০ জন
	প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি	প্রাথমিক স্তর-৫০০	৭১২৮০০০	১১৮৮ জন
		মাধ্যমিক স্তর-৬০০	১৮৬৪৮০০	২৫৯ জন
		উচ্চ মাধ্যমিক স্তর-৭০০	৬৪৬৮০০	২৫৯ জন
		উচ্চতর স্তর-১২০০	৫৪৭২০০	৩৮ জন
	হিজড়া শিক্ষা	প্রাথমিক স্তর-৩০০	৯৩৬০০	২৬ জন
		মাধ্যমিক স্তর-৪৫০	৫৩৬০	০৭ জন
		উচ্চ মাধ্যমিক স্তর-৬০০	১৪৪০০	০২ জন
		উচ্চতর স্তর-১০০০	২৪০০০	০২ জন
	বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি	প্রাথমিক স্তর-৩০০	২১৬০০০	৬০ জন
		মাধ্যমিক স্তর-৪৫০	১১৩৪০০	২১ জন
		উচ্চ মাধ্যমিক স্তর-৬০০	৬৪৮০০	০৯ জন
		উচ্চতর স্তর-১০০০	৪৮০০০	০৪ জন
	ভিজিডি কর্মসূচি (ইউনিয়ন পর্যায়ে)	প্রতিমাসে ৩০ কেজি হারে ০২ বছর চক্রে চাল/গম বিতরণ করা হয় ও সচেতনতামূলক		২৫৯৯ জন

প্রকল্পের নাম	নির্ণায়ক	তথ্য (মাসিক ভাতার হার)	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ	সুবিধাভোগীর সংখ্যা
		প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়		
	দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি (ইউনিয়ন পর্যায়ে)	প্রতিমাসে ৫০০ টাকা হারে		৩৪৮০ জন
	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি (সিলেট সিটি কর্পোরেশন)	প্রতিমাসে ৫০০ টাকা হারে		৬৫০০ জন

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প (এবাএখা) একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে একটি শীর্ষ অগ্রাধিকারমূলক জীবিকাভিত্তিক বিমোচন কর্মসূচি। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন-প্রসূত একটি উদ্যোগ। এটি দরিদ্র জনগোষ্টির নিজস্ব তহবিল, জীবিকা এবং স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিত করার প্রয়াস। উক্ত প্রকল্প সুষ্ঠু ভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন মডেল প্রণয়ন করা হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোগ হিসেবে স্বীকৃত এবং পরিচিত (মডেল-১)। এ পদ্ধতি অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি-২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সময়ের ব্যাপার মাত্র। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সকল দরিদ্র্য, হতদরিদ্র এবং ভিক্ষুক পরিবারকে প্রকল্পভূক্ত করে দরিদ্র মানুষের স্থায়ী বিমোচন অর্থাৎ দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নতুনভাবে গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে গরিব ও ভিক্ষুক উপকারভোগীর স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিতকরণের জন্য জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে একটি বাড়ি একটি খামার (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প জেলার ১৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলায় উপকারভোগীদের মধ্যে সম্পদ হস্তান্তর করা হয়। অর্থাৎ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় ১২০০ জনকে গরু, ৫২৮ জনকে ঢেউটিন, ২৪০ জনকে হাঁসমুরগি, ৪৫০ জনকে গাছের চারা ও ৬২০ জনকে বীজ বিতরণ করা হয়। এর সাথে সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে সদস্যদের পুঁজি গঠনের অভ্যাস তৈরি করে দেওয়া হয়। সরকার মাসে ২০০ টাকা সঞ্চয় জমাদানকারী সদস্যদের উৎসাহ সঞ্চয় বাবদ মাসিক সর্বোচ্চ ২০০ টাকা প্রদান করেছেন। তাতে করে সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলায় জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা হয়েছে ১৫৬.৭৭ লাখ টাকা এবং উৎসাহ সঞ্চয় প্রদান করা হয়েছে ১৩১.৮২ লাখ টাকা, যা একত্রে ২৮৮.৫৯ লাখ টাকা। এতে সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলার ৯২০টি সমিতির ৪৫২৩১ জন সদস্যের মোট ৫৬৫.২৪ লাখ টাকা পুঁজি/মূলধন গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। এর

মধ্যে বিনিয়োগ হয়েছে ৪৯২.৭৮ লাখ টাকা। সদস্যদের বাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার স্থাপিত হয়েছে ৪২৫৭৫টি।

সারণি-১৬৯

একটি বাড়ি একটি খামার (২য় সংশোধিত) প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

ক্র. নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৯৪৫	৯২০
২	সদস্য অন্তর্ভুক্তি (সংখ্যা)	৫৬৭০০	৪৫২৩১
৩	ব্যক্তি সঞ্চয় জমা (লাখ টাকা)	২৭২১.৬০	১৫৬.৭৭
৪	উৎসাহ বোনাস প্রদান (লাখ টাকা)	২৭২১.৬০	১৩১.৮২
৫	অনুদান হিসেবে আবর্তক তহবিল প্রদান (লাখ টাকা)	২৮৩৫.০০	২৫১.৪৬
৬	সমিতির মোট তহবিল (লাখ টাকা)	৮২৭৮.২০	৫৬৫.২৪
৭	বিনিয়োগের পরিমাণ (লাখ টাকা)		৪৯২.৭৮
৮	গড়েওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামারের সংখ্যা		৪২৫৭৫

এ প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলায় ২০১৭ পর্যন্ত সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৭১৩টি এবং এগুলোর সদস্যসংখ্যা ৭৩,২৭৮জন। এতে ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ হলো ৬২৬৬.০০ লাখ টাকা এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩,৬৬,০০০জন।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সৃজন:

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত দারিদ্র্য বিমোচনে সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্প। মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক চাহিদা ও প্রকল্পের মডেলে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া এবং সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি স্থায়ী কাঠামোতে রূপদানের জন্য সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪-এর বিধান অনুযায়ী ৩১/০৮/২০১৪ তারিখে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। ব্যাংকটির কার্যক্রম গত ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হওয়ার সাথে সাথে শুরু হওয়ার কথা ছিল। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সকল দরিদ্র, হতদরিদ্র্য এবং ভিক্ষুক পরিবারকে প্রকল্পভূক্ত করে দরিদ্র মানুষের স্থায়ী বিমোচনের লক্ষ্যে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম বৃদ্ধি করায় প্রকল্প এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রম একইসাথে চলমান রাখার স্বার্থে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের আইন সংশোধন করে গত ২১.১১.২০১৬ তারিখে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধনী) অধ্যাদেশ জারি করা হয় যা গত ০৮.১২.২০১৬ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে আইন হিসেবে পাস হয়। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রম সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলায় চলমান রয়েছে।

দি সিলেট কো-অপারেটিভ টাউন ব্যাংক লি. ১৯০৫ সালে ডেপুটি কমিশনার S.G.Hart, I.C.S-এর উদ্যোগে সিলেটের টাউন হলে সিলেট জেলায় কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য প্রায় ২০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় আসামের সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রার রায়বাহাদুর বি.সি বসু উপস্থিত ছিলেন সেখানে সমবায় সমিতি গঠনের নীতিমালা, পদ্ধতি এবং উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯০৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সিলেট কো-অপারেটিভ টাউন ব্যাংক লি. নামে সমিতিটি নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর ১৩ ডিসেম্বর ১৯৫২ তারিখে নিবন্ধন নং-৮ এবং ২৭ জুলাই ২০০৮ তারিখে নিবন্ধন নং ৭১৫/(২) মূলে সমিতির উপআইন সংশোধন করা হয়। সমিতিটি নিবন্ধনের উদ্দেশ্য হলো: সমিতির সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা, সহজ শর্তে সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদন করা, সমিতির সদস্য ও সদস্যদের বাইরে প্রয়োজন অনুসারে আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদান করা, সমিতির মৃত সদস্যদের পরিবারবর্গকে সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি।

সমিতির পুঁজিগঠনের মূল উৎস ছিল সদস্যদের শেয়ার মূলধন, প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ছিল ১০ রুপি। সিলেট শহরে বসবাসরত বাসিন্দারা সমিতির সদস্য হতো। সমিতির দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমিতির নিবন্ধনকালীন ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি ছিলেন সুখময় চৌধুরী। মুহেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন সেক্রেটারি । বর্তমানে সমিতির কার্যালয় সমবায় ভবন, পুরান লেইন, জিন্দাবাজার এ অবস্থিত। সমিতির সদস্য সংখ্যা ১২৭ জন এবং আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমান ২,৯৯,২৩০.০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ১১০,৪৯২.০০ টাকা। সমিতি আসাম সরকার থেকে একুইজিশনের মাধ্যমে বিগত ২৯ মার্চ ১৯২১ এবং ১০ মে ১৯২২ তারিখে মোট ১৮ কাঠা ৯ ছটাক ভূমি পায়। বর্তমানে সেখানে ১৬০টি দোকানঘর রয়েছে।

সিলেট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি. কৃষ্ণচন্দ্র দাসসহ মোট ১২জন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আসামের সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রার কর্তৃক ১৯২৩ সালের ২৩ মার্চ 'নর্থ সিলেট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকিং ইউনিয়ন লি.' নামে সমিতিটি নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়, যার নিবন্ধন নং-০৪/১৯২২-২৩। পরবর্তীকালে সমিতির উপআইন আসামের রেজিস্ট্রার আরএন ফুকান কর্তৃক ১৯২৮ সালের ২১ মার্চ সংশোধিত হয়ে সিলেট কো-অপারেটিভ সেন্ট্রাল ব্যাংক নামকরণ করা হয়। সমিতির নিবন্ধনকালে সদস্য ভর্তি ফি ছিল ০১ রুপি এবং সদস্য সমিতির ভর্তি ফি ০৫ রুপি। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ২০ রুপি। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সমিতির সদস্যদের মধ্যে ঋণ দানের জন্য প্রাথমিকভাবে পুঁজি গঠন, সমিতি সংগঠন এবং সমিতি পরিচালনায় সহযোগিতা, সমিতির পাট ব্যবসা—ক্রয়, মজুদ, বিক্রয় ইত্যাদিসহ অন্যান্য ব্যবসা গ্রহণ করা। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক হতে প্রাথমিক সমবায় সমিতিকে কৃষিঋণ দেওয়া হতো।

সিলেটের প্রাণকেন্দ্র জেল রোড কর্নারে নয়া সড়কে 'সিলেট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি.' অবস্থিত। এর অধীনে ৫৫৯টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি রয়েছে। সিলেট সিটি করপোরেশনের নয়া সড়কস্থ এলাকায় প্রতিষ্ঠানটির ০.১৩৬২ শতক ভূমিতে দ্বিতল ভবন অবস্থিত এবং উক্ত ভবনের নিচতলায় ব্যাংক ভবন অবস্থিত। উক্ত ব্যাংকের অর্থ সরবরাহকারী সংস্থা বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি., ঢাকা। শুরু থেকেই সিলেট জেলায় কৃষকদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে তা মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও বর্তমানে সরকারি আর্থিক সহযোগিতার অভাবে ঋণ কার্যক্রম প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে।

২০১৬-২০১৭ সালের বার্ষিক অডিট প্রতিবেদনের আলোকে সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ৯,১৯,৯৩৮.৫০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৭,৫১,৮৭৫.৯৮ টাকা। সদস্যদের মধ্যে ২৪,১৫,৫০৮.৩৮টাকা কর্জ দেওয়া হয়েছে। উক্ত সমিতিতে মোট ২ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লি.

কৃষকদের কৃষিঋণ সহজভাবে পাওয়ার লক্ষ্যে সিলেট শহরের জিন্দাবাজার ১৫ মে ১৯২৭ তারিখে 'সিলেট সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্তমানে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক নামে নামকরণ করা হয়েছে। উক্ত ব্যাংকের মোট সদস্য সংখ্যা ৩৫৭। সদস্যদের জমি বন্ধক রেখে সদস্যদের মধ্যেই ঋণ দেওয়া ব্যাংকের প্রধান কাজ। উক্ত সমিতির অর্থ সরবরাহকারী সংস্থা বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি., ঢাকা। সমিতিটি ৯ সদস্যবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত সমিতিতে ১জন ম্যানেজারসহ মোট ৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছেন।

সিলেট কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন লিমিটেড

১৯৪৫ সালে এ দেশে তাঁতি সম্প্রদায়ের সমবায় সমিতি গঠনের রেওয়াজ প্রবর্তিত হলে সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে তাঁতি বা তন্তুবায় সমবায় সমিতি গঠিত হয়। সিলেট জেলার তাঁতিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এসব তাঁতি সমবায়ীগণের সহযোগিতা দেওয়ার জন্য ৩১ মার্চ ১৯৬৩ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয় সিলেট কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন লিমিটেড। এর অধীনে ৪৯টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি রয়েছে। সমিতির নামে সিলেট সিটি করপোরেশনের অন্তর্গত মিরাবাজারের আগপাড়া এলাকায় ০.৪৪ শতক ভূমিতে টিনশেডের ০৩ টি পাকা ঘর রয়েছে। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সিলেট জেলার তাঁতিদের জন্য তাঁত ও সুতা সরবরাহ করলেও সরকারি আর্থিক সহযোগিতার অভাবে বর্তমানে এটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে।

সিলেট কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি লি.

সিলেট জেলার কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নিম্ন মধ্যবিত্তদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৮.০৭.১৯৬৫ তারিখে সিলেট কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। সিলেট শহরের মুমিনখলায় সমিতিটি অবস্থিত। এর অধীনে ১৪২টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি রয়েছে। এ সমিতির নামে মৌলভীবাজার রোডস্থ সড়ক ও জনপদরাস্তার পার্শ্বে ১৫ শতাংশ জমিতে দালানকোঠা ও গুদামঘর রয়েছে। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সিলেট জেলার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে

টিসিবির মাধ্যমে কাপড়, সাবান, চাল ও সুপারি বিক্রি করলেও সরকারি আর্থিক সহযোগিতার অভাবে বর্তমানে এটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ৯,৩৪০/- টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ১৪২০/৪৫ টাকা।

কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. জেলার মৎস্যজীবীদের কল্যাণে জেলাব্যাপী গড়ে তোলা হয়েছিল অনেকগুলো মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি এবং এসব সমিতির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তাদানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। এসব সমিতি স্থানীয়ভাবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। দেশের পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মূলত প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোকে একত্রে সংগঠিত করে মৎস্য উৎপাদনে ক্ষুদ্রঋণ, জলমহাল বন্দোবস্ত গ্রহণ ও অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সিলেট জেলার বালাগঞ্জ, সিলেট সদর, বিয়ানীবাজার এই ৩টি উপজেলায় ৩টি কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে। বর্তমানে সরকারি আর্থিক সহযোগিতার অভাবে ঋণ কার্যক্রম প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে।

জেলা সমবায় অফিস সমবায় সমিতির নিবন্ধন, পরিদর্শন, নির্বাচন, কমিটি গঠন, বিরোধ নিষ্পত্তি, অবসায়ন কার্যক্রম, নিরীক্ষা কার্যক্রম, সমিতির বাজেট অনুমোদনসহ জেলার সমবায় সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য১৯৪৯ সালে সিলেট জেলা সমবায় অফিসের যাত্রা শুরু হয়। সহকারী নিবন্ধক' সমবায় সমিতিসমূহের প্রধান ছিলেন। ১৯৮৩ সালে সহকারী নিবন্ধক পদের পরিবর্তে 'জেলা সমবায় অফিসার' পদ সৃষ্টি করা হয়।

বর্তমানে সিলেট জেলার ১২টি উপজেলায় সমবায় কার্যালয় রয়েছে যার প্রধান হিসেবে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ১ এপ্রিল বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, সিলেটের কার্যক্রম শুরু হয় যার প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন একজন যুগ্মনিবন্ধক।

সিলেটে সমবায়ের বর্তমান অবস্থা (মার্চ ২০১৮) :

সিলেট জেলার সমবায়-সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য হলো : ১. প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা: ৩,৫৮৭টি। (সাধারণ: ১,৯০৯টি; বিআরডিবিভুক্ত: ১,৬৭৮টি); ২. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা: ২৮টি। (সাধারণ : ৬টি; বিআরডিবিভুক্ত : ২২টি); ৩. সিভিডিপি সমবায় সমিতির সংখ্যা: ১৪৪টি (এলজিইডি প্রকল্পভুক্ত ৫টি); ৪. আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির সংখ্যা: ০৭টি (আশ্রয়ণ ২টি; ফেইজ ২-৫টি); ৫. সমবায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা: ১৪৩,২৮৭ জন (পুরুষ: ১০৯,১৬০ জন; মহিলা: ৩৪,১২৭ জন); ৬. সফল সমবায় সমিতির সংখ্যা : ৫৩টি; ৭. মডেল সমবায় সমিতির সংখ্যা: ৩০টি; ৮. সমবায় সমিতির মোট শেয়ার মূলধন ১২৮৩.৭১ (লাখ টাকায়) টাকা; ৯. সমবায় সমিতির মোট সঞ্চয়

আমানত ২,৪৯১.৭১ (লাখ টাকায়) টাকা; ১০. সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধন : ৬,৩২৯.৮৭ (লাখ টাকায়) টাকা; ১১. সমবায় সমিতিসমূহের স্থাবর সম্পদের পরিমাণ ১,০৭০.৪১ (লাখ টাকায়) টাকা; ১২. সমবায় সমিতিসমূহের অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৩,৪৬৪.২৮ (লাখ টাকায়) টাকা; ১৩. সমবায়সমিতির দ্বারা পরিশোধিত অডিট ফির পরিমাণ (সরকারি রাজস্ব) (২০১৫-২০১৬ সালে) ০৪.৭৮ (লাখ টাকায়) ১৪. সমবায় সমিতির দ্বারা পরিশোধিত সমবায় উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ (২০১৫-২০১৬ সালে): ০৪.৮০ (লাখ টাকায়) ১৫. সমবায় সমিতির দ্বারা সৃষ্ট কর্মসংস্থান: (ক) প্রত্যক্ষ: ৬১৬ জন। (খ) আত্ম-কর্মসংস্থান: ৪,৭৮৪ জন; (গ) পরোক্ষ কর্মসংস্থান: ৫,৬৪২ জন। (ঘ) উপকারভোগী সমবায়ীর সংখ্যা: ১০৪,৩৫৮ জন।

সিলেট জেলার ক্যাটাগরিভিত্তিক সমবায় সমিতির সংখ্যা হলো: ১. কৃষি/কৃষক সমবায় সমিতি ২৯টি; ২. মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষি সমবায় সমিতি ৩৭৬ টি; ৩. শ্রমজীবী সমবায় সমিতি ৬৫টি; ৪. ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি ১টি; ৫. তাঁতি সমবায় সমিতি ৬টি; ৬. ভূমিহীন সমবায় সমিতি ১৫টি; ৭. মহিলা সমবায় সমিতি ০৭ টি; ৮. অটোরিক্সা /অটো টেম্পো/টেক্সিক্যাব/মটর, ট্রাক বা ট্যাঙ্ক-লরি চালক সমবায় সমিতি ১১টি; ৯. হকার্স সমবায় সমিতি ৫টি; ১০. পরিবহন মালিক/শ্রমিক সমবায় সমিতি ৬টি; ১১. কর্মচারী সমবায় সমিতি ০৮টি; ১২. মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি ১১টি; ১৩. যুব সমবায় সমিতি ২৫টি; ১৪. পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ২৭ টি; ১৫. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি ৬৩ টি; ১৬. গৃহায়ন (হাউজিং) সমবায় সমিতি ০২টি; ১৭. দোকান মালিক/ব্যবসায়ী/মার্কেট সমবায় সমিতি ১৬৯ টি; ১৮. সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি ২০৫টি; ১৯. বহুমুখী সমবায় সমিতি ১৯৭ টি; (২০) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ০১টি; (২১) সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ১ টি; (২২) বিশেষায়িত সমবায় সমিতি (ক) জারা লেবু সমবায় সমিতি ১টি (জৈন্তাপুর); (খ) বাঁশ-বেত ১টি (সদর); এবং (২৩) বন সংরক্ষণ সমবায় সমিতি ৬টি; (২৪) সিআইজি সমবায় সমিতি ৩৯৬টি; (২৫) কৃষি সমবায় সমিতি ৫৫টি; (২৬) ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি ২৪ টি; (২৭) অন্যান্য সমবায় সমিতি ৪৯টি। (২৮) বিআরডিবি ভূক্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৬৭৮টি; (ক) কৃষক সমবায় সমিতি ৫২২টি; (খ) মহিলা সমবায় সমিতি ৪৫টি; (গ) বিত্তহীন সমবায় সমিতি ১৪১টি; (ঘ) মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি ৫৮টি; (ঙ) বিত্তহীন পুরুষ (পজীপ) সমবায় সমিতি ১৩৯টি; (চ) বিত্তহীন মহিলা (পজীপ) সমবায় সমিতি ৭৭৩টি।

এ জেলায় বিভিন্ন পেশাভিত্তিক এবং ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনাকারী অনেক সমবায় সমিতি রয়েছে। এসব সমিতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইস্টার্ন মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি. (সদর), সার্চ সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লি. (সদর), ন্যাশনাল বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. (সদর), একতা মহিলা সমবায় সমিতি লি. (সদর), বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ভোগ্যপণ্য, সঞ্চয় ও ঋণদান

সমবায় সমিতি লি. (সদর), অগ্রগামী বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. (সদর), শ্রীহট্ট আলোর দিশারী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি. (সদর), জেলা সমবায় কর্মকর্তা কর্মচারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. (সদর), জালালাবাদ গ্যাস কর্মচারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. (সদর), বাংলাদেশ ব্যাংক বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. (সদর), লাল বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি. (সদর), সোনার বাংলা বহুমুখী সমবায় সমিতি (জকিগঞ্জ), অগ্রগামী বহুমুখী সমবায় সমিতি (বিশ্বনাথ), রাইজিংসান বহুমুখী সমবায় সমিতি (জকিগঞ্জ), মানবকল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি. (জকিগঞ্জ), গোল্ডেন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি. (জকিগঞ্জ), সানরাইজ বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. (কানাইঘাট), শ্যামল বাংলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. (কানাইঘাট), দিগন্ত বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. (কানাইঘাট), ০৫ নং ফতেহপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. (জৈন্তাপুর), স্টোনক্রাশার সমবায় সমিতি লি. (জৈন্তাপুর), মিতালী বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. (বালাগঞ্জ) ইত্যাদি।

আশ্রয়ণ প্রকল্প এ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগের মধ্যে একটি। একটি সমাজের ভূমিহীন ও আশ্রয়হীনদের পুনর্গঠন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে সচেতন ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অধীনে আশ্রয়ণ প্রকল্প সমবায় সমিতিসমূহ সংগঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। সমবায় অধিদপ্তর উক্ত প্রকল্পে পুনর্বাসিতদের বেইজ লাইন সার্ভে, প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায়কার্য সম্পাদন করে আসছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা দিয়ে আসছে:

আশ্রয়ন প্রকল্প: ০৪টি (উপকৃত পরিবারের সংখ্যা-৪০০টি)
আশ্রয়ণ ফেইজ:২ (আবাসন প্রকল্প): ০৫টি (উপকৃত পরিবারের সংখ্যা-২৯০টি)
আদর্শগ্রাম প্রকল্প: ১১টি (উপকৃত পরিবারের সংখ্যা-৬৪১টি)
গুচ্ছ গ্রাম: ০২টি (উপকৃত পরিবারের সংখ্যা-৪০টি)

সারণি-১৭০

সিলেট জেলায় মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত মোট আশ্রয়ণ প্রকল্পের চিত্র

ক্র. নং	বিবরণ	আশ্রয়ণ	আশ্রয়ন (ফেইজ-২)	মোট
১	প্রকল্পভূক্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা	০১টি	০৫টি	০৬টি
২	মোট ব্যারাক সংখ্যা	১৬টি	২৯টি	৪৫টি
৩	পুনর্বাসিত পরিবার	১৬০	২৩০	৩৯০
৪	সদস্য সংখ্যা	৪০৬ জন	৩৬২ জন	৭৬৮ জন
৫	শেয়ার মূলধন	১৫৭৩০০/-	১৬১৭০/-	৩১৯০০/-

ক্র. নং	বিবরণ	আশ্রয়ণ	আশ্রয়ন (ফেইজ-২)	মোট
৬	সঞ্চয় আমানত	২০৮৯১২/-	২২৪৯০/-	২৩১৪০২/-
৭	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যসংখ্যা	৩৯৭জন	৩৭৬ জন	৭৭৩জন
৮	আবাসন থেকে বরাদ্দকৃত ঋণ	১৬০০০০০/-	১৮২০০০০/-	৩৪২০০০০/-
৯	বিতরণকৃত ঋণ(ক্রমপুঞ্জিভূত)	৫৭৫৪০০০/-	১২৪৬২০০/-	৭০০০২০০/-
১০	আদায়কৃত ঋণ	৪৩৯০১০০/-	৬৭১৫৪০/-	৫০৬১৬৪০/-
১১	ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১৫২ জন	৮২ জন	২৩৪ জন
১২	ব্যারাক ত্যাগকারী সদস্যের সংখ্যা	২২ জন	--	২২ জন

(সূত্র : জেলা সমবায় কার্যালয়, সিলেটের সংশ্লিষ্ট নথি)

সারণি-১৭১

সিলেট জেলায় ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট আশ্রয়ণ প্রকল্পের চিত্র

ক্র. নং	বিবরণ	আশ্রয়ণ	আশ্রয়ন (ফেইজ-২)	মোট
১	প্রকল্পভূক্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা	০১টি	০৫ টি	০৬টি
২	মোট ব্যারাক সংখ্যা	১৬টি	২৯ টি	৪৫টি
৩	পুনর্বাসিত পরিবার	১৬০	২৩০	৩৯০
৪	সদস্য সংখ্যা	৪০৬ জন	৩৭১ জন	৭৭৭ জন
৫	শেয়ার মূলধন	১৫,৮৩০/-	১৬,১৭০/-	৩২,০০০/-
৬	সঞ্চয় আমানত	২১০,৪১২/-	২২,৪৯০/-	২,৩২,৯০২/-
৭	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা	৩৯৭ জন	১৫০ জন	৫৪৭ জন
৮	আবাসন থেকে বরাদ্দকৃত ঋণ	১৬০০,০০০/-	১৮,২০,০০০/-	৩৪,২০,০০০/-
৯	বিতরণকৃত ঋণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	৫৮,০৪,০০০/-	১২,৪৬,২০০/-	৭০,৫০,২০০/-
১০	আদায়কৃত ঋণ	৪৫,৯৪,৮৬৮/-	৭,৬৭,৮৮০/-	৫৩,৬২,৭৪৮/-
১১	ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১৫২ জন	৮২ জন	২৩৪ জন
১২	ব্যারাক ত্যাগকারী সদস্যের সংখ্যা	১৭ জন	১১ জন	২৮ জন

(সূত্র : জেলা সমবায় কার্যালয়, সিলেটের সংশ্লিষ্ট নথি)

সমবায় বাজার কার্যক্রম

দেশের দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার সমবায় বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রির নির্ভরযোগ্য সংগঠন হিসেবে সমবায় সেক্টরকে চিহ্নিত করেছে। তার ফলে যখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাজার ব্যবস্থাপনায় ন্যায্যমূল্যের দোকান ও পণ্য বিক্রি বন্ধ হয় তখন সমবায় অধিদপ্তর এ দায়িত্ব পায়। সে আদলে সিলেট জেলায় ০২টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে জেলা ও উপজেলায় মোট ০২টি সমবায় বাজার চালু করা হয় এবং এসব বাজারের মাধ্যমে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করতে পারে। ফলে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। সমবায় বাজার চালুতে সমবায় সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। টিসিবি কর্তৃক ডিলারশিপ গ্রহণকারী সমবায় সমিতির সংখ্যা ৫টি।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমবায় সমিতির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের গঠনমূলক পরামর্শ প্রদানের জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনের পাশাপাশি প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষক দল রয়েছে। সিলেট জেলার ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষক দল সমবায় সমিতির সদস্যদের সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় দক্ষ নেতৃত্ব ও সমবায় সমিতির হিসাব সম্পর্কে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়াও এ দল গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতিতে গিয়ে হাঁস-মুরগি পালন ও গবাদি পশু পালন, বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচির আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এপ্রিল, ২০১৮ পর্যন্ত ৯০০ জন সমবায়ীকে সমবায় ব্যবস্থাপনা, সমবায় অর্থ ও হিসাব ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ ও গবাদি পশু পালন, স্যানিটেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায়-১৪

ঐতিহাসিকস্থান ও এলাকা এবং স্থাপত্য

এ জেলায় দর্শনীয় স্থান হলো হজরত শাহজালাল (র.) এর মাজার, হজরত শাহপরান (র.) এর মাজার, মালনীছড়া চা-বাগান, স্টার (তারাপুর) চা-বাগান, আলী বাহার চা-বাগান, লাক্কাতুরা চা-বাগান, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, এমসি কলেজ, যুগল টিলা, গিরিধারী মহোদয় মন্দির, নাজিমগড়, ওসমানী জাদুঘর, মিউজিয়ামস অব রাজাস, এডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ড, জাকারিয়া সিটি, মণিপুরি রাজবাড়ি, ওসমানী শিশু পার্ক, পর্যটন পার্ক, আলী আমজদের ঘড়ি, কিন ব্রিজ প্রভৃতি।

হজরত শাহজালাল (র.)-এর মাজার

হজরত শাহজালাল (র.)-এর দরগাহ দেখার জন্য শুধু সিলেটবাসীই নন, বাংলাদেশ, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের অনেক পুণ্যার্থী, ইতিহাসবিদ ভক্ত-পর্যটক ও গবেষক এই পবিত্র স্থানে আসেন। তাই দরগাহর কর্মকান্ডের পাশাপাশি দর্শনার্থীদের এই মিলনমেলাও একটি দর্শনযোগ্য ঘটনা বলে বিবেচিত।

প্রাপ্ত শিলালিপি অনুযায়ী হজরত শাহজালাল (র.)-এর সিলেট আগমনের তারিখ ৬৭১ হিজরি, তখন তাঁর বয়স ৩২ বছর। সিলেটে তিনি ৩৭ বছর অবস্থান করেন এবং ১৩৪০ সাল, ৭৪০ হিজরির ২০ জিলকদে তাঁর ওফাত ঘটে। সেই হিসেবে তাঁর জন্মতারিখ ১২৭১ সাল; ইতিহাসবিদ, গিবসের হিস্টরি অব ইয়ামেন ডাইনেস্টি গ্রন্থের বরাত দিয়ে কেউ কেউ বলেন যে ইয়ামেনের শাসক ওমর আশরাফ যখন হজরত শাহজালাল (র.)-কে ১২৯৬ সালে বিষ মেশানো শরবত দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর, সেই হিসেবে তাঁর জন্ম ১২৬৬, অন্য মতে ১১৯৬ সাল। এই অঞ্চলের জনশ্রুতিসহ অধিকাংশ চরিতগ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী তাঁর জন্ম হয়েছিল ইয়ামেনে, কিন্তু ঢাকা জাদুঘরে রক্ষিত ৯১১ সালে লিখিত হোসেন শাহী শিলালিপির তথ্য অনুযায়ী তাঁর জন্মস্থান তুরস্কের কুনিয়ায়।[১] হজরত শাহজালাল (র.) এর জন্মের আগেই পিতা এবং জন্মের তিন মাস পরে মাকে হারানোর পর তিনি তাঁর মামা সৌদি আরবের অধিবাসী বিশিষ্ট আলেম সৈয়দ আহমদ কবীর সুহরাওয়ার্দীর কাছে লালিত পালিত হন এবং তাঁকেই পির মেনে শরিয়ত ও মারিফত উভয় প্রকার জ্ঞান অর্জন করেন। *তারিখে জালালি* এর লেখক মুহম্মদ মবশ্বর আলি চৌধুরী লিখেছেন:

[১] শামসুল আলম, হজরত শায়খ জালাল কুনিয়াভি (র.) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ ৯।

তিনি এমনভাবে তাঁর ভাগ্নেকে বড়ো করে তুলতে চাইলেন যাতে তার জাহিরি ও বাতিনি জ্ঞান গভীর পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে। কার্যত তাই ঘটল। ধীরে ধীরে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পেতে শুরু করল।[২]

তারিখে জালালি এর বয়ান অনুযায়ী সৈয়দ আহমদ কবির তাঁর ভাগনেকে একটি বাঘের কাছ থেকে এক হরিণীর গৃহ উদ্ধার কাজের দায়িত্ব দেন এবং তাঁর কাজের সাফল্যে সন্তুষ্ট হন। এই ঘটনার উল্লেখ করে মবশ্বির আলি চৌধুরী লিখেছেন।

শিষ্যের নিরন্তর সাধনার ফলে গুরু-শিষ্যের মন এমন এক স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল যেখানে তারা ছিলেন একান্ত ও অভিন্ন। এরপর তিনি তাঁর ঘর থেকে একমুঠো মাটি এনে হজরত শাহজালাল (র.) এর হাতে দিয়ে বললেন 'বেরিয়ে পড়ো এবং যে মাটির সঙ্গে এই মাটির রূপ-রস-ঘ্রাণের সাদৃশ্য খুঁজে পাবে সেখানে এই মাটি ছড়িয়ে দিয়ে আস্তানা গাড়বে।'[৩] তারপর তিনি নানা ঘটনার শেষে রাজা গৌড়গোবিন্দকে পরাজিত করে রাজ্যভার সিকান্দর গাজির কাছে অর্পণ করেন এবং বর্তমানে যেখানে মাজার, সেখানকার মাটির সঙ্গে সেই একমুঠো মাটির বৈশিষ্ট্য মিলে যাওয়ায় এখানেই অবস্থান করেন।

হজরত শাহজালাল (র.) এর দরগাহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গেই দর্শনার্থীদের চোখে পড়বে জালালি কবুতরের ওড়াওড়ি আর কানে আসবে তাদের বাকবাকুম আওয়াজ। এগুলো হলো সেই একজোড়া কবুতরেরই বংশধর যে কবুতর দুটি দিল্লি থেকে আসার সময়ে হজরত শাহজালাল (র.) কে উপহার দিয়েছিলেন খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (র.)। সোজা সামনের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে দরগাহ মসজিদ, তার ডান পাশ দিয়ে টিলার ওপরস্থ মাজারে ওঠার সিঁড়িপথ। ডান দিকে মুখ করে তাকালে নজরে পড়বে ভক্তদের মানত ও দানগ্রহণের জন্য বড়ো-বড়ো ডেকচি, তারপর পুকুর। আর বামপাশে তাকালে দরগাহ টাইটেল মাদরাসা।

ডানপাশের এই পুকুরটি হলো সেই পুকুর যেখানে রয়েছে কৌতুহলী দর্শনার্থীদের প্রধান আকর্ষণ অসংখ্য গজার মাছ। ভক্তরা মাজারের পাশ থেকে ছোটোমাছ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য কিনে পুকুরে ফেলার অল্পক্ষণের মধ্যেই কালো কালো গজার মাছ ভেসে ওঠে এবং তা খেতে শুরু করে। ডানপাশে বড়ো বড়ো ডেকচিগুলোতে টাকার ছোটো-বড়ো নোট (টাকা) দেখা যায়, যেগুলো সাধারণত আগের মানত হিসেবে বা ভবিষ্যতের কোনো আশা পূরণের জন্য ভক্তরা দান করে থাকেন।

বামপাশের টাইটেল মাদরাসাটি হলো দেওবন্দি পরম্পরার শরিয়তানুসারী মাদরাসা। মাদরাসা প্রাঙ্গণ থেকে সামনের দিকে তাকালেই টিলার উপরে

---

[২] মৌলভি মুহম্মদ মবশ্বির আলি চৌধুরী, তারিখে জালালি (মোস্তাক আহমাদ দীন অনূদিত), উৎস প্রকাশনী, সিলেট, ২০০৩, পৃ. ১৬

[৩] মৌলভি মুহম্মদ মবশ্বির আলি চৌধুরী, তারিখে জালালি (মোস্তাক আহমাদ দীন অনূদিত), উৎস প্রকাশনী, সিলেট, ২০০৩, পৃ.১৮

নির্মিত মাজার এবং বামপার্শ্বের মসজিদটির ওপর চোখ পড়বে। মসজিদের পাকা ভবনটি ১৫৩১ সালে নির্মিত হয়, পরে ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মসজিদের সামনের অনেক ধাপযুক্ত সিঁড়ি মাড়িয়ে হলঘরের মধ্য দিয়ে ভক্ত ও প্রার্থনাকারীগণ চাদরঢাকা মাজার জিয়ারত করার জন্য সেখানে যান। এখানকার প্রবেশপথ ও প্রার্থনার স্থান সিলেটের কালেক্টর জন উইলিস (১৭৮৯-৯৩) তৈরি করে দিয়েছিলেন। হজরত শাহজালাল (র.) এর কবরের দক্ষিণপাশে রয়েছে তাঁর সফরসঙ্গী হাজি ইউসুফ, হাজি খলিল ও হাজি দরিয়ার কবর, আর পূর্ব ও পশ্চিম পাশে তাঁর আরেক সফরসঙ্গী ইয়ামনের রাজত্ব ত্যাগ করে আসা রাজপুত্র শেখ আলী ও সিলেটের একসময়কার প্রশাসক মকবুল খান উজির। এছাড়াও মাজারের পাশেই রয়েছে বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীসহ আরো অনেক গুণী ব্যক্তির কবর ।

এই দরগাহর উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যসমূহের মধ্যে বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট ইমারতটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেটি ১৬৬৭ সালে ফৌজদার ফরহাদ খান নির্মাণ করেন। গম্বুজের চারকোণে চারটি বুরুজ এবং খিলানে প্রবেশপথ রয়েছে। গম্বুজটি অষ্টভুজাকৃতি ড্রামের ওপর সংস্থাপিত এবং শীর্ষে কলস ফিনিয়াল।

দরগাহর মূল প্রবেশপথের উপরে যে শিলালিপি রয়েছে তাতে লেখা রয়েছে হজরত শাহজালাল (র.) এর হুকুমে খালিস খান ৯১১ হিজরিতে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে এই ইমারত নির্মাণ করেন।

দরগাহে যে চারটি শিলালিপি রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন শিলালিপিটিতে সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের সময়ে মজলিস উজির কর্তৃক একটি মসজিদ তৈরির তথ্য রয়েছে। এই শিলালিপিটি সূক্ষ্ম তুগরারীতিতে লেখা কিন্তু এর এক-তৃতীয়াংশ দেওয়াল তৈরির সময় মিশে গিয়েছিল, শিলালিপিটির পরিমাপ চার ফুট।

দরগার পশ্চিম দিকে রয়েছে রয়েছে আরেকটি দর্শনীয় স্থান তা হলো ঝরনা। ভক্তদের বিশ্বাস এই ঝরনার যোগ মক্কাশরিফের সঙ্গে আর সেজন্যই তার পানিও জমজমের পানির মতো পবিত্র ও সুমিষ্ট। এই ঝরনায় দেখা যায় সোনার অর্থাৎ সোনালি কই-মাগুর। এছাড়াও মাজারের অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু হলো হজরত হজরত শাহজালাল (র.) এর ব্যবহৃত খড়ম, তলোয়ার, খাবার পাত্র ও পেয়ালা।

হজরত শাহ পরান (র.)-এর মাজার

বর্তমানে হজরত শাহজালাল (র.) এর দরগাহর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সাপ্তাহিক ওরস, যেখানে বৃহত্তর সিলেটের অনেক বাউলফকির আসেন, এসে গান করেন।

যে-সকল পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থী হজরত শাহজালাল (র.) এর দরগায় আসেন তারা তাঁর সফরসঙ্গী ও আত্মীয় হজরত শাহপরান (র.) এর মাজার জিয়ারত করেন না এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে। হজরত শাহজালাল (র.) এর দরগাহ থেকে বের

হয়েই পাওয়া যায় খাদিমপাড়াস্থ শাহপরান (র.) এর মাজারে যাওয়ার নানারকম যানবাহন, কেননা পুণ্যার্থীরা এখান থেকে বের হয়েই সেখানে যেতে চান। এর কারণও আছে। শাহপরান ছিলেন হজরত শাহজালাল (র.) এর ভাগনে, এছাড়া জালালি কবুতরের সঙ্গে হজরত শাহপরান (র.) এর অতিলৌকিক কর্মকাণ্ডের কাহিনিও এই অঞ্চলে প্রচলিত। দরগাহে ঢুকেই লোকেরা যখন জালালি কবুতর দেখে তখন কারো না কারো কাছ থেকে সেই কাহিনিটাও শুনে ফেলেন। এ-বিষয়ে হজরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন:

কথিত আছে তিনি প্রত্যহ দরগার একটি কবুতর খেয়ে তার পালক নিজের ঝুলিতে রাখতেন। পরে একদিন হজরত শাহজালাল (র. কবুতরের সংখ্যা কম দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি পালকগুলো উড়িয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে পালকগুলো কবুতর হয়ে যায়। তাঁর অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখে হজরত শাহজালাল (র.) তাঁকে শহরের বাইরে অন্যত্র অবস্থান করতে বলেন।[৪]

কথিত রয়েছে যে, হজরত শাহপরান (র.) এর এই অলৌকিক কর্মে চিন্তিত হয়ে হজরত শাহজালাল (র.) তাঁকে বললেন যে, এভাবে সাধারণ লোকের সামনে কেরামত প্রদর্শন ঠিক নয়, কারণ সবাই তার মর্মার্থ বুঝতে পারবে না, তাই এতে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে বেশি; এরপর তাঁকে শহর থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে তৎকালীন দক্ষিণ কাছ পরগনায় খাদিমনগরে একটি ছোটো ঘর তৈরি করে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের নির্দেশ দেন। মামার নির্দেশমতো শাহপরান (র.) আজীবন সেখানেই অবস্থান করেন।

তাঁর মাজার বাজারের পাশেই একটি টিলার উপরে। এখানে হজরত শাহজালাল (র.) এর দরগাহর তুলনায় লোকসমাগম কম থাকায় পরিবেশও শান্ত ও মনোরম। মাজারের পাশেই রয়েছে অনেক পুরোনো একটি গাছ, যে গাছটি বহুদিন ধরে মাজারের ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে। মাজারের পাশেই রয়েছে একটি মসজিদ, যেটি সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। ওইখানে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুযায়ী সেই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতার নাম আব্দুল্লাহ। এই মসজিদটি আয়তাকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট, দেওয়াল চারফুট চওড়া। এর ভেতরভাগের উত্তর-দক্ষিণের মাপ ৩৯ ফুট আর পূর্বপশ্চিম ১২ ফুট। বহির্ভাগে চারকোণে চারটি অষ্টভুজাকৃতির পার্শ্ব বুরুজ এবং সেটি কার্নিশ পর্যন্ত ওঠে গেছে; শীর্ষভাগ ছত্রীসম্বলিত এবং তাতে রয়েছে পদ্মকলির ফিনিয়াল। পূর্ব ফাসাদে খিলানবিশিষ্ট ও আয়তাকৃতির বর্ডার-বেষ্টিত তিনটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। আয়তাকৃতির মসজিদটি আড়াআড়ি খিলানে তিনটি বে-তে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় বে-টি দু-পার্শ্বের বে থেকে বড়ো, এবং বর্গাকৃতির। কক্ষের একেকদিকের পরিমাপ

[৪] সৈয়দ মুর্তাজা আলী, হজরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২১।

১২ ফুট। পার্শ্বের বে দুটি আয়তাকৃতি এবং এগুলোর পরিমাপ ১২ ফুট। গম্বুজ তিনটির মধ্যে কেন্দ্রীয় গম্বুজটি বড়ো একটি দুর্গের উপরে অবস্থিত।

হজরত শাহপরান (র.) কত সালে জন্মগ্রহণ করেন তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেন না, তবু এখানে এই অনুমানের সুযোগ আছে যে, তিনি হজরত শাহজালাল (র.) এর সম বয়েসি না হলেও বেশি ছোটো হওয়ার কথা নয়। তাঁর বাড়ি ছিল বোখারায়, তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ, তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। শরিয়তি জ্ঞান অর্জন করার পর আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য তাঁর মধ্যে আকুলতার সৃষ্টি হয় এবং বোখারার নিশাপুরের আল আমিন নামের একজন দরবেশের কাছে সেই জ্ঞান অর্জন করেন। হজরত শাহজালাল (র.) এর ভারতযাত্রার কথা শুনে তিনি তাঁর সঙ্গী হন এবং নানা ঘটনার পরে সিলেটে পৌঁছে খাদিমনগরে অবস্থান নেওয়ার আগে হজরত শাহজালাল (র.) এর আদেশে ইটা, লংলা ও হবিগঞ্জে ধর্মপ্রচার করেন।

আলী আমজদের ঘড়ি

সুরমা নদীর ওপরে নির্মিত কিন ব্রিজের ওপর দিয়ে সিলেট শহরে ঢুকতে গেলে ব্রিজের মাঝপথে আসার পর সামনে তাকানোমাত্রই আলী আমজদের ঘড়ি ও ঘড়িঘরটি আগন্তকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং সময়-সুযোগে এর সময়নির্দেশক ঢং ঢং আওয়াজও তাদের সচকিত করবে। এই ঘড়িটি নিঃসন্দেহে এ-অঞ্চলের একজন সংস্কৃতিবান মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক।

লোকশ্রুতি রয়েছে, ঘড়িটি নির্মাণ করিয়েছিলেন লংলার জমিদার নবাব আলী আমজদ খাঁ, কিন্তু তা ঠিক নয়, কারণ এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৪ আর আলী আমজদ খাঁর জন্ম ১৮৭১; তবে একথা ঠিক যে, প্রতিষ্ঠাতা না হলেও এই ঘড়িটির সঙ্গে আলী আমজদের নাম সংগত কারণেই জড়িয়েই আছে, তাঁর তিন-চার বছরের বয়সে তাঁরই নামে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁর পিতা আলী আহমদ খাঁ। এই ঘড়ি প্রতিষ্ঠার আরেকটি উপলক্ষও রয়েছে। ১৮৭৪ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থ ব্রুকের সিলেট আগমন উপলক্ষ শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এই ঘড়ি স্থাপন ও সুরমাপাড়ে চাঁদনিঘাটের সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীকালে এ নিয়ে একাধিক সারিগানও লিখিত হয়েছে।[৫]

ওসমানীনগর উপজেলা

২০০১ সালের ২২ মার্চ বালাগঞ্জের ০৮টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হয় ওসমানীনগর থানা। ২০১৪ সালের ২১ অক্টোবর ওসমানীনগর থানা উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। বঙ্গবীর মো. আতাউল গণি ওসমানী'র নামানুসারে এই উপজেলার নাম ওসমানীনগর রাখা হয়েছে।

---

[৫] সৈয়দ মোস্তফা কামাল, সিলেট বিভাগের পরিচিতি, রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স, ২০০৪, পৃ. ২৯২-২৯৩ [তিনি এ-নিয়ে এই অঞ্চলের একটি সারিগানের উল্লেখ করেছেন : 'সুরমা গাঙের পুলের তলে চান্নিঘাটের সিঁড়ি/তার উপরে খাড়া দেখ আলী আমজদের ঘড়ি/কিরে হৈ হৈ হৈ হৈয়া'

এ উপজেলার আয়তন ২১২.৪৮ বর্গকিলোমিটার; জনসংখ্যা: ২,০১,৩৫৪ জন; এর মধ্যে পুরুষ ১,০০,০১৮ জন এবং মহিলা ১,০১,৩৩৬ জন; মুসলিম-১,৮৫,২৩৬ জন, হিন্দু-১৫,৯৯৬ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ইউনিয়ন সংখ্যা- ০৮টি, যথা: ১) বুরুঙ্গা ২) দয়ামীর ৩) গোয়ালাবাজার ৪) উমরপুর ৫) উসমানপুর ৬) পশ্চিম পৈলেনপুর, ৭) সাদিপুর, ৮) তাজপুর। গ্রামের সংখ্যা: ২৯৪।

এ উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১০৭টি। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়: ২৪টি (কিন্ডার গার্টেন, কমিউনিটি স্কুল, এনজিও পরিচালিত স্কুলসহ)। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ১৯টি। বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ: ১টি। বেসরকারি কলেজ: ৪টি। মাদরাসা: ৯টি। এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো তাজপুর ডিগ্রি কলেজ, গোয়ালাবাজার আদর্শ মহিলা কলেজ, মঙ্গালচন্ডী উচ্চবিদ্যালয়, বুরুঙ্গা ইকবাল আহমদ উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ।

এ উপজেলায় বৃহৎ কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই, তবে এই উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মানুষ বাঁশ ও বেতের নানারকম সরঞ্জাম তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

এই উপজেলার দর্শনীয় স্থান হলো বঙ্গাবীর মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী সাহেবের বাড়ি, বঙ্গাবীর আতাউল গণি ওসমানী এতিম খানা, ওসমানী পাঠাগার, বুরুঙ্গা প্রাচীর শিলালিপি, উসমানপুর প্রাচীন পাটা, কায়েরী মসজিদ, বরুঙ্গা গণকবর ইত্যাদি।

ওসমানী জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীর (১৯১৮-১৯৮১) কীর্তিকে স্মরণ করে ওসমানী জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ৪ মার্চ। উদ্বোধক ছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। সিলেটের নাইয়রপুলে অবস্থিত জেনারেল ওসমানীর বাসভবনে অবস্থিত জাদুঘরটি জাতীয় জাদুঘরের শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই ভবনটিকে ওসমানীর পরিবারের পক্ষ থেকে ‘জোবেদা খাতুন-খান বাহাদুর মফিজুর রহমান ট্রাস্ট’-এর কাছে হস্তান্তর করার পর জাতীয় জাদুঘর সেটি ৯৯ বছরের জন্য লিজ নেয়।

এতে মোট তিনটি গ্যালারি রয়েছে। এ জাদুঘরে জেনারেল ওসমানীর ব্যবহৃত কিছু চেয়ার-টেবিল, আলমারিতে রাখা কিছু বই, ব্যবহৃত কাপড়চোপড়, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কিছু চিত্র, মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র, বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া নানা জিনিস, ব্রিফকেস, সিঙ্গেল খাট, নামাজের চৌকি, বঙ্গাবীরকে দেওয়া মানপত্র, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারের মানপত্র, পাসপোর্ট, ব্যক্তিগত ব্যাজ ও তাঁর নিজের একাধিক আলোকচিত্র ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে।

পুরো সংগ্রহশালাটি দেখার পর যে কোনো মানুষের চোখে অকৃতদার ও দেশপ্রেমিক বঙ্গবীর এমএজি ওসমানীর অনাড়ম্বর জীবনযাপনের পরিচয় ফুটে উঠবে।

কানাইঘাট উপজেলা

জনশ্রুতি আছে যে, বর্তমান কানাইঘাট বাজারের তীরবর্তী সুরমা নদীর ঘাটে কানাই নামক একজন মাঝি ছিল এবং তার নামানুসারে নদীর ঘাটকে 'কানাইঘা' বলা হতো। এ থেকে উপজেলার নাম কানাইঘাট রাখা হয়েছে। মতান্তরে কানাইঘাট উপজেলার মূলাগুল এলাকার কানাই চৌধুরী নামে জৈন্তা রাজদরবারের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নামানুসারে কানাইঘাট উপজেলার নামকরণ করা হয়।

এই উপজেলার আয়তন ৩৯১.৭৯ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা: ২,৬৩,৯৬৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১,২৯,৩১৯ জন এবং মহিলা ১,৩৪,৬৫০ জন, মুসলিম- ২,৫৪,৯৪০ জন, হিন্দু-৮,৭৩০ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। পৌরসভা- ০১টি, কানাইঘাট পৌরসভা, ইউনিয়ন-০৯টি ১) লক্ষীপ্রসাদ পূর্ব ২) লক্ষীপ্রসাদ পশ্চিম ৩) দিঘীর পাড় ৪) সাতবাঁক ৫) বড়োচতুল ৬) কানাইঘাট ৭) দক্ষিণ বাণিগ্রাম ৮) ঝিংগাবাড়ী ৯) রাজাগঞ্জ, মহল্লা-২৯টি। গ্রাম-২৬৮টি।
এ উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১২৯টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪০টি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ১টি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ১৭টি, বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ- ৪টি, বেসরকারি কলেজ: ৩টি, মাদরাসা- ৪১টি। উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কানাইঘাট সরকারি উচ্চবিদ্যালয় বিখ্যাত। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯০৫ সাল। এটি সরকারিকরণ করা হয় ১৯৭৭ সালে। সরকারিকরণের পর থেকে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাওয়ায় এতে প্রতি বছর অনেক শিক্ষার্থী ভালো ফলাফল করে আসছে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি এ উপজেলার উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

এ উপজেলায় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। তবে কিছুসংখ্যক লোক বাঁশ ও বেতের বিভিন্ন ভৈজসপত্র তৈরি করে।

এ উপজেলায় দর্শনীয় স্থান হলো- ১. লোভাছড়া চা-বাগান। ২. লোভাছড়া পাথর কোয়ারি।

কিনব্রিজ

সিলেট শহরে সুরমা নদীর উপরে অবস্থিত এই ব্রিজের নির্মাণকাজ ১৯৩৩ সালে শুরু হয়ে ১৯৩৬ সালে শেষ হয়। এর দৈর্ঘ্য ১১৫০ ফুট আর প্রস্থ ২৭ ফুট। তৎকালীন সময়ে এর নির্মাণ ব্যয় ছিল ৫৬ লাখ টাকা। আবদুল হামিদ ও প্রমোদ দত্তের চেষ্টায় এই ব্রিজটি তৈরি হলেও আসামের তৎকালীন গভর্নর মাইকেল কিনের নামানুসারে এর নামকরণ হয়।[৬] ১৯৭১ সালে ব্রিজটির একাংশ নষ্ট হলে বাংলাদেশ রেলওয়ের অর্থায়নে ১৯৭৭ সালে এর সংস্কার হয়।

[৬] শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, 'সুরমা নদী', সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭১;

একসময় এই ব্রিজটিই ছিল যান-পারাপারের একমাত্র স্থলমাধ্যম, পরে সেটি দুর্বল হয়ে পড়ায় ১৯৮৪ সালে মেন্দিবাগ এলাকায় 'হজরত শাহজালাল সেতু' নামে আরেকটি ব্রিজ স্থাপিত হয়, বর্তমানে কাজির বাজারের ওপর দিয়ে আরেকটি ব্রিজ তৈরির কাজও সমাপ্ত। দেখতে খুব সুন্দর বলে সিলেটে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কিন ব্রিজটি পর্যটক ও সাধারণ যাত্রীদের আকৃষ্ট করে।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বর্তমান কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা হেডকোয়ার্টারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি বাংলো ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পাথর সংগ্রহের জন্য এ এলাকায় এসেছিল। পাথর সংগ্রহকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে এ এলাকায় 'গঞ্জ' নামে একটি বড়ো ব্যবসায়িক অঞ্চল গড়ে ওঠে। তাই বলা হয়ে থাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নাম থেকে 'কোম্পানি' ও 'গঞ্জ' এ দুইটি শব্দ থেকে কোম্পানীগঞ্জ গ্রামের নামকরণ করা হয়। এ গ্রামের নামানুসারে এ উপজেলার নাম কোম্পানীগঞ্জ রাখা হয় বলে ধারণা করা হয়।

এই উপজেলার আয়তন ২৯৬.৭৫ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ১,৭৪,০২৯ জন, এর মধ্যে পুরুষ ৮৯,৬৪৯ জন এবং মহিলা ৮৪,৩৮০ জন, মুসলিম-১৬০,৭৮২ জন, হিন্দু-১২,৯৫৪ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ইউনিয়নের সংখ্যা: ০৬টি-১) ইসলামপুর পশ্চিম, ২) ইসলামপুর পূর্ব, ৩) তেলিখাল, ৪) ইছাকলস ৫) উত্তর রণিখাই ৬) দক্ষিণ রণিখাই। গ্রামের সংখ্যা: ১৪৪টি।

এ উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৭০টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৪টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-২টি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-১১টি, বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ- ৩টি, বেসরকারি কলেজ: ১টি, দাখিল মাদরাসা- ০২টি, এবতেদায়ি মাদরাসা-০৩টি এ উপজেলায় উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে এম. সাইফুর রহমান ডিগ্রি কলেজ। এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মরহুম এম. সাইফুর রহমান এ কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ কলেজে ৮৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ১৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে।

এ উপজেলায় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। তবে এখান থেকে মূল্যবান খনিজ সম্পদ পাথর ও বালি সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখযোগ্য পাথরখনিগুলো হলো ভোলাগঞ্জ পাথরখনি, শাহ আরপিনটিলা পাথরখনি, উৎমাছড়া পাথরখনি। এই উপজেলার পাথরখনি হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাথর সরবরাহ করা হয়।

গিরিধারী মন্দির প্রায় ১৭ ফুট উঁচু এই মন্দিরটি ১৮ শতকে নির্মিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এটি সিলেট শহরের লামাবাজারে অবস্থিত। এই মন্দিরটি আগের মতো নেই, কারণ আগে তৈরি ভূমি-নকশা অনুযায়ী এ-মন্দিরটি ছিল বর্গাকৃতি এবং একেক দিকের বিস্তার ছিল ১১ ফুট। স্থাপত্যরীতির ক্ষেত্রে এটি শিখর ধরনের।

গোয়াইনঘাট উপজেলা গোয়াইনঘাট থানা ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৫ এপ্রিল ১৯৮৩ সালে গোয়াইনঘাট থানাটি উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। গোয়াইনঘাট উপজেলাটি

প্রাচীন জৈন্তা রাজ্যের একটি অংশ ছিল। গোয়াইনঘাট উপজেলা সদর প্রাচীন 'গোয়াইন' নদীর তীরে অবস্থিত। সেই নদীর নামানুসারে উপজেলা সদরের নাম 'গোয়াইনঘাট' হতে পারে। গোয়াইনঘাট প্রবহমান গোয়াইন নদীর তীরে গোয়াইন মৌজায় অবস্থিত। জনসধারারণ নদী পারাপারের জন্য বাজারসংলগ্ন গোয়াইন নদীতে একটি ঘাট তৈরি করে। আর সম্ভবত 'গোয়াইন' শব্দের সাথে 'ঘাট' শব্দ যোগ করে 'গোয়াইনঘাট' নামকরণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

এই উপজেলার আয়তন ৪৮১.১২ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা: ২,৮৭,৫১২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১,৪৩,৮৭৭ জন এবং মহিলা ১,৬১,৯০০ জন। মুসলিম- ৩,০২.৪৭৯ জন, হিন্দু- ১৩,৬০৩ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ইউনিয়নের সংখ্যা-০৯ টি। ১) রুস্তমপুর ২) পশ্চিম জাফলং ৩) পূর্ব জাফলং ৪) লেঙ্গুড়া ৫) আলীরগাঁও ৬) ফতেহপুর ৭) নন্দীরগাঁও ৮) তোয়াকুল ৯) ডৌবাড়ী। গ্রামের সংখ্যা- ৩০৬টি।

এই উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১২৯টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭৭টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ৫টি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ২৬টি, বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ- ২টি, বেসরকারি কলেজ-৫টি, মাদরাসা- ১০টি। উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে গোয়াইনঘাট বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এ উপজেলায় উল্লেখযোগ্য ভূ মিকা রাখছে। এ কলেজে বর্তমানে অনার্স কোর্স চালু আছে।

এ উপজেলায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাথরভাঙা শিল্পই প্রধান। ২৩৫টি স্টোন ক্রাশার মেশিন এ কাজে নিয়োজিত আছে। এছাড়া চা-বাগান- ১টি, তাঁত শিল্প- ১৭টি ও ২৭টি হস্তশিল্প রয়েছে। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রাতারগুল জলারবন পর্যটকদের অতি প্রিয় আকর্ষণ।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা

ইংরেজ শাসনামলে প্রথমে থানা প্রশাসন ছিল হেতিমগঞ্জে। ১৯০৬ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার সুরমা তীরবর্তী গোলাপগঞ্জ বাজারের সন্নিকটে থানা কার্যালয় স্থানান্তর করেন। ১৯৮৪ সালে তা উপজেলায় রুপান্তরিত হয়।

এই উপজেলার আয়তন ২৭৮.৩৩ বর্গকিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা ৩,১৬,১৪৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১,৫৪,২৪৯ জন এবং মহিলা ১,৬১,৯০০ জন। মুসলিম- ৩,০২.৪৭৯ জন। অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। পৌরসভা- ০১টি, ইউনিয়ন-১১টি, ১। বাঘা, ২। গোলাপগঞ্জ ৩। ফুলবাড়ী, ৪। লক্ষীপাশা ৫। বুধবারী বাজার, ৬। ঢাকা দক্ষিণ ৭। লক্ষণাবন্দ, ৮। ভাদেশ্বর, ৯। পশ্চিম আমুড়া ১০। শরীফগঞ্জ, মহল্লা ২৩টি, গ্রাম- ২৫৫টি।

এই উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১৭৮টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৭০টি, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০৩টি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ২৩টি। বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ- ১০টি। বেসরকারি কলেজ- ৫টি। মাদরাসা- ৪১টি। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: এমসি, একাডেমি, ২।

আতহারিয়া উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ৩। ভাদেশ্বর নাসির উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ৪। ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ৫। ঢাকাদক্ষিণ ডিগ্রি কলেজ ও ৬। আল এমদাদ উচ্চবিদ্যালয়।

জকিগঞ্জ উপজলা জনশ্রুতি রয়েছে যে, শাহ জাকী নামে একজন সুফী পির কুশিয়ারা নদীর তীরে আস্তানা স্থাপন করেন। পিরের মোকামকে কেন্দ্র করে যে সাপ্তাহিক বাজার বসত তা জকিগঞ্জ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আর এ কিংবদন্তির সাথে মিল রেখে জকিগঞ্জ নামের সাথে সাথে বাজারের পাশে পিরের স্মৃতি বহনকারী পিরেরখাল ও পিরেরচক গ্রাম গড়ে উঠেছে। আবার কারো কারো মতে, গোলাম জকি মজুমদারের নামাঅনুসারে জকিগঞ্জ এবং তার অপর ভাই করিম মজুমদারের নামানুসারে করিমগঞ্জের নামকরণ করা হয়েছে। জকি শব্দের অর্থ অশ্বারোহী, কোনো কোনো অর্থে জ্ঞানদাতা।

এই উপজেলার আয়তন ২৬৫.৬৮ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা: জনসংখ্যা ২,৩৭,১৩৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১,১৭,৩৫৪ জন এবং মহিলা ১,১৯,৭৮৩ জন, মুসলিম-২,১৩,৭৮৫ জন, হিন্দু-২৩,৩৩৯ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। পৌরসভা- ০১টি - জকিগঞ্জ পৌরসভা। ইউনিয়ন- ০৯টি, ১) বারহাল ২) বিরশ্রী ৩) কাজলসার ৪) খলাছড়া ৫) জকিগঞ্জ ৬) সুলতানপুর ৭) বারঠাকুরী ৮) কসকনকপরু ৯) মানিকপুর। মহল্লা- ২৭টি। গ্রাম- ২৮৮টি।

এ উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১৩৬টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫৩টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৪টি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-২টি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ১৪টি, বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ-৫টি। বেসরকারি কলেজ: ৪টি, এবতেদায়ি মাদরাসা-১০টি, দাখিল মাদরাসা-১৭টি, ফাজিল মাদরাসা-০২টি, কামিল মাদরাসা-০২টি।

এ উপজেলায় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। তবে কিছুসংখ্যক পর্যটন ও দর্শনীয় স্থান আছে যেমন ত্রিনদীর মোহনা (বরাক, সুরমা ও কুশিয়ারা নদী) অমলসীদ, জকিগঞ্জ কাস্টম ঘাট, ফুলতলী সাহেবের মাজার।

জাফলং খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জাফলং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে খুবই মনোহর বলেই সিলেট ও অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীর কাছে সেই স্থানটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এখন স্থানে স্থানে কৃত্রিমতার ছোঁয়ায় আদি সৌন্দর্য কিছুটা ক্ষুণ্ন হলেও জায়গাটি এখনো দর্শনাথীদের আকর্ষণ করছে। সিলেট থেকে জাফলংয়ের দূরত্ব প্রায় ৬২ কিলোমিটার। টিলাগড়স্থ মুরারিচাঁদ কলেজ ও খাদিম নগরের শাহপরান (র.) দরগাহ্ গেট পার হয়ে যে রাস্তাটি জাফলং-তামাবিল ছুঁয়ে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত পর্যন্ত চলে গেছে এর ওপর দিয়ে ভ্রমণ কম সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। কারণ দুই পাশের দৃশ্য খুবই মনোরম, তাকালেই চোখে পড়ে কাছে-দূরের ছোটো-বড়ো টিলা, পাহাড়। পাহাড়ের গা ঘেষে ঝরনা ও মেঘরাশি।

জাফলং যাত্রাপথে বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তসংলগ্ন যে নদীটিকে দেখা যাবে তার নাম পিয়াইন। এর পানি খুবই স্বচ্ছ ও সুন্দর। তার পাড়ে রয়েছে বেশ কিছু পাথরের কোয়ারি। এগুলোও একসময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হয়ে ধরা পড়ত পর্যটকের চোখে, কিন্তু এখনকার পাথরভাঙা যন্ত্রদানবের আওয়াজ ও ধোয়ার আকারে উড়ন্ত বালিরাশি এগুলো উপভোগের বদলে কিছুটা বিরক্তি জন্ম দেয়। তবে এখনো নিকটবর্তী খাসিয়াপুঞ্জিতে পৌঁছে তাদের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ঘরবাড়ি, জীবন-জীবিকা, পানের বরজ প্রভৃতি দেখতে সকলেরই ভালো লাগে।

জৈন্তাপুর উপজেলা

সিলেট বিভাগের একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলা হিসেবে জৈন্তাপুর বিশেষভাবে পরিচিত। প্রাচীন কালে জৈন্তিয়া একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। জাইন্তিয়া শব্দ থেকে জৈন্তিয়া শব্দের উৎপত্তি। এ সম্পর্কে নানা পণ্ডিত নানা মত দিয়েছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক রাজমোহন নাথের মতে, জাইন্তিয়া শব্দ এসেছে জাইন্তিয়া আদিবাসীগণ হতে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সিন্টেং শব্দ হতে জাইন্টেং শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে এবং সংস্কৃতকরণ বা আর্যকৃত হয়ে জৈন্তিয়া, জাইন্তিয়া বা জৈন্তা হয়েছে। প্রাচীন কালে জৈন্তা নারীরাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। মোগল আমলেও জৈন্তা রাজ্য স্বাধীন ছিল। বিট্রিশ আমলে ১৮৩৫ সালে জৈন্তিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

এই উপজেলার আয়তন ২৬৬.১১ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা: ১,৬১,৭৪৪ জন; এর মধ্যে পুরুষ ৮০,৭৬৯ জন এবং মহিলা ৮০,৯৭৫ জন; মুসলিম-১,৪৭,১৪০ জন, হিন্দু- ১৩,৮৮৭ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ইউনিয়নের সংখ্যা ০৬টি, ১) নিজপাট, ২) জৈন্তাপুর, ৩) চারিকাটা ৪) দরবস্ত, ৫) ফতেপুর ৬) চিকনাগুল। গ্রামের সংখ্যা- ১৯৬টি।

এই উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৭২টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-১২টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ১০টি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ৭টি, বেসরকারি কলেজ- ৫টি, মাদরাসা- ২৫টি। উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে জৈন্তিয়া ডিগ্রি কলেজ এ উপজেলার একটি স্বনামধন্য কলেজ। এটি ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা হলো ১৫০০ জন।

এ উপজেলায় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান না থাকলেও প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন তৈল, গ্যাস, পাথর, বালি ও কয়লা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র এই উপজেলার হরিপুর নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয়। তা ছাড়া এ উপজেলায় বালি ও পাথর রয়েছে। চা-বাগানসমূহ হলো লালাখাল, হাবিব নগর, শ্রীপুর চা-বাগান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য এ উপজেলা বিখ্যাত।

জৈন্তা রাজবাড়ি

প্রায় চার হাজার বছরের পুরানো মহাভারতসহ অন্যান্য পুরাণগ্রন্থে যেহেতু জৈন্তা রাজ্যের উল্লেখ আছে, তাই তার ইতিহাসকে পুরাণাশ্রিত ও কিংবদন্তিনির্ভর বলে

উল্লেখ করা সহজ, কিন্তু তার প্রাচীনত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে রাজা যুধিষ্ঠির যখন অশ্বমেধযজ্ঞ করেন তখন জৈন্তা নারীরাজ্য নামে পরিচিত। সেই সময় নারীরাজ্যের রানি প্রমীলা যজ্ঞের অশ্ব আটক করলে সেটি উদ্ধারের জন্য সেখানে আসেন অর্জুন, কিন্তু তিনি নারীবাহিনীর সাথে লড়াই করবেন কি না তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হন, ফলে একসময় সন্ধি হয় এবং অর্জুনের সঙ্গে রানির বিয়ে হয়। মহাভারতের কাহিনি যাই হোক, জৈন্তা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আরেকটি কাহিনির উল্লেখ করলে রাজ্য বিষয়ে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে।

আসামের কামরূপ রাজ্যের রাজা মারা গেলে রানি উর্মি পালিয়ে এসে নারীরাজ্যের একাংশ অধিকার করে নতুন রাজ্য স্থাপন করেন। রানি উর্মির মেয়ে উর্বরার সঙ্গে বিয়ে হয় তিব্বত থেকে আসা যুবরাজ কৃষকের। তিনি পরে তিব্বতে ফিরে যান। কিন্তু তার পুত্র হাটক থেকে যায় নারীরাজ্যে। হাটকের পরে রাজা হয় তার পুত্র গুহক। গুহক মারা গেলে রাজ্য ভাগ হয় তিন পুত্রের মধ্যে। জয়ন্তক নামের পুত্রের ভাগে যে অংশ পড়ে তার নাম জয়ন্তিয়া। একপর্যায়ে রাজ্য চলে যায় রাজপুরোহিত ব্রাহ্মণদের হাতে। পুরোহিত রাজবংশের চারজন রাজা ১৫০০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পুরোহিত বংশের জয়ন্ত রায়ের কন্যা জয়ন্তীর বিয়ে হয় খাসিয়া সর্দারপুত্র লম্বরের সাথে। পরে শুধু রাজকন্যা নয়, রাজ্যও চলে যায় খাসিয়াদের হাতে। খাসিয়াদের ২৩ জন রাজা ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত শাসন করে জৈন্তা রাজ্য।[৭]

অন্য কাহিনি মতে, বড়ো গোঁসাই নামের এক উপজাতি নৃপতি এই রাজ্যের জনক আর রানি জৈন্তিশ্বরীর নামে এর নামকরণ।

জৈন্তা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নানা মত ও কাহিনি প্রচলিত থাকায় তা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা মুশকিল তবে একথা ঠিক, এখানে রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আছে, মেগালিথ পাথর আছে এবং কালীমূর্তি স্থাপনের জন্য একটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত। নানা বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, কালী দেবীর পদতলে নিয়মিত নরবলি দেওয়া হতো। বহুদিন অনেক স্বাধীন নৃপতি এই রাজ্য শাসন করার পর একবার তিন ব্রিটিশকে বলি দেওয়ার অপরাধে জৈন্তার শেষ রাজা রাজেন্দ্র সিংহকে রাজ্য হারাতে হয়। তাকে বন্দি করে সিলেট শহরে দেওয়ান মুরারিচাঁদ রায়ের বাড়িতে শেষদিন পর্যন্ত নজরবন্দি করে রাখা হয় এবং সেখানে ১৮৬১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাড়ির গাছের ছায়ায় যে-মেগালিথ পাথরগুলো রয়েছে তা নিয়ে লোকধারণা, এই পাথরের আসনে বসেই নাকি রাজারা জনগণের আরজ-আরজি শুনতেন, তাদের অপরাধের বিচারও করতেন। তবে, ‘গবেষকবৃন্দ এই মেগালিথ

---

[৭] মাহবুবুজ্জামান চৌধুরী (সম্পাদিত), সংকলন (জাতীয় গ্রন্থবর্ষ ২০০২ উপলক্ষে প্রকাশিত), ‘সিলেটের দর্শনীয় স্থানসমূহ’, একে শেরাম, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, সিলেট, ২০০২, পৃ. ৩২-৩৩

পাথরগুলোর স্থাপনসহ বিভিন্ন দিক ব্যাপক পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, এগুলো স্মৃতিস্তম্ভ। খাসিয়া সম্প্রদায় তাদের মৃত পুরুষদের স্মৃতি রক্ষার্থে কিংবা সম্মানার্থে এই পাথরগুলো স্থাপন করেছিল।'[৮]

ঢাকা দক্ষিণের তীর্থভূমি

শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪৮৫ সালে, ভারতের নবদ্বীপে; তাঁর মায়ের নাম শচী দেবী, পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। ঢাকাদক্ষিণ ছিল তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি এবং এই কারণেই এই স্থানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। তবে শুধু পিতৃসূত্রে নয়, এক অর্থে জন্মসূত্রেও তিনি সিলেটি : এ প্রসঙ্গে অচ্যুতচরণ চৌধুরী লিখেছেন :

অচিরমৃত অষ্টতনয়ার পর একটি পুত্র জাত হইয়াছিল–ইনি বিশ্বরূপ। যখন ৮-৯ বছরের, তখন জগন্নাথের আহবান আসিল, উপেন্দ্র মিশ্র পুত্রকে বিদেশে যাইতে লিখিলেন। শচী বিশ্বরূপকে মাতা বিলাসিনী দেবীর করে অর্পণ করিয়া পতির সহিত ঢাকাদক্ষিণে গেলেন। কিছুদিন তথায় অবস্থিতির পর শচীদেবীর পুনর্গর্ভসঞ্চার হয়।[৯]

ঢাকাদক্ষিণ অবস্থানকালে বড়ো ভাই বিশ্বরূপের যখন ৮-৯ বছর বয়স তখন শচীমাতা যে শিশুটিকে গর্ভধারণ করেন, তিনিই হলেন শ্রীচৈতন্য, কিন্তু তিনি ভূমিষ্ঠ হন নবদ্বীপে।

এই শ্রীচেতন্য হরিনাম প্রচারের মধ্য দিয়ে প্রেমধর্মকে এত সাফল্যের সঙ্গে পৃথিবীময় যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার পেছনে প্রাচীন শ্রীহট্টপণ্ডিতদের অবদানও কম নয়। তাঁর প্রধান পারিষদদের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য ছিলেন সিলেটেরই অধিবাসী। চৈতন্যের জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ এবং মৃত্যুর সময়েও বেঁচেছিলেন। এছাড়াও বৈষ্ণবাচার্য মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীবাস পণ্ডিত ও নবদ্বীপের জ্ঞানজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী রঘুনাথ শিরোমণির বাড়িও ছিল সিলেটে। পিতৃভূমি এই সিলেটেই আসেন বৈষ্ণবমতের নতুন চেতনার উদ্বোধক শ্রীচেতন্য। ফলে ঢাকাদক্ষিণের এই তীর্থভূমি জগন্নাথ মিশ্রের জন্মকারণের জন্য নয়, তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীচৈতন্যের আগমনের কারণে। পিতামহী শোভা দেবীকে দেওয়া পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুয়ায়ী মায়ের আদেশে ১৫১০ সালে শ্রীচৈতন্য ঢাকা দক্ষিণে আসেন।

ঢাকাদক্ষিণ সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত এবং সিলেট থেকে তার দূরত্ব প্রায় ২৬ কিলোমিটার। ঢাকাদক্ষিণ বাজারের পেছনে একটি পুকুর রয়েছে, সেই পুকুরের পাশ ধরে দুটি টিলা; বামে নিচু টিলার উপরে মন্দির আর ডানপাশের উঁচু টিলার উপরে রয়েছে শ্রীচেতন্যের আদিপুরুষের ভিটেবাড়ি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

---

[৮] মো. আবদুল আজিজ (ও অন্যান্য সম্পাদিত), বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), 'জৈন্তাপুরের মেগালিথ : একটি জনগোষ্ঠীর প্রাচীন নিদর্শন', নূরুজ্জামান মণি, সিলেট ২০০৬, পৃ. ৩২৮।

[৯] অচ্যুতচরণ চৌধুরী, শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণ (আসাম ও ঢাকাদক্ষিণ লীলাপ্রসঙ্গ), পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২।

মন্দিরপ্রাঙ্গণে পৌঁছলেই প্রথমেই চোখে পড়বে একটি সিংহদ্বার, তার বামদিক থেকে রয়েছে পাঁচটি মন্দির : নাটমন্দির, দোলমন্দির, রামন্দির, শ্রীমন্দির ও ভোগমন্দির। এই মন্দিরগুলোর সামনে রয়েছে একটি নাটমণ্ডপ। কথিত আছে যে, শ্রীমন্দিরের জন্য মণিপুরের রাজা ভাগ্যচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাঁচ মণ ওজনের একটি পিতলের ঘণ্টা দান করেন, কিন্তু সেটি আগুনে পুড়ে যায়; পরে মণিপুরের আরেক রাজা চন্দ্রকীর্তি সিংহ দুই মণ ওজনের আরেকটি পিতলের ঘণ্টা দান করেন, সেটি এখনো রয়েছে। উল্লেখ্য, এখনকার মন্দিরগুলো বেশি আগের নয়, তবে মূল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনো রয়েছে। শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষ ও তাঁর পুণ্যস্মৃতিধন্য এই স্থান পরিদর্শনের জন্য বহুদূর থেকে অনেক মানুষ এখানে আসেন। এখানে প্রতিবছর চৈত্রমাসে মন্দিরপ্রাঙ্গাণে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয় যেটি শ্রীচৈতন্যের আগমনেরই স্মারক।

তিন মন্দির বাড়ি তিনটি পৃথক মন্দির ভবন নিয়ে গঠিত এই তিন মন্দির বাড়ি সিলেট শহরস্থ লামাবাজার এলাকায় অবস্থিত। এই মন্দির তিনটি কে নির্মাণ করেছিলেন তা যেমন জানা যায় না, তেমনি কবে নির্মিত তাও ঠিকভাবে জানা যায় না। তবে এর স্থাপত্যরীতি দেখে অনুমান করা হয় যে এগুলো ১৮ শতকে নির্মিত।

দশনামী আখড়া সিলেট শহরের লামাবাজারে চারটি ছোটো ভবন নিয়ে গঠিত এই মন্দিরে একটি শ্বেত মর্মরের গৌরী শিববিগ্রহ এবং তিনফুট উঁচু ও দশ মণ ওজনের একটি শিবলিঙ্গ আছে। এই মন্দিরের কোনো প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না, তবে এটি ১৮ শতকের শেষভাগে তৈরি করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

দক্ষিণ সুরমা উপজেলা ৯ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত নিকারের ৯১তম বৈঠকে ০৯টি ইউনিয়ন নিয়ে দক্ষিণ সুরমা নামে একটি নতুন প্রশাসনিক উপজেলা গঠন করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮-এর ৩(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলা ঘোষণা করে। এর ফলে ২১ মার্চ ২০০৫ সালে দক্ষিণ সুরমা উপজেলা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নবসৃষ্ট এ উপজেলার সদরদপ্তর মোগলাবাজার ইউনিয়নের নৈখাই মৌজায় অবস্থিত।

এই উপজেলার আয়তন ১৮৭.৬৬ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ২,৫৩,৩৮৮ জন এর মধ্যে পুরুষ ১,২৬,৩১৫ জন এবং মহিলা ১,২৭,০৭৩ জন; মুসলিম- ২,৪৪,৩৪১ জন, হিন্দু- ৯,৮৯৯ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ইউনিয়নের সংখ্যা- ১০টি। ১) মোল্লারগাঁও, ২) বরইকান্দি, ৩। তেতলী, ৪) কুচাই, ৫) সিলাম, ৬। লালাবাজার, ৭। জালালপুর, ৮। মোগলাবাজার, ৯। দাউদপুর, ১০। কামালবাজার, গ্রামের সংখ্যা- ৩১৮টি।

এই উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১৪৪টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৮৩টি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ২৪টি। বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ- ০২টি। বেসরকারি কলেজ- ০৪টি। মাদরাসা- ৪৫টি। এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে দক্ষিণ সুরমা কলেজে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষ

হতে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। বর্তমানে কলেজটিতে বাণিজ্য বিভাগে ০২টি এবং মানবিক বিভাগে ০৭টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। কলেজটিতে ৩৪৬৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত।

নিম্বার্ক আশ্রম

সিলেট শহরের মির্জাজাঙ্গালে এই আশ্রমটি অবস্থিত। একটি প্রাচীন ধর্মকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

ফরহাদ খাঁর সেতু

সিলেটের গোয়ালিছড়ায় প্রধান সড়কের উপরে নির্মিত এই সেতুটি একটি প্রাচীন সেতু। খিলানের স্প্যানের সাহায্যে তৈরি এই সেতুটির নির্মাণকাল ফারসি ভাষায় লিখিত শিলালিপি অনুযায়ী ১০৯৮ হিজরি (১৬৭৪ সাল)।

ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা

১৯২২ সালের ১০ জানুয়ারি ০৩ টি ইউনিয়ন নিয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালের ০২ জুলাই বাংলাদেশের অন্যান্য থানার সাথে এক প্রশাসনিক আদেশে এটি উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এ উপজেলায় নতুন দুইটি ইউনিয়নসহ মোট ০৫টি ইউনিয়ন রয়েছে। কথিত আছে, কৃষকদের নিত্য প্রয়োজনীয় তামাক, চিড়া, গুড়, মুড়ি ইত্যাদির পসরা নিয়ে ফেঁচু নামের এক ব্যক্তির ঝুপড়ি ঘরের মতো একটি দোকান ছিল। ওই দোকানদারদের নামানুসারে গড়ে ওঠা বাজারটির নাম হয় ফেঁচুগঞ্জ, যা পরবর্তীকালে ফেঞ্চুগঞ্জ নামকরণ করা হয়।

এই উপজেলার আয়তন ১১৪.০৯ বর্গকিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা ১,০৪,৭৪১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৫১,০৭৭ জন এবং মহিলা ৫৩,৬৬৪ জন। মুসলিম- ৯৩,৪৩১ জন, হিন্দু-১১,২৯৬ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ইউনিয়নের সংখ্যা- ০৫টি, ১) ফেঞ্চুগঞ্জ, ২। মাইজগাঁও, ৩) ঘিলাছড়া, ৪) উত্তর কুশিয়ারা, ৫) উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ। গ্রামের সংখ্যা- ১২৭টি।

এই উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৪৪টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ২২টি, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়- ১টি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ৯টি। বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ- ০২টি। বেসরকারি কলেজ- ০২টি। আলীয়া মাদরাসা- ০৬টি, দাখিল মাদরাসা- ০৪টি। এবতেদায়ি মাদরাসা: ০৪টি, হাফিজিয়া মাদরাসা: ০৩টি কওমি মাদরাসা: ১১টি। এ উপজেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাসিম আলী মডেল উচ্চবিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য এটি ১৯১৫ সালে স্থাপিত হয়। এ বিদ্যালয়ের ভূমির ব্যবস্থা করেন কাজী বাড়ি গ্রামের আলহাজ কাজী ইউসুফ আলী চৌধুরী।

এ উপজেলায় বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান হলো ফেঞ্চুগঞ্জ ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি (এনজিএফএফ) ও শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি। এখানের ৯০ মেগাওয়াট কেন্দ্র ০২টি, ১৩২/২৩০ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, এনার্জি প্রিমা লি. বিদ্যুৎকেন্দ্র, বারাকাতুল্লাহ ইলেকট্রো ডায়ানামিক্স বিদ্যুৎকেন্দ্র উল্লেখযোগ্য।

বালাগঞ্জ উপজেলা বালাগঞ্জ উপজেলা কুশিয়ারা নদীর তীরে সিলেট জেলার দক্ষিণে অবস্থিত। বৃহত্তর সিলেট জেলার বর্তমান বালাগঞ্জ, ওসমানীনগর, ফেঞ্চুগঞ্জ এবং রাজনগর উপজেলা নিয়ে ১৮৮২ সালে বালাগঞ্জ থানা (পুলিশ স্টেশন) গঠিত হয়। ১৯২২ সালে বর্তমান বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর উপজেলা এলাকা নিয়ে বালাগঞ্জ থানা পুনর্গঠিত হয়। পরবর্তীকালে ৭ নভেম্বর ১৯৮৪ তারিখে বালাগঞ্জ থানা উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। ২০১৪ সালের ২১ অক্টোবর বালাগঞ্জ উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে ওসমানীনগর উপজেলা গঠিত হয়।

বালাগঞ্জ উপজেলার আয়তন ১৬৩.২৭ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা: ১,১৮,৮৭৩ জন; এর মধ্যে পুরুষ ৫৭,৯৫৭ জন এবং মহিলা ৬০,৯১৬ জন, মুসলিম- ১,০১,৪৭৩ জন, হিন্দু- ৯,৫৭১ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭২৮ জন। ইউনিয়নের সংখ্যা- ০৬টি, যথা: ১) বালাগঞ্জ, ২। বোয়ালজুড়, ৩। দেওয়ান বাজার, ৪। পশ্চিম গৌরীপুর, ৫। পূর্ব পৈলেনপুর, ৬। পূর্ব গৌরীপুর গ্রামের সংখ্যা: ১৭৬টি।

এ উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৭৪টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১৭টি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ১৪টি। বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ- ০১টি। বেসরকারি কলেজ- ০২টি। মাদরাসা- ০৬টি। এ উপজেলায় উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো বালাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, বালাগঞ্জ ডি.এন উচ্চবিদ্যালয়, দেওয়ান আব্দুর রহিম উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ।

এ উপজেলায় বৃহৎ কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই, তবে এই এলাকায় রয়েছে কুটিরশিল্পের এক বিরাট বাজার। এছাড়াও বালাগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মানুষ বাঁশ ও বেতের তৈরি নানা রকম সরঞ্জাম তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। উল্লেখ্য, শীতল পাটির জন্য বালাগঞ্জ উপজেলার খ্যাতি রয়েছে।

এ উপজেলায় মদনমোহন প্রভুর নামে একটি মন্দির প্রাচীন কালে বড়োচরের জমিদার নির্মাণ করেন। এ মন্দিরকে ঘিরে 'গঞ্জ' নামে ব্যবসায়িক কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে তা উন্নত হয়। উক্ত স্থানটি উন্নতমানের 'বালার' (এক প্রকার চুড়ি) জন্য স্থানীয় হিন্দু মহিলাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'বালা' ও 'গঞ্জ' শব্দ দুইটির সমন্বয়ে উপজেলাটির নাম বালাগঞ্জ করা হয়েছে বলে ধারণা কর হয়।

এই উপজেলার দর্শনীয় স্থান মদনমোহন জিউ আশ্রম, স্লুইচ গেইট, আদিত্যপুর গণকবর, গালিমপুর গণকবর, বালাগঞ্জ প্রাচীন ভবন ইত্যাদি।

বিয়ানীবাজার উপজেলা বিয়ানীবাজার উপজেলা নামকরণের পেছনে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে জনশ্রুতি আছে যে, এই এলাকায় একটি গভীর জঙ্গল ছিল যেখানে বিভিন্ন হিংস্র জীবজন্তু ও সাপ বসবাস করত। এগুলো শিকারের জন্য সন্ধ্যাবেলায় জঙ্গালের বাইরে আসত। এসকল হিংস্র জীবজন্ত ও সাপের কবল থেকে সাধারণ মানুষ রক্ষা পাওয়ার জন্য সিলেটের প্রথম রায়বাহাদুর হরেকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর পুত্র কৃষ্ণকিশোর পালচৌধুরী এ জায়গায় একটি হাট প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। প্রতিদিন ‘বিহানবেলা’ (সকালবেলা) এ হাট বসত বলে এ হাটকে ‘বিহান বাজার’ বলা হতো। ‘বিহান’ ও ‘বাজার’ এ দুইটি শব্দ থেকে বিয়ানীবাজার উপজেলার নামকরণ করা হয় বলে অনেকের ধারণা।

এই উপজেলার আয়তন ২৫৩.২৪ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা : ২,৫৩,৬১৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১,২৩,৯৩৯ জন এবং মহিলা ১,২৯,৬৭৭ জন। মুসলিম-২,৪৪,৪৫৩ জন, হিন্দু-৯,১৪৭ জন। অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। পৌরসভা- ০১টি, ইউনিয়ন-১০টি, ইউনিয়নের নাম- ১। আলীনগর, ২। মুল্লাপুর, ৩। চারখাই, ৪। দুবাগ, ৫। কুড়ার বাজার, ৬। লাউতা, ৭। মাথিউরা, ৮। মেওলা, ৯। তিলপাড়া, ১০। মুড়িয়া। মহল্লা ৪১টি, গ্রামের সংখ্যা: ২০৮টি।

এ উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১৫০টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৪০টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০৪টি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ৩৮টি। বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ- ০২টি। সরকারি কলেজ- ০১টি। বেসরকারি কলেজ- ০৩টি। মাদরাসা- ৬৬টি। এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজ ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৮ সালে সরকারিকরণ করা হয়। কলেজটিতে ০৬টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু আছে। বর্তমানে মাস্টার্স কোর্স চালু প্রক্রিয়াধীন আছে।

এ উপজেলায় বৃহৎ কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই, তবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অনেক পরিবার জড়িত আছে। এই উপজেলার দর্শনীয় স্থান ‘মালিক মহল’ যা ‘লাল বিল্ডিং’ নাম পরিচিত।

স্থানীয় হিন্দু জমিদার বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর জমির ওপর প্রাথমিকভাবে বিশ্বনাথ বাজারসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল বলে জমিদার বিশ্বনাথ চৌধুরীর নামানুসারে বিশ্বনাথ উপজেলার নামকরণ করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি ১৯২২ সালে বিশ্বনাথ থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালে বিশ্বনাথকে মানোন্নীত থানায় উন্নীত করা হয়। অতঃপর ১৯৮৪ সালে তা উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

এই উপজেলার আয়তন ২১৩.১৬ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা: ২,৩২,৫৭৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১,১৫,৭৬৩ জন এবং মহিলা ১,১৬,৮১০ জন, মুসলিম- ২,২২,৩৯৩ জন, হিন্দু-১০,০৬৫ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ইউনিয়নের সংখ্যা: ৮টি, ১) লাকাকাজী ২) খাজাঞ্চীগাঁও ৩) অলংকারী ৪) রামপাশা ৫) দৌলতপুর ৬) বিশ্বনাথ ৭) দেওকলস ৮) দশঘর। গ্রামের সংখ্যা: ৪৩৮।

এ উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১৩০টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪৬টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-০৩টি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ২১টি, বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ- ৮টি, বেসরকারি কলেজ: ৩টি, এবতেদায়ি মাদরাসা-০৩টি, দাখিল মাদরাসা- ০৮টি, আলিয়া মাদরাসা: ০৫টি, ফাজিল মাদরাসা: ০১টি, কামিল মাদরাসা: ০১টি। হাফিজিয়া ও কওমি

মাদরাসা:- ১৩টি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে রামসুন্দর অগ্রগামী উচ্চবিদ্যালয় উপজেলার একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশ্বনাথ থানার ওসি বাবু চন্দ্র নাথ ১৯০৯ সালে এমই স্কুল রূপে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৩১ সালে বাবু রজনী কান্ত পালচৌধুরীর সহযোগিতায় তারই পিতৃদেবের নামে এমই স্কুলটি বামসুন্দর হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়।

মতিন উদ্দীন আহমদ স্মৃতি জাদুঘর মতিন উদ্দীন আহমদ (১৯০০-১৯৮০)-এর নামে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরটি সিলেটের শহরের প্রাণকেন্দ্র জিন্দাবাজারের শুকরিয়া মার্কেটের চতুর্থ তলায় অবস্থিত। তিনি ছিলেন একজন ভাষাসৈনিক ও সুসাহিত্যিক। সাহিত্যসাধনার পাশাপাশি অনেক দুর্লভ বস্তু সংগ্রহের প্রতি ব্যক্তিগত আগ্রহবশত যে সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন, সেগুলো পরে তাঁর দৌহিত্র ডাক্তার মোস্তফা শাহজামান বাহারকে দান করে যান। তিনি সেগুলোকে উপরিউক্ত স্থানে ‘মতিন উদ্দীন আহমদ জাদুঘর’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এই স্মৃতি জাদুঘরের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে : প্রায় পাঁচ হাজার দুর্লভ বই, দুটি হাতির দাঁত, (প্রতিটি এক মণ ওজনের) হাতির দাঁতের তৈরি দাবা ও পাশা, বুমেরাং, বালুঘড়ি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত কামানের শেল, জগৎদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের ব্যবহৃত কলম, দেড়’শ বছরের পুরোনো টাইপরাইটার, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন ক্যালেন্ডার, প্রায় আড়াই’শ বছরের আগেকার মানুষ বিক্রির দলিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন মসজিদের ছবি।

মণিপুরি রাজবাড়ি মণিপুর রাজবংশের দুই ভাই চৌরজিৎ সিংহ ও মারজিৎ সিংহের মধ্যকার ক্ষমতার লড়াইয়ের সুযোগে বার্মার রাজা মারজিৎ সিংহের পক্ষ নিলে অন্য ভাই চৌরজিৎ সিংহ তার অনুসারীদের নিয়ে সিলেটে চলে আসেন।[১০] তবে, অন্য মতে, পার্শ্ববর্তী বার্মিজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যহারা হয়ে ১৮১৯ (মতান্তরে ১৮২০) সালে মণিপুরের রাজা চৌরজিৎ দুই ভাই মারজিৎ ও গম্ভীর সিংহকে নিয়ে সৈন্যসামন্তসহ প্রথমে কাছাড়ে এরপর সিলেটে এসে আশ্রয় নেন এবং মির্জাজাঙ্গালে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন যেটি পরে ‘মণিপুরি রাজবাড়ি’ নামে পরিচিতি পায়। চৌরজিৎ তাদের সঙ্গীরা সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করেন। পরে গম্ভীর সিংহের দুই ভাই একসময় মৌলভীবাজার জেলার ভানুগাছে চলে যান আর তিনি নিজে এখানে রয়ে যান। এই সময়ে বিদ্রোহী খাসিয়ারা প্রায় সময়ে এসে ইংরেজদের অসহযোগিতা করত বলে ইংরেজরা তাদের প্রতিরোধ করার জন্য গম্ভীর সিংহের সহযোগিতা চান এবং তিনি খাসিয়াদের দমন করতে সক্ষম হন। এরপর ব্রিটিশরা মণিপুর রাজ্য পুনরুদ্ধারে তাকে সহযোগিতা করেন এবং তিনি পুনরায় সেখানকার রাজা হন। তবে ১৮৯৭

[১০] শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ‘ব্রিটিশ আমলে সিলেটের জনসংখ্যা পর্যালোচনা, মো. মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৩

সালের ভূমিকম্পে রাজবাড়ি ও মন্দির ধ্বংস হয়ে যায় এবং এখনো সেখানে সেই ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।[১১]

মিউজিয়াম অব রাজাস

সিলেটের জিন্দাবাজারে অবস্থিত ‘দেওয়ান তালেবুর রাজা ট্রাস্ট’-কর্তৃক পরিচালিত ‘মিউজিয়াম অব রাজাস’ জাদুঘরটি ২০০৬ সালের ২৫ এপ্রিল পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয় এবং ৩০ জুন একসঙ্গে শতাধিক একতারা বাজিয়ে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা করা হয়। দেওয়ান তালেবুর রাজা ট্রাস্টের চার পৃষ্ঠপোষক সৈয়দা জানে জাহান মিনা রাজা, ফাতেমা নাহরীন রাজা, ফাতেমা নাজরীন রাজা, দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা, বেগম মোসলেহা মনিরা রাজা এই মর্মে ঘোষণা দেন যে, ‘এখানে মরমি কবি দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী, খানবাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী (কাব্যবিশারদ), শিক্ষানুরাগী দেওয়ান তালেবুর রাজা চৌধুরী এমএএলএলবি (আলিগড়) এবং অন্যান্য সম্মানিত রাজাদের; সিলেট অঞ্চলের মরমী কবিদের; লোকসাহিত্য, লোকগীতি ও বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হবে।’[১২] বর্তমানে এখানে হাছন রাজার গানের পাণ্ডুলিপি, তৎকালীন ব্যবহৃত মুদ্রা, ডাকটিকিট, হাছন রাজা ও তাঁর বংশের অন্য রাজাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও আলোকচিত্র, বিভিন্ন প্রকার লোকবাদ্যযন্ত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।

মুরারিচাঁদ কলেজ

রাজা গিরিশচন্দ্র রায় তাঁর মাতামহ মুরারিচাঁদের নামে ১৮৮৬ সালে মুরারিচাঁদ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই স্কুলটিকেই পরে ১৮৯২ সালের ২৭ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজে উন্নীত করা হয়। এই কলেজটিই ছিল আসাম প্রদেশের প্রথম কলেজ যার অধ্যক্ষ হন অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় এম.এ। প্রতিষ্ঠাতা গিরীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পরে কলেজটি আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়লে তার সম্পূর্ণ দায়ভার সরকার গ্রহণ করে এবং ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল কলেজটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি কলেজ হিসেবে যাত্রা শুরু করে, এ পর্যায়ে কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান অপূর্ব চন্দ্র দত্ত বি. এ. (ক্যান্টাব)। শুরুতে কলেজটি স্কুলের সঙ্গেই যুক্ত ছিল পরে ১৯২৫ সালে কলেজটি থ্যাকারে টিলায় নবনির্মিত ভবনে অর্থাৎ বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়।

মুরারিচাঁদ কলেজের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এমন অনেক ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এর পাশাপাশি এখানে সবিশেষ উল্লেখ করতে হয় এর নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের কথা। এ-প্রসঙ্গে মুরারিচাঁদ কলেজের ইতিকথা গ্রন্থের লেখক এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যক্ষ মো. আবদুল আজিজ তাঁর আত্মজীবনীতে ছাত্রকালের কথা লিখেছেন :

---

[১১] মাহবুবুজ্জামান চৌধুরী (সম্পাদিত), সংকলন (জাতীয় গ্রন্থবর্ষ ২০০২ উপলক্ষে প্রকাশিত), ‘সিলেটের দর্শনীয় স্থানসমূহ’, একে শেরাম, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, সিলেট, ২০০২, পৃ. ৩৩-৩৪।

[১২] দেওয়ান তালেবুর রাজা ট্রাস্ট (প্রকাশিত),মিউজিয়াম অব রাজাস, রাজাকুঞ্জ, সিলেট, ২০০৬, পৃ. ১০।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় কলেজের ক্যাম্পাসটি দেখতে ছিল ছবির মতো। তামাবিল সড়কের পার্শ্ববর্তী টিলার পার্শ্বে ঘাস কেটে সুন্দর করে লেখা থাকত M.C.C.। কলেজের প্রায় প্রতিটি ভবনের সামনেই ছিল ফুলের বাগান। ঘাসকাটা মেশিনে সকাল বিকাল মালীরা ঘাস কেটে গোটা ক্যাম্পাসটিকে ছিমছাম করে রাখত। কলা ভবন ও প্রশাসনিক ভবনের চারপাশে টিলার ওপর বসার জন্য স্থায়ী বেঞ্চ পাতা ছিল। ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ছিল থোকা থোকা ঝাউ গাছের সারি-যা মালীদের সযত্ন পরিচর্যায় এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করত।[১৩]

এরপরে কলেজ-ক্যাম্পাসে নানা ধরনের ভবন তৈরি হয়েছে, এখন অবশ্য প্রতিটি ভবনের সামনে বাগান তৈরি করা হয় না, কিন্তু এরপরও এখানে কলেজ ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য সকলকে আকৃষ্ট করে।

শাহী ঈদগাহ মোগল ফৌজদার ফরহাদ খাঁ সিলেটের প্রাচীনতম এই ঈদগাহটি নির্মাণ করেন। চারদিকে দেওয়ালঘেরা এই ঈদগাহের উপরের মেহরাবে পৌঁছতে গেলে ২০টি সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এখানে একটি কেন্দ্রীয় মেহরাব ছাড়াও আরও মেহরাব রয়েছে। কেন্দ্রীয় মেহরাবটি অর্ধগম্বুজের সাহায্যে নির্মিত। কেন্দ্রীয় মেহরাবের উভয় দিকের মেহরাবগুলোর দুই পাশে অষ্টভুজাকৃতি বুরুজ, তা আবার ছত্রীদ্বারা আচ্ছাদিত। এই ঈদগাহে মোট তিনটি প্রবেশপথ আছে। এতে ওজু করার জন্য একটি জলাশয়ও রয়েছে।

শাহী ঈদগাহে একসঙ্গে প্রায় দেড় লাখ মানুষ নামাজ পড়তে পারেন। ১৫টি গম্বুজে সজ্জিত এই মনোরম ঈদগাহটি একাধিক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। বর্তমানে এর পরিবেশ এতই মনোরম যে, এখানে প্রতিদিন বিকালে অনেক মানুষ ঘুরতে আসেন।

সিলেট সদর উপজেলা এই উপজেলার আয়তন ৩০১.৮০ বর্গকিলোমিটার (সিটি ব্যতিত)। সিলেট সিটি করপোরেশনের আয়তন ২৬.৫০ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা: ৮,২৯,১০৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৪,৩৬,৬৭৯ জন এবং মহিলা ৩,৯২,৪২৪ জন, মুসলিম- ৭,৩৮,৯৫৮ জন, হিন্দু-৮৮,০৭১ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। সিটি করপোরেশন-০১টি, ইউনিয়ন-০৮টি ১) জালালাবাদ ২) হাটখোলা ৩) খাদিমনগর ৪) খাদিমপাড়া ৫) টুলটিকর ৬) টুকেরবাজার ৭) মোগলাগাঁও ৮) কান্দিগাঁও, মহল্লা ৩০৬টি, গ্রাম- ৩৭৩টি।

এই উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-১২৫, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ২২৭টি (কিন্ডার গার্টেন, কমিউনিটি স্কুল, এনজিও পরিচালিত স্কুলসহ)। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-০৬টি। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-০২টি। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৩৭টি, সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ-০২টি। বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ-১৯টি। সরকারি কলেজ-০৩টি, বেসরকারি

---

[১৩] মো. আবদুল আজিজ, কালের যাত্রার ধ্বনি, রওশন আজিজ (উৎস প্রকাশনী পরিবেশিত) সিলেট, ২০০৮, পৃ. ৪২।

কলেজ-২৩টি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়-০২টি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-০৪টি। সরকারি মাদরাসা-০১টি, বেসরকারি মাদরাসা-১৭টি, কওমি মাদরাসা-৭৩টি, ক্যাডেট কলেজ-০১টি আইন কলেজ-০২টি। সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ-০১টি, সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট: ০১টি, সরকারি বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়-০১টি। বন বিদ্যালয়-০১টি (এয়ারপোর্ট রোড), মডেল স্কুল ও কলেজ- ০১টি (মীরের ময়দান), মূক ও বধির বিদ্যালয়-০১টি, মণিপুরি নৃত্য একাডেমী- ০১টি, প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ-০১টি, টিচার ট্রেনিং কলেজ-০৩টি, মেডিকেল কলেজ-০৪টি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-০১টি, কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট-০১টি, সরকারি তিব্বিয়া কলেজ-০১টি, চক্ষু হাসপাতাল-০১টি, ডায়াবেটিক হাসপাতাল- ০১টি, হোমিও কলেজ-০২টি (সরকারি+বেসরকারি), সাধারণ পাঠাগার-০৪টি, শিল্প নগরী-০১টি, সেবিকা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট- ০৪টি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট-০১টি, যুব প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট-০১টি, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-০১টি।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- ১) শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, ২) সিলেট কৃষি বিদ্যালয়, ৩) এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সিলেট, ৪) মুরারিচাঁদ কলেজ, ৫) নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ৬) জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ, ৭) মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি ৮) সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ, ৯) সিলেট সরকারি তিব্বিয়া কলেজ, ১০) জালালাবাদ হোমিও মেডিকেল কলেজ, ১১) সিলেট ক্যাডেট কলেজ, ১২) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ১৩) পিটিআই, ১৪) সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ১৫) কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সিলেট, ১৬) মদনমোহন কলেজ, ১৭) সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ১৮) লিডিং ইউনিভার্সিটি।

এ উপজেলায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সিলেট টেক্সটাইল মিল, মণিপুরী তাঁত শিল্প, পাথরভাঙা শিল্প, খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, ওষুধ, ফোম ও সাবান, বিভিন্ন রকমের যন্ত্রাংশ, বিদেশে রফতানিযোগ্য কুকিং বার্নার, কাঠ ও মেলামাইনের উপকরণ এবং ইলেকট্রিক ক্যাবল তৈরির প্রকৌশল শিল্প। এ ছাড়াও বিসিক শিল্প এলাকা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন (বিসিক) সিলেট-এর আওতায় সিলেটে দুটি শিল্প নগরী রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ১. বিসিক শিল্প নগরী, গোটাটিকর, ২. বিসিক শিল্পনগরী, খাদিমনগর।

হাদা মিয়া মাদা মিয়ার টিলা

শাহী ঈদগাহর নিকটবর্তী উত্তর পাশের একটি টিলা হাদা মিয়া মাদা মিয়ার টিলা নামে খ্যাত। ১৭৮২ সালে দুই ভাই সৈয়দ মুহম্মদ হাদী (হাদা মিয়া) ও সৈয়দ মুহম্মদ মেহেদি (মাদা মিয়া) ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গো সম্মু খ সংঘর্ষে শহিদ হন। এই ঘটনার সত্যতা রয়েছে সিলেটের তৎকালীন শাসনকর্তা রবার্টস লিন্ডসের আত্মজীবনীতে। এই সম্মু খ সংঘর্ষের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিন্ডসে ছাড়া আর কারো জবানিতে পাওয়া পাওয়া যায় না, তবে এ-নিয়ে এমনিতে নানা লোকশ্রুতি

রয়েছে। লোকশ্রুতি যা-ই থাকুক, সিলেটের এই দুই যুবক তিতুমীরেরও আগে ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলেছিলেন, ‘আজ ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিন’ এবং লিন্ডসেকে সশস্ত্র আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু পূর্বপ্রস্তুতি থাকায় লিন্ডসে তা প্রতিহত করেন এবং তাদের হত্যা করেন।[১৪]

যুগল টিলা সিলেট শহরের কাজলশাহ এলাকায় অবস্থিত এই মন্দিরটি তিনশ বছর আগে সাধু যুগল বাবা স্থাপন করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। টিলার উপরে অবস্থিত বলে কেন্দ্রীয় মন্দির ভবনে যেতে হলে বহুধাপযুক্ত সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়। বর্তমান মন্দিরটি পরে তৈরি করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

---

[১৪] রবার্ট লিন্ডসে, সিলেটে আমার বার বছর (আবদুল হামিদ মানিক অনূদিত), মুসলিম সাহিত্য সংসদ, ২০০৩, সিলেট, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩।

অধ্যায়-১৫

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ

বাংলা ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)

ব্রিটিশ শাসন হতে স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতীয় মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় তা ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তদানীন্তন বাংলাকে বিভক্ত করে পূর্ব বাংলার মুসলিম প্রধান এলাকাগুলো নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা প্রদেশ আর ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় মুসলিম প্রধান এলাকাগুলোকে নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ। পাকিস্তানের এ দু অংশের মধ্যে ১,৫০০ মাইল বিস্তৃত ছিল ভারত।

দু প্রদেশের মধ্যে ভৌগোলিক, জাতিগত, ভাষাগত সাংস্কৃতিক ব্যবধানের ফলে উদ্ভূত অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলোকে মুছে দিয়ে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ঐক্যবদ্ধ এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটাতে পারত তা পাকিস্তানের সূচনা লগ্ন থেকেই অনুসৃত হয় নি। উলটো পাকিস্তানের জন্মলগ্ন হতেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা ও বঞ্চনার ধারাবাহিক ইতিহাস শুরু হয়।

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাষা বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তানের এ ন্যায্য অধিকারকে নস্যাৎ করার জন্য উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এমনকি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পালটা বাংলা ভাষার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

পরে ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা রূপে সরকারি স্বীকৃতির দাবি উত্থাপন করলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান, পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ও গণপরিষদের সহ-সভাপতি মৌলবি তমিজউদ্দিন খান তার বিরোধিতা করেন, ফলে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্ভবত ঐ অপরাধেই ২৩ বছর পর ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল কুমিল্লা সেনানিবাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে শহিদ হন। গণপরিষদে বাংলা ভাষার স্থান না হওয়ায় ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকা শহরে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদ সভা, সাধারণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বাংলা ভাষার দাবিতে এভাবেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। ঐ দিনের ছাত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের বেপরোয়া লাঠি চার্জ, ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ

এবং ভাড়াটিয়া গুন্ডাদের আক্রমণে বহু ছাত্র আহত হন। প্রায় হাজারখানেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দি ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন- শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলি, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ। কিন্তু এই দমননীতির ফলে ছাত্ররা দমে যায় নি, তারা পরিষদ ভবনের সামনে (পুরানো জগন্নাথ হলের মিলনায়তন), বর্ধমান হাউজে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে (বর্তমান বাংলা একাডেমি), হাইকোর্ট ও সেক্রেটারিয়েটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন অব্যাহত রাখে। এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল ও শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদকে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এই বিক্ষোভ দমনের জন্যে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন জিওসি ব্রিগেডিয়ার আইয়ুব খান মেজর পীরজাদার অধীনে এক দল পদাতিক সৈন্য নিয়ে স্বয়ং পরিষদে গিয়ে খাজা নাজিমউদ্দিনকে বাবুর্চিখানার মধ্য দিয়ে বাইরে পাচার করেন। (আইয়ুব খানের 'প্রভু নয় বন্ধু', পৃষ্ঠা ৩৮) শেষ পর্যন্ত ১৫ মার্চ সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ও সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দীন আহমদ নিম্নোক্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন:

১. ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে।

২. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩. ১৯৪৮-সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্যে যেদিন নির্ধারিত হইয়াছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজি উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা ভাষা তাহার স্থলে সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুলকলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

৫. আন্দোলনে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬. সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭. ২৯ ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ব বাংলার যে-সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।

চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলি, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ বন্দি ছাত্রনেতাকে চুক্তিপত্রটি দেখিয়ে তাঁদের সম্মতি নিয়ে আসেন। ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় বন্দি ছাত্রদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হয় কিন্তু ১৬ মার্চও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ১৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সাধারণ ছাত্র সভার পরে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে পরিষদ ভবনে যায় এবং পরিষদ ঘেরাও করে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভকারীদের ওপরও পুলিশ প্রচণ্ড লাঠি চার্জ করেছিল।

জিন্নাহ ও বাংলা ভাষা

খাজা নাজিমউদ্দিন ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে ঐ চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হওয়ার মাত্র ৪ দিন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাত মাস পর পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা শহরে সফরে আসেন এবং ২১ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। এ সভায় তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেন-

এ কথা আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করে তা হলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু।

রেসকোর্স মাঠে জনসভার মাঝখান থেকে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর ঐ বক্তৃতার বিরুদ্ধে 'না' 'না' সূচক প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হয়। এই 'না' ধ্বনি ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবেও সংক্রমিত হয়। সমাবর্তন ভাষণেও জিন্নাহ ঐ ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। এখানে তিনি বলেন-

"....রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগের ভাষা হিসেবে একটি ভাষা থাকবে এবং সে ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। কাজেই স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, যা এই উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, যা পাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকলেই বোঝে এবং সর্বোপরি যার মধ্যে অন্য যে-কোনো প্রাদেশিক ভাষা থেকে অধিক ইসলামি সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বাস্তব রূপ লাভ করেছে এবং যে ভাষা অন্যান্য ইসলামি দেশগুলোতে ব্যবহৃত ভাষার সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি।"

সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত ছাত্রদের মধ্য থেকে 'না' 'না' ধ্বনি এবং প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হয়। ২৪ মার্চ রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি প্রতিনিধিদল জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাশেম, তাজউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ,

অলি আহাদ, নঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম। কিন্তু মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ এই প্রতিনিধিদলের দাবি অগ্রাহ্য করেন। এভাবেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শেষ হয়।

আরবি হরফে বাংলার ষড়যন্ত্র

১৯৪৮ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ইসলামি আদর্শের খাতিরে বাংলা ভাষার জন্যে 'আরবি হরফ' বা প্রকারান্তরে 'উর্দু হরফ' গ্রহণের প্রস্তাব করেন। ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পেশওয়ারে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভায় আরবি হরফকেই পাকিস্তানের একমাত্র হরফ করার জোর সুপারিশ করা হয়। বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলনের উদ্দেশ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে নিয়োগ করার জন্যে তাঁকে একটি পত্রও প্রেরণ করা হয়। বলা বাহুল্য যে, ড. শহীদুল্লাহ এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে টোপ গেলাতে অসমর্থ হয়ে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সেক্রেটারি ফজলে আহমদ করিম ফজলী চট্টগ্রামের জনৈক মওলানা জুলফিকার আলীকে দিয়ে 'হরফুল কোরান সমিতি' গঠন করান এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পবিত্র কোরানশরিফের হরফ প্রচারের নামে আকৃষ্ট করে বাংলা ভাষায় আরবি বা উর্দু হরফ প্রচলনের চেষ্টা করেন।

বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা 'পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিশেষজ্ঞ কমিটি'র কাছে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করে একটি দীর্ঘ স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। এই স্মারকলিপিতে বলা হয়-

> *আমরা মনে করিতেছি যে, আরবি হরফ প্রণয়ন প্রচেষ্টার দ্বারা পৃথিবীর ষষ্ঠ স্থানাধিকারী বিপুল ঐশ্বর্যময়ী ও আমাদের জাতীয় গৌরবের ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর হামলা করা হইতেছে। পাকিস্তান বাংলার মনে নতুন পরাধীনতার আশঙ্কাকে কায়েম করিয়া তুলিতেছে। বাংলা হরফকে পরিবর্তন করা চলিবে না। পাকিস্তান বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর কসাইয়ের মতো ছুরি চালনা করা চলিবে না।*

১৯৪৯ সালের ১১ ডিসেম্বরে আরবি হরফ প্রবর্তন প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন ও ইকবাল হলে ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আরবি হরফের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে ১৯৫০ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় আরবি হরফে বাংলা শেখানোর জন্যে ২০টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হয়। পাকিস্তান সরকার এই উদ্ভট প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কেবলমাত্র আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রয়াস চালিয়েই বাংলা ভাষার শত্রুরা ক্ষান্ত হয় নি, ১৯৪৯ সালের

নভেম্বর মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান আরবি সংঘ' আরবিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলে। পরবর্তীকালে এই দাবিদাররাই আবার আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জিকির তুলেছিল। সাধারণত মাদ্রাসা থেকেই এইসব প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মাথা তুলত। আরবিকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র আরও জোরদার হয়েছিল ১৯৫১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মোসলেম সম্মেলনে যখন আগা খান আরবিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ওকালতি করেন। স্মরণীয় যে, আরবি হরফ প্রবর্তনের প্রয়াস ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত অটুট ছিল। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৬৪ সালের ১২ মে করাচিতে জাতীয় সংহতি ও সমঝোতার জন্যে ভাবাবেগ বর্জিত হয়ে আরবি হরফ প্রচলনের প্রস্তাব করেছিলেন।

বাংলা ভাষা সংস্কার

১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ পূর্ব বাংলা সরকার বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্যে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে। মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। বিভিন্ন সময়ে এই কমিটির সম্পাদক ছিলেন, কবি গোলাম মোস্তফা, শেখ শরফুদ্দিন ও আবু সাঈদ মাহমুদ। ১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট দাখিল করে। এই রিপোর্টে কমিটি বাংলা ভাষাকে কাটছাঁট করে বিকৃত করার বিভিন্ন কায়দাকানুন বাতলে দিয়েছিল। পূর্ব বাংলা সরকার আট বৎসর পর্যন্ত এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেনি। ১৯৫৮ সালের পরে আইয়ুব খানের আমলে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বাংলা একাডেমিতে পঠিত একটি প্রবন্ধে ঐ সংস্কার প্রয়াসের অসারতা ও বাতুলতা নির্দেশ করে প্রতিবাদ জানান।

বাংলা বর্ণমালা উচ্ছেদের চেষ্টা

পূর্ব বাংলা সরকার ১৯৫১ সালেও বাংলা বর্ণমালা উচ্ছেদ প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। সেপটেম্বর মাসের শেষ দিকে পূর্ব বাংলা সরকারের শিক্ষা দফতর এক সরকারি আদেশ জারি করে, তাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এখন থেকে মুসলমান বালকগণের শিক্ষা আরবি বর্ণমালা দ্বারা আরম্ভ হবে। নতুন ব্যবস্থানুযায়ী শিশুরা ১ম ও ২য় শ্রেণিতে আরবি অক্ষরপরিচয় শিক্ষা করবে এবং ৩য় শ্রেণিতে তাদের আমপারা শিক্ষা দেওয়া হবে। ৪র্থ ও তদুর্ধ্ব শ্রেণিগুলোতে তাদের বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু পড়ানো হবে। পূর্ব বাংলা সরকারের এই নির্দেশ সম্পর্কে 'ইনসাফ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছিল:

> *তবে পূর্ববঙ্গের ছেলে-মেয়েরা বাংলা বর্ণমালায় মাতৃভাষা শিখিলে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা শুরু করিলে গোমরাহ বা ইসলামি ভাবধারাবিহীন হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কা কেন? সেই আশঙ্কা যদি কাহারও মনে না থাকে তবে বর্ণমালা পরিবর্তনের জন্যে কর্তৃপক্ষ মহলের এই অস্বাভাবিক আগ্রহ কেন?*

বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও অমর একুশে

১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে যখন ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন ঢাকায় ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। প্রতিবাদস্বরূপ ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র

ধর্মঘট পালিত হয় এবং সেদিনই বার লাইব্রেরিতে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ, খিলাফতে রাব্বানী পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে 'সর্বদলীয় কর্মপরিষদ' গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুব কর্মপরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। অন্য সভ্যরা ছিলেন- আবুল হাশিম, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল মতিন ও খালেক নেওয়াজ খান। শেখ মুজিবুর রহমান তখন পর্যন্ত আটক; তিনি ১৯৪৯ সালের মার্চ মাস থেকে একটানা বন্দি। ৪ ফেব্রুয়ারি পুনরায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং স্থির হয় যে ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস রূপে পালিত হবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে জেলে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ অনশন শুরু করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় নূরুল আমীন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় কর্মপরিষদ' আবদুল মতিন ও অলি আহাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও পরের দিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিন্তু 'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ' পরের দিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। সারারাত ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে প্রস্তুতি চলে, পরের দিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে মনোবল গড়ে তোলা হয় আর সেই মতো বহু প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন তৈরি করা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে সাফল্যের সঙ্গে ছাত্র ধর্মঘট পালন এবং সকাল এগারোটার পর গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায় এক বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত জানান, কিন্তু সংগ্রামী ছাত্ররা সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। আবদুল মতিন ও আবদুস সামাদ আজাদের প্রস্তাব মতো ছাত্ররা দশজনের অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারপর দলে দলে ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার অতিক্রম এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেফতার বরণ করতে থাকে। কিন্তু পুলিশ হঠাৎ কলাভবন প্রাঙ্গণে প্রবেশ এবং বেপরোয়া কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ ও লাঠি চার্জ করতে শুরু করে, ফলে বহু ছাত্রছাত্রী আহত হয়। পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ছাত্র পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন, খেলার মাঠ, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পরিষদ ভবন (জগন্নাথ হল মিলনায়তন) এলাকায় সমস্ত দুপুর ও অপরাহ্ণ জুড়ে ছাত্র-জনতা বনাম পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। বহু ছাত্র ও জনতা আহত হয়। ওদিকে তিনটার সময় জগন্নাথ হল মিলনায়তনে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের অধিবেশন

শুরু হওয়ার কথা, ছাত্ররা পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদ এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জানানোর জন্যে শান্তিপূর্ণভাবে পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ কোনোরূপ সতর্ক বার্তা না দিয়ে হঠাৎ মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে কয়েক দফা গুলি চালনা করে। প্রথম দফা গুলিতে রফিকউদ্দিন ও জব্বার এবং দ্বিতীয় দফা গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত শহিদ হন।

এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের খবর দাবানলের মতো শহরময় ছড়িয়ে পড়লে ঢাকা শহর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এবং সর্বত্র কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। তারপর মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা এক গায়েবি জানাজায় শামিল হন। জানাজার শেষে এক বিরাট শোক শোভাযাত্রা বের হয়। এত বড়ো শোভাযাত্রা ঢাকায় তখন পর্যন্ত আর কোনো দিন হয় নি। শোভাযাত্রাটি ঢাকা হাইকোর্ট ও কার্জন হলের মাঝখানের রাস্তায় এসে পৌঁছলে শোভাযাত্রার ওপর পুনরায় গুলি চালানো হয়, ফলে বেশ কয়েকজন হতাহত হন। উত্তেজিত জনতা মুসলিম লীগের মুখপত্র 'মর্নিং নিউজ' ও 'সংবাদ' প্রেস জ্বালিয়ে দেয়। উভয় স্থানেই পুনরায় গুলি চলে, ফলে বেশ কয়েকজন হতাহত হন। ঐদিনকার শহিদদের মধ্যে ছিলেন শফিউর রহমান ও রিকশাচালক আউয়াল। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে সামরিকবাহিনী এবং ইপিআর নিয়োগ করা হয়। ইতোমধ্যে বিক্ষোভ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি অফিস, রেলওয়ে, রেডিয়ো সব জায়গায় ধর্মঘট চলে। সরকার বস্তুতপক্ষে অচল হয়ে পড়ে। সলিমুল্লাহ হল ও মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে স্থাপিত ছাত্রদের কন্ট্রোল রুম থেকে দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী আন্দোলন চলতে থাকে। ২৩ ফেব্রুয়ারি পুনরায় হরতাল পালিত হয় এবং আবুল বরকত যেখানে গুলিবিদ্ধ হন, সেখানে ২৩ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা রাতারাতি একটি শহিদমিনার নির্মাণ করেন। ঐ শহিদমিনারের উদ্বোধন করেছিলেন ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে অনানুষ্ঠানিকভাবে শহিদ শফিউর রহমানের পিতা আর ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে *দৈনিক আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। কিন্তু সেদিন অপরাহ্ণে পুলিশ শহিদমিনারটি ধ্বংস করে দেয়। ইতোমধ্যে পুলিশ নিরাপত্তা আইনে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাশিম, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ, অধ্যাপক মোজফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক পুলিন দে, গোবিন্দলাল ব্যানার্জি, খয়রাত হোসেন, মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখকে গ্রেফতার করে। সামরিকবাহিনী, ই.পি.আর, পুলিশ শহরের বিভিন্ন ছাত্রাবাস আক্রমণ এবং শত শত ছাত্রকে গ্রেফতার করে। ছাত্রদের হল থেকে বের করে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়। চলতে থাকে ত্রাসের রাজত্ব। নূরুল আমীন সরকার ভাষা আন্দোলনকারীদের 'ভারতের চর', 'হিন্দু', 'কমিউনিস্ট' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে পূর্ব বাংলায় দমননীতির স্টিম রোলার চালাতে থাকে। নূরুল আমীন সরকার

নারায়ণগঞ্জে একজন পুলিশকে হত্যা ও একজন আনসারকে আহত করিয়ে ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর দোষ চাপাতে চায়, কিন্তু আন্দোলন স্তিমিত হয় না। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে শহিদ হন রফিকউদ্দিন আহমদ, আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম আর ২২ ফেব্রুয়ারি শহিদ হন শফিউর রহমান, আবদুল আউয়াল, কিশোর অহিউল্লাহ এবং আরও একজন অজ্ঞাত পরিচয় বালক।

১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহিদ দিবস পালন করা হয়। কণ্ঠে ভাষার গান নিয়ে ছাত্র-জনতা নগ্ন পদে প্রভাতফেরি বের করে। আজিমপুরে শহিদানের কবরে এবং বিভিন্ন প্রতীকী শহিদমিনারে শহিদদের উদ্দেশ্যে ফুল দেয়। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে ২১ ফেব্রুয়ারির স্মারক একুশ দফার ভিত্তিতে গঠিত হক, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট নৌকা প্রতীকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও পূর্ব বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ঘোষণা করে। কিন্তু এই সরকার দুই মাসও ক্ষমতায় টিকতে পারেনি। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয় এবং গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহিদ দিবস পালন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শহিদ দিবসে প্রভাতফেরি, শহিদদের কবরে পুষ্প প্রদান, পুরাতন কলাভবনের ছাদে কালো পতাকা উত্তোলন এবং কলাভবনে সভা শেষে দলে দলে বিক্ষোভ মিছিল বের করতে থাকে। পুলিশ ব্যাপক লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ এবং শত শত ছাত্রছাত্রীদের গ্রেফতার করে। ছাত্রদের জেলে নিয়ে যাওয়া হয় ও ছাত্রীদের জন্য লালবাগ দুর্গ প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটিয়ে বিশেষ জেলখানা স্থাপন করা হয়। এইভাবে ১৯৫৬ সালে গৃহীত পাকিস্তান শাসনতন্ত্রে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার সময় পর্যন্ত রাজপথে বাংলা ভাষা আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৫৬ সালে শহিদমিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ১৯৫৭ সালে বর্ধমান হাউজে বাংলা একাডেমির যাত্রা শুরু হয়।

ভাষা আন্দোলনে সিলেট

ভাষা আন্দোলনে সিলেটের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। বাংলা ভাষা আন্দোলনে সিলেটের জনসাধারণের মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিশোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম থেকেই ছাত্র, সাংবাদিক, মহিলাকর্মী এবং জনসাধারণ দৃঢ়ভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ভাষা সংক্রান্ত সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের পুরোভাগে তারা অবস্থিত থাকেন।[১] বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলা না উর্দু, কী হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা- এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে বাংলার পক্ষে নিজেদের অবস্থানের কথা জানান দিতে সিলেটের

---

[১] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, আনন্দধারা প্রকাশনা, পৃ. ৬৭।

বুদ্ধিজীবীগণ ১৯৪৭ সালের ৯ নভেম্বর সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে আয়োজন করেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক আলোচনাসভা। সভা থেকে মাতৃভাষা বাংলার প্রাধান্য কমানো হলে জেহাদ ঘোষণার হুমকি দেওয়া হয়। ৩০ নভেম্বর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আরও একটি সভা কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মতিন উদ-দীন আহমদ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ভাষাবিদ, পণ্ডিত সৈয়দ মুজতবা আলী। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল: 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু হওয়া উচিত'। তবে, সেই সমাবেশ সম্পন্ন করা যায় নি। সমাবেশকে সামনে রেখে মুসলিম লীগ শহরে নানা অপপ্রচার চালায়। পাকিস্তান রক্ষার জন্য উর্দুর পক্ষে অবস্থান নিতে সভায় যোগ দিতে হবে- এমন অপপ্রচারও চালানো হয়। মুসলিম লীগের এ ধরনের প্রচারণায় তাদের অনুগতরা ৩০ নভেম্বর সমাবেশে যোগদান করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। মুসলিম লীগের কর্মীদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ফলে সভা পণ্ড হয়ে যায়। এ কারণে সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর বক্তব্য শেষ করতে পারেননি। বক্তব্য অসমাপ্ত রেখেই তিনি সভাস্থল ত্যাগ করেন। তবে, বক্তব্যের পুরোটা লিখে তা প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেন মুজতবা আলী। কথা অনুযায়ী কলকাতার ত্রৈমাসিক *চতুরঙ্গ* এবং সিলেটের *মাসিক আল-ইসলাহ* পত্রিকায় এ সংক্রান্ত তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়, যা পরে চট্টগ্রাম থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শিরোনামে বই আকারে বের হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে অবস্থান নেওয়ার কারণে পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে সেই সময় দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী।

উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে সারা দেশের মতো সিলেটেও প্রচারণা চালায় মুসলিম লীগের কর্মী-সমর্থকরা। তাদের এমন তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন সিলেটবাসী। নিজেদের দাবি বাস্তবায়নে নানামুখী তৎপরতা চালান এই অঞ্চলের নেতৃস্থানীয়রা। ১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকারের যানবাহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী আবদুর রব নিশতার সিলেটে এলে আবদুস সামাদের নেতৃত্বে ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যম এবং অফিস আদালতের ভাষা হিসেবে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করার দাবি জানান। ওইদিন জোবেদা খাতুন চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি নারী প্রতিনিধিদলও মন্ত্রীর সাথে দেখা করে একই দাবি উত্থাপন করেন।[২]

এদিকে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজির পাশাপাশি পরিষদে বাংলায় বক্তব্য রাখার প্রস্তাব করলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান তাঁর প্রস্তাবনার ঘোর বিরোধিতা করায় সিলেটে এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। এখানকার এক দল বিশিষ্ট নারী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী

[২] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, আনন্দধারা প্রকাশনা, পৃ. ৬৭।

বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন। সেই স্মারকলিপিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন: সিলেট জেলা মহিলা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জোবেদা খাতুন চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দা শাহার বানু, সেক্রেটারি সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন, সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী রাবেয়া খাতুন প্রমুখ।

এদিকে, ২৬ ফেব্রুয়ারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট এবং ১১ মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট কর্মসূচি আহ্বান করা হলে সিলেটের ছাত্র-জনতা এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। প্রাক-প্রস্তুতি হিসেবে শুরু হয় প্রচার অভিযান। কর্মসূচিকে সামনে রেখে শহরের গোবিন্দচরণ পার্কে (বর্তমান হাসান মার্কেট) ৮ মার্চ আহ্বান করা হয় জনসভা। তমদ্দুন মজলিশ ও মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভার সভাপতি ছিলেন মাহমুদ আলী। সভা শুরুর কিছুক্ষণ পরই মুসলিম লীগের কর্মীরা এসে হামলা চালায়। তারা মঞ্চ দখল করে নেয়। তাদের হামলায় গুরুতর আহত হন মকসুদ আহমদ। সভাস্থলের পাশে পুলিশের অবস্থান থাকলেও তারা ছিল নির্বিকার। এ ঘটনার প্রতিবাদে সিলেটের মহিলা মুসলিম লীগ ১০ মার্চ প্রতিবাদ সভা আহ্বান করে। কিন্তু প্রশাসন ২ মাসের জন্য সিলেট শহরে ১৪৪ ধারা জারি করার কারণে সেই সভা করা হয়নি। নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে প্রকাশ্যে সভাসমাবেশ থেকে বিরত থাকতে হয় আন্দোলনকারীদের। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *নওবেলাল* পত্রিকা। সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে পত্রিকাটিতে একের পর এক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে বাংলা ভাষার পক্ষে।

১৯৪৮ সালের পর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বস্তুত গতিহীন হয়ে পড়ে। তবে, *নওবেলাল* পত্রিকা দাবির পক্ষে অনড় থাকে। অতিক্রান্ত হয় চার বছর। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ঢাকা সফরে এসে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে আন্দোলনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। শুরু হয় দুর্বার আন্দোলন। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকায় মিছিলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার শহিদ হন। এ খবর সিলেটে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে রাজপথে শোকার্ত মানুষের ঢল নামে। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে সিলেটবাসী। ১৯৪৮ সালের ১১ই জানুয়ারি পাকিস্তান সরকারে যানবাহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুর রব নিশাতার সফরের উদ্দেশ্যে সিলেটে উপস্থিত হন। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন এবং অফিস আদালতের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার দাবী জানানোর জন্যে সিলেট মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুস সামাদের নেতৃত্বে একটি ছাত্র প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। একটি মহিলা প্রতিনিধিদলও সেই সময় আব্দুর রব নিশাতারের সাথে সাক্ষাত করে বাংলাকে

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবী জানান।[৩] সিলেট রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয় নানান কর্মসূচি। ২২ ফেব্রুয়ারি সিলেটে হরতাল আহ্বান করা হয়। 'ভাষা আন্দোলনে সিলেট' প্রবন্ধে তাজুল মোহাম্মদের ভাষ্যে ফুটে উঠেছে সেদিনের চিত্র। তিনি লিখেছেন:

১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সিলেট সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করে। সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, অফিস-আদালত কর্মচারিশূন্য রাস্তায় কোনো যানবাহন নেই; স্কুল কলেজে পূর্ণ ধর্মঘট। মিছিলের পর মিছিল বের হচ্ছে। সম্পূর্ণ শহর শোকে মুহ্যমান এবং প্রতিবাদমুখর। মুসলিম লীগ সরকারের এই জুলুমের প্রতিবাদে সমগ্র সিলেটবাসীই সোচ্চার। মুসলিম লীগের ভেতরেও এর প্রতিক্রিয়া কম হয়নি। সিলেটের জননন্দিত মুসলিম লীগ নেতা মাহমুদ আলী, এ জেড আবদুল্লাহ ও আবদুর রহিম (লাল বারী) এবং মতসির আলী (কালা মিয়া) দল থেকে পদত্যাগ করেন।

বিকাল ৩টায় গোবিন্দচরণ পার্কে অনুষ্ঠিত হয় জনসভা। জেলা বার এসোসিয়েশন [অ্যাসোসিয়েশন] সেক্রেটারি মোহাম্মদ আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় হত্যাকারীদের শাস্তি দাবি করে পরের দিনও হরতাল আহবান [আহ্বান] করা হয়। সভা শেষে একটি প্রতিনিধি দল স্থানীয় এমএলএ ও মুসলিম লীগ সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি দেওয়ান তৈমুর রাজা চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর পদত্যাগ দাবি করে। আর একটি দীর্ঘ মিছিল রাত ৮টা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন রাস্তা ও পাড়া-মহল্লা প্রদক্ষিণ করে। ঐ দিনই পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে যায় শহর। সমানভাবে চলছে মাইকিং। সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচি মাইকে প্রচার করা হচ্ছে অবিরত। গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয় হযরত শাহজালালের মাজার প্রাঙ্গানে [প্রাঙ্গণে]। তারপর সেখান থেকে বের হয় এক বিশাল গণমিছিল। কারো কারো মতে সাতচল্লিশের গণভোটের পর এত বড়ো [বড়ো] মিছিল আর দেখেনি কেউ সিলেটে।

সিলেটে তারপর থেকে প্রতিদিনই সভাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে। প্রায় মাসাধিককাল ধারাবাহিকভাবে নানা কর্মসূচি পালন করেছেন সিলেটবাসী। ভাষা আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে শুধু শহরেই নয়, গ্রামগঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছিল আন্দোলনের বহ্নিশিখা। এই অঞ্চলে যাঁদের নেতৃত্বে ও অংশগ্রহণে বেগবান হয়েছিল মায়ের ভাষা রক্ষার আন্দোলন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের নাম (বর্ণ ক্রম অনুসারে) হলো: আবদুল আজিজ, আসাদ্দর আলী, আবুল মাল আবদুল মুহিত, আবু জাফর আবদুল্লাহ, আবদুর রহিম, আবুল বশর, আবদুল মজিদ, আবদুস সামাদ আজাদ, আবু নছর মনির বখত মজুমদার, আখলাকুর রহমান, আবদুল হক, আবদুল হাই, আবদুল হামিদ, আবদুল মালিক, আবুল হাসনাত সাদত খান, উবেদ জায়গীরদার, এনামুল হক,

[৩] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, আনন্দধারা প্রকাশনা, পৃ. ৪৪।

ওয়ারিছ আলী, খন্দকার রুহুল কুদ্দুস, জালাল উদ্দিন আহমেদ খান, জোবেদা খাতুন চৌধুরী, তারা মিয়া, তসদ্দুক আহমদ, দেওয়ান আহমদ কবির চৌধুরী, দেওয়ান ফরিদ গাজী, দিলওয়ার, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দবির উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, নাইয়ার উদ্দিন আহমদ, নূরুল ইসলাম, নূরুল হক, নূরুর রহমান, নির্মল চৌধুরী, পীর হাবিবুর রহমান, প্রসূনকান্তি রায়, ফারুক আহমদ চৌধুরী, বাহাউদ্দিন আহমদ, মকসুদ আহমদ, মতছির আলী, মতিনউদ্দিন আহমদ, মনিরউদ্দিন আহমদ, মনির উদ্দিন, মহিবুর রহমান, মাহমুদ আলী, মুসলিম চৌধুরী, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, রিয়াছত আলী, রাবেয়া আলী, লুৎফুন্নেছা খাতুন, লিয়াকত আলী, শরফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, শাহেদ আলী, শামসুদ্দিন আহমদ, সৈয়দা শাহেরা বানু, সখাওতুল আম্বিয়া, সাফাত আহমদ চৌধুরী, সৈয়দ মুজতবা আলী, সৈয়দা নজিবুন্নেছা খাতুন, সৈয়দ মোতাহির আলী, সিরাজউদ্দিন আহমদ, হাজেরা মাহমুদ ও হিমাংশু ভট্টাচার্য।

মুক্তিযুদ্ধে সিলেট

ভাষা আন্দোলনে যেভাবে সামনের কাতারে ছিলেন এই অঞ্চলের মানুষ, ঠিক একইভাবে স্বাধিকার আদায়ের লড়াইয়েও ছিলেন অগ্রভাগে। মুক্তিযুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও দেশপ্রেমের অনন্য নজির স্থাপন করেছেন সিলেটের সংগ্রামী মানুষ। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছেন তাঁরা। একাত্তরে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সমগ্র জাতির সাথে একাত্ম হয়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন সিলেটের নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষ। আর তাঁদের একত্রিত করে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে সারা দেশের মতো সিলেটেও অনন্য ভূমিকা পালন করে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ন্যাপ (ভাসানী)সহ বামপন্থি রাজনৈতিক দলের অসংখ্য নেতা-কর্মীও মুক্তিযুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন নানাভাবে।

মূলত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর পরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রান্তিক এই জনপদ। রাজপথে নামে সর্বস্তরের মুক্তিকামী মানুষ। 'মুক্তিযুদ্ধে সিলেট' প্রবন্ধে লেখক মোহাম্মদ ফারুক আহমদ সেই সময়ের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন নিখুঁতভাবে। মার্চের উত্তাল দিনগুলো সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে যেভাবে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনার উন্মেষ ঘটে, সিলেটেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের ব্যানারে বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার মিছিল-মিটিং ছাড়াও অনেক স্থানে দলমতনির্বিশেষে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সিলেট শহর ও শহরতলির পাড়া মহল্লা এবং গ্রামে শুরু হয় দেশীয় অস্ত্রের মহড়া এবং প্রশিক্ষণ। ছুলফি, জাটি/জাটা, [জাঠা] বল্লুম, [বল্লম] তীর-ধনুক [তিরধনুক] প্রভৃতি দেশীয় অস্ত্রের ব্যাপক সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণ চলে গ্রামে গ্রামে। সিলেট শহর ও পার্শ্ববর্তী আম্বরখানা,

চৌকিদেখি, পীরমহল্লা, মালনীছড়া, খাদিমনগর, দলদলি প্রভৃতি এলাকার চা শ্রমিকদের সংগঠিত করা হয়। ছাত্রলীগ, যুবলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়নসহ পাড়া ও মহল্লার যুব সম্প্রদায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর [সামরিকবাহিনীর] বিরুদ্ধে চোরাগুপ্তা [চোরাগোপ্তা] হামলার ট্রেনিং নিতে শুরু করে। মজার ব্যাপার হলো শক্তিশালী একটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর [সেনাবাহিনীর] আধুনিক সমরাস্ত্রের বিরুদ্ধে ওইসব মধ্যযুগীয় অস্ত্র কতটুকু ফলপ্রসূ হবে সে বিষয়ে চিন্তা না করেই শুধু জাতীয় স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ [উদ্‌বুদ্ধ] হয়েই তারা এসব দুঃসাহসিক অভিযানের পরিকল্পনা করে। লাক্কাতুরা, তারাপুর, মালনীছড়া, দলদলি, তেলিহাটি প্রভৃতি চা বাগানের [চা-বাগানের] অজস্র টিলা-পাহাড় এবং ঘন জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের শতসহস্র চা শ্রমিক আম্বরখানা মুজুমদারি, গোয়াইপাড়া (বর্তমানে বড়োবাজার) এবং পীরমহল্লা অঞ্চলের ছাত্রলীগের প্রচুর ছাত্র, এলাকার যুবক ও শ্রমিক নিয়ে গড়ে তোলা হয় বৃহত্তর আম্বরখানা সংগ্রাম কমিটি। এলাকার দুঃসাহসী ছাত্র-যুবারা শারীরিক কসরৎ, [কসরত] তীরধনুক [তিরধনুক] চালানো ও ছোটোখাটো বিস্ফোরক তৈরি ও নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নিজেদের প্রচেষ্টায় চালাতে থাকেন।...একইভাবে সিলেট শহরতলির খাদিমনগর, চিকনাগুল, আখালিয়া, টুকেরবাজার, বাদাঘাট, টিলাগড় প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় যুবক ও বিভিন্ন পেশার জনগণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে সংগঠিত করার কাজে অগ্রসর হয়।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। উক্ত সরকার কর্তৃক জেনারেল এমএজি ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। বিভিন্ন সেক্টর ও বাহিনীর মাঝে সমন্বয়সাধন করা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ রাখা, অস্ত্রের যোগান নিশ্চিত করা, গেরিলা বাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা-প্রভৃতি কাজ সাফল্যের সাথে পালন করেন ওসমানী।

একদিকে শত্রুর মোকাবিলা করার প্রস্তুতি, অন্যদিকে মিছিল, মিটিং ও সমাবেশ সব মিলিয়ে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে উত্তাল হয়ে ওঠে সিলেটের রাজপথ। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে স্বাধিকারের দাবিতে মুক্তিকামীরা ছিলেন সোচ্চার। মিছিল মিটিং ও সমাবেশের প্রধান স্লোগান ছিল: 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সর্বস্তরের মানুষকে এক কাতারে এনে দাঁড় করায়। 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হতে থাকে সুরমা উপত্যকা।

১০ মার্চ বিকালে মহিলা পরিষদ সিলেট নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। কলম তুলি কণ্ঠ সংগ্রাম পরিষদ 'দুর্জয় বাংলা' নামের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ১৯ মার্চ। ২৩ মার্চ দেওয়ান ফরিদ গাজীর শেখ ঘাটস্থ বাসভবনে প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। একই দিন সিলেট ডিসি অফিসে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে শোয়েব আহমদ চৌধুরীসহ অন্যরা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

সময়ের সাথে সাথে বেগবান হতে থাকে আন্দোলন। ২৫ মার্চ ভিন্ন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সিলেটে। এদিন সকালে সিলেটের রাজপথে লাঠি হাতে জনতার ঢল নামে, যা ঐতিহাসিক 'লাঠি মিছিল' নামে খ্যাত। একই দিন বিকালে রেজিস্ট্রি মাঠে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সেই সময়ের অন্যতম বৃহৎ জনসভা। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ডা. আবদুল মালিক। বক্তব্য দেন দেওয়ান ফরিদ গাজী, ডা. নুরুল হোসেন চঞ্চল, কাজি সিরাজ উদ্দিন, শাহ মোদাব্বির আলী, সিরাজ উদ্দিন, জমির উদ্দিন, মোহাম্মদ আশরাফ আলী, ইনামুল হক চৌধুরী, মকসুদ ইবনে আজিজ লামা, সদর উদ্দিন চৌধুরী, শোয়েব আহমদ চৌধুরী, রফিকুল হক প্রমুখ।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে গুলির শব্দে ঘুম ভাঙে সিলেটবাসীর। ঢাকায় বঙ্গাবন্ধু গ্রেফতার হয়েছেন-এ খবর সিলেটে এসে পৌঁছালে উত্তেজিত ছাত্র-জনতা শহরের শামসুদ্দিন হোস্টেলের সামনের রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুটি সামরিক যান সেই ব্যারিকেড ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় উত্তেজিত জনতা জলপাই রঙের জিপ লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে গুলি ছোড়ে সেনা সদস্যরা। মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে যায় রাজপথ। শহরের ভাতালিয়া, নাইওরপুল, রিকাবীবাজার, লামাবাজার এবং টিলাগড় এলাকায় একইভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে ছাত্র-জনতার বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটে। নিরস্ত্র মুক্তিকামী মানুষের সেই প্রতিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবে, এ রাতে একটি সফলতা আসে ক্যাপটেন (অব.) এম এ মুত্তালিবের হাত ধরে। শহরে টিলাগড় পয়েন্টে শত্রু বাহিনীর ওপর দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন তিনি। শুধু মাত্র একটি রিভলভার নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জিপে আক্রমণ চালিয়ে দুজন পাকিস্তানি সৈন্যকে ঘায়েল করতে সক্ষম হন ক্যাপটেন মুত্তালিব।[৪]

২৬ মার্চ সকালে ছাত্র-জনতা বিভিন্ন পাড়া মহল্লা থেকে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড তৈরি করেন। তাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালান। তবে, তা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়নি।

২৮ মার্চ নায়েব সুবেদার মোশাররফ হোসেন এক প্ল্যাটুন ইপিআর. (বর্তমানে বিজিবি) সদস্য নিয়ে আখালিয়ায় ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি প্ল্যাটুনের ওপর আক্রমণ করেন। সংঘর্ষে ৩জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় ১০-১২জন পাকিস্তানি সৈন্য এবং ৩জন মুক্তিযোদ্ধা।[৫] সংঘর্ষে পাকিস্তানিদের ক্ষয়ক্ষতি অধিক হলেও তাদের তীব্র আক্রমণে বাধ্য হয়ে ইপিআর. বাহিনীর সদস্যরা পিছু হটেন।

---

[৪] তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটের যুদ্ধকথা,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ১৩।

[৫] রফিকুল ইসলাম, প্রবন্ধ: *সিলেটে মুক্তিযুদ্ধ: সূচনা পর্ব,* শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) *সিলেট: ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭৪৭।

এই পরিস্থিতিতে সিলেট শহরকে শত্রুমুক্ত করতে মেজর সিআর দত্তের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা হবিগঞ্জ থেকে সিলেট অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার সংযোগস্থল শেরপুরে হানাদার বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি থাকায় শেরপুরকে শত্রুমুক্ত করে সিলেটের দিকে অগ্রসর হওয়ার উদ্যোগ নেন মুক্তিযোদ্ধারা।

শেরপুরে আক্রমণ পরিচালনার জন্য হবিগঞ্জ থেকে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা শ্রীমঙ্গল হয়ে মৌলভীবাজারে পৌঁছেন। ১ এপ্রিল মৌলভীবাজারে মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। সেখান থেকেই গ্রহণ করা হয় যুদ্ধ পরিকল্পনা। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তিনটি কোম্পানিতে ভাগ করা হয়। ইউনুস চৌধুরী, আব্দুস শহীদ ও সুবেদার শামসুল আলমকে তিনটি কোম্পানির কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। ইউনুস চৌধুরী আনসারদের নিয়ে গঠিত কোম্পানির, আব্দুস শহীদ মুজাহিদদের নিয়ে গঠিত কোম্পানির এবং সুবেদার শামসুল আলমকে সৈনিক, প্রাক্তন সৈনিকসহ অন্যদের নিয়ে গঠিত কোম্পানির কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। মূলত হবিগঞ্জ ট্রেজারি থেকে সংগৃহীত ৩০৩ রাইফেল ও দেশপ্রেমকে পুঁজি করেই পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা।

৪ এপ্রিল রাতে শেরপুরের একেবারে কাছাকাছি একটি স্থানে মেজর সিআর দত্ত মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে অবস্থান নেন। পরিকল্পনা করা হয়, পরদিন ভোররাতে শত্রুর ওপর তিন দিক থেকে আক্রমণ চালানোর। দুটি প্ল্যাটুন ডান ও বাঁ-দিকে গিয়ে নদী পার হবে এবং অন্য সৈন্যরা মুখোমুখি আক্রমণ চালাবেন। শত্রু বাহিনী সম্মু খযুদ্ধে অবতীর্ণহলে মুক্তিযোদ্ধারা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবেন। ভোর ৫টায় মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। প্রথমে দিশাহারা হলেও তারা কিছু সময় পর পালটা আক্রমণ চালাতে থাকে। মুহুর্মুহু গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। বাংকারে দুই প্ল্যাটুন পাকিস্তানি সৈন্য ছিল। তাদের হাতে ছিল আধুনিক অস্ত্র। মুক্তিবাহিনীকে প্রতিহত করতে তারা ৩ ইঞ্চি মর্টার ও মেশিনগানের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে, যার ফলে পার্শ্ববর্তী বাড়িঘর বিনষ্ট হতে থাকে। ভোরে দিগবিদিক পালাতে থাকে সাধারণ লোকজন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে আক্রমণ ও পালটা আক্রমণের মাত্রা। মুক্তিবাহিনী ক্রমশ তিন দিক থেকে অগ্রসর হতে থাকে। মুক্তিবাহিনীর নির্ভুল নিশানার শিকারে পরিণত হতে থাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা। এই অবস্থায় সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শেরপুরের দখল ছেড়ে পাকিস্তানি বাহিনী সাদিপুরে পালিয়ে যায়। সাদিপুরে আগে থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক প্ল্যাটুন সৈন্য অবস্থান করছিল। শেরপুরের সৈন্যরা সেখানে পৌঁছলে তাদের শক্তিবৃদ্ধি পায়। মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক মেজর সি আর দত্ত সাদিপুর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। তবে, দিনের বেলা আক্রমণ পরিচালনা থেকে বিরত থাকেন তিনি।

সাদিপুর যুদ্ধের প্রাক্কালে তেলিয়াপাড়া থেকে ক্যাপটেন আজিজের নেতৃত্বে ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চার্লি কোম্পানি এসে যোগদান করলে মুক্তিফৌজের

শক্তি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। সাদিপুরে পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা হয় মুক্তিফৌজ, ইপিআর. এবং সামরিকবাহিনীর সম্মিলিত শক্তি দিয়ে। এ যুদ্ধে কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাশিম নামে একজন পাকিস্তানি সৈন্যকে অস্ত্রসহ বন্দি করতে সমর্থ হন। এ যুদ্ধেই শহিদ হন হবিগঞ্জের মহফিল হোসেন ও হাফিজ উদ্দিন। সাদিপুরে পাকিস্তানি সৈন্যরা এতই বিপদাপন্ন ছিল যে সিলেট থেকে অতিরিক্ত সৈন্য এনে এবং কভারিং ফায়ার দিয়ে তাদের উদ্ধার করতে হয়। তারপর পাকিস্তানি সৈন্যরা সিলেটে পালিয়ে যায় এবং সিলেট বিমানবন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা ৪ এপ্রিল সিলেটের টিবি হাসপাতালে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাজিত করে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার নুরুল হক, ইপিআর. বাহিনীর নায়েব সুবেদার গোলাম হোসেন, নায়েব সুবেদার মোখলেসুর রহমান, হাবিলদার ওয়াহিদুল ইসলাম, হাবিলদার হাফিজ উল্লাহ চৌধুরী এই অভিযানে অংশ নেন। ফলে সিলেট শহরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সকল পাকিস্তানি সৈন্য পালিয়ে সালুটিকর বিমানঘাঁটিতে অবস্থান নেয়।

৫ এপ্রিল ক্যাপটেন মুত্তালিবের নেতৃত্বে ২১জন মুক্তিযোদ্ধা সিলেট কারাগার থেকে বন্দিদের মুক্ত করেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরই মেজর সফিউল্লাহ এবং মেজর খালেদ মোশাররফ সিলেট আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। মেজর খালেদ মোশাররফ কুমিল্লা অভিমুখে যাত্রা করেন। তবে, মেজর সফিউল্লাহর বাহিনী সিলেট পৌঁছে হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

অন্যদিকে, সিলেটে অবস্থানরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে মোকাবিলার জন্য ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপটেন আজিজকে প্রেরণ করা হয়। তাঁর নেতৃত্বাধীন ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চার্লি কোম্পানির সৈন্যরা মৌলভীবাজার-কুলাউড়া-লাতু-শেওলা হয়ে চারখাইয়ের পথ ধরে সিলেটের দিকে অগ্রসর হয়। ৫ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে শুরু হয় যুদ্ধ। ৬ এপ্রিল মেজর দত্তের বাহিনী লালাবাজার এসে পৌঁছে। ক্যাপটেন আজিজের নেতৃত্বাধীন ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের সাথে মেজর দত্তের বাহিনী যুক্ত হওয়ায় মুক্তিবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি পায়। যার ফলে অনায়াসে ৭ এপ্রিল সন্ধ্যার মধ্যে মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে সুরমা নদীর দক্ষিণ পাড়। পাকিস্তানি সৈন্যরা বাধ্য হয়ে পিছু হটে সালুটিকর বিমানবন্দর এলাকায় অবস্থান নিয়ে নিরাপত্তা ব্যূহ গড়ে তোলে। অন্যদিকে সুনামগঞ্জ থেকে ইপিআর. সদস্যরা সিলেটে এসে পৌঁছেন। সালুটিকর বিমানবন্দর ছাড়া পুরো সিলেট মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। এই পরিস্থিতিতে সিলেটে দ্রুত সৈন্যসমাবেশ ঘটাতে শুরু করে পাকিস্তানি বাহিনী। পিআইএ-এর অভ্যন্তরীণ বিমান এবং পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সি-১৩০ হারকিউলিকস বিমানে করে সালুটিকর বিমানঘাঁটিতে

সৈন্য ও গোলাবারুদ নিয়ে আসে পাকিস্তানি বাহিনী। ১২০ মি.মি. কামান সজ্জিত গোলন্দাজ বাহিনী এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে গঠিত ৩১৩ ব্রিগেডকে বিমানঘাঁটিতে নিয়ে আসে তারা। পাকিস্তানি বাহিনীর এই শক্তিবৃদ্ধির খবর সোর্স মারফত অবগত হন মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা। শত্রুপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি বিচলিত করে তোলে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারদের। তাঁরা বিমানবন্দর আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। উদ্দেশ্য বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল করে দেওয়া। ৮ এপ্রিল খাদিমনগর থেকে এলএমজি ও ৩ ইঞ্চি মর্টারে সজ্জিত মুক্তিবাহিনীর দুটি দল বিমানবন্দর আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়ে যথাসময়ে আক্রমণ পরিচালনা করে। সালুটিকর বিমানবন্দরসংলগ্ন একটি টিলা থেকে মর্টারের গোলা বর্ষণকালীন শত্রুর মেশিনগানের গুলিতে প্রাণ হারান ল্যান্স নায়েক সুরত আলী। পাকিস্তানিদের পালটা আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা পিছু হটতে বাধ্য হন। ব্যর্থ হয় অভিযান।

এই পরিস্থিতিতে ক্যাপটেন আজিজ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন বাহিনীকে সিলেট শহরে মোতায়েন করেন। অন্যদিকে ইপিআর.-এর একটি কোম্পানিকে খাদিমনগরে প্রেরণ করা হয়। পাশাপাশি একজন মুজাহিদ ক্যাপটেনের নেতৃত্বে শহরের আম্বরখানা, ওয়্যারলেস এবং এমসি কলেজ এলাকায় ৬০জন স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়। রাতে খাদিমনগরে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ হয়।[৬] অন্যদিকে পাকিস্তানি বাহিনী বিমানবন্দর থেকে আম্বরখানার দিকে অগ্রসর হলে মুক্তিবাহিনী তাদের প্রতিরোধের চেষ্টা চালায়। প্রায় চার ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সৈন্যরা পুরো সিলেট শহরে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরে একত্রিত হন। তাঁদের অবস্থান লক্ষ্য করে পাকিস্তানি বাহিনী অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকে। তাদের আক্রমণে ভোরে শহিদ হন ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এলএমজিম্যান। *সিলেটে মুক্তিযুদ্ধ: সূচনা পর্ব* প্রবন্ধে এই অভিযান সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম লিখেছেন:

এ সময় পাকিস্তানি সেনারা নদী পারাপারের চেষ্টা থেকে বিরত থাকে। ক্যাপটেন আজিজ তাঁর ডানদিকে ৭৫ এম. এম. রিকয়েলেস [রিকয়েললেস] রাইফেল-এর দলটি মোতায়েন করে। এই দলটি পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। দুপুর ২টায় পাকিস্তানি বিমানবাহিনী হামলা শুরু করে। বিরাজমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাঙালি সৈন্যদের পশ্চাৎপসরণ [পশ্চাদপসরণ] করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। ৭৫ এম.এম. রিকয়েলেস [রিকয়েললেস রাইফেলের] দলটি অবস্থান পরিত্যাগ করে। ক্যাপটেন আজিজ দ্রুত সেখানে যান। তাঁর জিপের ওপর পাকিস্তানি সেনারা গোলাবর্ষণ [গোলা বর্ষণ] করলেও তিনি প্রাণে বেঁচে যান। পলায়নরত বাঙালি সৈন্যরা ক্যাপটেন আজিজকে জানান যে, শত্রুদের একটি

---

[৬] রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত,

প্ল্যাটুন নদী অতিক্রম করে কদমতলি পৌঁছে গেছে। দ্রুত অবনতিশীল পরিস্থিতিতে ক্যাপটেন আজিজ সৈন্যদের পুনরায় আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে ব্যর্থ হন। কমান্ড পোস্টে গিয়ে তিনি অবহিত হন যে, আরও একটি পাকিস্তানি প্ল্যাটুন নদী অতিক্রম করেছে। এই পরিস্থিতিতে ক্যাপটেন আজিজ লালাবাজারে সরে গিয়ে সৈন্যদের শেরপুর সাদীপুর লাইনে সরে যেতে আদেশ দেন। এখানে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করা হয়। ২৩ এপ্রিল শত্রুর জংগি বিমান [জঙ্গিবিমান] তার অবস্থানের ওপর কয়েকবার চক্কর দেয়। লক্ষ্যবস্তু নিশ্চিত হয়ে বিমান থেকে গোলাবর্ষণ [গোলা বর্ষণ] আরম্ভ করে। বাঙালি সৈন্যরা পিছু হটে যায়। কিন্তু ক্যাপটেন আজিজ প্রতিরোধ অবস্থান থেকে সরে না গিয়ে লড়াই অব্যাহত রাখেন। এই যুদ্ধে হাবিলদার মোসলেহ উদ্দিন ও ল্যান্স নায়েক আবদুর রহমান নিহত হয় [শহিদ হন]। ৫জন বাঙালি সৈন্যসহ ক্যাপটেন আজিজ গুরুতর আহত হন। সিলেটের বিশাল মুক্ত এলাকা এই বিপর্যয়ের ফলে পাক [পাকিস্তানি] বাহিনীর দখলে চলে যায়। [৭]

সিলেট শহর পতনের পর ছন্দপতন ঘটে এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধে। এপ্রিল মাসে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা কোনো ধরনের অপারেশন পরিচালনা করতে পারেননি সিলেটে। ক্যাপটেন আজিজ ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যদের নিয়ে মেজর সফিউল্লাহর সঙ্গে যোগদান করেন। আর মেজর সিআর দত্ত তাঁর বাহিনী নিয়ে চলে যান সীমান্তের ওপারে করিমগঞ্জে।

পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। ৪ নম্বর সেক্টরের আওতাধীন ছিল তৎকালীন সিলেট জেলা। মে মাসে এই সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর চিত্তরঞ্জন দত্তকে। এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল খোয়াই (ত্রিপুরা)। পরে মাসিমপুর স্থানান্তর করা হয়।

যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সারা দেশের মতো সিলেটেও 'নিয়মিত বাহিনী' এবং 'গণবাহিনী' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর., পুলিশ, আনসার এবং মুজাহিদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় 'নিয়মিত বাহিনী' এবং কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক তথা সাধারণ মানুষদের নিয়ে গঠিত হয় 'গণবাহিনী'। এই দুই বাহিনীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে 'মুক্তিবাহিনী'। সিলেট অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত তাঁর সমগ্র সেক্টরকে ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করেন। ৪ নম্বর সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৯৭৫জন এবং গেরিলা বাহিনীর সদস্য ছিল ৯ হাজার।

সিলেটের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে শুধু একটি সেক্টরের সাহায্যে পুরো জেলায় যুদ্ধ পরিচালনা দুরূহ ব্যাপারে পরিণত হয়। প্রয়োজন দেখা দেয় আরও একটি সেক্টর গঠনের। সময়ের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠা করা হয় ৫ নম্বর সেক্টর। এই সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর মীর শওকত আলীকে। ৫ নম্বর সেক্টরের সীমানা নির্ধারণ করা হয় সিলেট জেলার দুর্গাপুর থেকে ডাউকির

---

[৭] রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪৯-৫০।

(তামাবিল) পূর্ব সীমা পর্যন্ত। বাঁশতলায় প্রতিষ্ঠা করা হয় এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার। এই সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিলেন ১,৯৩৬জন এবং গেরিলা বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল ৯ হাজার।

বৃহত্তর সিলেট জেলার সুযোগ্য সন্তান মেজর জেনারেল এম.এ রব ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ১৯৭০ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সিলেটে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। প্রাথমিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লে তিনি এপ্রিল মাসে ভারতে আশ্রয় নেন। মুজিবনগর সরকার তাঁকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ ও সেকেন্ড-ইন-কমান্ড নিয়োগ করে। স্বাধীনতার পর তাঁকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়। ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ পদে অধিষ্ঠিত ছেলেন। মুক্তিযুদ্ধে অসম সাহসিকতা ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'বীরউত্তম' খেতাবে ভূষিত করে। ১৯৭৩ সালে তিনি সিলেট থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর এম.এ.রব মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০০ সালে তাঁকে স্বাধীনতা পদকে (মরণোত্তর) ভূষিত করে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন তাঁর নামে ঢাকার একটি সড়কের নামকরণ করেছে বীরউত্তম এম. এ. রব সড়ক।

বৃহত্তর সিলেটে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন আরেকজন ব্যাক্তি। তিনি হলেন কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সম্মু খসমরে সরাসরি অংশগ্রহণের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদেরও সংগঠিত করেন। সম্মু খসমরে অংশ নেয়ার পাশাপাশি ৩ নং ও ৪ নং সেক্টরে সৈন্য, অস্ত্র, খাদ্য সরবরাহসহ ভারতের খৈয়াই ও কৈলাশহরের মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল এম. এ. রব তাকে সিভিলিয়ান হওয়া সত্ত্বেও "কমান্ড্যান্ট" উপাধিতে ভূষিত করেন।

সিলেট জেলাকে দুটি সেক্টরে বিভক্ত করার পর গতি সঞ্চার হয় যুদ্ধে। গেরিলা যুদ্ধের পাশাপাশি প্রথাগত (Conventional War) যুদ্ধও চলতে থাকে। সিলেট জেলায় ৩০টিরও অধিক অপারেশন পরিচালনা করে মুক্তিবাহিনী। বেশ কয়েকটি সম্মু খযুদ্ধেও মুখোমুখি হয় বীর সেনারা।১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পুরো ৯ মাসজুড়েই সিলেটে চলে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে একের পর এক লড়াই। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হলো:

সূতারকান্দি

এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে কৌশলগত কারণে মুক্তিবাহিনী গোলাপগঞ্জের ডিফেন্স ছেড়ে বিয়ানীবাজারের বড়োগ্রাম বিওপিতে ডিফেন্স গড়ে তোলে। বিয়ানীবাজার তখন পর্যন্ত শত্রুমুক্ত থাকায় অগ্রসরমান পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মুক্তিবাহিনী এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

অন্যদিকে, মুক্তিবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়ে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি শেওলা ফেরিঘাট এলাকায় প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে। শেওলা ফেরিঘাট এলাকায় এক সপ্তাহের ব্যবধানে দ্বিগুণ সৈন্যসমাবেশ ঘটায় পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্তিবাহিনীর পরিকল্পনা ছিল আক্রমণাত্মক অভিযানের মাধ্যমে কুশিয়ারা নদী এলাকাতে পাকিস্তানি বাহিনীকে বাধা দেওয়া। সেই লক্ষ্যে ক্যাপটেন রবের নেতৃত্বে বড়োগ্রাম বিওপি থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান স্থলে মাঝেমধ্যে আক্রমণ করছিল মুক্তিবাহিনী। তবে, বড়ো ধরনের কোনো সংঘর্ষ হয়নি। ২০ মে ভোরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুই কোম্পানি সৈন্য কুশিয়ারা নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। ২৪ মে সকাল ৬টায় পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি কোম্পানি সুতারকান্দিতে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের ওপর এবং অন্য কোম্পানি আক্রমণ করে বড়োগ্রামে। মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তুললে তুমুল সংঘর্ষ বাধে উভয় পক্ষের মধ্যে। মুক্তিবাহিনী সংখ্যায় মাত্র এক কোম্পানি ছিল। কিন্তু কৌশলী মুক্তিযোদ্ধারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যার ফলে হানাদার বাহিনীর সদস্যরা অগ্রসর হতে পারছিল না। সকাল ১০টা পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী নিজেদের অবস্থানস্থলে অটুট থাকলেও সকাল ১১টার দিকে তাদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই মুক্তিবাহিনীকে পিছু হটতে হয়।[১৭] যার ফলে দুপুর ১২টা নাগাদ পুরো এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় পাকিস্তানি বাহিনী। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রাণ হারায় ৩৯জন পাকিস্তানি সৈন্য, বন্দি হয় ২জন। অন্যদিকে, ২জন মুক্তিযোদ্ধা আটক হন পাকিস্তানিদের হাতে, আহত হন কয়েকজন। ক্যাপটেন রব পরে তাঁর বাহিনী নিয়ে বড়োপুঞ্জিতে ঘাঁটি স্থাপন করেন।

আটগ্রাম-জকিগঞ্জ জকিগঞ্জের আটগ্রাম দখল মুক্তিবাহিনীর কাছে অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জকিগঞ্জকে শত্রুমুক্ত করা ছিল খুবই জরুরি। আটগ্রামে শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যূহ ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর। সেখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক কোম্পানি নিয়মিত সৈন্য, একটি রাজাকার কোম্পানি ও এক কোম্পানি খাইবার স্কাউটস অবস্থান করছিল। হানাদাররা রাতের আঁধারে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যাতায়াতের রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখার কারণে মুক্তিবাহিনীসহ ওপারে চলাচলকারীরা আতঙ্কের মধ্যে থাকতেন। কারণ, কয়েকটি মাইন বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনাও ঘটে। এই পরিস্থিতিতে সেক্টর কমান্ডার চিত্তরঞ্জন দত্ত আটগ্রামে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। দুই কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে লে. জহির শত্রুর ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করেন।

৯ নভেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা। সন্ধ্যার পর পরই আটগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন মুক্তিযোদ্ধারা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, আটগ্রাম এবং দর্পনগর গ্রামের নিকটে সুরমা নদী অতিক্রম করে শত্রুর মূল ঘাঁটি সামনে রেখে রাস্তার দুই পাশে যোদ্ধাদের নিয়ে অবস্থান নেন লে. জহির। অন্যদিকে, লে. গিয়াস এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে আটগ্রাম-জকিগঞ্জ সড়ক শত্রুমুক্ত রাখতে নিয়োজিত থাকেন। এদিকে, ভোরে আরও এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে আটগ্রামে পৌঁছেন ক্যাপটেন রব। তিনি তাঁর সৈন্যদের নিয়ে রাজাকারদের ক্যাম্প অতর্কিতে আক্রমণ করেন। ঘুমন্ত রাজাকাররা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ঘিরে ফেলেন। বাধ্য হয়ে ১১জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। তবে, একজন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের হাত ফসকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সে পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটিতে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের খবর জানিয়ে দেয়। ক্যাপটেন রব তাৎক্ষণিকভাবে রাস্তার দুই পাশে যোদ্ধাদের নিয়ে বাংকার তৈরি করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের খবর পেয়ে তাঁদের প্রতিহত করতে এগিয়ে আসে হানাদার বাহিনীর সদস্যরা। পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেল রেঞ্জের মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপটেন রব গুলির নির্দেশ দেন। গর্জে ওঠে মুক্তিবাহিনীর হাতিয়ার। কোনো ধরনের প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হয় পাকিস্তানি বাহিনী। এই যুদ্ধে ১৮জন পাকিস্তানি সৈন্য প্রাণ হারায়।[৮] বাকিরা পালিয়ে যায়। অন্যদিকে, লে. জহির এবং লে. গিয়াস তাঁদের বাহিনী নিয়ে শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে তুমুল লড়াই চলতে থাকে। পরবর্তীকালে জেড ফোর্সের ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টও যুদ্ধে যোগদান করে। এই যুদ্ধে ভারতের ৪-৫ গোর্খা রাইফেলস আক্রমণ রচনা করে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ও খাইবার স্কাউটসের ক্ষতিসাধন করে। প্রায় দশ দিনের সংঘর্ষের পর বিজয় অর্জিত হয়। শত্রুমুক্ত হয় জকিগঞ্জ ও আটগ্রাম।

রাধানগর অভিযান

বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে কয়েকটি সুরক্ষিত ঘাঁটি ছিল তারমধ্যে জাফলংয়ের রাধানগর কমপ্লেক্স অন্যতম। অবস্থানগত কারণে এটি ছিল সামরিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওপারে ডাউকি-শিলং, এপারে গোয়াইনঘাট এবং এ পথ ধরেই সিলেটের পথে অগ্রসর হওয়ার রাস্তা থাকায় রাধানগর ও এর আশপাশ এলাকায় শক্তিশালী সুরক্ষা বলয় গড়ে তুলেছিল পাকিস্তানি বাহিনী, যার ফলে এ পথ ধরে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। হানাদারদের নিরাপত্তা ব্যূহ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, তারা পাকা কংক্রিট বাংকারগুলোর মধ্যে কমান্ড পোস্টের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। বেতার টেলিফোন সংযোগ ছাড়াও ক্রলিং ট্রেঞ্চের সাহায্যে এক বাংকার থেকে অন্য বাংকারে যাতায়াত, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর গোলন্দাজ সাহায্যও ছিল নিশ্চিত।

---

[৮] সুকুমার বিশ্বাস, প্রবন্ধ: *সিলেটে মুক্তিযুদ্ধ: মে-ডিসেম্বর ১৯৭১*, শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) *সিলেট: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭৬১।

পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকাররা রাধানগর স্কুল, সুলতান মেম্বারের বাড়ি, ইসলামপুর বস্তি, মুরা বস্তি, কুমিল্লা বস্তি, কাফাউরা ও ছোটোখেল গ্রামে নিরাপত্তা ব্যূহ গড়ে তুলেছিল। ছোটোখেল গ্রামে ছিল পাকিস্তানিদের কমান্ড পোস্ট ও তিন ইঞ্চি মর্টারের অবস্থান। পাকিস্তানি বাহিনীর এই সুরক্ষা বলয় ভাঙতে মেজর শাফায়াত জামিল ক্যাপটেন নুরুন্নবীকে সাথে নিয়ে রাধানগর অভিমুখে অগ্রসর হন। মেজর শাফায়াত জামিল ৪ নভেম্বর ডাউকি সীমান্তে পৌঁছেন। ৫ নভেম্বর সকালে ক্যাপটেন নুরুন্নবীকে তাঁর কোম্পানি ও হেডকোয়ার্টারের কোম্পানি নিয়ে লুনি গ্রামে পৌঁছার নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী, লে. মনজুর আলফা কোম্পানি নিয়ে কাফাউরা গ্রামসংলগ্ন এলাকায় পৌঁছেন। এই স্থানে আগে থেকেই সুবেদার মোশাররফের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি দল অবস্থান করছিল। অন্যদিকে লে. মতিউর রহমানের নেতৃত্বে একটি এফএফ কোম্পানি জাফলং চা-বাগানের বিপরীতে এবং মুজাহিদ ক্যাপটেন দাউদের অধীনে মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানি কাফাউরার বিপরীতে অবস্থান নেয়। *মুক্তিযুদ্ধে দু'শ রণাঙ্গন* বইয়ে রাধানগর যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে:

মেজর শাফায়াত [ওই] রাতেই সমগ্র এলাকা রেকি করেন এবং রাতের অন্ধকারে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। নির্দেশ মোতাবেক ভোরের আগেই বাংকার খুঁড়ে অবস্থান নেওয়া [নেওয়া] হল [হলো]। পরদিন বিকাল তিনটায় পাকিস্তানিদের একটি প্যাট্রল পার্টি মুক্তিবাহিনীর এই অবস্থানের সম্মু খ দিয়ে সুরাগ্রামে যাচ্ছিল। পাকিস্তানিরা যখন ৫০ গজ দূরে তখন সম্মু খের বাংকার থেকে মাখন ও সিপাই [সিপাহি] মুজিব উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে এসে পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে, 'হ্যান্ডস আপ।' পাকিস্তানি সৈন্যরা দ্রুত পাশের পায়ে হাঁটা রাস্তার ওপারে অবস্থান নিয়ে গুলিবর্ষণ [গুলি বর্ষণ] শুরু করে। মাখন ও মুজিব গুরুতর আহত হয়। এই ঘটনার পরে দুই পক্ষের গুলিবিনিময় চলতে থাকে।

লুনিগ্রামে চারদিন অবস্থানের পরে ক্যাপটেন নবী দুয়ারী খেল, ছাত্তারগাঁ ও গোরাগ্রামে প্রতিরক্ষাব্যূহ [প্রতিরক্ষা ব্যূহ] রচনা করেন। জাফলং চা বাগানের [চা-বাগানের] সম্পূর্ণ এলাকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। এ সময় সি কোম্পানির একটি প্লাটুন [প্ল্যাটুন] সুবেদার হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে এবং ই কোম্পানির একটি প্লাটুন [প্ল্যাটুন] হাবিলদার সিদ্দিকের নেতৃত্বে ক্যাপটেন নবীর সাথে যোগাযোগ করে। ছাত্তারগাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব আলী আকবরকে দিয়ে ক্যাপটেন নবী শিমুলতলা গ্রামের ওপরে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। শিমুলতলা গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে গোয়াইনঘাট-রাধানগর সড়ক। সুতরাং এখানে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান পাকিস্তানিদের জন্য ছিল বিপজ্জনক।

২৬ নভেম্বর রাতে ক্যাপটেন নবী শিমুলতলা গ্রামে রাধানগর-গোয়াইনঘাট সড়ককে সামনে রেখে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করেন। [ওই] রাতেই ভারতীয় ৫/৫ গুর্খা [গোর্খা] রেজিমেন্ট রাধানগর গ্রামে আক্রমণ করে। রাধানগরের

*পশ্চাতে ছোটোখেলে গুর্খাদের [গোর্খাদের] একটি কোম্পানি আক্রমণ চালায়। সুবেদার বদিউর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। ভোর হয়ে আসছে- আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে ভারতীয় বাহিনী গোলা বর্ষণ শুরু করে। গুর্খাদের [গোর্খাদের] একটি কোম্পানি রাধানগর স্কুলে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে আক্রমণ করে। অপর কোম্পানিটি মুক্তিবাহিনীসহ ছোটোখেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড যুদ্ধ শেষে গুর্খা [গোর্খা] রেজিম্যান্ট [রেজিমেন্ট] ও মুক্তিবাহিনী ছোটোখেল দখল করে নেয়। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ১৭জন নিহত হয় এবং বহু সৈন্য গুরুতরভাবে আহত হয়। কিন্তু মাত্র ছয় ঘণ্টা পরেই পাকিস্তানিরা প্রতি হামলা (*Counter attack) *করে।*[৯]

পাকিস্তানিদের আক্রমণে পিছু হটতে বাধ্য হয় গোর্খা বাহিনী। এই পরাজয়ের পর শিমুলতলা গ্রামে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্তিবাহিনী নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকে। পুনরায় ছোটোখেল আক্রমণের জন্য মেজর শাফায়াত জামিলকে নির্দেশ দেন সেক্টর কমান্ডার মেজর মীর শওকত আলী। মেজর শাফায়াত জামিল ক্যাপটেন নবীর অবস্থানে পৌছে আক্রমণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। ২৮ নভেম্বর রাতে মেজর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে মেজর শাফায়াত জামিল আহত হলে মুক্তিবাহিনী কৌশল অবলম্বন করে পিছু হটে। ৩০ নভেম্বর মুরা বস্তি, ইসলামপুর বস্তি, কুমিল্লা বস্তি এবং রাধানগর স্কুল দখলের জন্য মুক্তিবাহিনী পুনরায় ক্যাপটেন নবীর নেতৃত্বে আক্রমণ চালায়। মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ও বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা রাতের আঁধারে পালিয়ে যায়। রাধানগর মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে আসে।

কানাইঘাট অভিযান

কানাইঘাটেও হানাদারদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। সিলেট অভিমুখে অগ্রসরের জন্য কানাইঘাটকে হানাদারমুক্ত করা ছিল খুবই জরুরি। কানাইঘাটে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রথমে জেড ফোর্সকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী, ক্যাপটেন রবকে কানাইঘাট-দরবস্ত সড়কে প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশনা দেওয়া হয়। ক্যাপটেন রব ২৬ নভেম্বর পার্শ্ববর্তী লোভাছড়া চা-বাগানে অবস্থান নেন, যার ফলে পাকিস্তানি সৈন্যদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ হয়ে আসে। অন্যদিকে, অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়। জেড ফোর্সের পরিবর্তে ৪ নম্বর সেক্টর ট্রু পসেরুওপর কানাইঘাট আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হলে সেক্টর কমান্ডার মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত অভিযান পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন করেন। তিনি লে. গিয়াসের নেতৃত্বে একটি কোম্পানিকে কাট অফ পার্টি হিসেবে দরবস্ত-কানাইঘাট সড়কে ডিফেন্স নিতে বলেন। উদ্দেশ্য, কানাইঘাটে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যরা যাতে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছ থেকে কোনোরূপ সাহায্য নিতে না পারে। একই পদ্ধতি অবলম্বন করে লে. জহিরের নেতৃত্বে আরও একটি কোম্পানিকে কানাইঘাট-চরখাই সড়কে ডিফেন্স নিতে বলা হয়।

[৯] মেজর রফিকুল ইসলাম (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের দ'শ রণাঙ্গন*, পৃষ্ঠা ৩৩

চরখাই থেকে যাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা কানাইঘাট অভিমুখে অগ্রসর হতে না পারে সে উদ্দেশ্যে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আক্রমণের মূল দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ক্যাপটেন রবের ওপর। সরাসরি সম্মু খভাগে আক্রমণ চালিয়ে কানাইঘাট দখলের নির্দেশনা দেওয়া হয় মুক্তিযোদ্ধাদের। ২ ডিসেম্বর দুটি কোম্পানিকে নিয়ে যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছেন ক্যাপটেন রব। মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে তাঁদের প্রতিহত করতে আর্টিলারির গুলি বর্ষণ শুরু করে পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্তিবাহিনীও পালটা আক্রমণ করে। শুরু হয় তুমুল লড়াই। ৪ ডিসেম্বর ভোরে তিন দিক থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের ঘিরে ফেলে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা। ভোর ৫টায় শত্রুপক্ষের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালান মুক্তিযোদ্ধারা। সকাল সোয়া ৭টায় পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে আক্রমণ করলে অধিকাংশ পাকিস্তানি সৈন্য প্রাণ হারায়। পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক সদস্য প্রাণ বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দেয়। তাতেও তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। সকাল সাড়ে ৮টায় শত্রুমুক্ত হয় কানাইঘাট। এখানে শহিদ হন ১১জন মুক্তিযোদ্ধা, আহত হন ২০জন। অন্যদিকে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মেজর সরোয়ারসহ ২৫জন পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে এবং নিহত হয় ৫০জন।[১০]

মুক্তিবাহিনীর একের পর এক আক্রমণে নাস্তানাবুদ হতে থাকে হানাদার বাহিনী। আটগ্রাম, জাফলং, রাধানগর, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট প্রভৃতি এলাকায় পরাজিত হয়ে পিছু হটতে থাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বিশেষ করে কানাইঘাট ও গোয়াইনঘাটে পরাজয়ের পর পাকিস্তানি সৈন্যরা সিলেট সালুটিকর বিমানবন্দর এলাকায় তাদের প্রধান ঘাঁটিতে এসে আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে জৈন্তার দরবস্ত ও সারিতে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যরা শেষ ডিফেন্স লাইন হিসেবে হরিপুরে জড়ো হয়। ৭ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা হরিপুর আক্রমণ করে তাদের সেই ডিফেন্স ভাঙতে ব্যর্থ হন। এ প্রসঙ্গে মেজর সিআর দত্তের ভাষ্য:

আমাকে বলা হল [হলো] হেমুর (পাকিস্তানিদের ঘাঁটি) পেছন দিক থেকে পাক [পাকিস্তানি] সেনাদের আক্রমণ করতে এবং যেভাবেই হোক হেমু শত্রুমুক্ত করে হরিপুরের ওপর আক্রমণ চালাতে। খাওয়া-দাওয়া সেরে গ্রাম থেকে দু-জন গাইড নিয়ে চললাম হেমুর উদ্দেশ্যে। সারা রাত [সারারাত] নদী, খাল-বিল পার হয়ে পৌঁছলাম আটগ্রাম নামক এক গ্রামে। এখান থেকে হেমুর দূরত্ব প্রায় দু'মাইল। আটগ্রামে পৌঁছলাম ভোর ৪টায়। সঙ্গে সঙ্গে মৌলভী [মৌলবি] সাহেবের আযান শোনা গেল। মনটা যেন কেমন করে উঠল। মেজর রব এবং ডা. নজরুলকে বললাম এই আযানের কি অর্থ হতে পারে? তর্ক করার সময় তখন ছিল না। গ্রামের পাশেই নদী। এই নদী পার হতে হবে। অনেক কষ্টে দুটো নৌকা জোগাড় করা গেল। ওপারে সবাই পৌঁছলাম। আমার সৈন্যরা কোথায় থাকবে, কি খাবে ইত্যাদি চিন্তা-ভাবনারও সময় পাওয়া গেল না। সকাল প্রায়

[১০] মেজর রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩।

৬টায় পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর হঠাৎ করেই মর্টারের গোলাবর্ষণ [গোলা বর্ষণ] শুরু করে। একই সঙ্গে আমাদের ওপর আরম্ভ হল [হলো] মেশিনগান ও এল.এম.জির গুলিবর্ষণ [গুলি বর্ষণ]। সৈন্যরা যে পজিশন নেবে তারও সময় নেই। হঠাৎ করে আক্রমণ হওয়ায় আমার সৈন্যরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মৌলভীকে [মৌলবিকে] খুঁজতে পাঠালাম, কিন্তু পাওয়া গেল না। চারধার থেকে খবর আসছে শুধু মৃতের এবং আহতের। তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বৃষ্টির মতো গোলাগুলি হচ্ছিল। আমাদের এখন কিছুই করবার নেই। চিন্তা করলাম যদি আটগ্রামে থাকি তাহলে [তা হলে] সবাই মারা পড়ব। কারণ পাকিস্তানিরা আমাদের অবস্থান জেনে ফেলেছে। তাই সবাইকে যে যেভাবে পারে পেছনে দু'তিন মাইল দূরে আরেক গ্রামে চলে যেতে বললাম। যখন আমরা আটগ্রাম ছেড়ে পেছনের গ্রামের দিকে যাচ্ছিলাম তখন আমাদের কেউ মারা যায়নি বা আহত হয়নি। যদিও আমাদের ওপর প্রচুর গোলাগুলি হচ্ছিল। যখন সবাই এসে পৌঁছলাম তখন দেখলাম আমার ১১জন ছেলে শহিদ হয়েছে, ৫জন হয়েছে গুরুতর আহত।

মুক্তিবাহিনীর পুনরায় আক্রমণের আশঙ্কায় পাকিস্তানি বাহিনী হরিপুরের অবস্থান ছেড়ে খাদিমনগরে এসে আশ্রয় নেয়। কারণ তাদের শেষ অগ্রবর্তী ঘাঁটি ছিল খাদিমনগর। অন্যদিকে কিনব্রিজ, সিলেট বিমানবন্দর ও রেডিয়ো স্টেশনে নিয়ন্ত্রণ আনার লক্ষ্যে ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেডের ৪/৫ গোর্খা রাইফেলসকে হেলিকপটারে করে সিলেট শহরের সামান্য বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ধুবড়ী হাওর এলাকায় অবতরণ করানো হয়। এই বাহিনী সিলেট শহরের দিকে অগ্রসর হতে চাইলে পাকিস্তানি বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধের সম্মু খীন হয়। এই বাহিনীর ছত্রীসৈন্যদের সাথে কৈলাসহর থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধা সোলেমানকে পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। এই বীর যোদ্ধার স্মরণে সিলেটে দুটি হলের নামকরণ করা হয়েছে। সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের 'জিন্নাহ হল'-এর নাম পরিবর্তন করে 'শহিদ সোলেমান হল' এবং মদনমোহন কলেজের একটি হলের নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামে।

১৫ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনী ডানদিক থেকে এবং সেক্টর ট্রু পস বাঁদিক থেকে খাদিমনগরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের প্রতিহত করতে খাদিমনগর ইদগাহ থেকে মুক্তিবাহিনীর ওপর গুলি বর্ষণ শুরু করে পাকিস্তানি বাহিনী। ওই দিন বিকেল ৫টায় ইপিআরের হাবিলদার গোলাম রসুল দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেন। অকুতোভয় এই যোদ্ধা একা ক্রলিং করে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের ওপর গ্রেনেড চার্জ করতে থাকেন, যার ফলে হানাদার বাহিনীর সদস্যরা ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করে। শত্রু বাহিনীকে ঘায়েল করতে গিয়ে গোলাম রসুল শহিদ হন। পাকিস্তানি বাহিনীর বুলেট কেড়ে নেয় এই দেশপ্রেমিকের প্রাণ। মুক্তিবাহিনী তীব্র আক্রমণ চালিয়ে খাদিমনগরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

ফলে সিলেট শহর থেকে পালিয়ে যাওয়ার সব পথ বন্ধ হয়ে যায় পাকিস্তানি সৈন্যদের। এই পর্যায়ে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেয়। ১৭ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সিলেটে যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি সৈন্যরা। সেদিন ৩জন ব্রিগেডিয়ার, ১০৭জন অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তা, ১৯১জন জেসিওসহ মোট ৬,৫৫৬জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করে সিলেটে। তাদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের।

সিলেটে যুদ্ধাপরাধ যুদ্ধাপরাধ বলতে যা বোঝায় তার প্রতিটি অপরাধই মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছে সিলেট অঞ্চলে। হানাদার বাহিনীর পাশাপাশি রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তি কমিটির সদস্যরা এই অঞ্চলের মুক্তিকামী মানুষের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছে তা আঁতকে ওঠার মতো। স্বাধীনতার শত্রুরা গণহত্যা, নারীনির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালিয়েছে যুদ্ধের পুরো ৯টি মাস। এমনকি হাসপাতালের রোগী, ডাক্তার কেউই রেহাই পায়নি তাদের হাত থেকে।

গণহত্যা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সিলেট জেলার ৬৪ স্থানে গণহত্যা সংঘটিত হয়। এসব গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীর পাশাপাশি রাজাকার এবং আলবদরদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। অনেক স্থানে রাজাকাররাই হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দিয়েছে। তাদের নিক্ষিপ্ত বুলেটে প্রাণ হারিয়েছে নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষ। ‘সিলেটে গণহত্যা’ বইয়ে তাজুল মোহাম্মদের ভাষ্য অনুযায়ী সিলেটে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের নির্মমতায় প্রাণ হারিয়েছে ২,৪৪১জন মানুষ। এই পরিসংখ্যানের বাইরেও অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে বিভিন্ন বধ্যভূমিতে, যার ফলে এই অঞ্চলের ঠিক কত মানুষ আত্মোৎসর্গ করেছেন স্বাধীনতার বেদিমূলে তার সঠিক পরিসংখ্যান বের করা দুরূহ ব্যাপার।

সিলেটের যে-সব স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা চালায় তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য বধ্যভূমিগুলো হচ্ছে: আম্বরখানা, পুরান লেন, খালপাড়, কামালগড়, বন্দর বাজার, বারুতখানা, ন্যাশনাল ব্যাংক, আবহাওয়া অফিস, টুলটিকর, মিরাবাজার, মির্জা জাঙ্গাল, দাড়িয়াপাড়া, সুবিদবাজার, নয়া সড়ক, হাওয়াপাড়া, সিলেট হাসপাতাল, ইলাশকান্দি, আখালি, দক্ষিণ সুরমা, কলাপাড়া, লাক্কাতুরা, মালনীছড়া, বড়োশালা, সালুটিকর, মহালদিক, কেওয়াছড়া, কালাগুল চা-বাগান, কালাগুল বস্তি, খাদিমনগর চা-বাগান, স্টার চা-বাগান, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, ইলাশপুর, লালকৈলাশ, গোয়ালাবাজার, সাদিপুর, সুরিকোনা, শেরপুর, গালিমপুর, বুরুঙ্গা, আদিত্যপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সুন্দিশাইল, সুপাতলা, মাথিউড়া, আলীনগর, চরখাই, শেওলা, কুড়ারবাজার, মুড়িয়া, লাউতা, লোহারমহল, কালিগঞ্জ, চারগ্রাম, মালিগ্রাম, খান চা-বাগান, হেমু, গোয়াইনঘাট, পূর্ণানগর, ছাতারগ্রাম, কামাইদ, কচুয়ারপাড়, গৌরীনগর, মিত্রিমহল প্রভৃতি।

পাকিস্তানি বাহিনী কতটা নৃশংস ছিল একাত্তরে তার প্রমাণ পাওয়া যায় *দৈনিক যুগভেরীর* ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের প্রতিবেদনে। 'হাসপাতালে হত্যাযজ্ঞ, হার মেনেছে সকল বর্বরতা' শিরোনামে সেই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়:

আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধকালীন সময়ে হাসপাতাল নিরাপদ স্থান। কিন্তু পাক [পাকিস্তানি] পশুর দল কোনো রীতিনীতি মানেনি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হিটলারের বাহিনীর চেয়েও বর্বর হয়ে [ওঠে] তারা।

১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল ভোর থেকে সিলেট শহরে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের দামামায় কেঁপে ওঠে পুরো শহর। একপর্যায়ে মুক্তিবাহিনীকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায় পাক [পাকিস্তানি] বাহিনী। এতে আহত হয় অসংখ্য সাধারণ মানুষ। তারা চিকিৎসা নিতে ছুটে আসে সিলেট সদর হাসপাতালে। প্রাণ বাঁচাতেও হাসপাতালে এসে আশ্রয় নেয় অনেকে। সবার ধারণা ছিলো [ছিল] হাসপাতালে আসবে না হানাদাররা। সকলের ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত করে সকাল ১১টায় হাসপাতাল চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে পাক [পাকিস্তানি] আর্মি। এসময় আহত রোগীদের চিকিৎসায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দিন আহমদ ও ডা. শ্যামলকান্তি লালাসহ অন্যান্য চিকিৎসক। গুলির শব্দে ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে আসেন ডা. শামসুদ্দিন, শ্যামলকান্তি লালাসহ অন্যরা [অন্যান্যরা]। রেডক্রুসের ব্যাজপরিহিত [ব্যাজ পরিহিত] ডাক্তাররা পাক [পাকিস্তানি] বাহিনীর কাছে জানতে চান আক্রমণের কারণ। তাঁদের কোনো কথা না শুনে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে তাঁদের ঘেরাও করে তারা। ৭জন রোগীকেও আটক করে। এরপর [তারপর] চালায় হত্যাযজ্ঞ [হত্যাকান্ড]। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়, ডা. শামসুদ্দিন, শ্যামলকান্তি লালা, হাসপাতালের গাড়ি চালক কোরবান আলী, ওয়ার্ডবয় মুখলেছুর রহমান ও মাহমুদুর রহমান এবং ৭জন রোগীর বুক। সেই বর্বরতায় নেতৃত্ব দিয়েছিল পাক [পাকিস্তানি] মেজর রিয়াজ।

নারীনির্যাতন

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী যেভাবে নিরীহ মুক্তিকামী বাঙালি হত্যায় মেতে ওঠে তেমনই নারীদের ওপর চালাতে থাকে নারকীয়তা। প্রায় প্রতিটি গণহত্যা স্থলের আশপাশ এলাকায় সম্ভ্রম হারিয়েছেন অসংখ্য মা-বোন। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধা, কেউই রেহাই পায়নি হানাদারদের হাত থেকে। অন্তঃসত্বা, প্রসূতি যাঁকেই পেয়েছে তাঁকেই তারা বানিয়েছে ভোগের সামগ্রী। সিলেটের তিন দিকে ভারত সীমান্ত থাকায় নির্যাতিতাদের অনেকেই সে সময় দেশ ছেড়ে ওপারে পাড়ি জমিয়েছেন চিরদিনের জন্য। যার ফলে এখন নারীনির্যাতনের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন। তা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সামাজিক বাস্তবতায় নারীনির্যাতনের অধিকাংশ ঘটনা ছাইচাপা পড়েছে। তারপরও যে-সব ঘটনা কালের গহ্বরে হারিয়ে যায়নি সেগুলোও কম নয়। সিলেট জেলায় নির্যাতিত হয়েছেন এমন নারীর সংখ্যা ৬৯৩জন। তবে এই তথ্য অপূর্ণাঙ্গ তালিকা হতে সংগৃহীত। ভুক্তভোগীর সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে।

১৯৭১ সালে হানাদাররা যে-সব স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল এর প্রায় প্রতিটিতেই নারীনির্যাতনের জন্য নির্ধারিত কক্ষ ছিল। সিলেট মডেল হাই স্কুলেও শত শত নারীকে ধরে এনে তারা পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিতামাতার সামনে সন্তানের ওপর, অথবা স্বামীর সামনে স্ত্রীর ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অনেক নারীর করুণ উপাখ্যান জনসম্মু খে আসে। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নির্যাতিত হওয়া নারীদের মধ্যে গুটি কয়েক ছাড়া অন্যরা নিজেদের দুঃখজাগানিয়া ঘটনাকে বুকের মধ্যে পাথরচাপা দিয়ে রেখেছেন। লাজলজ্জায় সমাজে তা প্রকাশ করতে চান না।

অগ্নিসংযোগ, লুটপাট

হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় পদলেহনকারীরা প্রতিটি গণহত্যার পর পরই আশপাশের গ্রামগুলোতে লুটপাট চালিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়েছে। লুটপাট শেষে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ছারখার করেছে গ্রামের পর গ্রাম। মুক্তিকামী মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য করার জন্যই এমন ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করেছিল পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসররা। সিলেটে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা চমকে ওঠার মতো। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সিলেট জেলায় ৭৬৯টি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে এবং লুটপাটের ঘটনা ঘটে ৬২০টি। এসব ঘটনার ফলে সর্বস্বান্ত হয়েছে সাধারণ মানুষ। বাধ্য হয়ে মুক্তিকামীদের পাড়ি জমাতে হয়েছে সীমান্তের ওপারে।

রাজাকার আলবদরদের কর্মকাণ্ড ও তৎকালীন সংবাদপত্রের ভাষ্য

মুক্তিযুদ্ধকে নস্যাৎ করতে একাত্তরে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে ঘাতকদালালরা। মুক্তিকামী বাঙালিকে দমিয়ে রাখতে এমন কোনো পন্থা নেই যা তারা অবলম্বন করেনি। একদিকে স্বাধীনতাকামীদের ওপর তারা লেলিয়ে দিয়েছে হানাদারদের, অন্যদিকে নিজেরা তৎপর ছিল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। শান্তি কমিটির ব্যানারে তাদের বিভ্রান্তকরণের অপতৎপরতা অব্যাহত ছিল বিজয় দিবসের আগের দিন পর্যন্ত। সারা দেশের মতো সিলেটেও শান্তি কমিটির ব্যানারে অশান্তির বিষবাষ্প ছড়িয়েছে দালালরা। আর এসব খবর তাদেরই অনুচরেরা প্রকাশ করেছে তৎকালীন পাকিস্তানপন্থি প্রচারমাধ্যমগুলোতে। সংবাদপত্রে শান্তি কমিটি ও দালালদের সভাসমাবেশের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় তাদের অপতৎপরতার মাত্রা।

২৩ এপ্রিল, ১৯৭১

সিলেট শান্তি কমিটির উদ্যোগে সিলেট শহরে স্বাধীনতাবিরোধীরা একটি মিছিল বের করে। মিছিলে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, ইয়াহিয়া খান জিন্দাবাদ' ইত্যাদি স্লোগান দেওয়া হয় এবং ভারত ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত সভায় শান্তি কমিটির নেতারা দুষ্কৃতকারীদের উৎখাত করে দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার শপথ নেয়।

২৪ এপ্রিল

সিলেট শান্তি কমিটি আয়োজন করে একটি সমাবেশের। সমাবেশে জেলা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক নাজমুল হোসেন উত্তপ্ত বক্তব্য দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধীদের

২৯ এপ্রিল

মধ্যে জেহাদি মনোভাব জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা চালায়। অন্যান্য শান্তি কমিটির নেতারা তাদের বক্তব্যে দেশপ্রেমিক জনগণকে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

সিলেট বেতারকেন্দ্রে ভাষণ দেয় সিলেট শান্তি কমিটির সদস্য খন্দকার আব্দুল জলিল। ভাষণে সে দেশপ্রেমিক পাকিস্তানিদের প্রতি আহ্বান জানায় প্রত্যেক এলাকায় শান্তি কমিটি গঠন করে দুষ্কৃতকারীদের প্রতিহত করার।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর 'চীফ অব স্টাফ' জেনারেল হামিদ খান সিলেট সফরে **২ মে** আসেন। এদিন সীমান্ত এলাকায় সেনাবাহিনীর তৎপরতা প্রত্যক্ষ করেন তিনি। স্থানীয় সামরিক কমান্ডাররা জেনারেলকে জানান, এলাকা থেকে দুষ্কৃতকারীদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। ঘরোয়াভাবে আলাপ করে তিনি সেনাবাহিনীকে আরও সক্রিয়ভাবে দুষ্কৃতকারীদের উচ্ছেদ করার পরামর্শ দেন।

সিলেটে শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। শহর শান্তি কমিটির আহ্বায়কের **১০ মে** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মওলানা আব্দুল কদ্দুস, মওলানা নুরুদ্দিন, ডা. আব্দুল মজিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুপ্রবেশকারীদের নির্মূল করার কাজে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অনুপ্রবেশকারী আখ্যায়িত করে, তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য বক্তারা সিলেটের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানায়। তারা আরও বলে, পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলার ভারতীয় চক্রান্ত দেশবাসী অবশ্যই ব্যর্থ করে দিবে। তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় সহযোগিতা করার জন্য বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানায়।

শান্তি কমিটির সদস্যরা ডা. আব্দুল মালিক, শাহিদ আলী প্রমুখের নেতৃত্বে **২১ জুন** সিলেটে একত্রিত হয়।

বিশ্বনাথ থানা শান্তি কমিটির উদ্যোগে চেয়ারম্যান মওলানা ইসহাক আহমদের **৩০ জুন** সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিল সিলেট জেলা মুসলিম লীগের আহ্বায়ক ও জেলা শান্তি কমিটির সদস্য মোহাম্মদ মোকাম, আরশদ আলী, আব্দুর রকিব প্রমুখ। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করার জন্য সামরিকবাহিনীকে অভিনন্দন জানায়। তা ছাড়া নাজমুল হোসেন খান যুবকদের গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়। সভা শেষে পাকিস্তানের ঐক্য ও অখন্ডতা বজায় রাখার জন্য মোনাজাত করা হয়।

মুসলিম লীগের (কাইয়ূম) নেতা হাকিম ইরতেজাউর রহমান খান আখুনজাদা **১ জুলাই** সিলেট সফরে আসেন।

৬ জুলাই সিলেট শান্তি কমিটির নেতা মকবুল আলী চৌধুরী, শাহাবুদ্দিনসহ ৫ সদস্যের একটি দল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান নূরুল আমীনের সঙ্গে দেখা করে কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করে।

১৪ জুলাই

মুসলিম লীগের সদস্য ও সিলেট জেলা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক নাজমুল হোসেন খান (তারা মিয়া), মো. মাখন মিয়া, দেওয়ান আব্দুল বাসিত, শাহিদ আলী প্রমুখ পাকিস্তানপন্থিরা শান্তি কমিটির সকল সদস্যদের সেনাবাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতার নির্দেশ দেয়।

২৫ জুলাই সিলেট শহর শান্তি কমিটির আহ্বায়ক শাহিদ আলী, সদস্য ডা. আব্দুল মালিক, আহমদ আলী, গোলাম জিলানী প্রমুখ দালালেরা সভা করে সিলেটের গুগলি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এতে শাহিদ আলী বলে, 'ভারত কোনো দিনই পাকিস্তানকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা দুষ্কৃতকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে।'

৩০ জুলাই ডা. আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে সিলেট রেজিস্ট্রি মাঠে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিল মওলানা আব্দুল লতিফ, সাবেক মন্ত্রী আজমল আলী চৌধুরী। সভা শেষে রাজাকাররা কুচকাওয়াজ করে। সভা হয় চৌমহনিতেও। এতে নেতৃত্ব দেয় শান্তি কমিটির খায়েজ আহমদ।

৩১ জুলাই সিলেটের দালালরা শাহিদ আলীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা পুনর্ব্যক্ত করে। এতে উল্লেখ করা হয়, সিলেটের বহু সংখ্যক লোক রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশদ্রোহীদের দমন করে চলেছে।

১৬ আগস্ট সিলেট জেলা শান্তি কমিটির সদস্য ডা. আব্দুল মালিকের বাসায় পাকিস্তানের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি। অ্যাডভোকেট শাহেদ আলীকে চেয়ারম্যান, ডা. আব্দুল মালিককে ভাইস চেয়ারম্যান এবং অধ্যাপক আফজাল চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়।

২২ আগস্ট তথাকথিত শহিদ মালিক স্মরণে সিলেট ইসলামি ছাত্রসংঘ স্মরণসভার আয়োজন করে। শহর শান্তি কমিটির আহ্বায়ক শাহিদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি রক্ষায় নিজেদের মালিকের মতো কোরবানি করার শপথ নেয়।

পৃথক সভায় সাবেক মন্ত্রী আজমল আলী চৌধুরী বলেন, 'সিলেট রেফারেন্ডামের মাধ্যমে পাকিস্তানে যোগদান করেছে। কাজেই পাকিস্তানবিরোধী হিন্দুস্থানি চক্রান্ত নস্যাৎ করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখা আমাদের পবিত্র কর্তব্য।'

২৯ আগস্ট সিলেটের পাকিস্তানি দালালরা যথাযথভাবে প্রতিরক্ষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

৬ সেপ্টেম্বর সিলেটে এক সভায় ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার আহমদ রানা প্রশংসনীয় কাজের জন্য রাজাকার সদস্য আদম মিয়া, উসমান মিয়া ও আবদুর রহমানকে টিক্কা খানের দেওয়া পদক ও প্রশংসাপত্র দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন শহর শান্তি কমিটির আহ্বায়ক শাহিদ আলী। বক্তব্য রাখে জেলা জামায়াত নেতা এস হক,

পিডিপি নেতা গোলাম জিলানী প্রমুখ। সভায় নিহত দালাল তালাতের নামে হরিপুরের নামকরণ করা হয় ‘তালাতনগর’।

১৬ সেপটেম্বর ডা. আবুল হাসেম যোগ দেয় পিডিপিতে এবং ১৯ সেপটেম্বর স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে সাক্ষাৎকার প্রদান করে। এই সাক্ষাৎকার রেডিয়োতে প্রচারিত হয়।

২৩ সেপটেম্বর সিলেটের দুলালপুরের মোবাশ্বের আলীর সভাপতিত্বে দালালদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন *দৈনিক সংগ্রামে* ফলাও করে সিলেট রেজিস্ট্রি মাঠে বক্তব্যরত মতিউর রহমানের ছবি ছাপা হয়।

১ অক্টোবর বালাগঞ্জ শান্তি কমিটির উদ্যোগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করে জামায়াতে ইসলামের সভাপতি হাফেজ লুৎফুর রহমান। সভায় সিলেট শহর শান্তি কমিটির আহ্বায়ক শাহিদ আলী বলে, ভারতীয় হামলাকারীরা যে পথ অবলম্বন করেছে তাদের সেইভাবে শিক্ষা দিতে হবে। সভায় আরও বক্তব্য রাখে, শান্তি কমিটির সদস্য ডা. আব্দুল মালিক, বালাগঞ্জ শান্তি কমিটির আহ্বায়ক ফজলুর রহমান প্রমুখ।

৪ অক্টোবর গোলাপগঞ্জে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য দালাল ও রাজাকাররা একত্রিত হয়। একই দিন তারা শপথ নেয় ভারতীয় চরদের চক্রান্ত নস্যাতের। এই সভায় সিলেট শহর শান্তি কমিটির আহ্বায়ক শাহিদ আলী বক্তব্য রাখে।

৬ অক্টোবর বালাগঞ্জ থানা শান্তি কমিটির উদ্যোগে বালাগঞ্জে দালালদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান হেফাজত ইসলামের আমির মওলানা লুৎফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক মওলানা নূরউদ্দিন, থানা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক মওলানা ফজলুর রহমান, সিলেটের ডেপুটি কমিশনার সৈয়দ আহমদসহ অন্যরা বক্তব্য রাখে। মওলানা নূরউদ্দিনের বক্তব্য ছিল, ভারত যে নীতি অবলম্বন করেছে তাতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আর যুদ্ধ বাধলে ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের পতাকা উড়বে।

৮ অক্টোবর সিলেটের পিডিপি নেতা জসিমউদ্দিন আহমদ গভর্নর হাউজে তথাকথিত মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেয়। শপথবাক্য পাঠ করান ডা. মালিক। সেদিন ছাতক বাজারে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তব্য রাখে সিলেট শহর শান্তি কমিটির আহ্বায়ক শাহিদ আলী। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখে আহমদ আলী, মওলানা লুৎফুর রহমান, আব্দুল হাই প্রমুখ।

১৫ অক্টোবর সিলেট সফরে আসেন গভর্নর ডা. মালিক। তিনি এদিন একটি সমাবেশে বক্তব্যে বলেন, এক শ্রেণির লোক ভারতীয় প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে পাকিস্তান ধ্বংসের কাজে লিপ্ত রয়েছে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে বলেন, এঁরা দেশের শত্রু। চরমপন্থি ছাত্ররা দুষ্কৃতকারীদের দলে ভিড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থাসহ দেশের

২০ অক্টোবর

অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছেন। ধ্বংসকারীরা কখনো দেশের মঙ্গল চাইতে পারে না।

সিলেটে একটি সভায় বক্তব্য রাখেন আইন ও পার্লামেন্টারি বিষয়কমন্ত্রী জসিম উদ্দিন আহমদ। তিনি তার বক্তব্যে বলেন: 'ভারত আওয়ামী সেবা দাসদের লেলিয়ে দিয়ে অসংখ্য নিরীহ পাকিস্তানিকে হত্যা করেছে। কিন্তু বর্তমানে দেশে এবং বিদেশে সবার কাছেই তাদের স্বরূপ নগ্ন হয়ে পড়েছে।'

২৬ অক্টোবর মওলানা এ.কে.এম ইউসুফ সিলেট সফরে আসেন এবং একটি সমাবেশে বক্তৃতা করেন। সমাবেশে তিনি বলেন: 'জাতীয়তাবাদ আমাদের মানবীয় মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিয়েছে।' একই দিন তার সভাপতিত্বে চাষি কল্যাণ সমিতির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২৭ অক্টোবর বিশ্বনাথ শান্তি কমিটির উদ্যোগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট শহর শান্তি কমিটির আহ্বায়ক শাহিদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য দেন ডা. আব্দুল মালিক, মওলানা ইসহাক ও মওলানা আব্দুর রহিম। সভায় বক্তারা জীবন দিয়ে হলেও শত্রুর হাত থেকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার শপথ নেন।

২১ নভেম্বর সিলেটের ঝালপাড়ায় এক সভায় বক্তব্য রাখেন আইন ও পার্লামেন্টারি বিষয়কমন্ত্রী জসিম উদ্দিন আহমদ এবং সবাইকে শত্রু দমনে কাজ করার আহ্বান জানান।

২৫ নভেম্বর দালাল-রাজাকাররা সিলেটে একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে ভারতবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।

সিলেটে দখলদার বাহিনীর সহযোগীদের এসব সভাসমাবেশ থেকে সুস্পষ্ট যে, শান্তি কমিটি বাঙালিদের বিভ্রান্ত করার মিশন নিয়ে কাজ করেছে। তাদের ছক অনুযায়ী কাজ করেছে হানাদার বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় প্রতিদিনই তারা কোথাও না কোথাও সভাসমাবেশ করেছে। এই সভাসমাবেশে বক্তৃতা দিয়েছে তথাকথিত শান্তি কমিটির সভাপতি, আহ্বায়কসহ দায়িত্বশীল পদের লোকেরা। পাশাপাশি পাকিস্তানি মন্ত্রী আমলারা প্রায় সব বড়ো সভাসমাবেশে উপস্থিত থেকে বক্তৃতা দিয়েছে। তাদের বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনকারী ভারতকে বার বার অভিযুক্ত করা হয়েছে। এমনকি হুমকিও দেওয়া হয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে।

মুক্তিযোদ্ধাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী, দুষ্কৃতকারী এবং বিপথগামী হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রচারণা চালানো হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁরা 'পাকিস্তানের শত্রু, দেশ ও জাতির শত্রু, তাই তাঁদেরকে খতম করতে হবে।' এজন্য শপথও নিয়েছে পাকিস্তানি দালালরা। রাজাকার অথবা দালাল কেউ মারা গেলে সে শহিদ হয়েছে বলে প্রচারণা চালানো হয়েছে। অন্য দালালরা যাতে ভড়কে না যায় তাই ইসলামের জন্য সে প্রাণবিসর্জন দিয়েছে বলে নিহতের নামের সাথে বিভিন্ন

বিশেষণ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। স্লোগান দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে অন্যরাও 'শহিদ' হতে প্রস্তুত রয়েছে দেশের জন্য।

এসব সভাসমাবেশে বার বার ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে বোকা বানানোর অপচেষ্টা চালানো হয়েছে সাধারণ মানুষকে।

এই সভাগুলোর পেছনে ছিল নীল নকশা বাস্তবায়নের তাগিদ। সভা থেকেই এলাকার কারা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করছেন, কারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন তার একটা স্পষ্ট ধারণা নিয়ে নেওয়া হতো। পরবর্তীকালে সেই ধারণার আলোকেই চলত হত্যাকাণ্ড। আর প্রতিটি গণহত্যায় পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগিতা করেছে তাদের দোসর রাজাকাররা। তারা পাকিস্তানি সৈন্যদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে বাঙালি নিধনের জন্য। নিজেরাও মেতে উঠেছে উন্মত্ততায়।

অনেক সভায় তারা মুক্তিকামীদের জোরপূর্বক শপথবাক্য পাঠ করিয়েছে পাকিস্তানের পক্ষে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ছলেবলেকৌশলে অথবা জোরপূর্বক নিজেদের অনুসারী করা। যখনই তারা ব্যর্থ হয়েছে তখনই চালিয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ। রক্তে রঞ্জিত করেছে দেশের মাটি। হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে নির্বিচারে। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কাউকেই বাদ দেয়নি। জ্বালিয়ে দিয়েছে ঘরবাড়ি। শুধু তা-ই নয়, সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছে মা-বোনদের।[২৮]

স্বাধীনতার শত্রুরা মুক্তিপথের অভিযাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের লোভ-লালসাও দেখিয়েছে। প্রস্তাব দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পথ পরিহারের। বলেছে, তাদের কথামতো কাজ করলে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে না কাউকে। অন্যথায় কঠোর শাস্তি পেতে হবে। যে শাস্তির নাম মৃত্যুদণ্ড। এতদসত্ত্বেও তারা মুক্তিকামী মানুষকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে অংশ নিয়ে দখলদার বাহিনীকে উৎখাত করেছেন। যার ফলে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা।

মুক্তিযুদ্ধে সিলেটের নারী

সিলেটের নারীরা অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে সব সময়ই প্রতিবাদী ছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যেভাবে তাঁরা লড়াই করেছেন ঠিক সেভাবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, অসহযোগ আন্দোলন এবং স্বাধিকারের দাবিতেও ছিলেন সোচ্চার। নানাভাবে নানা মাত্রায় তাঁদের অংশগ্রহণ মুক্তিযুদ্ধকে করেছিল বেগবান। তাঁরা কেউ কেউ অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শত্রুর ওপর, অনেকেই পালন করেছেন সংগঠকের ভূমিকা। পাকিস্তানি হায়নাদের সাথে শারীরিকভাবেও যুদ্ধ করতে হয়েছে মায়ের জাতিকে। শত্রুর হাতে অকাতরে ঝরেছে নারীদের প্রাণ। কিশোরী, তরুণী, যুবতী, বৃদ্ধা কেউই রেহাই পায়নি তাদের হাত থেকে। নির্বিচারে গুলি করে অথবা নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে তাঁদের। অনেক ক্ষেত্রে গণহত্যার স্থলে দাঁড় করিয়ে, অথবা ঘরের মধ্যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে নারীদের। বিমান থেকে নির্বিচারে চালানো গুলিতেও ঝাঁঝরা হয়েছে অনেক নারীর শরীর।

যুদ্ধ শুরুর আগেই ময়দানে

১৯৭১ সালে পরিস্থিতি যখন অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে, যখন অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না, তখন পুরুষদের যোগ্য সহচর হিসেবে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সিলেটের নারীরাও রাজপথে নামেন। মুক্তিকামী সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করতে, অনুপ্রেরণা জোগাতে, মিছিলের অগ্রভাগে থেকে তাঁরা স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত করে তোলে রাজপথ। সিলেটে উত্তাল মার্চে যে কয়েকটি মিছিল সমাবেশ হয়েছে তার প্রতিটিতেই নারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মতো। শুধু পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে শামিল হননি নারীরা, তাঁরা নিজেরাও নানা কর্মসূচি পালন করেছেন পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্তির দাবিতে। অগ্নিগর্ভ মার্চে মিছিল, সভাসমাবেশ, তহবিল সংগ্রহ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবকিছুতেই নারীর অংশগ্রহণ স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করে।

সংগঠক ছিলেন যাঁরা

অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত যে-সকল নারী অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জীবন বাজি রেখে, দিকনির্দেশনা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে অনন্য ভূমিকা রাখেন তাঁদের মধ্যে জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সিরাজুন্নেসা চৌধুরী, সুহাসিনী দাস, ঊষা দাশ পুরকায়স্থ, ষোড়শী চক্রবর্তী, আলম রওশন চৌধুরী, ফাহমীদা রশীদ চৌধুরী, খোদেজা কিবরিয়া, আবেদা চৌধুরী, জেবুন্নেসা হক, ফাতেমা চৌধুরী, জাহানারা আফসার, নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, নিবেদিতা দাশ ও রাখী দাশ পুরকায়স্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অস্ত্র হাতে শত্রুর মোকাবিলা

জীবন বাঁচানোর তাগিদে একাত্তরে অনেক নারী অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। পুরুষের পাশাপাশি দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বহিঃশত্রুর ওপর। যুদ্ধে প্রাণ হারানোর শঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা পিছপা হননি। হানাদারদের পরাজিত করতে লড়াই করেছেন সমান তালে।

কানাইঘাট উপজেলার লক্ষ্মীপ্রসাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবদুল মজিদের মেয়ে শামসুন নাহার অস্ত্র হাতে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন একাত্তরে। ৫ নম্বর সেক্টরের মুক্তাপুর সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন শামসুন নাহার ।

গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের নালিউরী গ্রামের ছায়ারন দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হাতে তুলে নেন অস্ত্র। তাঁর স্বামী মৃত ফজির উদ্দিনও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। স্বামীর অনুপ্রেরণায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

বিশ্বনাথ উপজেলার রবীন্দ্র রায়চৌধুরীর মেয়ে রুমা চক্রবর্তী যুক্ত ছিলেন গার্লস গাইডের সঙ্গে। শারীরিক কসরতসহ নানা আত্মরক্ষার ট্রেনিংও জানা ছিল তাঁর। ১৯৭১ সালে সেই প্রশিক্ষণ কাজে আসে তাঁর। স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনিও লড়াই করেন জীবন বাজি রেখে।

মহিলা মুক্তফৌজ
সহায়ক কমিটি

মুক্তিযুদ্ধে সিলেট অঞ্চলের নারীদের ভূমিকার একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে 'শেলা সাব-সেক্টর মহিলা মুক্তিফৌজ সহায়ক কমিটি'। ৫ নম্বর সেক্টরের অধীন শেলা সাব-সেক্টরের কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের উদ্যোগে এই কমিটি গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাঁরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে মহিলা মুক্তিফৌজ সহায়ক কমিটি গড়ে ওঠে। যাঁদের প্রাগ্রসর চিন্তায় এই কমিটি গঠিত হয়, তাঁরা হচ্ছেন: ছাতক-জগন্নাথপুর থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মরহুম আবদুল হক, আওয়ামী লীগ নেতা হেমেন্দ্র দাশ পুরকায়স্থ, ধর্মগুরু প্রভাত চক্রবর্তী এবং ভারতীয় খাসিয়া নেতা দেবদাস রায়। তাঁরা সুনামগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) জগন্নাথপুর থানা এবং সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার নারীদেরকে সংগঠিত করে এক প্ল্যাটফরমে সমবেত করেন। ১৯৭১ সালের ৫ জুলাই শেলা সাব-সেক্টরের মুক্তাঞ্চল বাঁশতলায় এই কমিটি গঠনের লক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ নেতা হেমেন্দ্র দাশ পুরকায়স্থ। সভায় প্রীতিরাণি দাশ পুরকায়স্থকে সভানেত্রী, গীতা রাণি নাথকে সহ-সভানেত্রী ও নিবেদিতা দাশকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। সদস্য করা হয় সুধারাণি কর, প্রমীলা দাশ, যূথিকা রাণি রায়, কানন দেবী (শক্তি), মঞ্জু দেবী, সুষমা দাস, সুমিতি দেবী, শেফালি দাশ ও রমা রাণি দাশকে।

এই কমিটির প্রায় ৫০জন নারী মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করেন দুঃসময়ে। তারমধ্যে অন্যতম ছিল চিকিৎসা সহায়তা প্রদান। ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে চিকিৎসা দিয়েছেন এই সংগঠনের নারীরা। মহিলা মুক্তিফৌজ সহায়ক কমিটির উদ্যোগে শেলায় একটি অস্থায়ী হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। সেখানে নিযুক্ত ছিলেন দুজন চিকিৎসক। আহত মুক্তিযোদ্ধা এবং অসুস্থ হয়ে পড়া বাঙালিদের চিকিৎসা করা হতো সেখানে। দুঃসময়ে মহিলা মুক্তিফৌজ সহায়ক কমিটির একদল নারী যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তা সত্যিই বিরল।

সীমান্তের ওপারেও সোচ্চার

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যায় হতবাক হয়ে পড়ে মুক্তিকামী বাঙালিরা। পরিস্থিতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ নারীকে ওপারে পাড়ি জমাতে বাধ্য করে। তবে, ভারতে আশ্রয় নিলেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নারীরা ছিলেন তৎপর। তাঁরা শরণার্থীশিবিরে, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করেছেন অসুস্থ এবং আহতদের। অনেকে যুক্ত হয়েছিলেন নার্সিং পেশায়। আবার অনেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থেকে মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামীদের উদবুদ্ধ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণাও চালিয়েছেন নারীরা।

মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি অকাতরে ঝরেছে নারীদের প্রাণ। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আটক কোনো নারীই রেহাই পাননি তাদের নির্যাতনের হাত থেকে। নির্বিচারে গুলি করে অথবা নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে মায়ের জাতিকে। কোথাও কোথাও গণহত্যার স্থলে দাঁড় করিয়ে, অনেক ক্ষেত্রে ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে নারীকে। বিমান থেকে নির্বিচারে গুলি চালিয়েও অনেক নারীর প্রাণ কেড়ে নিয়েছে স্বাধীনতার শত্রুরা। মুক্তিসংগ্রামে ঠিক কত নারীর জীবন উৎসর্গ হয়েছে স্বাধীনতার বেদিমূলে এর সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। অনুসন্ধানে নারী হত্যার যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তাতে অসংখ্য নারীনিধনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সিলেট শহরের বারুতখানা এলাকায় দেশ স্বাধীন হওয়ার দু-দিন আগে পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারান ১৩জন। তাঁদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ৫জন । তাঁরা হচ্ছেন: মইরম বিবি, ইয়ারুন বিবি, হাজেরা বিবি, আমেনা বিবি ও আফিয়া বিবি।

১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় পাকিস্তানি বাহিনী মর্টার নিক্ষেপ করে সিলেট শহরের মির্জা জাঙ্গালস্থ ডা. দিগেন্দ্রকুমার এন্দের বাসায়। মর্টার বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ডা. দিগেন্দ্রকুমার এন্দ, তাঁর স্ত্রী সুনীতিবালা এন্দ এবং তাঁদের আত্মীয় গোপেশ দাশ। আহতাবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার পর প্রাণ হারান দিগেন্দকুমার এন্দের পুত্র দিব্যেন্দু এন্দ, কন্যা শিখা এন্দ এবং দিব্যেন্দুর পুত্র অপু এন্দ।

২৪ এপ্রিল রাতে শিল্পপতি নির্মল চৌধুরীর সিলেট শহরের নয়াসড়কের বাসায় হানা দেয় পাকিস্তানি সৈন্যরা। বাসায় অবস্থান করা ৫জনকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এতে প্রাণ হারান প্রভাবতী দেবী।

৮ এপ্রিল সকালে সিলেট সদর উপজেলার ইলাশকান্দি গ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনী হানা দেয়। নির্বিচারে তারা গণহত্যা শুরু করে। এতে পুরুষের পাশাপাশি প্রাণ হারান নারীরাও। স্বাধীনতার বেদিমূলে সেদিন যাঁদের প্রাণ উৎসর্গ হয়েছিল তাঁরা হচ্ছেন: ইদু মিয়ার অশীতিপর বৃদ্ধা মাতা ও ছলু মিয়ার বৃদ্ধা মা।

দক্ষিণ সুরমা থানার গোটাটিকর এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দানের কারণে রাহেলা বেগম নামের এক নারীকে গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী।

৬ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনীর একটি বহর সিলেট শহরতলির কলাপাড়ায় প্রবেশ করে হত্যাকান্ড শুরু করে। কিছু বুঝে উঠার আগেই ১৭জনের বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায়। নিথর দেহ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। সেই ১৭ জনের মধ্যে ৪জন নারী ছিলেন। তাঁরা হলেন: সাইবা উড়িয়া, ছানিয়া উড়িয়া, বেণি উড়িয়া ও মুন্নি ধর উড়িয়া।

সিলেট সদর উপজেলার মহালদিক গ্রামে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কিছুদিন পর হানা দেয় পাকিস্তানি বাহিনী। গ্রামের মাইজম হাজির স্ত্রী ময়মনা বিবি, ওহাব উল্লাহর স্ত্রী আপতেয়া বিবি ও ছরতুন বিবি প্রাণ হারান হানাদারদের হাতে।

বিয়ানীবাজার থানার বেগুন বিবি (১০), লেচু বিবি, হিরণবালা ঘোষ (৩৭), ক্ষেত্রময়ী ঘোষ (৬৮), অসিতা রাণি, সীতা রাণি ঘোষ, চারুবালা ঘোষ (৫০), ঘোষ বেগম (১৪), মরিয়ম বেগম (২৭) ও সুফিয়া বেগম (৬)-কে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করে নির্মমভাবে।[৩৪]

জৈন্তাপুর থানার হেমু গ্রামে ১৭ এপ্রিল পাকিস্তানি জঙ্গিবিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হয়। এতে প্রাণ হারান ১১জন। তাঁদের মধ্যে ৩জন নারী শহিদ হন । তাঁরা হচ্ছেন আলেকজান বিবি, নছিরা বেগম ও আয়শা বেগম।

গোয়াইনঘাট উপজেলার কামাইদ এলাকায় ৫ মে এক দল পাকিস্তানি সৈন্যকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসে স্বাধীনতাবিরোধীরা। সেদিন এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণে অন্যান্যের সঙ্গে শহিদ হন মাতঙ্গিনী চক্রবর্তী, গুণবালা দাসী এবং গঙ্গাবালা দাসী।

মুক্তিযুদ্ধে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের সম্মিলন ঘটেছিল। ১৯৭১ সালের জনযুদ্ধে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি অংশ নিয়েছিলেন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর বাঙালি সদস্যবৃন্দ, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈনিকগণ, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ বাহিনীর সদস্য। আবালবৃদ্ধবনিতা, ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-মুটে-মজুর-কুলি, পেশাজীবী ও শ্রমজীবীদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মুছে গিয়েছিল ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-অবস্থানভেদ। মুক্তিযুদ্ধে সংগ্রামের, ত্যাগের, সহ্যের, সাহসের এক অকৃত্রিম তুলনাহীন ভূমিকা পালন করেছিলেন এই অঞ্চলের মানুষ। যার ফলে দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে, বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা, আমরা অর্জন করি নতুন মানচিত্র, নতুন পতাকা।

অধ্যায়-১৬

খাদ্য ও পুষ্টি

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিলেটে ভাতই প্রধান খাদ্য। সাধারণত ভাত, মাছ, ডাল, মাংস, সবজি নিত্যদিনের খাদ্যতালিকায় স্থান পায়। তবে শহর ও গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভ্যাসের কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। শহরাঞ্চলে সকালের নাস্তা হিসেবে সাধারণত পরোটা/রুটির সাথে সবজি/মাংস/ডিম, পাউরুটির সাথে জ্যাম-জেলি বা কলা খেতে দেখা যায়। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের মানুষ খৈ, মুড়ি, নানা ধরনের পিঠা বা পান্তাভাত ও মরিচ সকালের খাবার হিসেবে খেয়ে থাকে। তেমনি দুপুর ও রাতে মানুষ তাদের পছন্দ ও চাহিদানুসারে খাবার খেয়ে থাকেন। তবে অধিকাংশই দুপুরে ভাত, মাছ, ডাল বা সবজি খেয়ে থাকেন। সাধারণত ভাতের সাথে বিভিন্ন রকমের মাছ, ডিম, সবজি এবং গোরু, ছাগল ও মোরগের মাংস ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় স্থান পায়। খাবারের পরে সাধারণত চা, দুধ বা ঠান্ডাজাতীয় পানীয় পান করেন অনেকেই। অনেকেই নানারকম ফলমূল যেমন আম, কাঁঠাল, কলা, আনারস, আপেল, পেয়ারা, কমলা, তরমুজ এবং ঋতুভেদে পছন্দ অনুসারে নানা মৌসুমি ফল খেয়ে থাকেন।

খাদ্যাভ্যাস

যদিও অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিলেটবাসীর প্রধান খাবার ভাত-মাছ, তবে রান্নার পদ্ধতিতে রয়েছে ভিন্নতা। ঐতিহ্যবাহী খাদ্যগুলোর মধ্যে টকজাতীয় খাবার অন্যতম, যা সিলেটে টেংগা বলা হয়ে থাকে। এই টক রান্নায় আমড়া, ডেউয়া, জলপাই, বরই, সাতকরা, আদা জামির বা অন্যান্য টকজাতীয় সবজি ব্যবহৃত হয়। আম দিয়ে তৈরি করা হয় আমসি, আমতা ইত্যাদি।

ঐতিহ্যবাহী খাবারসমূহ:

ক) শর্করা জাতীয় খাবার

বিরইন চাল

বিরইন (বিন্নি) সিলেটের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী চাল। বিরইন চাল রান্নার পরে আঠালো হয়। এই চাল অত্যন্ত সুগন্ধি। বিরইন চালের ভাত দুধ দিয়ে খাওয়া সিলেটের ঐতিহ্য, তবে এর সাথে মাছভাজা ও মাংস ভুনাও কম জনপ্রিয় নয়। বর্তমানে এই ঐতিহ্য বিলুপ্তির পথে, এখন আর আগের মতো বিরইন চাল উৎপন্ন হয় না।

চোঙা পিঠা

সিলেটের জনপ্রিয় খাবারের আরেকটি হলো চোঙা পিঠা। চোঙা পিঠার ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা গেছে, এককালে সিলেট বিভাগের বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল বনবনানি ঘেরা। এসব বনাঞ্চলে বসবাস করত নাগা, কুকি ও টিপরাসহ নানা জাত ও বর্ণের পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। তারা পাহাড়ে জুমচাষ ছাড়াও পশুপাখি শিকার করে আহার করত। পাহাড়ি নৃ-গোষ্ঠী একধরনের বিশেষ বাঁশ কেটে

চোঙা বানিয়ে ভেতরে ভেজা চাল ভরে তৈরি করত একধরনের খাবার। পরে এ খাবার নৃ-গোষ্ঠীর আস্তানা ছেড়ে চলে এসেছে গ্রামে গ্রামে সিলেটবাসীর ঘরে ঘরে। কালের বির্বতনে চোঙা দিয়ে তৈরি করা খাবার এখন চোঙা পিঠা নামে বহুল পরিচিত। চোঙা পিঠা তৈরির প্রধান উপকরণ ঢলু বাঁশ ও বিরইন চাল (বিন্নি)। ঢলুবাঁশ ছাড়া চোঙা পিঠা তৈরি করা যায় না। কারণ ঢলুবাঁশে এক ধরনের তৈলাক্ত রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যা বাঁশের চোঙাকে আগুনে অধিক না পুড়তে সাহায্য করে। ঢলুবাঁশে অত্যধিক রস থাকায় আগুনে পুরোপুরি না পুড়েই ভেতরের পিঠা আপনাআপনি সিদ্ধ হয়। বাঁশের ভেতরে সৃষ্ট একধরনের মিষ্টি গন্ধ চোঙা পিঠার বিশেষত্ব। চোঙার ভেতরে বিন্নি চাল, দুধ, চিনি, নারকেল ও চালের গুঁড়ো দিয়ে পিঠা তৈরি করা হয়। গোলাকৃতির এই পিঠা দুধের মালাই, খেজুরের গুড় ও দুধের সর দিয়ে পরিবেশন করা হয়। পিঠা খেতে সুস্বাদু এবং সহজপাচ্য।

সন্দেশ পিঠা সন্দেশ পিঠা অন্যান্য অঞ্চলে তেলের পিঠা বা পোয়া পিঠা নামে পরিচিত। এই পিঠা ময়দা বা চালের গুঁড়োর সাথে গুড়/চিনি এবং পানি দিয়ে মিশিয়ে তেলে ভেজে তৈরি করা হয়। এই পিঠা সাধারণ তাপমাত্রায় কিছুদিন এমনিতেই ভালো থাকে। সিলেটের গ্রামাঞ্চলে কোথাও বেড়াতে গেলে এই পিঠা নিয়ে যাওয়ার রীতি এখনও দেখা যায়। আরেকটি জনপ্রিয় সিলেটি পিঠা হলো চই পিঠা যা ভালো মানের চালের গুঁড়ো দিয়ে ভাপে তৈরি করা হয়।

আখনি আখনি সিলেটিদের পছন্দের ও সুস্বাদু খাবার। এটি সিলেটের ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলোর অন্যতম। আখনি তৈরির প্রধান উপকরণ হলো চাল, মাংস (গোরু/খাসি/মোরগ), ঘি/বাটার, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, লবণ, আদা, রসুন, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা, গোলমরিচ। যে মাংস যুক্ত করা হয়, সেই মাংসের নাম উল্লেখ করে আখনি পরিচিতি পায় যেমন গোরুর আখনি, খাসির আখনি ও মোরগের আখনি প্রভৃতি। এই আখনি যে-কোনো উৎসবে অত্যন্ত জনপ্রিয়, বিশেষ করে রমজান মাসের ইফতারিতে। এটি খুবই পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার, এতে উচ্চমাত্রায় ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেড রয়েছে।

বাখরখানি বাখরখানিও সিলেটিরা বেশ পছন্দ করেন।ইফতারের সময় কিংবা রাতে চায়ের সঙ্গে বাখরখানি খাওয়ার প্রচলন চলে আসছে যুগ-যুগ ধরে। মিষ্টি ও ঝাল জাতীয় চার প্রকার বাখরখানি রয়েছে, যা সিলেট ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

খ) শাকসবজি:

নাগা মরিচ নাগা মরিচ মরিচের একটি উন্নত প্রজাতি। সিলেট অঞ্চলের নাগা মরিচকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ কামরাঙা মরিচ বা বোম্বাই মরিচ হিসেবে চেনে। ২০০৭ সালে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস বুকে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ঝাল ও সুগন্ধি মরিচের স্বীকৃতি পাওয়া এই নাগা মরিচ ভারতে ‘ভূত-জোলোকিয়া’

মরিচ হিসেবে পরিচিত। শ্রীলংকায় নাগা মরিচের নাম 'নাই মরিচ'। বর্তমানে যুক্তরাজ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে এটাকে 'ভূত মরিচ' বলা হয়। মাত্রাতিরিক্ত ঝাল হওয়ার কারণেই এটি ভূত মরিচ নামে পরিচিত বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। প্রচুর ঝাল, সুগন্ধি ও ঝাঁজের জন্য তা বিশ্বব্যাপী পরিচিত। সিলেট জেলার ফলদ বাগানগুলোতে উৎপাদিত নাগামরিচ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রফতানি হচ্ছে।

সিলেটের স্থানীয় একটি শাক হলো লাইশাক বা রাইশাক। লাইশাকের ভর্তা ও ভাজি খাওয়া হয়। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, বিশেষ করে ভিটামিন এ। **লাইশাক**

সিলেটের টকজাতীয় স্থানীয় সবজির মাঝে হইলফা অন্যতম। হইলফার বৈজ্ঞানিক নাম *Hibiscus sabdariffa*, ইংরেজি নাম Roselle। সিলেটের কোথাও কোথাও একে খইলফা বা খলফাও বলে থাকে। এটি জ্যাম-জেলি এবং আচার তৈরিতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এটি দিয়ে তরকারি রান্না করা যায় যাকে সিলেটে 'খাট্টা' বলে। হইলফা ওজন কমাতে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি এতে রয়েছে এসকরবিক এসিড, প্রোটিন, ফ্যাট, ফাইবার, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ক্যারোটিন, থিয়ামিন, রিবোফ্লাবিন এবং নিয়াসিন। **হইলফা**

গ) ফলমূল

সিলেটকে অনায়াসেই টক ফলের দেশ বলা যেতে পারে। সিলেটে যে পরিমাণে সাইট্রাসজাতীয় ফল উৎপন্ন হয় তাতে এই অভিধায় 'শ্রীভূমি'কে আখ্যায়িত করলে অত্যুক্তি করা হবে না। সিলেটের কমলা ও লেবুর স্বাদ আস্বাদন করেননি এমন লোক হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাতকরা, লিচু, লটকন, লুকলুকি, থৈকর, জাম্বুরা এবং মাল্টার জন্য সিলেট প্রসিদ্ধ। একসময় পাহাড়ি এলাকা, বাড়ির আঙিনা এবং পতিত জমিতে এসব টক ফল উৎপন্ন হলেও চাহিদা বৃদ্ধির কারণে এখন এসব ফল বাণিজ্যিকভাবে উৎপন্ন হচ্ছে।

তৈকর সিলেটের জনপ্রিয় টক ফল। যার বৈজ্ঞানিক নাম *Garcinia pedunculata*।সিলেটের পাহাড়ি এলাকার নিকাশযুক্ত অম্লীয় মাটিতে প্রচুর পরিমাণে তৈকর উৎপাদিত হয়। কেউ কেউ তৈকরকে তৈকলও বলে থাকে। তৈকর স্কার্ভি রোগ নিরাময়ে কাজ করে। তৈকরের তৈরি আচার, জ্যাম, জেলি খুবই মজাদার। **তৈকর**

সিলেটে টক বা ডাল রান্নায় ডেফল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্থানীয় মানুষ নানাভাবে এর ব্যবহার করে। অঞ্চলভেদে এই ফলের একাধিক নাম থাকলেও ইংরেজিতে False Mangosteen বা Yellow Mangosteen নামে পরিচিত। ফলের আকৃতি ডিমের মতো হওয়ায় কোথাও কোথাও Egg Fruit নামেও পরিচিত। বৈজ্ঞানিক নাম *Garciniaxynthochymus* (Syn. G. tinctoria)। ডেফল বৃক্ষ মাঝারি আকারের গাছ। পাকা ফলের রং হলুদ-সোনালি **ডেফল**

ধরনের।এই ফলের শাঁস সুগন্ধি ও বেশ রসালো। ভেতরে এক বা একাধিক বীজ থাকে। এই ফল কোষ্ঠকাঠিন্য ও অন্ত্রপ্রদাহ সারাতে বেশ কার্যকর। এফলের রস জ্যাম এবং প্রাকৃতিক ভিনেগার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। একসময় ডেফল তেঁতুলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

লটকন লটকন একধরনের টক মিষ্টি ফল। সিলেটে এর পরিচিতি ‘ভুবি’ হিসেবে। হলুদ রঙের এই ফলের আকার দুই থেকে পাঁচ সে.মি., যা থোকায় থোকায় ধরে। ফলে ২-৫ টি বীজ হয়, বীজের গায়ে লাগানো রসালো (ভক্ষণ) অংশ থাকে, যা জাতভেদে টক বা টক-মিষ্টি স্বাদের। এই ফল জ্যাম তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।

লটকনের প্রচুর পুষ্টিমান রয়েছে। এতে রয়েছে ভিটামিন বি ২, ভিটামিন সি ২। এছাড়া ফলটি ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহসহ বিভিন্ন খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ। লটকনের ভেষজগুণও রয়েছে। এটি তৃষ্ণা নিবারণের পাশাপাশি বমির ভাবও দূর করে। লটকনগাছের শুকনো পাতার গুঁড়ো সেবনে ডায়রিয়া নিরাময় হয়।

মাল্টা সিলেটের পাহাড়ি এলাকায় দিন দিন মাল্টার চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। দেখতে ও খেতে অনেকটা কমলার মতো। মাল্টার রস দিয়ে, জ্যাম, জেলি তৈরি করা যায়। ৬-৭ বছর বয়সের প্রতিটি মাল্টা গাছ থেকে প্রতি বছর ২৫০-৩০০টি পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশের সবচেয়ে উপযোগী মাল্টার উন্নত জাতের নাম ‘বারি মাল্টা-১’। বীজ এবং কলম থেকে এর বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। সরকারি হর্টিকালচার সেন্টার থেকে এর চারা সংগ্রহ করে তা রোপণ এবং পরিচর্যার মাধ্যমে মাল্টার বাগান গড়ে তোলা যায়। সিলেটের জৈন্তাপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় মাল্টার চাষ হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জেলার ১৬ হেক্টর জমিতে মাল্টা চাষ হচ্ছে। এ থেকে বার্ষিক উৎপাদিত হচ্ছে ৩৭ মেট্রিক টন মাল্টা। বছরের প্রায় বারো মাসই মাল্টা পাওয়া যায়। এই ফল সংরক্ষণও করা যায় দীর্ঘদিন।

লেবু লেবু উৎপাদনে সিলেটের তুলনা নেই। সিলেটে উৎপাদিত হয় দেশের লেবুর চাহিদার শতকরা ৮৫ শতাংশ।

সিলেটে আদিকাল থেকে বিভিন্ন প্রজাতির লেবুর চাষ হলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ শুরু হয় সত্তরের দশকে। লাভজনক হওয়ার কারণে কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, বড়োলেখা ও হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল এবং চুনারুঘাট উপজেলায় লেবু চাষ শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সিলেট জেলার চাষিরাও শুরু করেন লেবু চাষ। সিলেটে উৎপাদিত লেবুর অধিকাংশই কাগজি লেবু। তবে, কাগজি লেবুর পাশাপাশি জেলায় জারা লেবু উৎপাদিত হয়। সিলেট জেলায় বর্তমানে ৩৯৩ হেক্টর জমিতে পাহাড়ি ও সমতলভূমিতে লেবু চাষাবাদ হচ্ছে, যা থেকে প্রতিবছর উৎপাদিত হচ্ছে ৩ হাজার ৩০৯ টন লেবু।

জেলায় ছোটো-বড়ো মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক লেবুবাগান রয়েছে, যার সঙ্গে মালিক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী মিলিয়ে প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক লোক সম্পৃক্ত। এখানকার

লেবু যাচ্ছে বিদেশেও। লেবু একদিকে যেমন রসনার অনুষঙ্গ তেমনি বিপুল সংখ্যক মানুষের আয়েরও উৎস।

খাসিয়া পান

সিলেটের আরও একটি বিশেষ পণ্য 'খাসিয়া পান'। জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার পিয়াইন নদীর তীরে অবস্থিত সংগ্রামপুঞ্জি, নকশিয়াপুঞ্জি, লামাপুঞ্জি এবং প্রতাপপুরপুঞ্জির পাহাড়ি ভূমিতে উৎপাদিত হচ্ছে বিশেষ জাতের এই পান। খাসিয়া সম্প্রদায়ের প্রায় প্রত্যেকের রয়েছে পানের বাগান। বাগানকে তারা 'পুঞ্জি' বলে।

পানের ইংরেজি নাম Betel vine। মধ্য এবং পূর্ব মালয়েশিয়া পানের মূল উৎপত্তিস্থল। সেখান থেকেই বিস্তৃত হয়েছে পান চাষ। উপ-মহাদেশে ৪০টির বেশি পানের জাত শনাক্ত করা হয়েছে। খাসিয়া পান তার মধ্যে একটি। খাসিয়ারা চাষ করেন বলেই এই পান 'খাসিয়া পান' নামে খ্যাত। এই পান চাষের ধরন অন্যান্য পানচাষের চেয়ে ভিন্ন। এই পান প্রাকৃতিক গাছকে অবলম্বন করে উৎপন্ন হয়। সেজন্য কেউ কেউ এই পানকে গাছপানও বলে থাকেন। খাসিয়া পান উৎপাদনে কোনো ধরনের সার প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না। গাছের পাতা-মরা ডালপালা, পানগাছের গোড়ায় সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এ পানের স্বাদ বেশ ঝাঁজালো। পাতা মাঝারি ও ডিম্বাকৃতির এবং পাতার শীর্ষ তেমন সূচালো নয়। পাতার বর্ণ সবুজ, মাঝারি পুরু এবং বোঁটা মাঝারি লম্বা। এই পানের গড় ওজন ২.২৩ গ্রাম। এক একটি পান গাছ থেকে বছরে ২০-২৫ বার পান সংগ্রহ করা হয়।

পুঞ্জির উঁচু গাছ থেকে মই দিয়ে পান সংগ্রহ করা হয়। এরপর মহিলারা গুণে সাজিয়ে খাঁচায় ভর্তি করে কলাপাতা দিয়ে বেঁধে রাখেন বাজারজাতকরণের জন্য। খাসিয়া পান কুঁড়ি হিসেবে বিক্রি করা হয়। অন্যান্য পান যেখানে বিড়া (৭২টি পান পাতায় এক বিড়া) হিসেবে বিক্রি হয় সেখানে খাসিয়া পানের হিসাব ভিন্ন। ১৪৪টি পান পাতায় এক কান্তা এবং ২০ কান্তাকে এক কুড়ি বলা হয়।

মূলত খসিয়া সম্প্রদায়ের পুরুষরা পান চাষ করেন। আর মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রধান হিসেবে নারীরা পাইকারি বাজারে এগুলো বিক্রি করে থাকেন। এ থেকে যে আয় হয় তাতেই চলে খাসিয়াদের সংসার। বংশানুক্রমেই পানচাষের সঙ্গে খাসিয়ারা জড়িত। এটি তাদের বংশগত ঐতিহ্য।

খাসিয়াদের উৎপাদিত পান এই অঞ্চলের মানুষের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রফতানি হচ্ছে। তবে এই পানের চাহিদা ভাটি অঞ্চলে অত্যধিক।

আনারস

আনারসের জন্য সিলেটের রয়েছে বিশেষ খ্যাতি। বিয়ানীবাজারের জলঢুবের আনারস দেশ-বিদেশে পরিচিত। আকর্ষণীয় সুগন্ধ ও অম্লমধুর স্বাদের জন্য এ ফল সমাদৃত। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সিলেট জেলার ১৯৩.৫০ হেক্টর জমিতে বর্তমানে আনারস চাষ হচ্ছে। এ থেকে প্রতিবছর উৎপাদিত হচ্ছে, ১১৬৩ মে.টন আনারস। পরনা-প্যারাগুয়ে নদীবিধৌত অঞ্চলকে আনারসের উৎপত্তিস্থল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। কলম্বাসের

সময়ে ইউরোপে এর বিস্তার ঘটে। ১৫৪৮ সালে ইউরোপীয় বণিকদের সাহায্যে উপমহাদেশে আনারস চাষ শুরু হয়।

ফলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে আনারসকে ৩টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। কুইন, কিউ এবং স্পেনিস। সিলেট অঞ্চলে কুইন বা জলঢুব ও জায়েন্ট কিউ বা কলেঙ্গা জাতের আনারসের চাষ করা হয়ে থাকে।

জলঢুবের আনারসের গাছ অন্যান্য আনারসের গাছের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোটো, পাতা কাঁটাযুক্ত সবুজাভ বাদামি বর্ণের। পাতার কিনারা অনেকটা করাতের মতো। এই প্রজাতির গাছ প্রতিকূল আবহাওয়াতেও টিকে থাকতে পারে। জলঢুবের আনারস আকারে ছোটো। প্রতিটি ফলের গড় ওজন প্রায় ১.২৫ কেজি। পাকা ফলের খোসা সোনালি হলুদ এবং শাঁস গাঢ় সোনালি হলুদ। স্বাদে বেশ মিষ্টি এবং শাঁস কম আঁশময়। এই সকল আনারস জায়েন্ট কিউ কালেঙ্গা নামেই অধিক পরিচিত। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতেই ফলে। সারা বছরই এই আনারস বাজারে পাওয়া যায়। কালেঙ্গা জাতের আনারসের গাছের পাতায় কোনো ধরনের কাঁটা থাকে না। মোটামুটি সমান থাকে পাতার কিনারা। এটি একটি নাবী জাতের আনারস। এই জাতের আনারসের এক একটির ওজন প্রায় ১.৬-৩ কেজি। ফল লম্বা, মুকুটের দিকে সামান্য সরু। চোখ চ্যাপ্টা অগভীর, বড়ো। কাঁচা অবস্থায় ফলের রং গাঢ় কালচে সবুজ থাকে। পাকার পর সবুজ ছোপযুক্ত কমলা হলুদবর্ণ ধারণ করে। শাঁস হালকা হলুদ রঙের এবং সাধারণত আঁশবিহীন অত্যন্ত রসালো, অম্লমধুর স্বাদ ও গন্ধযুক্ত। শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে সংগৃহীত ফলের স্বাদ ও গন্ধ ভালো হয়।

গ্রাম বাংলার এমন খুব কম গৃহস্থ ঘরই আছে যে ঘরে পান-সুপারির থালা বা বাটা নেই। পান-সুপারির স্বাদ আস্বাদন করেননি এমন কৃষক কৃষানীও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু কি গ্রামবাংলার মানুষজনই? শহুরেরাও পান খাওয়ায় কম যায় না। পান বারো মাস উৎপাদিত হলেও সুপারি মৌসুমি ফল। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পাকে। সেজন্য সুপারি সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। সিলেট অঞ্চলের অধিকাংশ বাড়িতেই আছে সুপারি গাছ। ফলে বাজার থেকে তেমন একটা সুপারি কিনতে হয় না। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জেলার ২২০২ হেক্টর জমিতে সুপারি চাষ হয়। যা থেকে প্রতিবছর উৎপাদিত হয় ১৮২৫০ মেট্রিক টন সুপারি।

সিলেটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুপারি উৎপাদিত হয় জকিগঞ্জ উপজেলায়। জকিগঞ্জ উপজেলার যেদিকেই তাকানো যাবে, সে দিকেই চোখে পড়বে সারি সারি সুপারি বাগান। বাড়ির আশপাশের খালি জায়গা, উঠান, ক্ষেতের আইল, রাস্তার দু’পাশ, পুকুর পাড় সর্বত্রই রয়েছে সুপারিগাছ। এখানকার পরিবেশ সুপারি উৎপাদনের জন্য অধিক সহায়ক হওয়ায় এখানে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হয় সুপারি। উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসের হিসাব অনুযায়ী, জকিগঞ্জে ফলবান ও ফলহীন মিলিয়ে ২ লাখ ৮৬ হাজার ৯০০ সুপারিগাছ আছে। জকিগঞ্জের সুপারির চাহিদা রয়েছে দেশব্যাপী। উৎপাদিত সুপারি বিক্রির

জন্য এই উপজেলায় বেশ কয়েকটি হাট রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাটগুলো হচ্ছে, জকিগঞ্জ বাজার, বাবুর বাজার, কালীগঞ্জ বাজার, শরীফগঞ্জ বাজার, শাহগলী বাজার এবং লক্ষ্মীবাজার। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মৌসুমে পাইকাররা এসে ভিড় জমান এসব হাটে। তবে, রংপুর, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, বগুড়া, নীলফামারী, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় রয়েছে জকিগঞ্জের সুপারির বিশেষ চাহিদা। প্রতি ভি (চল্লিশ ঘা' তে এক ভি) সুপারি ৮০০ থেকে ২২০০ টাকায় বিক্রি হয়।

সাধারণত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সুপারি গাছে ফুল হয় এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফল পাকে। সঠিক পরিচর্যা ও সুষম সার প্রয়োগ করা হলে ৪-৫ বছর বয়স থেকেই সুপারি ধরতে শুরু করে। তবে ১০-৪০ বছর বয়সের গাছ থেকেই অধিক ফল পাওয়া যায়। ফুল আসা থেকে শুরু করে ফল পাকতে সময় লাগে ৯ থেকে ১০ মাস। সাধারণত গাছ প্রতি ৩-৫টি ছড়া এবং ছড়া প্রতি ৫০-১৫০টি সুপারি ধরে থাকে।
সুপারিকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'গুয়া'। এই 'গুয়া' অনুন্নত জনপদ জকিগঞ্জের মানুষের মুখে এনে দেয় হাসির ঝিলিক।

ঘ) শুঁটকি

সিলেটে প্রতিবছর নানা রকমের মাছ শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। এই শুকনো মাছকেই শুঁটকি বলা হয়। শুঁটকি দিয়ে তরকারি ও ভর্তা দুই ভাবেই রান্না করা হয়। সিলেটে হিদল বা সিদল ভর্তা বেশ জনপ্রিয়। চিতই পিঠার সাথে অনেকেই সিদল খেয়ে থাকেন। এই ভর্তা অনেক ঝাল হয়ে থাকে।

ঙ) চা

সিলেটকে চায়ের রাজধানী বললে ভুল হবে না। সমতল বা উঁচু ভূমিতে চা-গাছ উৎপন্ন হয়। সিলেটের মানুষ চা পান করতে পছন্দ করেন। সিলেটে পানির পরে প্রধান পানীয় হলো চা। চায়ে রয়েছে উচ্চমাত্রায় ক্যাটিচিন নামক এন্টি-অক্সিডেন্ট যা ক্যানসার প্রতিরোধ বা ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। পানীয় ছাড়াও চায়ের অন্যান্য ব্যবহার সিলেটে লক্ষ করা যায়। বাগানের শ্রমিকরা দুপুরের খাবার হিসেবে কচি চা-পাতা, পিঁয়াজ, কাঁচামরিচ ও চালের গুঁড়ার সাথে মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে আহার করে থাকে, যা শক্তিবর্ধক ও ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস

দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সিংহভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রাজশাহী অঞ্চলে বসবাস করে। সিলেটের প্রধান দুটি নৃ-গোষ্ঠী হলো 'মণিপুরি' ও 'খাসিয়া' সম্প্রদায়, যাদের রান্নার রয়েছে নিজস্ব পদ্ধতি এবং খাদ্যাভ্যাসও

ভিন্ন। এ-দুটি সম্প্রদায় ছাড়াও আরেকটি সম্প্রদায় রয়েছে যার নাম 'জৈন্তিয়া'। এই সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাস অনেকটাই বাঙালিদের মতো।

ক. মণিপুরিদের খাদ্যাভ্যাস

মণিপুরিদের পূজাপার্বণে ইরোম্বা (পানি দিয়ে সবজির ভর্তা), এমারপি (পানি ছাড়া সবজি ভর্তা), চ্যাম্পউধ (সবজি ও মাছ সিদ্ধ), শিনুব্মু (তাজা সালাদের মিশ্রণ), ওশই (কাঁচা বাঁশের ভর্তা), কানজি (পুড়ানো মাছ ভর্তা), ভউতং (ভর্তা করা এবং ভাজা সবজি) ইত্যাদি পরিবেশন করে থাকে।

মণিপুরিদের রয়েছে তিনটি ধর্মীয় গোষ্ঠী-সনাতন হিন্দু (বিষ্ণুপ্রিয়া), মৈতৈ এবং মুসলিম (মৈতৈ পাঙাল)। সনাতন হিন্দুরা বোধ থেকে মাংস, ডিম, তেল, পেঁয়াজ খাওয়া থেকে বিরত থাকে। মৈতৈ গোরুর দুধ পান করে না। এই দুই গোষ্ঠীই পেঁয়াজ এর বদলে জেনোম নামক পাতা ব্যবহার করে থাকে, যা পেঁয়াজের মতোই কাজ করে। মণিপুরিদের আরেকটি জনপ্রিয় সবজি হলো ইকাই থাবি লজ্জাবতী বর্গের এটি পানিতে জন্মে। এছাড়াও তারা তনিংখিক, মায়ংবা, হেইনা, লংচাক ইত্যাদি খেয়ে থাকে। মুসলিম বা মৈতৈ পাঙাল মণিপুরিরা মাছ, মাংস, সবজি খেয়ে থাকে কিন্তু তারা মদ থেকে বিরত থাকে।

খ. খাসিয়াদের খাদ্যাভ্যাস

সিলেটের খাসিয়ারা সিনতেং (Synteng) গোত্রভুক্ত। তারা কৃষিজীবী, ভাত ও মাছ তাদের প্রধান খাদ্য। খাসিয়াদের মধ্যে কাঁচা সুপারি ও পান খাওয়ার প্রচলন বেশি। খাসিয়াদের উৎপাদিত পান খুবই জনপ্রিয়। খাসিয়ারা নিজেদের উৎপাদিত শাকসবজি, শূকরের মাংস ও মোরগ খেতে ভালোবাসে। তারা মদ খেতেও পছন্দ করে। খাসিয়াদের অধিকাংশই পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। পানে রয়েছে এন্টি-ক্যানসারের গুণ, পান কফ হ্রাস করতে সাহায্য করে, মুখের দূর্গন্ধও দূর করে।

গ. জৈন্তিয়াদের খাদ্যাভ্যাস

জৈন্তিয়ারা ভাতের সঙ্গে সবজি, মাছ, মাংস খেয়ে থাকে। শূকরের মাংস তাদের পছন্দের খাবার। এছাড়াও তারা খাসি, মোরগ, দুধ ও দুধজাতীয় খাবার খায়। তারা চা পান করে এবং অতিথিদের পান সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকে। দেশি মদ তাদের খুবই পছন্দের পানীয়। তাদের রান্না বাঙালিদের মতো।

অধ্যায়-১৭

দুর্যোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সিলেট বাংলাদেশের একটি অন্যতম দুর্যোগপূর্ণ জেলা হিসেবে পরিচিত। সিলেটে ভূমিকম্প, বন্যা, কালবৈশাখি ঝড়, পাহাড়ধস, পাহাড়িঢল, অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায়শ দেখা দেয়। সিলেটে খরার প্রকোপ কম; যদিও ১৮৬৯-৭০ সালে সিলেটে খরায় ফসলহানি হয়েছিল বলে জানা যায়।

সিলেটে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্যোগের বিবরণী সংক্ষেপে দেওয়া হলো :

ভূমিকম্প (Earthquake)

প্রতিবছর পৃথিবীতে গড়ে প্রায় ৬ হাজার ভূমিকম্প হয়। এর বেশির ভাগ মৃদু হওয়ার কারণে সাধারণভাবে তা অনুভূত হয় না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, একটি মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প থেকে যে শক্তি নির্গত হয়, তা ১৮০ মিলিয়ন মেট্রিক টন টিএনটি (ট্রাই নাইট্রো টলুইন) বিস্ফোরকের সমান। জাপানে হিরোশিমায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে প্রথম পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল তার প্রায় ১০ হাজার গুণ বেশি শক্তি একটি মাঝারি ধরনের ভূমিকম্পের। বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার স্বল্পমাত্রার ও মধ্যম ধরনের ভূমিকম্প হয়েছে। সিলেট জেলার উত্তরপূর্ব সীমান্তের নিকটবর্তী ডাউকি ফল্টের কারণে বাংলাদেশেও বড়ো ধরনের ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

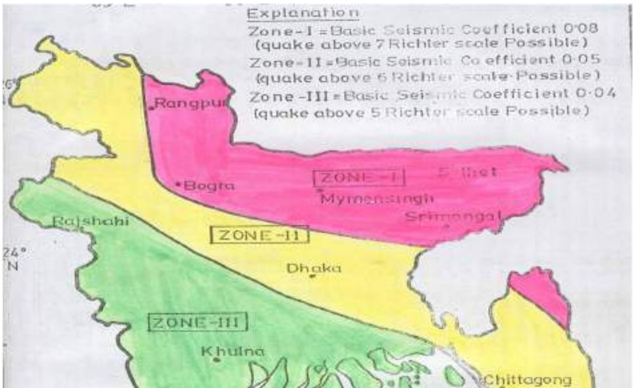

চিত্র : বাংলাদেশের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা

বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড ২০০৬ অনুসারে ভূমিকম্পের গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে উপরিল্লিখিত ম্যাপে বর্ণিত মতে ৩টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। সিলেট বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে পড়েছে, যা সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। গত ১৫০ বছরে ৭৬৫টি ছোটো-বড়ো ভূমিকম্প সিলেট অঞ্চলে অনুভূত হয়েছে। এ সকল ভূমিকম্পের অপকেন্দ্র (Epicentre) সিলেট শহর থেকে ৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে ছিল, এর মধ্যে ১৮৬৯ সালে কাছাড় (Cachar) ভূমিকম্প (ম্যাগনেচুট ৭.৫), ১৮৮৫ সালে বাংলা ভূমিকম্প (ম্যাগনেচুট ৭), ১৮৯৭ সালে গ্রেট ইন্ডিয়ান ভূমিকম্প (ম্যাগনেচুট ৮.৭), ১৯৫০ সালে আসাম ভূমিকম্প (ম্যাগনেচুট ৮.৫), ১৯৩০ সালে ধুব্রী ভূমিকম্প (ম্যাগনেচুট ৭.১), এবং ১৯১৮ সালে শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প (ম্যাগনেচুট ৭.৬) ছিল অন্যতম।

সিলেটে সংঘটিত কতিপয় ভূমিকম্পের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো।

১৫৪৮ সালের ভূমিকম্প

এ পর্যন্ত রেকর্ডকৃত ভূমিকম্পের মধ্যে ১৫৪৮ সালের ভূমিকম্প প্রথম। এটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হিসেবে উল্লিখিত। কিন্তু এ ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণী জানা যায় না।

১৬৪২ সালের ভূমিকম্প

এ ভূমিকম্পটি ১৫৪৮ সালের ভূমিকম্পের চেয়েও ভয়াবহ ছিল। অধিকাংশ বাড়িঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তবে জীবনহানির খবর জানা যায় না।

১৬৬৩ সালের ভূমিকম্প

১৬৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আসামে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় যেটি প্রায় আধাঘণ্টাব্যাপী স্থায়ী ছিল। ভূমিকম্প সিলেটেও আঘাত হানে তবে সিলেটে ক্ষয়ক্ষতির কোনো রেকর্ড পাওয়া যায় না।

১৮৬৯ সালের ভূমিকম্প

১৮৬৯ সালের ১০ জানুয়ারি এ ভূমিকম্পটি সংঘটিত হয় এবং সিলেটে এর ব্যাপকভাবে আঘাত অনুভূত হয়। এটি প্রায় ১মিনিট স্থায়ী ছিল এবং উত্তর-উত্তরপূর্ব থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে ভূমিকম্প বিস্তার লাভ করে। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আরো ৩টি ছোটো কম্পন সংঘটিত হয়।

এ ভূমিকম্পটি প্রায় ২,৫০,০০০ বর্গমাইল এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। বার্মা থেকে পাটনা বাজার গেইট পর্যন্ত কম্পন অনুভূত হয়। জৈন্তা পাহাড়ের উত্তরদিকে মোটামুটি বেশ গভীরে ২০ মাইলব্যাপী একটি খাদ তৈরি হয়। সিলেটে গীর্জার কতকাংশ ভেঙে যায়। আদালত ভবনের দেওয়াল ভেঙে যায় এবং সার্কিট হাউজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিলেটের পুর্বাঞ্চলের নদীগুলো দেবে যায়। তবে কোনো জীবনহানি হয়নি।

১৮৯৭ সালের ভূমিকম্প

এটি ছিল ইতিহাসের ভয়াবহতম ভূমিকম্প। ১৭,৫০,০০০ বর্গমাইলের অধিক এলাকাজুড়ে এটি বিস্তৃত ছিল। রেঙ্গুন থেকে দক্ষিণপূর্বে কাঙ্গারা পর্যন্ত, হিমালয়

থেকে মসুলিপট্টাম পর্যন্ত এ ভূমিকম্পটি ব্যাপক বিধ্বংসী আকারে আঘাত হানে। সিলেটে প্রথম ভূমিকম্পটি বিকাল ৪:৫০ মিনিটে অনুভূত হয়। সুনামগঞ্জের কিছুসংখ্যক বাসিন্দা জানায় বেশ কদিন পূর্ব থেকে শিলংয়ের দিকে তারা বিষ্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। এ ভূমিকম্পে সিলেটে ইটের তৈরি দালানগুলো মাটির সাথে মিশে যায়। তবে সুনামগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক কার্যালয়ের পুরোনো ভবনটি অক্ষত থাকে। কারণ এটি বাঁশের তরজার ওপর প্লাস্টার করা ছিল। নদীতে বহু নৌকাডুবিতে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করে। সিলেটে মোট ৫৪৫ জন লোক মারা যায়। মৃতদের মধ্যে সিলেট শহরে ৫৫ জন, উত্তর সিলেটে ১৭৮ জন, সুনামগঞ্জে ৩৮৭ জন, হবিগঞ্জে ৭ জন, দক্ষিণ সিলেটে ৮জন এবং করিমগঞ্জে ১০ জন ছিল। এতে দেখা যায় যে, উত্তর সিলেটে জীবনহানি দক্ষিণ সিলেটের চেয়ে বেশি হয়েছে। সিলেট জেলে ভূমিকম্প আঘাত হানে। কিন্তু কয়েদিরা এসময় মাঠে প্যারেডরত অবস্থায় ছিল। এতে লোক মারা যায় কম। সুনামগঞ্জের বিপরীত দিকে জাগিরগাঁও গ্রামটি নদীতে ধসে পড়ে এবং ৩৯ জন লোক মারা যায়। সিলেট সুনামগঞ্জ এবং সিলেট কোম্পানীগঞ্জে রুটে কমপক্ষে ৫টি সেতু ভেঙে পড়ে।

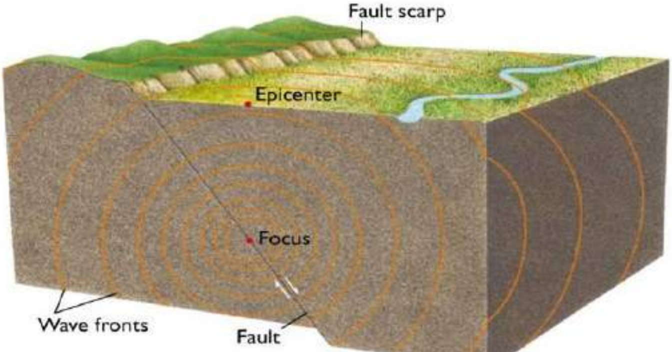

২০১৪ সালে সিলেটের বিল্ডিংগুলোর ভূমিকম্পের সহনশীলতা পরীক্ষা করা হয়েছে, এতে দেখা গেছে যে, সিলেটের বাড়িগুলো Irregular shape-এর; ফ্ল্যাট স্লাব-এর বাড়িসংখ্যা বেশি যা ভূমিকম্পের সময় ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশ বৃদ্ধি করে দেবে। অন্য এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে ৭০% বহুতল ভবনের মালিক বিল্ডিং কোড সম্পর্কে কোনো ধারণা পোষণ করেন না। ৪৪% বহুতল ভবনের মালিক নাগরিক সুবিধার কন্সট্রাকশনের জ্ঞান রাখেন না। সিলেট শহরের ১১.৩৭% স্কুল ও কলেজ বিল্ডিং ভূমিকম্পের সময় ঝুঁকিপূর্ণ। আরেকটি গবেষণায় সিলেটের মাটির গুণাগুণকে গুরুত্ব দিয়ে ভূমিকম্প ক্ষয়ক্ষতির সূচক (EDI) বের করা হয়। এখানে দেখা গেছে, সিলেট শহরের আখালিয়া, উপশহর, বাগবাড়ি, নদীর তীরবর্তী অঞ্চল অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।

বন্যা বাংলাদেশ তিনটি বৃহৎ নদীর মুখে অবস্থিত। নদী তিনটি হলো : গঙ্গা, মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্র। বাংলাদেশের ৮০ ভাগ ভূমি ডেলটা অঞ্চল, যা সক্রিয় ফ্লাড জোনের মধ্যে। বাংলাদেশের ৮০ ভাগ ভূমির গড় বৃষ্টিপাত ২২০০ মিলিমিটার। বন্যা শুরু হয় সাধারণত এপ্রিল মাসের শেষভাগে অথবা মে মাসের প্রথম ভাগে। জুলাই অথবা আগস্ট মাসে বাংলাদেশের ২০ ভাগ এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়। বাংলাদেশের বন্যাকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

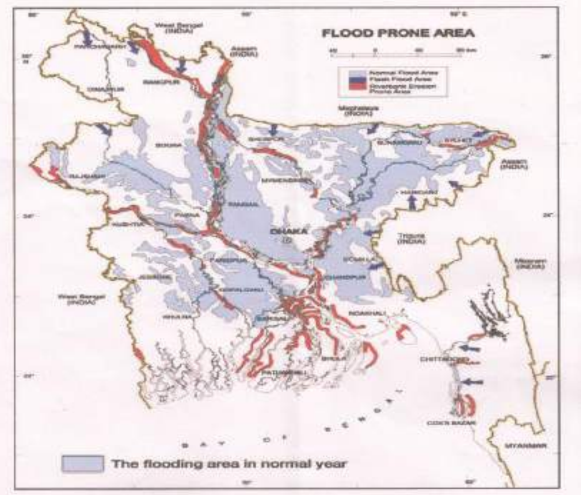

Fig 30: Danger Areas for Floods in Bangladesh

১. নদীর পানি বৃদ্ধি হয়ে বন্যা,
২. অবিরত ব্যাপক বৃষ্টিপাত ও পানি নিষ্কাশন না হওয়ার কারণে বন্যা ,
৩. পাহাড়ি ঢলে আগাম বন্যা,
৪. জোয়ারে অস্বাভাবিক পানির উচ্চতা বৃদ্ধি.

(সিলেটে জোয়ার ভাটার প্রভাব নেই বিধায় ৪নং কলামে বর্ণিত কারণ সিলেটে বিদ্যমান নেই।)

প্রতিবছরই বাংলাদেশে বন্যা হয়, তার মধ্যে ১৭৮১, ১৭৮৫, ১৭৯৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালের বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং জনদুর্ভোগ মারাত্মক আকার ধারণ করে। কতগুলো বন্যার বিবরণী দেওয়া হলো:

১৭৮১ সালের বন্যা এ বন্যা সম্পর্কে তৎকালীন জেলা কালেকটর মি. লিন্ডসের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এ বছরে ১৭৮১ সালে ওই এলাকায় ধানের বাম্পার ফলন হয়েছিল এবং খাদ্যশস্যের দাম অত্যন্ত নিচে নেমে গিয়েছিল। এর পর পরই সিলেটে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয় এবং সিলেটবাসী ব্যাপক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। নদীর পানি তলদেশ থেকে প্রায় ৩০ ফুট ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। নদীতীর

প্লাবিত হয়ে সামনের সবকিছু বিধ্বস্ত করে পানির স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। বাড়িঘর ভেঙে যায় এবং গবাদি পশু ও বন্যপ্রাণীর লাশ যেখানে সেখানে ভাসতে দেখা যায়। ধান ও খাদ্যশস্য যেগুলো কৃষকরা নদীতীরে গুদামজাত করে রেখেছিল সেগুলো পানির স্রোতে ভেসে যায়। ফলে এলাকায় পরবর্তী সময়ে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যে সমস্ত ফসলি জমি দেরিতে পেকেছিল সেগুলো পানিতে নিমজ্জিত হয়। মানুষের দুর্গতির সীমা থাকে না। সরকারিভাবে সাহায্য করা হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অপ্রতুল।

১৭৮৫-৯৫ সালের বন্যাসমূহ

৩ বছর পর সিলেটে আবারও বন্যা দেখা দেয়। শহর এলাকায় বলতে গেলে সব বাড়িঘর পানিতে ডুবে যায়। সেপটেম্বর মাসে ব্রহ্মপুত্র থেকে পানি প্রবাহিত হয়ে সিলেটে তা সাগরের আকার ধারণ করে। মাঝে মধ্যে কোনো কোনো এলাকাকে দ্বীপের মতো দেখা যাচ্ছিল। এতে ব্যাপকহারে গবাদি পশুও মারা যায়। মি. লিন্ডসে বোর্ডকে জানান, গবাদি পশুর দুই তৃতীয়াংশ পানিতে ভেসে গেছে এবং নিচু এলাকার একচতুর্থাংশ লোক অনাহারে অর্ধাহারে ও নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। ১৭৮৭ সালে আবারও বন্যা দেখা দেয় এবং এতে বহু গবাদি পশু মারা যায়। তা ছাড়া ১৭৯৩ ও ১৭৯৫ সালের বন্যায়ও সিলেটে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।

১৮৫০-৫১ সালের বন্যাসমূহ

এ সময়ে সিলেটে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা দেখা দেয়। বন্যার কারণে জমিতে ফসল চাষ করা বন্ধ থাকে এবং ইতোমধ্যে সে সকল ফসল জমিতে ছিল সেগুলোও বিনষ্ট হয়ে যায়।

১৮৯৩ সালের বন্যা

১৮৯৩ সালে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং জেলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়। এ সময়ে তেমন ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

১৯০২ ও ১৯২৯ সালের বন্যা

১৯০২ সালে এক বন্যা দেখা দেয় জেলার পশ্চিমাঞ্চলে। এছাড়া ১৯২৯ সালে জেলায় আবারও বন্যা হয়।

১৯৬৬ সালের বন্যা

১৯৬৬ সালের ১৮ জুন সিলেটে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। অধিকাংশ এলাকা পানিতে ডুবে যায়। সুনামগঞ্জ ও সদর মহকুমায় বন্যা স্মরণাতীতকালের মধ্যে ভয়াবহ ছিল। সুরমা, কুশিয়ারা এবং এগুলোতে শাখা নদী বন্যার পানিতে এমনভাবে সয়লাব হয়ে যায় যা এ জেলায় এর আগে ঘটেনি। রেলওয়ে লাইন পানিতে ডুবে যায়। জেলার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমনকি টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থাও ব্যাহত হয়। এ বন্যার মধ্যেই ১২ জুন তারিখে সকালে এক বিধ্বংসী ঝড় আঘাত হানে। এতে জেলার অধিকাংশ ইলেকট্রিক ও টেলিফোন লাইন ভেঙে পড়ে এবং সুনামগঞ্জের অনেক বাড়িঘর উড়িয়ে নিয়ে যায়। সিলেটের গোয়াইনঘাট, বিশ্বনাথ এবং জকিগঞ্জ থানায় এতটাই ঝড় হয়েছিল যে, এ গুলো সাথে অন্য কোনো এলাকার সাথে যোগাযোগ রাখাই সম্ভব হয়নি। ছাতক এলাকায় বেশ কিছু মৃতদেহ পাওয়া যায়। ফসলি জমির আউশ ধান সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু বন্যায় ভেসে

যায়। সরকারিভাবে জরুরি ত্রাণসামগ্রী ও বিভিন্ন অনুদান দুর্গত এলাকার জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সিলেটের প্রায় ৩ হাজার বর্গমাইল এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। এ এলাকার শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িঘর বিনষ্ট হয়, ৩৯ জনের জীবনহানি ঘটে এবং ১০ হাজার গবাদি পশু হারিয়ে যায় এবং প্রায় ১২ লাখ লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৬৮ সালের বন্যা

১৯৬৮ সালে সিলেটে আরো একটি ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। আসামের বন্যার পানির দ্বারা সিলেট প্লাবিত হয়। আর এদিকে সিলেট জেলায়ও ব্যাপক বৃষ্টিপাত শুরু হয়। ১৯৬৮ সালে জুলাই মাসে যখন আসামের মণিপুর রাজ্যে বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ ভেঙে যায় তখন সিলেটে বন্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে। ৩৮ বছরের মধ্যে এ বন্যা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহতম। সিলেটের ৪টি মহকুমার ১৯টি থানার ৭ লাখ লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৭,৫০০ এর বেশি পরিবারকে বন্যা আক্রান্ত এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় এবং লক্ষাধিক লোককে নিরাপদ অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১৩ থানার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সিলেট সদরের ৪০ ভাগ ফসল বিনষ্ট হয়। তা ছাড়া সিলেটের বালাগঞ্জ, কানাইঘাট এবং সদরের হাওর এলাকা সবচেয়ে বেশি বন্যায় আক্রান্ত হয়। বালাগঞ্জে শতভাগ বাড়ি এবং শতকরা ৫০ ভাগ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকার থেকে ৯ হাজার মণ জিআর গম এবং নগদ ১০ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

টিলাকর্তন ও পাহাড়ধস

গত ১০ বছরে টিলা ধসে বসতবাড়ি ভেঙে প্রাণ হারিয়েছে সিলেটের বহু লোক। তারপরও টিলা কেটে বড়ো ধরনের ঝুঁকির মধ্যে বসতবাড়ি নির্মাণ করা ও ভূমি দখলের প্রক্রিয়া বন্ধ হয় নেই। স্থানীয় প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী ১৯৭০ সালে সিলেট জেলার পাহাড়ি টিলার সংখ্যা ছিল ৪১২টি। বর্তমানে এই সংখ্যা কমে ৩৫১টিতে দাঁড়িয়েছে। খাদিম, বালুচর, আখালিয়ায় টুলটিকর ইউনিয়নের বালুচর এলাকার ধোপাগুল, ডালিয়া ও লাখাউড়ায় টিলার কর্তনের ঘটনা বেশি। সিলেটের সবচেয়ে বেশি পাহাড় কাটা হয়েছে খাদিম নগর ও খাদিমপাড়া ইউনিয়নে। এখানে ১৫-১৮টি টিলা বিলুপ্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন-২০১০-এর ৪ ধারার ৬ (খ) এ বলা হয়েছে ‘কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান-কর্তৃক সরকারি বা আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন বা মোচন করা যাবে না’।

টিলা কর্তনের ফলে পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। কর্তিত টিলার পার্শ্ববর্তী টিলা ধসে পড়ে এবং ক্রমাগত পরিবেশবিপর্যয় ঘটতে থাকে।

সিলেট জেলায় ১ লাখ লোক টিলা ও পাহাড়ধসের মৃত্যুঝুঁকিতে রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সিলেট শহর অঞ্চল, বিমানবন্দরসংলগ্ন অঞ্চল, আখালিয়া, বাগবাড়ি এলাকায় মানুষ পাহাড়ধসের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। পাহাড়

থেকে বৃক্ষনিধন, নদী থেকে অপরিকল্পিত উপায়ে পাথর ও বালু উত্তোলন, পাহাড় কাটা, পাহাড়ে অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন ইত্যাদি পাহাড়গুলোকে ভারসাম্যহীন করছে। পাহাড়গুলো পাললিক শিলাদ্বারা গঠিত বলে অতিবৃষ্টিতে এখানে পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে ৩৮ হাজার ২ শ ৩৭ হেক্টর পাহাড়ি অঞ্চল ছিল। ২০০৭ সালে তা হয়েছে ২৪ হাজার ৮২৭ হেক্টরের মতো। সিলেটের ১১% ভূমি পাহাড়, এবং ১৭.৮% উচ্চভূমি। সিলেটে প্রায় ৬৬,০০০ হেক্টর বনাঞ্চলের ২৩% পাহাড় ও টিলার ওপর অবস্থিত। সিলেট শহরের খাদিমপাড়ার ভাওয়ালটিলা, বাহুবল, বাইপাস, খলিটিলা, কলগ্রাম, দলাইপাড়া, আখালিয়া, জালালাবাদ, এলাকার বিভিন্ন পাহাড় ও টিলা ভূমিখেকো চক্রের দৃষ্টির মধ্যে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেটের টিলাগুলো কেটে পরিবেশ বিপন্ন করে তোলা হচ্ছে।
সিলেট বৃষ্টিবহুল অঞ্চল, কিন্তু গত দুই তিন দশক ধরে বৃষ্টিপাতের প্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলের Ground Water Table ০.৫ মিটার প্রতিবছরে পরিবর্তিত হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের ফলে Water Resource কমে গেছে। সিলেটের অন্য দুর্যোগের মধ্যে ছড়া দখল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, জলাশয় ভরাট ইত্যাদি অন্যতম।

কালবৈশাখি ঝড়

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে কালবৈশাখি ঝড় হয়, যা টর্নেডোর মতোই ভয়াবহ। কখনো কখনো অস্বাভাবিকভাবে ফাল্গুন মাসের শেষের দিকেও কালবৈশাখি ঝড় হয়ে থাকে। সিলেটে কালবৈশাখি ঝড়ে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

১. কালবৈশাখি ঝড়ের আভাস পাওয়া গেলেই রেডিয়োতে প্রচারিত আবহাওয়া বার্তা শোনা ও ঝড়ের গতিপ্রকৃতির দিকে খেয়াল রেখে জনগণকে অবহিত রাখা।

২. পরিবারের সকলকে সতর্ক করে নির্দিষ্ট শক্ত খাট-পালংকের নিচে, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তুতি রাখা;

৩. বাড়ির আঙিনার আশেপাশে ভারী জিনিসপত্র কাঠ, টিন, চাষের যন্ত্রপাতি লোহা ইত্যাদি খোলা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে না রাখা;

৪.বাড়ির কাছাকাছি গাছপালার ডাল কেটে বাড়িকে পরিচ্ছন্ন করে রাখা;

কালবৈশাখি ঝড় যেহেতু স্থানীয় পরিসরে সংঘটিত হয়ে থাকে, তাই কালবৈশাখি শেষ হলেই এর ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন, উদ্ধারকারী ও আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে যত দ্রুতসম্ভব অবহিত করা এবং নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের মাধ্যমে কালবৈশাখির ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কার্যকর অবদান রাখা।

বজ্রপাত

বাংলাদেশে বজ্রপাতে প্রতি বছর অনেক মানুষ হতাহত হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বর্ষাকালে বজ্রপাতের পরিমাণ

বৃদ্ধি পায়। ২০০৭ সালে বজ্রপাতে হতাহতের সংখ্যা মোট ১৯১ জন, এর মধ্যে মারা যায় ১০৮ জন এবং বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতায় ভোগে ৮৩ জন। সিলেটেও বজ্রপাতজনিত আঘাতে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

দুর্যোগ প্রতিরোধ

আগে দুর্যোগকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাকৃতি দুর্যোগ মোকাবিলার ওপর মানুষের হাত না থাকলেও দুর্যোগের প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যে অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব, এ সম্পর্কিত বিশ্বাস মানুষের মধ্যে জন্মেছে। সকল দুর্যোগে যথাযথ প্রস্তুতি, গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ মোকাবেলার চক্র পালনের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

একসময় মনে করা হতো যে, প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ হওয়ার পর দুর্গত এলাকার জন্য ত্রাণসংগ্রহ ও বিতরণ করাই সরকার বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের একমাত্র দায়িত্ব, কিন্তু অধুনা বিশ্বে এ ধারণা পাল্টে গেছে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সরকার দুর্যোগ প্রশমনের জন্য দুর্যোগপ্রস্তুতির ওপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করছে। বাংলাদেশ সরকার এ সম্পর্কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সরকার সাবেক ত্রাণমন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নামকরণ করেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিবিধ পরিকল্পনার সাথে একাত্মতা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিলেট জেলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগ কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) সমন্বিত প্রচেষ্টায় কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অগ্নিপ্রতিরোধ, অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, ইভাকুয়েশন (জরুরি নির্গমন) ড্রিল, অগ্নিনির্বাপণে ও ভূমিকম্প বিষয়ে মহড়া প্রদর্শন এবং গণসংযোগ অব্যাহত আছে। জুন ২০১৪ সাল পর্যন্ত সিলেট সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ড হতে ৩১৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরি করা হয়েছে।

দুর্যোগ প্রস্তুতিতে করণীয়

১. ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ;

২. দুর্বল অবকাঠামো চিহ্নিত করে তা ব্যবহারের অনুপযোগী বলে ঘোষণা দেওয়া;

৩. পরিবার, পাড়া-মহল্লা তথা কমিউনিটির জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে কাউন্সলিং, সভা ও সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা;

৪. কন্টিনজেন্সি প্ল্যান তৈরি করা;

৫. কমিউনিটিতে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;

৬. প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, এর ব্যবহারের শিক্ষা দেওয়া এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা ;

৭. অন্যান্য সাড়াদানকারী সংস্থার সদস্যদের একই আঙ্গিকে দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৮. বিল্ডিং কোড মেনে এবং এলাকার উপযুক্ততা যাচাই করে প্রয়োজনীয় আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা;

৯. জরুরি সেবাপ্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি সেবাদানকারী সংস্থায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, মালামাল মজুদ ও যথাযথ ব্যবস্থায় পারদর্শী করে গড়ে তোলা;

১০. শিক্ষা কারিকুল্যামে দুর্যোগ-বিষয়ক পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্তকরণ;

১১. ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাজ-সরঞ্জামাদি ও খাবার সংরক্ষণ;

১২. ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ডের মহড়া ও জরুরি নির্গমন অনুশীলন;

দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাসে সচেতন করা এবং ভূমিকম্পের মতো বড়ো দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ৬২ হাজার আরবান কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হচ্ছে। এদের মাধ্যমে কমিউনিটি জনসাধারণ যেমন সচেতন হবে, তেমনি বড়ো দুর্যোগে ফায়ার সার্ভিস ও অন্যান্য সংস্থার সাথে এসব স্বেচ্ছাসেবক অপারেশনাল কাজে সহযোগিতা করে দেশের জাতীয় সম্পদ ও মানুষের জানমাল রক্ষায় অনন্য ভূমিকা পালনে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি ফলিত বা ব্যবহারিক প্রক্রিয়া। দুর্যোগের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ, ঝুঁকি হ্রাসকরণ, প্রস্তুতি, জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার উন্নতির সাধন করা সম্ভব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ

ক. ঝুঁকিপূর্ণ জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
খ. দুর্যোগ-আক্রান্ত জনগণের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম উন্নতকরণ;
গ. যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণকে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে অবগত করা;
ঘ. সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও আর্থিক লোকসান কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ. দ্রুত বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে ত্বরিত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা : আর্থ-সামাজিক দক্ষতা প্রয়োজন, রাজনৈতিক দক্ষতার প্রয়োজন, প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রয়োজন, স্থানীয় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত দক্ষতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতা প্রয়োজন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

সংগঠন : বড়ো দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবিলা করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণ আবশ্যক।

দক্ষতা : কমিউনিটির জনসাধারণকে স্বাভাবিক সময়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে দুর্যোগ মোকাবিলায় কাজে লাগাতে হবে।

অধ্যায়-১৮

অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

সিলেটে অভিবাসী হওয়ার কারণ

দেশের বাইরে কিংবা দেশের অভ্যন্তরে একস্থান থেকে অন্যস্থানে মানুষের অভিবাসী হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থনৈতিক। মানুষ প্রধানত ভাগ্যের উন্নয়নের জন্যই একস্থান থেকে অন্যস্থানে এবং একদেশ থেকে অন্যদেশে স্থানান্তরিত ও অভিবাসী হয়। ভাগ্যের অন্বেষণের জন্য অভিবাসী হতে আগ্রহী মানুষ ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ, সম্পদ ও প্রাচুর্যে ভরপুর নিরাপদ শান্তিপূর্ণ দেশ ও অঞ্চলে অভিবাসী হতে চায়। অভিবাসী হতে আগ্রহীদের আকৃষ্ট করার মতো আকর্ষণ সিলেটের সবসময়ই ছিল, এখনো আছে।

চা-বাগানে চাকরির সুবাদে অভিবাসন

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সিলেটে চা-চাষ শুরু হলে চা-বাগানে কাজ করার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রায় ১,৬৪,৮৯৫ জন শ্রমিক বিহার ও উড়িষ্যা থেকে নিয়ে আসা হয়। বহিরাগত এই অভিবাসীদের উত্তরসূরিরা বংশানুক্রমে চা-বাগান এলাকা ও আশপাশের পাহাড়ি এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। ১৯৭১ সালে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য তারা বাঙালিদের সাথে একজোট হয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, আত্মদান করেছেন। তারা নিজেদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির সাথে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করেছেন। স্থানীয় লোকজনের সাথে তাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান।

হাওর অঞ্চল

সিলেটে একসময় শত শত মাইল বিস্তৃত হাওর ছিল। এখনো বড়ো বড়ো হাওর আছে। এসব হাওরে বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি এবং মৎস্যসম্পদ আছে। হাওর অঞ্চলে চাষ, সেচ, নিড়ানি ও ধান কাটা, ধান মাড়াই, ধান ভাঁড়ারে তোলা ইত্যাদি কাজের জন্য সবসময়ই পার্শ্ববর্তী ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, রংপুর ইত্যাদি জেলার লোকজন সিলেটে অভিবাসী হয়েছেন। হাওর ভরাট হয়ে চরাঞ্চল জেগে উঠেছে। এসব চরে অন্য জেলা থেকে আগত অভিবাসীরা বসতি গড়ে তুলেছেন। আমেরিকায় যেমন ইংল্যান্ডের ইয়র্ক থেকে গিয়ে বসতি স্থাপনকারীদের ফেলে আসা জেলার নামানুসারে নিউইর্য়ক নাম হয়েছে সিলেটেও তেমনি হাওরের চরাঞ্চলে ভিন্ন জেলা থেকে আগত অভিবাসীদের ফেলে আসা এলাকার নামানুসারে নোয়াখালী বাজার, রংপুর ইত্যাদি নামকরণ হয়েছে।

পাহাড়ি এলাকা

সিলেটে বিরাট এলাকাজুড়ে অসংখ্য পাহাড় ও টিলা আছে। বিশাল বনভূমি ও অরণ্য আছে। এসব পাহাড় ও অরণ্যাঞ্চলে বাইরের জেলা থেকে আগত অভিবাসী লোকজন বহুবছর আগে থেকে এসে এসব দখল ও আবাদ করেছেন এবং আবাসস্থল গড়ে তুলেছেন। এসব এলাকায় বসবাসকারী ভিন্ন জেলার অভিবাসীদের একসময় ‘আবাদি’ নামে ডাকা হতো। কালের স্রোতে এখন স্থানীয়-অস্থানীয় সবাই একাকার হয়ে গেছেন।

প্রবাসী অর্থের প্রভাব উনিশ শতকের শেষ থেকেই সিলেটের মানুষ ব্রিটিশ মার্চেন্ট নেভীর জাহাজসমূহে চাকরি নিতে শুরু করেন। বিংশ শতকের শুরুতে সিলেট অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ জাহাজের চাকরিতে যোগদান করেন। তারা ভালো রোজগারও করতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে সিলেটের জাহাজিরা বিলাত-আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং তাদের রোজগারের টাকা পয়সার প্রভাবে সিলেটে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। জাহাজে চাকরির সুবাদে যেমন সিলেটে বিরাট অঙ্কের বাড়তি টাকা আমদানি হতো, তেমনি জাহাজ থেকে ওঠে যারা ব্রিটেন-আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তারাও দেশে টাকা পাঠাতেন। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের প্রভাবে সিলেট দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক বেশি আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করে এবং ব্যাপক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এই আর্থিক উন্নয়নের আকর্ষণে অন্য জেলার লোকজনের সিলেটে কর্মসংস্থানের জন্য আগমনের একটি ধারা সৃষ্টি হয়েছে যা এখনো অব্যাহত।

সিলেটের যে-সব এলাকায় অন্য জেলার মানুষ অভিবাসী হয়েছেন এগুলো হলো :

উত্তরপূর্ব পাহাড়ি এলাকা সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলা ও গোয়াইনঘাট উপজেলার পাহাড়ি অঞ্চলে অন্যান্য জেলার লোকজন পাহাড়ি টিলা ও জমি দখল এবং আবাদ করে জীবিকা অর্জনের জন্য আসেন। তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। দেশবিভাগের পর পাকিস্তান আমলের শুরু থেকে তথা গত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে এই অভিবাসনপ্রক্রিয়া শুরু হয়। বর্তমানে এসব এলাকায় ভিন্ন জেলার বিপুলসংখ্যক লোকজন স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা বর্তমানে যুক্তরাজ্যে প্রায় ১০ লাখ বাংলাদেশি আছেন যার শতকরা ৯৫ জন সিলেটি এবং অধিকাংশই বর্তমান সিলেট জেলার বাসিন্দা। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রেও ১০ লাখ বাংলাদেশি আছেন যাদের অধিকাংশ সিলেটি এবং বর্তমান সিলেট জেলার বাসিন্দা। উনিশ শতকের শেষদিক থেকে জাহাজিরা প্রচুর টাকাপয়সা নিয়ে এসে সিলেটে বাড়িঘর নির্মাণ, পুকুর খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণসহ নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করেন। এই সময় ইটাখলায় কাজের জন্য এবং পুকুর খনন ও রাস্তাঘাট নির্মাণে মাটিকাটার জন্য নোয়াখালী ও ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক এসে সিলেটে স্থায়ী হয়ে যান। প্রবাসী-অধ্যুষিত বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, ওসমানীনগর, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় প্রবাসীদের খালি বাড়িঘর পাহারা দেওয়ার জন্য ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রংপুর অঞ্চলের মানুষদের বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রবাসীরা স্থানীয় লোকজনের চেয়ে উল্লিখিত অঞ্চলসমূহের মানুষের অধিক নিরাপদ বিবেচনা করে নিজেদের বাড়িঘর এদের জিম্মায় রেখে যান। এই সুবাদে অন্যান্য জেলা থেকে আগত অনেক অভিবাসী সিলেটে বসবাস করছেন।

সিলেট মহানগর

সিলেট মহানগরে বৈধ ও অবৈধ মিলে প্রায় ৭০ হাজার রিকশা, ঠেলাগাড়ি, ভ্যানগাড়ি চলাচল করে। এসব যানবাহনের চালক শতকরা ৯৫ জনই নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, জামালপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দা। মহানগরীর দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁর কর্মচারীদের, শতকরা ৮০ জনই ভিন্ন জেলার মানুষ। কাজ ও চাকরির সুবাদে তারা অভিবাসী হিসেবে সিলেটে বসবাস করছেন। মহানগরীতে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অভিবাসীদের সমিতি আছে। এসব সমিতির প্রাণচাঞ্চল্য থেকে বোঝা যায় বিপুলসংখ্যক নন-সিলেটি সিলেট মহানগরীতে বসবাস করেন। সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে নন-সিলেটি ভোটারদের ব্যাপক প্রভাব থেকেও বোঝা যায় সিলেট মহানগরীতে বিপুলসংখ্যক নন-সিলেটি আছেন। চাকরি ছাড়াও ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ অঞ্চলের অনেক মানুষ মহানগরীতে ব্যবসাবাণিজ্যে নিয়োজিত আছেন।

অভিবাসনের সুফল ও কুফল

ভিন জেলার মানুষ সিলেটে অভিবাসী হওয়ার ফলে কিছু সুফল যেমন পাওয়া গেছে, তেমনি কিছু সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। অভিবাসীরা সর্বত্রই খুবই পরিশ্রমী হন। এখানেও এর ব্যত্যয় হয়নি। সিলেটের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এর সুফল লক্ষ করা যায়। দুর্গম এলাকা ও পাহাড়ের জমি আবাদ করে যেমন তারা অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় অবদান রাখছেন, তেমনি প্রবাসীদের পরিত্যক্ত জমিতে চাষাবাদ করে তারা নিজেদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছেন। সিলেটে ভিন জেলার মানুষের অভিবাসনের কুফল হচ্ছে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় বেকারত্ব আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় শ্রমজীবীদের অভিযোগ অভিবাসীরা সস্তায় শ্রম বিক্রি করেন বলে তারা ন্যায্য মজুরিপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিপুলসংখ্যক অভিবাসী আগমনের ফলে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, খাদ্য ও আবাসনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। স্থানীয় শ্রমজীবী ও দরিদ্র মানুষের অভিবাসীবিরোধী মনোভাবের ফলে মাঝে মাঝে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ঝগড়াবিবাদও হয়, তবে তাতে এখন পর্যন্ত ব্যাপক কোনো অশান্তির সৃষ্টি হয়নি।

বৈদেশিক অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত সভায় অভিবাসীদের ‘ডায়াস্পরা ও মাইগ্রেন্ট-ওয়ার্কার’ দুই শ্রেণিতে ভাগ করে অভিবাসীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ডায়াস্পরা হচ্ছে, জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী ডায়াস্পরা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অভিবাসী আর মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার অস্থায়ী অভিবাসী।

সিলেটের বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রবাসে বাস করেন। এদের মধ্যে ডায়াস্পরা ও মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার দুই শ্রেণিরই প্রবাসী আছেন। কারো কারো প্রপিতামহ, পিতামহের আমল থেকে প্রবাসী হওয়ার ইতিহাস আছে, আবার কেউ কেউ অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রবাসে কর্মরত আছেন। স্থানীয়ভাবে প্রবাসীদের লন্ডনি, মিরিকিনি, সৌদি, কুয়েতি, সিঙ্গাপুরি ইত্যাদি নানা নামে ডাকা হয়। তবে

তাদের সকলের সাধারণ পরিচয় প্রবাসী। সিলেটে প্রবাসী বাঙালিরা জননন্দিত ও সম্মানিত। বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী সিলেটের প্রবাসীরা এখানকার সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। লন্ডনে কারো অসুখ হলে সিলেটে দোয়া, খতম পড়ানো হয়, নিউইর্য়কে কেউ মৃত্যুবরণ করলে সিলেটে কান্নার রোল পড়ে। আবার লন্ডন বা নিউইর্য়কে বিয়ে, আকিকা, জন্মদিনের উৎসব হলে সিলেটে কেবল আনন্দ ফুর্তি নয়, খানাপিনার উৎসব অনুষ্ঠানও হয়। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যেমন সিলেট থেকে বিলাত, আমেরিকায় গিয়ে আত্মীয়স্বজনরা যোগদান করেন, তেমনি সিলেটেও এসব অনুষ্ঠানে প্রবাস থেকে এসে আত্মীয়স্বজনরা যোগ দেন। সিলেটের প্রবাসীদের মধ্যে ডায়াস্পরার সংখ্যাধিক্য, তবে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার প্রবাসীর সংখ্যাও যথেষ্ট।

বিদেশে অভিবাসী হওয়ার ইতিহাস-যুক্তরাজ্য গমন

দাবি করা হয় যে, ভারতীয়দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় প্রথম বিলাত গিয়েছিলেন। কিন্তু সিলেটের প্রথম কালেক্টর রবার্ট লিন্ডসের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় সিলেটের সৈদ উল্লা প্রথম বিলাত গিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় বিলাত যান ১৮৩০ সালে আর সিলেটের সৈদ উল্লা গিয়েছিলেন ১৮০৯ সালে রবার্ট লিন্ডসেকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। রবার্ট লিন্ডসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি সিলেটের কালেক্টর থাকাকালীন এখানে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল। বিদ্রোহ দমনের জন্য লিন্ডসে গুলি করেছিলেন। ওই ঘটনায় অনেকের সাথে সৈদ উল্লাহর পিতাও মারা যান।

বস্তুত, যুক্তরাজ্য প্রবাসী সিলেটের জাহাজিরাই আমাদের প্রথম প্রবাসী বা প্রবাসী-বাঙালিদের পথিকৃৎ। ব্রিটিশ গবেষক ও লেখক ক্যারোলিন এডামস, যিনি বিলাতপ্রবাসী সিলেটি কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন কাজ করেছেন তিনি তার লিখিত *Across the seven seas & thirteen rivers* গ্রন্থে বলেছেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই সিলেটের জাহাজিরা বিলাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি জানান নেতৃস্থানীয় প্রবাসী আইয়ুব আলী মাস্টার, নানা, মুনশি, মারুফা খান, নাঈম উল্লাহ্ প্রমুখ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই বিলাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন এবং আইয়ুব আলী মাস্টারের সহযোগিতায় ১৯২২-১৯২৩ সাল থেকে অন্য জাহাজিরা লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ লাভ করেন। আইয়ুব আলী মাস্টার জাহাজ থেকে পালিয়ে আসা আশ্রয়প্রার্থীদের থাকার সুবিধার জন্য ব্রিক লেইন এলাকায় বড়ো বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন। সেখানেই জাহাজিরা প্রথমে আশ্রয় নিতেন। আইয়ুব আলী মাস্টার তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে নাম রেজিস্ট্রারি করাতেন, ইন্ডিয়া হাউসে নিয়ে গিয়ে পরিচয়পত্র বের করতেন, রেশনকার্ড ও পৌরনিবন্ধন করে দিতেন। এভাবে বৈধ বসবাসকারী হওয়ার পর তারা চাকরি নিয়ে সুবিধাজনক জায়গায় চলে যেতেন, কিন্তু কোনো অসুবিধা হলেই মাস্টার সাহেবের শরণাপন্ন হতেন। মাস্টার সাহেব নিজের দায়িত্ব মনে করে তাদের সহযোগিতা করতেন। জাহাজিরা বাংলা, ইংরেজি কোনো ভাষাতেই লিখতে পড়তে পারতেন না। মাস্টার সাহেব তাদের

দেশের চিঠি লিখে দিতেন, তাদের দেশে টাকা পাঠানোর মানি অর্ডার ফরম পূরণ করে দিতেন এবং তা প্রেরণেরও ব্যবস্থা করে দিতেন। এসব সহযোগিতার জন্য আইয়ুব আলী মাস্টার কোনো টাকা পয়সা নিতেন না। কিন্তু চাকরি হওয়ার পর জাহাজিরা বকেয়াসহ বাড়িভাড়া পরিশোধ করতেন। আইয়ুব আলী মাস্টারের উপরিউক্ত সহযোগিতা ছাড়া পূর্বসূরি জাহাজিরা বিলাতে স্থায়ী হতে পারতেন না। তাই আইয়ুব আলী মাস্টারকে পথিকৃৎ প্রবাসীর মর্যাদা দেওয়া হয় ও শ্রদ্ধা জানানো হয়। বস্তুত, আইয়ুব আলী মাস্টারসহ সিলেটের জাহাজিরাই প্রবাসী বাঙালিদের পথিকৃৎ বা পূর্বসূরি এটা সকলেই স্বীকার করেন।

ব্রিটিশ মার্চেন্ট নেভিতে তৎকালীন পূর্ববাংলার যেসব জাহাজি ছিলেন তারা কলকাতা বন্দর থেকে জাহাজের চাকরিতে যোগ দিতেন। এসব জাহাজি পূর্ববাংলার মাত্র তিনটি জেলা সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার অধিবাসী ছিলেন। কোলকাতা বন্দর থেকে কিছু জাহাজ ‘ইনারসী’তে চলাচল করে কাছের সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, রেংগুন ইত্যাদি বন্দরে যাতায়াত করত। আবার কিছু জাহাজ ‘ডিপসি’ তথা সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে লন্ডন, নিউ ইর্য়ক, বোস্টন, ব্রিস্টল ইত্যাদি বন্দরে যাতায়াত করত। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের জাহাজিরা ‘ইনারসি’তে চলাচলকারী জাহাজে চাকরি করতে বেশি পছন্দ করতেন। আর সিলেট অঞ্চলের জাহাজিরা ‘ডিপসি’তে চলাচলকারী জাহাজে চাকরি করতেন। ‘ডিপসি’তে চলাচলকারী জাহাজে চাকরির সুবাদেই সিলেটের বিপুলসংখ্যক জাহাজি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসী হয়েছেন।

সিলেটের মানুষ কেন এত ব্যাপকহারে ওই সময় জাহাজের চাকরিতে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে অনুসন্ধানে জানা যায়, ব্রিটিশ বাংলায় সিলেটের ভূমিব্যবস্থা ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম। ঔপনিবেশিক শাসকরা তৎকালীন বাংলাদেশে ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করলেও সিলেটে তেমন কোনো বড়ো জমিদার ছিল না, বেশির ভাগ বন্দোবস্তই হয়েছিল সাধারণ কৃষকদের সাথে। এজন্য সিলেটে ভূমিব্যবস্থাকে Peasant proprietorship বলা হতো। ফলে সাধারণ মানুষ তথা কৃষকদের হাতেই ভূমির মালিকানা রয়ে যায়। এ কারণে সিলেটে কৃষকদের মধ্য থেকে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটে। তালুকদার, পেটি তালুকদার এবং সরকারের কাছ থেকেই সরাসরি রায়তি জোত বা কৃষিজমি বন্দোবস্ত আনয়নকারী কৃষকরাও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর এই মধ্যবিত্তের সংখ্যা সিলেটে বেশ উল্লেখযোগ্যই ছিল। সময়ের ব্যবধানে পরিবার বড়ো হওয়া ও ভাগ হওয়ার কারণে এসব পরিবারের জমির পরিমাণ কমে আসতে থাকলে উঠতি কর্মক্ষম যুবকরা বেকার হতে থাকেন। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মমর্যাদাবোধ আবার বেশি ছিল। তারা প্রতিবেশী জোতদার বা অবস্থাপন্নদের জমিতে কামলা বা কৃষি শ্রমিক হিসেবে রোজগার করা পছন্দ করতেন না। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে দেশে কলকারখানা গড়ে ওঠেনি

বিধায় সিলেটে তাই মধ্যবিত্ত বেকারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ মার্চেন্ট নেভির বাণিজ্য-জাহাজ সিলেটের আত্মমর্যাদা সচেতন এই মধ্যবিত্তের সামনে কর্মসংস্থানের এক নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে দেয় এবং সিলেটের মধ্যবিত্ত শ্রেণির এসব বেকার যুবক দলে-দলে জাহাজের চাকরিতে যোগ দেন।

সিলেটের মানুষ জাহাজি বা প্রবাসী হওয়ার আরেকটি কারণ হলো সিলেটের প্রবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকের বংশানুক্রমে আরবীয় রক্ত প্রবাহিত। প্রাথমিক আরবরা সমুদ্রপথেই এদেশে এসেছিলেন। তাই তাদের সংস্পর্শে আসায় ঐতিহ্যগতভাবেই সিলেটিরা সমুদ্রযাত্রায় ভীত ছিলেন না। এই অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার ঘটে হজরত শাহজালাল (র.) ও তাঁর ৩৬০ জন সহচরের ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে। সিলেটের সাধারণ মানুষ তাঁদের সংস্পর্শে এসে বিদেশ ও বিদেশিদের সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। হজরত শাহজালাল (র.)-এর সহচরগণ সিলেটের বর্তমান সময়ের প্রবাসী-অধ্যুষিত এলাকাসমূহেই বেশির ভাগ বসতি গড়ে তুলেছিলেন। তারা স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করে স্থায়ী হয়েছিলেন। অনুসন্ধান করে দেখা যায়, সিলেটের প্রবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেই হজরত শাহজালাল (র.)-এর ৩৬০ সহচরের বেশির ভাগেরই মাজার অবস্থিত। গবেষণায় জানা যায়, অনেক জাহাজিই নিজেদের হজরত শাহজালাল (র.)-এর ৩৬০ সহচরের কারো না কারো অথবা অন্য কোনো আরবের উত্তরসূরি দাবি করেন। জানা যায়, এদেশে স্থায়ী হলেও হজরত শাহজালালের সহচররা আরবে তাদের ফেলে আসা জন্মভূমির সাথে যোগাযোগ রাখতেন, জন্মভূমিতে যাতায়াত করতেন এবং সেখান থেকে নিকটাত্মীয়দের এদেশে নিয়ে এসেছিলেন যারা পরবর্তী সময়ে এখানে স্থায়ী হয়ে যান। এভাবে সিলেটে আরব থেকে অভিবাসী হয়ে-আসা মানুষের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়।

অভিবাসন ঐতিহ্যই যে সিলেটের মানুষের অভিবাসী হওয়ার অন্যতম কারণ এর পক্ষে বিশিষ্ট লেখক আবুল মাল আবদুল মুহিত লিখেছেন, ‘As regards emigration from Sylhet, it may be mentioned that Sylhet was historically a land for immigrants since the days of the arrival of the great Saint Shahjalal (RA) with 360 disciples from far away Arabia in the early fourteenth century, who settled down in Sylhet opening the door for immigrants from the Middle East. The trend continued till India was occupied by the British fortune-hunters in the eighteenth century, who, plundering the immense wealth of the whole of Bengal, soon turned it into a land of hapless people. As a result, the people of Sylhet were compelled to take recourse to emigrating for survival. They found their way to the port city of Calcutta for more permanent but also more mobile employment on the ocean going British merchant ships that soon carried them

from their peaceful green villages to the four corners of the globe. Thus Sylhet was turned from a land for immigrants to a land of emigrants.' (নুরুল ইসলাম রচিত 'Sojourners to Settlers, The Tales of Immigrant' বইয়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

প্রবাসযাত্রার আর্থিক সক্ষমতাই যে সিলেটের মানুষের বিপুল সংখ্যায় প্রবাসী হওয়ার কারণ, তা বিলাত আমেরিকায় অভিবাসী হয়েছেন এমন প্রবাসীদের পারিবারিক পরিচয় পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়। দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই সে সময় আর্থিকভাবে সক্ষম পরিবারের তথা উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ ছিলেন। কিংবদন্তি জাহাজি নেতা আফতাব আলী, আইয়ুব আলী মাস্টার, শাহ আবদুল মজিদ ওরফে ময়না মিয়া কোরেশী ও আব্দুল মান্নান চৌধুরী ওরফে সানু মিয়া প্রমুখ দেশের প্রবাসী বাঙালির পথিকৃৎ বা পূর্বসূরি। উল্লিখিত প্রবাসীদের পরিচয় অনুসন্ধানে জানা যায়, চারজনই উচ্চবংশের ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছিলেন। নানা কারণে পরবর্তী সময় মধ্যম আয়ের পরিবারে নেমে আসেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত হন। আইয়ুব আলী মাস্টারের পিতার যথেষ্ট জোতজমি তো ছিলই, কয়েক ঘর প্রজাও ছিল। তাদের প্রজা ও নৌকা মেস্তরি সমাই নাথ, দুলাল নাথ ও কৃপাল নাথের পরামর্শে তাঁর পিতা নৌকার ব্যবসায় চড়া সুদে অর্থলগ্নি করে ব্যবসায় লোকসান দিয়ে সর্বস্বান্ত হন। আইয়ুব আলী মাস্টার ১৯১৩ সালে প্রাইমারি বৃত্তি লাভ করে এম.ই স্কুলের উপরের শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। পিতাকে ঋণমুক্ত করার জন্য তিনি তখন বিদেশ যাওয়ার জন্য জাহাজের চাকরি নেন। জাহাজি নেতা আফতাব আলী ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় স্বরাজ আন্দোলনে জড়িত হলে তাঁর বিরুদ্ধে সিলেটে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। তাই তিনি পালিয়ে কোলকাতা যান। পরবর্তী সময়ে জাহাজের চাকরিতে যোগ দেন। তার পিতা খুবই খান্দানি ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। আবদুল মান্নান ওরফে সানু মিয়ার পরিবারও অবস্থাপন্ন ছিলেন কিন্তু প্রতিবেশীর সঙ্গে মামলায় জড়িয়ে আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, তাই সানু মিয়া পিতাকে না জানিয়েই জাহাজের চাকরিতে যান। শাহ আবদুল মজিদ কোরেশী ময়না মিয়া শাহজালালের অন্যতম সহচর শাহ কামালের উত্তরসূরি ও ধনাঢ্য পরিবারের মানুষ ছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্বসূরিদের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে অনেক সিলেটি জাহাজি বিলাতে ও আমেরিকায় স্থায়ী হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সিলেটি জাহাজি স্থায়ী অভিবাসী হয়েছেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর কোলকাতা বন্দর হারানোয় সিলেটি জাহাজিরা বিপাকে পড়েন। জাহাজের চাকরির নিয়ম অনুযায়ী যে বন্দরে চাকরি হয় সেই বন্দরে পে-অফ ও চাকরি শেষ হয়, আবার সেই বন্দর থেকেই পুনরায় জাহাজের চাকরিতে যোগদান করতে হতো। তখন সিলেটের জাহাজিদের এই সংকটে জাহাজিদের নেতা তৎকালীন বেঙ্গল আইনসভার সদস্য, আন্তর্জাতিক ট্রেড

ইউনিয়ন সংস্থার সদস্য ও সর্বভারতীয় সিম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আফতাব আলী সিলেটের জাহাজিদের কোলকাতার বদলে লন্ডন বন্দরে জাহাজ ছাড়ার পরামর্শ দেন। আফতাব আলীর পরামর্শ অনুযায়ী কোলকাতার পরিবর্তে লন্ডনে জাহাজ ছেড়ে সে সময় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সিলেটি জাহাজি যুক্তরাজ্যে অভিবাসী হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে যুদ্ধবিধ্বস্ত যুক্তরাজ্যের কলকারখানা চালু করা, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ ও পুনর্গঠনের জন্য ব্রিটিশ সরকার কমনওয়েলথ থেকে কর্মী আহ্বান করেন। সিলেটের জাহাজিরা এ সুযোগে সিলেট অঞ্চল থেকে 'ভাউচারের' মাধ্যমে হাজার হাজার লোককে বিলাত নিতে সক্ষম হন। 'ভাউচারের' মাধ্যমে যারা বিলাত গিয়েছিলেন তারা প্রধানত বিলাতের তৎকালীন শিল্পাঞ্চল বার্মিংহাম, ওল্ডহাম, রচডেল ইত্যাদি নগরে গিয়েছিলেন।

বিশ শতকের সত্তর দশকের আগে অর্থাৎ বাংলাদেশ জন্মের আগে বিলাত প্রবাসীরা তাদের স্ত্রীদের বিলাত নিতেন না। স্বাধীনতার পর স্ত্রী সন্তানদের বিলাত নেওয়া শুরু হলে বিলাতে বাঙালি তথা সিলেটি কমিউনিটি দ্রুত বাড়তে থাকে। পরে সেদেশে বসবাসকারী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সিলেটে বসবাসকারী ছেলেমেয়েদের বিয়ের মাধ্যমেও অনেকে বিলাত যান। বিয়ের মাধ্যমে বিলাত যাওয়ার আইন এখনও কার্যকর আছে বটে কিন্তু আইনের কড়াকড়ির জন্য স্বামী বা স্ত্রী নেওয়া সময়সাপেক্ষ ও ঝামেলাপূর্ণ হওয়ায় এবং দেশের ছেলেমেয়েরা শিক্ষায় বিলাতের ছেলেমেয়েদের চেয়ে পিছিয়ে থাকায় পিতামাতার আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা সহজে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের বিয়ে করতে চায় না। তাই, এপথে বিলাতে যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে চালু হওয়া 'ভাউচারের' মাধ্যমে বিলাত যাওয়া ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও কমনওয়েলথ দেশসমূহ থেকে বিলাত যাওয়ার জন্য ভিসার প্রয়োজন ছিল না বিধায় আগে থেকে বসবাসকারী সিলেটিদের কাছে আশ্রয় পাবেন এমন ভরসায় সিলেটের অনেক মানুষ চিকিৎসা, ভিজিট ইত্যাদি নানা অজুহাত দেখিয়ে বিলাত গিয়েছেন এবং আশানুরূপ সহযোগিতা লাভ করে চাকরি বা ব্যবসা করে বিলাতে স্থায়ী হয়েছেন।

বিলাতে সিলেটিদের মালিকানাধীন প্রায় ১৫ হাজার (ইন্ডিয়ান) রেস্টুরেন্ট আছে। বিশ শতকের শেষ ও একুশ শতকের শুরুতে এসে পূর্বপ্রজন্মের প্রবাসীরা অবসর নিলে এসব রেস্টুরেন্ট কর্মীসংকটে পড়ে, এখনো এ সংকট বিরাজমান। কারণ বর্তমান প্রজন্মের ছেলেরা রেস্টুরেন্টের চাকরিতে যেতে চায় না। রেস্টুরেন্ট মালিকদের চাপে তখন সরকার বাংলাদেশ থেকে রেস্টুরেন্টের শেফ, কুক, ওয়েটার ইত্যাদি কর্মচারী নেওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি

ওয়ার্কপারমিট চালু করে। এর ফলে বিলাতের সিলেটি মালিকানাধীন ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে কাজ করার জন্য অনেকে বিলাত গিয়ে সেখানে স্থায়ী হয়েছেন।

বিলাতপ্রবাসী সিলেটিদের এক বিরাট অংশ যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে বসবাস করেন। লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস বারা কাউন্সিল এলাকায় বিলাতপ্রবাসী সিলেটিদের বড়ো ঘাটি। পূর্বসূরি আইয়ুব আলী মাস্টার প্রমুখ লন্ডনেই থাকতেন। তাই, আগে থেকেই সুযোগ পেলেই অন্য নগরীতে বসবাসকারী সিলেটিরা লন্ডনে চলে আসতেন। লন্ডন ছাড়া যে সমস্ত নগরীতে সিলেটি প্রবাসী অধিক সংখ্যায় বসবাস করেন সেগুলো হচ্ছে বার্মিংহাম, ওল্ডহাম, মানচেস্টার, নর্দাম্পটন, শেফিল্ড, ব্রাইটন, লুটন, অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ, নিউকাসেল, সান্দারল্যান্ড, কার্ডিফ, চেস্টার, রচডেল, ইয়র্ক, ব্রিস্টল ইত্যাদি।

যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের জন্য বিশ শতকের ষাটের দশকের আগে ভিসা নিয়ে বাইরে থেকে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। ষাটের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা নিয়ে বাইরে থেকে মানুষ যাওয়া শুরু হয়। এর আগে জাহাজ থেকে পালিয়ে যাওয়া সিলেটিরা ছাড়া আর কোনো বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারেননি। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ দিকে এসে বাংলাদেশ থেকে ভিসা চালু হলে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবারের সংজ্ঞার উদারতার ফলে যে কোনো বয়সের ভাইবোনসহ অন্যান্য আত্মীয় ও বউ ছেলেমেয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকায় সেদেশে বসবাসকারী জাহাজি সিলেটিদের সুবাদে সিলেটের বিপুলসংখ্যক মানুষ যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী হতে পেরেছেন। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায়ও সিলেটের মানুষ জাহাজ থেকে পালিয়ে গেছেন। বস্তুত, সিলেটের জাহাজিরাই আজকের প্রায় ১ কোটি প্রবাসী বাঙালির পথপ্রদর্শক বা পূর্বসূরি।

কানাডা

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতো কানাডায়ও রোজগারের জন্য সিলেটের জাহাজিরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তথা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাহাজ থেকে পালিয়ে বসবাস শুরু করেন। পরে কানাডার উদার ইমিগ্রেশন নীতির ফলে তারা তাদের আত্মীয়স্বজনদেরও সেখানে নিয়ে যান। এভাবে কানাডায় একটি সিলেটি কমিউনিটি গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর ভিজিট ও পড়াশোনার জন্য আমাদের দেশের মানুষ কানাডা যেতে শুরু করেন। পূর্ব থেকে বসবাসকারী সিলেটি আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় অনেক সিলেটি ভিজিট ভিসা ও স্টুডেন্ট ভিসায় কানাডা যান এবং রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে সেখানে বসাবাস করছেন। বর্তমানে প্রায় লক্ষাধিক বাংলাদেশি কানাডায় আছেন। এদের অধিকাংশই সিলেটি। কানাডার প্রবাসীদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক কর্মক্ষম ব্যক্তি আছেন যারা হোটেল, রেস্তোরাঁ, অফিস, গার্মেন্টস, দোকান ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে কর্মরত আছেন।

অস্ট্রেলিয়া

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মতো অস্ট্রেলিয়ায়ও সিলেটের জাহাজিরা অভিবাসী হয়েছিলেন এবং তাদের সুবাদে তাদের আত্মীয়স্বজন অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশন আইনের উদারতার সুযোগ নিয়ে অভিবাসী হয়ে বসবাস করছেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় যে কোনো অভিবাসী তার স্বামী অথবা স্ত্রী,

ছেলেমেয়ে, মাতাপিতা, ভাইবোন ও তাদের পোষ্যদের ইমিগ্রেন্ট করতে পারেন। এই সুযোগে অস্ট্রেলিয়ায়ও বিপুলসংখ্যক সিলেটি ইমিগ্রেন্ট হয়েছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ভিজিট ভিসায় অনেক সিলেটি তাদের অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী আত্মীয়ের সহযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে বসবাস করছেন। অনেকে পড়াশোনার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও আমেরিকায় পাঁচ বছর পড়াশোনা করলে যে কোনো ছাত্র সেদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পেতে পারে। এই সুযোগে এসব দেশে বাংলাদেশের তথা সিলেটের অনেক ছাত্র স্থায়ীভাবে ইমিগ্রেন্ট হয়ে বসবাস করছেন। অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার, যার অধিকাংশই সিলেটি এবং কর্মক্ষম। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত আছেন।

সিংগাপুর ব্রিটিশ মার্চেন্ট নেভিতে কর্মরত সিলেটের অনেক জাহাজি বিভিন্ন সময় জাহাজ থেকে পালিয়ে সিঙ্গাপুরে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। সিঙ্গাপুরে বর্তমানে ৬০ হাজার বাংলাদেশি আছেন। সিঙ্গাপুরে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিলেটিও সিঙ্গাপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এবং ব্যবসা ও চাকরিতে নিয়োজিত আছেন।

জার্মানি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শিক্ষিত বেকার যুবক ও তরুণরা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে যাত্রা শুরু করেন। আশির দশক পর্যন্ত বিপুলসংখ্যক রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশি পশ্চিম জার্মানিতে কর্মরত ছিলেন। পরে জার্মানিতে আশানুরূপ সুযোগ না পেয়ে তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। শুরুতে এই আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিলেন সিলেটি। বর্তমানেও জার্মান প্রবাসীদের মধ্যে সিলেটিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। এরা জার্মানিতে অফিস আদালত, ফ্যাক্টরি, হোটেল রেস্তোরাঁসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত আছেন।

ইতালি ইউরোপে যুক্তরাজ্যের পরেই সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি ইতালিতে বসবাস করেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের জন্য ইতালি যাত্রা শুরু হয়। তারা বৈধ ও অবৈধভাবে দীর্ঘদিন ইতালিতে বসবাস করে ইতালির সাম্প্রতিক সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে সেদেশে স্থায়ী হতে পেরেছেন। ইতালিতে বর্তমানে প্রায় ২ লাখ বাংলাদেশি আছেন। ইতালিতে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ সিলেটি। বাংলাদেশিরা ফ্যাক্টরি, হোটেল-রেস্তোরাঁ, দোকান ও কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত আছেন।

ফ্রান্স ফ্রান্সেও রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে ও ফ্রান্সের সাম্প্রতিক সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মরত আছেন। ফ্রান্সে বাংলাদেশিদের

কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা আশির দশক থেকে শুরু হয়। ফ্রান্সে বসবাসরত বাংলাদেশিদের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৪০ হাজারের মতো বাংলাদেশি ফ্রান্সে আছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিলেটিও আছেন।

এছাড়াও স্পেন, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে প্রচুর সংখ্যক সিলেটি ও বাংলাদেশি কর্মরত আছেন। সেনজিন দেশসমূহের বাইরে সুইজারল্যান্ডে বিপুলসংখ্যক সিলেটিসহ বাংলাদেশি নাগরিক কর্মরত আছেন। এরা প্রধানত ভিজিট ভিসার মাধ্যমে এসব দেশে গমন করে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে স্থায়ীভাবে বসাবাস করছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে সিলেটের লোকজন বিশ শতকের সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। সত্তর দশকের প্রথম থেকে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর আরবরা তেল সম্পদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তেলের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের নয়টি দেশ সৌদিআরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান, লিবিয়া, ইরান ও ইরাক অকল্পনীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। ফলে এসব দেশে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হয়। এসব দেশে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, দালানকোঠা, এয়ারপোর্ট, সি-পোর্ট ইত্যাদি তৈরির কাজ বেশ জোরেশোরে শুরু হয়। কিন্তু আরব দেশসমূহে পেশাজীবী মানুষের অভাব থাকায় লাখ লাখ শ্রমজীবী পেশাজীবী মানুষের প্রয়োজন দেখা দেয়। উন্নত বিশ্বের প্রকৌশলী ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এসব উন্নয়নকাজে ঠিকাদারি নেয়। তারা অনুন্নত দেশসমূহ থেকে স্বল্প বেতনে দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে যায়। এই সুবাদে বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর লোক মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে চাকরি নিয়ে যান। ম্যানপাওয়ার ব্যুরোর এক হিসেবে দেখা যায় ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত প্রায় ৭ লাখ বাংলাদেশি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চাকরির জন্য গিয়েছেন। সেটির একটি বিবরণ দেওয়া হলো: **মধ্যপ্রাচ্য**

সৌদি আরব	২৫,৭৭,০০০	সংযুক্ত আর আমিরাত	১৬,৯৭,০০০
কুয়েত	৪,৭৯,০০০	ওমান	৩,৭৭,০০০
কাতার	১,৬১,০০০	বাহরাইন	২,০১,০০০
লিবিয়া	৬০,০০০		

সূত্র: বাংলাদেশ ওভারসিজ সেন্টার, জিন্দাবাজার, সিলেট।

এই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে প্রায় ৫৫ লাখ বাংলাদেশি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন। মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশিরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আছেন সৌদি আরবে। সেদেশে বাঙালিদের যাওয়া শুরু হয় ১৯৭৬ সাল থেকে। বর্তমানে প্রায় ২৬ লাখ বাংলাদেশি সৌদিআরবে কর্মরত আছেন। সিলেটি মাইগ্রেন্ট-ওয়ার্কাররা সবচেয়ে বেশি আছেন সৌদি আরবে। সৌদি আরবের পরে মধ্যপ্রাচ্যে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশির অবস্থান সংযুক্ত আরব আমিরাতে। এদেশের দুবাই ও আবুধাবিতেই অধিকসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মরত আছেন।

বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রায় ১৭ লাখ বাংলাদেশি কর্মরত আছেন। এই বাংলাদেশিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সিলেটি আছেন। সিলেটিরা আছেন কুয়েতেও। এছাড়া কাতার, ওমান, বাহরাইন ও লিবিয়ায় বিপুলসংখ্যক সিলেটি অভিবাসী আছেন। সিলেটি অভিবাসীরা নির্মাণকাজ, পৌরসভার কাজ ও দোকান এবং হোটেল রেস্টুরেন্টে কর্মরত আছেন। কুয়েতে একসময় সিলেটিদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। ১৯৯০ সালে ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের সময় প্রায় ৬৩ হাজার বাংলাদেশি কুয়েত থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাদের অধিকাংশই সিলেটি। তারা এখানে এসে প্রবাসী কল্যাণসংস্থা বাংলাদেশ ওভারসিজ সেন্টার সিলেটকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘের ওয়ার কম্পেনসেশনের জন্য অনেক আন্দোলন সংগ্রাম করেন এবং ওভারসিজ সেন্টারের সহযোগিতায় মাথাপিছু ন্যূনতম ২ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ লাভ করেন। কুয়েত প্রত্যাগতদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে পুনরায় কুয়েত প্রত্যাবর্তন করেন এবং সিলেট থেকে আরও কর্মী কুয়েতে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে কুয়েতে বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ৭৯ হাজার, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিলেটি আছেন। ইরাকেও বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার আছেন। এর মধ্যে অনেক সিলেটিও রয়েছেন। সাদ্দাম হোসেনের শাসনামলে বিপুলসংখ্যক সিলেটি ইরাকে কর্মরত ছিলেন। ইরাক কুয়েত যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের সময়ে দেশে প্রত্যাবর্তনকারী এসব প্রত্যাগত সিলেটি যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশটিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তারা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণকাজ ও রাস্তাঘাট মেরামতের কাজে নিয়োজিত আছেন। যুদ্ধরত এই দেশটিতে তারা বিভিন্ন সময়ই নানাধরনের বিপদের সম্মু খীন হন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, যুক্তরাজ্যপ্রবাসী বাঙালির শতকরা ৯৫ জনই বৃহত্তর সিলেটের অধিবাসী। যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাঙালিরও অর্ধেক সিলেটের অধিবাসী। কানাডাপ্রবাসী বাঙালিরও অধিকাংশ সিলেটি। ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রবাসী বাঙালি-বসবাসকারী দেশ ইতালিসহ জার্মানি, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, স্পেনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সিলেটি আছেন। একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদিআরব ও কুয়েতপ্রবাসী বাঙালির অর্ধেকের বেশি লোক সিলেটি। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে কুয়েত ইরাক যুদ্ধের শিকার হয়ে প্রত্যাগত প্রবাসীর অর্ধেকই ছিলেন সিলেটি, যাদের অনেকেই যুদ্ধ শেষে কুয়েত ফিরে যান এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত কুয়েত গড়ার জন্য অধিক লোকের প্রয়োজন সৃষ্টি হওয়ায় সিলেট থেকে আরো অনেক নতুন লোক কুয়েত যান। মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান, সিরিয়া, লিবিয়া এবং কাতারেও প্রবাসী বাঙালির উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লোক সিলেটের অধিবাসী। প্রাচ্যের মালয়েশিয়ায় প্রায় ৭ লাখ বাংলাদেশির বসবাস। সেদেশেও সিলেট জেলার প্রচুর লোক আছেন। অস্ট্রেলিয়াতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই সিলেটের জাহাজিরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বিলাতের মতো অস্ট্রেলিয়ায় সিলেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখানে সিলেট বলতে সিলেট অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। সিলেট

বিভাগের আবার বিশেষ বিশেষ উপজেলার লোকজন বিশেষ বিশেষ দেশে প্রবাসী হয়েছেন। যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী প্রবাসীদের বেশিরভাগ বৃহত্তর সিলেটের বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, রাজনগর, মৌলভীবাজার সদর, নবীগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার বাসিন্দা। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী সিলেটিদের মধ্যে বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বড়োলেখা, রাজনগর ও মৌলভীবাজার সদর উপজেলার লোকজনই বেশি। অন্যান্য উপজেলার লোকজনও বিলাত ও আমেরিকায় আছেন বটে কিন্তু সংখ্যায় নগণ্য। উপরিউক্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যপ্রবাসী সিলেটিদের অধিকাংশই বর্তমান সিলেট জেলার বাসিন্দা। যুক্তরাজ্যপ্রবাসী প্রায় ১০ লাখ সিলেটির প্রায় অর্ধেক সিলেট জেলার বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জের মানুষ। উপরিউল্লিখিত সিলেট বিভাগের উপজেলাওয়ারি যুক্তরাজ্যপ্রবাসীদের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, তাতেও দেখা যায় তালিকার বেশিরভাগ উপজেলাই সিলেট জেলার অন্তর্গত। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রে সিলেট বিভাগের প্রবাসীদের উপজেলাওয়ারি যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করেও দেখা যায় অধিকাংশ উপজেলাই সিলেট জেলার অন্তর্গত। তাই ধারণা করা হয় যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাঙালিরও অধিকাংশই সিলেট জেলার বাসিন্দা। মধ্যপ্রাচ্যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার হিসেবে সিলেট বিভাগের সব উপজেলার লোকজনই কর্মরত আছেন। তার মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছেন সিলেটের বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, কানাইঘাট, জকিগঞ্জ, সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক, জগন্নাথপুর, হবিগঞ্জ জেলার নবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর, কুলাউড়া, বড়োলেখা, মৌলভীবাজার সদর উপজেলার বাসিন্দা। উপজেলাওয়ারি এই হিসেবেও দেখা যায় মধ্যপ্রাচ্যপ্রবাসী বাঙালি অধ্যুষিত উপজেলার বেশির ভাগই সিলেট জেলার অন্তর্ভুক্ত। তাই, উপর্যুক্ত হিসাব মতে, মধ্যপ্রাচ্যপ্রবাসী সিলেটিদেরও অধিকাংশ সিলেট জেলার বাসিন্দা।

প্রবাসীদের অবদান

সাধারণত প্রবাস থেকে অভিবাসীরা নিজ দেশে রেমিটেন্স পাঠিয়ে থাকেন। উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রেরিত এই রেমিটেন্স এসব দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রবাহ। বাংলাদেশেও প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রবাহ।

রেমিট্যান্স

বিদেশে কর্মরত মাইগ্রেন্ট-ওয়ার্কার ও অন্যান্য প্রবাসী দেশে বার্ষিক ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স প্রেরণ করে থাকেন। প্রেরিত এই রেমিট্যান্সের বেশির ভাগই আসে সৌদিআরব, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। আর এসব দেশে সিলেটিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই এটা অনস্বীকার্য দেশে আগত রেমিট্যান্সের একটা বড়ো অংশ সিলেটি বিদেশি কর্মীদের প্রেরিত।

বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট শাখার ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ের সূচক থেকে রেমিট্যান্স প্রেরণে সিলেটিদের অগ্রণী ভূমিকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সিলেট বিভাগের তফসিলি ব্যাংকসমুহে প্রবাসী কর্তৃক প্রেরিত রেমিট্যান্সের মোট পরিমাণ ছকে উল্লেখ করা হলো :

সারণি-১৭২
২০১০-২০১৭ সাল পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহে প্রবাসী কর্তৃক প্রেরিত মোট রেমিট্যান্স

সাল	প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০১০	৯৬৬৬.৫১
২০১১	১০৯১৮.১৯
২০১২	১১৫৬১.১৯
২০১৩	১১৬৭৬.৩৪
২০১৪	১২৬৫৬.২৩
২০১৫	১২৮৯৯.৫৫
২০১৬	১১৩২৩.১০
২০১৭	১০২৫৪.৭৪

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট শাখা।

প্রবাসীদের অর্থানুকূল্যে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড বেশিরভাগ বৃহত্তর সিলেট তথা সিলেট বিভাগেই পরিলক্ষিত হয়। সিলেট শহরে 'লন্ডন ম্যানশন' নামে মার্কেটের নামকরণ এবং 'লন্ডনি রোড' নামে রাস্তার নামকরণ সিলেট নগরীতে বিপুলসংখ্যক প্রবাসীর বসবাসের প্রমাণ। তারা সব সময় সিলেটে থাকেন না বটে, তাদের আত্মীয়স্বজন তাদের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দেখাশোনা করেন। গ্রাম অঞ্চলে নিরাপত্তার অভাবও প্রবাসীদের সিলেট নগরীতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ।

বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নে বিলাতপ্রবাসী সিলেটিরা খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন। দেশের শিক্ষার উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন উপজেলার প্রবাসীরা শিক্ষা উন্নয়ন ট্রাস্ট গঠন করেছেন। জগন্নাথপুর প্রবাসী শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট, বিশ্বনাথ প্রবাসী শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট, বালাগঞ্জ প্রবাসী শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট, নবিগঞ্জ প্রবাসী শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট, বিয়ানীবাজার প্রবাসী শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট, গোলাপগঞ্জ প্রবাসী শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্টসহ অনেক শিক্ষা কল্যাণ ও উন্নয়নমুলক সংস্থা গড়ে উঠেছে। প্রবাসীরা এসব ট্রাস্টে বিপুল অঙ্কের চাঁদা প্রদান করে বিরাট অঙ্কের তহবিল গঠন করেছেন। এসব ট্রাস্টের বিপুল অর্থ সিলেটের ব্যাংকসমূহে স্থায়ী আমানত হিসাব খুলে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং লভ্যাংশ উত্তোলন করে প্রতিবছর দেশের শিক্ষার উন্নয়নে বৃত্তি প্রদানসহ নানা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এছাড়া, বৃহত্তর সিলেটে স্কুল, কলেজ, মাদরাসাসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ তথা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং এগুলোর উন্নয়নে সিলেটের প্রবাসীরা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তারা সবসময়ই বিলাত আমেরিকায় উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীর আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন এবং উচ্চশিক্ষার্থী বিলাত, আমেরিকা যাওয়ার পর থাকা খাওয়া ও খণ্ডকালীন চাকরির ব্যবস্থা করে দেন।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে সিলেটের প্রবাসীরা বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধের পুরো নয় মাস তারা ব্রিটেন আমেরিকার রাজপথে সভা শোভাযাত্রার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের আরেকটি ফ্রন্ট পরিচালনা করেন। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কোনো দেশের নেতা, বিশেষ করে পাকিস্তানি কোনো কর্মকর্তা বিলাত আমেরিকা সফরে গেলে তারা বিক্ষোভ করে, কালো পতাকা প্রদর্শন করে প্রতিবাদ জানাতেন। আবার, মক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেতা-নেত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হতো। তারা মুজিব নগর সরকারকে বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা চাঁদা প্রদান করেছেন। মুক্তিযুদ্ধেরও আগে ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শিকার হলে বিলাতপ্রবাসী সিলেটিরা ১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্য চাঁদা তুলে বিরাট অঙ্কের ফিস দিয়ে ব্রিটিশ আইনজীবী ব্যারিস্টার টমাস উইলিয়াম কিউসিকে ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, মুক্তিযুদ্ধের সময় কেবল বিলাত, কানাডা ও আমেরিকায় বসবাসকারী সিলেটের প্রবাসীরাই ছিলেন।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

সিলেটের প্রবাসীরা কেবল দেশে নয়, বিদেশেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যুক্তরাজ্যের কথা বলা যায়, সেদেশে সিলেটের প্রবাসী বাঙালিদের প্রতিষ্ঠিত প্রায় ১৫ হাজার ‘ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট’ থেকেই ব্রিটিশ অর্থনীতিতে বার্ষিক ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন পাউন্ডের আর্থিক জোগান দেওয়া হয়। এসব রেস্টুরেন্টে লক্ষাধিক ব্রিটিশের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ‘হাউস অব কমন্সে’ ১জন বাঙালি এমপি নির্বাচিত হয়েছেন এবং ব্রিটিশ লর্ড সভায়ও ১ জন বাঙালি মহিলা আইনসভার সদস্য বা ‘ব্যারোনেস’ নির্বাচিত হয়েছেন। এই দুজনই বৃহত্তর সিলেটের অধিবাসী। ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সের সদস্য ব্রিটিশ বাঙালি রোশনারা আলী এমপির বাড়ি সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায়। এছাড়া, স্থানীয় সরকারে বিভিন্ন কাউন্সিলে সিলেটি বাঙালি মেয়র, কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে রাজনৈতিক কর্মাকাণ্ড দ্বারা প্রবাসে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস বারা কাউন্সিলের প্রথম এক্সিকিউটিব মেয়র সিলেট জেলার বালাগঞ্জ ওসমানী নগরের অধিবাসী। তিনি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত। এরকম এক্সিকিউটিব মেয়র সারা বিলাতেই মাত্র কয়েকটি বারা কাউন্সিলে আছেন।

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রেও রেস্টুরেন্ট ব্যবসাসহ বিভিন্ন পেশায় সিলেটের প্রবাসীরা প্রশংসনীয় অবদান রেখে চলেছেন। আমেরিকার সিনেটে সিলেটের ১জন প্রবাসী বাঙালি সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন। আমেরিকার সিনেটে নির্বাচিত প্রথম বাঙালি সিনেটর হ্যানসেন ক্লার্ক-এর বাড়ি সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলায়।

সিলেটি প্রবাসীদের প্রচেষ্টার ফলে বিভিন্ন দেশে নানা ক্ষেত্রে ইংরেজির পাশপাশি বাংলা ভাষাও নিজের স্থান করে নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনসংক্রান্ত সরকারি প্রচারণায় ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাও ব্যবহৃত হচ্ছে। নিউইয়র্কের চতুর্থ ভাষা বাংলা। সেখানে শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা, আদমশুমারির কাগজপত্র, হাসপাতালের কাগজপত্রে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা চালু করা হয়েছে। একইভাবে যুক্তরাজ্যেও নানা ক্ষেত্রে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা চালু করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইউরোপীয় ভাষাসমূহের পাশাপাশি বাংলা ভাষাও কারি কুলামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লন্ডনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্গবীর আতাউল গনি ওসমানী প্রমুখ মহান বাঙালি ব্যক্তিবর্গের নামানুসারে সরকারি স্কুলের নামকরণ করা হয়েছে। এ সাফল্য সিলেটি প্রবাসীদের অবদান ও কর্মতৎপরতার ফলে অর্জিত হয়েছে।

প্রবাসীদের প্রচেষ্টায় বহির্বিশ্বে যুক্তরাজ্যের ওল্ডহামে প্রথম বাঙালির গর্বের শহিদমিনার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর লন্ডন। উল্লেখ্য, ওল্ডহামে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের অধিকাংশই সিলেট জেলার অধিবাসী। ওল্ডহামে শহিদ মিনার প্রতিষ্ঠায় তারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। একইভাবে লন্ডনে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে সিলেটের মানুষের সংখ্যা বেশি। লন্ডনের পর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইর্য়ক, ডালাস, নিউজার্সি, লসএঞ্জেলসসহ বিভিন্ন শহরে শহিদমিনার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কানাডার মন্ট্রিল ও টরন্টোতেও সিলেটি প্রবাসীরা শহিদমিনার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বস্তুত, সিলেটের প্রবাসীরা একদিকে দেশের জন্য সোনার চেয়ে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান জোগানদার। তারা রেমিট্যান্স প্রেরণ করে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছেন, অন্যদিকে, প্রবাসে দেশের স্বেচ্ছাসেবক রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা পালন করে বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন।

প্রবাসীদের সমস্যা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও বিশ্ব অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান সত্ত্বেও উন্নত ও ধনী দেশগুলো অভিবাসীদের জন্য অনুকূল নয়। এসব দেশে অভিবাসীরা সবসময়ই বর্ণবাদের শিকার। নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারের জঙ্গি বোমা হামলা তথা নাইন ইলেভেনের পর থেকে ইউরোপ-আমেরিকায় প্রবাসীদের ওপর বর্ণবাদী নির্যাতনের হার আরো বেড়ে গেছে। এখন এসব দেশে কালো বা বাদামি বর্ণের সকল অভিবাসীই মৌলবাদী জঙ্গি অজুহাতে বর্ণবাদী নির্যাতনের শিকার হন। উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তি ইউরোপে দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে, তারা

অভিবাসীদের তাড়ানোর জন্য ফ্যাসিস্ট কায়দায় অপতৎপরতা চালাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলের অভিবাসন নীতি প্রকাশ্যেই অভিবাসীবিরোধী। তরুণ প্রবাসীরা ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কারণে বাংলাদেশে বিয়ে করতে আগ্রহী। কিন্তু, স্পাউজ ভিসার ক্ষেত্রে অযৌক্তিক কড়াকড়ি আরোপ করায় তারা দেশে বিয়ে করতে আগ্রহ হারাচ্ছেন, প্রবাসীরা মা, বাবা, ভাইবোন, মামা, চাচা, ফুফু এসব আত্মীয়স্বজনদের পারিবারিক পুনর্মিলনীর জন্য মাঝে মাঝে ভিজিট ভিসায় বিলাত নিতে চান, ব্রিটিশ সরকার ভিসা প্রদানে কড়াকড়ি আরোপ করায় এবং আপিলের সুযোগ বাতিল করায় প্রবাসীরা হতাশ। এসব উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতা অভিবাসী তাড়ানোর কৌশল বলে প্রবাসীরা অভিযোগ করেন।

সিলেটে বিনিয়োগ সুবিধার জন্য একটা রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ইপিজেড (EPZ) স্থাপন প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি। প্রবাসীদের জন্য সিলেট নগরীতে সরকারি আবাসন প্রকল্প করারও দাবি প্রবাসীদের। এসব উদ্যোগ নেওয়া হলে ব্যাপক প্রবাসী বিনিয়োগ হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার প্রবাসীরা কয়েক বছর চাকরি করার পর দেশে এসে বেকার হয়ে যান। গত শতাব্দীর নব্বই সালে কুয়েত-ইরাক যুদ্ধের শিকার হয়ে প্রায় ৭০ হাজার কুয়েত-ইরাক প্রত্যাগত প্রবাসী দেশে ফিরে আসেন। ওই সব প্রত্যাগত প্রবাসীর অর্ধেকই ছিলেন সিলেটের অধিবাসী। তাদের মধ্য থেকে কিছু প্রবাসী কুয়েতমুক্ত হওয়ার পর কুয়েত ফিরে যেতে পারলেও, অধিকাংশই দেশে বেকার জীবন কাটাচ্ছেন।

অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম ও মামলামোকদ্দমা করে প্রবাসীরা বাংলাদেশে ভোটাধিকার লাভ করেছেন, কিন্তু দেশে অনুপস্থিতির কারণে ভোটার তালিকায় অনেকের নামই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। দ্বৈত নাগরিক হয়েও বিদেশি নাগরিকত্ব বর্জন না করে প্রবাসীরা সংসদসদস্য পদে নির্বাচন করার অধিকার থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেছেন। অথচ যুক্তরাজ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনের জন্য কোনো নাগারিককে বাংলাদেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব বর্জন করতে হয় না।

জেলা প্রশাসনের প্রবাসী কল্যাণ শাখা

সিলেটের জেলা প্রশাসকের ভবনে জেলা প্রশাসনের অধীনে একটি প্রবাসী কল্যাণ শাখা আছে। উক্ত শাখায় প্রবাসীদের বেদখল হওয়া জায়গাজমি পুনরুদ্ধার, হয়রানিসহ প্রবাসীদের নানা অভিযোগের আবেদন গ্রহণ ও বিবেচনা করা হয় এবং প্রবাসীদের সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

প্রবাসী অভিযোগ সেল

প্রবাসীদের নানা ধরনের হয়রানির প্রতিকার, বেদখল হওয়া জায়গাজমি পুনরুদ্ধারসহ প্রবাসীদের নানা সমস্যার সমাধানকল্পে ১৯৯৭ সালে সিলেট রেঞ্জের পুলিশের ডিআইজিকে চেয়ারম্যান করে প্রবাসী অভিযোগ সেল গঠিত হয়। সিলেট আইনজীবী সমিতি, প্রেসক্লাব, প্রবাসী কল্যাণ সংস্থা, বাংলাদেশ

ওভারসিজ সেন্টারসহ কিছু প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাসী দরদি ব্যক্তিবর্গকে সংস্থার সদস্য করা হয়েছে। এখানে প্রবাসীদের সব ধরনের অভিযোগ গ্রহণ ও বিবেচনা করা হয় এবং প্রতিকারের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ওভারসিজ সেন্টার প্রবাসীদের নানা সমস্যার সমাধান, প্রবাসীদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, তাদের সম্ভাবনা বিষয়ক প্রচারণা-প্রকাশনা, মতবিনিময়সহ প্রবাসীদের কল্যাণে সেবামূলককাজ করার জন্য ১৯৭৮ সালে সিলেটের জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং প্রবাসী ও স্থানীয় মহৎ ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় প্রবাসী কল্যাণ সংস্থা বাংলাদেশ ওভারসিজ সেন্টার গঠিত হয়। এটি একটি প্রবাসী কল্যাণ ট্রাস্ট। সিলেটের জেলা প্রশাসক এই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। সিলেট নগরীর প্রাণকেন্দ্র জিন্দাবাজারে এই সংস্থার বহুতল ভবন ও কার্যালয় অবস্থিত। বহুতল ভবনের নিচতলায় প্রবাসীদের ব্যবসার সুবিধার্থে একটি বিপণি বিতান করে দেওয়া হয়েছে। বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত অ্যাডভাইজারি সার্ভিস থেকে প্রবাসীদের ইমিগ্রেশন, ভিসা আবেদন, আপিল, পেনশন, বিধবা ভাতাসহ নানা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এছাড়া সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রবাসী ও বিদেশিদের আপ্যায়ন ও ট্রানজিট অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং হয়রানি, প্রতারণার শিকার প্রবাসীদের সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রবাসীবিষয়ক প্রচারণা ও প্রকাশনাও এ সংস্থা করে থাকে।

জনশক্তি উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সিলেট শাখা সরকারি এই সংস্থা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার প্রবাসীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এই সংস্থার অধীনে সিলেটে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক দুইটি আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণকেন্দ্র আছে। দুর্ঘটনার শিকার নিহত প্রবাসীদের দেশ ও বিদেশ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে এই সংস্থা সহায়তা প্রদান করে। বিদেশে মৃত প্রবাসীদের লাশ দাফনের খরচ প্রদান করা হয়। মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার প্রবাসীদের নাম রেজিস্ট্রেশন ও ফিঙ্গার প্রিন্টসহ ডাটাবেইজ করা হয়। বিদেশে কর্মরত অথবা মৃত মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার প্রবাসীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সিলেট শাখা প্রবাসীদের নানামুখী আর্থিক কর্মকাণ্ড সহায়তা ও উন্নয়নের জন্য সরকার ২০১১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠার পরপরই ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে সিলেট ওভারসিজ সেন্টারে সিলেট শাখা চালু করা হয়। এই ব্যাংক মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার প্রবাসীদের বিদেশ যাওয়ার জন্য জামানত ছাড়া সহজশর্তে সর্বনিম্ন সুদে ঋণ প্রদান করে। প্রত্যাগত প্রবাসীদের একইভাবে ব্যবসা বা উন্নয়ন সুবিধার জন্য পুনর্বাসন ঋণ প্রদান করা হয়।

ওভারসিজ ইউনিয়ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসীদের এই সংগঠন ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক সংস্থা। কেবল স্থায়ী প্রবাসী বা বাংলাদেশি ডায়াস্পরা এই সমিতির সদস্য। জন্মলগ্ন থেকে এই সংস্থা প্রবাসীদের দাবি-দাওয়াভিত্তিক জনমত গঠন, আন্দোলন ও সেবামূলক কাজ করে আসছে।

কুয়েত প্রত্যাগত বাংলাদেশি সমিতি

১৯৯০ সালে ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের শিকার হয়ে প্রায় ৩০ হাজার সিলেটিসহ ৭০ হাজার বাংলাদেশি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার কুয়েত ও ইরাক থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এই সমিতি গঠিত হয়। যুদ্ধ শেষে অনেকেই কুয়েত ও ইরাকের কর্মস্থলে ফিরে যান, অনেকেই ফিরে যেতে পারেননি, আবার নতুনও অনেক লোক কুয়েত গিয়েছেন। যারা যেতে পারেননি এবং নতুন যারা গেছেন বা পুরোনো যারা যুদ্ধের পর গিয়েছিলেন তাদের সকলের নানা সমস্যার সমাধানের জন্য এ সংস্থা কাজ করে।

ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক সিলেটে তাদের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের আওতায় প্রবাসী সেবামূলককাজ করে। সিলেটের তাজপুরে ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের কার্যালয় অবস্থিত।

অধ্যায়-১৯

বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৯২ সালে মুরারিচাঁদ (এমসি) কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলে বিজ্ঞান শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৭ সালে প্রণীত আইন অনুযায়ী শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) প্রতিষ্ঠা হলে এ অঞ্চলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসারে নতুন মাত্রা যোগ হয়। বিশেষ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ চালু হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। সিলেটে তখন কেবল কিছু কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের দোকান ছিল, যার মধ্যে কম্পিউটার অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স, কম্পিউটার এরেনা, এক্সপার্ট কম্পিউটার্স অন্যতম। ১৯৯৮ সালে এই বিভাগের উদ্যোগে সিলেট শহরে প্রথম ‘কম্পিউটার মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়। কম্পিউটার এবং কম্পিউটার যন্ত্রাংশ বিক্রয়ের পাশাপাশি মেলায় তিন দিনব্যাপী আইসিটি-বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যা স্থানীয়ভাবে সাড়া ফেলে। বিপুলসংখ্যক লোক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এই মেলায় অংশগ্রহণ করে আইসিটির সঙ্গে পরিচিত হয়। তখন থেকে প্রতিবছর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এই বিভাগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো সম্মিলন ‘সিএসই কার্নিভ্যাল’ আয়োজন করে আসছে।

সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন বিশ্বমানের গবেষণা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গবেষণার চেয়ে প্রযুক্তিগত গবেষণা তুলনামূলকভাবে সহজ। এর মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে আইসিটিতে বাংলাদেশের অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইসতেহারে দিনবদলের সনদে ২০১১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার রূপকল্প ঘোষণা করে। সেই থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ ও নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের কার্যকরী পরামর্শে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এই রূপকল্প বাস্তবায়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে দেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যেই দেশের জনগণ এর সুফল পেতে শুরু করেছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহায়তায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (ইউআইএসসি), জেলা ই-সেবা কেন্দ্র, জাতীয় তথ্য বাতায়ন ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নে সরকারের বিভিন্ন ধরনের ২৫ হাজার ৪৩টি ওয়েবসাইটের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছনোর জন্য ওয়ার্ল্ড সামিট ফর ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশ। গত ১০ জুন সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামকে এই পুরস্কার প্রদান করে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বিশাল অর্জন।

আইসিটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের প্রতিটি জেলায় হাই-টেক পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ ২০১২-২০১৩ অর্থবর্ষে আইসিটি খাত থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলার রফতানি আয়ের মাইলস্টোন অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর শীর্ষ ১৫টি আইসিটি সার্ভিস রফতানিকারক দেশের একটি। বিশ্বায়নের যুগে তথ্যপ্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে দেশের আধ্যাত্মিক নগরী বলে খ্যাত সিলেটও এগিয়ে চলছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ১০ (দশ) টি উদ্যোগ এর মধ্যে ১টি হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ। তথ্য প্রযুক্তি জনগণের দোরগোড়ায় সহজে পৌঁছানোর লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সিলেট সার্কিট হাউসে ফ্রি ওয়াইফাই জোন স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট এ ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেমের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে চিঠিপত্র অনলাইনে উপস্থাপনসহ তা দ্রুত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এবং জেলা পর্যায়ের ৬ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে জেলা ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। গত ৩০/০৭/২০১৭ তারিখে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জেলা ইনোভেশন-সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলায় বাস্তবায়নাধীন উদ্যোগসমূহের সংখ্যা ১৭টি। জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সিলেট জেলায় ২১০ জন উদ্যোক্তা নিয়ে ১০৫টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গঠন করা হয়। বর্তমানে ইউডিসি উদ্যোক্তাগণ সকল নাগরিককে ডিজিটাল সেবা প্রদান করছেন। এছাড়াও ইউডিসি'র আয় ও নতুন সেবা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

ক. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

১. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সিলেটের বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা:

বর্তমান বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ দারিদ্র্য-দূরীকরণ ও জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম হাতিয়ার। এ হাতিয়ার ব্যবহার করার মতো দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে। আর দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হতে পারে মানবসম্পদ তৈরির প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র। সিলেট জেলার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো :

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি। এছাড়াও সিলেটের স্বনামধন্য মুরারিচাঁদ (এমসি) কলেজ, শাবিপ্রবি'র এফিলিয়েটেড সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আইসিটি বিষয়ক ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। এদের মধ্যে শাবিপ্রবি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে তাদের সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনের কারণে ক্রমশ সারা দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ জায়গা দখল করে নিয়েছে। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট শাবিপ্রবি'র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন এখানে উপস্থাপন করা হলো।

Nonlinear Optics ল্যাবরেটরি

নানা কারণে প্রযুক্তিগত গবেষণার তুলনায় বিজ্ঞান গবেষণা বিশেষ করে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গবেষণা বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কঠিন। তারপরও শাবিপ্রবি ধীরে ধীরে বিজ্ঞান গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। সম্প্রতি প্রফেসর ইয়াসমীন হকের নেতৃত্বে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে Nonlinear Optics-এর একটি বিশ্বমানের ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে একাধিক শক্তিশালী লেজার ব্যবহার করে তীব্র আলোতে পদার্থের বৈচিত্র্যপূর্ণ Nonlinear ব্যবহারের ওপর মৌলিক গবেষণার কাজ চলছে।

সূর্যালোক ব্যবহার করে দূষিত পানি পরিষ্কার

শাবিপ্রবির রসায়ন বিভাগে প্রফেসর ড. মো. নিজাম উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করে আসছেন। তবে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন হলো, বাজারে পাওয়া সাধারণ সোডালাইম গ্যাসের ওপর সহজে ও কম খরচে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক আস্তরণ তৈরি করা, যা সূর্যালোকে দূষিত পানিকে বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রি হতে নির্গত রঙিন দূষিত পানি পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। এধরনের আস্তরণযুক্ত গ্যাস বারবার ব্যবহার করা যায়। অধ্যাপক নিজাম এই গবেষণা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে বিভিন্ন উৎসের (মজা পুকুর, নালা, হাওর ইত্যাদি) দূষিত পানি পরিষ্কার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তার গবেষণার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে স্টিলের ওপর অল্প খরচে বিশেষ রাসায়নিক আস্তরণ তৈরি করা, যার Hardness প্রায় ডায়ামন্ড-এর সাথে তুলনীয় এবং রক্ত/মানব-কোষের সঙ্গে ব্যবহার উপযোগী। এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ইন্সট্রু মেন্টের ক্ষেত্রেবিশেষ করে Bio Implant হিসেবে (অরথোপেডিক চিকিৎসায়) ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

ইলেক্ট্রো কেমিক্যাল সায়েন্সের ওপর গবেষণা

ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল সায়েন্সের ওপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করছেন রসায়ন বিভাগের আরেকজন অধ্যাপক ড. হাসনাত। সম্প্রতি তিনি আর্সেনিক ও নাইট্রেট আয়ন শনাক্ত করার জন্য একধরনের সেন্সর তৈরি করেছেন। তাঁর আরও উল্লেখযোগ্য গবেষণা হচ্ছে, কম খরচে অক্সিজেন তৈরির জন্য একটি বাইমেটালিক ক্রিস্টাল তৈরি। ড. হাসনাতের এই আবিষ্কার চিকিৎসা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যেখানে সিলিন্ডার অক্সিজেন নেই সেখানে ব্যবহৃত হতে পারে।

Bio Reactor ইউনিট ব্যবহার করে বৃহত্তর পরিসরে দূষিত পানি পরিষ্কার শাবিপ্রবির কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রফেসর আখতারুল ইসলামের নেতৃত্বে বৃহত্তর পরিসরে দূষিত পানি পরিষ্কার প্রযুক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চলছে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এই বিভাগ থেকে একটি Bio Reactor ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাথে যৌথভাবে সুরমা নদীর পানির মান পরিমাপের জন্যে এক বছরের একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। উক্ত বিভাগের অন্যান্য গবেষণার মধ্যে পলিমারভিত্তিক কংক্রিট এবং টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে জৈব জ্বালানি তৈরি উল্লেখযোগ্য।

মোবাইল ফোনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ২০০৯ সালে দেশে প্রথমবারের মতো শাবিপ্রবির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের পুরো বিষয়টি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের ১৩ সেপটেম্বর কাগজবিহীন এই ভর্তি-পদ্ধতির উদ্বোধন করেন। নতুন এই পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র (ফরম) আনা বা তা জমা দেওয়ার জন্য ভর্তিচ্ছুকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেতে হয় না। মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম করা হয়। বর্তমানে ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৪০০টি কলেজ এবং ৭০টি মেডিকেল কলেজ (সরকারি-বেসরকারি)-এ এই সেবা চালু রয়েছে। গত ৩ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ২৭ লাখ শিক্ষার্থী মোবাইল ফোনে আবেদন করেছে। পুরো প্রকল্পটি তত্ত্বাবধান করেছেন সিএসই বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ। আরও বেশি করে তথ্য প্রযুক্তির গবেষণা ও উদ্ভাবনে আগ্রহী করে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শাবিপ্রবিতে একটি আইসিটি ভবন নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

পিপীলিকা সার্চ ইঞ্জিন ১৪২০ বাংলা নববর্ষে চালু হয় দেশের প্রথম বাংলা সার্চ ইঞ্জিন ‘পিপীলিকা’। এর মাধ্যমে বাংলায় লিখে ওয়েবসাইটের যে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে। পিপীলিকা বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র সার্চ ইঞ্জিন, যা বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই কাজ করতে সক্ষম। এই উন্মু ক্ত ওয়েব সার্ভিসটি সারা দেশের সাম্প্রতিক গ্রহণসাধ্য তথ্য অনুসন্ধান করতে সহায়তা করে। এটি দেশের প্রধান বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার সংবাদ, বাংলা ব্লগ, বাংলা উইকিপিডিয়া ও সরকারি তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার জন্য নির্মাণ করা হলেও পিপীলিকাতে বাংলা তথ্য বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। শাবিপ্রবির কম্পিউটার বিজ্ঞান অ্যান্ড প্রকৌশল বিভাগের একদল শিক্ষার্থী দীর্ঘদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় দেশের প্রথম বাংলা সার্চ ইঞ্জিন বাস্তবায়ন করেছেন। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. রুহুল আমীন ‘পিপীলিকা’ ডেভেলপমেন্ট

টিমের প্রধান গবেষক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের সবধরনের সহায়তা দিয়েছে গ্রামীণফোন আইটি।

মঙ্গলদীপ

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণে তৈরি বিশেষ সফটওয়্যার ‘মঙ্গলদীপ’। এটি একটি বিশেষ স্ক্রিন রিডিং সফটওয়্যার যা একই সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ব্যবহারযোগ্য। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সব কাজ খুব সহজে করতে পারেন। কারও সাহায্য ছাড়া মঙ্গলদীপ ব্যবহার করে খুব সহজে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ারপয়েন্ট ডকুমেন্ট সম্পাদনা করা যাবে। এ ছাড়াও গান শোনা, ই-বুক পড়া, ই-মেইল পাঠানো ও গ্রহণ করা থেকে শুরু করে সফটওয়্যার ইনস্টল, আন-ইনস্টল করাসহ মোটামুটি দরকারি প্রায় সব কাজই করা যাবে এ সফটওয়্যার দিয়ে।

সুবচন

কম্পিউটার ব্যবহারে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য মূলত মঙ্গলদীপ সফটওয়্যারটিতে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা লেখা থেকে কথা অর্থাৎ টেক্সট টু স্পিচ সিস্টেম হিসেবে ‘সুবচন’ ব্যবহার করা হয়েছে। সুবচন ব্যবহার করায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে-কোনো বাংলা ডকুমেন্ট খুব সহজে পড়ে ফেলতে পারবেন। শাবিপ্রবির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সিএসই) বিভাগে মঙ্গলদীপ ও সুবচনের গবেষণা পর্যায়ের কাজ বেশ কয়েক বছর আগে থেকে শুরু হলেও সফটওয়্যার হিসেবে এগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অস্তিত্ব লাভ করে। ‘পিপীলিকা’র পাশাপাশি মো. রুহুল আমীন ‘মঙ্গলদীপ’ এবং ‘সুবচন’ ডেভেলপমেন্ট টিমের প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেছেন।

ব্রেইল প্রিন্টার

শাবিপ্রবির সিএসই বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করেছেন ব্রেইল প্রিন্টার। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ডটমেট্রিকস প্রিন্টারকে বিশেষভাবে ব্রেইল প্রিন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। বাজারে এ ধরনের প্রিন্টারের দাম বেশি থাকা সত্ত্বেও অনেক কম খরচে এটি তৈরি করা হয়েছে। এতে ব্রেইল-উপযোগী ফন্ট উদ্ভাবন ছাড়াও বিশেষ সফটওয়্যার তৈরি করেছেন তিনি। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা সাধারণ অডিও শুনতে পারে কিন্তু যারা লেখাপড়া জানে তাদের জন্য প্রিন্টারটাও গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে তারা শিখতে পারে এবং প্রয়োজনে প্রিন্টও করতে পারবে, যা তাদের দৈনন্দিন কাজকে সহজ করে দেবে। এটা একটা ছোটো উদ্যোগ, যা ছোটো কাজ সারার জন্য প্রযোজ্য। তবে বড়ো আকারে করতে হলে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

ড্রোন প্রকল্প

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে সেটি নানা ধরনের উদ্ভাবনী কাজকর্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ড্রোন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীর নিজস্ব প্রযুক্তিতে গড়ে তোলা Unmanned Aerial Vehicle (UAV) বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশে উড়ে বেড়ানোর দৃশ্য একটি নিয়মিত ঘটনা। UAV এর সঙ্গে সঙ্গে ড্রোন গবেষকেরা QUAD COPTER Ges HEXA COPTER সাফল্যের সাথে আকাশে উড়িয়েছে। বিষয়টিকে শুধু হবি বা

বিনোদনের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে সত্যিকারের ব্যবহারের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

রোবট প্রকল্প শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবটের ওপর গবেষণার জন্যে একটি টিম গড়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীদের নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তোলা রোবট ইতোমধ্যে সারা বাংলাদেশের রোবট প্রতিযোগিতায় (রোবমানিয়া, ২০১৪) শ্রেষ্ঠ রোবট হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

শাবিপ্রবি ছাড়াও সিলেটে প্রতিবছর প্রায় দেড়শ' শিক্ষার্থী আইসিটি বিষয়ক কোর্সে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করছে, যারা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় ও জাতীয় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোতে সুনামের সাথে চাকরি করছে। এদের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আউটসোর্সিংয়ের কাজও করে থাকে। সম্প্রতি মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে রোবটিক্স ও মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং মোবাইল অ্যাপস ডেভেলাপমেন্টের দুটি স্বল্পমেয়াদি কোর্স চালু করা হয়। এই কোর্স দুটি সিলেটে এই প্রথম। এই কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন উপযোগী দক্ষতা অর্জন সম্ভব। শাবিপ্রবির রোবটিক্স অ্যান্ড অ্যারোনেটিক্স ল্যাব এবং মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে কিছু প্রকল্পের কাজ চলছে যার মাঝে অন্যতম দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়ক প্রকল্প।

ব্যাচেলর ডিগ্রি ছাড়াও সিলেটের কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা প্রদান করে আসছে। এদের মধ্যে সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট অন্যতম। প্রতিষ্ঠানটি ব্যবহারিক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর জোর দিয়েই বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কোর্সগুলোতে পাঠদান করে থাকে। এসব প্রক্রিয়া একজন শিক্ষার্থীকে হাতেকলমে কাজ শিখতে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত ব্যবহারিক ক্লাসের কারণে এখান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা কর্মজীবনে অনেকটাই এগিয়ে থাকে।

টিচার্স ট্রেনিং কলেজ আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্পের আওতায় সিলেট টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মাধ্যমে সিলেট জেলার ৯৭৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি করে ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার মাধ্যমে একটি করে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প-১ এবং ২-এর আওতায় এখানে কলেজ শিক্ষকদের ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

এ কলেজের শিক্ষকদের দ্বারা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান বিষয়ে পরিচালিত একটি পাইলট প্রকল্প Localization of Digital Content সিলেট জেলার তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

মুরারিচাঁদ (এমসি) কলেজ

১৮৯২ সালে সরকারের অনুমোদন নিয়ে আসাম এবং সিলেটের প্রথম কলেজ মুরারিচাঁদ (এমসি) কলেজ চালু হয়। ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল এই কলেজ সরকারিকরণ হয়। ১৯১৩ সাল থেকেই এই কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়। বর্তমানে এখানে উচ্চমাধ্যমিক এবং অনার্স পর্যায়ে প্রায় সহস্র শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হয়। এই কলেজে বর্তমানে ৪০টি কম্পিউটার নিয়ে দুটি কম্পিউটার ল্যাব আছে, যেখানে শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদান এবং ব্যবহারিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, এ ছাড়া বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এখানে প্রোগ্রামিংয়ে বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদি কোর্স করিয়ে থাকেন।

সরকারি মহিলা কলেজ

১৯৩৯ সালে সিলেটে স্থাপিত এই কলেজটি ১৯৪৭ সালের আগেই সরকারি প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ছাত্রী স্বল্পতার অজুহাতে এই কলেজকে আবার বেসরকারিকরণ করা হয়। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রয়াস এবং স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের সহযোগিতার ফলে সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে কলেজটির অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশে মহিলাদের জন্য স্থাপিত প্রথম ডিগ্রি কলেজ হিসেবে সরকারি মহিলা কলেজ এখন পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এ অঞ্চলের মেয়েদের শিক্ষায় বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষায় এই কলেজ বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় ২৫ বছর পর ১৯৬৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে এই কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শুরু থেকেই ছাত্রীদের পাসের হার উল্লেখযোগ্য ছিল।

আইসিটি ইনস্টিটিউট

ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে ২০০১ সালে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের একটি উদ্যোগ ছিল অত্যন্ত কার্যকর ও প্রশংসনীয়। যেহেতু স্বল্পসময়ে আইটি গ্র্যাজুয়েট তৈরি তখন সম্ভব ছিল না, সেজন্যে আইটি গ্র্যাজুয়েটদের চাহিদা কিছুটা পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞানের যে কোনো বিষয়ের গ্র্যাজুয়েটদের আইটিতে দক্ষ করে তোলার জন্যে দেশের ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রকল্পের আওতায় ১ বছর মেয়াদি পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি (পিজিডি ইন আইটি) কোর্স চালু করা হয়। এই ডিগ্রি প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩ বছরে কমপক্ষে ১৮০ জন আন্তর্জাতিকমানের কম্পিটউটার প্রোগ্রামার তৈরি করা এবং প্রজেক্ট শেষে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্সটি চালু রাখার তাগিদ ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একটি পূর্ণাঙ্গ আইসিটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইআইসিটি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ২০১৩ সালের অ্যাকাডেমিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের তথা এ অঞ্চলের ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে পিজিডি, স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান এবং গবেষণা, উদ্ভাবন, সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট ও কনসালট্যান্সি প্রদানসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আইআইসিটি এগিয়ে চলছে।

খ. হাই-টেক পার্ক বাংলাদেশ হাই-টেক কর্তৃপক্ষ সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে ১৬২ দশমিক ৮৩ একর জমি নির্বাচন করেছে। কর্তৃপক্ষ জেলার হাই-টেক পার্কের নামকরণ করেছে ‘সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি’। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণের পর সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের ভিত্তিতে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। এই হাই-টেক পার্কে উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প স্থাপন করা হবে। একই সঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে; আশা করা যায় যে, এই পার্কে মাইক্রোসফট, গুগল, আইবিএম, স্যামসাংয়ের মতো বড়ো বড়ো কোম্পানি তাদের অফিস চালু করবে। ফলে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সুলভ মূল্যে গ্যাস, পানি, বিদ্যুতের সরবরাহ করবে। সাথে সাথে স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় উচ্চগতির ইন্টারনেট নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সফটওয়্যার নির্মাণকারী ও আউটসোর্সিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও আকর্ষণীয় কম ভাড়ায় অফিস স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হবে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জেলায় তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হবে ।

গ. সফটওয়্যার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য ও প্রযুক্তিকে মানুষের কাছে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্যে সফটওয়্যারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যপ্রযুক্তির সেবাসমূহ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সফটওয়্যার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। জেলার অন্যতম সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো হলো :

সিঅ্যান্ডই, এরোসফট্, বিকাম এক্সপার্ট, আইটি ল্যাব সলিউশনস্, রাইট ক্লিক সফটওয়্যার, রেকন আইটি, ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ, পাই-সফট সলিউশনস্, টেকনেক্সট, কোড এক্সটাসি, ডিভাইজর ওয়েব, প্রিমিটিভ সল্যুশন, জিআইটি এক্সপার্ট ইত্যাদি।

এই সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো যে ধরনের কাজ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো অ্যাকাডেমিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সলিউশন, পয়েন্ট অব সেইল, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনভেন্টরি, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং অফিস অটোমেশন সিস্টেম, হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং সফটওয়্যার, মোবাইল বেইজড অ্যাপ্লিকেশনস্, ওয়েবসাইট ডিজাইন, মেইন্টেনেন্স এবং ওয়েব এনাবল্ড সার্ভিস।

ঘ. ফ্রিল্যান্সিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সিলেটে প্রায় কয়েক হাজার ফ্রিল্যান্সার রয়েছে, যারা বিগত কয়েক বছর ধরে সিলেটে বসে বিশ্বের নানা প্রান্তের ক্লায়েন্টদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। গতবছর বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেস ইল্যান্সে প্রায় এক হাজারের

মতো রেজিস্ট্রার্ড ফ্রিল্যান্সার ছিল এবং ওডেস্ক-এ প্রায় তিন হাজার রেজিস্ট্রার্ড ফ্রিল্যান্সার ছিল, যা সংখ্যায় বর্তমানে আনুমানিক সাত হাজারের কাছাকাছি। ফ্রিল্যান্সিং বা মুক্তপেশা তরুণদের মাঝে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রতিবছর সিলেটে কয়েক লাখ ডলার রেমিটেন্স আসে শুধু ফ্রিল্যান্সারদের মাধ্যমে। বিভিন্ন সুযোগসুবিধা বাড়ানো হলে এবং সরকারিভাবে প্রচার-প্রচারণা চালালে আরো বেশিসংখ্যক ফ্রিল্যান্সার তৈরি করা সম্ভব।

বেসিস প্রতিবছর ফ্রিল্যান্সারদেরকে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করে। ২০১১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিবছরই সিলেটের ফ্রিল্যান্সাররা এই পুরস্কার পেয়ে আসছে। সিলেটে ফ্রিল্যান্সিংকে জনপ্রিয় করার পেছনে যার অশেষ অবদান রয়েছে তিনি হলেন শাবিপ্রবি সিএসই বিভাগের ছাত্র জাকারিয়া চৌধুরী। বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিং শুরুর প্রথমদিকে তিনি বিভিন্ন টিউটোরিয়াল তৈরি করে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন, ফ্রিল্যান্সিংকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রচুর ব্লগ লিখতেন এবং তার সহযোগিতায় বর্তমানে অনেকেই নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলেছে।

ঙ. আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাশাপাশি প্রায় অর্ধশত তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের এ নগরীতে প্রতিদিন তথ্যপ্রযুক্তির সাথে পরিচয় হচ্ছে হাজারো মানুষের, গড়ে উঠছে তথ্যপ্রযুক্তিকেন্দ্রিক এক বিশাল জনগোষ্ঠী। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (সিলেট শাখা), ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, সিলেট আইটি অ্যাকাডেমি, যুব উন্নয়ন অ্যাকাডেমি, অ্যারোসফট ট্রেইনিং সেন্টার ও শাহ্ খুররম ইনস্টিটিউট অব আউটসোর্সিং টেকনোলজি অন্যতম। এসব প্রতিষ্ঠান আইসিটিবিষয়ক বেসিক কোর্স থেকে শুরু করে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, গ্রাফিকস ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, এফিলিয়েট মার্কেটিংসহ অন্যান্য আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করে। আইটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা দেশের বাইরে আউটসোর্সিংয়ে সফলতার সাথে কাজ করেছে, আয় করছে বৈদেশিক মুদ্রা।

চ. ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি)

সিলেটে বর্তমানে বাংলাদেশের সকল আইএসপি এবং মোবাইল অপারেটরই ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে। এগুলোর মধ্যে BTCL, Link3 & Technologies, BRAC Net, SOL-BD আইএসপিগুলো প্রধানত কেবল কানেকশন দেয়। এগুলো যদিও বড়ো ও মাঝারি কোম্পানি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেই মূলত ইন্টারনেট সার্ভিস দেয়, তথাপি সম্প্রতি BRAC Net ব্যতীত অন্য কোম্পানিও প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের জন্যে ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করেছে। BTCL টেলিফোন লাইন-ভিত্তিক ADSL সংযোগ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে টেলিটক লি. Optical fiber সংযোগ এবং কোম্পানির মাধ্যমে 3G ইন্টারনেট সেবা দেয়। Link3 & Technologies মূলত অপটিক্যাল ফাইবার কানেকশন দিয়ে থাকে। BRAC Net অপটিক্যাল ফাইবার এবং WiMax Network-

ভিত্তিক সংযোগ দিয়ে থাকে। প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের জন্য WiMax Network-ভিত্তিক মোবাইল ইন্টারনেট সেবা মূলত Bangla Lion GesQubee দিয়ে থাকে। মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে গ্রামীণ, টেলিটক, বাংলালিংক এবং এয়ারটেল ইতোমধ্যেই 3G/3.5G প্রযুক্তির মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা দেওয়া শুরু করেছে। এছাড়াও অল্প ব্যান্ডউইডথ্-এর EDGE/GPS/EVDO প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা অনেক আগে থেকেই সব মোবাইল অপারেটররা দিয়ে আসছে।

২. একনজরে ডিজিটাল সিলেট :

সরকারি সেবা প্রদানের প্রচলিত পদ্ধতির বদলে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইউনিয়ন থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সমন্বিত ই-সেবা কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে যাতে যেখানেই সেবা তৈরি হোক না কেন জনগণ যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো জায়গায় বসে তা পেতে পারেন। বর্তমানে বাংলাদেশের বেশিরভাগ নাগরিক কোনো না কোনো ই-সেবা উপভোগ করছেন। এটুআই প্রোগ্রামের কারিগরি সহায়তায় শুরু হওয়া উল্লেখযোগ্য কিছু ই-সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণ যেভাবে উপকৃত হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হলো :

ক. ডিজিটাল সেন্টার ২০১০ সালের নভেম্বর মাস থেকে দেশে একযোগে সকল ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (ইউআইএসসি) কার্যক্রম শুরু করে। ইউআইএসসি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হয়েছে। সিলেটের ১০৫টি ইউআইএসসি থেকে বর্তমানে হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন তথ্য ও সেবা নিচ্ছে। আর এসব সেবা প্রদান করে জেলার ইউআইএসসি উদ্যোক্তারা এ পর্যন্ত ২,৭৬,২৪,২৪৫ টাকার বেশি উপার্জন করেছেন। এসব তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকে এ যাবৎ ৩,৭৭,৯৪১টির বেশি সেবা প্রদান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মালয়েশিয়া গমনেচ্ছু ৪৭,০০০-এর অধিক কৃষিশ্রমিকের অনলাইন নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে।

এসব ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনপদের মানুষ খুব সহজে সরকারি ফরম, নোটিশ, পাসপোর্ট-ভিসা সংক্রান্ত তথ্য, জাতীয় ই-তথ্যকোষ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনবিষয়ক তথ্য, চাকরির খবর, নাগরিকত্ব সনদপত্র, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলসহ অন্যান্য সরকারি সেবা পাচ্ছেন। তা ছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহার, ই-মেইল করা, কম্পিউটার কম্পোজ, ফটোকপি, স্ক্যানিং করার সুবিধা রয়েছে এসব তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে। প্রচলিত সেবার বাইরে এসব কেন্দ্র থেকে বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং, জীবন বিমা, মাটি পরীক্ষা ও সারের সুপারিশ, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ এবং জেলা প্রশাসক অফিসে জমির পরচাসহ অন্যান্য সেবার আবেদন করা যাচ্ছে। গ্রামের সাধারণ মানুষকে সেবা প্রদান ছাড়াও এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারীপুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

খ. জেলা ই-সেবাকেন্দ্র

জেলা ই-সেবাকেন্দ্রে এসে জনগণ সরাসরি, ডাকযোগে কিংবা অনলাইনে সেবার আবেদন করতে পারছে। আবেদনের সাথে সাথে আবেদনকারীকে একটি গ্রহণ রশিদ দেওয়া হচ্ছে, ফলে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত হয়েছে। এর ফলে সেবার মান উন্নত হওয়ার পাশাপাশি যে কোনো সময়ে যেকোনো স্থান হতে সেবা নেওয়া বা দেওয়া যাচ্ছে। চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সিলেটের ই-সেবাকেন্দ্র থেকে ১৫,০০০টির বেশি নাগরিক আবেদন অনলাইনে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। জেলা ই-সেবাকেন্দ্র চালু হওয়ার ফলে জনগণের হয়রানি বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। জনগণ কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই দ্রুততম সময়ে সেবা পাচ্ছে। প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজে এসেছে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা, কমেছে দুর্নীতি।

গ. ই-পর্চা

জনসাধারণ এখন খুব সহজে অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম থেকে জায়গা-জমির পর্চা/খতিয়ান/সার্টিফাইড কপি পাচ্ছেন। এর ফলে একদিকে জনগণ যেমন কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই দ্রুত সেবা পাচ্ছেন, অন্যদিকে সরবরাহকৃত রেকর্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিজিটালাইজ হয়ে যাচ্ছে। এ যাবত সিলেট জেলার অধীনে ৯৭,৮৫১ টির বেশি পর্চার অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে।

ঘ. মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমে ডিজিটাল কনটেন্ট

'তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা নয় বরং শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তি'—এই মূলমন্ত্র ধারণ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য 'মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম' ও 'শিক্ষক কর্তৃক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি' নামে দুটি মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশে এ মডেল অনুসরণে আগ্রহ প্রকাশ করছে। এ মডেলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীদের উপযোগী কনটেন্ট তৈরি করে ক্লাসে ব্যবহার করছেন। শিক্ষকদের তৈরিকৃত কনটেন্ট শিক্ষক বাতায়নে (https://www.teachers.gov.bd/) এবং অন্য আরেকটি ব্লগে (https://www.ictinedubd.ning.com/) রাখা হয়েছে, যা অন্য শিক্ষকগণ ব্যবহার করছেন এবং এর গুণগত মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন।

বর্তমানে একটি প্রকল্পের আওতায় সিলেট টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের ১৬০০ স্কুল-শিক্ষক ও ৬০জন কলেজ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। ২০১৬ সালের মধ্যে জেলার সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হবে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালিত হলে আমাদের নতুন প্রজন্ম মানসম্মত শিক্ষা পাবে, যার ফলে তারা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে।

ঙ. অনলাইনে আবেদনের ব্যবস্থা

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরকালীন ভাতা ঝামেলামুক্ত উপায়ে নিশ্চিত করতে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

ও অবসর সুবিধা বোর্ডে অনলাইন আবেদন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সিলেট জেলার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীরা এখন অনলাইনে তাদের অবসরকালীন সুবিধার আবেদন করতে পারছেন।

চ. সেবা যখন মোবাইল ফোনে

মোবাইল ফোন শুধু কথার বলার যন্ত্রই নয়, বরং এর মাধ্যমে নানাবিধ তথ্য ও সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১০ কোটির বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী রয়েছে। দ্রুত সম্প্রসারণশীল এ প্রযুক্তি এখন গ্রামের দরিদ্র কৃষকের হাতেও। এই পরিপ্রেক্ষিতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ইতোমধ্যে বিভিন্ন সেবা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের নাগরিক পরিবার বিল (বিদ্যুৎ-পানি-গ্যাস ইত্যাদি) পরিশোধ করার জন্য এখন মোবাইল ফোনই যথেষ্ট। রেলওয়ে টিকিট এখন মোবাইল ফোন ও অনলাইনে ক্রয় করা যাচ্ছে। এছাড়াও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এবং অনলাইনে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ট্রেনের অবস্থানও জানা যাচ্ছে।

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সিলেটের সম্ভাবনা

শুধু মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে নয়, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তিতেও অন্যান্য অনেক জেলার চেয়ে সিলেট ইতোমধ্যেই এগিয়ে। সিলেটে আছে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪টি মেডিকেল কলেজ, ৮০টি কলেজ ও ৬০০টি মাধ্যমিক স্কুল। আছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ রাজধানীর সাথে যোগাযোগের জন্যে চমৎকার রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

আধুনিক বসবাসযোগ্য চমৎকার এই শহরটিকে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে উত্তরোত্তর এগিয়ে নিতে প্রশিক্ষিত লোকবল আইসিটি খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আইসিটি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে দেশের আইসিটি খাতে উন্নয়ন দ্রুততর হবে। পাশাপাশি দেশের বাইরে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি হবে।

আইসিটি খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী করতে ব্যবসায়ীদের অবকাঠামোগত সহায়তা করলে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হবে। দ্রুত হাই-টেক পার্ক চালু করতে পারলে বিশ্ববাজারে বাংলদেশের আইটি পণ্যের চাহিদা বাড়বে। একই সঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

অনলাইনে গড় আয়ের দিক থেকে সিলেটের ফ্রিল্যান্সাররা তৃতীয়। ২০১৪ সালে সম্মিলিতভাবে প্রায় এক লাখ ডলার আয় করেছেন সিলেটের ফ্রিল্যান্সাররা। এখানে অনেক দক্ষ ফ্রিল্যান্সার রয়েছেন। একই সঙ্গে নতুন করে আরও অনেকেই এ পেশায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন। কিন্তু বিভাগীয় শহর হিসেবে কাজ করার প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় ইন্টারনেটের গতি। দ্রুতগতির ও সাশ্রয়ী খরচে ইন্টারনেট পেলে অনলাইন মার্কেটপ্লেসে ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ভালো সম্ভাবনা তৈরি হবে। সারা দেশে দক্ষ ফ্রিল্যান্সার তৈরিতে কাজ করছে অনলাইন মার্কেটপ্লেসে ইল্যান্স।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মোবাইল অ্যাপস বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম করে তোলা সম্ভব। ইতোমধ্যে এ বছরের মে মাসে আইসিটি মন্ত্রণালয় ও EATLসফটওয়্যার কোম্পানির সহযোগিতায় শাবিপ্রবিতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আসা ৫০০-এর অধিক শিক্ষার্থীকে মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের ওপর একটি উন্মু ক্ত প্রিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করলে আরো বেশি সংখ্যক মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপার তৈরি করা যাবে। বিভিন্ন ই-সেবা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও কোথায় কীভাবে এসব সেবা পাওয়া যায়, তা সাধারণ মানুষকে জানানোর জন্য ইতোমধ্যে সিলেট জেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা সেবাদানকারী এবং সেবাগ্রহণকারীর মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা ও বিভিন্ন ডিজিটাল সেবার সাথে মানুষকে ব্যাপকভাবে পরিচিত করার উৎকৃষ্ট মাধ্যম। সেজন্যে আরও কার্যকরভাবে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা আয়োজন করা গেলে বর্তমান সেবার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ ই-সেবা বিষয়ে সাধারণ মানুষ ধারণা পাবে।

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বর্তমানে অনলাইন আউটসোর্সিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সারা দেশের একদল তরুণ ইতোমধ্যে আউটসোর্সিং কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। জেলা প্রশাসন থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া গেলে, আউটসোর্সিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সিলেটে সফল করা সম্ভব হবে। জেলা ই-সেবাকেন্দ্র সঠিকভাবে কাজ করার জন্য মূল চালিকাশক্তি হলো জেলা প্রশাসনের গতিশীল নেতৃত্ব। জেলা প্রশাসন কর্মতৎপর হলেই ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রসমূহ/ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার টেকসই হয়ে উঠবে এবং জাতীয় তথ্য বাতায়ন (National Portal) নিয়মিত হালনাগাদ হবে এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে সর্বাধিক সুযোগ দিয়ে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব।

বিশেষ উদ্যোগ:

প্রবাসীদের কল্যাণার্থে সরকার প্রবাসীবিষয়ক বিশেষ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, সিলেট বিদেশ গমনেচ্ছু ওয়ার্কারদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করছে। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বিদেশ গমনেচ্ছু ওয়ার্কারদের দক্ষতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বিদেশে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে নিহত মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের পরিবারকে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে বিশেষ সাহায্য প্রদান করা হয়। সরকার সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রবাসী কল্যাণ শাখা চালু করেছে যা প্রবাসীদের বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করছে। ডি.আই.জি. অব পুলিশ, সিলেট রেঞ্জের অফিসেও প্রবাসী অভিযোগ সেল গঠন করা হয়েছে।

সরকার প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করেছে যার মাধ্যমে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের বিদেশে যাওয়ার ভাড়াবাবদ নামমাত্র সুদে জামানতবিহীন সহজশর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সিলেটে জেলা প্রশাসকের পরিচালনায় একটি প্রবাসী কল্যাণ ট্রাস্ট 'বাংলাদেশ ওভারসিজ সেন্টার' প্রবাসীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের নাম রেজিস্ট্রেশন ও ফিঙ্গার প্রিন্টসহ ডাটাবেইজ তৈরির কাজ চলছে।

অধ্যায়-২০

বিশেষ পণ্য

দেশের প্রতিটি অঞ্চলেই রয়েছে বিশেষ ধরনের পণ্য। এসব পণ্য একদিকে অঞ্চলকে যেমন সমৃদ্ধ করে তেমনি এলাকার সুখ্যাতিও ছড়ায়। বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতির কারণে সিলেট অঞ্চলেও এমনসব পণ্য রয়েছে যা দেশের অন্য অঞ্চলে বিরল। চা, পান, আনারস, কমলা, সাতকরা, সুপারি, শীতলপাটি, তাঁতবস্ত্র প্রভৃতি পণ্য সিলেট অঞ্চলকে করেছে সমৃদ্ধ। এসব পণ্য শুধু দেশেই সমাদৃত নয়, বিশ্বব্যাপী রয়েছে এসব পণ্যের কদর। দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি এসব পণ্য রফতানি হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যা থেকে প্রতিবছর আয় হচ্ছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। এতে উৎপাদনকারীরা যেমন সচ্ছল হচ্ছেন তেমনি গতিশীল হচ্ছে দেশের অর্থনীতির চাকা।

সাতকরা

সিলেট অঞ্চলের মানুষের কাছে রসনার অন্যতম অনুষঙ্গ সাতকরা। হরেক রকমের খাবার তৈরিতে সাতকরা ব্যবহৃত হয়। মাছ, মাংস এবং ডালের সাথে সাতকরা দিয়ে রান্নাকরা খাবার খুবই সুস্বাদু। সাতকরার আচার বেশ মজাদার। সিলেটিদের কাছে সাতকরা 'হাতকরা' হিসেবে পরিচিত।

স্বাদে গন্ধে অনন্য সাতকরা মুখরোচক সবজি হিসেবে সিলেটের সর্বত্র সমাদৃত। হালকা টক ও তেতো রান্নায় ভিন্ন মাত্রা তৈরি করে। ধনিয়া পাতা ছাড়া যেমন রাঁধুনিরা ভালো রান্নার চিন্তা করেন না তেমনি সিলেটের নারীরা সাতকরা ছাড়া মাংস কিংবা ইলিশ রান্নার কথা ভাবেন না। সাইট্রাস ফ্রুট হিসেবে বিভিন্ন দেশে রফতানি করা হয় কাঁচা সাতকরা। প্রবাসী সিলেটিদের জন্য সাতকরা কেটে শুকিয়ে প্যাকেট করে পাঠানো হয় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। সিলেটের বাইরের জেলাগুলোতেও সাতকরার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোরবানি ঈদে সাতকরার চাহিদা বেড়ে যায় কয়েকগুণ।

কমলা

কমলার জন্য এক সময় সিলেটের সুখ্যাতি ছিল। খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে উৎপাদিত এ কমলার পরিচিতি ছিল 'খাসিয়া জাত' হিসেবে। আকার আকৃতি ও রসের জন্য বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় উৎপাদিত কমলার চাহিদা ছিল সীমান্তের ওপারেও। তখন এ অঞ্চলের চাষিদের অন্যতম অর্থকরী ফসল ছিল কমলা। এখানকার উৎপাদিত কমলা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি হতো। কিন্তু ষাটের দশকের শুরুতে এতে ছন্দপতন ঘটে। হঠাৎই কমলা বাগানে দেখা দেয় ক্ষয়িষ্ণু 'ডিক্লাইন ডিজিজ'। এ মড়কে অধিকাংশ কমলা বাগান বিনষ্ট হয়ে যায়। মড়কের ক্ষতি পোষাতে না পেরে অনেক কমলাচাষি কমলাচাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। মাটির পুষ্টিমান ক্ষয়ে যাওয়া, রোগ বালাইয়ের উপদ্রব, গাছের উৎপাদনশীলতা হ্রাস ও মড়ক ইত্যাদির কারণে কমলার উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। একপর্যায়ে কমলা চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন কৃষকেরা। তবে,

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বড়োলেখা উপজেলার কৃষকরা কমলা চাষ করে ভালো ফলন পেলে পুনরায় তাদের মধ্যে কমলা চাষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সময়ের সাথে সাথে কমলা চাষ সম্প্রসারিত হতে থাকে। সিলেটের অতীত ঐতিহ্য রক্ষা এবং কমলার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০০১ সালে সরকার 'বৃহত্তর সিলেটে কমলা ও আনারস উন্নয়নসহ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প' গ্রহণ করে। সে সময় জুড়ী উপজেলার গোয়ালবাড়ি ইউনিয়নের কচুরগুল ও হায়াছড়া এলাকায় ৬৯ হেক্টর জমি নিয়ে কমলা চাষ প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। পরে আরও ৫৫ হেক্টর জমিতে তা সম্প্রসারিত হয়। চাষিরা নিজ উদ্যোগে অতিরিক্ত ৪৫ হেক্টর জমিতে কমলা চাষ করেন। এরপর সিলেটের বিভিন্ন উপজেলায় আগের মতো শুরু হয় কমলা চাষ। কমলা চাষে একদিকে যেমন কৃষকরা স্বাবলম্বী হতে থাকেন অন্যদিকে কমলা রফতানির মাধ্যমে প্রতিবছর অর্জিত হয় বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

সিলেট বিভাগীয় কৃষি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর মৌলভীবাজার ও সিলেটে ৫৫৬ হেক্টর জমিতে কমলা চাষ হয়। তার মধ্যে সিলেট জেলার ৩৮৫ হেক্টর জমিতে কমলার বাণিজ্যিক বাগানের সংখ্যা ১৫৭টি। সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, জাফলং, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় কমলা বাগান রয়েছে।

সিলেটের চাষিরা প্রতি মৌসুমে কোটি টাকার কমলা কেনাবেচা করে থাকেন। তবে উৎপাদন হ্রাসবৃদ্ধির ওপর এ টাকার অঙ্কেও তারতম্য ঘটে।

মণিপুরি তাঁতবস্ত্র

সিলেটের মণিপুরি তাঁতের সুনাম রয়েছে দেশজুড়ে। একসময় যে তাঁতবস্ত্র নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে তৈরি করতেন মুণিপুরি নারীরা, সময়ের বিবর্তনে আজ তা তাদের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।

সিলেট নগরীর মণিপুরি অধ্যুষিত খাদিমপাড়া, শিবগঞ্জ, কুশিঘাট, লামাবাজার, মণিপুরি রাজবাড়ি, লালাদিঘিরপাড়, আম্বরখানা, বড়োবাজার, সুবিদবাজার, সাগরদিঘিরপাড়, কেওয়াপাড়া ও নরসিংটিলা এলাকায় শিল্পীর সুনিপুণ ছোঁয়ায় তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের তাঁতের পোশাক। শুধু শহর সিলেটেই নয় বিভাগজুড়েই তাঁতের পোশাক তৈরির কারখানা রয়েছে। সিলেট বিভাগের চার জেলায় মোট তাঁত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪ হাজার ৮টি এবং তাঁতের সংখ্যা ৬ হাজার ৫০৩টি। এর মধ্যে সিলেট জেলায় তাঁত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪১২টি এবং তাঁতের সংখ্যা ৬৮১টি।৬

তাঁতশিল্পের তাঁতি হচ্ছে মূলত মেয়েরা। মণিপুরি মহিলাতাঁতিরা জন্মসূত্রে মায়ের কাছ থেকেই তাঁতের কাজ শিখে থাকেন। মণিপুরি সম্প্রদায়ের ৯৫ ভাগ মহিলাই এ শিল্পের সাথে জড়িত।

অনুসন্ধানে জানা যায়, আত্মনির্ভরশীল মণিপুরি নারীরা পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য আদিকাল থেকেই পোশাক তৈরি করে আসছে। একসময়

সৌখিন মানুষের দৃষ্টি পড়ে তাঁতের তৈরি পোশাকে। আশির দশকের শুরুতে পারিবারিক সচ্ছলতার জন্য মণিপুরি নারীরা নিজেদের তৈরি পোশাক বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করতে থাকেন। শুরুতেই ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় তাঁতের পোশাক। বাড়তে থাকে চাহিদা। সময়ের বিবর্তনে পরিস্থিতি এখন এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, মণিপুরি সম্প্রদায়ের অনেক পরিবারই তাঁত শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। বাকি পরিবারগুলো আয়ের সহায়ক হিসেবে এ শিল্পে কাজ করছে। সিলেটে উৎপাদিত তাঁতের কাপড় শুধু স্থানীয়ভাবেই বিক্রি করা হয় না, পাইকাররা দেশের বিভিন্নস্থানে সরবরাহ করে থাকেন। শুধু দেশেই নয়, সিলেটের প্রবাসীরাও মণিপুরী তাঁত শিল্পের প্রতি ঝুঁকতে শুরু করেছেন। সে কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে যাচ্ছে মণিপুরি কাপড়।

তাঁতশিল্পীদের ভাষ্য অনুযায়ী,আগে শুধু তাদের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর জন্য এ শিল্পের গন্ডি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে মণিপুরি মহিলারা এ শিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করায় গড় উৎপাদন ও চাহিদা দুই-ই বেড়েছে। সাধারণ একটি কাপড় বুনন করতে সময় লাগে ৩-৪ দিন। অন্যদিকে একটি চাদর বুনতে সময় লাগে এক থেকে দেড় দিন। এ শিল্পের সাথে জড়িত পুরুষরা পাইকারিভাবে শহরের বিভিন্ন বিপণি বিতানগুলোতে তাঁতের তৈরি কাপড় বিক্রি করে থাকেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানেও উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য পাঠানো হয়। ফলে এ শিল্পের সাথে জড়িত পরিবারগুলোতে প্রতি মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা বাড়তি আয় হয়।

মণিপুরী নারীরা তাঁত দিয়ে প্রায় সবধরনের পোশাকই তৈরি করে থাকেন। এর মধ্যে বিভিন্ন জাতের শাড়ি, চাদর, ফতুয়া, থ্রিপিস, বেড কাভার, পাঞ্জাবি, ছোটোদের পোশাক, শার্ট প্রভৃতির চাহিদা বেশি। মণিপুরি কাপড় ব্যবসায়ীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রকারভেদে তাঁতের শাড়ি ৬০০ থেকে ২৫০০ টাকা, বালুচরী জামদানি ২৭০০ থেকে ৩২০০ টাকা, মনিপুরী শাড়ি ৭০০ থেকে ১৮০০ টাকা, মনপুরা শাড়ি ৬০০ টাকা, পাঞ্জাবি ৩০০ থেকে ১৩০০ টাকা, ফতুয়া ২০০ থেকে ৫০০ টাকা, নকশি কাঁথা ৭০০ থেকে ২ হাজার টাকা, গামছা ২৫০ টাকা, শার্ট ২০০ থেকে ২৫০ টাকা, শিশুদের পোশাক ৬০ থেকে ৫০০ টাকা, হাত ব্যাগ ২০০ থেকে ২৫০টাকা, ফানেক ৭৫০ টাকা, হাফ স্কিল শাড়ি ৭০০ থেকে ১৫০০ টাকা, থ্রি-পিস ৪০০ থেকে ৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

শীতলপাটি

সিলেটের শীতলপাটির কদর রয়েছে বিশ্বজোড়া। স্থানীয় ঐতিহ্যে শীতলপাটির অবস্থান শীর্ষে। শীতলপাটি বুননের সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও সিলেট অঞ্চলের শিল্প সচেতন মানুষের আবিষ্কার এই শীতলপাটি, এনিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলার তেঘরিয়া, চাঁনপুরম শ্রীনাথপুর, আতাসন, গৌরীপুর, লোহামোড়া, খুজগীপুর, কোয়ারগাঁও, হরিশ্যাম, টেকামুদ্রা, কলমপুর, আলগাপুরসহ আরও বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার লোক

শীতলপাটি শিল্পের সাথে জড়িত। সিলেট অঞ্চলের অন্যান্য এলাকায় শীতলপাটি তৈরি হলেও বালাগঞ্জের শীতলপাটিই অনন্য।

এক সময় এই উপজেলায় তৈরি শীতলপাটি শুধু বাংলাদেশেই বাজারজাত হতো না, তা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানেও রফতানি হতো। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ায় শীতলপাটির কদর ছিল ঈর্ষণীয়। ভারতবর্ষে আগমনের প্রমাণ হিসেবে ভিনদেশিরা ঢাকার মসলিনের পাশাপাশি বালাগঞ্জের শীতলপাটি নিয়ে যেতেন স্মারক হিসেবে। প্রচলিত আছে, ব্রিটিশ আমলে রানি ভিক্টোরিয়ার রাজপ্রাসাদে স্থান লাভ করেছিল বালাগঞ্জের শীতলপাটি।

সিলেটে এই শিল্প গড়ে ওঠার মূল কারণ শীতলপাটি তৈরির প্রধান উপকরণ মুর্তা গাছ। সিলেট অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া মুর্তা গাছের জন্য সহায়ক। এই গাছ থেকে আহরিত বেত দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে শীতলপাটি। বিশেষ ধরনের এই গাছ বনাঞ্চলের স্যাঁতসেঁতে মাটি ও বাড়ির পার্শ্ববর্তী ভেজা নিচু জমিতে হয়ে থাকে। ডোবা অথবা পুকুরের একপাশেও মুর্তা গাছ হয়। এ অঞ্চলে মুর্তা গাছের সহজলভ্যতা এই শিল্পকে করেছে ব্যাপক জনপ্রিয়।

মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত প্রায় প্রতিটি পরিবারেই রয়েছে শীতলপাটির কদর। চাহিদার কারণেই শীতলপাটির রয়েছে হরেক রকম নাম। তবে নাম অনেক ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থের ওপরও নির্ভর করে। বেতের প্রস্থের মাপে শীতলপাটির নামকরণ করা হয়ে থাকে সিকি, আধুলি, টাকা, সোনামুড়ি, নয়নতারা, আসমানতারা প্রভৃতি। একেকটি পাটি তৈরি করতে একজন দক্ষ শিল্পীর ৩-৪ মাস পর্যন্ত সময় লেগে যায়, যার ফলে বর্তমানে শীতলপাটির দাম অত্যধিক। এক একটি শীতলপাটি ২ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে।

শীতলপাটির বদৌলতে বালাগঞ্জের শিল্পীরা দেশ-বিদেশে ব্যাপক সুনামও অর্জন করেছেন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় কারু শিল্পপ্রদর্শনীতে বালাগঞ্জের যদুরাম দাস শীতলপাটির জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৮২ সালে জাতীয়পর্যায়ে শীতলপাটির জন্য শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত হন বালাগঞ্জের পবঞ্জয় দাস। ১৯৯১ সালে ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্বের কারুশিল্প প্রদর্শনীতে বালাগঞ্জের মনীন্দ্রনাথ শীতলপাটি নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করে পুরস্কার লাভ করেন।

বেতের আসবাবপত্র

বনাঞ্চল অধ্যুষিত সিলেট অঞ্চল বেতশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। স্থানীয়ভাবে বেত দিয়ে তৈরি করা হরেক রকমের আসবাবপত্র দেশ-বিদেশে সমাদৃত।

সিলেটে বেতশিল্প শুরুর ইতিহাস ততটা প্রাচীন নয়। ১৯২২ সালে জীবিকার তাগিদে এখানকার তিন যুবক ইনাত উল্লাহ, সইদ উল্লাহ, রইছ মিয়া চীন দেশে পাড়ি জমান। সেখানে গিয়ে তারা জড়িত হন বেতশিল্পের সাথে। এরপর দেশে এসে তারা নিজেদের উদ্যোগে শুরু করেন বেতের কাজ। তাদের মধ্যে কেউই আজ বেঁচে নেই। তবে, তাদের সেই শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়ে পুরো সিলেটে ছড়িয়ে পড়েছে।

বেতশিল্প এক সময় নগরীর ঘাসিটুলানির্ভর ছিল। তার ওপর নির্ভরশীল ছিল এখানকার ৪ হাজার পরিবার। এখন তা এসে ঠেকেছে মাত্র হাজার বারোশয়। ঘাসিটুলায় উৎপাদিত বেতের পণ্যসামগ্রী বিদেশেও রফতানি হচ্ছে।

দেশজ বেতের পাশাপাশি বার্মা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত থেকে আমদানিকৃত বেত দিয়ে এখানকার লোকজন বেতশিল্প কারখানা গড়ে তুললেও এখনও দেশজ জালিবেতকে আসবাবপত্র তৈরির প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যাবহার করা হচ্ছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সিলেটের ৭ শতাধিক কারখানা থেকে উৎপাদিত বেতের পণ্য রাজধানী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানের চাহিদা মিটিয়ে সুদূর যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, স্পেনসহ নানা দেশে রফতানি হচ্ছে। এতে অর্জিত হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা। শুধু তাই নয় এই শিল্পের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে কমপক্ষে ৫ হাজার মানুষ।

সিলেটের স্থানীয় বাজারেও বেতের তৈরি আসবাবের রয়েছে প্রচুর চাহিদা। এখানকার স্বাস্থ্য সচেতন লোকজন বেতের সামগ্রীতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। বেতের তৈরি চেয়ার, সোফা, খাটসহ অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে কোনো প্রকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। ফার্নিচার সামগ্রীর প্রায় সবই তৈরি করা যায় বেত দিয়ে। এগুলো বিক্রি হয় নগরীর বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে।

চা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে দেশে চা-শিল্পের অভিযাত্রা শুরু হয়। ১৮৫৭ সালে সিলেটের মালনীছড়ায় প্রতিষ্ঠা করা হয় দেশের প্রথম চা-বাগান। এরপর একে একে এই অঞ্চলে বাড়তে থাকে চা-বাগানের সংখ্যা। সিলেটের প্রকৃতি, আবহাওয়া এবং টিলাভূমি চা-চাষের উপযোগী হওয়ায় দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে এই শিল্প। বিকাশমান এই শিল্পের জন্য বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই প্রয়োজনীয়তা থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে আগমন ঘটে চা শ্রমিক জনগোষ্ঠীর। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত সস্তা শ্রমের অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হয় চা-শ্রমিকদের। কৃষ্ণাঙ্গ এই জনগোষ্ঠীর হাত ধরেই বাড়তে থাকে বাগানের সংখ্যা।

চায়ের জন্য সিলেটের রয়েছে বিশেষ সুখ্যাতি। অনেকে সিলেটকে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ বলে থাকেন। ইংরজিতে চা-এর প্রতিশব্দ হচ্ছে টি। গ্রিকদেবী থিয়ার নামানুসারে এর নাম হয় টি। চীনে ‘টি’ চা-এর উচ্চারণ ছিল ‘চি’। এর বৈজ্ঞানিক নাম ‘ক্যামেলিয়া সাইনেসিস’।

পানির পরেই চা বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত পানীয়। প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া অনুসারে চা-কে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন কালো চা, সবুজ চা, ইষ্টক চা, উলং বা ওলোং চা এবং প্যারাগুয়ে চা। এছাড়াও, সাদা চা, হলুদ চাসহ আরো বিভিন্ন ধরনের চা রয়েছে। তবে সর্বাধিক পরিচিত ও ব্যবহৃত চা হলো সাদা, সবুজ, উলং এবং কাল চা। প্রায় সবরকম চা-ই ক্যামেলিয়া সিনেনসিস থেকে

তৈরি হলেও বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুতের কারণে এক এক ধরনের চা এক এক রকম স্বাদযুক্ত।

চা-গাছ একটি বহুবর্ষজীবী চিরসবুজ উদ্ভিদ। আদর্শ পরিবেশে একটি চা-গাছ ৫০-৬০ বছর বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক ফলন দিতে সক্ষম। বাংলাদেশে সাধারণত বড়ো পাতাওয়ালা আসাম জাত ও ছোটো পাতার চীনা জাত চাষ করা হয়।

চা-গাছ তার বৃদ্ধিতে কিছুটা আরণ্যক পরিবেশ পছন্দ করে। উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশ যেখানে তাপমাত্রা ২৬ থেকে ২৮ ডিগ্রি সে. বৃষ্টিপাত ২০০০ মিলিমিটারের ওপরে ও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অর্থাৎ আর্দ্রতা ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ, সে জায়গা চায়ের জন্য আদর্শ। চা গাছ জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি কোনোটাই চায়ের অনুকূল নয়।

স্নিগ্ধ, প্রশান্তিদায়ক স্বাদের কারণে মানুষ একদিকে যেমন চায়ের প্রতি আকৃষ্ট তেমনি চা একটি অর্থকরী ফসলও বটে। এই শিল্প অবারিত রেখেছে বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান।

অধ্যায়-২১

প্রাকৃতিক সম্পদ

সিলেট জেলা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। বাংলাদেশে অন্য কোনো একক জেলায় এত বেশি প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। এখানে রয়েছে অজস্র খাল, বিল, নদনদী, নালা, হাওর, পাহাড়, বন ও মাটির তলায় নানা প্রকার খনিজ সম্পদ। এ জেলাতেই রয়েছে উত্তোলনযোগ্য সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস। এ জেলা এছাড়া নির্মাণকাজে ব্যবহার উপযোগী কঠিন শিলা-নুড়ি ও নদীবাহিত বালুর জন্য এ জেলা বিখ্যাত। কিছু এলাকায় পিট কয়লা ও চুনাপাথরের মজুদও রয়েছে। এসব প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেলের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সিলেট জেলা বেঙ্গাল বা বাংলা অববাহিকা (Bengal Basin)-এর সুরমা নামক উপ-অববাহিকায় অবস্থিত। সুরমা উপ-অববাহিকাটি (Surma Sub-basin) একটি নিম্নগামী (subsiding) গঠনান্তিক সচল (tectonically active) অববাহিকা। উল্লেখ্য, এরূপ অববাহিকা পৃথিবীর অনেক জায়গায় দেখা যায়। সুরমা উপ-অববাহিকাটি মূলত পাললিক শিলার উপাদান পলল দিয়ে গঠিত যার পুরুত্ব ১৫ কি. মি.-এর অধিক। পলল-এর মধ্যে মূলত বালু বা মিহি কাদা ও মাঝে-মাঝে চুনাপাথরের সংমিশ্রণ দেখা যায়। ধারণা করা হয় প্রায় ৫০ মিলিয়ন বছর আগে থেকে হিমালয় পর্বতের উত্থান, বার্মিজ সাব প্লেট ও ইন্ডিয়ান প্লেটের সংঘর্ষ এবং এর ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাখণ্ড দ্বারা এ অববাহিকাটির গঠনপ্রক্রিয়া শুরু হয়। বালু-কাদার সংমিশ্রণ ও সচল টেকটোনিক্যালিক অবস্থার ফলে ছোটো-বড়ো উর্ধ্বভাঁজ বা ধনুকাকার গঠন (anticline), চ্যুতির (fault) সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে সিলেট অঞ্চল তেল-গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের সৃষ্টি বা জমা হওয়ার একটি আধারে পরিণত হয়েছে। একটি অঞ্চলে প্রাকৃতিক তেল-গ্যাস প্রাপ্তির যতগুলো নিদর্শন-মৌলিক উপাদান যেমন উর্ধ্বভাঁজ (anticline), চ্যুতি (fault), উৎস শিলা, মজুদ শিলা, ফাঁদ-এর উপস্থিতি দরকার হয়, এর সবকটিই সিলেটে বিদ্যমান। অধিকন্তু, শিলার বয়স, আঞ্চলিক ভূ-তাপীয় নতিমাত্রা (geothermal gradient), ভারাক্রান্ত চাপ (overburden pressure) ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় উৎস শিলা হতে সহজেই তেল-গ্যাস উৎপাদিত হতে পারে। সিলেটে প্রাপ্ত তেল-গ্যাসসমূহ Oligocene সময়ের Jenam শিলাস্তর হতে বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক ও ভূ-রাসায়নিক পরির্বতনের মাধ্যমে অভিপ্রয়াণ (migration) হয়ে Oligocene হতে Miocene সময়ের Surma Group এর Bhuban ও Bokabil শিলাস্তরে জমা হয় (Curiale et al., ২০০২)। পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রমাণিত যে, উৎস শিলা হতে সৃষ্ট তেল-গ্যাস ভূমির সাথে উল্লম্বভাবে বা সমান্তরালভাবে উর্ধ্বমুখী গতিতে গমন করে উপযুক্ত কোনো গঠনযুক্ত বিশেষ ফাঁদে আটকা পড়ে মজুদ

শিলায় জমা হয় (Shamsuddin and Khan, ১৯৯১)। এসব ফাঁদগুলো মূলত উর্ধ্বভাঁজ কিংবা চ্যুতির দ্বারা সৃষ্ট। আবার কোনো কোনো সময় উভয় প্রকার (উর্ধ্বভাঁজ বা চ্যুতি) গঠন একত্রে পাওয়া যায়।
সিলেট জেলায় যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ বা খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় তা পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো :

প্রাকৃতিক গ্যাস সিলেট জেলার অন্তর্গত মোট ৫টি গ্যাসক্ষেত্র আছে। দেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র সিলেট (হরিপুর, চিত্র ১) ১৯৫৫ সালে আবিষ্কৃত হয়। এজেলায় অবস্থিত অন্যান্য গ্যাসক্ষেত্র যথাক্রমে কৈলাশটিলা (১৯৬২), বিয়ানীবাজার (১৯৮১), ফেঞ্চুগঞ্জ (১৯৮৮) ও জালালাবাদ (১৯৮৯)। ভূপ্রকৃতির দিক দিয়ে গ্যাসক্ষেত্রগুলো তুলনামূলকভাবে সমতলভূমি ও ভূগর্ভে উর্ধ্বভাঁজ বা চ্যুতি দ্বারা সৃষ্ট কোনো আধারে অবস্থিত। বিভিন্ন গবেষণা বা জরিপের মাধ্যমে প্রমাণিত, সিলেট জেলায় প্রাপ্ত উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ৪.৬৫ টিসিএফ (সারণি ১৬৬)। ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ১.৬৬৬ টিসিএফ ও অবশিষ্ট মজুদ ৩.১৮ টিসিএফ। পেট্রোবাংলার তথ্য মতে, এসব ছাড়াও সিলেট জেলায় ৫০% সম্ভাব্যতায় ২০,৬৮১ বিসিএফ শেল গ্যাস (shale-gas) ও ২,১৬৮ বিসিএফ পাতলা শিলাস্তরে গ্যাসসম্পদ পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে (সারীন-১৬৭)।

চিত্র: ১ : হরিপুর তেল-গ্যাসক্ষেত্র (সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেড ওয়েব পেজ হতে ডাউনলোডকৃত)

সারণি-১৭৩

সিলেট জেলায় প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ (বিসিএফ)

ক্র. নং	গ্যাসক্ষেত্র	আবিষ্কারের সাল	মজুদ নির্ধারণের সাল	মোট মজুদ	উত্তোলনযোগ্য মজুদ (১ পি)	মোট উত্তোলন (ডিসেম্বর ১২)	অবশিষ্ট মজুদ (জানুয়ারি ১৩)
১.	সিলেট	১৯৫৫	২০০৯	৩৭০.০	২৫৬.৫	১৯৮.৮৭	১২০.৩
২.	কৈলাশটিলা	১৯৬২	২০০৯	৩৬১০.০	২৩৯০.০	৫৭৭.১৫	২১৮২.৮৫
৩.	বিয়ানীবাজার	১৯৮১	২০০৯	২৩০.৭	১৫০.০	৭৩.৪০	১২৯.৬০
৪.	ফেঞ্চুগঞ্জ	১৯৮৮	২০০৯	৫৫৩.০	২২৯.০	৯৫.০৯	২৮৫.৯১
৫.	জালালাবাদ	১৯৮৯	১৯৯৯	১৪৯১.০	৮২৩.০	৭২১.৩০	৪৬২.৭০
মোট				৬২৫৪.৭	৩৮৪৮.৫	১৬৬৫.৮১	৩১৮১.৩৬

সূত্র : মজুদ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১২

সারণি-১৭৪

সিলেট জেলায় সম্ভাব্য প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ (বিসিএফ)

	গ্যাসক্ষেত্র-সুরমা বেসিন	সম্ভাব্যতা		
		৯০%	৫০%	১০%
অনাবিষ্কৃত	সুরমা বেসিন	-	১,০৬৫	৮,২৭৯
শেল গ্যাস	সুরমা বেসিন	-	২০,৬৮১	৪১,৪৭১
পাতলা শিলাস্তর	সিলেট	-	১৭১	৪৪০
	কৈলাশটিলা	-	১,২২০	৩,০১৫
	বিয়ানীবাজার	-	৬১	১৫৯
	ফেঞ্চুগঞ্জ	-	১২৩	৩৩৯
	জালালাবাদ	-	৫৯৩	১,৫৩১
মোট			২৩৯১৪	৫৫২৩৪

সূত্র: বাংলাদেশের পেট্রোলিয়ামের সম্ভাবনা ও সম্পদ যাচাইয়ের চূড়ান্ত প্রতিবেদন, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, জুন, ২০১১

উৎপাদনের হিসাব মতে, সিলেট জেলার পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্রের ১৬টি কূপ থেকে দৈনিক উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৩৭৭.৪ এমএমসিএফ, যা দেশে উৎপাদিত মোট উৎপাদিত গ্যাসের (২২৯৪.৬, ১০-১১/০৬/২১০৪ তারিখে) শতকরা ১৬.৪৫ ভাগ (সারণি-১৬৮)। এসব গ্যাসক্ষেত্র থেকে বার্ষিক (২০১২-১৩) উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩৮৬৭.৯৫ এমএমসিএফ এবং প্রারম্ভ থেকে ক্রমপুঞ্জিত (মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত) মোট উৎপাদন ৫২০৪৪.৬১ এমএমসিএফ।

সারণি-১৭৫

সিলেট জেলায় উৎপাদিত দৈনিক গ্যাসের পরিমাণ (এমএমসিএফ)

ক্র. নং	গ্যাসক্ষেত্র	উৎপাদনরত কূপের সংখ্যা	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	দৈনিক উত্তোলন	বিগত বছর (২০১২-১৩) এ মোট উৎপাদন	শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত (মার্চ, ১৪ পর্যন্ত)
১.	সিলেট	২	১১.০	৮. ৬	৯৬.৯০	৫৭৪৬.২৮
২.	কৈলাশটিলা	৬	৮০.০	৭৬.২	৮৮৯.৪০	১৭৩৯৬.৭৫
৩.	বিয়ানীবাজার	২	১৪.০	৯.৯	১২১.০০	২২১৫.৯০
৪.	ফেঞ্চুগঞ্জ	২	৪০.০	৩৭.৯	৩৯৬.৯০	৩১৯৪.৮০
৫.	জালালাবাদ	৪	২৩০.০	২৪৪.৮	২৩৬৩.৭৫	২৩৪৯০.৮৮
মোট		১৬	৩৭৫	৩৭৭.৪	৩৮৬৭.৯৫	৫২০৪৪.৬১

সূত্র : মজুদ ও তথ্যব্যবস্থাপনা বিভাগ পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১২

খনিজ তেল বাংলাদেশে যে কয়টি গ্যাসক্ষেত্রে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে তা মূলত সিলেট জেলায়ই অবস্থিত। ১৯৮৬ সালে সিলেট গ্যাসফিল্ডে খনিজ তেলের সন্ধান মেলে। ভূগর্ভে প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল একসঙ্গে অবস্থান করলেও দু-স্তরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের ভূতত্ত্ববিদগণের ধারণা, বর্তমানে যে পরিমাণ গভীরতা থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে তার অধিক গভীরতায় বিশেষ জরিপ চালানো হলে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। ইতোমধ্যে ত্রিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপের মাধ্যমে এর প্রমাণ মিলেছে। সিলেটের হরিপুরের খনিজ তেল মূলত সিলেট ঊর্ধ্বভাঁজ (Sylhet Anticline)-এ অবস্থিত। এটি ভূমি থেকে প্রায় ২০০০ মিটার গভীরে, দৈর্ঘ্যে ১৩ কি.মি. ও প্রস্থে ৩ কি.মি. বিস্তৃত দুটি শিলাস্তরে দৃশ্যমান। পেট্রোবাংলার হিসাব মতে, এক্ষেত্র থেকে সর্বোচ্চ ২১ মিলিয়ন ব্যারেল খনিজ তেল পাওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্র থেকে ১৯৮৭ সালে প্রাকৃতিক চাপে প্রতিবছর সর্বোচ্চ ৪০০ ব্যারেল উত্তোলন শুরু হলেও ১৯৯৪ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ১০০ ব্যারেল। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ০.৫৬ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত খনিজ তেল উত্তোলন করা হয়। বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক না হওয়ায় ১৯৯৪ সালে উত্তোলন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২০১১-১২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি বাপেক্স (BAPEX-Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited) সিলেট জেলার অধীন সিলেট, রশিদপুর ও কৈলাশটিলায় ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত জরিপে সিলেট গ্যাসক্ষেত্র একটি শিলাস্তরে মোট ২৮ মিলিয়ন ব্যারেল (উত্তোলনযোগ্য ১১ মিলিয়ন ব্যারেল) ও কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্রে বিভিন্ন গভীরতায় পাঁচটি শিলাস্তরে মোট ১০৯ মিলিয়ন ব্যারেল (উত্তোলনযোগ্য ৪৪ মিলিয়ন ব্যারেল) খনিজ তেলের সন্ধান মেলে। আশা করা হচ্ছে, কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্রের প্রস্তাবিত কূপের খননকার্য সমাপ্ত হলে উক্ত কূপ থেকে দৈনিক ৫০০ ব্যারেল অপরিশোধিত খনিজ তেল উত্তোলন সম্ভব, যা

দেশের বিদ্যমান জ্বালানি চাহিদা পূরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া এ জেলাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শেল তেল (Shale-oil) পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৯০%, ৫০% ও ১০% সম্ভাব্যতায়, যা যথাক্রমে ২৭.০, ৯৫.২ ও ২৭৯.১ মিলিয়ন ব্যারেল।

সারণি-১৭৬

সিলেট জেলায় সম্ভাব্য শেল তেলের মজুদ (মিলিয়ন ব্যারেল)

	গ্যাসক্ষেত্র-সুরমা বেসিন	সম্ভাব্যতা		
		৯০%	৫০%	১০%
শেল তেল	সুরমা বেসিন	২৭.০	৯১.০	২৩৯.০
অনাবিষ্কৃত শেল তৈল	সুরমা বেসিন	০.০	৪.২	৪০.১
মোট		২৭.০	৯৫.২	২৭৯.১

সূত্র : বাংলাদেশের পেট্রোলিয়ামের সম্ভাবনা ও সম্পদ যাচাইয়ের চূড়ান্ত প্রতিবেদন, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, জুন, ২০১১

সিলেট জেলার অন্তর্গত সব কটি গ্যাসক্ষেত্র থেকে উল্লেখযোগ্যহারে তরল হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায়। এসব তরল হাইড্রোকার্বনের মধ্যে কন্ডেনসেট, ডিজেল, মটরস্পিরিট (এমএস) ও কেরোসিন উল্লেখযোগ্য। এ সব তরল হাইড্রোকার্বন কৈলাশটিলা ও রশিদপুরে প্রক্রিয়াজাত করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়।

সারণি-১৭৭

সিলেট জেলায় উৎপাদিত তরল হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ (হাজার লিটারে)

ক্র. নং	গ্যাসক্ষেত্র	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	দৈনিক উৎপাদন	বিগত বছর (২০১২-১৩) এ মোট উৎপাদন	শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত (মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত)
১.	সিলেট	মটরস্পিরিট	৬.৯৯	৭.৭৭	২৯০৫.৯২	১১৩১৬১.১৬
		ডিজেল	-	-	-	১৭.৭১
		কেরোসিন	২.৮৮	২.১৬	৯৩৪.১৫	৯৭৩০.০৬
		কন্ডেনসেট	১১.০৮	১১.০০	৪৩০৪.৭০	১২৫৭৬৮.৫৩
২.	কৈলাশটিলা	মটরস্পিরিট	২৩.৫৮	২৭.২৩	৯৪২৩.৮৪	১৯৩৪২৪.৪১
		ডিজেল	১৯.৮৭	২৪.৫৮	৮১৭৮.১১	১৭৫৪৩৬.৮৩
		কন্ডেনসেট	১৬২.০৫	১১৩.৭৯	৪১৭০৮.২৭	৯৯৭৭৩৮.৬৪
৩.	বিয়ানিবাজার	কন্ডেনসেট	২৯.৮০	২৫.০৫	১০৫২৩.৮৮	২০৮০৪২.৭৩
৪.	ফেঞ্চুগঞ্জ	কন্ডেনসেট	৫.৯৬	৩.৯৯	১৮২৮.০৫২	১৪০৮১.৩৫৯
৫.	জালালাবাদ	কন্ডেনসেট	-	২৯৫.৩২	১০৩৮৩৮.৬১	১২২৫৩২৯.০৪
মোট			২৬২.২১	৫১০.৮৯	১৮৩৬৪৫.৫৩২	৩০৬২৭৩০.৪৬৯

সূত্র : মজুদ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১২

চুনাপাথর সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলংয়ে ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকায় চুনাপাথর পাওয়া যায় (চিত্র ২)। সিলেটের চুনাপাথর হালকা হলুদ থেকে ধূসর বর্ণের। আঞ্চলিকভাবে সিলেট চুনাপাথরকে নুম্মু লাইটিক চুনাপাথর (Nummulitic Limestone) বলা হয়। এ চুনাপাথরে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার ছোটো-বড়ো জীবাশ্ম (ছোটো-বড়ো Foraminifera গোষ্ঠী ও স্বল্পপরিমাণে ostacode গোষ্ঠী) পাওয়া যায়। সিলেট চুনাপাথরের সঙ্গে একই সময়ের বিশ্বের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত চুনাপাথরের শিলাস্তরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে প্রচুর মিল পাওয়া যায়, বিশেষ করে বড়ো বড়ো জীবাশ্মের (Nummulites, Assilina, Discocyclina,Alveolina) সঙ্গে। সিলেটের জাফলংয়ের চুনাপাথরের বিস্তৃতি ও মজুদ বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলন লাভজনক না হওয়ায় এটিকে পর্যটকদের জন্য ভূমিদর্শন ও অধিকতর গবেষণার সুবিধার্থে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

চিত্র ২ : জাফলংয়ে ডাউকি নদীর তীরে সিলেটে চুনাপাথর

কঠিন শিলা বা নুড়ি সিলেট জেলার জাফলং, ভোলাগঞ্জসহ বেশকিছু এলাকায় কঠিন শিলা বা নুড়ি উত্তোলন করা হয়। এসব পাথর মূলত নির্মাণসামগ্রী হিসেবে সারা দেশে সমাদৃত। বর্ষাকালে উজানের পাহাড়ি ঢলে ডাউকি নদীসহ বেশকিছু পাহাড়ি নদী দ্বারা পানিবাহিত হয়ে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় নদীর তলদেশে জমা হয়। জাফলং, ভোলাগঞ্জসহ অন্যান্য এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা উক্ত জমাকৃত কঠিন শিলা-নুড়ি উত্তোলন করে পাথর ভাঙার যন্ত্র (Stone crushing machine) দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি বা মাপের খন্ড (সিব (১/২ হতে ৩/4 ইঞ্চি), সিলিকন (বড়ো বালুকণার) , সিঙ্গাল (৩/4 হতে ১ বা ২ ইঞ্চি) , গ্রাবেল বা বোল্ডার (২ ইঞ্চি থেকে বড়ো) করে থাকে। আর এ ধরনের খন্ডসমূহের মাপ গ্রাহকের চাহিদার ওপর নির্ভর করে। স্থানীয় পাথরসংগ্রহকারী ও ব্যবসায়ীদের ধারণা মতে, জাফলংয়ের ডাউকি নদীতে ৪৫.৬ মিলিয়ন ঘন মিটার কঠিন শিলা বা নুড়ি জমা আছে। পাথর উত্তোলন ও ভাঙার শিল্পে কয়েক হাজার লোক নিয়োজিত। স্থানীয়ভাবে নদী হতে উত্তোলিত কঠিন শিলা বা নুড়ি ছাড়াও

সিলেটের তামাবিল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের শিলং হতে পাথর আমদানি করে পরবর্তী সময়ে চাহিদামতো খড়ে বিভক্ত করে বাজারে বিক্রি করা হয়। এ ব্যাপারে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক তুলনামূলক অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বর্তমানে ভারত থেকে আমদানিকৃত পাথর অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হলেও আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও অন্যান্য সূচকে নদী হতে উত্তোলিত কঠিন শিলা বা নুড়ির অবদান অনন্য। তবে উক্ত সমীক্ষায় পরিবেশ দূষণ (শব্দ ও বায়ুদূষণ), নদীতীরের ক্ষয়সাধন ও পরিবেশ সচেতনতার প্রতি নজর দেওয়ার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পাথর উত্তোলন ও ভাঙার শিল্প হতে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব পেয়ে থাকে।

স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ও ভারত থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন মাপের ২৫০ বর্গফুট পাথরের খরচ ও লাভের হিসাব বিশ্লেষণ (Islam and Islam, 2014) :

খরচ ও লাভ	পাথরের প্রকার				
	সিব (টাকা)	সিলিকন (টাকা)	সিঙ্গাল (টাকা)	গ্রাবেল বা বোল্ডার (টাকা)	আমদানি কৃত পাথর (টাকা)
ভাঙার আগে আনুমানিক খরচ	৭,৫০০	২,২৫০	১২,৫০০	১৬,৫০০	১৪,৫০০
আনুমানিক ভাঙার খরচ	-	-	-	১,৫০০	২,০০০
আনুমানিক মোট খরচ	৭,৫০০	২,২৫০	১২,৫০০	১৮,০০০	১,৬৫০
প্রত্যাশিত বিক্রি দাম	১০,৫০০	৫,০০০	১০,০০০	১৮,৫০০ হতে ১৯,৫০০	২২,০০০
প্রত্যাশিত নিট লাভ	৩,০০০	২,৭৫০	২,৫০০	৫০০ হতে ১,৩৫০	৫,৫০০

ক.

খ.

গ.

চিত্র ৩ ক) সিব, খ) সিঙ্গাল, গ) সিলিকন

বালু বালু বা ছোটো নুড়ি একটি অতি মূল্যবান ও সহজলভ্য নির্মাণসামগ্রী। কম ইউনিট মূল্যের পণ্য হওয়া সত্ত্বেও বালু ও ছোটো নুড়ি নির্মাণশিল্পে একটি প্রধান কাঁচামাল ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর ভূমিকা অপরিসীম। সিলেটের লালাখাল, জাফলং, ভোলাগঞ্জ, জকিগঞ্জসহ সীমান্তবর্তী নদী থেকে নির্মাণকাজের ব্যবহার-উপযোগী প্রচুর পরিমাণ বালু উত্তোলন করা হয়। এ বালু উত্তোলন ও বিপণনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু লোক নিয়োজিত। বলতে গেলে সিলেটের লালাখাল, জাফলং, ভোলাগঞ্জ, জকিগঞ্জসহ সীমান্তবর্তী নদীগুলো শুধু সিলেট নয় সারা দেশের জন্য আশীর্বাদ। এসব নদী থেকে উত্তোলিত বালু সিলেটের চাহিদা মিটিয়েও অন্যান্য অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় দেখা যায়, সিলেটের লালাখালের সারি নদী হতে দৈনিক প্রায় ৬০০ ঘনফুট ছোটো নুড়ি ও ৩৭,৫০০ ঘনফুট বালু আহরিত হয়, যার বার্ষিক বাজার মূল্য প্রায় ২৭,৮৬৬,৬৬৫.০ টাকা (Nath, ২০১৩)। এ খাত থেকে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর অনেক টাকা রাজস্ব পেয়ে থাকে।

চিত্র ৪ শ্রমিকেরা ক) নদী থেকে বালু সংগ্রহ ও খ, গ) নৌকায় বালু পরিবহণ করে সারিঘাটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ক.

খ.

গ.

চিত্র ৪ শ্রমিকেরা ক) নদী থেকে বালু সংগ্রহ ও খ, গ) নৌকায় বালু পরিবহণ করে সারিঘাটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

পিট কয়লা পিট কয়লা হচ্ছে একটি জৈব জ্বালানি, যা জৈবপদার্থের আংশিক পচনে গঠিত ফাঁপা উপাদান। পিট হলো কয়লা গঠনের প্রথম ধাপ। এটি প্রধানত উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় উদ্ভিদ উপাদান হতে জলাভূমিতে জমা হয়। ধারণা করা হয়, সিলেটসহ এর আশেপাশের জেলাসমূহের নিম্ন জলাভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পিট কয়লা মজুদ আছে। সম্প্রতি দেশের অন্যতম বৃহৎ হাওর হাকালুকিতে ২০০ মিলিয়ন টনের পিট কয়লা মজুদ আবিষ্কৃত হয়েছে (দৈনিক প্রথম আলো, ২০ জুন, ২০১৪) । ধারণা করা হচ্ছে, হাওরের অন্তত ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে পিট কয়লা মজুদ রয়েছে ও দেশের সর্ববৃহৎ পিট কয়লাক্ষেত্র। তিন দফায় জরিপকাজ শেষে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এ তথ্য নিশ্চিত করে। ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, মৌলভীবাজারের জুরী, কুলাউড়া ও বড়োলেখা এবং সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ ও গোলাপগঞ্জ উপজেলাজুড়ে হাকালুকি হাওরের বিস্তৃতি। এ হাওরের আয়তন প্রায় ২৮ হাজার হেক্টর। ১৯৮৪ সালে প্রাথমিক ও ২০১৩ সালের দুই দফা ভূতাত্ত্বিক জরিপে এখানে পিট কয়লা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। তথ্য মতে, হাকালুকি হাওরে ২০০ মিলিয়ন টন পিট কয়লা মজুদ রয়েছে, এর বর্তমান বাজারমূল্য এক হাজার কোটি টাকার বেশি এবং উক্ত পিট কয়লার মানও বেশ ভালো। সেখানকার পিট কয়লার আনুমানিক বয়স পাঁচ থেকে আট হাজার বছর।

বনজ সম্পদ ভৌগোলিকভাবে ইন্দো-বার্মা হটস্পটের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের উত্তরপুর্ব অঞ্চলের একটা স্বকীয় জীববৈচিত্র্য আছে। অঞ্চলটি মেঘালয় পাহাড়ি ভূখণ্ডের পাশে অবস্থিত যা উক্ত এলাকার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। সিলেট জেলা দেশের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে সীমান্তবর্তী এলাকা নিয়ে গঠিত। আবাসভুমির বৈচিত্র্যের কারণে এখানে বিশেষ ধরনের সব গাছপালা ও পশুপাখির অবস্থান লক্ষ করা যায়।

এসব বনের প্রকৃতিগত গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় উদ্যান ও ইকোপার্ক নামে দুই ধরনের সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছে। আগে উল্লিখিত এই অঞ্চলে দুই ধরনের বন দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলোর একটি হলো স্বাদু পানির জলাবন (সোয়াম্প ফরেস্ট) এবং অন্যটি হলো পাহাড়ি বন।
সিলেট জেলায় অবস্থিত এসব সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে জাতীয় উদ্যান বলা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে :
১. রাতারগুল জাতীয় উদ্যান;
২. খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান;
৩. টিলাগড় ইকোপার্ক।

রাতারগুল জাতীয় উদ্যান রাতারগুল জাতীয় উদ্যান 'বাংলাদেশের একমাত্র স্বাদু পানির জলাবন (সোয়াম্প ফরেস্ট)। পরিবেশগত গুরত্ব এবং ক্রমাগত গাছপালা নিধনের হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাংলাদেশ সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ২০১২'-এর আওতায় বনটিকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করে। রাতারগুল জাতীয় উদ্যান সিলেট

বনবিভাগের উত্তর সিলেট-২ রেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। বনটি সিলেটের প্রাণকেন্দ্র সিলেট সিটি করপোরেশন থেকে মাত্র ৪৫ কিলোমটার দূরে অবস্থিত। এই বনকে ১৯২৭ সালের বন আইন-এর আওতায়, ১৯৫২ সালে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বনের পাশ দিয়ে প্রবাহিত গোয়াইন নদী হলো বনের স্বাদু পানির মূল উৎস। রাতারগুল জাতীয় উদ্যানসংলগ্ন গোয়াইন নদীর এই শাখাকে বলা হয় চেঙ্গের খাল। বর্ষাকালে গোয়াইন নদীর প্রবহমান পানির স্রোতে এই খাল প্লাবিত হয়। বর্ষাকালে এর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলেও শীতকালে শুকিয়ে যায়, যদিও বর্ষাকালে পানির উচ্চতা ২০ ফুট পর্যন্ত উন্নীত হয়। এই বনের প্রধান উদ্ভিদ হচ্ছে করচ। অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে হিজল, পানিজাম, জারুল, বরুণ ইত্যাদি। বনটি চারদিকে মোর্তা বেত দিয়ে পরিবেষ্টিত। বনের গুরুত্বপুর্ণ সব প্রাণীর মধ্যে রয়েছে শূকরডাকা ব্যাঙ, মুরগিডাকা ব্যাঙ, যাইযাই ব্যাঙ, বার্মিজ অজগর, বোরাসাপ, ঢোঁড়াসাপ, বানর ইত্যাদি।

খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান

খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান ২৪০৫৬′-২৪০৫৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১০৫৫′-৯১০৫৯′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এটি ১৯৫৭ সালে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ইন্দো-বার্মা বায়োডাইভারসিটি হটস্পট এর অংশ হিসেবে এখানকার জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে ২০০৬ সালে এটিকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে জাতীয় উদ্যান এলাকার মোট পরিমাণ ৭০০ একর। এটি একটি অর্ধ চিরহরিৎ এবং চিরহরিৎ বনাঞ্চল। যদিও এটি ৭ বর্গকিলোমিটারে ছোটো বনাঞ্চল, উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদের সমৃদ্ধির কারণে এটি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত এলাকাগুলোর মধ্যে একটি। ১৯৬০ সালের আগে এলাকাটি প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, প্রধানত গাছ কাটা এবং কৃষিকাজের কারণে এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। এই পার্কের গুরুত্বপূর্ণ গাছগুলোর মধ্যে রয়েছে সেগুন, চম্পা, চামকাঁঠাল, গর্জন, লোহাকাঠ ইত্যাদি। প্রাণী প্রজাতির মধ্যে রয়েছে লালচোখা ব্যাঙ, সাদাঠোঁটি সবুজ বোরাসাপ, ঢোঁড়া সাপ, পাহাড়ি সাপ, দাঁড়াশ সাপ, অজগর সাপ, মেছো বাঘ, মুখপোড়া হনুমান ইত্যাদি। কিছু জরিপে দেখা গেছে, এখানে ২৩ প্রজাতির পাখি, ১২ প্রজাতির উভচর, ১৪ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৮ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী পাওয়া যায়।

টিলাগড় ইকোপার্ক

টিলাগড় ইকোপার্ক সিলেট বন বিভাগের আওতাধীন উত্তর-সিলেট রেঞ্জ-১ এর অন্তর্ভুক্ত চিরহরিৎ এবং অর্ধ চিরহরিৎ ভৌগোলিক অঞ্চল। সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এর আয়তন ১১২ একর। এ বনটি ২৩০৫৫′-২৫০০২′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০০৫৫′-৯২০৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বনের কেবল ১০ থেকে ১২ একর এলাকা উদ্ভিদ আচ্ছাদনের বাইরে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে উদ্ভিদবৈচিত্র্য ও প্রাণিবৈচিত্র্যে ভরপুর এই বন। এখন পর্যন্ত ১৩টি গোত্রের সর্বমোট ৯০ প্রজাতির উদ্ভিদ শনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি

হচ্ছে শাল, গর্জন, চম্পা, চামকাঁঠাল ইত্যাদি। এছাড়াও গুরুত্বপুর্ণ প্রাণিকুলের মধ্যে রয়েছে বার্মিজ অজগর, কালনাগিনী, পাহাড়ি সাপ, ধারাজ সাপ, মেছোবাঘ, বানর, মথুরা ইত্যাদি।

এসকল বন ছাড়াও বাংলাদেশ বন আইন ১৯২৭-এর আওতায় আরও বেশ কিছু বন সংরক্ষিত বন হিসেবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এছাড়া এখনও জলজ পরিবেশে বেশ কিছু প্রজাতি আছে যা কিনা হুমকির সম্মুখীন। IUCN Gi RED LiST অনুসারে সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলে Cuoraamboinensis, Geoclemyshamiltonii, Hardellathurjii, Melanochelystricarinata, Moreniapetersi, Ophiophagushannah, Python molurus, Aquila clanga, Trachypithecuspileatus, Prionailurusviverrinus, Nycticebusbengalensis, Lutrogale perspicillata, Caprolagu shispidus, Callosciurus-pygerythrus ইত্যাদি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। সিলেট মেঘালয় পাহাড়ি অঞ্চলের পাদদেশে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখনো এখানে এমন সব প্রজাতি আছে যা হুমকির সম্মু খীন। তাই এদের বিলুপ্তির হাত্থেকে রক্ষায় কার্যত ও কৌশলগত পদক্ষেপ একান্ত জরুরি।

অধ্যায়-২২

জীবন ও জীবিকা

সিলেট জেলার ভূ-প্রকৃতি বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় বৈচিত্র্যময়। ভূ-প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের কারণে এ জেলায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকায়ও লক্ষণীয় বৈচিত্র্য বিরাজমান। তা ছাড়াও, অতীতকাল থেকেই এ জেলায় বেশ কিছু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী তাদের জীবন ও জীবিকার স্বকীয় ধারা অনুসরণ করে আসছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের জীবন ও জীবিকাও স্বাভাবিক কারণেই ভিন্ন। আরো দু'টি বিশেষ কারণে সিলেট জেলার মানুষের জীবন ও জীবিকা অন্যান্য অঞ্চল থেকে খানিকটা ভিন্ন। এক, ১৯০৫ থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময় বাদ দিলে ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত সিলেট জেলা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিলো । ফলে সিলেটিদের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনাচার ইত্যাদি লক্ষণীয়ভাবে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা থেকে ভিন্ন । দুই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় থেকে হাল আমল পর্যন্ত সিলেট জেলার মানুষের ব্যাপক হারে প্রবাস গমন, তাদের প্রেরিত অর্থ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জনগোষ্ঠীর সাথে আদান-প্রদান এ অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করেছে।

কর্মপেশা

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সিলেটের ৮১.৫ শতাংশ লোক জীবিকার জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিলো [B.C Allen, Assam District Gazetteers, Vol-II: Sylhet, Calcatta, 1905(Cylo Copy.)] । বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রবাস গমন, দ্রুত নগরায়ন, এবং সার্ভিস সেক্টরের ব্যাপক বিকাশের ফলে এ জেলার পেশাগত কাঠামো উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে গিয়েছে। কেবলমাত্র কৃষির ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন লোকের সংখ্যা এখন অনেক কম। নতুন প্রজন্মের সিলেটিরা পৈত্রিক পেশা ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, ওকালতি, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী, ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার, পর্যটন ও হোটেলসংশ্লিষ্ট কাজ, ব্যাংক-বীমাসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে নানা পেশা গ্রহণ করেছে। তবে, সিলেটে ভার বহন, মাটি কাটা, নির্মাণকাজে শ্রম দেওয়া, রিক্সা চালনার মতো পেশার বিরুদ্ধে সামাজিক সংস্কার রয়েছে। এসব কাজের জন্য সিলেট পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে আগত শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল। সিলেটে মহিলাদের ঘরের বাইরে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে সামাজিক সংস্কার রয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই এ জেলায় কৃষিবহির্ভূত কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার মাত্র ৪.৫৬ শতাংশ, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম (জেলা পরিসংখ্যান-২০১১: সিলেট, পৃষ্ঠা-৪)। তবে সাম্প্রতিক সার্ভিস সেক্টরে নিরাপদ ও আরামদায়ক পরিবেশে কাজের প্রতি মেয়েদের আগ্রহ বাড়ছে।

বাড়িঘরের ধরন ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত হওয়ার কারণে এ জেলার বসত বাড়িগুলোর নির্মাণশৈলীতে দীর্ঘদিন যাবৎ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় ছিলো (উল্লেখ্য, ১৮৯৭ সালের ১২ জুন সংঘটিত হওয়া ভূমিকম্পে সিলেটের অধিকাংশ পাকা ঘর-বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়)। শহরে অধিকাংশ ঘর-বাড়ির ছাদে ব্যবহৃত বাড়িঘরের ধরন হতো টিন এবং দেওয়ালে ব্যবহৃত হতো বাঁশের তৈরি তরজা (বেড়া)। তাতে থাকতো এক ধরনের চুনের প্রলেপ। ফলে দেওয়ালগুলো দেখলে পাকা মনে হতো। অধিকাংশ বাড়িই ছিলো ইংরেজি L অথবা E আকৃতিতে তৈরি। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ ঘর-বাড়ীতে ব্যবহৃত হতো ছন-বাঁশ। বাঁশ এবং কাঠের সহজ লভ্যতার কারণে দেওয়ালেও এ দুটোর ব্যবহার হতো বেশি। দেওয়াল নির্মাণে মাটির ব্যবহারও হতো।

কালক্রমে জনসংখ্যার চাপে এবং আধুনিকতার ছোঁয়ায় ঘর-বাড়ির আকৃতি, নির্মাণশৈলী এবং নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহারে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। শহর গ্রাম সর্বত্রই এখন টিন, ছন এবং বাঁশের তৈরি ঘর-বাড়ির স্থান দখল করেছে আধুনিক স্থাপত্য রীতিতে তৈরি প্রাসাদোপম দালানকোঠা। শহরে একতলা বাড়িগুলো ভেঙে তৈরি হচ্ছে বহুতল ভবন। শহর এবং গ্রামের বাড়িগুলোর গুণমানে তারতম্য খুব একটা চোখে পড়ে না। এ জেলার কোনো কোনো গ্রামে ইউরোপীয় রীতিতে তৈরি বিলাসবহুল ঘর-বাড়ি দেখতে দূরদূরান্ত থেকে লোকজনের সমাগম হয়। কে কত অর্থ ব্যয় করে বাড়ি তৈরি করলো তার প্রতিযোগিতা চলে। এসব বাড়ির অধিকাংশের মালিক বিলেত অথবা আমেরিকা প্রবাসীরা। সুবিশাল বাড়িগুলোর অধিকাংশই সারাবছর তত্ত্বাবধায়কের অধিকারে থাকে। প্রকৃত মালিকেরা মাঝে মধ্যে বেড়াতে এসে কিছুদিন অবস্থান করেন।

এ জেলার বিত্তবান ব্যক্তিদের মধ্যে ছোটো-বড়ো বাগানবাড়ি নির্মাণের প্রবণতা লক্ষণীয়। শহর, শহরতলী এবং গ্রামাঞ্চলে বৈচিত্র্যময় এসব বাগানবাড়িতে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। সিলেটের জঙ্গলে 'জালিবেত' নামক এক প্রকার কাঁটাযুক্ত বেতজাতীয় লতা পাওয়া যায়। এগুলো দিয়ে তৈরি আসবাবপত্র রুচিশীল নগরবাসীর নিকট অত্যন্ত সমাদৃত ছিলো। বর্তমানে জালিবেত দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং আধুনিকতার ছোঁয়ায় আসবাবপত্রে বেতের ব্যবহার অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। তার স্থান নিয়েছে আধুনিক আসবাবপত্র। তবে সিলেট শহরের অনেক বাড়িতে এবং হোটেল-রেস্টুরেন্টে কারুকার্যময় বেতের চেয়ার-টেবিল এখনো চোখে পড়ে। সিলেট জেলার পরিবারসমূহের গড় আকার বাংলাদেশের গড় আকারের কাছাকাছি। কিন্তু জেলার গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায়ই লোকজন তাদের বসতগৃহে তুলনামূলকভাবে বেশি কক্ষ ব্যবহার করে থাকে। অধিকতর আর্থিক সচ্ছলতা এর কারণ হতে পারে। সিলেট শহর এবং জেলার প্রতিটি বড়ো বাজারে সুপরিচিত বিশ্বমানের ফার্নিচার ব্রান্ডগুলোর শো-রুম এবং বিক্রয়কেন্দ্র

চোখে পড়ে। সিলেট শহরে কিছু দোকানে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত দামি ফার্নিচার ও অন্যান গৃহস্থালি সামগ্রীও বিক্রয় করা হয়।

পোশাক

অতীতে সিলেটের সাধারণ মুসলমানগণ তহবন্দ (লুঙ্গি), শার্ট, পিরহান (কুরতা) পরতেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের সাধারণ পোশাক ছিলো ধুতি, নিমা (ফুলহাতা ঢোলা গেঞ্জি) এবং ফতুয়া। অবশ্য মুসলমানদের মধ্যেও ধুতি পরার প্রচলন ছিলো। অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল লোকজনদের মধ্যে বহুবিধ ব্যবহারে গামছার প্রচলন ছিলো। মহিলারা শাড়ি পরলেও সাথে পেটিকোট (ছায়া) এবং ব্লাউজের ব্যবহার ছিলো না। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় পোশাক পরিচ্ছদে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কিশোর-যুবাদের মধ্যে লুঙ্গি-ধুতির ব্যবহার প্রায় বিলুপ্তির পথে। তার স্থান দখল করেছে টি-শার্ট, শার্ট, প্যান্ট। ব্যপকভাবে প্রচলন ঘটেছে জিন্স প্যান্টের। সিলেট শহরে সুপ্রতিষ্ঠিত দেশি ও বিদেশি ব্র্যান্ডের পোশাকের বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। তবে মুসলমান মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদে রক্ষণশীলতার উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে উৎসব-অনুষ্ঠানাদীর বাইরে শাড়ির ব্যবহার প্রায় বিলীয়মান। তার স্থান দখল করেছে সালোয়ার-কামিজ। সকল বয়সী মুসলিম মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদে রক্ষণশীলতার ছাপ সুস্পষ্ট। শহর-গ্রাম এমনকি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়েদের একটি বড়ো অংশ হিজাব পরিধান করে। অনেককে নেকাব-বোরকায় সর্বাঙ্গ আবৃত করে চলাফেরা করতে দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত কম আয়ের মানুষ, বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে গামছার ব্যবহার এখনো আছে।

১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে হজরত শাহজালাল (র.) কর্তৃক সিলেট বিজয়ের পর সিলেটে উদার সুফিবাদের বিস্তার ঘটে। পরবর্তী সময়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে অদ্বৈতাচার্য এবং শ্রীচৈতন্যের মাধ্যমে বৈষ্ণববাদ আসাম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই দুই সহজিয়া মতবাদের সংমিশ্রণে এবং প্রভাবে সিলেটের সাংস্কৃতিক জগৎ মানবতাবাদী ধারায় পরিপুষ্ট হতে থাকে। সৈয়দ শাহনূর, আরকুম শাহ্, ইয়াসিন শাহ্, শেখভানু, হাসন রাজা, দুর্বিন শাহ, কুরবান শাহ্, শাহ আব্দুল করিম প্রমুখ মানবতাবাদী কবিদের রচনায় এর প্রভাব লক্ষণীয়।

খাদ্যসামগ্রী

সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সিলেটিদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রধান স্থান দখল করে আছে ভাত, মাছ ও শুঁটকি। এ জেলার বন্যা প্লাবিত বিল-হাওর ও নদ-নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক বাণিজ্যিকভাবে গড়ে উঠা মৎস্য খামারগুলো মাছের চাহিদার একটা বড়ো অংশ পূরণ করে। বোয়াল, শোল, বাইম ও টেংরা মাছের শুঁটকি সিলেটিদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। পুঁটিমাছ থেকে তৈরি হিদলের (চ্যাপা শুঁটকি) প্রতি সিলেটিদের বিশেষ আসক্তি সর্বজনবিদিত। তরকারিতে সাতকরা নামের লেবু জাতীয় একটি সুগন্ধি আনাজের বহুল ব্যবহার কেবল সিলেটেই দেখা যায়। জারা লেবু নামে

একজাতীয় লেবু কেবল সিলেটেই পাওয়া যায়। সাতকরা, জারা লেবু, শুঁটকি ও পান প্রবাসী সিলেটিদের চাহিদা মেটানোর জন্য রফতানি হয়ে থাকে।

সিলেটিরা সাধারণত রাতের খাবার কিছুটা বিলম্বে (রাত ১০টা ১১টার দিকে) গ্রহণ করে এবং যাদের অফিস আদালতে কাজ কর্ম নেই তারা বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমায়। এ কারণে সিলেটের দোকান-পাট সাধারণত বেলা এগারোটার আগে খোলে না। রমজান মাসে অধিকাংশ সিলেটি তারাবি নামাজের পর ঈদ-শপিংয়ে বের হয় এবং এ কেনাকাটা সেহ্‌রির সময়ের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে।

সিলেট জেলা কখনো মিষ্টান্ন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিলো না। গ্রামে-গঞ্জে মহিলাদের হাতে তৈরি চুই পিঠা, নিমকিসদৃশ হলদে পিঠা, ভাপা পিঠা, ডুবা তেলে তৈরি হান্দেশ (সন্দেশ), নকশি পিঠা (হাতকাটা), হাতে তৈরি সেমাই ইত্যাদি ছিলো অতিথি আপ্যায়নের উপাচার। হাতে তৈরি সেমাই ছাড়া বাকিগুলো এখনো সিলেটিদের নিকট সমান জনপ্রিয়। অতীতে জেলার বড়ো বড়ো বাজারগুলোতে ময়রারা জিলাপি, বাতাসা ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রি করতো। বর্তমানে এসব মিষ্টান্ন প্রায় দেখাই যায় না। তার স্থান দখল করেছে আধুনিক কনফেকশনারিতে প্রস্তুত জিলাপি, চমচম, ছানামুখী, কাঁচাগোল্লা, নিখুঁতি, পান্তুয়া, বালিশ, মণ্ডা, রসকদম, রসগোল্লা, রসমালাই, ল্যাংচা, সন্দেশ, সরপুরিয়া, সাগরভোগ, সীতাভোগ, লালমোহন, রাজভোগ, মালাইকারী, ক্ষীরমোহন ইত্যাদি মিষ্টান্ন। এসব মিষ্টান্ন তৈরির দোকানগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে আগত তিনটি ব্র্যান্ড সমগ্র সিলেটের মিষ্টি ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে। এদের কয়েকশ সুসজ্জিত শো-রুম সিলেটের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। মিষ্টি তৈরির জন্য সিলেট শহরের সন্নিকটে খাদিম নগর ও গোটাটিকর নামক স্থানে এদের নিজস্ব কারখানা আছে। এসব কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক ও শো-রুমগুলোর কর্মীদের অধিকাংশই চট্রগ্রাম থেকে আগত ।

পান সিলেটিদের অতিথি আপ্যায়নের অপরিহার্য উপাদান । বয়স্করা-তো বটেই অনেক যুবা বয়সী পুরুষ ও মহিলা চুন-খয়ের সমেত সারাক্ষণ পান সেবন করে। নতুন প্রজন্মের কাছে পানের জনপ্রিয়তা খানিকটা কমছে।

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, খাবার পানির উৎস, বিদুৎ ব্যবহারের ব্যাপ্তি, মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা কোনো জনগোষ্ঠীর জীবনমানের নির্ণায়ক বলে বিবেচিত হয়। সিলেট জেলায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের পর্যাপ্ত উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। শহরের প্রায় শতভাগ বাসা-বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৮৫ শতাংশ ঘর-বাড়িতে বিদ্যুৎ সুবিধা আছে। সিলেট জেলায় তেমন বিদ্যুৎ ঘাটতি নেই তবে ত্রুটিযুক্ত সঞ্চালন লাইনের কারণে প্রায়শই বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। এ কারণে অনেকেই বিদ্যুৎ সংযোগের পাশাপাশি জেনারেটর, আই.পি.এস ও সোলার প্যানেল ব্যবহার করে। বিদ্যুতের প্রাপ্যতার দরুন ফ্রিজ, ওভেন ও ফুড প্রসেসরের ব্যবহার বেড়েছে। সেই সাথে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে মানুষের খাদ্যাভ্যাসে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ

পদ্ধতি অনেক সহজ ও কম সময় সাপেক্ষ হয়েছে। প্রক্রিয়াজাত ও হিমায়িত খাদ্যের ওপর মানুষের নির্ভরতা বেড়েছে।

ধনী-গরিব নির্বিশেষে জেলার অধিকাংশ লোকের মোবাইল ফোন আছে। মোটামুটিভাবে বিত্তবান ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ারা একাধিক স্মার্টফোন ব্যবহার করে। স্মার্টফোন, ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট এখন শিক্ষার আবশ্যকীয় অনুসঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই বৈপ্লবিক বিস্তার মানুষের জীবনাচরণ ও সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। তথ্য সহজলভ্য হয়েছে, সহজতর ও বিস্তৃত হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ।

বিবাহ

নন-সিলেটিরা সিলেটবাসীর নিকট বেঙ্গালি নামে পরিচিত। নন-সিলেটিদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সিলেটিদের এক ধরনের অনীহা দীর্ঘদিন বজায় ছিলো। সাম্প্রতিক সময়ে এই সংস্কার অনেকটাই দূরীভূত হয়েছে। কিছু মানুষের মধ্যে প্রবাসী পাত্র-পাত্রীর প্রতি আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। সন্তানের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভবিষ্যৎ জীবনের প্রত্যাশাই এর বড়ো কারণ। অতীতের মতো গ্রাম-শহর কোথাও বিয়ের অনুষ্ঠান বাড়িতে হয় না। মূলত বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্যই সর্বত্র গড়ে উঠেছে অসংখ্য কমিউনিটি সেন্টার ও ক্যাটারিং ব্যবসা। বিয়েতে বরযাত্রী পরিবহণ ব্যবহৃত হয় মাইক্রোবাসের বহর। এসব বহরকে এস্কর্ট করে নিয়ে যায় দু-সারি মোটর সাইকেল।

সড়ক ও যানবাহন

পাহাড়-টিলা ও ছড়া-খালের আধিক্যের কারণে শহরের রাস্তাগুলো অপ্রশস্ত ও আঁকাবাঁকা। এ কারণে অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের জন্য বাস সার্ভিস চালু নেই। সিলেট শহর থেকে সব ক'টি উপজেলা এবং দেশের নানা প্রান্তে যাতায়াতের জন্য বাস সার্ভিস আছে। রেল ও আকাশপথেও সিলেট নগরী রাজধানী ঢাকার সাথে সংযুক্ত । তবে অভ্যন্তরীণ ও স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতের জন্য লোকজনের প্রধান পছন্দের বাহন রিকশা, অটোরিকশা, সিএনজি, মাইক্রোবাস ও টেম্পো। জেলায় মোট নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত মিলিয়ে রিকশার সংখ্যা ৪০ হাজারেরও বেশি (জেলা পরিসংখ্যান-২০১১: সিলেট, পৃষ্ঠা-৮৯-৯০)। রিকশাচালকদের অধিকাংশই ট্রাফিক আইন সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে শহরের যেখানে সেখানে রিক্সাজট নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। যাত্রীদের অনেকেই ঘণ্টা হিসেবে দীর্ঘ সময়ের জন্য এসব যানবাহন ভাড়া নিয়ে থাকে।

শ্রমজীবীদের জীবনাচরণ

সিলেট জেলায় মোট শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৩.৬ শতাংশ) মাছ ধরা ও বিক্রয়ের সাথে জড়িত। (বাংলাপিডিয়া, ১ম সংস্করণ, ২০০৩, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪)। সিলেট জেলায় ৩০৫৪১ জন নিবন্ধিত প্রকৃত জেলে রয়েছে (জেলা মৎস্য অফিস)। বন্যা প্লাবিত বিল ও নদী তীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী এই জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার চিত্র জেলার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন। একটি নমুনা জরিপ অনুযায়ী, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের পরিবারের গড় আয় পরিবারের সদস্য সংখ্যার তুলনায় অতি কম। ২০% মৎস্যজীবী পরিবারই যৌথ পরিবার এবং এদের গড় সদস্যসংখ্যা ১০-১১ জন। বাকিরা একক পরিবার

হলেও পরিবার প্রতি সদস্যসংখ্যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। (এম. মোয়াজ্জেম হোসেন, 'দি সোসিও-ইকোনমিক সিচ্যুয়েশন অ্যান্ড অকুপেশন্যাল চ্যালেঞ্জস অব ফিশারম্যান ইন সিলেট', সাস্ট স্টাডিজ, ভ. ১৫, নং. ১, ২০১২; পৃ. ৯৪-১০৩)। এসব মৎস্যজীবী তাদের স্বল্প আয়ের সিংহভাগই ব্যয় করে খাদ্যসামগ্রী ক্রয়ে এবং তাদের খাদ্যসামগ্রীর তালিকায় কার্বোহাইড্রেটের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। শীতকালে মাছের উৎস বিল-হাওর সংকুচিত হয়ে এলে মৎস্যজীবীদের অনেকে বেকার হয়ে যায় আবার কেউ কেউ পেশা পরিবর্তন করে। অনেকের পক্ষেই তখন খাবার জোটানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে এবং তাদের ধার-দেনা বেড়ে যায়।

জেলার মোট জনসংখ্যার ০.৩১ শতাংশ চা-শ্রমিক। মোট ১২টি সুসংগঠিত চা-বাগানে (এ জেলায় আকারে ও শ্রমিক সংখ্যায় অতি ক্ষুদ্র আরো ৮টি চা-বাগান রয়েছে) রেজিস্টার্ড শ্রমিকের সংখ্যা ৬৯৫৬ জন, এবং ক্যাজুয়েল শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১৬০০ জন (মোট শ্রমিকের প্রায় ২৩ শতাংশ)। ক্যাজুয়েল শ্রমিকরা সারাবছর নিয়মিত কাজ পায় না। জীবিকার তাগিদে এরা সমতল এলাকায় কৃষিশ্রমিক এবং দিনমজুর হিসেবেও কাজ করে। রেজিস্টার্ড শ্রমিকদের ৬৩ শতাংশই নারী। বাগান থেকে চা-পাতা সংগ্রহের কাজটি মহিলা শ্রমিকরাই করে। পুরুষ শ্রমিকরা মূলত জমি তৈরি, কলম তৈরি, ছাফাই, কোদালি, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি কাজে নিয়োগ পেয়ে থাকে।

চা-শ্রমিক চা-শ্রমিকদের ৭০ শতাংশই ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, ইত্যাদি এলাকা থেকে আগত। বাকিরা বাংলাদেশের নানা অঞ্চলের মানুষ। চা-শ্রমিকরা দৈনিক মাত্র ৮৫ টাকা মজুরিতে কাজ করে। তবে তারা ফ্রি চিকিৎসা সেবা এবং সপ্তাহে ৩.৫ কিলোগ্রাম চাল অথবা আটা রেশন পেয়ে থাকে। অনেক চা-বাগানগুলোর শ্রমিক কলোনিগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও কোনোটিতেই গ্যাস সংযোগ নেই। মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এমন বাগানের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। রিং বসানো ল্যাট্রিন থাকলেও সেগুলো যথাযথ মানের নয়। এদের প্রধান খাদ্য রুটি ও চা। চা-শ্রমিকরা সর্বার্থেই সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

সিলেট জেলায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক খাসিয়া নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ সুদূর অতীতকাল থেকে তাদের স্বকীয় ধারায় জীবন যাপন করে আসছে। জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলংয়ে মোট ৬টি পুঞ্জিতে বসবাসরত খাসিয়াদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০০। পুঞ্জিগুলো হচ্ছে : বল্লাপুঞ্জি, পুরাতন সংগ্রাম, নতুন সংগ্রাম, নকশিয়ার পুঞ্জি, লামা পুঞ্জি ও প্রতাপপুর।

খাসিয়াদের মূল পেশা পানসুপারির চাষ। শুধু পান থেকে খাসিয়াদের বার্ষিক গড় আয় ৭,৫০,০০০টাকা। স্থানীয় বাজারেই তাদের উৎপাদিত পান বাজারজাত করে থাকে। খাসিয়াদের বার্ষিক মাথাপিছু আয় প্রায় ৭২,০০০ টাকা।

বাংলাদেশে মোট উত্তোলিত পাথরের সিংহভাগই আসে সিলেট থেকে। এ জেলার পাথর কোয়ারিগুলোতে পাথর উত্তোলন, গ্রেডিং, হেন্ডলিং, লোডিং-আনলোডিং, ক্রাশিং, স্টোরিং ও পরিবহণ কাজে মোট কত লোক নিয়োজিত আছে তার সঠিক হিসাব বের করা কঠিন। কারণ পাথর উত্তোলন করা হয় নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত; কিন্তু এর সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, বিশেষ করে ক্রাশিং, লোডিং ও পরিবহণের কাজ চলে প্রায় সারাবছরই। সকল শ্রমিক তাই কোয়ারি এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। অনুমান করা হয় জাফলং ও ভোলাগঞ্জে পাথর কোয়ারিগুলোতে অফ সিজনে ১২০০০ থেকে ১৫০০০ এবং পিক সিজনে ৪০০০০ থেকে ৫০০০০ (চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার) শ্রমিক কাজ করে। পাথর কোয়ারিগুলোতে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রায় ৪০ শতাংশ সিলেট জেলার অধিবাসী। বাকিরা মূলত পার্শ্ববর্তী সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও অন্যান্য জেলা থেকে আগত।

পাথর কোয়ারিতে নিয়োজিত শ্রমিকরা মূলত বস্তিতে বসবাস করে। পানীয় জলের জন্য এরা টিউবওয়েলের ওপর নির্ভরশীল। এদের অধিকাংশই পরিবার-পরিজন সাথে নিয়ে থাকে না। স্থায়ীভাবে কোয়ারি এলাকায় বসবাসকারী শ্রমিকের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। শ্রমিকদের অধিকাংশই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গজিয়ে ওঠা নিম্নমানের হোটেলের খাবার খায়।

পাথর সংগ্রহ কাজ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। প্রায় সকল শ্রমিকই কিশোর ও যুবক বয়সী। অধিক উপার্জনের লোভে এ সমস্ত কমবয়সী শ্রমিক মাত্রাতিরিক্ত ওজনের পাথর উত্তোলন ও বহন করে থাকে। ফলে তারা বয়সবৃদ্ধির সাথে সাথে নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যায় বিশেষ করে হাড়ের-ক্ষয়জনিত অসুখে ভুগতে থাকে এবং পরিণত বয়সে অনেকটা পঙ্গুত্বের জীবনযাপনে বাধ্য হয়। জাফলং সন্নিহিত এলাকায় (বিশেষ করে কানাইঘাট, জৈন্তাপুর কোম্পানীগঞ্জসহ বেশ কিছু উপজেলায়) এধরনের হাড়ের জটিলতায় অসুস্থ রোগীর অধিক্য দেখা যায়।

তাই দেখা যায় ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়া বিবেচনায় দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সিলেট অঞ্চলে যেমন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিরাজমান ঠিক তেমনি জীবন ও জীবিকায়ও রয়েছে বৈচিত্র্য।

অধ্যায়-২৩

খেলাধুলা

সিলেট ক্রীড়াঙ্গানের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অতীত যা শতবছরের খেলাধুলার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধারণ করে বর্তমানকে করেছে গৌরবান্বিত। সিলেটের ক্রীড়াঙ্গনে এমন সব কৃতী খেলোয়াড়ের জন্ম হয়েছে যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। দেশ-বিদেশে ক্রীড়ামোদীদের মানসপটে তারা চিরভাস্বর হয়ে আছেন।

প্রাচীন কাল থেকেই সিলেট শহর এবং গ্রামাঞ্চলে নানা ধরনের খেলাধুলা হতো। তবে তা ছিল বিচ্ছিন্ন এবং জমিদার ও সমাজপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তখনকার সময়ে গ্রাম ও ভাটি অঞ্চলে প্রধানত ঘোড়দৌড়, নৌকাবাইচ ও লাঠিখেলা হতো। এসব খেলাধুলার ভেতর দিয়ে সমাজপতিরা গ্রামে গ্রামে ও পরগনায় পরগনায় নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যাচাই করে নিতেন। সাধারণের মধ্যে তখন খেলাধুলার সম্পৃক্ততা তেমন ছিল না। মূলত সিলেটে শহরকেন্দ্রিক খেলাধুলার প্রসার ঘটতে শুরু করে উনিশ শতকের শেষে। এ সময়েই সিলেটের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীরা সংগঠিত হওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করেন।

১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘সিলেট টাউন ক্লাব’। এটাই সিলেটে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ক্লাব। এ ক্লাবের নিজস্ব ফুটবল মাঠ ছিল, ছিল আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত লনটেনিস খেলার একটি গ্রাউন্ড। তবে ফিরিঙ্গি-ইংরেজরা এর আগেও তাদের চিত্তবিনোদনের সুবিধার্থে দু-একটি ক্লাব গড়ে তুলেছিল। প্রভাবশালী জমিদার ও অভিজাত লোক ছাড়া সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল নিষিদ্ধ। টাউন ক্লাবের পর পরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ‘স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব’। নিজেদের সুনাম বৃদ্ধির জন্য এ দুটি ক্লাবের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ তীব্র প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল। ফলে বিশ্বের সর্বাধিক ও জনপ্রিয় খেলা ফুটবলের প্রতি সিলেটের ক্রীড়ামোদীদের ঝোঁক বেড়ে যায়। উপমহাদেশের বিভিন্ন ফুটবল দল সিলেটে খেলতে আসে। সিলেটেরও অনেক কৃতী খেলোয়াড় ভারতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ নেন।

এদের মধ্যে বি. রায়চৌধুরী, অমিয় ভট্টাচার্য, মুফতি রুকনউদ্দিন আহমদ, অনুকূল দত্ত, জ্যোতি গুহ, ডা. প্রেমদারঞ্জন দাস, এরাদত বন্দ আলী চৌধুরী প্রমুখের নাম উল্লেখযাগ্য।

১৯৩৪ সাল ছিল সিলেটের ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবের। এ সময় কোলকাতা বিশ্বদ্যালয় পোস্টগ্রাজুয়েট দল সিলেটে খেলতে আসে এবং টাউন ক্লাবের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এটা সিলেটের ফুটবল ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে আছে। খেলা শেষে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পোস্টগ্রাজুয়েট

দলের অধিনায়ক কে. ব্যানার্জি মন্তব্য করেছিলেন, ‘সিলেট এসে এভাবে পরাজয়বরণ করব তা স্বপ্নেও ভাবিনি।’ ওই খেলায় টাউন ক্লাবের পক্ষে তিনজন ইংরেজও খেলেছিলেন। বাকি সকলেই ছিলেন সিলেটের অধিবাসী। মুফতি রুকনউদ্দিন আহমদ ও অনুকূল দত্ত অত্যন্ত চমৎকার খেলেছিলেন।

ব্রিটিশ শাসনামলে সিলেটে বিভিন্ন নামে শিল্ড-কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট হতো। এতে অংশ নিত ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন জেলা ও ক্লাব দল। এসব টুর্নামেন্টের মধ্যে বেনীলাল শিল্ড, বঙ্কুবিহারী শিল্ড, ঈশান শিল্ড, এহিয়া মেমোরিয়াল শিল্ড, প্রমীলা কাপ, অমরেন্দ্র কাপ, নরেন্দ্র কাপ, আর্ল কাপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সকল খেলা আয়োজন হতো তৎকালীন জমিদার, ব্যবসায়ী ও সমাজপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায়। খেলা হতো বর্তমান সদর হাসপাতাল, যেখানে আগে খোলা মাঠ ছিল, সেখানে এবং আলিয়া মাদরাসা মাঠ ও এমসি কলেজ মাঠে। তখন সিলেটে স্টেডিয়াম ছিল না এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থাও ছিল না।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে মূলত সিলেটে খেলাধুলার সার্বিক প্রসার ঘটতে শুরু করে। সিলেটের ক্রীড়াঙ্গনে একটি সাংগঠনিক কাঠামো বা ভিত গড়ে ওঠে। এ সময় রাজা জিসি হাইস্কুলের ক্রীড়াশিক্ষক কালীসদয় কর ও বেদার বখত মজুমদারের উদ্যোগে ‘ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ’ গঠন করা হয়, যা পরবর্তীকালে ‘সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা’ হিসেবে রূপান্তরিত হয়। শুরুতে ‘ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন’-এর কোনো স্থায়ী কার্যালয় ছিল না। বেদার বখত মজুমদারের বাড়ি, লালদিঘির পাড়ের একটি হোটেলের দু’তলার কক্ষ, রাজা জিসি হাইস্কুলের একটি কক্ষ এবং স্কাউট ভবন বিভিন্ন সময় ‘ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন’-এর অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এসোসিয়েশনের ফাইলপত্র রাখা হতো বেদার বখত মজুমদারের বাড়িতে। ষাটের দশকের শুরুতে বর্তমান স্টেডিয়াম নির্মিত হলে ‘সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা’র কার্যালয় স্টেডিয়ামের উত্তরপূর্ব কোণে অবস্থিত স্কাউট ভবনে চলে আসে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে বর্তমান স্টেডিয়াম ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং ১৯৭৭ সালে স্টেডিয়াম ভবন ও প্যাভিলিয়ন নির্মাণ করা হলে ‘জেলা ক্রীড়া সংস্থা’র স্থায়ী কার্যালয় হয়। ‘ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন’ বা ‘জেলা ক্রীড়া সংস্থা’ গঠনের পর থেকে জেলা প্রশাসক পদাধিকারবলে এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ১৯৪৯ সালে ‘ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন’-এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন কালীসদয় কর। তবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বর্তমান স্টেডিয়াম ভবনে সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদকদের যে তালিকা বোর্ডে লেখা হয়েছে তাতে দেখা যায় এ.এইচ.এ কাহের ১৯৪৭-১৯৫১ ও কালীসদয় কর ১৯৫১-১৯৫৬ মেয়াদে জেলা ক্রীড়া সংস্থা’র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তবে প্রবীণ ক্রীড়াবিদদের অনেকের মতে কালীসদয় কর ‘ডিস্ট্রিক স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন’-এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই

অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে যাঁরা সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হন তাঁরা হলেন : বিমলেন্দু দাস (সাধু বাবু) ১৯৫৬-১৯৬১, সিরাজ উদ্দিন আহমদ ০১.০৫.১৯৬১ থেকে ২১.০৫.১৯৬৯, মোহাম্মদ শফিক ২২.০৫.১৯৬৯ থেকে ১০.০৮.১৯৭০, এম এ হালিম ১১.০৮.১৯৭০ থেকে ০৬.১০.১৯৭০, মুফতি আবদুল কাদির ০৭.১০.১৯৭০ থেকে ২৮-২-১৯৭৬, লুৎফুর রহমান লালু ২৮.০২.১৯৭৬ থেকে ১১.০৫.১৯৭৭, বাহাউদ্দিন জাকারিয়া ১২.০৫.১৯৭৭ থেকে ০৭.০৯.১৯৭৭, আজিজুল মালিক চৌধুরী ০৭.০৯.১৯৭৭ থেকে ২৬.০৭.১৯৮১, এহিয়া রেজা চৌধুরী ২৭.০৭.১৯৮১ থেকে ০৯.০৪.১৯৮৫, অধ্যাপক এ.এন.এ.এ. মাহবুব আহমদ ০৯.০৪.১৯৮৫ থেকে ০৫.০১.১৯৮৮, দিলদার হোসেন সেলিম ০৫.০১.১৯৮৮ থেকে ০৮.১১.১৯৯৯, এহিয়া রেজা চৌধুরী ০৯.১১.১৯৯১ থেকে ২৭.১১.১৯৯৪, দিলদার হোসেন সেলিম ২২.১১.১৯৯৪ থেকে ২১.১১.২০০১,খন্দকার ফজলুর রহমান বাবুল ২২.১১.২০০১ থেকে ২২.১১.২০০২, আহমেদ আরিফ আরেফ ২২.১১.২০০২ থেকে ২১.১১.২০০৭, খন্দকার ফজলুর রহমান বাবুল ২২.১১.২০০৭ থেকে ২১.১১.২০১১, আব্দুল হালিম (সুনু মিয়া) ২১.১১.২০১১ থেকে এখনো দায়িত্বে আছেন।

এরপর ১৯৯৫ সালে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় কমিশনার সিলেট পদাধিকার বলে এর সভাপতি। সংস্থাটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করে অবদান রাখছে। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দৃষ্টিনন্দন সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম। এখানে ২০১৪ সালে ‘আইসিসি টি-২০ ওয়ার্ল্ড ক্লাব’-এর ভেন্যু নির্বাচিত হয়। বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদকগণের তালিকা দেওয়া হলো।

আলহাজ এহিয়া রেজা চৌধুরী ০৫.০৯.১৯৯৫ থেকে ১৭.১২.১৯৯৬, মাহবুব আহমদ ১৭.১২.১৯৯৬ থেকে ২৫.০১.২০০৬, আলহাজ মো. জাহেদ ২৫.০১.২০০৬ থেকে ২৪.০৪.২০০৭, শেখ নাজমুল হক ২৪.০৪.২০০৭ থেকে ১০.০২.২০০৮, মো. ইমরান চৌধুরী ১০.০২.২০০৮ থেকে ১০.০২.২০১৩, শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল ১০.০২.২০১৩ থেকে এখনো সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন।

ফুটবল

বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা ফুটবল কখন সিলেটে শুরু হয় তার কোনো তথ্য না থাকলেও আঠারো শতকের শেষ প্রান্তে যে সিলেটে নিয়মিত ফুটবল খেলার প্রচলন ঘটে তাতে কারো দ্বিমত নেই। ১৮৯৬ সালে ‘সিলেট টাউন ক্লাব’ এবং এর পর পরই ‘স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব’ প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই সিলেটের ফুটবলে আসে প্রাণের স্পন্দন। ১৯৩৪ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পোস্ট গ্রাজুয়েট দলের সিলেট সফরের মধ্য দিয়ে সিলেটের ফুটবলে নবদিগন্তের সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালের পর থেকে মূলত সিলেটে খেলাধুলার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। ভারত ও পাকিস্তানের বড়ো বড়ো ক্লাব ও আঞ্চলিক দল সিলেটের মাঠে

প্রদর্শনী ফুটবল খেলতে আসে। তার মধ্যে ১৯৪৬ সালে কোলকাতা মোহনবাগান ক্লাব, ১৯৪৭ সালে কোলকাতা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব, ১৯৪৮ সালে কোলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের পেশোয়ার দল ও করাচির মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৮১ সালে কোলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৮৯ সালে রাশিয়ার কোলহতি ক্লাব ও ১৯৯৫ সালে যুক্তরাজ্যের শাপলা ইয়ুথ সংঘ প্রভৃতি দল সিলেটে খেলেছে। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে ভারতের করিমগঞ্জ, শিলং ও শিলচর হতে ফুটবল দল সিলেটে এসে প্রদর্শনী ফুটবল খেলে। ঠিক তেমনি সিলেট থেকে ফুটবল দলও করিমগঞ্জ, শিলং ও শিলচরে গিয়ে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচে অংশ নিয়েছে। চল্লিশের দশকে সিলেটের ফুটবল অঙ্গনে পুলিশ ক্লাব ও এমসি কলেজের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গঠিত এআরপি দল এবং পাকিস্তান আমলে গঠিত পিএনজি দলও জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। সিলেটের ফুটবলে স্থানীয় স্কুলগুলোর ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সিলেট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, দি এইডেড হাইস্কুল, রাজা জিসি হাইস্কুল, মডেল হাইস্কুল প্রভৃতি স্কুলগুলোর প্রচেষ্টায় অনেক কৃতী ফুটবলার তৈরি হয়েছিলেন যারা পরবর্তীকালে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। চল্লিশের দশকে তৎকালীন আসাম প্রদেশের স্কুলগুলোর মধ্যে নিয়মিত অনুষ্ঠিত ‘আর্ল কাপ প্রতিযোগিতা’য় সিলেটের স্কুলগুলো অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করত।

১৯৬১ সালে বর্তমান সিলেট স্টেডিয়াম নির্মিত হওয়ার পর সিলেটের ফুটবলে নতুন মাত্রা যোগ হয়। তবে বর্ষামৌসুমে কাদার জন্য খেলাধুলা ব্যাহত হতো, যা এখনো হয়। পাকিস্তান আমলে যে সকল ক্লাব ও দল সিলেট স্টেডিয়ামে ফুটবল লিগ খেলেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে টাউন ক্লাব, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব, পিএনজি দল, কাস্টমস ক্লাব, সাউথ সুরমা ক্লাব, পাকিস্তান ক্লাব, আখালিয়া খুরমাখলা ক্লাব, মার্চেন্ট ক্লাব, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, জালালাবাদ ক্লাব, পুলিশ এসি, স্টুডেন্ট ইউনাইটেড, ইসমাইল স্পোর্টিং, রিজার্ভ পুলিশ, মদনমোহন কলেজ দল, এমসি কলেজ দল, আজাদ স্পোর্টিং, ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, ইভিনিং ক্লাব, ইপিআর ক্লাব, ইসমাইল গ্রিন স্পোর্টিং, ইয়ুথ সেন্টার ক্লাব, ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাব, ভিক্টোরিয়া ক্লাব, ওয়াপদা ক্লাব, নওজোয়ান ক্লাব, ইয়ুথ সেন্টার ডিপ প্রভৃতি। সিলেট অঞ্চলের ফুটবল খেলোয়াড়রা সেকালে এবং একালে দেশ-বিদেশে ফুটবল খেলে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। সেকাল-একাল মিলিয়ে যাঁদের নাম ক্রীড়ামোদীদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁরা হচ্ছেন : বিশ ও ত্রিশের দশকের খ্যাতিমান খেলোয়াড় বি. রায়চৌধুরী, অমিয় ভট্টাচার্য, অনুকূল দত্ত, জ্যোতিষ গুহ, এরাদত বন্দ আলী চৌধুরী, মুফতি রুকনউদ্দিন আহমদ, প্রেমদারঞ্জন দাস, জহুর বক্স, এএইচএ কাহের, ছৈদ উল্লা, ফণী দাস, সরেকুম মো. তাহের, মুফতি আবদুস সাত্তার, জাফর আলী, মধুবাবু, বীরেন সোম, মন্মথ দত্ত, মো. আশরফ, আবদুর রহিম, সমর সিং, প্রণয়চন্দ্র, সুধীর (বুড়িয়া), পুটো সোম প্রমুখ; চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের কৃতী ফুটবলার

রইসুজ্জামান চৌধুরী, মো. আবদুল করিম, সিরাজ উদ্দিন আহমদ, বিমলেন্দু দাস (সাধু বাবু), মজনু চৌধুরী, কামরুজ্জামান, কমরু মিয়া (ঝাড়ু ভাই), আশরাফুল হক মুকুল, উবায়েদ আহমদ চৌধুরী, আবদুল হক, আবদুল খালিক, কানু বাবু, মছরুছুল করিম চৌধুরী, হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, এম আর চৌধুরী, এম এ হামিদ, সি আর দত্ত, এম এ রকিব, অধ্যাপক জিতেন্দ্রমোহন দাশ, গাজী ফরিদ, আখতার মিয়া, ছমির উদ্দিন, জামাল উদ্দিন, অরবিন্দ দাস, আবদুল মতিন, বজু, মোহাম্মদ আলী, নূর হোসেন খান, রাধিকা সিং, বাদশাহ, সুরেন সিং, উমেশ দাস, টুটুল দাস, জিতেন্দ্র দে, রঞ্জিত দত্ত, রাখাল দাস, সুরেন সিং (১), সুরেন সিং (২), মিলাও সিং, আজমান গাজী, জমসের আলী, তপসির মিয়া, আলতাই মিয়া, সুফি মিয়া, ফিজু, চুনু, টুকু, এ আর লস্কর, মৌলুদ, মসুদ, জামাল, নিখিলেশ, জব্বার, আবদুর রব, হান্নান, আবদুর রউফ, আবু জাফর মজুমদার প্রমুখ; ষাট ও সত্তরের দশকের কৃতী খেলোয়াড় দেওয়ান সাইফুর রাজা, রণজিৎ দাস, আবদুল জলিল চৌধুরী, ওয়ালী আহমদ চৌধুরী, লুৎফুর রহমান লালু, টি আম্বিয়া, শফিকউদ্দিন চৌধুরী, অরুণ লস্কর, চান মিয়া, তমিজউদ্দিন, কাঁচা মিয়া, আমান চৌধুরী, আশিক উদ্দিন, শমসের আলী, সাইফুল ইসলাম, মিসবাহউদ্দিন চৌধুরী, হারুন মিয়া, পীযূষ চৌধুরী, আজব আলী, জিল্লুর, নাজির হোসেন (ছোটো নাজির), থাংলুরা লুসাই, মফিজুর রহমান তিতন, বকুল, সতু, প্রলয় চন্দ, ইসহাক মিয়া, সোমেন চক্রবর্তী, আবদুল মালেক, টুনু, আবদুস সত্তার, মোহন, সুলতান, আবদুল হান্নান, লাল, তছকির মিয়া, নীলমণি সিং, করুণাময় পাল, আবদুল খালিক, প্রবীর দাস ভানু, অলক, শ্যামল, আবদুল মান্নান, তসলিম বক্ত, মুফতি শফিক, মুফতি সাদিক, সরেকুম মোহাম্মদ মুকুল, মুন্সী মিয়া, নাক্কু, ঝিন্টু, জহির মিয়া, কাসেম, তনু, মিন্টু, রানা, বাবু, শহীদউদ্দিন, মিসির, তাহির, কন্টর, নীল, আজহর আলী, শফিকুর রহমান শফিক, লাড্ডু, মন্তাজুর রহমান মন্তাজ, কুটিল, তোফা, ইসমাইল, আবদুল হাই, মদরিস, আজমান, মাসুক, ওয়াহিদ বক্স, তেরা মিয়া, আবদুস সালাম রাজা, শাহজাহান, ফখরুল ইসলাম, মিসবাহউদ্দিন জায়গীরদার, বর্ধন, এ্যালেন ব্রীজ, চন্দ্রমণি, সাইদুর রহমান, সুনু, মুক্তার, আলী হোসেন, আবদুল হামিদ, হাবিবুর রহমান হাবিব, চুন্নু, মনসুর, সুলেমান, জগনুন, যাহেদ আহমদ চৌধুরী, নুরে আলম খোকন, আসদ্দর ভূঁইয়া, আবদুল মতিন সওদাগর, মকুল, রফিক, বেলায়েত হোসেন, ছালেহ আহমদ, হরিমোহন সিংহ, বিশ্বনাথ, বিমলেন্দু, ফয়েজ মোস্তাক প্রমুখ। আশির দশকে এবং বর্তমানে যাঁরা ফুটবলে দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন : রামা লুসাই, কায়সার হামিদ, মুক্তার হোসেন, রেহান উদ্দিন, দিলীপ দাস, জুয়েল রানা, মাহমুদ হোসেন কার্জন, মানু সিং, জালাল উদ্দিন, হাসান আলী বাদল, সমীরণ দাস, দিলীপ চৌধুরী, আকবর হোসেন, মো. সফিকউদ্দিন, বিজনবিহারী চক্রবর্তী, হানিফ আলম, সালাহউদ্দিন, ইউনুস মিয়া, গ্রীন, বুলবুল, নওশাদ, লিয়াকত, সেলিম, আলফাজ, টুটুল, রাহেল, ঝন্টু, আয়হান, আহাদ, সবুর, একরাম, রানা প্রমুখ।

এছাড়া ঢাকা ও সিলেটের মাঠে যে সকল তরুণ ফুটবল খেলোয়াড় তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁরা হলেন : পাপ্পু, মান্না, আলম, সাব্বির, দোলন, লুলু, মিন্টু, কয়েস, সলমান, ফয়জুল, মাহতাব, জমিরুল, ফুলাদ, সোহেল, মঙ্গল, লাল, ইকবাল, সুন্দর, মহসীন, নজমুল, চেরাগ, ওহাব, এহতেশাম, নূরুজ্জামান, দীপু, জাহান, সিরাজ, অবিনাশ, সোহাগ, হোসেন, রওশন, সফু, আইনুর, আরশাদ, দিলওয়ার, দিন্দু, বিদ্যুৎ, ফিরোজ, রতন, দীপুনূর, রাসেল, আজমান, বীরেন্দ্র, মিজান, কাসেম, জব্বার, তিতাস, ফারুক, আলমগীর, আনু, রঞ্জন, হেলাল, জামাল, মনোজ, বদরুল, উজ্জ্বল, বক্কর, নীলু, সাঈদ, মুক্তাদির, দুলাল, আলকাস, টিপু, প্রদীপ, শংকর, বেলাল, ধনু, লোকমান, কামরান, কামাল, মাহমুদ, তোতা, মোস্তাক, ফারুক, শহীদ, তছন, রাজ্জাক, ঝুলন, মইন, মাস্তান, গনি, রাহেল, মিনার, ইয়ামিন আহমেদ চৌধুরী মুন্না, তখলিছ আলী, ওয়াহেদ উদ্দিন, সাদ মিয়া, বিপুল আহমদ, মাসুক মিয়া জনি, মোহাম্মদ আব্দুল মতিন ও মনছুর আহমেদ প্রমুখ।

বর্তমানে সিলেট স্টেডিয়ামকে কেন্দ্র করে ফুটবল প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এখন সিলেটে নিয়মিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লিগ হচ্ছে। সিলেট স্টেডিয়ামে ১৯৭৪ ও ১৯৮০ সালে জাতীয় ফুটবলের আঞ্চলিক খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে এমসি কলেজ মাঠে চট্টগ্রাম বিভাগীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। এতে সিলেট জেলা রানার্সআপ হয়। এ ছাড়া ১৯৬৫ ও ১৯৬৯ সালে চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফুটবলে সিলেট জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়।

১৯৮৩ সালে সিলেট স্টেডিয়ামে শেরে বাংলা কাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট এই প্রতিযোগিতায় ২-০ গোলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। এই খেলায় সিলেট দলের খেলোয়াড় ছিলেন কার্জন, কায়সার হামিদ, শফিক, মানু সিং, দীলিপ দাস, রামা লুসাই, আকবর, ভুলু, মনু, এমিলি ও বিজন চক্রবর্তী (অধিনায়ক)। এর মধ্যে ভুলু, মনু ও এমিলি ছিলেন অন্য জেলার অধিবাসী, খেলাটি পরিচালনা করেন আবদুল জলিল চৌধুরী যিনি ফিফা ব্যাজ লাভ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। সিলেটে অবশ্য ফিফা ব্যাজধারী আরো একজন লাইন্সম্যান আছেন, তার নাম ফয়জুল ইসলাম আরিজ।

বর্তমান সিলেটের ফুটবল অঙ্গানের প্রধান চার শক্তি মোহামেডান, আবাহনী, গ্লোরিয়ার্স ও বঙ্গবীর অগ্রগামী। মোহামেডান ক্লাবের গোড়াপত্তন ঘটে ১৯৫৮ সালে। বাকি তিনটি ক্লাবের জন্ম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর। ১৯৭২ সালে ৩৮টি দল নিয়ে ফুটবল লিগ হতো। দিনে দিনে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে ১৯৭৭ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লিগ চালু করার সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৮টি দলকে বিলুপ্ত করে ১০টি দল নিয়ে প্রথম বিভাগ ও ২০টি দল নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লিগ হচ্ছে।

সিলেটের ফুটবল-ইতিহাসে ১৯৭৭ সালের ১ জুলাই কলঙ্কিত দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ দিন সিলেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ রাইফেলস্ বনাম পুলিশ দলের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ চলাকালে একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে এক সংঘর্ষ বাধে। এ সংঘর্ষে বাংলাদেশ রাইফেলস দলের তিনজন খেলোয়াড় পুলিশ দলের খেলোয়াড় ও সমর্থকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। পরে এর প্রভাব সমগ্র সিলেট শহরে ছড়িয়ে পড়লে আরো শতাধিক লোক আহত হন। স্থানীয় প্রশাসন শহরে কারফিউ জারি করে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পরে এ দুদলকে সিলেটের ফুটবল থেকে চিরদিনের জন্য বহিষ্কার করা হয়, যা আজও বহাল।

প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগের ক্লাবসমূহের তালিকা

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, আবাহনী ক্রীড়া চক্র, লাউয়াই স্পোর্টিং ক্লাব, শাহ স্পোর্টিং ক্লাব লাউয়াই, গ্লোরিয়ার্স স্পোর্টিং ক্লাব, সিলেট স্পোর্টিং ক্লাব, সিলেট ইউনাইটেড ক্লাব, কসমস ক্লাব, জালালাবাদ ক্লাব, বঙ্গবীর অগ্রগামী ক্রীড়া চক্র, জনতা ক্লাব, সিলেট টাউন ক্লাব, শহীদ বাছির অগ্রগামী ক্লাব, আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব, বীর বিক্রম ইয়ামিন ক্রীড়া চক্র।

ক্রিকেট

সিলেটে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ও ঐতিহ্য শত বছরের, তবে সিলেটে কখন ক্রিকেট খেলা শুরু হয় তার প্রকৃত সাল-তারিখ কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। শতাধিক বছর আগে চা-বাগানের ইংরেজ ম্যানেজার ও সিলেটের জমিদার পরিবারগুলোর উদ্যোগে সিলেটে ক্রিকেট শুরু হয়। তখন হাতেগোনা কয়েকজন খেলোয়াড় সিলেটের পুলিশ লাইন মাঠ, আলিয়া মাদরাসা মাঠ, বর্তমান সদর হাসপাতাল নির্মিত হওয়ার আগের খোলা মাঠ, এমসি কলেজ মাঠ ও বিভিন্ন চা-বাগান মাঠে শীত মৌসুমে ক্রিকেট খেলা হতো। শ্রীমঙ্গলের বালিশিরা চা-বাগান মাঠ ক্রিকেট খেলার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করে। বর্তমানে সিলেট স্টেডিয়ামে নিয়মিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগ হচ্ছে। ক্রিকেটের জনপ্রিয়তাও অনেক বেড়েছে। ইতোমধ্যে বিদেশি ক্রিকেট দল সিলেট স্টেডিয়ামে ক্রীড়া প্রদর্শন করে গেছে। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে শ্রীলঙ্কা ও সিঙ্গাপুর যুব ক্রিকেট দল এশিয়া যুব ক্রিকেট খেলেছে সিলেট স্টেডিয়ামে। ১৯৮৯ সালের ১২ ডিসেম্বর শ্রীলঙ্কা বনাম সিঙ্গাপুর এবং ১৪ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুর বনাম বাংলাদেশের খেলা হয়। এছাড়া ১৯৯৫ সালের ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি এবং ১ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে হংকং, কেনিয়া ও হায়দরাবাদ একাদশের সাথে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল তিনটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে।

সেকালে এবং একালে ক্রিকেট খেলে অনেকেই খ্যাতি অর্জন করেন। এদের মধ্যে অনেকেই বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে গেলেও এখনো সিলেটের ক্রীড়ামোদী দর্শকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। তাঁরা হলেন : মামুনুর রশীদ চৌধুরী, এম এ রউফ বাচ্চু, এম এ আজিজ, এম আহমদ, মানিক, সিরাজুল ইসলাম, রণজিৎ দাস, ডা. রুহুল আমিন, দৌলা, বাবু, মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী আশিক, পঙ্কজ, সুকুমার, ফয়সল আহমদ, লুকু, মুহিত, বদরউদ্দিন, মঈন, ফয়েজ

আহমদ, ফেরদৌস আহমদ চৌধুরী, হেলাল আহমদ চৌধুরী, শফিকুল হক হীরা, শহীদউদ্দিন মিসির, ফরহাদ আহমদ চৌধুরী, মোহাম্মদ ফারুক আহমদ, আলী হোসেন, জিয়া, নাসিম, হারুন আহমদ, বুড্ডু, আজমল, ইমতিয়াজ, আতাউর রহমান আতা, জুনেদ আহমদ, মো. শামসুদ্দিন, সরেকুম মো. সানু, মুস্তাক আহমদ, ইসমত চৌধুরী, নিশীথ, কিশোর, বিরাজমাধব চক্রবর্তী মানস, সুপ্রিয় চক্রবর্তী রঞ্জু, শংকর, জুবের আহমদ চৌধুরী, নাহাস আহমদ চৌধুরী, শাহরুখ আহমদ চৌধুরী, বাবুল মুফতি খসরু, মুফতি সাহেদ, আতিক মাহমুদ, মুরাদ আহমদ, আজিজ আহমদ সেলিম, আলী আশরাফ চৌধুরী খালেদ, টিপু মজুমদার, মাসুক আহমদ, হীরা, শাহিদ মোবারক, জিন্নুর চৌধুরী দীপু, মোমিন চৌধুরী, ইয়ামিন চৌধুরী, আবুল কাশেম ভুলু, মুফতি মুন্না, গোলাম মোহাম্মদ রুস্তম, জাকির আহমদ কোরেশী, সোহেল আহমদ, যাহেদ আহমদ চৌধুরী, জাহেদ আহমদ, নেহাল হাসনাইন, গোলাম ফারুক সুরু, মকবুল হায়দার রেজভী, আহমদ জুলকারনাইন, বদরুদ্দোজা বদর, হানিফ আলম, সোহেল হামিদ, রিপন, মণি, জাহিন, তারিন মজুমদার, ফয়েজ, জালালউদ্দিন, মিসবাহউদ্দিন, তারেক আহমদ, অপু, সুজক, সুমন, মিনহাজ, কায়কোয়াস, জয়, রাহাত, জাহাঙ্গীর, রফি, তাহের, আনোয়ার, রুমেল, শাহেদ, রাজ, রাজা, বুলবুল, হিমু, হাসান, মঞ্জু, বদর, সিদ্দেক, বকুল, জামালউদ্দিন, আরিফ, রকিব, তমাল, শাহীন, সোহেল, নাহিদ, আমিন, জওসন, রানু, সেলিম, সালাউদ্দিন, পারভেজ, মওদুদ, হাসিবুল হাসান শান্ত, সলমান, লোকমান, মামুন, রনি, মিন্টু, সুমন, পল, জাহাঙ্গীর, জিসান, প্রলয়, নাদির, আমিন, তুষার, ফরহাদ, নাদিম, জাফর, কাবী, রাজিব, রাহাত, তাপস, মৃদুল, রিংকু, সামু, সঞ্চন, মিন্টু, রাহেল, মঞ্জুর, তমাল, কাজল, শাকিল, আদনান, ইমরান রহিম, এন্টু, মারজান, রঞ্জু, আবিদ, জাবেদ, টিটু, ওয়াসিম আহমদ চৌধুরী, নাসিম আহমদ চৌধুরী, ফয়সল প্রমুখ।

১৯৮৩ সালে নবম জাতীয় ক্রিকেটে সিলেট চ্যাম্পিয়ন হয়। সিলেট স্টেডিয়ামে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট ঢাকা জেলা দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। সিলেট দলে খেলেন রেজা, জিন্নুর, নেহাল, সুরু, সোহেল হামিদ, নাদির শাহ্, লিপু, ওয়াহিদ, মোহন, পাপলু, সাথী ও কার্জন। ফাইনালে নেহাল 'ম্যান অব দ্যা ম্যাচ' হন। পঞ্চম জাতীয় যুব ক্রিকেটে ১৯৮৩ সালে সিলেট রানার্সআপ হয়। এ প্রতিযোগিতা সিলেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে সিলেটকে হারিয়ে ময়মনসিংহ চ্যাম্পিয়ন হয়। সিলেট দলে খেলেন জুবের, নওশাদ, রেজভী, হাসান, কার্জন, তারিন, সোহেল, পাপলু, কিসমত, হানিফ ও লোকমান। এছাড়া সিলেট জেলা ক্রিকেট দল ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে জাতীয় ক্রিকেটে পর পর দুবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছে। খেলা দুটি হয়েছিল ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে।

সেকালে উল্লেখযোগ্য ক্রিকেট ক্লাবগুলোর মধ্যে ছিল ক্রিসেন্ট ক্লাব, স্যাটেলাইট স্পোর্টিং, মুসলিম কালচার, ডায়মন্ড স্পোর্টিং, ইগলেটস ক্লাব, স্টেশন ক্লাব,

জালালাবাদ ক্লাব, ইউনাইটেড ক্লাব, ইসমাইল স্পোর্টিং, শেখঘাট পাইওনিয়ার্স, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, এ্যাপোলো ১১ ক্লাব, শেখ মুজিব ক্রীড়া চক্র, ইয়ুথ সেন্টার ক্লাব, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং প্রভৃতি।
উল্লেখযোগ্য ক্রিকেট ক্লাবগুলো হচ্ছে: জিমখানা ক্লাব, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, অনির্বাণ ক্রীড়া চক্র, স্টার ইউনাইটেড, এ্যাপোলো ১১, বঙ্গবীর অগ্রগামী, ইয়ং ভিক্টোর ক্লাব, ইলেভেন ব্রাদার্স, মুনলাইট, ইয়ুথ সেন্টার, শেখঘাট পাইওনিয়ার্স, জালালাবাদ ব্লু, নবাগত ক্রীড়া সংস্থা, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ইয়ং প্যাগাসাস ক্লাব, বীর বিক্রম ইয়ামিন ক্রীড়া চক্র প্রভৃতি।

সিলেটের বেশ কজন ক্রিকেট খেলোয়াড় এ পর্যন্ত জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। এরা হচ্ছেন : শফিকুল হক হীরা, নেহাল হাসনাইন, গোলাম ফারুক সুরু, নাহিদ আহমেদ, পারভেজ আহমদ, তাপস বৈশ্য, অলক কাপালী, রাজিন সালেহ, এনামুল হক জুনিয়র, আবুল হোসেন রাজু ও আবু জাহেদ রাহী। এর মধ্যে শফিকুল হক হীরা বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়ক ও ম্যানেজার হওয়ার সম্মান লাভ করেন। এছাড়া রয়েছেন জাতীয় ক্রিকেট কোচ জালাল আহমদ চৌধুরী। তিনি ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবেও সুপরিচিত। বিসিসিবির নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শওকত উসমান জুবের, ইমরান চৌধুরী ও বর্তমানে শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল।

ভলিবল

সিলেটের হাটে-মাঠে, গ্রামেগঞ্জে ও শহরের আনাচেকানাচে যে খেলাটি সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করেছে তা হলো ভলিবল। এর প্রধান কারণ হলো কমখরচে ছোটো মাঠ বা স্বল্প জায়গায় ভলিবল খেলার আয়োজন করা যায়। ভলিবলে সিলেটের গৌরবোজ্জ্বল অতীত রয়েছে। সিলেটের মিসবাহউদ্দিন চৌধুরী পাকিস্তান আমলে পূর্ব-পাকিস্তানের একজন নিয়মিত ভলিবল খেলোয়াড় ছিলেন। ষাটের দশকে তিনি পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলার ডাকও পেয়েছিলেন। কিন্তু বাঙালি হওয়ার কারণে তাঁকে জাতীয় দলের নিয়মিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সিলেট স্টেডিয়ামে ভলিবল লিগ শুরু হয়, যা প্রায় প্রতি বছর হচ্ছে। ১৯৭৫ সালে সিলেটে তৃতীয় ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ ও ১৯৮৬ সালে জাতীয় যুব ভলিবলে সিলেট জেলা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ দুটি প্রতিযোগিতা সিলেট স্টেডিয়ামে হয়েছিল। বাংলাদেশ জাতীয় ভলিবল দলের সাথে ১৯৭৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের উজবেক ভলিবল দল সিলেট স্টেডিয়ামে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে। বাংলাদেশ জাতীয় দলে সিলেটের কৃতী ভলিবল খেলোয়াড় সিরাজুল ইসলাম বাদশা খেলেছিলেন। পরবর্তীকালে সিলেটের আরো দুজন ভলিবল খেলোয়াড় বাংলাদেশ জাতীয় ভলিবল দলের পক্ষে খেলার সুযোগ লাভ করেছিলেন, এই দুজন হচ্ছেন মোস্তাক ও এনাম। এছাড়া সিলেটের যে কজন খেলোয়াড় ভলিবলে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে

দর্শকনন্দিত হতে পেরেছিলেন তারা হচ্ছেন: নজমুল, তনু, মিসবাহ, নাক্কু, অসিত, রাজা, মঙ্গাল, রানা, বাবু, কৃষ্ণ, সুইট, গ্রীন, বাদল আলী প্রমুখ।

লন টেনিস লন টেনিসে সিলেটের রয়েছে আলাদা ঐতিহ্য। অতীতে সিলেটের বিভিন্ন চা-বাগান, সিলেট স্টেশন ক্লাব, এমসি কলেজ প্রভৃতি স্থানে নিয়মিত লন টেনিস প্রতিযোগিতা হতো। খেলোয়াড়ের সংখ্যাও কম ছিল না। তবে ব্রিটিশ শাসনামলে চা-বাগানে কর্মরত ইংরেজ ম্যানেজাররাই ছিলেন মূল খেলোয়াড়। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে সিলেটের কয়েকজন খেলোয়াড় লন টেনিসে অংশ নিয়ে সিলেটে লন টেনিসকে সমৃদ্ধ করেন এবং এ খেলা জনপ্রিয় করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : আমীনুর রশীদ চৌধুরী, সলমান চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মহিউস সুন্নত চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, আবদুল জলিল চৌধুরী, কাজী ফজলুর রহমান, ফখরউদ্দিন আহমদ, ডব্লিউ করিম, কিউ এইচ খান, ফারুক আহমদ প্রমুখ। ষাটের দশকে সিলেটে লন টেনিসে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এরা হচ্ছেন- কাতিল ও তাঁর স্ত্রী বেগম কাতিল, মোল্লা ও বেগম মোল্লা, সাইফ খান ও তাঁর স্ত্রী বেগম সাইফ, আজিজ আহমদ, জিয়াউস সামস চৌধুরী, হুমায়ুন কবীর, তবারক আলী, আহমেদ শামীম চৌধুরী, নাসিরউদ্দিন আহমদ, শোয়েব চৌধুরী, গোলাম রহমান, শওকত আলী, আবদুর রউফ বাচ্চু, মাহবুবুর রহমান, হুসাম মোহাম্মদ চৌধুরী প্রমুখ। এদের মধ্যে সলমান চৌধুরীর তিন পুত্র জিয়াউস সামস্ চৌধুরী, আহমেদ শামীম চৌধুরী ও হুসাম মোহাম্মদ চৌধুরী ১৯৬২-৬৩ দুবছর পূর্বপাকিস্তান স্টুডেন্ট টেনিস চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ডক্টরেট ডিগ্রি নেওয়ার প্রাক্কালে লন টেনিসের একজন খ্যাতিমান খেলোয়াড় হিসেবে New Orients Bicentennial Commission কর্তৃক প্রশংসাপত্র লাভ করেন। এ ছাড়াও লন টেনিসের Yulane University চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করা ছাড়াও Lousiana State চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন একাধিকবার। ১৯৭০ সালে কানাডায় অবস্থানকালে তিনি কিছুদিন সে দেশের ‘কানাডা, লন্ডন, হান্ট অ্যান্ড কান্ট্রি ক্লাব’- এর গ্রীষ্মকালীন কোচিং পরিচালনাও করেছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেশ ক’বছর লন টেনিস খেলা বন্ধ থাকলেও পর পুনরায় এর প্রসার ঘটে। চা-বাগানগুলো ছাড়াও সিলেট স্টেশন ক্লাব, সরকারি কর্মচারী বিনোদন কেন্দ্র ও সিলেট স্টেডিয়াম-সংলগ্ন টেনিস গ্রাউন্ডে নিয়মিত লন টেনিস প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ১৯৮২ সালে সিলেটে টেনিস গোল্ডকাপ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। সিলেট স্টেশন ক্লাবের আজীবন সদস্য আমীনুর রশীদ চৌধুরীর নামে ‘আমীনুর রশীদ চৌধুরী গোল্ড ট্রফি টেনিস প্রতিযোগিতা’ ১৯৮৩ সালে শুরু হয়। সিলেটে সবচেয়ে বড়ো ও ব্যয়বহুল এ প্রতিযোগিতা একসময় অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এ প্রতিযোগিতা সিলেট স্টেশন ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্লাবগ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হতো। সিলেট স্টেডিয়াম-সংলগ্ন গ্রাউন্ডে ১৯৮৮ সালে গোল্ডলিফ লন

টেনিস প্রতিযোগিতা, ১৯৯০ সালে ফিলিপস টেনিস প্রতিযোগিতা ও ১৯৯৫ সালে ডিএসএ কাপ টেনিস প্রতিযোগিতা লন টেনিস খেলোয়াড় ও টেনিস-আমোদী দর্শকদের মাঝে বেশ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে লন টেনিস খেলে যাঁরা নন্দিত হয়েছেন তাঁরা হলেন মহীউদ্দিন আহমদ, সালেহ আহমদ ফারুকী, আজিজুল মালীক চৌধুরী, আবদুল মুমিন, আবদুর রহমান, আবদুল মুকিত খান, মফিজুর রহমান তিতন, ফরিদউদ্দিন আহমদ, নিরঞ্জন পাল, আবু হোসেন, নজরুল ইসলাম, মেজর জেনারেল আজিজুর রহমান, ব্রিগেডিয়ার আবদুর রব, মহীউদ্দিন নান্টু, ইমরান চৌধুরী, শওকত আলম, মো. শফিক, মাসুদ আহমদ, আকমল, আকমল হোসেন, মীর হাসমত উল্লাহ, পারভেজ আহমদ, সুধাংশু সাহা, গোলাম মোহাম্মদ শিবলী, সিথি প্রমুখ। এর মধ্যে ইমরান চৌধুরী জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

অ্যাথলেটিক্স

সিলেটের অনেক খেলোয়াড় অ্যাথলেটিক্সে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনামলে আশরাফ আলী সাড়ে উনিশ ফুট লং জাম্প দিয়ে তৎকালীন আসাম প্রদেশে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। পরে রাইসুজ্জামান চৌধুরী বিশ ফুট অতিক্রম করে এ রেকর্ড ভাঙেন। এ রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছিল আসাম অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায়। সেকাল এবং একালে অ্যাথলেটিক্সে যারা কৃতিত্ব অর্জন করে সিলেটের ক্রীড়াঙ্গনে নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নাসিরউদ্দিন, মুজিবুর রহমান, হারিস উদ্দিন, বশির উদ্দিন, আবদুল হামিদ, মিসবাহ উদ্দিন, এম এ খালেক, আবেদা চৌধুরী, নূর রওশন চৌধুরী, লোকমান আহমদ, সুহেদ-উদ-জামান, মো. শফিকউদ্দিন, মোস্তাক আহমদ, সাঈদুর রব, মঈন বখত মজুমদার, নুরুল আম্বিয়া, নুরুল আলম, তৌহিদ আহমদ, আবদুল মালিক, রানা ফেরদৌস চৌধুরী, জেসমিন খালেদ, রোকেয়া বেগম রাখী, আবদুল রহিম বাদশা, সমীরণ দে, শামীম আরা চৌধুরী, জৌসানী লুসাই, ফাতেমা বেগম, তামান্না পারভীন, আবদুর রউফ পাশা, রহিম, মিলু, অনিন্দিনী সিনহা, আলেয়া বেগম, শাহানারা বেগম রেনু, জাহানারা বেগম লক্ষ্মী, মনোয়ারা বেগম মণি, লাভলী বেগম, মারিয়ান চৌধুরী প্রমুখ।

পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান অলিম্পিকে বশিরউদ্দিন বর্শা নিক্ষেপে জাতীয় রেকর্ড ও হারিসউদ্দিন পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্সে ১০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড সৃষ্টি করে দ্রুততম মানব হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

হকি

সিলেটে হকি খেলার রয়েছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। কালের স্রোতে এখন তা অনেকটাই ম্লান। যদিও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রায় নিয়মিত লিগ ও টুর্নামেন্ট হচ্ছে। সেকালে এবং একালে যে-কজন হকি খেলোয়াড় দর্শকনন্দিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মাহমুদুর রহমান মোমিন, রণজিৎ দাস, রামা লুসাই, ডনডন লুসাই, থাংলুরা লুসাই, আবদুস সালাম খান রাজা, এনায়েত আহমদ, মোস্তাক আহমদ, হাসান আহমদ, জুম্মন লুসাই, রহমত আলী, মিজানুর রহমান

মিজান, মনা দে, নিশি দে, আনোয়ার বক্স সুদন, সাদউদ্দিন, আখতার আহমদ, লুৎফুল কবীর চৌধুরী রুমী, আলা বক্স রুকন, মুজিবুর রহমান, হানিফ আলম, শরীফ হোসেন গ্রীন, মুকুল, বিয়াকা লুসাই প্রমুখ। এদের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলে খ্যাতি অর্জন করেছেন রামা লুসাই, ডনডন লুসাই, জুম্মন লুসাই ও বিয়াকা লুসাই, তুহিন, বাপন, নান্নু ও মশবির। ১৯৭৯ সালে সিলেট স্টেডিয়ামে ষষ্ট জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেটের হকি খেলার অগ্রযাত্রায় সিলেট পুলিশ লাইনের রিজার্ভ পুলিশ ও পুলিশ লাইনের টিলার উপরের মাঠের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

হকি লিগের ক্লাবসমূহ মৌসুমী ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ সংস্থা, ইয়ং স্টার স্পোর্টিং ক্লাব, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব, ইয়ং ভিক্টর ক্লাব, জালালাবাদ ক্লাব, সিটি স্পোর্টিং ক্লাব, রেড নবাগত ক্রীড়া সংস্থা, হোয়াইট মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, কাজীটুলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, দি এইডেড হাই স্কুল, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ইসমাইল স্পোর্টিং ক্লাব।

বাস্কেটবল পাকিস্তান আমলে সিলেটের স্কুল ও কলেজগুলোতেই শুধু বাস্কেটবল খেলার মাঠ ছিল। তাই এই খেলা শুধু স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আশির দশকের শুরুতেই সিলেট স্টেডিয়ামে বাস্কেটবল গ্রাউন্ড নির্মিত হলে সিলেটে বাস্কেটবল খেলার প্রসার ঘটতে থাকে। তবে তা এখনও পুরোপুরি জনপ্রিয় হতে পারেনি। লিগও হচ্ছে অনিয়মিত। ফলে উল্লেখ করার মতো এখনও কোনো খেলোয়াড় সৃষ্টি হয়নি। ১৯৮৩ সালে সিলেট স্টেডিয়ামে সপ্তম জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য খেলাধুলা সিলেট স্টেডিয়ামে ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সপ্তম জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বিপুল সাড়া জাগে ক্রীড়ামোদী মহলে। সাইক্লিং এ শহরের আম্বরখানার অধিবাসী বশির আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য।

খেলাধুলার অঙ্গানে সমর্থকদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। সারা দেশের মতো সিলেটেও রয়েছে মোহামেডান ও আবাহনী সমর্থক গোষ্ঠী। এরাও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করে থাকে। মোহামেডান ফ্যান ক্লাব, আম্বরখানা কলোনি শাখা আয়োজিত প্রতিবছর বিজয় দিবসের ভোরে মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। 'জেট মিনি ম্যারাথন' নামে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত এ দৌড় প্রতিযোগিতা সিলেট বিভাগে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও মিনি ম্যারাথনে দৌড়বিদরা অংশ নিচ্ছেন।

মোহাম্মদ আলী জিমনেসিয়াম ও স্টেডিয়ামের উন্নয়ন ১৯৭৮ সালের ৭ ডিসেম্বর বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী সিলেট সফরে এলে তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী ভেরনিকা আলীকে লাক্কাতুরা চা-বাগানসংলগ্ন গলফ ক্লাবে এক নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর সিলেট সফরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সিলেট স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে ওই দিন 'মোহাম্মদ আলী জিমনেসিয়াম'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং

তার দীর্ঘদিন পর ১৯৮২ সালে নির্মাণকাজ শুরু ও ১৯৮৬ সালে কাজ সমাপ্ত হয়। এ জিমনেসিয়ামে কোনো প্রকার জিমন্যাস্টিক না হলেও নিয়মিত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ও বইমেলা হচ্ছে।

১৯৮৩ সালে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে গ্যালারি নির্মাণ এবং ১৯৮১ সালে বাস্কেটবল গ্রাউন্ড ও গ্যালারি এবং ১৯৮৭ সালে টেনিস কোর্ট নির্মাণের পর ১৯৯৪ সালে স্টেডিয়ামের ব্যাপক সংস্কার করা হয়। উত্তর দিকের পুরোনো গ্যালারি ভেঙে নতুন গ্যালারি নির্মাণ ও মাঠের সংস্কার করা হয়।

সিলেটের ক্রীড়াসংগঠন

সিলেট জেলার খেলাধুলার উন্নয়ন ও প্রসারে জেলা ক্রীড়া সংস্থা অনুমোদিত যে ৫১টি ক্লাব ভূমিকা পালন করে চলেছে সেসবের তালিকা দেওয়া হলো : ১. অনির্বাণ ক্রীড়া চক্র, ২. অগ্রদূত ক্রীড়া চক্র, ৩. আবাহনী ক্রীড়া চক্র, ৪. আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব, ৫. ইয়ুথ সেন্টার ক্লাব, ৬. ইয়ং ভিক্টোর ক্লাব, ৭. ইলেভেন ব্রাদার্স ক্লাব, ৮. ইসমাইল স্পোর্টিং ক্লাব, ৯. ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব, ১০. এইডেড হাইস্কুল, ১১. এ্যাপলো ১১ ক্লাব, ১২. এ্যাপলো-১২ ক্লাব, ১৩. ওয়ান্ডারার্স স্পোর্টিং ক্লাব, ১৪. কসমস ক্রীড়া চক্র, ১৫. কালীঘাট অগ্রগামী ক্রীড়া চক্র, ১৬. কাজীটুলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ১৭. গ্লেরিয়ার্স স্পোর্টিং ক্লাব, ১৮. চৌহাট্টা ক্রীড়া চক্র, ১৯. চতুরঙ্গ যুব সংঘ, ২০. জালালাবাদ স্পোর্টিং ক্লাব, ২১. জিমখানা ক্লাব, ২২. জনতা স্পোর্টিং ক্লাব, ২৩. টাউন ক্লাব, ২৪. টিলাগড় ক্লাব, ২৫. দক্ষিণ সুরমা ক্রীড়া চক্র, ২৬. নবাগত ক্রীড়া চক্র, ২৭. ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব, ২৮. বঙ্গবীর অগ্রগামী ক্রীড়া চক্র, ২৯. মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ৩০. নবাগত ক্রীড়া চক্র, ৩১. বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ৩২. ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব. ৩৩. মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ৩৪. মুনলাইট স্পোর্টিং ক্লাব, ৩৫. মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব, ৩৬. মকন হাই স্কুল, ৩৭. মৌসুমী ক্রীড়া ও সমাজ কল্যাণ সমিতি, ৩৮. মৌসুমী সবুজ ক্রীড়া সংস্থা, ৩৯. রাজা জি সি হাই স্কুল, ৪০. রেড নবাগত ক্রীড়া চক্র, ৪১. লাউয়াই স্পোর্টিং ক্লাব, ৪২. শেখঘাট পাইওনিয়ার্স ক্লাব, ৪৩. শেখঘাট পাইওনিয়ার্স গ্রীন ক্লাব, ৪৪. শহীদ বাছির অগ্রগামী ক্লাব, ৪৫. সিলেট ইউনাইটেড ক্লাব, ৪৬. স্টার্স ইউনাইটেড ক্লাব, ৪৭. স্কাইল্যাব স্পোর্টিং ক্লাব, ৪৮. হিলটাউন ক্লাব, ৪৯. হোয়াইট মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ৫০. ইলেভেন স্টার ক্লাব ও ৫১. সিলেট স্পোর্টিং ক্লাব।

ক্রীড়ালেখক সমিতি

বাংলাদেশ ক্রীড়ালেখক সমিতি সিলেট জেলা শাখা সিলেট অঞ্চলের খেলাধুলার উন্নয়নে নানাভাবে ভূমিকা রাখছে। ১৯৭৪ সালের ২০ জুন এহিয়া রেজা চৌধুরীকে সভাপতি ও আলী আশরাফ চৌধুরী খালেদকে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ ক্রীড়ালেখক সমিতির সিলেট শাখা গঠিত হওয়ার পর ক্রীড়ালেখক সমিতি সেরা খেলোয়াড় ও সংগঠকদের সমিতির প্রতীক ‘ধাবমান হরিণ’ পুরস্কার দিয়ে আসছে। ১৯৭৫ সালে ফুটবলে ছাবির হোসেন, হকিতে রামা লুসাই, ক্রিকেটে ফরহাদ আহমদ চৌধুরী, ভলিবলে সিরাজুল ইসলাম বাদশা, অ্যাথলেটিক্সে নূরুল মান্নান, দাবায় ফাতেমা বেগমকে বছরের সেরা খেলোয়াড়ের

পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৭৬ সালের পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছেন ফুটবলে মো. শফিকুর রহমান, হকিতে রণজিৎ দাস, ক্রিকেটে শহীদউদ্দিন মিসির, ভলিবলে নজমুল ইসলাম, অ্যাথলেটিক্সে আবদুল মুনীম ও জেসমিন খালেদ, টেবিল টেনিসে পীযূষকান্তি ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ প্রবীর দাস ভানু ও সেরা সংগঠক কমরু মিয়া (ঝাড়ু ভাই)। ১৯৮৫ সালের আগে নয় বছর কোনো পুরস্কার দেওয়া হয়নি। ১৯৮৫ সালে ফুটবলে মোস্তাক আহমদ, ক্রিকেটে যায়েদ আহমদ চৌধুরী, হকিতে নিশি দে ও ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে বিরাজমাধব চক্রবর্তী মানস পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে পান ফুটবলে হাসান আলী বাদল, ক্রিকেটে আহমদ জুলকারনাইন, অ্যাথলেটিক্সে আবদুর রহিম বাদশা, হকিতে মিজানুর রহমান মিজান, সেরা ক্রীড়াসংগঠক মফিজুর রহমান তিতন। ১৯৮৭ সালে ফুটবলে দিলীপ দাস। ১৯৮৮ সালে ফুটবলে ইউনুস আলী, ক্রিকেটে মকবুল হায়দর রেজভী, হকিতে জুম্মন লুসাই, ভলিবলে স্বরূপ দেওয়ানজী, বাস্কেটবলে নাহিদ দীন আসাদ, অ্যাথলেটিক্সে আবদুর রউফ পাশা ও লাভলী বেগম, রেফারি (ফুটবল) আবদুল জলিল চৌধুরী, আম্পায়ার (ক্রিকেট) আলী আশরাফ চৌধুরী খালেদ ও সেরা ক্রীড়াসংগঠক হিসেবে রণজিৎ দাস পুরস্কৃত হন।

সিলেটের কৃতী খেলোয়াড় ও ক্রীড়াসংগঠক

সিলেটের ক্রীড়াজগৎ এমন কিছু কৃতী খেলোয়াড়ের জন্ম দিয়েছে যাঁরা অতীত ও বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে সিলেটের গৌরব যেমনি বাড়িয়েছেন তেমনি দেশ-বিদেশে ক্রীড়ামোদীদের মনে করে নিয়েছেন স্থায়ী আসন। এর মধ্য থেকে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে হলো :

প্রেমদারঞ্জন দাস

সিলেট শহরের মির্জাজাঙ্গালের অধিবাসী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও ১৯২০ সালের কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। বিশ ও ত্রিশের দশকে তিনি সিলেটে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ক্লাব 'টাউন ক্লাব'-এর একজন নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিম সিলেটে খেলতে আসে এবং টাউন ক্লাবের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত হয়। প্রেমদারঞ্জন দাস সে খেলায় একটি চমৎকার গোল করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ক্রীড়াসংগঠক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর পুত্র ভানু দাসও সিলেটের ফুটবল জগতের একজন উঁচুমানের খেলোয়াড় ছিলেন।

হাজী জহুর বক্স

সিলেটের ফুটবল অঙ্গনে একজন খ্যাতিমান খেলোয়াড় ছিলেন হাজী জহুর বক্স। সিলেট শহরের জল্লারপারের অধিবাসী ছিলেন তিনি। বিশ ও ত্রিশের দশকে 'টাউন ক্লাব'-এর পক্ষে খেলতেন। ১৯৩৪ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিমকে হারানোর পেছনে তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

মুফতি রুকনউদ্দিন আহমদ

সিলেট শহরের দরগা মহল্লার অধিবাসী মুফতি রুকনউদ্দিন আহমদ বিশ ও ত্রিশের দশকে কিংবদন্তিতুল্য ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। 'টাউন ক্লাব'-এর স্টপার ব্যাক হিসেবে তিনি ১৯৩৪ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিমকে পরাজিত করতে অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

কালীসদয় কর

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজা জি সি হাইস্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক কালীসদয় কর একজন ক্রীড়াসংগঠক হিসেবে আজও খ্যাতিমান হয়ে আছেন। ১৯৪৭ সালে বেদার বখত মজুমদারকে সাথে নিয়ে তিনি প্রথম ‘ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন’ গঠন করেন। সিলেটের খেলাধুলাকে সমন্বয় ও সংগঠিত করার জন্য কালীসদয় করের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটি এখন ‘জেলা ক্রীড়া সংস্থা’ হিসেবে পরিচিত।

এএইচএ কাহের

সিলেট শহরের শেখঘাটের অধিবাসী এ এইচ এ কাহের ছিলেন একাধারে একজন কৃতী ফুটবল খেলোয়াড়, ফুটবল রেফারি ও ক্রীড়াসংগঠক। ১৯২৮ সালে এমসি কলেজ দলের অধিনায়ক হিসেবে খেলার মাঠে পা ভাঙলে তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি একজন নামকরা ফুটবল রেফারি ছিলেন এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ‘ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের’ সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৫১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করে তিনি ক্রীড়াসংগঠক হিসেবে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৩২ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন।

বিমলেন্দু দাস (সাধু বাবু)

সিলেটের শেখঘাটের অধিবাসী কৃতী ফুটবল খেলোয়াড় এবং একজন শক্তিমান ক্রীড়া সংগঠক। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায়ই ১৯৫৭ সালে তৎকালীন জেলা প্রশাসক আই এইচ উসমানী বর্তমান স্টেডিয়াম মাঠ জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাছে হস্তান্তর করেন। এর আগে এ মাঠ সিলেট সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৬১ সালে ড. আই এইচ উসমানী বদলি হলে জেলা প্রশাসক হিসেবে আসনে এসএম ওয়াসেম। এ সময় বিমলেন্দু দাস (সাধু বাবু)-এর প্রচেষ্টায় সিলেট স্টেডিয়াম নির্মিত হয়।

মামুনুর রশীদ চৌধুরী

সিলেটের বিশিষ্ট ‘রশীদ’ পরিবারের সন্তান মামুনুর রশীদ চৌধুরী ছিলেন একজন নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড় ও বিশিষ্ট ক্রীড়াসংগঠক। বর্তমানে আম্বরখানা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইয়ের অধিবাসী। মামুনুর রশীদ চৌধুরী সিলেটের একমাত্র ব্যক্তি যিনি ক্রীড়া ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য ভারতের ঐতিহ্যবাহী আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু লাভের দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সিলেটে ক্রিকেট খেলার প্রসার ঘটে।

মো. কামরুজ্জামান

সিলেট শহরের দাড়িয়াপাড়া নিবাসী শিল্পঋণ সংস্থার প্রাক্তন ব্যবস্থাপক মো. কামরুজ্জামান ছিলেন একজন স্বনামধন্য ফুটবল খেলোয়াড়। তিনি চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে জিমখানা ও পুলিশ দলের হয়ে ঢাকার প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে খেলেছেন। তিনি তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে বাংলায় নির্মিত প্রথম ছায়াছবি ‘মুখ ও মুখোশ’-এ অভিনয় করেন।

মো. আবদুল করিম সিলেট শহরের আম্বরখানার অধিবাসী বিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় এবং সিলেট জেলা দলের একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৪৮ সালে কোলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সিলেট সফরে এলে মো. আবদুল করিম সিলেট দলের অধিনায়ক হিসেবে খেলে একটি চমৎকার গোল করে কোলকাতা মোহামেডানের কাছ থেকে ১১০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সিরাজ উদ্দিন আহমদ সিলেট শহরের মিরের ময়দানের অধিবাসী সিরাজ উদ্দিন আহমদ বিশ শতকের চল্লিশের দশকের একজন নামী ফুটবলার ছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি আসাম প্রদেশের ডিব্রুগড় জেলা একাদশের খেলোয়াড় মনোনীত হন। তিনি একজন ক্রীড়াসংগঠক ও রেফারিও ছিলেন। ১৯৪৯ সালে থেকে এখনো পর্যন্ত সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাথে সক্রিয় রয়েছেন। তিনি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি জালালাবাদ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি ১৯৫৯ সালে আমেরিকার International Recreation Association থেকে Recreation Specialist হিসেবে ট্রেনিং গ্রহণ করেন।

আহমদ হক মুকুল সিলেট শহরের অদূরবর্তী বড়োশালার অধিবাসী স্বনামখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় আহমদ হক মুকুল ১৯৪৫ সালে আসাম শ্রেষ্ঠ একাদশের খেলোয়াড় হিসেবে বেতিয়া মহারাজা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে এবং ১৯৪৮ সালে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে একাদশের খেলোয়াড় হিসেবে আই্এফএ শিল্ড টুর্নামেন্ট অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি আগরতলা বুং বাহাদুর শিল্ড ও বদরপুর স্মিথ শিল্ডসহ বহু জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে তেজগাঁও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও ১৯৫১ সালে করাচি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন দলের খেলোয়াড় ছিলেন।

মো. কমরু মিয়া (ঝাডু ভাই) সিলেটে শহরের জল্লারপারের অধিবাসী মো. কমরু মিয়া ‘ঝাডু ভাই’ হিসেবে সিলেটের ক্রীড়াঙ্গনে সুপারিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি সিলেটের একজন নিবেদিতপ্রাণ ক্রীড়াসংগঠক হিসেবে খ্যাতিমান। পঞ্চাশের দশকে ভালো ফুটবল খেললেও তার মূল পরিচয় ক্রীড়াসংগঠক হিসেবে। মোহামেডান, হোয়াইট মোহামেডান, ইলেভেন ব্রাদার্সসহ আরও বহু ক্লাব তিনি সিলেটে প্রতিষ্ঠা করেন। তার তত্ত্বাবধানে সিলেটে বহু ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি খেলোয়াড় গড়ে উঠেছে যারা পরবর্তী সময়ে দেশ-বিদেশে খেলে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ওয়ালী আহমদ চৌধুরী সিলেট শহরের আম্বরখানা বড়ো বাজার নিবাসী পঞ্চাশের দশকের ফুটবল খেলোয়াড় এবং ষাটের দশকের বিশিষ্ট ক্রীড়াসংগঠক ওয়ালী আহমদ চৌধুরীর উদ্যোগে সিলেট মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়ায়। তিনি কয়েক বছর মোহামেডানের সভাপতি ও গত প্রায় ২০ বছর ধরে সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তিনি ১৯৭০-৭৬ সাল পর্যন্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার

যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বড়ো ভাই উবায়েদ আহমদ চৌধুরী চল্লিশের দশকে একজন কৃতী ফুটকলার ও ভালো রেফারি ছিলেন। উবায়েদ আহমদ চৌধুরীর জেষ্ঠ্য পুত্র আজিজ আহমদ সেলিম একজন ক্রিকেটার ও ক্রিকেট আম্পায়ার—১৯৮৫ সালে আম্পায়ারিং পরীক্ষায় সারা দেশে যিনি প্রথম হয়েছিলেন।

লুৎফুর রহমান লালু

সিলেটের দক্ষিণ সুরমার অধিবাসী পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কৃতী ফুটবল খেলোয়াড় ও ক্রীড়াসংগঠক লুৎফুর রহমান লালু সিলেটের প্রাচীন ক্লাব ইসমাইল স্পোর্টিং-এর প্রতিষ্ঠাতা, যার সভাপতি হিসেবে তিনি এখনো দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৯৭৬-৭৭ সালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং এখনো জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকাণ্ডের সাথে সক্রিয় আছেন।

মফিজুর রহমান তিতন

সিলেটের দক্ষিণ সুরমা নিবাসী ষাট-সত্তরের দশকের মধ্যমাঠের অত্যন্ত কৃতী খেলোয়াড় সত্তরের দশকে গ্লোরিয়ার্স স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন এবং সিলেটের ফুটবলে নতুন শক্তির উদ্ভব ঘটান।

রানী হামিদ

রানী হামিদ ৯ বার জাতীয় মহিলা দাবা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে প্রথম কিউ এম হোসেন আন্তর্জাতিক দাবা রেটিং টুর্নামেন্টে রানী হামিদ ১৩তম স্থান লাভ করে বাংলাদেশে প্রথম রেটিংধারী মহিলা দাবাড়ু হওয়ার সম্মান অর্জন করেন। ১৯৮৪ সালে লন্ডনে লয়েড ব্যাংক মাস্টারস দাবায় রানী হামিদ মহিলা মাস্টারের প্রথম নর্ম পূরণ করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি লন্ডনে তৃতীয় কমনওয়েলথ দাবায় মহিলা গ্রুপে রানার্সআপ হন এবং একই বছর লন্ডনে ব্রিটিশ মহিলা দাবা আবার চ্যাম্পিয়ন হন। তিনি ১৯৮৯ সালে লন্ডনে ব্রিটিশ মহিলা দাবায় তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনন্য গৌরব অর্জন করেন। ১৯৮৭ সালে রানী হামিদ ভারতে অনুষ্ঠিত প্রথম মহিলা গ্র্যান্ড মাস্টার টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে পঞ্চম হন। এই প্রতিযোগিতায় তিনি বিশ্ব শিরোপা চ্যালেঞ্জার রাশিয়ার মহিলা গ্র্যান্ড মাস্টার নোনা আলেকজান্দ্রিয়ার সাথে ড্র ও যুগোশ্লাভিয়ার গ্র্যান্ড মাস্টার লুজারবিককে পরাজিত করেন। রানী হামিদ ১৯৮৫ সালে 'আন্তর্জাতিক মহিলা মাস্টার টাইটেল' অর্জন করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা মাস্টার দাবাড়ু রানী হামিদ দাবাবিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ রচনাও করেছেন।

রামা লুসাই

সিলেট শহরের রিকাবীবাজারের অধিবাসী রামা লুসাই ফুটবল ও হকি খেলায় একজন দেশসেরা খেলোয়াড় হিসেবে ন্যাশনাল কালার হওয়ার দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন। সিলেট জেলা এবং ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল ও হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রামা লুসাই বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল ও হকি দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৭৬ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত কিংস কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম জাতীয় ফুটবল দলে এবং তেহরানে অনুষ্ঠিত ১৯তম এশিয়ান যুব ফুটবল ও জাতীয় দলের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। মধ্যমাঠের দুরন্ত খেলোয়াড় রামা লুসাই ১৯৭৭ সালে মালয়েশিয়ার জুনিয়র বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দলের পক্ষে খেলেন এবং ১৯৭৮ সালে

শ্রীলঙ্কায় অষ্টম এশিয়ান গেমসে এবং ১৯৮২ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপ হকিতে বাংলাদেশ দলের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। রামা লুসাই বাংলাদেশ 'ক্রীড়ালেখক সমিতি' কর্তৃক ১৯৭৪ সালে শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় এবং ১৯৮০ সালে বছরের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ (ফুটবল/হকি) নির্বাচিত হন।

কায়সার হামিদ সিলেট শহরের ছড়ারপাড় (কামালগড়)-এর অধিবাসী এম এ হামিদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দাবাড়ু রানী হামিদের জ্যেষ্ঠ পুত্র কায়সার হামিদ আশির দশকে দেশের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৮০ সালে সিলেট অগ্রগামী ক্লাবের মাধ্যমে ফুটবল যাত্রা শুরু, পরে ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন এবং ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে নিয়মিত খেলেছেন। জাতীয় দলে তিনি তিনবার অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। রক্ষণভাগের দেশসেরা খেলোয়াড় কায়সার হামিদ বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি কর্তৃক ১৯৮৬ সালে সেরা ফুটবলার এবং ১৯৮৮ সালে বছরের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হন।

রেহানউদ্দিন সিলেট জেলার রণকেলির অধিবাসী রেহানউদ্দিন চৌধুরী ১৯৮২ সালে সিলেট অগ্রগামী ক্লাবের মাধ্যমে ফুটবল খেলা শুরু করেন। তিনি দেশের সেরা দুই ক্লাব মোহামেডান ও আবাহনীর নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে ঢাকার প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। রক্ষণভাগের এই প্রতিভাবান ফুটবলার পাকিস্তানে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ১৯৮৯ সালে চতুর্থ সাফ গেমসে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় দলে নিজের স্থান করে নেন।

রণজিৎ দাস সিলেট শহরের অধিবাসী সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা রণজিৎ দাস ষাটের দশকে ফুটবল ও হকির গোলরক্ষক হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি ঢাকা মোহামোডান স্পোর্টিং ক্লাবের নিয়মিত গোলরক্ষক ছিলেন। এছাড়া তিনি সাবেক পূর্বপাকিস্তান দলের ফুটবল ও হকির গোলরক্ষক ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রণজিৎ দাস বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

এম এ হামিদ সিলেট শহরের ছড়ারপাড় (কামালগড়)-এর অধিবাসী ৫০ দশকের ফুটবল খেলোয়াড়, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল এম এ হামিদ বাংলাদেশ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। এরপর বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সভাপতি ও এশিয়ান হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সদস্য হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন । তার স্ত্রী রানী হামিদ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা দাবাড়ু, জ্যেষ্ঠ পুত্র কায়সার হামিদ, দ্বিতীয় পুত্র জাহাঙ্গীর হামিদ এবং কনিষ্ঠ পুত্র শাহাজাহান হামিদ এরা প্রত্যেকেই কৃতী খেলোয়াড়।

শফিকুল হক হীরা সিলেট জেলার অধিবাসী সত্তরের দশকের অত্যন্ত প্রতিভাবান ক্রিকেটার শফিকুল হক হীরা ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নিয়মিত উইকেটরক্ষক ছিলেন। তিনি ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় দলের খেলোয়াড়

ছিলেন। ১৯৭৯ সালে এবং ১৯৮২ সালে ইংল্যান্ডে আইসিসি ট্রফি টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন।

ডনডন লুসাই

সিলেট শহরের রিকাবীবাজারের বাসিন্দা সত্তরের দশকের কৃতী হকি খেলোয়াড় ডনডন লুসাই জাতীয় হকি দলের নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে দেশ-বিদেশে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৭৭ সালে মালয়েশিয়ায় জুনিয়র বিশ্বকাপ হকি ও ১৯৭৮ সালে শ্রীলঙ্কায় এবং ১৯৭৮ সালে অষ্টম এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ হকি দলে নিয়মিত খেলেন। বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি তাকে ১৯৭৮ সালে শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় হিসেবে মনোনীত করে।

জুম্মন লুসাই

সিলেট শহরের রিকাবী বাজারের অধিবাসী আন্তর্জাতিকমানের হকি খেলোয়াড় জুম্মন লুসাই সিলেট জেলা দল এবং ঢাকা আবাহনী ক্রীড়া চক্রের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৮২ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ হকি দলের পক্ষে প্রথম অংশ নেন এবং ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের একজন অপরিহার্য খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ বাছাই একাদশের পক্ষে একমাত্র বাংলাদেশি খেলোয়াড় হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ক্রীড়ালেখক সমিতি কর্তৃক জুম্মন লুসাই ১৯৮৫ সালে শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

মোস্তাক আহমদ

সিলেটের অধিবাসী সেনাবাহিনীর হাবিলদার মোস্তাক আহমদ ছিলেন সত্তরের দশকে একজন দেশসেরা দৌড়বিদ। তিনি ১৯৭৮ সালে অষ্টম এশিয়ান গেমস এবং ১৯৮৫ সালে দ্বিতীয় সাফ গেমসে ৮০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন। মোস্তাক আহমদ বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি কর্তৃক ১৯৭৪ সালে সেরা অ্যাথলেট এবং ১৯৭৫ সালে বছরের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হন।

সাইদুর রব

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানার অধিবাসী সাইদুর রব। তিনি ১৯৭৯ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় গেমস ও তুরস্কের ইজমিরে প্রথম ইসলামি সলিডারিটি গেমস এবং ১৯৮৩ সালে কুয়েতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক আমন্ত্রণমূলক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় সটপুট ও ডিসকাস থ্রোতে অংশগ্রহণ করেন।

গোলাম ফারুক চৌধুরী সুরু

সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলার অধিবাসী গোলাম ফারুক চৌধুরী সুরু সিলেট জেলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। ১৯৮২ সালে আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ দলে খেলে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি মোহামেডান, আবাহনী, বাংলাদেশ বিমান, ব্রাদার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি দলের পক্ষে খেলে ঢাকার ক্রিকেট লিগে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

নেহাল হাসনাইন

হবিগঞ্জ জেলার অধিবাসী এমসি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আবদুল মতিন চৌধুরীর পুত্র নেহাল হাসনাইন আশির দশকে বাংলাদেশের একজন প্রতিভাবান ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বিসিসিবি একাদশের পক্ষে পশ্চিম বাংলা একাদশের বিপক্ষে, ১৯৮৪ সালে প্রথম আইসিসি সহযোগী টুর্নামেন্টে এবং ১৯৮৪ সালে কেনিয়ায় অনূর্ধ্ব ২৫ একাদশের হয়ে বাংলাদেশ

দলের পক্ষে খেলেন। তিনি সিলেট জেলা দলের একজন নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি কর্তৃক ১৯৮৪ সালে শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার নির্বাচিত হন। তিনি ঢাকা লিগে বাংলাদেশ বিমানের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন।

এনাম আহমদ সিলেট জেলার অধিবাসী এনাম আহমদ আশির দশকে বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান ভলিবল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশিয়ান জুনিয়র ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ভলিবল দলের হয়ে অংশগ্রহণ করেন। এনাম আহমদ ১৯৮৬ সালে ভারতের হায়দরাবাদে আন্তর্জাতিক ভলিবল টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ জাতীয় দলের খেলোয়াড় হিসেবে অংশ নেন।

জুয়েল রানা সিলেট জেলার অধিবাসী বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের রক্ষণভাগের অপরিহার্য খেলোয়াড় জুয়েল রানা ঢাকার ফুটবল লিগ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে খেলে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ ফুটবলার ১৯৯৫ সালে মিয়ানমারে চার জাতি ফুটবল টুর্নামেন্টে জাতীয় দলের বাংলাদেশকে চ্যাম্পিয়ন করতে ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৯৫ সালে ভারতের মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সাফ গেমসে জাতীয় দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। বাংলাদেশ ষষ্ঠ সাফ গেমস ফুটবলে রানার্সআপ হয়।

ফারজান হোসেন সোমা সিলেট শহরের জেল রোডের অধিবাসী ফারজানা হোসেন সোমা অত্যন্ত প্রতিভাময়ী শুটার। ১৯৯৩ সালে ঢাকার অনুষ্ঠিত পঞ্চম সাফ গেমসে তিনি এয়ার রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করেন।

জাহাঙ্গীর হামিদ সিলেট শহরের ছড়ারপাড় (কামালগড়)-এর অধিবাসী ক্রীড়া সংগঠক লে. কর্নেল (অব.) এম. এ. হামিদ ও দাবাড়ু রানী হামিদের দ্বিতীয় পুত্র জাহাঙ্গীর হামিদ ১৯৮৯ সালে চতুর্থ সাফ গেমসে স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় এবং ১৯৮৮ সালে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দলের পক্ষে অংশ নেন।

শাহজাহান হামিদ লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামিদ এবং দাবাড়ু রানী হামিদের কনিষ্ঠ পুত্র শাহজাহান হামিদ ১৯৮৮ সালে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল দলের হয়ে অংশগ্রহণ করেন।

আবদুল জলিল চৌধুরী সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার থানার অধিবাসী আবদুল জলিল চৌধরী (ছালিক) বৃহত্তর সিলেটের একমাত্র ফিফা ব্যাজধারী রেফারি। তিনি ঢাকা স্টেডিয়ামে বড়ো বড়ো ফুটবল ম্যাচ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

আবদুল খালেক চৌধুরী বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবদুল খালেক চৌধুরী একজন সংগঠক হিসেবে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

মাহমুদুর রহমান মোমিন

বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মোমিন একজন দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন।

দিলদার হোসেন সেলিম

জেলা ক্রীড়া সংস্থার বর্তমান সাধারণ সম্পাদক দিলদার হোসেন সেলিম একজন সফল ক্রীড়াসংগঠক। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তৃতীয়বারের মতো জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি প্রথমদিকে হোয়াইট মোহামেডান ও ইলেভেন ব্রাদার্সের সাথে জড়িত ছিলেন।

এহিয়া রেজা চৌধুরী

সিলেট শহরের ছড়ারপাড়ের অধিবাসী সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক দুবার নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এহিয়া রেজা চৌধুরী একজন ক্রীড়াসংগঠক। তিনি ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লি এশিয়াডে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ভলিবল ও সাঁতার ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য।

যায়েদ আহমদ চৌধুরী

সিলেট শহরের দরগামহল্লার অধিবাসী যায়েদ আহমদ চৌধুরী একজন প্রতিভাবান ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং ক্রীড়াসংগঠক। তার পিতা মরহুম মশাহিদ উদ্দিন চৌধুরী একজন খ্যাতনামা ব্রিজ খেলোয়াড় ছিলেন। তার বড়ো দুই ভাই ফেরদৌস আহমদ চৌধুরী ও ফরহাদ আহমদ চৌধুরী নামকরা ক্রিকেটার ছিলেন।

সিলেট অঞ্চলের খেলাধুলার প্রসারে সিলেটের স্কুল-কলেজগুলোর অবদান অগ্রগণ্য। মূলত সিলেটে খেলাধুলার প্রসার ঘটেছে স্কুল-কলেজের মাধ্যমে : স্কুলগুলোর মধ্যে রাজা জিসি হাইস্কুল, এইডেড হাইস্কুল, মডেল হাইস্কুল, রসময় মেমোরিয়েল হাইস্কুল, সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালক উচ্চবিদ্যালয়, কিশোরীমোহন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, তাজপুর মঙ্গালচন্ডী নিশিকান্ত উচ্চবিদ্যালয় প্রভৃতির নাম করতে হয়। এ ছাড়া মুরারিচাঁদ কলেজ ও মদনমোহন কলেজ সিলেটের খেলাধুলার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

অধ্যায়-২৪

গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা

এদেশে উনিশ শতকে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় '*দিগদর্শন*' (মামুন : ১৯৮৫, পৃ. ৩৯) নামে প্রথম বাংলা মাসিকপত্র এবং এর একমাস পর ফেলিক্স কেরি ও মার্শম্যানের পরিচালনায় '*সমাচার দর্পণ*' (বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৮১, পৃ. ২৮৩) প্রথম বাংলা সাপ্তাহিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যই প্রথম বাঙালি সম্পাদক, যিনি ১৮১৮ সালের জুন মাসে '*বাঙ্গাল গেজেট*' (মামুন : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯) নামক প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র (সাপ্তাহিক) প্রকাশ করার গৌরব অর্জন করেন।

বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের দু-দশক পর সিলেটের প্রাচীনতম সংবাদপত্র-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৯৯-১৮৫৯) ১৮৩৯ সালের মার্চ মাসে '*সম্বাদ ভাস্কর*' এবং একই বছরের ২৯ নভেম্বর '*সম্বাদ রসরাজ*' সম্পাদনা করেন এবং পত্রিকা দুখানা কোলকাতা থেকেই ১৮৫৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। (সেন : ১৩৭৮ ব. পৃ. ৯৩) সেই বিবেচনায় সিলেটের সাংবাদিকতার ইতিহাসে ১৮৩৯ সাল সূচনাবর্ষ এবং গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যই এ ধারার পথিকৃৎ। সিলেটের মুদ্রণসেবা ও প্রকাশনার ইতিহাসেও তিনি অগ্রপথিক। ১৮৪৮ সাল থেকে '*শোভাবাজার বালাখানার বাগানে*' গৌরীশঙ্কর নিজের প্রেস স্থাপন করেন বলে জানা যায়। (বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭)

'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ রসরাজ' প্রকাশের শত বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে কালীপ্রসন্ন দাশ সম্পাদিত ও সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা দৈনিক কাগজ '*দৈনিক বলাকা*' । (শীরু : ১৯৯৮, পৃ. ১৬) এর পরের বছর (১৯৪০) এখান থেকে রমণীরঞ্জন শর্মার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় '*দৈনিক সূর্যোদয়*' (শীরু : পূর্বোক্ত পৃ. ১৬) '১৯৫২ সালে রজিউর রহমান সম্পাদিত '*দৈনিক ইনকিলা*' (শীরু : পূর্বোক্ত পৃ. ১৬) আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৩৯ থেকে ১৯৭০ এই ১৩০ বছরের ব্যবধানে কেবল সিলেট থেকে উল্লিখিত তিনখানা দৈনিক কাগজসহ (বাংলা ১২২+ ইংরেজি ৯) ১৩১ খানা সংবাদপত্র প্রকাশের তথ্য জানা যায়। (শীরু : পূর্বোক্ত পৃ. ১৬-২৩)। অধিকন্তু, ১৩০ বছরে সিলেট ও সিলেটের বাইরে থেকে (বাংলা ২২২+ ইংরেজি ২৮) ২৫০ খানা কাগজ প্রকাশিত হয়। (শীরু : পূর্বোক্ত পৃ. ১৬-২৩) সিলেট থেকে প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা সাপ্তাহিক '*শ্রীহট্ট প্রকাশ*' (১৮৭৫) প্যারীচরণ দাশ সম্পাদনা করেন। (শীরু : পূর্বোক্ত পৃ. ১৬) '*পরিদর্শক*' (১৮৮০) সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, '*শ্রীহট্ট মিহির*' (১৮৮৯) সম্পাদক লালা প্রসন্নকুমার দে থেকে শুরু করে প্রায় ষাটজন সম্পাদক বিভিন্ন সময় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে এ অঞ্চলের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনচর্যার স্বরূপটি বাঙ্ময় করে তোলেন। সেই বিবেচনায় সংবাদপত্র সেবায় সিলেট অঞ্চলের অতীত গৌরব সর্বমহলে স্মরণযোগ্য। শুধু তাই নয় মুক্তিযুদ্ধোত্তর ১৯৭২-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মাত্র ২৭ বছরে

সিলেট অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা ১১৯; এর মধ্যে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ২১।

সিলেটের শতবর্ষের সংবাদপত্র সেবার ইতিহাস যে চারজন ব্যক্তির লেখায় উপাত্তনির্ভর হয়ে উঠেছে, তাঁরা হলেন যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৯০৫-১৯৯০), মুহম্মদ নূরুল হক (১৯০৭-১৯৮৭), কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য ও মহিউদ্দিন শীরু (১৯৫৫-২০০৯)।

মধ্যযুগ ও বাংলা মুদ্রণের আদিপর্ব গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহ ও বিন্যাসে যিনি অগ্রপথিক, তিনি যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। তাঁর বিজ্ঞানচেতনা, অনুসন্ধিৎসা ও বিচক্ষণতা গবেষকমহলে স্বীকৃত। তাঁর প্রণীত শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় থেকে প্রকাশিত '*সংবাদপত্র*' (১৯৪৩)-গ্রন্থে সিলেট-কাছাড়ে কর্মরত সিলেটি সংবাদপত্রসেবীদের একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

এ-ধারার অপর লেখক সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক মুহম্মদ নূরুল হক। তাঁর সম্পাদিত *'মাসিক আল-ইসলাহ'* (১৯৩২) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। (শীরু : পূর্বোক্ত পৃ. ৬৫) দীর্ঘদিন থেকে মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র হিসেবে আল-ইসলাহ প্রকাশিত হয়ে আসছে। মুহম্মদ নূরুল হকের সংবাদপত্রবিষয়ক গ্রন্থ *'সংবাদপত্রসেবায় সিলহেটের মুসলমান'* (১৯৬৯) এ অঞ্চলের মুসলমান সংবাদপত্রসেবীদের পরিচালনায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সম্পাদকদের পরিচয় সম্বলিত গ্রন্থ।

সিলেটের সংবাদপত্রসেবার অপর ভাষ্যকার কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' শিলং শাখার সম্পাদকরূপে তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। সাহিত্যে ও '*সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় শ্রীহট্টের অবদান*' (১৯৭৩) তাঁর অন্যতম তথ্যনির্ভর ও প্রামাণ্যগ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে সুধীর সেন প্রণীত *'বাংলাসাহিত্যে আসামের বাঙ্গালীদের অবদান'* (১৩৭৮ ব.) শীর্ষক গ্রন্থের 'সাময়িকপত্র সম্পাদনা' (পৃ. ৯২-১০৭) অধ্যায়ের কথা এখানে উল্লেখের দাবি রাখে।

সিলেট সংবাদপত্র কথার চতুর্থ লেখক মহিউদ্দিন শীরু। সত্তরের দশক থেকে সাপ্তাহিক *'যুগভেরীর'* মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিকতার সূত্রপাত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় ১৯৭৮ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮২ সাল থেকে দীর্ঘদিন বাংলার বাণী পত্রিকার সিলেট প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কর্মরত ছিলেন। *'দৈনিক সুদিন'* এবং *'সাপ্তাহিক গ্রামসুরমা'* সম্পাদনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর ছিল বহুমাত্রিক যোগসূত্র। তাঁর সংবাদপত্রবিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ *'সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা'* (১৯৯৮) এ ধারার চতুর্থ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ১৮৩৯ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সিলেট ও সিলেটের বাইরে থেকে

প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রসেবীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

সিলেট ও সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত পত্রিকার তালিকা :

১৮৩৯-১৯৭০ থেকে জানা যায় প্রায় ১৩০ বছরের সংবাদপত্রসেবায় মাত্র তিনখানা দৈনিক পত্রিকা সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা তিনটি হলো : কালীপ্রসন্ন দাশ সম্পাদিত *'দৈনিক বলাকা'* (১৯৩৯), রমণীরঞ্জন শর্মা সম্পাদিত *'দৈনিক সূর্যোদয়'* (১৯৪০), রজিউর রহমান সম্পাদিত *'দৈনিক ইনকিলাব'* (১৯৫২)।

এ গ্রন্থে লেখক প্রণীত তালিকা (পৃ. ১৬-২৩) থেকে সারণি-১৮০-এর মাধ্যমে সিলেটি সম্পাদক কর্তৃক সিলেট ও সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা (১৮৩৯-১৯৭০)-র শ্রেণিভিত্তিক বিবরণ ও সারণি-১৭১-এর সিলেটি সম্পাদক কর্তৃক সিলেট ও সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকার বিবরণ এবং সারণি-১৭২-এ 'মুক্তিযুদ্ধোত্তর সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার জেলাওয়ারি হিসাব রয়েছে। সিলেটের দেড় শতাধিক বছরের সাংবাদিকতার স্বরূপ এবং বর্তমান সিলেট জেলার অবস্থান সারণি ১৭১, ১৭২ ও ১৭৩-এর মাধ্যমে প্রদত্ত হলো। (ফাত্তাহ : ২০০৬, পৃ. ৭৪) :

সারণি-১৭৮

সিলেটি সম্পাদক কর্তৃক সিলেট ও সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত পত্রিকা : বাংলা

বাংলা পত্রিকা	বার্ষিক	ত্রৈমাসিক	দ্বিমাসিক	মাসিক	পাক্ষিক	সাপ্তাহিক	দৈনিক	সর্বমোট
সিলেট	-	০৯	-	৮৬	০৮	৫৬	৩	১২২
সিলেটের বাইরে	-	০৫	-	৪১	০৫	২৪	১২	৮৭
মোট সংখ্যা	১৩	১৪	-	১২৭	১৩	৮০	১৫	২০৯

সারণি-১৭৯

সিলেটি সম্পাদক কর্তৃক সিলেট ও সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত পত্রিকা : ইংরেজি

ইংরেজি পত্রিকা	বার্ষিক	ত্রৈমাসিক	দ্বিমাসিক	মাসিক	পাক্ষিক	সাপ্তাহিক	দৈনিক	সর্বমোট
সিলেট	-	-	-	০৩	-	০৬	-	০৯
সিলেটের বাইরে	-	-	-	০৫	০২	১০	০২	১৯
মোট সংখ্যা	-	-	-	০৮	০২	১৬	০২	২৮

লক্ষণীয় : সিলেট ও সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা (বাংলা ২২২ + ইরেজি ২৮)= মোট ২৫০;

সারণি-১৮০

সিলেট সদর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা : ১৯৭২-১৯৯৮

পত্রিকার শ্রেণি	সিলেট জেলা	হবিগঞ্জ	মৌলভীবাজার	সুনামগঞ্জ	সর্বমোট সংখ্যা
দৈনিক	১২	০২	০১	০২	১৭
সাপ্তাহিক	৪৫	০৭	১৩	০৮	৭৩
পাক্ষিক	০৪	০১	০১	০২	০৮
মাসিক	১৬	-	-	০১	১৭
ত্রৈমাসিক অথবা অন্যান্য	০১	-	০১	০২	০৪
জেলাভিত্তিক পত্রিকার সংখ্যা	৭৮	১০	১৬	১৫	১১৯

লক্ষণীয় যে সারণি-১৭২ এ সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত কোনো বাংলা পত্রিকার কথা উল্লেখ হয়নি। তাই এ ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে অবস্থানকারী প্রবাসী সিলেটি সংবাদপত্রসেবীদের ২৫ খানা সংবাদসাময়িকপত্রের কথা মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া করিমগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল ভারতভুক্তির ফলে মুক্তিযুদ্ধোত্তর তালিকা থেকে ওই অঞ্চলের সংবাদপত্রগুলো স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়ে।

সারণিত্রয়ের তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় ১৩০ বছরের নিরবচ্ছিন্ন চর্চার ফলাফল সিলেট ও সিলেটের বাইরে থেকে সর্বমোট ২০৯টি বিভিন্ন শ্রেণির বাংলা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং সারণি-১৭২-এ প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকার সংখ্যা ২৮। এর মধ্যে কেবল সিলেট থেকে ৯ টি ও সিলেটের বাইরে থেকে ১৯টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সারণি-১৭৩-এ সিলেট বিভাগের চার জেলা থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার সংখ্যা ১১৯।

মহিউদ্দিন শীরু মুক্তিযুদ্ধকালীন ৮টি পত্রিকার কথা তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। পত্রিকাগুলো হচ্ছে *‘সাপ্তাহিক বাংলা’, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা’, সাপ্তাহিক দুর্জয়, ‘সাপ্তাহিক বাংলার ডাক’, ‘সাপ্তাহিক জন্মভূমি’, ‘ সাপ্তাহিক জয় বাংলা’।*

সিলেটিদের মাধ্যমে উর্দু, হিন্দি এবং মণিপুরী ভাষায় পৃথক তিনখানা পত্রিকা প্রকাশের তথ্য জানা যায়। পত্রিকাগুলো হচ্ছে আবু সুফি মো. বশির সম্পাদিত *‘বাজাম-ই-খেয়াল* (উর্দু) ১৯৩০ হেমন্তকুমারী চৌধুরী সম্পাদিত হিন্দি পত্রিকা *‘সুগৃহিনী’* ১৮৯৯ সাল সমরজিৎ সিংহ সম্পাদিত মণিপুরী ভাষার পত্রিকা *‘মণিপুরী’* ১৩৪০। এছাড়া আমিনুল হক সম্পাদিত ত্রিভাষিক (ইংরেজি-বাংলা-অসমীয়া) পত্রিকা *‘সাহিত্য’* (ত্রৈমাসিক) ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। মহিউদ্দিন শীরুর গ্রন্থে ইংরেজি ২৮ খানা পত্রিকার উল্লেখ থাকলেও যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

প্রণীত তালিকায় এই সংখ্যা ৩৪ বর্ণিত হয়েছে। *‘সুহৃদ’* (১৯৩৯), *সঙ্ঘশক্তি* (১৯২৯), *’রংপুর দিকপ্রকাশ* (১৯১৫), *পল্লীস্বরাজ* (১৯৪২-ব.) *নিউ এরা* (১৯৩৭) প্রভৃতি প্রকাশিত পত্রিকাগুলো বৃহত্তর সিলেটে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

সিলেট থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮৩৯-১৯৭০ পর্যন্ত ১৩০ বছরে সিলেট থেকে মাত্র তিনখানা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের তথ্য পাওয়া গেছে। পত্রিকা তিনটির বিবরণ সারণি-১৭৪-এ দেখানো হলো :

সারণি-১৮১

সিলেট থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা (১৯৩৯-১৯৫২)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
দৈনিক বলাকা	১৯৩৯ সাল	কালীপ্রসন্ন দাশ	সিলেট
দৈনিক সূর্যোদয়	১৯৪০ সাল	রমণীরঞ্জন শর্মা	সিলেট
দৈনিক ইনকিলাব	১৯৫২ সাল	রজিউর রহমান	সিলেট

সিলেট থেকে প্রকাশিত (কিছু) সাপ্তাহিক পত্রিকার বিবরণ

‘শ্রীহট্ট প্রকাশ’ (১৮৭৫) থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সিলেটে প্রকাশিত কিছু সাপ্তাহিক পত্রিকার বিবরণ দেওয়া হলো। (আজিজ ও অন্যান্য : ১৯৯৭, পৃ. ৩৪১-৩৪৬) :

অগ্রগতি

এটি ছিল জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ এটি প্রকাশিত হয়। সপ্তাহের প্রতি সোমবারে বের হতো। ‘অগ্রগতি’র সম্পাদক ছিলেন সিলেট সদর থানার ব্রাহ্মণঝুলি নিবাসী হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী। ‘অগ্রগতি’ ছাড়াও তিনি *সাপ্তাহিক জয়ন্তী, দেশবন্ধু, বাসন্তী, স্বাধিকার এবং মাসিক সম্পদ* -এর সম্পাদক ছিলেন। ‘অগ্রগতি’ প্রতি কপির মূল্য ছিল একআনা এবং বাৎসরিক চাঁদা ছিল ৩ টাকা।

অরুণ

‘অরুণ’ সম্পাদনা করতেন বিবুধকৃষ্ণ চক্রবর্তী বি.এ। তাঁর বাড়ি ছিল সিলেট সদর থানার অন্তর্গত রেঙ্গা নামক স্থানে।

আল-জ্বালাল

আল-জ্বালাল ছিল আসাম মুসলিম মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপত্র। এর প্রকাশকাল ২৫ বৈশাখ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। প্রতি বুধবারে এটি বের হতো। আল-জ্বালালের সম্পাদক ছিলেন সিলেট শহরের শেখঘাট নিবাসী মোহাম্মদ সিকন্দর আলী। পত্রিকাখানির বার্ষিক চাঁদা ছিল আড়াই টাকা এবং প্রতি কপির মূল্য ছিল একআনা। পত্রিকাখানি প্রায় বছরখানেক প্রকাশিত হয়।

জনশক্তি

সাপ্তাহিক ‘জনশক্তি’র প্রথম প্রকাশ সিলেট শহরের চালিবন্দরের এক জীর্ণ কুঁড়েঘরে। ভুবনমোহন বিদ্যার্ণবের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে ‘জনশক্তি’ প্রকাশ লাভ করে। বিপিনচন্দ্র পাল পত্রিকাখানির নাম ‘জনশক্তি’

রাখার সুপারিশ করেছিলেন। ক্ষীরোদচন্দ্র দেব, ক্ষিতীশচন্দ্র সোম ও চন্দ্রকুমার দে প্রমুখের শ্রম ও অক্লান্ত চেষ্টায় 'জনশক্তি' পরিচালিত হতো। জনশক্তি সম্পাদনা করেন সতীশচন্দ্র দেব, অনাথবন্ধু দাস, বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ধর ও বিধুরঞ্জন চক্রবর্তী। সতীশচন্দ্র দেব সম্পাদক থাকাকালে অনাথবন্ধু দাস জনশক্তি'র মুদ্রাকর ছিলেন। 'জনশক্তি' ছাড়াও সতীশচন্দ্র দেব 'লাউতা প্রকাশ' ও 'শ্রীভূমি' নামে দুটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে সম্পৃক্তদের পক্ষে অবস্থানের কারণে 'জনশক্তি' সম্পাদক সতীশচন্দ্র দেব, মুদ্রাকর অনাথবন্ধু দাস এবং সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা কারাদন্ডে দন্ডিত হন।

পরবর্তীকালে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 'জনশক্তি'র পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁর চেষ্টা ও আর্থিক সহায়তায় শহরের কেন্দ্রস্থল জিন্দাবাজারে নিজস্ব বাড়িতে পত্রিকার অফিস ও প্রেস চালু হয়। ১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি 'জনশক্তি'র ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ পায় এবং বছরখানেক চালু থাকে। ইংরেজি সংস্করণের সম্পাদনা করতেন ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। প্রথম দিকে জনশক্তির বার্ষিক চাঁদা ছিল তিন টাকা এবং প্রতি কপির দাম এক আনা।

জয়ন্তী সাপ্তাহিক জয়ন্তীর প্রথম প্রকাশ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১ মাঘ। এর সম্পাদক ছিলেন সিলেট সদর থানার ব্রাহ্মণঝুলি নিবাসী হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী। 'জয়ন্তী' সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশ পেলেও পরবর্তীকালে অর্ধসাপ্তাহিকরূপে প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল উদ্যোক্তাদের। কিন্তু সাপ্তাহিকরূপে কয়েক সংখ্যা বের হওয়ার পরই এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। 'জয়ন্তী'র বার্ষিক চাঁদা ছিল ৩ টাকা এবং প্রতি কপির মূল্য ছিল একআনা। সাপ্তাহিক জয়ন্তী ছাড়াও হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী অগ্রগতি, দেশবন্ধু, বাসন্তী ও স্বাধিকার-এরও সম্পাদক ছিলেন।

জাগরণ 'জাগরণ' ১৩৪৪ সালের ২০ ফাল্গুন জাতীয়তাবাদী মুসলিম পরিষদের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। সপ্তাহের প্রতি শুক্রবারে 'জাগরণ' প্রকাশ পেত। জাগরণের সম্পাদক ছিলেন সদর সিলেটের দুলালী পাঁচপাড়ার আজিজুর রহমান। সংবাদ প্রকাশে এই পত্রিকা সাহসী ভূমিকা পালন করে। 'জাগরণ' প্রকাশনার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণের পর ১৫ সংখ্যা পর্যন্ত বের হয়েছিল।

ব্র্যহস্পর্শ সাপ্তাহিক 'ব্র্যহস্পর্শ' সম্পাদনা করতেন যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন। তার বাড়ি ছিল মৌলভীবাজারের পাঁচগাঁও গ্রামে। কয়েক সংখ্যা বের হওয়ার পর পত্রিকাটি লুপ্ত হয়ে যায়।

দেশবন্ধু সাপ্তাহিক 'দেশবন্ধু' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে। সম্পাদক ছিলেন হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী। তিনি ছিলেন সিলেট সদরের ব্রাহ্মণঝুলির অধিবাসী। পত্রিকাটির প্রকাশনা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কয়েক সংখ্যা বের হওয়ার পর বিলুপ্তি ঘটে।

‘দেশবার্তা’র প্রকাশকাল ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২ ফাল্গুন, সোমবার। দেশবার্তার সম্পাদক ছিলেন অনঙ্গমোহন দাস। তার নিবাস ছিল মৌলভীবাজারের সাধুহাটি নামক স্থানে। প্রায় দুবছর পত্রিকাখানি চালু ছিল। **দেশবার্তা**

সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিকী ‘নবরঙ্গ’-এর সম্পাদক ছিলেন সদর সিলেটের কাইড়ঘাট নিবাসী নবীনচন্দ্র পাল এবং সিলেট শহরের তেলিহাওর নিবাসী হেমেন্দ্রনাথ দাস। **নবরঙ্গ**

‘নয়াদুনিয়া’ ছিল তৎকালীন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাপ্তাহিক মুখপত্র। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে ‘নয়াদুনিয়া’ প্রকাশিত হয়। সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারায় প্রভাবিত ‘নয়াদুনিয়া’র সম্পাদক ছিলেন হবিগঞ্জের বেজুড়ার অধিবাসী জ্যোতির্ময় নন্দী মজুমদার। ‘নয়াদুনিয়া’ তিন বছর চালু ছিল। জ্যোতির্ময় নন্দী মজুমদার ‘সংহতি’ নামে আরো একখানি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। **নয়াদুনিয়া**

‘পরিব্রাজক’-এর সম্পাদক ছিলেন লালা প্রসন্নকুমার দে। তিনি ছিলেন সিলেট শহরের কাজলশাহর অধিবাসী। কয়েক সংখ্যা বের হবার পর ‘পরিব্রাজক’ বন্ধ হয়ে যায় । লালা প্রসন্নকুমার দে *‘শ্রীহট্ট মিহির’ রসরাজ’, ‘এপ্রিল ফুল’, ‘এপ্রিল রহস্য’* পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। **পরিব্রাজক**

১৩৩৮ সালের ২ চৈত্র মঙ্গলবার ‘পূরবী’ প্রথম প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন মৌলভীবাজার চুয়াল্লিশ নিবাসী নিম্নরূপ গুপ্ত। ‘পূরবী’ মাত্র এক সংখ্যা বের হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। **পূরবী**

সাপ্তাহিক ‘বাসন্তী’ বের হতো প্রতি রোববারে। এটি সম্পাদনা করতেন ব্রাহ্মণঝুলি, সিলেট-এর হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী। ‘বাসন্তী’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১ পৌষ। এই পত্রিকার আটটি সংখ্যা বের হয়েছিল। **বাসন্তী**

‘বেপরোয়া’ বের হতো সপ্তাহের প্রতি শনিবারে। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১১ ভাদ্র। ‘বেপরোয়া’র সম্পাদক ছিলেন সিলেট সদরের মদনরচক নিবাসী বিনোদবিহারী চক্রবর্তী। তিনি ‘জনশক্তি ও ‘বিবর্ত্তন’ পত্রিকা দুখানিও সম্পাদনা করতেন। সমসাময়িক অন্যান্য সাপ্তাহিকের তুলনায় ‘বেপরোয়া’র মূল্য অপেক্ষাকৃত কম ছিল। পত্রিকাটি প্রতি কপির মূল্য ছিল মাত্র ১ পয়সা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ছিল ২ টাকা। **বেপরোয়া**

আসাম প্রাদেশিক মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সাপ্তাহিক মুখপত্র ছিল ‘মোজাহেদ’। প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৬ বাংলার ২৯ ভাদ্র, শুক্রবার। ‘মোজাহেদ’-এর সম্পাদক ছিলেন সিলেট সদরের শ্রীরামপুর নিবাসী আবদুল লতিফ। এই সাপ্তাহিকের প্রকাশনার পেছনে জনৈক হাজী আবদুস সালামের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ‘মোজাহেদ’-এর মাত্র পাঁচটি সংখ্যা বের হয়েছিল। **মোজাহেদ**

সমগ্র সিলেট জেলার মধ্যে মুসলমানদের দ্বারা সম্পাদিত ও পরিচালিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হলো ‘যুগবাণী’। প্রকাশের পর থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের **যুগবাণী**

মধ্যে এই পত্রিকা বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। 'যুগবাণী' প্রকাশিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৩ মাঘ (১৬ জানুয়ারি ১৯২৫) শুক্রবারে। সুনামগঞ্জের বিন্নাকুলি নিবাসী মকবুল হোসেন ছিলেন 'যুগবাণী'র সম্পাদক। অসহযোগ আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি গ্রেফতার হন এবং জেল থেকে বের হয়ে 'যুগবাণী' প্রকাশ করেন। 'যুগবাণী' প্রকাশনা প্রায় আড়াই বছর অব্যাহত ছিল। 'যুগবাণী'র বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ছিল তিন টাকা এবং প্রতি কপির মূল্য ছিল (একআনা)। তদানীন্তন সাপ্তাহিক 'যুগভেরী' (বর্তমানে দৈনিক) এবং কোলকাতার দৈনিক 'ছোলতান'-এর সম্পাদক হিসেবেও মকবুল হোসেন দক্ষতার পরিচয় দেন।

সিলেট থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে 'যুগভেরী' অন্যতম। এর প্রথম প্রকাশ ১৯৩০ সালের ১০ নভেম্বর। এটি সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশনার ৫০তম বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করেছে ১৯৮২ সালে।

যুগভেরীর প্রতিষ্ঠাতা সুনামগঞ্জ নিবাসী আবদুর রশীদ চৌধুরী। মকবুল হোসেন চৌধুরী ছিলেন 'যুগভেরী'র প্রথম সম্পাদক। সূচনাতে 'যুগভেরী' ছাপা হতো মির্জাজাঙ্গালের কোটিচাঁদ প্রেস থেকে। অতঃপর 'মিনার প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড'-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন আবদুর রশীদ চৌধুরী এবং অন্যতম ডিরেক্টর আবদুল মতিন চৌধুরী।

মকবুল হোসেন চৌধুরী শুরু থেকে দীর্ঘ সাত বছর 'যুগভেরী' সম্পাদনা করেন। অষ্টম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে ২৪শ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন শেখপাড়া-ভাদেশ্বর নিবাসী শেখ আবদুর রহিম। অষ্টম বর্ষের ২৫শ সংখ্যা থেকে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন মৌলানা সখাওতুল আম্বিয়া। ভাদেশ্বরের আবদুল খালিক চৌধুরী দশম বর্ষের ২৩শ সংখ্যা থেকে কিছুকাল যুগভেরী সম্পাদনা করেন। এর আগে কিছুদিন সিংকাপন নিবাসী (মৌলভীবাজার) মৌলানা আবদুর রহমান সিংকাপনী যুগভেরীর সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে সাপ্তাহিক যুগভেরী সম্পাদন করেছেন রজিউর রহমান চৌধুরী, আবদুল কাদির চৌধুরী, আবদুল করিম সিদ্দিকী, আবদুল হক, মোহাম্মদ জহুর আলী, দেওয়ান ফরিদ গাজী এবং আমীনূর রশীদ চৌধূরী। রমেশচন্দ্র দাস (পরবর্তীকালে করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'নবযুগ'-এর সম্পাদক) আবদুল মতিন চৌধুরীর পরিচালনকালে কিছুদিন 'যুগভেরী'র কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন।

যুগশক্তি সাপ্তাহিক 'যুগশক্তি' প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালে। সম্পাদক ছিলেন সুবোধচন্দ্র দত্ত। তার বাড়ি ছিল করিমগঞ্জের বীরশ্রী গ্রামে।

যুগের আলো 'যুগের আলো' প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৪ চৈত্র। সপ্তাহের প্রতি শনিবার 'যুগের আলো' বের হতো। প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্যারীমোহন গোস্বামী এবং পরে সম্পাদনা করেন অনিলবরণ দেব, ভূদেব ভট্টাচার্য, মতিলাল দেব। পত্রিকাটি প্রায় পাঁচ বছর স্থায়ী ছিল।

শান্তি

শান্তি প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালের ১৯ জুলাই। সম্পাদক ছিলেন ক্ষেত্রমোহন শ্যাম। তাঁর নিবাস ছিল রেঙ্গা, সিলেট সদর। তিনি প্রায় দেড় বছর ওই পত্রিকা সম্পাদনা করেন। শেষ দিকে সাপ্তাহিক 'শান্তি'র সম্পাদক ছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্র শ্যাম। তার নিবাসও ছিল রেঙ্গা।

শ্রীহট্টবাসী

'শ্রীহট্টবাসী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে। সম্পাদক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত বি.এল.। তাঁর বাড়ি ছিল হবিগঞ্জের লাখাই। সাপ্তাহিক 'শ্রীহট্টবাসী' ছাড়াও তিনি হবিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত মাসিক 'মৈত্রী'রও সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীহট্ট মিহির

'শ্রীহট্ট মিহির' ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। প্রায় বছর খানেক বের হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন লালা প্রসন্নকুমার দে।

শ্রীহট্ট হিতৈষী

শ্রীহট্ট হিতৈষী : ১৮৯৮ সালে সিলেট থেকে 'শ্রীহট্ট হিতৈষী' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'শ্রীহট্ট হিতৈষী'র সম্পাদকের নাম জানা যায়নি।

শ্রীদেশবার্তা

১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৩ শ্রাবণ সোমবার শ্রীদেশবার্তা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব। সপ্তাহের প্রতি সোমবারে এটি প্রকাশিত হতো। 'শ্রীদেশবার্তা' প্রায় বছর খানেক বের হয়েছিল। ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব সাপ্তাহিক 'জনশক্তি' ও 'সুরমা'র সম্পাদক ছিলেন।

সংহতি

'সংহতি' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২৬ মাঘ। মুক্তি আন্দোলনের সাপ্তাহিক মুখপত্ররূপে প্রতি সোমবারে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। 'সংহতি'র সম্পাদক ছিলেন বেজুড়া, হবিগঞ্জ নিবাসী জ্যোতির্ময় নন্দীমজুমদার।

সুরমা

সাপ্তাহিক 'সুরমা'র সম্পাদক ছিলেন ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব। বিদ্যার্ণব সম্পাদিত 'সুরমা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দের শিলচর থেকে। পরে 'সুরমা'র প্রকাশনা সিলেটে স্থানান্তরিত হয়।

১৩৪৩ সালে শিলচর থেকে 'সুরমা' নামে পৃথক একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম বি.এল.। তার বাড়ি ছিল মৌলভীবাজারের জাইদপুরে। একই নামের পৃথক দুটি সাপ্তাহিককে ভুলবশত কেউ কেউ একই পত্রিকা হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

সুরমা উপত্যকা

১৩৪৯ সালের ৮ আশ্বিন শুক্রবার 'সুরমা উপত্যকা' প্রকাশিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা- সম্পাদক ছিলেন মোগলগাঁওয়ের আবদুল মতিন বি.এল.। তিনি প্রথম বর্ষের শুরু থেকে ২৬শ' সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। অতঃপর তিনি সিলেট জেলার বারে যোগ দিলে যশস্বী সাংবাদিক রমেশচন্দ্র দাস সাপ্তাহিক 'সুরমা উপত্যকা'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

স্বাধিকার

'স্বাধিকার' প্রকাশিত হয় ১৩৪১ সালের ৭ ফাল্গুন। 'স্বাধিকার'-এর সম্পাদক ছিলেন জালালপুর, সিলেট সদরের অনাথবন্ধু দাস। শেষ কয়েক সংখ্যার

সম্পাদনা করেন হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (ব্রাহ্মণঝুলি, সিলেট সদর)। 'স্বাধিকার' বের করার পেছনে অবলাকান্ত গুপ্তচৌধুরীর অক্লান্ত শ্রম ছিল।

সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার বিবরণ সারণি-১৭৫ এবং সিলেটের সাংবাদিক কর্তৃক সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার বিবরণ সারণি-১৭৬-এর মাধ্যমে দেখানো হলো।

সারণি-১৮২

সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক (১৮৭৫-১৯৬২)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
শ্রীহট্ট প্রকাশ	১৮৭৫ খ্রি.	প্যারীচরণ দাস	সিলেট
পরিদর্শক	১৮৮০ খ্রি.	বিপিনচন্দ্র পাল	সিলেট
শ্রীহট্ট মিহির	১৮৮৯ খ্রি.	লালা প্রসন্নকুমার দে	সিলেট
শ্রীহট্টবাসী	১৮৯৩ খ্রি.	নগেন্দ্রনাথ দত্ত	সিলেট
শ্রীদেশ বার্তা	১৯০৭ খ্রি.	ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব	সিলেট
দেশবার্তা	১৯১৭ খ্রি.	অনঙ্গমোহন দাস	সিলেট
জনশক্তি	১৯২০ খ্রি.	সতীশচন্দ্র দেব	সিলেট
দেশবন্ধু	১৩২২ ব.	হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	সিলেট
পাঞ্চজন্য	১৩৩৭ ব.	সুবোধকুমার রায়	করিমগঞ্জ
পূরবী	১৯৪৮ খ্রি.	ডা. জিতেন্দ্র চক্রবর্তী	সুনামগঞ্জ
জনমত	১৯৩৩ খ্রি.	ব্রজেন্দ্রলাল রায়	হবিগঞ্জ
নকীব	১৯৩৭ খ্রি.	মোহাম্মদ ছনাওর আলী	কুলাউড়া
জয়ন্তী	১৩৪৩ ব.	হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	সিলেট
জাগরণ	১৯৩৮ খ্রি.	মোহাম্মদ আজিজুর রহমান	সিলেট
অরুণ	-	বিবুধকৃষ্ণ চক্রবর্তী	সিলেট
অগ্রগতি	১৩৪৬ ব.	হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	সিলেট
আল্ জ্বালাল	১৯৪০ খ্রি.	মোহাম্মদ সিকন্দর আলী	সিলেট
কাল বৈশাখী	-	সতীন্দ্র দেব	হবিগঞ্জ
নয়া দুনিয়া	১৩৪৫ ব.	জ্যোতির্ময় নন্দী মজুমদার	সিলেট
পরিব্রাজক	-	লালা প্রসন্নকুমার দে	সিলেট
পূরবী	১৯৩২ খ্রি.	নিবারণ গুপ্ত	সিলেট
বাসন্তী	১৯২৮ খ্রি.	হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	সিলেট
বেপরোয়া	১৯২৬ খ্রি.	বিনোদবিহারী চক্রবর্তী	সিলেট
আনসার	১৯৪৮ খ্রি.	সখাওতুল আম্বিয়া	সিলেট
জীবন	১৯৫২ খ্রি.	রজিউর রহমান ও শামসুল হোসেন খান	সিলেট
দেশের দাবি	১৯৫৪ খ্রি.	রজিউর রহমান	সিলেট
জনতার ডাক	-	সৈয়দ আজাদ আলী	সিলেট
যুগশক্তি	১৩৪৪ ব.	সুবোধচন্দ্র দত্ত	সিলেট
ইলেকশন (অর্ধসাপ্তাহিক)	১৩৪৪ ব.	প্রফুল্লচন্দ্র দাস	সিলেট

সংহতি	১৩৪৮ ব.	জ্যোতির্ময় নন্দী	সিলেট
মোজাহেদ	১৯৩৯ খ্রি.	আবদুল লতিফ ও প্যারীমোহন গোস্বামী	সিলেট
যুগের আলো	১৯৩৯ খ্রি.	মতিলাল দেব	সিলেট
যুগবাণী	১৯২৫ খ্রি.	মকবুল হোসেন চৌধুরী	সিলেট
শান্তি	১৯৩২ খ্রি.	ক্ষেত্রমোহন শ্যাম	সিলেট
সারথি	১৩৪৪ ব.	অনিলকুমার রায়	হবিগঞ্জ
স্বাধিকার	১৩৪১ ব.	হরেন্দ্রকুমার চৌধুরী	সিলেট
জনশক্তি	১৯২৮ খ্রি.	ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও সতীশচন্দ্র দেব	সিলেট
সুরমা উপত্যকা	১৯৪৩ খি:	আবদুল মতিন	সিলেট
নওবেলাল	১৯৪৮ খ্রি.	মাহমুদ আলী	সিলেট
যুগভেরী	১৯৩০ খ্রি.	মকবুল হোসেন চৌধুরী	সিলেট
সিলেট বার্তা	-	হিমাংশু শেখর ধর	সিলেট
আওয়াজ	-	আবদুল মন্নান	
জনশক্তি	-	নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী	সিলেট
সিলেট পত্রিকা	-	মকবুল হোসেন চৌধুরী	সিলেট
আজান	-	আবদুল বারী (ধলাবারী)	সিলেট

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮,
দ্র. : ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট-পূর্ব পত্রিকাগুলোর প্রকাশ স্থান সিলেট হিসেবে গণ্য।

সারণি-১৮৩
সিলেটের সাংবাদিক কর্তৃক সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক (১৮৩৯-১৯৫৫)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল (সাল)	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
সম্বাদ ভাস্কর	১৮৩৯ খ্রি.	গৌরীশংকর তর্কবাগীশ	কোলকাতা
সম্বাদ রসরাজ	১৮৩৯ খ্রি.	গৌরীশংকর তর্কবাগীশ	কোলকাতা
বাংলা	--	বিপিনচন্দ্র পাল	কোলকাতা
খাদিম বাহক	১৩৪৩ ব.	মৌলভী হিফজুর রহমান	শিলং
প্রাচ্যবার্তা	১৩৪৭ ব.	হরিশরঞ্জন ভট্টাচার্য	শিলচর
বঙ্গভূমি	--	ঈশানচন্দ্র শর্মা	কোলকাতা
বর্তমান	১৩৩৭ ব.	ভূপেন্দ্রকুমার শ্যাম	শিলচর
আল মুসলিম	১৩৩৫ ব.	ফজলুল হক সেলবর্ষী	কোলকাতা
বাংলার কথা	--	আলতাফ হোসেন	কোলকাতা
রংপুর দিক প্রকাশ	১৯১৫ খ্রি.	প্রমথনাথ দে	রংপুর
রবিবার	১৩৪৬ ব.	ক্ষিতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য	কোলকাতা
সংহতি	১৩৪৪ ব.	জ্যোতির্ময় নন্দী	কোলকাতা
সপ্তক	১৩৪৪ ব.	কুশিমোহন দাশ	শিলচর
সারস্বত	--	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ	ঢাকা
জনশক্তি	--	নিবারণ গুপ্ত	শিলচর

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল (সাল)	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
সাহস কেশরী	--	ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী	কোলকাতা
সুরমা	১৩১৮ ব.	ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব	শিলচর
সৈনিক	--	শাহেদ আলী ও এনামুল হক	ঢাকা
নওবেলাল	১৯৪৮ খ্রি.	মাহমুদ আলী	ঢাকা
পাকিস্তানি খবর	--	আনোয়ার হোসেন	ঢাকা
হিতকর	--	মীর্জা আবু মুছা আবদুল হাই	টাঙ্গাইল
মোহাম্মদী	১৯২২ খ্রি.	আবদুল মতিন চৌধুরী	কোলকাতা

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮,
দ্র. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট-পূর্ব পত্রিকাগুলোর প্রকাশ স্থান সিলেট হিসেবে গণ্য।

সিলেট থেকে প্রকাশিত তিনটি দৈনিক পত্রিকার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। পাক্ষিক পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ডাক্তার ভারতচন্দ্র দাস সম্পাদিত ‘পরিদর্শক’। নগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ‘পরিদর্শক ও শ্রীহট্টবাসী’ নামক পাক্ষিক পত্রিকা ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। আবদুল মালিক চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১৫ চৈত্র শনিবার পাক্ষিক ‘যুদ্ধযাত্রা’ প্রকাশিত হয়। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২৪ জ্যৈষ্ঠ পাক্ষিক ‘সত্যবাদী’ বিধুকৃষ্ণ চক্রবর্তী বিএ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। জে.ই. চৌধুরীর সম্পাদনায় খ্রিস্টান মিশনারিদের পাক্ষিক পত্রিকা ‘সেবক’ ১৯৪০ সালের ১ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে বের হতো।[১] সন্ধিৎসু পাঠকের সুবিধার্থে সিলেট এবং সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকার বিবরণ সারণি-১৭৭ও সারণি-১৭৮ -এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হলো।

সারণি-১৮৪

সিলেট থেকে প্রকাশিত বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা (১২৯৯-১৩৬৪)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
যুদ্ধবার্তা	১৩৪৭ব.	আবদুল খালিক চৌধুরী	সিলেট
সেবক	--	জে ই চৌধুরী	সিলেট
দেশের ডাক	১৩৬৪ ব.	এ এইচ সা'আদত খান	সিলেট
প্রভাত	১৩১৫ ব.	কৃষ্ণকিঙ্কর আদিত্য	করিমগঞ্জ
পল্লীবাণী	১৩৪৩ ব.	সুবোধকুমার রায়	করিমগঞ্জ
মুক্তিনায়ক	১৩৪৪ ব.	অখিলবন্ধু চক্রবর্তী	করিমগঞ্জ
পরিদর্শক ও শ্রীহট্টবাসী	১২৯৯ ব.	গিরিশচন্দ্র দাশ	সিলেট
পরিদর্শক	--	ভারতচন্দ্র দাস	সিলেট

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮
দ্র. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট-পূর্ব পত্রিকাগুলোর প্রকাশ স্থান সিলেট হিসেবে গণ্য।

---

[১] মো. আবদুল আজিজ, বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, প্রথমখন্ড, কুমারপাড়া, সিলেট, ১৯৯৭, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮।

সারণি-১৮৫
সিলেটের সাংবাদিক কর্তৃক সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা (১৮৮৯-১৯৪১)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
ভবিষ্যৎ	১৩৩৩ ব.	নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম	শিলচর
শিলচর	১৮৮৯ খ্রি.	বিধুভূষণ রায়	শিলচর
সত্যবাদী	১৩৪৪ ব.	বিধুকৃষ্ণ চক্রবর্তী	কোলকাতা
চমক	১৩৪৬ ব.	ভূপেন্দ্রচন্দ্র সোম	শিলচর
জনশিক্ষা	১৯৪১ খ্রি.	মনমোহন মজুমদার ও কেদারনাথ চৌধুরী	শিলচর

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮

সিলেট জেলার আদি সংবাদপত্র সাপ্তাহিক *'শ্রীহট্ট প্রকাশ'* থেকে শুরু করে ভারত বিভক্তি পর্যন্ত সিলেট অঞ্চলে অসংখ্য পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। এক হিসাব মতে দেখা যায়, ১৯৪২ সাল অবধি শুধু সিলেট শহর থেকে প্রকাশিত ইংরেজি-বাংলা সংবাদপত্রের সংখ্যা প্রায় ৮০। এর মধ্যে বেশিরভাগই সাপ্তাহিক পত্রিকা। সাপ্তাহিকের পরেই মাসিক পত্রিকার স্থান। খুব সংক্ষেপে সিলেট জেলা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকাগুলোর পরিচয় উল্লেখ করা হলো।[২]

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে মাসিক *'আজান'* প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ইসলামধর্ম বিষয়ক সাময়িকী। এর সম্পাদক ছিলেন মৌলবি সালাউদ্দিন ইউসুফ। মাসিক *'আল-ইসলাহ'*১৩৩৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ নুরুল হক। পত্রিকাটি এখন পর্যন্ত চালু রয়েছে। বর্তমানে এর সম্পাদক সৈয়দ মবনু। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে আবদুর রহমান চৌধুরী সিংকাপনীর সম্পাদনায় *'আল বালাগ'* প্রকাশিত হয়। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে মো. আবদুস সাত্তারের সম্পাদনায় *'আল-আমান'* প্রকাশ পায়। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে কোলকাতা থেকে *'অন্তঃপুর'* প্রকাশিত হয়। এর চতুর্থবর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে সম্পাদক ছিলেন হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে উদয়চাঁদ রায় বি.এ কর্তৃক মাসিক *'উদয়কাল'* প্রকাশিত হয়। এটি ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতে প্রকাশিত হতো। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে রায়বাহাদুর রমণীমোহন দাস কর্তৃক *''কমলা'* প্রকাশিত হয়। প্রতুলচন্দ্র সোমের সম্পাদনায় মাসিক *'কৃষি বিজ্ঞান'* প্রকাশের খবর জানা যায়। এছাড়া *'শিক্ষাবিজ্ঞান'* ও *The Indian Messenger* নামে আরও দুখানা পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। বঙ্কুবিহারী দাশের সম্পাদনায় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে

[২] মো. আবদুল আজিজ, বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড, কুমারপাড়া, সিলেট, ১৯৯৭, পৃ. ৩৪৮-৩৫২।

প্রকাশিত হয় *'গান ও গল্প'* নামক সাময়িকপত্র। কনকপ্রভা দেব সম্পাদিত *'গৃহলক্ষ্মী'* প্রথম সংখ্যা ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। সিলেটের মণিপুরী সম্প্রদায়ের সাময়িকপত্র মাসিক *'জাগরণ'* অর্জুন সিংহ বি.এল-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে নারী জাগরণমূলক পত্রিকা *'জাগৃহি'* প্রকাশিত হয়। এটিও সম্পাদনা করেন কনকপ্রভা দেব। ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গ ও আসাম মুসলিম ছাত্র সমাজের মাসিকপত্র *'প্রভাতী'* মৌলবি রাজিউর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এর দ্বিতীয়বর্ষের সম্পাদক ছিলেন শাহেদ আলী। খ্রিস্টান মিশনারি পত্রিকা *'বঙ্গবামাবন্ধু'* ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই মাসিকের সম্পাদক ছিলেন রেভারেন্ড জে.পি জোন্স। *'শ্রীহট্ট বন্ধু'* নামে আরও একখানা পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে মাসিক *'বলাকা'* প্রকাশিত হয়। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রথমে ত্রৈমাসিক রূপে এটা প্রকাশ পায়। এর সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন দাস। বলাকার তৃতীয় বর্ষ থেকে পঞ্চম বর্ষ সংখ্যা সম্পাদনা করেন দুর্গাপ্রসন্ন দাস। তৃতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যা থেকে দ্বাদশ সংখ্যা যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেন কালীপ্রসন্ন দাস ও অমিয়াংশু এন্দ। মাসিক সাময়িকী *'বাণী'* ১৯২৮ সালে সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য বাণীর সম্পাদক ছিলেন। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে বিনোদবিহারী চক্রবর্তী ও উপেন্দ্রচন্দ্র ভদ্রের সম্পাদনায় *'বিবর্ত্তন'* প্রকাশিত হয়। মণিপুরী ও বাংলা দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা *'মণিপুরী'* ১৩১৪ বঙ্গাব্দে সমরজিৎ সিংহ এম.এস.সি-এর সম্পাদনায় শিলচর থেকে প্রকাশিত হয়। *'মৈত্রী'* নামে দুখানা পত্রিকা ১৩৩৬ এবং ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে যথাক্রমে সুধাংশুকুমার শর্ম্মা এবং বিধুভূষণ চৌধুরী ও অশোকবিজয় রাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে মাসিক *'রঙ্গমহল'* গিরিজাভূষণ দে-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ সালের জানুয়ারি মাসে লালাপ্রসন্ন কুমার দে-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক *'রসরাজ'*। সাপ্তাহিক জনশক্তির অন্যতম সম্পাদক সতীশচন্দ্র দেব নবীন বয়সে বিয়ানীবাজারের লাউতা গ্রাম থেকে *'লাউতা প্রকাশ'* নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর প্রকাশকাল জানা যায়নি। ডাক্তার বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় মাসিক *'শক্তি'* প্রকাশিত হয়। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি সম্পাদিত 'শ্রীহট্টদর্পণ' প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রীহট্ট সুহৃদ সমিতির মাসিক পত্ররূপে *'শ্রীহট্ট সুহৃদ'* প্রকাশিত হয়। তবে ১৮৯০ সালের জানুয়ারি মাসে *'শ্রীহট্ট সুহৃদ'* নামে আরও একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশের খবর পাওয়া যায়। এর সম্পাদক ছিলেন কৈলাশচন্দ্র বিশ্বাস। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক *'সম্পাদ'* প্রকাশিত হয়। এ অধ্যায়ে পাঠকদের সুবিধার্থে সিলেট এবং

সিলেটের বাইরে থেকে মাসিক পত্রিকার বিবরণ সারণি-১৮১ এবং সারণি-১৮২ -এ প্রদর্শিত হলো।

সারণি-১৮৬

সিলেট থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রপত্রিকা (১৮৯০-১৯৪২)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
আজান	১৩৪৮ ব.	সালাউদ্দিন ইউসুফ	কানাইঘাট
আল-ইসলাহ	১৩৩৯ ব.	মুহম্মদ নূরুল হক	সিলেট
কমলা	১৯৩১ খ্রি.	রমণীমোহন দাস ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী	সিলেট
কৃষি-বিজ্ঞান	--	প্রতুলচন্দ্র সোম	সিলেট
গান ও গল্প	১৩০৩ ব.	বঙ্কুবিহারী দাস	সিলেট
জাগরণ	--	অর্জুন সিংহ	সিলেট
জাগৃতি	১৩৪৫ ব.	কনকপ্রভা দেব	সিলেট
প্রভাতী	১৯৪২ খ্রি.	রজিউর রহমান	সিলেট
বলাকা	১৩৪৪ খ্রি	কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য	সিলেট
বাণী	১৯২৮ খ্রি.	কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য	সিলেট
মণিপুরী	১৩৪০ ব.	অশ্বিনীকুমার শর্মা	সিলেট
কোরক	১৩১৬ ব.	আবদুল মুহিত চৌধুরী	সিলেট
নগর	--	তোফাজ্জল হোসেন	সিলেট
আজান	১৩৫৫ ব.	ফারুকউদ্দিন চৌধুরী	সিলেট
বঙ্গবামাবন্ধু	১৯০২ খ্রি.	রেভা. জে পি জোন্স	সিলেট
বিবর্তন	১৩৪৮ ব.	বিনোদবিহারী চক্রবর্তী	সিলেট
নিশানা	১৩৫৮ ব.	মো. হবিবুর রহমান	সিলেট
জনশিক্ষা	--	কাজী বদরুদ্দিন হায়দর	সিলেট
মৈত্রী	১৩৩৬ ব.	সুধাংশুকুমার শর্মা	সিলেট
মৈত্রী	১৩৩৮ ব.	বিধুভূষণ দে	সিলেট
রংমহল	১৩৩৯ ব.	গিরিজাভূষণ দে	সিলেট
রসরাজ	১৮৯১ খ্রি.	লালা প্রসন্নকুমার দে	সিলেট
শক্তি	--	বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী	সিলেট
শ্রীহট্ট দর্পণ	১৩০৬ ব.	অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি	সিলেট
শ্রীহট্ট বন্ধু	--	রেভা. জে পি জোন্স	সিলেট
শ্রীহট্ট সুহৃদ	১৮৯০ খ্রি.	কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস	সিলেট
সন্ধানী	১৩৩৫ ব.	বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস	সিলেট
সম্পদ	১৩৪৭ ব.	হরেন্দ্রকুমার চৌধুরী	সিলেট
আল আমান	১৩৪৯ ব.	মোহাম্মদ এ সাত্তার	সিলেট
তকবীর	১৯৪২ খ্রি.	মোহাম্মদ এ সাত্তার	সিলেট
জালালাবাদ	--	রজিউর রহমান	সিলেট
নবারুণ	--	খয়রুল আমীন মঞ্জু	সিলেট

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮

সারণি-১৮৭

সিলেটের সাংবাদিক কর্তৃক সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা (১৮৮৪-১৯৭৪)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
আলোচনা	১৮৮৪ খ্রি.	বিপিনচন্দ্র পাল (ভারপ্রাপ্ত)	কোলকাতা
অন্তঃপুর	১৩০৫ ব.	হেমন্তকুমারী চৌধুরী	কোলকাতা
আল কেরামত	১৯২৮ খ্রি.	মৌলবি আবদুল আজিজ	ঢাকা
জয়শ্রী	১৩৩৮ ব.	লীলা নাগ	কোলকাতা
তবলীগ	--	আবদুল হক	কোলকাতা
নবারুণ	১৩৪০ ব.	নরেশ্বর ভট্টাচার্য	কোলকাতা
পল্লী স্বরাজ	--	জ্ঞানাঞ্জন পাল	কোলকাতা
নারী মঙ্গল	১৩৩৭ ব.	প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত	কোলকাতা
দামিনী	--	জিতেন্দ্রনাথ দাস	--
আল মুসলিম	১৯৪০ খ্রি.	ফজলুল হক সেলবর্ষী	কোলকাতা
সংবাদ	--	আবদুস সামাদ	শিলং
সবুজ পাতা	--	শাহেদ আলী	ঢাকা
মিনার	১৯৪৯ খ্রি.	বেগম ফওজিয়া সামাদ	ঢাকা
শ্রীহট্ট বার্তা	১৩৩৮ ব.	নরেশ্বর ভট্টাচার্য	কোলকাতা
প্রদীপ	১৩০৬ ব.	বৈকুণ্ঠনাথ দাশ	কোলকাতা
প্রাচ্যবার্তা	১৩৪৭ ব.	হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	শিলচর
বাজাম-ই খেয়াল (উর্দু)	১৯৩০ খ্রি.	আবু ছুফি মো. বশির	শিলং
বিজয়া	১৯১২ খ্রি.	রমেশচন্দ্র চৌধুরী	কোলকাতা
বিজয়িনী	১৩৪৭ ব.	জ্যোৎস্না চন্দ	শিলচর
বৈজয়ন্তী	১৩৪৬ ব.	জগদীশ ভট্টাচার্য	কোলকাতা
ভবিষ্যত	১৯২৭ খ্রি.	নেগন্দ্রচন্দ্র শ্যাম	শিলচর
মাসপয়লা	১৯৩৫	ক্ষিতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য	কোলকাতা
সখা, দাসী	১৩০৬ ব.	বৈকুণ্ঠনাথ দাস	কোলকাতা
মণিপুরী	১৩৪৬ ব.	সমরজিৎ সিংহ	শিলচর
শিক্ষা পরিচয়	১২৯৬ ব.	শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	রাজশাহী
শিক্ষা বিজ্ঞান	--	প্রতুলচন্দ্র সোম	কোলকাতা
শ্রীচৈতন্য বোধিনী	১৮৯১ খ্রি.	শরৎচন্দ্র তপস্বী	বৃন্দাবন
শ্রীভূমি	১৩২৬ খ্রি.	সতীশচন্দ্র দেব ও ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব	
গিরিকা	--	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	শিলং
কৌমুদি	--	বিপিনচন্দ্র পাল	কোলকাতা
শনিবারের চিঠি	--	জগনানন্দ দাস	কোলকাতা
শক্তি	--	বৈকুণ্ঠকুমার দাস	কোলকাতা
সংঘশক্তি	--	চন্দ্রকুমার দে	কোলকাতা
সময়	--	ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব	শিলচর
ঢাকা ডাইজেস্ট	১৯৭৪ খ্রি.	রশীদ চৌধূরী	ঢাকা
রূপসী	--	রণজিৎ নাগ	কোলকাতা

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮

দ্র. : ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট-পূর্ব পত্রিকাগুলোর প্রকাশ স্থান সিলেট হিসেবে গণ্য।

সিলেট থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সিলেট থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলো দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পত্রিকার তথ্য তুলে ধরা হলো:[৩]

বলাকা

১৩৪২ বঙ্গাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। প্রথমে ত্রৈমাসিক পরে মাসিক এবং শেষ পর্যন্ত দৈনিক হিসেবে (১৯৩৯) একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দৈনিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন দাস।

শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণ পরিষদ পত্রিকা

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। প্রথমবর্ষের চারটি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন কামিনীকুমার ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩৪) চার সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন সতীশচন্দ্র চৌধুরী। চতুর্থবর্ষের (১৩৩৬) প্রথম সংখ্যাটি সম্পাদনা করেন ভূবনমোহন বিদ্যার্ণব। চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা এবং পঞ্চম বর্ষের (১৩৩৬-৩৭) সব সংখ্যা সম্পাদনা করেন কালীজয় ভট্টাচার্য ন্যায়পঞ্চানন। রমণীমোহন দাস ও অতুলচন্দ্র নন্দীর সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক *‘সমবায়’* ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র *‘শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’* ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রথম থেকে ষষ্ঠ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা পর্যন্ত এর সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী বি.এল এবং ষষ্ঠ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা থেকে যৌথভাবে এর সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী ও যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। সপ্তম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৪৯) থেকে চতুর্দশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৫৬) সম্পাদনা করেন যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। মাসিক এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চার দিকটিও সমানভাবে কার্যকর ছিল। আমরা সিলেট থেকে এবং সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকার বিবরণ সারণি-১৮৩ ও সারণি-১৮৪ -এর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি।

সারণি-১৮৮

সিলেট থেকে প্রকাশিত বাংলা ত্রৈমাসিক পত্রিকা (১৯২৬-১৯৪১)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
ব্রতী	১৯৩৩ খ্রি.	সৈয়দ বদরুল হোসেন	মৌলভীবাজার
শ্রীহট্ট, ব্রাহ্ম পরিষদ পত্রিকা	১৩৩৩ ব.	কালীজয় ভট্টাচার্য ও প্রণব চৌধুরী	সিলেট
শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	১৩৩৩ ব.	মোহাম্মদ সালেহ উদ্দিন	সিলেট
ইশারা	১৩৬৩ ব.	মোহাম্মদ সালেহ উদ্দিন	সিলেট
শিক্ষা	--	হিরামণি দাসগুপ্ত	সিলেট
উন্মেষ	১৯২৬ খ্রি.	জতেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, অনন্তচরণ বিশ্বাস ও অশ্বিনীকুমার শর্মা	সুনামগঞ্জ
সমবায়	১৩৩৩ ব.	রমণীমোহন দাস	সিলেট

[৩] মো. আবদুল আজিজ, বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, প্রথমখন্ড, কুমারপাড়া, সিলেট, ১৯৯৭, পৃ. ৩৫২-৩৫৩।

সাহিত্য	১৯৪১ খ্রি.	আমিনুল হক	সিলেট
দি এওয়েকেনিং	১৯৪১ খ্রি.	এম এ ওসমানী	সিলেট

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮

সারণি-১৮৯

সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা (১৯৪১-১৯৬২)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
ব্রাহ্মতত্ত্ব	১৩০৩ ব.	সীতানাথ তত্ত্বভূষণ	কোলকাতা
শিক্ষক	--	জগন্নাথ দেব	শিলচর
শিক্ষা সেবক	১৩৩২ ব.	কেদারনাথ চৌধুরী	শিলচর
সাহিত্য	১৯৪১ খ্রি.	আমিনুল হক	শিলং
ইসলামি একাডেমিক পত্রিকা	১৯৬২ খ্রি.	শাহেদ আলী	ঢাকা

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮
দ্র. : ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট-পূর্ব পত্রিকাগুলোর প্রকাশ স্থান সিলেট হিসেবে গণ্য।

প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকা এ সময় সিলেট থেকে প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে লালাপ্রসন্নকুমার দে সম্পাদিত *‘এপ্রিল ফুল’* ও *‘এপ্রিল রহস্য’*, ১৮৯২ সালে মহেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত রম্যপত্রিকা *‘গদাধর’* গিরিজাভূষণ দে সম্পাদিত *‘ফুলতত্ত্ব প্রকাশিকা’*, গিরিজাভূষণ দে সম্পাদিত অপর পত্রিকা *‘রঙ্গমহল’* ও *‘রসরঙ্গিনী’* এবং হিরন্ময় দাস ও জিতেশ দত্ত সম্পাদিত ‘বার্ষিক স্মৃতি’ (১৩৪৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪] এ অধ্যায়ে সিলেট এবং সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকার বিবরণ সারণি-১৮৫ -এর মাধ্যমে দেওয়া হলো।

সারণি-১৯০

সিলেট ও সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকা (১৮৮২-১৯৬৭)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
এপ্রিল ফুল	--	লালা প্রসন্নকুমার দে	সিলেট
এপ্রিল রহস্য	--	লালা প্রসন্নকুমার দে	সিলেট
গদাধর	১৮৯২ খ্রি.	মহেন্দ্রনাথ দাস	সিলেট
ঝংকার	--	কিরণশশী দে	সুনামগঞ্জ
দাসতত্ত্ব দীপিকা	১৩৩৭ ব.	চন্দ্রকিশোর সরকার	কৈলাশহর
প্রদীপ	--	সুরেশরঞ্জন গোস্বামী	সুনামগঞ্জ
ফুলতত্ত্ব প্রকাশিকা	১৮৮২ খ্রি.	গিরীজাভূষণ দে	সিলেট
রংমহল	--	গিরীজাভূষণ দে	সিলেট
লাবান শিশু লাইব্রেরি	১৩৪৮ ব.	পীযূষকিরণ ভট্টাচার্য	সিলেট
স্মৃতি	১৩৪৮ ব.	হিরন্ময় দাসগুপ্ত	সিলেট

[৪] মো. আবদুল আজিজ, বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, প্রথমখন্ড, কুমারপাড়া, সিলেট, ১৯৯৭, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪।

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
কাফেলা	১৯৬৭ খ্রি.	মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ	সিলেট
আবাহনী	১৩৪৬ ব.	রণবীর দাসগুপ্ত	মৌলভীবাজার
রসরঙ্গিনী	--	গিরিজাভূষণ দে	সিলেট

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮

দ্র. : ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট-পূর্ব পত্রিকাগুলোর প্রকাশ স্থান সিলেট হিসেবে গণ্য।

সিলেট থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পত্রপত্রিকা

সিলেট অঞ্চল থেকে বাংলা ভাষায় পত্রপত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকারও সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালের আগে সিলেট অঞ্চল থেকে যে সকল ইংরেজি পত্রপত্রিকা বের হয়েছিল তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরা হলো :[৫]

১. Friends of Sylhet

এটা খ্রিস্টান মিশনারি পত্রিকা। সিলেটের স্থানীয় খ্রিস্টানরা Friends of Sylhet বের করতেন। ১৯০০ সালে সিলেট থেকে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

২. The Assam Herald

সাপ্তাহিক The Assam Herald আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯৩৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার। এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন সিলেটের ভাদেশ্বর নিবাসী আবদুল মতিন চৌধুরী। এই সাপ্তাহিকটির মূল্য ছিল দুই আনা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ছিল পাঁচ টাকা। আবদুল মতিন চৌধুরী সাপ্তাহিক The Sylhet Chronicle- এর রাজদ্রোহী প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে একবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের Forward -এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও তিনি Advance, Bombay Chronicle ও 'মাসিক মোহাম্মদী'র সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

৩. The Awakening

পত্রিকাটি ছিল নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র। প্রথম প্রকাশকাল জানা যায়নি। তবে দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা বের হয়েছিল পয়লা নভেম্বর, ১৯৪১ সালে। এই হিসাব থেকে গণনা করলে ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে বলে ধরা যায়। এর সম্পাদক ছিলেন এম.এ ওসমানী। এর প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল আট আনা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ছিল দুই টাকা।

৪. Janasakti

সাপ্তাহিক 'জনশক্তি' প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলায় ১৯২১ সালে। ১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি 'জনশক্তি'র ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইংরেজি সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। প্রায় বছরখানেক Janasakti বের হয়েছিল।

---

[৫] মো. আবদুল আজিজ, বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড, কুমারপাড়া, সিলেট, ১৯৯৭, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫।

৫. The Sylhet Chronicle এই ইংরেজি সাপ্তাহিকটি ১৯২১ সালের ৪ এপ্রিল আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী। তাঁর বাড়ি ছিল সিলেটের ধর্মধা গ্রামে। পত্রিকাটি সপ্তাহের প্রতি সোমবারে বের হতো। পত্রিকাটির মূল্য ছিল দুই আনা।

৬. The Weekly Chronicle সিলেট থেকে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র The Weekly Chronicle বের হয়েছিল ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ সালে। এর সম্পাদক ছিলেন রাঢ়িশাল, হবিগঞ্জ নিবাসী শশীন্দ্র সিংহ। তিনি করিমগঞ্জ থেকে The Eastern Chronicle নামে অন্য একখানি সাপ্তাহিকও সম্পাদনা করতেন। The Weekly Chronicle সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবারে বের হতো এবং মূল্য ছিল এক আনা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ছিল চার টাকা।

ব্যাংকিং বিষয়ক এই মাসিক পত্রিকাখানা মাত্র দুই সংখ্যা বের হয়েছিল। প্রথম সংখ্যা ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে এবং আরো এক সংখ্যা ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজি মাসিকখানা সম্পাদনা করতেন নরেশচন্দ্র দত্ত ও কে বি সেনগুপ্ত।

বীমা বিষয়ক এই মাসিকখানির মাত্র একটি সংখ্যা বের হয়েছিল। এর সম্পাদক ছিলেন লাখাই, হবিগঞ্জ নিবাসী সুবিনয় দত্ত বি.কম.।

পাঠকের সুবিধার্থে সিলেট থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক (সারণি-১৮৪), সিলেটের বাইরে থেকে সিলেটের সাংবাদিক কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক (সারণি-১৮৭), সিলেটের সম্পাদক কর্তৃক সিলেটের বাইরে থেকে ইংরেজি পাক্ষিক (সারণি-১৮৮), সিলেট থেকে প্রকাশিত ইংরেজি মাসিক (সারণি-১৮৯) এবং সিলেটের সম্পাদক কর্তৃক সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত ইংরেজি মাসিক (সারণি-১৯০) পত্রিকার বিবরণ প্রদর্শিত হলো।

সারণি-১৯১

সিলেট থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক (১৯০০-১৯৩৯)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
আসাম হ্যারল্ড	১৯৩৯ খ্রি.	আবদুল মতীন চৌধুরী	সিলেট
নিউ এজ	-	রজিউর রহমান	সিলেট
উইকলি ক্রনিকল	১৯০০ খ্রি.	শশীন্দ্রকুমার সিংহ	সিলেট
ওয়ার্ল্ড পিস	-	ড. অচলানন্দ	সিলেট
ইস্টার্ন হ্যারল্ড	-	আমীনুর রশীদ চৌধুরী	সিলেট
সিলেট ক্রনিকল	১৯২১ খ্রি.	নবনীকুমার গুপ্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ও কালীকৃষ্ণ দেব	সিলেট

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮

সারণি-১৯২

সিলেটের বাইরে থেকে সিলেটের সাংবাদিক কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক (১৮৮৩-১৯৪২)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
বেঙ্গালি পাবলিক অপিনিয়ন	১৮৮৩ খ্রি.	বিপিনচন্দ্র পাল	কোলকাতা
ডেমোক্রেট	-	বিপিনচন্দ্র পাল	এলাহবাদ
নিউ ইন্ডিয়া	১৯০১ খ্রি.	বিপিনচন্দ্র পাল	কোলকাতা
ফরোয়ার্ড ব্লক	-	লীলাবতী রায়	কোলকাতা
মর্নিং স্টার	১৯২৫ খ্রি.	স্বামী অব্যক্তানন্দ	পাটনা
ইন্ডিয়ান অবজারভার	১৯৩৪ খ্রি.	ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ	কোলকাতা
শিলং হ্যারল্ড	১৯৩৩ খ্রি.	রণজিৎ নাগ	শিলং
শিলং মেইল	১৯৩৪ খ্রি.	লালা বিজয়কুমার দে	শিলং
নিউ এরা	১৯৩৭ খ্রি.	অমিয়সিন্ধু রায়	শিলং
বেঙ্গাল উইকলি	১৯৪২ খ্রি.	আলতাফ হোসেন	কোলকাতা

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮

সারণি-১৯৩

সিলেটের সম্পাদক কর্তৃক সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পাক্ষিক (১৯০৮-১৯৩৫)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
স্বরাজ	১৯০৮ খ্রি.	বিপিনচন্দ্র পাল	লন্ডন
ওয়ার্ল্ড পিস	১৯৩৫ খ্রি.	এ মহাভারতী	--

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮

সারণি-১৯৪

সিলেট থেকে প্রকাশিত ইংরেজি মাসিক (১৯২৭-১৯৩৯)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
দি সিটিজেন	--	তোফাজ্জল হোসেইন	সিলেট
সুরমা ভ্যালি ম্যাগাজিন	১৯২৭ খ্রি.	রেভা. ডব্লিউ এইচ এস উড	--

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮

সারণি-১৯৫

সিলেটের সম্পাদক কর্তৃক সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত ইংরেজি মাসিক (১৮৭৫-১৯৩৮)

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	যেখান থেকে প্রকাশ
হিন্দু রিভিয়্যু	১৯১২ খ্রি.	বিপিনচন্দ্র পাল	কোলকাতা
ইন্ডিয়ান স্টোরি টেলার	১৯৩৮ খ্রি.	জ্ঞানাঞ্জন পাল	কোলকাতা
ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন	১৯৩৮ খ্রি.	জ্ঞানাঞ্জন পাল	কোলকাতা
ম্যাসেঞ্জার	১৯৩৩ খ্রি.	আবদুস সামাদ ও জামিল আহমদ	শিলং
ইন্ডিয়ান খ্রিস্টান হ্যারাল্ড	১৮৭৫ খ্রি.	রেভা. জয়গোবিন্দ সোম	কোলকাতা

সূত্র : এসএনএইচ রিজভি এমএ প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সিলেট, ১৯৭০; মহিউদ্দিন শীরু প্রণীত সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, ১৯৯৮

আগের আলোচনায় ১৮৩৯ থেকে ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধকালে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এককথায় ১৩০ বছরের সাংবাদিকতার ইতিহাসে সিলেট এবং সিলেটের বাইরে থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা এই সময়সীমায় সহজেই অনুধাবন করা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮৭ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বর্তমান সিলেট জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর বিবরণ পাঠকের সুবিধার্থে সারণি-১৯১, সারণি-১৯২, সারণি-১৯৩ ও সারণি-১৯৪ -এর মাধ্যমে দেখানো হলো।

সারণি-১৯৬

সিলেট জেলার দৈনিক পত্রিকার তালিকা (১৯৮৭-২০১৪)

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	প্রকাশকের নাম	পত্রিকা প্রকাশের সাল
০১	দৈনিক যুগভেরী	ফাহমীদা রশীদ চৌধূরী	১৯৯৩
০২	দৈনিক জৈন্তাবার্তা	রশীদ হেলালী	১৯৯১
০৩	দৈনিক সিলেটের ডাক	মো. রাগীব আলী	১৯৮৪
০৪	দৈনিক সিলেট বাণী	মো. জহিরুল হক চৌধুরী	১৯৮৭
০৫	দৈনিক জালালাবাদ	মুকতাবিস উন নূর	১৯৯২
০৬	দৈনিক শ্যামল সিলেট	এম.এ রহিম	১৯৯৪
০৭	দৈনিক কাজীর বাজার	কাজী এখলাছউর রহমান	২০০১
০৮	দৈনিক সচিত্র সিলেট	এমরান আহমদ চৌধুরী	২০০৪
০৯	দৈনিক সিলেট প্রতিদিন	ড. তৌফিক রহমান চৌধুরী	২০০৬
১০	দৈনিক সবুজ সিলেট	মো. মুজিবুর রহমান	২০০৬
১১	দৈনিক উত্তরপূর্ব	শফিউল আলম চৌধুরী	২০০৭
১২	দৈনিক সিলেট সংলাপ	মুহাম্মদ ফয়জুর রহমান	২০০৮
১৩	দৈনিক আলোকিত সিলেট	ফজলুল করিম মো. শাহজাহান	২০০৮
১৪	দৈনিক পুণ্যভূমি	ব্যারিস্টার মুস্তাকিম রাজা	২০১৩
১৫	দৈনিক সুদিন	মহিউদ্দিন শীরু	২০০০

১৬	দৈনিক বৃহত্তর সিলেটেরমানচিত্র	মো. রেজাউল ইসলাম চৌধুরী	২০০৮
১৭	The Daily Sylhet	বকসি ইকবাল আহমদ	২০১০
১৮	দৈনিক দুনিয়া আখেরাত	ডা. মোখলিছউর রহমান	২০১০
১৯	দৈনিক সিলেট সুরমা	মো. নাজমুল ইসলাম	২০১০
২০	দৈনিক শুভ প্রতিদিন	সরওয়ার হোসেন	২০১২
২১	দৈনিক সিলেটের হালচাল	মো. ছুরত আলী	২০১২
২২	দৈনিক বিজয়ের কণ্ঠ	জে.এ কাজল খান	২০১৪
২৩	দৈনিক সিলেট কণ্ঠ	আবদুল খালিক	২০১৪

সূত্র : জেলা প্রশাসক অফিস, সিলেট

সারণি-১৯৭

সিলেট জেলার সাপ্তাহিক পত্রিকার তালিকা (১৯৮৭-২০১৪)

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	প্রকাশকের নাম	পত্রিকা প্রকাশের সাল
০১	সাপ্তাহিক ফেঞ্চুগঞ্জ সমাচার	মাহমুদ-উস-সামাদ চৌধুরী	১৯৮৭
০২	সাপ্তাহিক অনুপম	ইকবাল কবির	১৯৯১
০৩	সাপ্তাহিক উদীয়মান	মোহাম্মদ ইয়াহইয়া	১৯৯২
০৪	সাপ্তাহিক সিলেট	মো. ফররুখ আহমদ চৌধুরী	১৯৯১
০৫	সাপ্তাহিক গোলাপ	মো. আক্তারুজ্জামান	১৯৯৫
০৬	সাপ্তাহিক সিলেট পরিক্রমা	মো. হিফজুর রহমান	১৯৯৪
০৭	সাপ্তাহিক সময়ের ডাক	মো. ইলিয়াছুর রহমান	১৯৯৪
০৮	সাপ্তাহিক সিলেট বিভাগ	কাজী এনামউদ্দিন আহমদ	১৯৯৫
০৯	সাপ্তাহিক সচিত্র ক্রাইম	সৈয়দ আবু জাফর	১৯৯৬
১০	সাপ্তাহিক ভোরের সিলেট	মোহাম্মদ আব্দারুল হক	১৯৯৮
১১	সাপ্তাহিক টেমস সুরমা	হাবিব উল্লা ফারুক ইবনে আম্বিয়া	২০০০
১২	সাপ্তাহিক সিলেটের তথ্য	আতাউর রহমান	২০০০
১৩	সাপ্তাহিক সোনার সিলেট	এ.কে এম নজরুল ইসলাম চৌধুরী	২০০৩
১৪	সাপ্তাহিক সিলেটের আওয়াজ	মো. শাহজাহান সেলিম বুলবুল	২০০২
১৫	সাপ্তাহিক বালাগঞ্জ বার্তা	শাহাবুদ্দিন শাহিন	২০০৪
১৬	সাপ্তাহিক দিগন্ত সিলেট	ওলি মোহাম্মদ	২০০৭
১৭	সাপ্তাহিক বিয়ানীবাজার বার্তা	ছাদেক আহমদ আজাদ	২০০৬
১৮	সাপ্তাহিক দিবালোক	মো. আবু হাসনাত	২০০৭
১৯	সাপ্তাহিক বিয়ানীবাজার আলো	আব্দুল খালিক	২০১৩
২০	সাপ্তাহিক সিলেটের আলো	বিদ্যুৎজ্যোতি দে	২০০৭
২১	সাপ্তাহিক নবদ্বীপ	আব্দুল বাছিত টিপু	২০০৮
২২	সাপ্তাহিক দিন রাত	ফয়জুর রহমান	২০০৬
২৩	সাপ্তাহিক বৈচিত্র্যময় সিলেট	মো. আবুল কাশেম	২০০৮
২৪	সাপ্তাহিক গ্রাম সুরমা	মহিউদ্দিন শীরু	২০০৮
২৫	সাপ্তাহিক আগামী প্রজন্ম	মিলাদ মো. জয়নুল ইসলাম	২০০৯
২৬	সাপ্তাহিক সপ্তাহজুড়ে	মো. আব্দুর রহিম	২০০৯
২৭	সাপ্তাহিক সিলেটের কাগজ	কায়সান ইসলাম	১৯৯১
২৮	সাপ্তাহিক অপূর্ব সিলেট	তাওহিদুল ইসলাম	২০১০
২৯	সাপ্তাহিক আমাদের সিলেট	ডা. মো. মিফাতহুল হোসেন	২০১০

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	প্রকাশকের নাম	পত্রিকা প্রকাশের সাল
৩০	সাপ্তাহিক সম্ভাবনা	মাছুম আহমদ	২০১০
৩১	সাপ্তাহিক গোলাপগঞ্জ বিয়ানীবাজার সংবাদ	মাওলানা রশিদ আহমদ	২০১০
৩২	সাপ্তাহিক ভিডিএন	হারুনুর রশীদ	২০১০
৩৩	সাপ্তাহিক সিলেট প্রান্ত	খন্দকার মামুন আলী আখতার	২০১১
৩৪	সাপ্তাহিক বাংলার বারুদ	আজির হোসেন	২০১১
৩৫	সাপ্তাহিক ইউনানী কণ্ঠ	আখতার হোসেন	২০১১
৩৬	সাপ্তাহিক নকশী বাংলা	সালেহ আহমদ হোসাইন	২০১১
৩৭	সাপ্তাহিক সুরমা টাইমস	হাবিবুর রহমান তাফাদার	২০১২
৩৮	সাপ্তাহিক সীমামন্ত কণ্ঠ	সিরাজুল ইসলাম	২০১২
৩৯	সাপ্তাহিক জকিগঞ্জ সংবাদ	শরীফ মো. হোসাইন চৌধুরী (তারেক)	২০১২
৪০	সাপ্তাহিক বিজয়ের কণ্ঠ	এ কাজল খান	২০১২
৪১	সাপ্তাহিক সোনালী সিলেট	গৌছুল হক নাঈম	২০১১
৪২	সাপ্তাহিক সিলেটের তথ্য	আতাউর রহমান	২০০০
৪৩	সাপ্তাহিক ফেঞ্চুগঞ্জ বার্তা	সাইফুল্লাহ আল হোসাইন	২০০৮
৪৪	সাপ্তাহিক সপ্তাহজুড়ে	মো. আব্দুর রহীম	২০০৯
৪৫	সাপ্তাহিক কুশিয়ারার কূল	মো. হুসাইন আহমদ	২০১২
৪৬	সাপ্তাহিক বিয়ানীবাজারের আলো	আব্দুল খালিক	২০১৩
৪৭	সাপ্তাহিক জকিগঞ্জ কানাইঘাটের ডাক	মোর্শেদ আলম লস্কর	২০১৩
৪৮	সাপ্তাহিক কানাইঘাটের ডাক	মো. দিলদার হোসেন	২০১৩
৪৯	সাপ্তাহিক হলি সিলেট	মো. শফিকুল ইসলাম	২০১৪
৫০	সবুজপ্রান্ত	জুবায়ের আহমদ	

সূত্র : জেলা প্রশাসক অফিস, সিলেট

সারণি-১৯৮
সিলেট জেলার মাসিক পত্রিকার তালিকা (১৯৮৭-২০১৪)

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	প্রকাশকের নাম	পত্রিকা প্রকাশের সাল
০১	মাসিক তৌহিদী পরিক্রমা	শাহীনুর পাশা চৌধুরী	১৯৯৪
০২	মাসিক পলাশ (সেবা ট্রাস্টের মাসিক)	শেখ ফারুক আহমদ	১৯৯৮
০৩	মাসিক ভিলেজ ডাইজেস্ট	বসির হোসেন চৌধুরী	১৯৯৯
০৪	মাসিক মারজান	মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান	২০০০
০৫	মাসিক বাসিয়া	মোহাম্মদ নওয়াব আলী	২০০২
০৬	মাসিক আজকের বিশ্ব বাংলা	মহিত চৌধুরী	২০০৩
০৭	মাসিক আলোর নাচন	মো. লবিবুর রহমান	২০০৭
০৮	মাসিক সীমান্ত কুড়ি	মোর্শেদ আলম লস্কর	২০০৮
০৯	মাসিক আল ফারুক	মুহাম্মদ শিববীর আহমদ	২০০৮
১০	মাসিক রূপসী সিলেট	মো. আবু হানিফা	২০০৯
১১	মাসিক শাহ জালাল	রুহুল ফারুক	২০০৯
১২	মাসিক অভিমাত্রিক	মো. রফিকুল ইসলাম	২০১৩
১৩	মাসিক সিলেট বাজার	মো. ছুরত আলী	২০১৩
১৪	মাসিক আমাদের বিশ্বনাথ	মো. ছুরত আলী	২০১৩
১৫	মাসিক জাগরণ সিলেট	মো. বশির আহমদ	২০১৩

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	প্রকাশকের নাম	পত্রিকা প্রকাশের সাল
১৬	মাসিক সাগ্নিক	সঞ্জয় কান্তি দেব	২০১৪
১৭	মাসিক বিশ্বনাথ ডাইজেস্ট	মো. রফিকুল ইসলাম জুবায়ের	২০১০
১৮	মাসিক কানাইঘাট বার্তা	হাবিব আহমদ	২০১২

সূত্র : জেলা প্রশাসক অফিস, সিলেট

সারণি-১৯৯

সিলেট জেলার পাক্ষিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকার তালিকা (১৯৯১-২০১৪)

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	পত্রিকা প্রকাশের সাল
০১	পাক্ষিক ম্যাগাজিন পনের দিন	১৯৯১
০২	পাক্ষিক ম্যাগাজিন দেশ দুনিয়া	১৯৯১
০৩	পাক্ষিক ম্যাগাজিন তাহরিক	১৯৯২
০৪	ত্রৈমাসিক নাটক	১৯৯২
০৫	ত্রৈমাসিক দি ইউনিয়ন ট্রাই জার্নাল	২০০৮
০৬	পাক্ষিক বিশ্বনাথ বার্তা	২০১৪

সূত্র : জেলা প্রশাসক অফিস, সিলেট

উল্লেখ্য যে, প্রায় ১৭৫ বছরের (১৮৩৯-২০১৪) সংবাদপত্র সেবায় অবিভক্ত সিলেট থেকে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় পত্রিকা প্রকাশের তথ্য আমাদের প্রাণিত করে।

বাংলাদেশ বেতার

গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্র এ অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ বেতারের ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মধ্যে সিলেট কেন্দ্র অন্যতম। ১৯৫৮ সালে প্রথম সিলেট শহরের টিলাগড়ে প্রেরণকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৬১ সালের ১ সেপটেম্বর থেকে। প্রথমদিকে শুধু ঢাকার অনুষ্ঠান রিলে করে প্রচার করা হতো। এখান থেকে নিজস্ব অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৬৭ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্র একটি পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৮ সালের ২২ নভেম্বর থেকে নগরীর মিরের ময়দানের প্রচার ভবন থেকে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। টিলাগড়ের দপ্তরটি কেবল প্রেরণ কেন্দ্র হিসেবে চালু রয়েছে। বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রের স্টুডিও সংখ্যা ৫, প্রেরণ যন্ত্রের সংখ্যা ৪। ২০১৩ সালের অক্টোবর থেকে এফ.এম ৮৮.৮ মেগাহার্জে এ কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন রিলে সেন্টার

নগরীর শাহী ঈদগাহ নিকটবর্তী কাজিটুলা এলাকায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি রিলে সেন্টার রয়েছে। এ কেন্দ্র থেকে কেবল বিটিভির অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা রয়েছে।

অধ্যায়-২৫

সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ সিলেট। সিলেটের ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ। পাহাড়, টিলা, অসংখ্য নদনদী, হাওর, বাঁওড়, বিল ও জলাভূমি, সমৃদ্ধ বনাঞ্চল ও সবুজ শ্যামল চা-বাগান, অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদ, সুবর্ণ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য, বাঙালি ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সৌভ্রাতৃত্বময় বসবাস, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, উপমহাদেশের বিখ্যাত সাধক শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি এবং অলিকুল শিরোমণি হজরত শাহজালাল (র.) এর পুণ্য স্মৃতিসমৃদ্ধ দেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী বলে খ্যাত সিলেট এক অনন্যসাধারণ জনপদ।

বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব কোণে অবস্থিত বৃহত্তর সিলেট জেলা। ১৯৮৪ সালে এ জেলার ৩টি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা হয়। সাবেক সিলেট মহকুমাই বর্তমান সিলেট জেলায় পরিণত হয়েছে। মোট ১৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত সিলেট জেলার আয়তন ৩৪৫২.০৭ বর্গ কি.মি. ও লোকসংখ্যা ৩৪,৩৪,১৮৮। জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৯৫ জন, যা গোটা দেশের গড় জনঘনত্বের কাছাকাছি। সিলেটের অধিবাসীর সিংহভাগ বাঙালি। তবে গারো, খাসিয়া, পাত্র, টিপরা, সাঁওতাল, ও মণিপুরি প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীও বাস করে। ব্রিটিশ আমল থেকেই সিলেটবাসীর এক বৃহৎ অংশ প্রবাসী হয়ে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি যেমন বিদেশে গৌরবের সাথে বহণ করছে তেমনি তাদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিকে করছে সমৃদ্ধ। তা ছাড়া পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সিলেটবাসীরা কর্মোপলক্ষ অভিবাসন করে তাদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দ্বারা দেশীয় অর্থনীতিকে উজ্জীবিত রাখছে।

সিলেটের প্রাচীনত্বের প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় জৈন্তিয়া রাজ্যের কথা, যার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এখনো রয়েছে জৈন্তিয়া রাজার বাড়ি, তার বিচারক্ষেত্র ও মেগালিথিক পাথর। দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা ওই অঞ্চলের, বিশেষত জাফলং, শ্রীপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে গেলে কিছুতেই রাজবাড়ি দেখার কথাটি ভোলেন না। এই রাজ্য নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামান্য কিছু গবেষণা হলেও এখন পর্যন্ত আশানুরূপ অনুসন্ধান হয়নি। এই রাজবাড়িটিকে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সামনে যথাযোগ্য মর্যাদায় উপস্থাপন করতে পারলে তাদের কৌতূহল যেমন নিবৃত্ত হবে, তেমনি আমাদের জাতীয় গৌরবও বৃদ্ধি পাবে।

সিলেট জেলার উন্নয়ন-সম্ভাবনার বিবেচনায় প্রথমেই আসে খনিজ সম্পদের কথা। হরিপুরে প্রথম গ্যাসের মজুদ আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৫ সালে। বর্তমানে এ জেলায় মোট ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের ১৬টি কূপ থেকে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের

পরিমাণ ৪৮৪৭ বিলিয়ন কিউবিক ফুট। এই বিপুল গ্যাসভাণ্ডার এ এলাকায় শিল্প উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। কৃষি উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কৃত্রিম সার এই গ্যাস থেকেই উৎপাদিত হয়। ১৯৬১ সালে দেশের প্রথম সার কারখানা (ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা) এই গ্যাসের ওপর ভিত্তি করেই স্থাপিত হয়। এর পাশাপাশি স্থাপিত আরো একটি সার কারখানায় (জালালাবাদ সার কারখানা) অচিরেই উৎপাদন শুরু হতে যাচ্ছে।

সিলেটের কৈলাশ টিলায় গ্যাসের উপজাত হিসেবে পাওয়া যায় পেট্রোলিয়াম, ডিজেল, কেরোসিন, মোটর স্পিরিট ও এলপি গ্যাস। সিলেটে অকটেন মানের তেলের মজুদ ১ (এক) কোটি ব্যারেল। যথাযথ অনুসন্ধানে আরো বেশি তেল, কেরোসিন, এমনকি কয়লাও পাওয়া যেতে পারে। দেশি-বিদেশী বেসরকারি বিনিয়োগকারীগণ অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড়ো বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। সে ক্ষেত্রে বিদ্যুৎখাতসহ অন্যান্য অবকাঠামোতে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

জাফলং, কোম্পানীগঞ্জ, ও ভোলাগঞ্জ থেকে উত্তোলিত বিপুল পরিমাণ বোল্ডার পাথর, নুড়ি পাথর ও বালি সিলেটের অন্যতম সম্পদ । দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিশেষ করে রাস্তা, ব্রিজ, ফ্লাইওভার, দালানকোঠা নির্মাণের জন্য এসবের আর কোনো বিকল্প নেই। লোয়ার রিপারিয়ান দেশের সুবিধায় সীমান্তবর্তী পাহাড় থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে বাংলাদেশের নদীতে নেমে আসা এই সব বালু ও পাথর সমগ্র দেশে চালান হয়ে থাকে।

সিলেটজুড়ে রয়েছে বিস্তৃত বনাঞ্চল। এতে রয়েছে নানা জাতের ওষধি গাছ। ওষধি গাছের উপকারিতা ও ব্যবহার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত, তাই এই গাছগুলো দেশে ব্যবহার করেও বিদেশে রফতানি সম্ভব। বনাঞ্চলে ওষধি গাছের পাশাপাশি রয়েছে আসবাবপত্র ও ঘরবাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহৃত অনেক মূল্যবান গাছ, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সেগুন, শাল, চাম, গামার, গর্জন, সুন্দি, মেহগনি। বলাই বাহুল্য যে, বনের সব গাছই যে পরিকল্পিতভাবে বেড়ে ওঠে তা নয়, এগুলো এমনি-এমনিতেও জন্মায় ও বেড়ে ওঠে, তাই এই গাছগুলো পরিকল্পিতভাবে রোপণ করা গেলে এর থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন সম্ভব।

সিলেটের বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে একাধিক শিল্পকারখানা স্থাপন করা সম্ভব। একসময় বাঁশকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তা পরিত্যক্ত হয়। অথচ বিশেষজ্ঞজনের গবেষণাসহ উপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বাঁশ, ঘাস ও নলখাগড়াকে কেন্দ্র করে শিল্পকারখানা স্থাপন করে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন সম্ভব। বাঁশ এমন একটি উদ্ভিদ যা শিল্প কারখানার কাঁচামাল ছাড়াও ঘর তৈরির কাজ থেকে শুরু করে আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, ঘরের চাল তৈরির কাজেও ব্যবহৃত হয়। বাঁশ অল্পমূল্যে পাওয়া যায় বলে যে তা ব্যবহৃত হয় তা

নয়, এগুলো অনেক রুচিবান সৌখিন লোকেরাও আধুনিক ঘরবাড়ি, অফিস-দোকান প্রভৃতি সাজসজ্জার জন্য ব্যবহার করা শুরু করেছেন। এ ছাড়া অনেক কারুপণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে বাঁশ এবং এগুলো দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সমাদৃত হচ্ছে, তাই এই বাঁশ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরি।

সিলেটের একটি উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনাময় শিল্প হলো বেতের তৈরি আসবাবসামগ্রী। এখানকার শীতলপাটি, মুড়া, বেতের সোফা, দেরাজ ও পার্টিশন বিশ্বখ্যাত। বেত (কেইন) বিয়ানীবাজার, সালুটিকর, বিভিন্ন চা-বাগান ও হাওর এলাকায় উৎপন্ন হয়। কাঁচামালের অভাবে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পটি এখন সমস্যার ভারে জর্জরিত। বিশেষ করে বেতের আসবাবপত্র নির্মাণে নিয়োজিত উদ্যোক্তাগণ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ‘গল্লা’ আমদানি করে অথবা অতি উচ্চমূল্যে কৃত্রিম প্লাস্টিকের বেত সংগ্রহ করে কোনোমতে এ শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বিশেষজ্ঞগণের মতে, গল্লার জীবনচক্র মাত্র ১০ বছরের। সে ক্ষেত্রে বর্তমানে বেতের গল্লা যে সকল উপজেলায় ফলানো হচ্ছে, সেখানে চা-বাগানে বাধ্যতামূলকভাবে পতিত জমির অর্ধেক এলাকাজুড়ে এবং খাসজমিতে গল্লা চাষের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পত্তন ও প্রণোদনা দেওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। তা ছাড়া কম পোক্ত গল্লা কাটার বিরুদ্ধে আইনি এবং সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব প্রয়োজন। সিলেটে তৈরি বেতের আকর্ষণীয় আসবাবপত্র বিলাত ও আমেরিকায় বাঙালি মালিকানাধীন রেস্টুরেন্টগুলোর অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার কাজে ব্যবহারের জন্য জোগান দেওয়া যেতে পারে।

দেশ-বিদেশে সিলেটের কমলালেবু, আনারস, সাতকরা, থৈকর, তেজপাতা প্রভৃতির রয়েছে অশেষ কদর। এগুলোর ফলন ও বিপণনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিলেটের একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হলো হাওর-বাঁওড়, বিল, নদী, জলাশয় প্রভৃতি। এগুলোতে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ করলে এর থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা জরুরি যে, সিলেটের মৎস্য সম্পদ, ফলমূল ও শাকসবজি প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য সর্বাধুনিক হিমাগার প্রতিষ্ঠা ও রফতানির জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণের কারখানা নেই। এ জন্য সিলেটের মৎস্য সম্পদ বিদেশে রফতানি করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য পরিকল্পিত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ আবশ্যক।

সিলেটের বালিমাটি দিয়ে অনায়াসে স্থাপন করা যেতে পারে বাণিজ্যিকভাবে কাচ তৈরির কারখানা। গবেষণায় দেখা গিয়েছে সিলেটের বালি কাঁচ তৈরির জন্য উৎকৃষ্ট মানের।

বর্তমানে দেশ-বিদেশে টেরাকোটা বা পোড়ামাটি শিল্পের কদর বেড়েছে এখন দেশের বড়ো বড়ো ভবনে, সুপারমার্কেটের সামনে, কর্পোরেট অফিস ও বাড়ির ভিতরে ও দেওয়ালে শোভা পায় টেরাকোটা। এই টেরাকোটা তৈরির জন্য এ

অঞ্চলের চিত্রশিল্পী ও ভাস্করেরা বহুদিন ধরেই সিলেটের মাটি ব্যবহার করছেন। যেহেতু টেরাকোটা তৈরির প্রক্রিয়া কিছুটা ব্যয়বহুল এবং এর জন্য যোগ্য শিল্পীর সক্রিয় অংশগ্রহণও প্রয়োজন, তাই এর জন্য পৃষ্ঠপোষকতার কোনো বিকল্প নেই।

সিলেটের মাটি দিয়ে তৈরি সিরামিক বহুদিন ধরেই দেশে সমাদৃত হয়েছে। সিলেটের খাদিম নগরে তৈরি খাদিম সিরামিকস এর বড়ো প্রমাণ। এ শিল্পে যথাযথভাবে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ থাকলে এ থেকে অনেক উপার্জন সম্ভব।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেটে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা গগনচুম্বী। এ জেলায় বন আর জলের নিঃশব্দ সৌন্দর্যের রাতারগুল জলারবন (সোয়াম ফরেস্ট), অবস্থিত। খাদিম রেইন ফরেস্ট, পান্না-সবুজ জলের লালাখাল, পাহাড়কন্যা জাফলংয়ের চমৎকার ছড়া-নুড়িসমৃদ্ধ পিয়াইন নদী ও সীমান্তের ওপার থেকে নেমে আসা স্বচ্ছ জলের ঝরনা, চিরসবুজ চা-গাছে আবৃত উঁচু-নিচু পাহাড়-টিলা, হজরত শাহজালাল (র.)ও তাঁর সহযাত্রী ধর্মপুরুষদের মাজার-সমাধিসমৃদ্ধ সিলেট হতে পারে বাংলাদেশের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন বলয়। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর দর্শনীয় স্থান, যেমন সুনামগঞ্জের টাংগুয়ার হাওর, লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, মাধবকুন্ড জলপ্রপাতকেও এই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

যে কোনো স্থানে পর্যটকদের আকর্ষণের আবশ্যক শর্ত ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা। সিলেট সড়ক, রেল ও আকাশপথে রাজধানীর সাথে যুক্ত হলেও এগুলোর আরো সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন দরকার। আখাউড়া-সিলেট সেকশনে ট্রেনের ডাবল ট্র্যাক নির্মাণ এবং দ্রুতগতির ট্রেন সার্ভিস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করা যেতে পারে। চার লেইনে উন্নয়ন সম্ভব না হলেও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কটি অনতিবিলম্বে প্রশস্ত করা প্রয়োজন। ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে আরো সম্প্রসারণ করে আরো বেশি ফ্লাইট ওঠানামার সুযোগ তৈরি করা জরুরি। নেপালের কাঠমান্ডু এবং ভারতের দিল্লি থেকে সিলেট এবং সিলেট থেকে সরাসরি কক্সবাজার হয়ে ব্যাংকক পর্যন্ত বিমান যোগাযোগ তৈরি করা গেলে বিপুল সংখ্যক বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করা যাবে। এ ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমে দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর ও হিমালয় দেখতে আসা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পর্যটককে সিলেটে আনা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, সব পর্যটকই সীমিত অর্থ এবং সময় ব্যয় করে সর্বোচ্চসম্ভব আনন্দ উপভোগের চেষ্টা করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের অনুকরণে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত পর্যটন-পুলিশ নিয়োগের কথাও ভাবা উচিত। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে হোটেল ও ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট বিভাগ খুলে পর্যটন ব্যবস্থাপনায় দক্ষ লোকবল তৈরি করা যেতে পারে। সিলেটে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইতোমধ্যেই বেশ কটি বিশ্বমানের অবকাশযাপন কেন্দ্র (রিসোর্ট)

স্থাপিত হয়েছে। হোটেল, অবকাশযাপন কেন্দ্র, এয়ার লাইনস ও ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে আবশ্যকীয় কোলাবরেশন স্থাপন করে বিদেশি পর্যটকদের কাছে সিলেটকে তুলে ধরা যেতে যেতে পারে।

বাংলাদেশ সংলগ্ন ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে প্রায় এককোটি বাঙালি বসবাস করেন, যারা একসময়ে বৃহত্তর সিলেটেরই অংশ ছিলেন এবং তারা এখনো ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে সিলেটি। ওই এলাকার ভারতীয় জনগণ চিকিৎসা সেবার জন্য সুদূর পশ্চিম বাংলা বা অন্য কোনো রাজ্যের ওপর নির্ভর করে থাকেন। সিলেটে মানসম্মত স্বাস্থসেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারলে ওই অঞ্চলের লোকেরা ছাড়াও আরও বহুসংখ্যক আঞ্চলিক স্বাস্থ্যপর্যটক আকর্ষণ করা সম্ভব।

সিলেটে বাণিজ্যিকভাবে মানসম্মত বৃদ্ধাশ্রম গড়ে-ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রবাসে অবসরজীবনে একাকিত্ব ও নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা দেশে থাকতে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। উপযুক্ত মূল্যে সেবা ও পরিচর্যা পেলে অনেকেই এই সুযোগ নিতে আগ্রহী হবেন।

শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে সিলেটের ঐতিহ্য সুবিদিত। 'চর্যাপদ'-এর ভাষার সঙ্গে সিলেটি উপভাষার সাদৃশ্য নিয়ে ইতোমধ্যে যে গবেষণা হয়েছে তা প্রশ্নাতীত না হলেও, এতে এ অঞ্চলের সাহিত্য-ঐতিহ্যের নিদর্শন বহন করছে। মধ্যযুগে ভারতের নবদ্বীপ ও মিথিলা ছিল এক সমৃদ্ধ জ্ঞানক্ষেত্র। সেখানে এ অঞ্চলের রঘুনাথ শিরোমণি, শ্রীবাস পন্ডিত, বৃন্দাবন দাস, মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের অবদানের কথা স্বীকৃত। আধুনিক যুগের সাহিত্যেও রয়েছে সিলেটের কবি-সাহিত্যিকদের অবদান। এই সকল অবদানের পাশাপাশি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় সিলেটের বিশেষ লিপির কথা, যার নাম নাগরী লিপি। এই নাগরী লিপিতে লিখিত হয়েছে প্রচুর সুফি শাস্ত্রগ্রন্থ, ফকিরি গান, ধর্ম-পুরাণাশ্রিত পুথি প্রভৃতি, যা এই অঞ্চলের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন বহন করছে। ইতোমধ্যে নাগরী লিপি নিয়ে দেশ-বিদেশে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাও হয়েছে। তারপরও এই অঞ্চলের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উপস্থাপন করার মতো এখানে কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোনো বিভাগও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তা প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি পাবে বলে আমাদের ধারণা।

সিলেটের উন্নয়ন সম্ভাবনায় বড়ো একটি উপাদান প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ। ২০১২-১৩ সালে দেশে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১,১৫,৬৪৬.১৬ কোটি টাকা। এ অর্থের একটি বড়ো অংশ সিলেটের প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন। তার একটা অংশ খরচ হয় কিছু জৌলুসপূর্ণ অট্টালিকা, বড়ো বড়ো শপিং মল ও জমি ক্রয়ে। এক হিসাব অনুযায়ী সিলেট বিভাগের ব্যাংকগুলোতে জমাকৃত অর্থের এক-চতুর্থাংশও সিলেটবাসী বিনিয়োগে ব্যবহার করছেন না। যথাযথ

উদ্যোগের মাধ্যমে এ অর্থ বিনিয়োগে ব্যবহৃত হলে সিলেট তথা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিপুলভাবে বাড়ানো সম্ভব।

নিষ্কণ্টক জমির স্বল্পতা দেশে বৃহৎ শিল্প স্থাপনের অন্যতম অন্তরায়। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মাধবপুর থেকে শায়েস্তাগঞ্জ এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উভয় পাশে উর্বর ফসলি জমিতে শিল্পকারখানা স্থাপনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুরে শিল্প স্থাপনের উপযোগী প্রচুর নিষ্ফলা জমি অনেকটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ইতোমধ্যেই সুরমা নদীর ওপর নির্মিত দুটি ব্রিজ এবং বাইপাসের মাধ্যমে এই বিশাল এলাকাগুলোকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। সিলেটে অপেক্ষাকৃত ডোসাইল শ্রমশক্তির প্রাপ্যতাও রয়েছে। এমতাবস্থায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উপরিউল্লিখিত স্থানসমূহের খাসজমিতে শিল্পস্থাপনের জন্য সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা যেতে পারে। সম্প্রতি কোম্পানীগঞ্জে একটি ‘হাইটেক পার্ক’ নির্মাণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তা দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করা উচিত।

বৃহত্তর সিলেটের চারটি জেলার সংযোগস্থল শেরপুরে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার যে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের নৈকট্য, ঢাকা ও চট্টগ্রামের সাথে সড়ক যোগাযোগ, নৌপথে পরিবহণ সুবিধা, জমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি মিলিয়ে এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য স্থান নির্বাচন যথাযথ হয়েছে। স্বল্প ব্যয়ে রেলের সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে এটিকে সিলেট-চট্টগ্রাম ও সিলেট-ঢাকা রেল নেটওয়ার্কের সাথেও যুক্ত করা যেতে পারে। এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলটির কাজ অতি দ্রুত শেষ হলে দেশি-বিদেশি বেসরকারি উদ্যোক্তা, বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগে উৎসাহী হবে।

সিলেটে নির্মিতব্য বিশেষায়িত আইটি পার্কটিই হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় হাইটেক পার্ক বা ইলেকট্রনিক সিটি। (শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) সিএসই কার্নিভাল ২০১৭-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি’ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহেমদ এ তথ্য জানান।) ‘সিলেট শহর’ থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে কোম্পানীগঞ্জে ১৬২ একর জায়গায় নির্মানাধীন হাইটেক পার্কটি নির্মাণে ব্যয় হবে ৩৭৮ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে দেশি-বিদেশি অনেক প্রতিষ্ঠানই এখানে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে। এখানে ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে। সিলেট হাই-টেক পার্ক নির্মাণের ফলে বিশ্বমানের বিনিয়োগ পরিবেশ এবং সুযোগ সুবিধাদি সৃষ্টির মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের আইটি-আইটিএস প্রতিষ্ঠান এবং ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানকে আকৃষ্ট করা যাবে। ফলে আইসিটি পেশাজীবীদের জন্য বহু চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হবে।

সিলেট বিভাগীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনাবাদি কৃষি জমি আবাদের আওতায় নিয়ে আসার কাজ চলমান রয়েছে। সিএনজি এবং ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার কারণে গ্রামীন পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধিত হয়েছে যার প্রভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে চাঙাভাব লক্ষণীয়। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, নারীরা আগের চাইতে বেশি হারে কাজে যুক্ত হচ্ছে ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিলেট জেলাকে পর্যটন নগরী হিসেবে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। পর্যটকদের আকৃষ্টকরণের জন্য যোগাযোগ, আবাসন ও নিরাপত্তা বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সিলেট জেলার অর্থনীতি আরও গতিশীল হবে আশা করা যায়।

জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নসংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ

(গত ২৫/০৮/২০১৪ তারিখে গঠিত)

প্রধান উপদেষ্টা: মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

উপদেষ্টা:
সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ।
সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়।
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নসংক্রান্ত সম্পাদনা পরিষদ

(গত ২৫/০৮/২০১৪ তারিখে গঠিত)

প্রধান সম্পাদক: ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

নির্বাহী সম্পাদক: জনাব মো. নজিবুর রহমান, সচিব।

যুগ্ম-নির্বাহী সম্পাদক: সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

সদস্য:

১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মনোনিত প্রতিনিধি।
২। মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৪। যুগ্ম-সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
৫। যুগ্ম-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬। যুগ্ম-সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৭। যুগ্ম-সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৮। যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯। যুগ্ম-সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ।
১০। যুগ্ম-সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১১। যুগ্ম-সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
১২। যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
১৩। যুগ্ম-সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
১৪। যুগ্ম-সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৫। যুগ্ম-সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১৬। যুগ্ম-সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৭। যুগ্ম-সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৮। যুগ্ম-সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
১৯। যুগ্ম-সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২০। যুগ্ম-সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
২১। যুগ্ম-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

(১–২১: মনোনিত প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নিচে নয়))

২২। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন),পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
২৩। মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি।
২৪। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি
(২জন মনোনিত প্রতিনিধি)।
২৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।
২৬। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।
২৭। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
২৮। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।
২৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৩০। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩১। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩২। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৩। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৪। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৫। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৬। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩৭। প্রতিনিধি, ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), মতিঝিল, ঢাকা।

৩৮। প্রতিনিধি, BRAC University

৩৯। মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪০। প্রতিনিধি, NGO Foundation.

সদস্যসচিব: উপ-সচিব (উন্নয়ন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

যাদের অবদানে এ গেজেটিয়ার প্রণীত

পরামর্শক: ড. মো. হাফিজুর রহমান ভূঞা
অতিরিক্ত সচিব (অব.)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	নাম ও ঠিকানা
১	ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশ	ক) জনাব আফতাব চৌধুরী সাংবাদিক-কলামিস্ট, সিলেট খ) জনাব মো. আনোয়ারুল ইসলাম প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় । গ) জনাব আব্দুল করিম কীম সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন সিলেট । ঘ) ড. এজেডএম মঞ্জুর রশিদ সহযোগী অধ্যাপক ফরেস্ট্রি অ্যান্ড ইনভাইরনমেন্টাল সাইন্স বিভাগ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ।
২	ইতিহাস	জনাব মোস্তাফিম আহমদ চৌধুরী অধ্যাপক বৃন্দাবন কলেজ, সিলেট।
৩	অধিবাসী, সমাজ ও নারীর ক্ষমতায়ন	ক) জনাব এনামুল হাবীব প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিলেট সিটি করপোরেশন, সিলেট। খ) জনাব সঞ্জয়কৃষ্ণ বিশ্বাস সহকারী অধ্যাপক এ্যাস্থ্রপোলজী বিভাগ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। গ) জনাব এ, কে, শেরাম সভাপতি মণিপুরী সাহিত্য সংসদ, সিলেট।
৪	জনপ্রশাসন	ক) জনাব সাজ্জাদুল হাসান কমিশনার সিলেট বিভাগ,সিলেট খ) জনাব মো. শহিদুল ইসলাম জেলা প্রশাসক সিলেট

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	নাম ও ঠিকানা
		গ) জনাব নুরে আলম মিনা পিপিএম, পুলিশ সুপার সিলেট
৫	ভুমিরাজস্ব ও ব্যবস্থাপনা	জনাব হাসান মাহমুদ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সিলেট
৬	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	ক) ড. মো. আবদুল বাসেত অধ্যাপক কৃষি বিভাগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। খ) ড. এ এইচ এম মাহফুজুল হক সহযোগী অধ্যাপক কৃষি বিভাগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। গ) ড. মো. আবু সাইদ অধ্যাপক, মৎস্য বিভাগ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঘ) জনাব সঙ্কর রঞ্জন দাস জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিলেট। ঙ) ডা: মো. নূরুল ইসলাম জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
৭	অর্থনৈতিক অবস্থা	ক) প্রফেসর মো. আব্দুল আজিজ এমেরিটাস অধ্যাপক মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, সিলেট। খ) এস. এম আনিসুজ্জামান যুগ্মপরিচালক বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, সিলেট
৮	যোগাযোগ ব্যবস্থা	জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি, সিলেট।
৯	শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য	জনাব এ জেড এম নুরুল হক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সিলেট
১০	স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও জনস্বাস্থ্য	ক) ডা. মো. আজহারুল ইসলাম, সিভিল সার্জন সিলেট। খ) প্রফেসর শিব্বির আহমেদ বিভাগীয় প্রধান কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ ওসমানী মেডিকেল কলেজ। গ) প্রফেসর মীর মাহবুবুল আলম

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	নাম ও ঠিকানা
		বিভাগীয় প্রধান সার্জারি বিভাগ নর্থ-ইস্ট মেডিকেল কলেজ। ঘ) ড. লুৎফুন্নাহার জেসমিন উপপরিচালক ফ্যামিলি প্ল্যানিং, সিলেট ঙ) জনাব মো. হনিফ নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ। চ) ড. সুধাময় মজুমদার চিফ মেডিকেল অফিসার সিলেট সিটি করপোরেশন।
১১	শিক্ষা	ক) ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ অধ্যক্ষ মদন মোহন কলেজ, সিলেট। খ) জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সিলেট গ) জনাব পুলিনচন্দ্র রায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সিলেট সদর, সিলেট।
১২	ভাষা ও সাহিত্য	ক) জনাব নন্দলাল শর্মা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, সিলেট খ) ড. মো. জফির উদ্দিন সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	ক) জনাব পরিমল সিংহ উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, সিলেট বিভাগ। খ) ড. সুভাস চন্দ্র বিশ্বাস উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, সিলেট। গ) জনাব শুভেন্দু দাস উপ-পরিচালক বিআরডিবি, সিলেট। ঘ) জনাব মো. মাহবুবুল হক হাজারী

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	নাম ও ঠিকানা
		জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সিলেট।
১৪	ঐতিহাসিক ও দর্শনীয়স্থান এবং স্থাপত্য	ড. মোস্তাক আহমাদ দীন অধ্যক্ষ সিলেট কমার্স কলেজ।
১৫	ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ	জনাব অপূর্ব শর্মা নির্বাহী সম্পাদক দৈনিক যুগভেরী, সিলেট।
১৬	খাদ্য ও পুষ্টি	ক) ড. মো. মোজাম্মেল প্রফেসর ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টি টেকনোলজি বিভাগ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। খ) ড. এসএম আবু সায়েম সহযোগী অধ্যাপক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়াটেকনোলজি বিভাগ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
১৭	দূর্যোগ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন	ক) প্রফেসর ড. মো. জহির বিন আলম বিভাগীয় প্রধান সিভিল এন্ড এনভাইরন মেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। খ) জনাব মো. শহিদুর রহমান সহকারী পরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিলেট।
১৮	বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	ক) ড. মোহাম্মদ শহিদুর রহমান বিভাগীয় প্রধান কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। খ) জনাব তানভীর আল নাফীস সহকারী কমিশনার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট। গ) জনাব চৌধুরী মোকাম্মেল ওয়াহিদ বিভাগীয় প্রধান কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগ মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, সিলেট।
১৯	বিশেষ পণ্য	জনাব অপূর্ব শর্মা নির্বাহী সম্পাদক দৈনিক যুগভেরী, সিলেট।
২০	প্রাকৃতিক সম্পদ	ক) ড. মো. শফিকুল ইসলাম

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	নাম ও ঠিকানা
		বিভাগীয় প্রধান পেট্রোলিয়ম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। খ) মো. শহিদুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বোর্ড জালালবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড
২১	জীবন-জীবিকা	ড. মো. সালেহ উদ্দীন সাবেক ভিসি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
২২	অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	ক) জনাব মো. শামসুল আলম নির্বাহী কর্মকর্তা বাংলাদেশ ওভারসিজ সেন্টার, সিলেট। খ) ড. মোস্তাক আহমাদ দীন অধ্যক্ষ সিলেট কমার্স কলেজ, সিলেট। গ) জনাব মো. শামসুল আলম নির্বাহী কর্মকর্তা বাংলাদেশ ওভারসিজ সেন্টার, সিলেট।
২৩	খেলাধুলা	জনাব আজিজ আহমেদ সেলিম সভাপতি সিলেট জেলা প্রেসক্লাব
২৪	গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা	ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ অধ্যক্ষ মদনমোহন কলেজ, সিলেট
২৫	সমস্যা ও সমাধান	ক) ড. মো. সালেহ উদ্দীন সাবেক ভিসি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। খ) ড. মোস্তাক আহমাদ দীন অধ্যক্ষ সিলেট কমার্স কলেজ, সিলেট।

নির্ঘণ্ট

অ

অদ্বৈত আচার্য, ২৪৯
অন্তঃপুর মাসিক পত্রিকা, ২৫২
অন্নদাকুমার সাংখ্যতীর্থ, ২৪৫
অবাঙ্গী টিলা, ২
অমলসিদ, ৩
অর্থকি টিলা, ২
অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, ৪৫৩, ৪৫৪
অস্ট্রিক ভাষাভাষী, ৭৫
অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ড, ২২১
অ্যাক্রোজ দা সেভেন সীস এন্ড থার্টিন রিভার্স, ৪৪২

আ

আইন অমান্য আন্দোলন, ৪৩
আখাউড়া বাইপাস, ১৮৯
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৫৭
আজমল আলী চৌধুরী, ৫৩, ৪১২
আবুল মাল আবদুল মুহিত, ৫৩, ৩০৭, ৩২৬, ৩৯৩, ৪৪৪
আরবি, ৬৩, ২৭৯
আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, ২৮
আশ্রয়ণ প্রকল্প, ৩৫৮, ৩৫৯
আসাম প্রদেশ, ১১৬
আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে, ১৮৯

ই

ইউএস বাংলা এয়ার ওয়েজ, ২০৯
ইনারসী, ৪৪৩
ইন্দো-আর্য জনগোষ্ঠী, ৮২
ইন্নাফি ওড়না, ৭৫
ই-পর্চা, ৪৬৯
ইপিআই কর্মসূচি, ২৪১
ইবনে বতুতা, ৩১,
ইস্কান্দর মির্জা, ৫৬
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ৩৬, ১১৫, ২২৯

উ

উইমেন্স মেডিকেল কলেজ, ২৫১
উইলিয়াম কেরি, ২৪৬
উইলিয়াম থ্যাকারে, ৩৬
উপজেলা প্রশাসন, ১১৪
উভচর প্রাণী, ১৭, ১৮
উরাং (ওঁরাও), ৭৯, ৮০

এ

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, ৩৫২, ৩৫৩
একনজরে ডিজিটাল সিলেট, ৪৬৮
এমএজি ওসমানী, ৫২, ২৩৩, ৩৬৭, ৩৯৫
এম্পিরিয়েল গেজেটিয়ার, ২৬৪
এলাহী বকশ হামেদ মজুমদার, ২৪৫
এস্টেট, ১১৬
এহিয়া ভিলা, ২৪৯

ঐ

ঐতিহ্যবাহী খাবারসমূহ , ৪২১

ও

ওয়াকফ সম্পত্তি , ১৪৮
ওয়ানগালা, ৭৯
ওয়েলস প্রেসবিটারিয়ান মিশন, ২৫৩
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ২০৭
ওসমানী জাদুঘর, ৩৬৬, ৩৬৭
ওসমানী শিশু পার্ক, ২২১
ওসমানী মেডিকেল কলেজ, ২৫১
ওসাই, ৭৮

ক

কমনওয়েলথ, ৪৪৬
কমিউটার, ২০৪
কমিউনিটি ক্লিনিক, ২৪৩
কমিউনিস্ট পার্টি, ৪৩
করিমগঞ্জ, ৪৯, ৫০, ৫৯, ৯৩, ২০৫, ২৪৫
করুণাময় তর্কবাগীশ, ২৪৫

কামরূপ, ২৮, ৮২
কামাখ্যাচরণ তর্কস্মৃতিতীর্থ, ২৪৫
কালনী, ৬
কালেক্টর, ১১৬
কালেক্টর ই এ গ্লোভার, ১৩৭
কীনব্রিজ, ৩৬৭, ৩৬৮
কুশিয়ারা, ৬
কুষ্ঠ আশ্রম, ২৩০
কূলচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, ২৪৫
কেশোরীমোহন বালিকা বিদ্যালয়, ২৫৩
কৈলাশটিলা, ৪৮২
কোয়ালেশন মন্ত্রিসভা, ৪৪, ৫৫
কোহিমা ইস্পল সীমান্ত, ৪৫
ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ, ১১৯
ক্রিপস মিশন, ৪৬
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ৭২
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস, ৪২৭, ৪২৮

খ

খাজাঞ্চী বাড়ি, ২৪০
খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, ১১
খান বাহাদুর আবু নছর মোহাম্মদ এহিয়া ওয়াকফ্ এস্টেট, ১৪৯
খানবাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী, ৩৭৯
খাসি, ৭৫
খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়, ১
খোজা, ৩৬
খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব, ৫২

গ

গণতান্ত্রিক যুবলীগ, ৫১
গণভোট, ৪৮
গারো খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়, ৬
গোয়াইন, ৩, ৭
গোল্ড ট্রফি টেনিস প্রতিযোগিতা, ৫০৮
গৌড়, ৯১
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ২৪৫

ঘ

ঘাষানি মহাল, ১২৪
ঘোড়াউত্রা, ৫

চ

চর্যাপদ, ২৬৪, ৩০৪
চাঁদনীঘাট, ৩৩, ১০৭
চাকলা, ৯১
চাচ্চি, ৭৯
চা-বাগান, ১৬২
চা-বাগানে চাকরির সুবাদে অভিবাসন, ৪৩৯
চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী, ৮০, ৮২
চিফ কমিশনার, ১১৬
চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ১০৮
চুনাপাথর, ১
চেঙ্গোর খাল, ৪, ৭, ১৮৯
চেরাগং টিলা, ২

ছ

ছয় দফা দাবি, ৫৬
ছাতক, ১৮৯

জ

জওহরপ্রথা, ৩৩
জগন্নাথ মিশ্র, ২৪৯
জন উইলিস, ৫৯
জন টেইলর, ২২৯
জমিদার মৌলবি রবি খাঁ, ২৪৫
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, ৪৮
জলমহাল, ১২৪
জলারবন, ১০
জাকারিয়া সিটি, ২২১
জাদুকাটা, ৩
জাফলং সবুজ উদ্যান, ১০
জায়গিরদার, ১১৫
জার্নাল অব আসাম রিসার্চ সোসাইটি, ৩৪
জিতু মিঞা, ১৪৯
জুড়ী নদী, ৪

জেলাপ্রশাসন, ৯২
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র, ৪৬৯
জৈন্তা নারীরাজ্য, ২২১
জৈন্তা রাজবাড়ি, ৩৭১, ৩৭৩
জৈন্তাপুর, ১
জৈন্তিয়া, ৯১

ঝ

ঝুলনযাত্রা, ৭৪

ট

টিলাগড় ইকোপার্ক, ১০, ৪৮৯, ৪৯০
টোল, ২৪৬
টোল-চতুস্পাঠী, ২৪৯

ড

ডাইরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস, ২৩২
ডাউকি চ্যুতি, ৯
ডাউকি পিয়াইন নদী, ১২৬
ডিএসএ কাপ টেনিস প্রতিযোগিতা, ৫০৯
ডিজিটাল বাংলাদেশ, ৪৬০
ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, ৫০০, ৫১৩
ড্যাম নির্মাণ, ৪

ত

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সিলেটের সম্ভাবনা, ৪৭০
তহশিলদার, ১১৬
তাপস বৈশ্য, ৫০৭
তাম্রলিপি, ২৭
তাম্রশাসন, ২৪৫
তারাপুর, ২, ১৪১, ৩৯৫
তিন মন্দির বাড়ি, ৩৭৪
তুলাপুরুষ যজ্ঞ, ২৯
তোফাজ্জুল আলী ফজলী, ২৪৫
ত্রিপুরা, ২৮

থ

থাপমু, ৭৭

দ

দশনামী আখড়া, ৩৭৪
দি এইডেড হাইস্কুল, ২৪৮
দিলওয়ার, ৩০৯, ৩১০, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৮, ৩২৬,
দেওয়ান তালেবুর রাজা ট্রাস্ট, ৩৭৯
দোলমন্দির, ৩৭৪
দ্রাবিড়, ৮২

ধ

ধনু, ৫
ধলাই নদী, ৪, ১২৭
ধলেশ্বরী, ৫

ন

নংখ্রেম নাচ, ৭৬
নকশিকাঁথা, ৮৮, ৮৯
নদনদী, ১৭১
নবকিশোর সেন, ২৫০
নবদ্বীপ, ২৪৯
নভো এয়ারওয়েজ, ২০৯
নমশূদ্র, ৬৯
নর্থইস্ট ইউনিভার্সিটি ও সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ২৫১
নর্থ-ইস্ট মেডিকেল কলেজ, ২৫১
নাটমন্দির, ৩৭৪
নানকার প্রথা, ৪৪
নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সিলেট, ২৫১, ২৫৪
নুরুল ইসলাম নাহিদ, ৫৩, ৫৭, ৩০৯
নুরুল হোসেন খান, ৪৭

প

১৫৪৮ সালের ভুমিকম্প, ৪৩০
পঞ্চখন্ডল, ৮৩
পঞ্চায়েত সভা, ৭৩
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, ২৪৬
পদ্মপুরাণ, ৩০৫
পন্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য , ২৪৫
পরগনা, ৯২, ১১৬

পরিযায়ী পাখি, ২০, ২২
পর্যটন শিল্প, ২২০, ২২১
পল্লি জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ), ৩৫০
পল্লি স্বায়ত্তশাসিত আইন, ৩৪৬
পশ্চিমবঙ্গ, ৬০
পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন, ২৬৬
১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৪০৩
পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে, ২০১
পাঙান, ৭৩
পাত্র ভাষা, ৭৮
পাথর মহাল, ১২৪, ১২৫
পাথরের কোয়ারি, ১২৬
পাহাড়ি ছড়া, ১২৭
পিয়াইন, ৩, ৭
পুঞ্জি, ৭৫
পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ, ৯২, ১১৬
পৃত্থিমপাশার জমিদার মৌলবি রবি খাঁ, ২৪৫
পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ৪৮৫
পেট্রোবাংলা, ৪৮২
প্রত্নবস্তু, ২৫
প্রবাসী অর্থের প্রভাব, ৪৪০
প্রাণিসম্পদ, ১৬৮, ১৬৯
প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ২৪০
প্রেমদারঞ্জন দাস, ৫১২

ফ

ফতেহপুর, ২
ফাইলেরিয়াসিস, ২৩১
ফিলিপস টেনিস প্রতিযোগিতা, ৫০৯
ফৌজদার ফরহাদ খাঁ, ৩৮০
ফৌজদার, ৯২

ব

বঙ্গ, ২৮
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৫২, ১১২, ৩০৮, ৩৯৪, ৪৪৮, ৪৫৩
বঙ্গভঙ্গ রদ, ৪১, ৯২
বনভূমি, ১৭৭
বন্য চা-গাছ, ১৩৭
বন্যা, ৪৩২
বর্ণসংকর, ২৭
বাঁশমহাল, ১২৪
বাংলা অববাহিকা, ৪৭৯
বাংলাদেশ ওভারসীজ সেন্টার, ৪৫৬
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১০৭
বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, ৩৪৯
বাউন্ডারি কমিশন, ৪৭
বাখরখানি, ৪২২
বারঠাকুরী ইউনিয়ন, ৩
বারমাসি, ৩০৫
বারাউতনি টিলা, ২
বারোভূঁইয়া, ৩৪
বালুমহাল, ১২৪
বাসিয়া নদী, ৪
বাহারী স্থান-ই-গায়বীর, ৩৪
বিদ্যুৎ উৎপাদন, ১৮০
বিবিয়ানা, ৬
বিমান বাংলাদেশ, ২০৯
বিয়ানীবাজার প্রবাসী শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট, ৪৫২
৯২ ক ধারা, ৫৫
বিশ্বনাথ প্রবাসী শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট, ৪৫২
বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭২, ৭৩, ৭৫, ২৫১
বিসিক শিল্প এলাকা, ২১৪
বৃন্দাবন দাস, ২৪৯
বেঙ্গল অ্যাক্ট, ৩৪০
বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশন, ৪৭, ৪৯
বেঙ্গল সুরমা সেকশন, ২০২
বেসরকারি খাতে শিল্প, ২১৪
বোহর কমিশন, ২৩১
ব্যাপটিস্ট মিশনারি, ২৪৬
ব্যারোনেস, ৪৫৩
ব্রহ্মপুত্র নদ, ৫
ব্রহ্মযুদ্ধ, ৩৮
ব্রিক লেইন, ৪৪২
ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, ৪৫৫
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটরী, ৪৭

ব্রিটিশ মার্চেন্ট নেভি, ৪৪৪
ব্রিটিশ শাসন আমল, ২৪৫

ভ

ভাটেরা তাম্রশাসন, ২৬৬
ভারতবিভাগ,গণভোট ও সিলেট ভাগ, ৪৭
ভাষা আন্দোলনে সিলেট, ৩৯০, ৩৯৪
ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা, ৬৩
ভাস্করবর্মা, ২৭
ভিটি বালু, ১৩২
ভূতাত্ত্বিক জরিপ, ৪৮৮
ভূতিবর্মার শাসনকাল, ২৬
ভোগমন্দির, ৩৭৪
ভোলাগঞ্জ, ১৮৯

ম

মইনুল হক চৌধুরী, ৪৭
মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ৪৭
মঙ্গলকাব্য, ৩০৫
মঙ্গলদ্বীপ, ৪৬৩
মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠী, ৭৫
মনোয়ার আলী, ৪৭
মফিজুর রহমান তিতন, ৫০৩
মমিনছড়া, ২
মহাত্মা গান্ধী, ২৪৭
মহামারি, ২৩১
মহারাজা গম্ভীর সিংহ, ৭২
মহাল সামীল জলমহাল, ১২৪
মহাল, ১১৬
মহাসামন্ত, ২৭, ৩২
মহেশ্বর, ২৪৫
মাইকেল কিন, ২৩৭
মাইন্ডু নদী, ৭
মাউন্ট ব্যাটেন, ৪৭
মাদার ফিশারি, ১৬২
মাদ্রাসা শিক্ষা, ২৪৯
মনসামঙ্গল, ৩০৫
মালনীছড়া, ২, ৪৭৭
মালিক-উল-উলামা, ২৪৫
মাহমুদ আলী, ৪৭
মাহারী, ৭৯
মি. উইলিস, ১১৬
মি. সামনার, ১১৫
মিউজিয়াম অব রাজাস, ৩৭৯
মিজোরাম, ৮
মিটার গেজ, ২০২
মুক্তসম্পত্তি, ১৪৮
মুক্তিযুদ্ধে সিলেটের নারী, ৪১৫, ৪১৬
মুফতি স্কুল, ২৪৭
মুরারি গুপ্ত, ২৪৫, ২৪৯
মুরারিচাঁদ হাইস্কুল, ২৪৮
মুহাম্মদ আলী খান কুইমজঙ্গা, ৯১
মূলক-উল-উপামা, ২৪৫
মৃদঙ্গ অনুষ্ঠান, ৭৪
মেগালিথ পাথর, ৩৭২
মৈতৈই, ৭৩
মোগলাবাজার ইউনিয়ন, ৩৭৪
মোতাওয়াল্লি, ১৪৮
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ৪৪
মৌলিক গণতন্ত্র, ৫৬, ৩৪০, ৩৪৬

য

যুক্তফ্রন্ট, ৫৫, ৩৯০
যুগল টিলা, ৩৮২

র

রঘুনাথ শিরোমণি, ২৪৫, ২৪৯
রত্না নদী, ৪
রথযাত্রা উৎসব, ৭৪
ররার্ট লিন্ডসে, ১১৬, ২২৯
রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ, ২৫১
রাজনগরে পোর্টিয়াস মধ্য ইংরেজি স্কুল, ২৫১
রাজা ছত্রসিংহ, ৩৭
রাজা রামমোহন রায়, ৪৪২
রামমন্দির, ৩৭৪
রায়তি প্রজা, ১১৮
রাসনৃত্য, ৮৫

রাসবিহারী মধ্য ইংরেজী স্কুল, ২৫০
রিজেন্ট এয়ারওয়েজ, ২০৯
রিডল্যান্ড বনাঞ্চল, ১৫
রেডক্রস, ২৩৭
রেভারেন্ড প্রাইজ, ২৫০
রেললাইন স্থাপনের ইতিকথা, ২০১, ২০৩
রোশনারা আলী, ৪৫৩
র‍্যাডক্লিফ, ৪৯

ল

লন্ডনি, ৪৪১
লর্ড কার্জন, ২০২
লাইনপ্রথা, ৪৬
লাউড়, ৮৩ ,৯১, ১১৫
লাক্কাতুরা, ২, ১৪২, ৩৬১
লাখেরাজ ভূমি, ১১৫, ২৫০
লালাখাল পাহাড়, ১
লালাখাল, ২, ৭, ২২১, ৩৭১, ৪৮৬
লিডিং ইউনিভার্সিটি, ২৫১
লেসকা হাইড্রো ইলেকট্রিক ড্যাম, ৭
লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি), ৩৪৮
লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ৩৪০
লোভাছড়া, ২, ৫, ১৩০

শ

শর্করা জাতীয় খাবার, ৪২১
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫১, ৩৮১, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬৫
শাহাজালাল উপশহর, ১০২
শাহী ঈদগাহ, ১০৫
শীতলপাটি, ৮৮
শেখ হাসিনা, ৯৩, ২১৩, ২৪৩, ২৬২, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫২, ৪৫৯, ৪৬২
শ্রীচৈতন্য, ২৪৯

স

সবার জন্য বিদ্যুৎ, ৩৪৯
সমতট, ২৮
সমবায় উন্নয়ন ব্যাংক লি., ৩৫৫
সরকারি তিব্বিয়া কলেজ, ২৫১
সরীসৃপ প্রজাতি, ১৮
সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, ৫২
সর্বপ্রাণবাদ, ৭৭
সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ, ৪৪
সাংসারেক, ৭৯
সাঈদ বখত মজুমদার, ২৪৫
সাতকরা, ৪২৩
সাভ সুর্ক মেনসিম, ৭৬
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, ৩৫১, ৩৫২
সামাজিক বিন্যাস, ৬৮
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ৪৭
সারি টিলা, ১
সিক্কাবরকন্দাজ, ৩৯
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫১
সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা, ৫০০
সিলেট টাউন ক্লাব, ৪৯৯
সিলেট থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা, ৫২৫
সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ২৫১
সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন, ১১৮, ১১৯
সিলেটি উপভাষা, ২৬৫
সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনিগত পরিবর্তন, ২৮০, ২৮১
সিলেটি নাগরী লিপিতে রচিত সাহিত্য, ৩২০
সিলেটে অভিবাসী হওয়ার কারণ, ৪৩৯
সিলেটে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে (সিএস) ও স্টেট একুইজিশান সার্ভে (এসএ) জরিপ কার্যক্রম, ১১৯
সিলেট স্টেডিয়াম, ৫০০
সিলেটের কৃতী খেলোয়াড় ও ক্রীড়াসংগঠক, ৫১২
সিলেটের জনপ্রিয় লোকসংগীতের তালিকা, ৩৩২
সুরমা উপত্যকা, ৫২৯
সেবায়েত, ১৪৮
সেভেন সিস্টার, ২১৯
সোয়াম্প ফরেস্ট, ১০, ৪৮৮

স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২২, ২৩
স্বরধ্বনি বিচারের মানদন্ড অনুযায়ী সিলেটি উপভাষার স্বরধ্বনি, ২৭২
স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট, ২৩০

হ

হজরত শাহজালাল (র.), ৩০, ৫৪, ৫৯, ৮৩, ৯১, ২২১, ২৩০, ২৪৫, ২৪৯, ৩০৪, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৪, ৪৪৪, ৪৯৩, ৫৪৭
সেতু, ৩৬৮
হজরত শাহপরান (র.), ২২১, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫
হরিকেল, ২৮
হাই-টেক পার্ক, ৪৫২, ৪৬৬
হাইলাকান্দি, ৪৯
হাকালুকি হাওর, ২২১, ৪৮৮
হাজী জহুর বক্স, ৫১২
হাসন রাজা, ৪৯৩
হাতির দাঁত, ৩৭৮
হাদা মিয়া মাদা মিয়ার টিলা, ৩৮১
হাবিব নগর, ২, ৩৭১
হামিদ বখত মজুমদার, ২৪৫
হিজল করচ বাগান, ১২৪
হিস্টরি অব ইয়ামেন ডাইনেস্টি, ৩৬১
হেলিকপ্টার সার্ভিস, ২১০
হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, ৫৩

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

নবম জাতীয় সংসদে সিলেট জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যগণের তালিকা:

ক্রমিক নং	নির্বাচনী এলাকার নাম	সংসদ সদস্যগণের নাম
১।	২২৯ সিলেট-১ (সিলেট সদর)	জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত
২।	২৩০ সিলেট-২ (বিশ্বনাথ-বালাগঞ্জ)	জনাব শফিকুর রহমান চৌধুরী
৩।	২৩১ সিলেট-৩ (দক্ষিণসুরমা-ফেঞ্চুগঞ্জ)	জনাব মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী
৪।	২৩২ সিলেট-৪ (কোম্পানিগঞ্জ-গোয়াইনঘাট-জৈন্তাপুর)	জনাব ইমরান আহমদ
৫।	২৩৩ সিলেট-৫ (জকিগঞ্জ-কানাইঘাট)	জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদার
৬।	২৩৪ সিলেট-৬ (বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ)	জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ

দশম জাতীয় সংসদে সিলেট জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যগণের তালিকা:

ক্রমিক নং	নির্বাচনী এলাকার নাম	সংসদ সদস্যগণের নাম
১।	২২৯ সিলেট-১ (সিলেট সদর)	জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত
২।	২৩০ সিলেট-২ (বিশ্বনাথ-বালাগঞ্জ)	জনাব মো. ইয়াহিয়া চৌধুরী
৩।	২৩১ সিলেট-৩ (দক্ষিণসুরমা-ফেঞ্চুগঞ্জ)	জনাব মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী
৪।	২৩২ সিলেট-৪ (কোম্পানিগঞ্জ-গোয়াইনঘাট-জৈন্তাপুর)	জনাব ইমরান আহমদ
৫।	২৩৩ সিলেট-৫ (জকিগঞ্জ-কানাইঘাট)	জনাব সেলিম উদ্দিন
৬।	২৩৪ সিলেট-৬ (বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ)	জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ

পরিশিষ্ট-২

বিভাগীয় কমিশনারদের তালিকা

ক্র. নং	নাম	হতে	পর্যন্ত
০১	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	০১.০৮.১৯৯৫	০১.০৬.২০০০
০২	জনাব মোহাম্মদ আবু হাফিজ	০১.০৬.২০০০	০৩.০৪.২০০১
০৩	জনাব জিকেএম নূরুল আমিন	০৪.০৪.২০০১	৩১.০৭.২০০১
০৪	জনাব মো. আব্দুর রাজ্জাক	৩১.০৭.২০০১	০৫.১২.২০০১
০৫	জনাব একেএম মনিরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)	০৫.১২.২০০১	২৭.০১.২০০২
০৬	জনাব এ,কে এম শামসুদ্দীন (ভারপ্রাপ্ত)	২৯.০১.২০০২	২৩.০৪.২০০২
০৭	জনাব নজরুল ইসলাম	২৩.০৪.২০০২	১৮.১০.২০০৩
০৮	জনাব মো. আব্দুস সালাম খান	২২.১০.২০০৩	০৩.১১.২০০৪
০৯	জনাব মোহাম্মদ আলী (ভারপ্রাপ্ত)	০৩.১১.২০০৪	২৩.১১.২০০৪
১০	জনাব মো. আব্দুল হাকিম মণ্ডল	২৩.১১.২০০৪	০৯.১১.২০০৬
১১	জনাব আজিজ হাসান	০৯.১১.২০০৬	০৯.০৪.২০০৮
১২	জনাব ড. জাফর আহমেদ খান	০৯.০৪.২০০৮	১৬.০৬.২০০৯
১৩	জনাব মো. ফজলুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	১৬.০৬.২০০৯	২৯.১০.২০০৯
১৪	জনাব মো. গোলাম রববানী	০৪.১১.২০০৯	২৮.০৯.২০১০
১৫	জনাব মো. তাজুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)	২৮.০৯.২০১০	০৪.১১.২০১০
১৬	জনাব এন এম জিয়াউল আলম	০৪.১১.২০১০	১০.০৩.২০১৪
১৭	জনাব সাজ্জাদুল হাসান	১০.০৩.২০১৪	২৮.০২.২০১৫
১৮	জনাব শামছুল আলম চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)	২৮.০২.২০১৫	০৮.০৩.২০১৫
১৯	জনাব জামাল উদ্দিন আহমেদ	০৮.০৩.২০১৫	০২.০২.২০১৭
২০	ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম	০২.০২.২০১৭	-

পরিশিষ্ট-৩

সিলেট রেঞ্জের ডিআইজদের নামের তালিকা

ক্র. নং	নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যমত্ম
০১	জনাব মোদাবিবর হোসেন চৌধুরী পিএসসি	০১-০৮-১৯৯৫	১৩-০৫-১৯৯৬
০২	জনাব মো. আব্দুর রহিম খান পিপিএম	১৪-০৫-১৯৯৬	১২-০২-১৯৯৭
০৩	জনাব কুতুবুর রাহমান পিপিএম	১২-০২-১৯৯৭	২০-০১-১৯৯৮
০৪	জনাব উসমান আলী খান বিপিএম	১৫-০২-১৯৯৮	১৩-১০-১৯৯৮
০৫	জনাব মো. তোফাজ্জল হোসেন	১৪-১০-১৯৯৮	০৪-০৭-২০০১
০৬	জনাব মো. ওয়ালিয়ার রহমান	১০-০৭-২০০১	০৫-০৯-২০০১
০৭	জনাব মো. আব্দুল মান্নান	০৫-০৯-২০০১	১৫-০৫-২০০২
০৮	জনাব এমএ হানিফ, এনডিসি	১৫-০৫-২০০২	০৭-০২-২০০৩
০৯	জনাব এমএ আজিজ সরকার, পিপিএম	০৭-০২-২০০৩	২১-০৫-২০০৩
১০	জনাব মো. আলী ইমাম চৌধুরী, বিপিএম	২৬-০৫-২০০৩	২৩-০৮-২০০৪
১১	জনাব একে এম মাহফুজুল হক	২৩-০৮-২০০৪	২৬-০৯-২০০৫
১২	জনাব সৈয়দ শাহজামান রাজ	২৪-১০-২০০৫	০৫-০৮-২০০৭
১৩	জনাব আব্দুস সালাম পিপিএম	০৫-০৮-২০০৭	২২-০৫-২০০৮
১৪	জনাব মেজবাহুন্নবী	২৬-০৫-২০০৮	২৬-০৭-২০০৮
১৫	জনাব সৈয়দ তৌফিক উদ্দিন আহমেদ, পিপিএম-সেবা	০৫-০৮-২০০৮	১০-১০-২০০৮
১৬	জনাব মোহাম্মদ আবুল কাশেম	১০-১০-২০০৮	১৯-০৩-২০০৯
১৭	জনাব মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁঞা, পিপিএম	২৪-০৩-২০০৯	২৪-০২-২০১১
১৮	জনাব মো. মকবুল হোসেন ভূঁইয়া	২৪-০২-২০১১	২২-০৯-২০১৪
১৯	জনাব মো. মিজানুর রহমান, পিপিএম	২২-০৯-২০১৪	০১-১২-২০১৬
২০	জনাব মো. কামরুল আহসান, বিপিএম	০৪-১২-২০১৬	

পরিশিষ্ট-৪

জেলা প্রশাসকদের তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবি	কর্মকাল
১.	মি. উইলিয়াম মেকপেস থ্যাকারে	জেলা কালেক্টর	১৭৭২-০৩-১৭ থেকে ১৭৭৫-০১-০১
২.	মি. জন সামনার	জেলা কালেক্টর	১৭৭৫-০২-১০ থেকে ১৭৭৬-০৩-১৭
৩.	মি. হল্যান্ড	জেলা কালেক্টর	১৭৭৬-০১-০১ থেকে ১৭৭৮-০১-০১
৪.	মি. রবার্ট লিন্ডসে	জেলা কালেক্টর	১৭৭৮-০১-০১ থেকে ১৭৮৭-১১-১২
৫.	মি. উইলিয়াম হাউডম্যান	জেলা কালেক্টর	১৭৮৭-০১-০১ থেকে ১৭৮৮-০১-০১
৬.	মি. জন উইলিস	জেলা কালেক্টর	১৭৮৮-০১-০১ থেকে ১৭৯৩-০১-০১
৭.	মি. জে, আর, নট	জেলা কালেক্টর	১৭৯৩-০১-০১ থেকে ১৭৯৩-১০-০১
৮.	মি. জে, আহমুতি	জেলা কালেক্টর	১৭৯৩-০১-০১ থেকে ১৭৯৪-০১-০১
৯.	মি.এইচ লজ	জেলা কালেক্টর	১৭৯৪-০১-০১ থেকে ১৭৯৭-০১-০১
১০.	মি. জে. ডব্লিউ লং	জেলা কালেক্টর	১৮০৩-০১-০১ থেকে ১৮০৩-০৯-০১
১১.	মি. সি এস এলোলিং	জেলা কালেক্টর	১৮০৩-০১-০১ থেকে ১৮০৭-০১-০১
১২.	মি. এফ মরগুন	জেলা কালেক্টর	১৮০৭-০১-০১ থেকে ১৮০৮-০১-০১
১৩.	মি. জে. ফ্রেঞ্জ	জেলা কালেক্টর	১৮০৮-০১-০১ থেকে ১৮০৯-০১-০১
১৪.	মি. এমই. মক্সওয়েল	জেলা কালেক্টর	১৮০৯-০১-০১ থেকে ১৮০৯-১১-১৮
১৫.	মি. ডব্লিউ ওয়াকোবল	জেলা কালেক্টর	১৮১২-০১-০১ থেকে ১৮১৩-০১-০১
১৬.	মি. জে. ফ্রেঞ্জ	জেলা কালেক্টর	১৮১৩-০১-০১ থেকে ১৮১৮-০১-০১
১৭.	মি. থমাস রমান লাক্স	জেলা কালেক্টর	১৮১৮-০১-০১ থেকে ১৮১৮-১০-১৯
১৮.	মি. জেপি. ওয়ার্ড	জেলা কালেক্টর	১৮১৮-০১-০১ থেকে ১৮২০-০১-০১
১৯.	মি. জি. কলিং	জেলা কালেক্টর	১৮২০-০১-০১ থেকে ১৮২৪-০১-০১
২০.	মি. সি. টুকের	জেলা কালেক্টর	১৮২৪-০১-০১ থেকে ১৮২৫-০১-০১
২১.	মি. ডব্লিউ জে. টুকের	জেলা কালেক্টর	১৮২৫-০১-০১ থেকে ১৮২৬-০১-০১
২২.	মি. সি. টুকের	জেলা কালেক্টর	১৮২৬-০১-০১ থেকে ১৮২৯-০১-০১
২৩.	মি. সি. বেরি	জেলা কালেক্টর	১৮২৯-০১-০১ থেকে ১৮২৯-১১-১৮
২৪.	মি. ডব্লিউ জে. টাগার্ড	জেলা কালেক্টর	১৮২৯-০১-০১ থেকে ১৮৩১-০১-০১
২৫.	মি. পি গন্ডস বেরি	জেলা কালেক্টর	১৮৩১-০১-০১ থেকে ১৮৩১-১২-০১
২৬.	মি. জে.স্টেনফর্থ	জেলা কালেক্টর	১৮৩১-০১-০১ থেকে ১৮৩৫-০১-০১
২৭.	মি. এ সি হিড্ওয়েল	জেলা কালেক্টর	১৮৩৫-০১-০১ থেকে ১৮৩৫-১০-০১
২৮.	মি. আর এইচ হিলটন	জেলা কালেক্টর	১৮৩৫-০১-০১ থেকে ১৮৩৮-০১-০১
২৯.	মি. এ. সি. প্লওডেন	জেলা কালেক্টর	১৮৩৮-০১-০১ থেকে ১৮৩৯-০১-০১
৩০.	মি. এ.সি. বিডয়েল	জেলা কালেক্টর	১৮৩৯-০১-০১ থেকে ১৮৪০-০১-০১
৩১.	মি. এ. সি. প্লওডেন	জেলা কালেক্টর	১৮৪০-০১-০১ থেকে ১৮৪২-০১-০১
৩২.	মি. এ.সি. বিডওয়েল	জেলা কালেক্টর	১৮৪২-০১-০১ থেকে ১৮৪৩-০১-০১
৩৩.	মি. সি. টি. সিনালি	জেলা কালেক্টর	১৮৪৩-০১-০১ থেকে ১৮৪৩-১২-০১
৩৪.	মি. এ টি আমাউল	জেলা কালেক্টর	১৮৪৩-০১-০১ থেকে ১৮৪৭-০১-০১
৩৫.	মি. সি. ডব্লিউ মেকিলপ	অন্যান্য	১৮৪৭-০১-০১ থেকে ১৮৪৭-১০-০১
৩৬.	মি. এ. টি. আকাউদ	জেলা কালেক্টর	১৮৪৭-০১-০১ থেকে ১৮৪৯-০১-০১
৩৭.	মি. ডব্লিউ বেংকট	জেলা কালেক্টর	১৮৪৯-০১-০১ থেকে ১৮৫০-০১-০১
৩৮.	মি. এম. এ. জি. সেসিউ	জেলা কালেক্টর	১৮৫০-০১-০১ থেকে ১৮৫৫-০১-০১
৩৯.	মি. টি, পি, লারকিন	জেলা কালেক্টর	১৮৫৫-০১-০২ থেকে ১৮৫৫-০৮-০৭
৪০.	মি. এফ. এ. গ্রোভার	জেলা কালেক্টর	১৮৫৫-০১-০১ থেকে ১৮৫৬-০১-০১
৪১.	মি. এ. সি. বার্নাড	জেলা কালেক্টর	১৮৫৬-০১-০১ থেকে ১৮৫৬-০৮-১৮
৪২.	মি. এফ এ প্রোভস	জেলা কালেক্টর	১৮৫৬-০১-০১ থেকে ১৮৫৬-১০-১৫
৪৩.	মি. টি, পি. লারকিন	জেলা কালেক্টর	১৮৫৬-০১-০১ থেকে ১৮৫৭-০১-০১
৪৪.	মি. এইচ ও হেউড	জেলা কালেক্টর	১৮৫৭-০১-০১ থেকে ১৮৫৮-০১-০১
৪৫.	মি. এইচ নেলসন	জেলা কালেক্টর	১৮৫৮-০১-০১ থেকে ১৮৫৯-০১-০১

ক্র. নং	নাম	পদবি	কর্মকাল
৪৬.	মি. ডব্লিউ জে. লংমোর	জেলা কালেক্টর	১৮৫৯-০১-০১ থেকে ১৮৫৯-০৬-০১
৪৭.	মি. পি. এ. হিমফ্রে	জেলা কালেক্টর	১৮৫৯-০১-০১ থেকে ১৮৫৯-০৯-১৯
৪৮.	মি. টি ওয়াল্টন	জেলা কালেক্টর	১৮৫৯-০১-০১ থেকে ১৮৬০-০১-০১
৪৯.	মি. জি. জি. বেলউটর	জেলা কালেক্টর	১৮৬০-০১-০১ থেকে ১৮৬১-০১-০১
৫০.	মি. টি. ওয়াল্টন	জেলা কালেক্টর	১৮৬১-০১-০১ থেকে ১৮৬১-০৮-২৫
৫১.	মি. এস. এফ. ডেভিস	জেলা কালেক্টর	১৮৬১-০১-০১ থেকে ১৮৬১-০৯-১৯
৫২.	মি. থিওডোর স্মিথ	জেলা কালেক্টর	১৮৬১-০১-০১ থেকে ১৮৬২-০১-০১
৫৩.	মি. এইচ বোরিজ	জেলা কালেক্টর	১৮৬৪-১০-০১ থেকে ১৮৬৪-০১-১৫
৫৪.	মি. এস. জি. হার্ট	জেলা কালেক্টর	১৮৬৪-০১-০১ থেকে ১৮৬৪-০৫-০১
৫৫.	মি. এইচ বোরিজ	জেলা কালেক্টর	১৮৬৪-০৩-১৮ থেকে ১৮৬৪-০৭-০১
৫৬.	মি. জেমস সেথারল্যান্ড ড্রাম	জেলা কালেক্টর	১৮৬৪-০৭-০১ থেকে ১৮৬৪-১০-০১
৫৭.	মি. জে. এস. ড্রামন্ড	জেলা কালেক্টর	১৮৬৪-১২-১৬ থেকে ১৮৬৫-০৭-০১
৫৮.	মি. ডব্লিউ কেম্বল	জেলা কালেক্টর	১৮৬৫-০৭-০২ থেকে ১৮৬৫-১১-০৮
৫৯.	মি. ওয়াল্টন	জেলা কালেক্টর	১৮৬৫-০১-০১ থেকে ১৮৬৮-০১-০১
৬০.	মি. কেম্বল	জেলা কালেক্টর	১৮৬৮-০১-০১ থেকে ১৮৬৮-০৬-২২
৬১.	মি. এফ. ডব্লিউ ডি. পিটারসন	জেলা কালেক্টর	১৮৬৮-০১-০১ থেকে ১৮৬৮-০৯-০১
৬২.	মি. ডব্লিউ কেম্বল	জেলা কালেক্টর	১৮৬৮-১২-২৩ থেকে ১৮৬৯-০৭-০১
৬৩.	মি. এফ ডব্লিউ ডি. পিটারসন	জেলা কালেক্টর	১৮৬৯-০৩-০১ থেকে ১৮৭০-০৯-১৭
৬৪.	মি. জে. এম. আরামন্ড	জেলা কালেক্টর	১৮৭০-০৮-০১ থেকে ১৮৭০-১১-১৬
৬৫.	মি. এইচ কলিন সেদারল্যান্ড	জেলা কালেক্টর	১৮৭০-১১-০১ থেকে ১৮৭৪-০৯-০১
৬৬.	মি. এ. এল. ক্লে	ডেপুটি কমিশনার	১৮৭৪-০১-০১ থেকে ১৮৭৭-০১-০১
৬৭.	মি. এ. ম্যানসন	ডেপুটি কমিশনার	১৮৭৭-০১-০১ থেকে ১৮৭৮-০১-০১
৬৮.	মি. হেনরি লাটমন জনসন	ডেপুটি কমিশনার	১৮৭৮-০১-০১ থেকে ১৮৮৩-০১-০১
৬৯.	মি. জি. স্টিভারসন	ডেপুটি কমিশনার	১৮৮৩-০১-০১ থেকে ১৮৮৭-০১-০১
৭০.	মি. জে. কেনেডি	ডেপুটি কমিশনার	১৮৮৭-০৫-১৭ থেকে ১৮৯১-০১-০১
৭১.	মি. টি এল. হ্যারল্ড	ডেপুটি কমিশনার	১৮৯১-০১-০২ থেকে ১৮৯১-০৮-২০
৭২.	মি. এইচ. এইচ. লি	ডেপুটি কমিশনার	১৮৯১-০৮-২২ থেকে ১৮৯২-০৯-১৬
৭৩.	মি. পি. এইচ. ও. ব্রিয়েন	ডেপুটি কমিশনার	১৮৯২-০৮-১৮ থেকে ১৮৯২-১১-১৯
৭৪.	মি. ডব্লিউ লি	ডেপুটি কমিশনার	১৮৯২-১১-২০ থেকে ১৮৯৩-০৭-২২
৭৫.	মি. বি. বি. নিউবল্ড	ডেপুটি কমিশনার	১৮৯৩-০৮-২২ থেকে ১৮৯৫-০৯-২১
৭৬.	মি. এফ. সি. হেনেকোর	ডেপুটি কমিশনার	১৮৯৫-০৮-০১ থেকে ১৮৯৫-১১-১৮
৭৭.	মি. পি. এইচ ও ব্রিয়েল	ডেপুটি কমিশনার	১৮৯৫-১১-২৪ থেকে ১৮৯৬-০৯-০১
৭৮.	মি. এল. জি. কেরশো	ডেপুটি কমিশনার	১৮৯৬-০৮-০১ থেকে ১৮৯৬-১০-০১
৭৯.	মি. মেজর ট্যাকেরপিনো	ডেপুটি কমিশনার	১৮৯৬-০৯-০১ থেকে ১৮৯৬-১২-২০
৮০.	মি. পি. এইচ. ও. ব্রিয়েল	ডেপুটি কমিশনার	১৮৯৬-০১-০১ থেকে ১৮৯৮-০১-০১
৮১.	মি. টি. এমারসন	ডেপুটি কমিশনার	০০০০-০০-০০ থেকে ১৮৯৮-০১-০১
৮২.	মি. এল. জে. কেরশিউ	ডেপুটি কমিশনার	১৮৯৮-০১-০১ থেকে ১৮৯৮-০৮-০১
৮৩.	মি. ডি এইচ লীজ	ডেপুটি কমিশনার	১৮৯৮-০১-০১ থেকে ১৮৯৯-০১-০১
৮৪.	মি. এ. পরটিয়াস	ডেপুটি কমিশনার	১৮৯৯-০১-০১ থেকে ১৯০০-০১-০১
৮৫.	মি. ডি এইচ লীজ	ডেপুটি কমিশনার	১৯০০-০১-০১ থেকে ১৯০২-০১-০১
৮৬.	মি. এস. জি. হার্ট	ডেপুটি কমিশনার	০০০০-০০-০০ থেকে ১৯০২-০১-০১
৮৭.	মি. এ মজিদ	ডেপুটি কমিশনার	০০০০-০০-০০ থেকে ১৯০২-০১-০১
৮৮.	মি. ডি এইচ লিজ	ডেপুটি কমিশনার	০০০০-০০-০০ থেকে ১৯০২-০১-০১
৮৯.	মি. জে. সি. আর্বাথনট	ডেপুটি কমিশনার	০০০০-০০-০০ থেকে ১৯০২-০১-০১
৯০.	মি. জে. সি. আর্বাথনট	ডেপুটি কমিশনার	১৯০২-০১-০১ থেকে ১৯০৩-০১-০১
৯১.	মি. এইচ. এল. সালকেল্ড	ডেপুটি কমিশনার	১৯০৩-০৩-১৬ থেকে ১৯০৩-০৭-২০
৯২.	মি. এস. জে. হার্ট	ডেপুটি কমিশনার	১৯০৩-০১-০১ থেকে ১৯০৫-০১-০১
৯৩.	মি. এইচ. এ. সি. কল	ডেপুটি কমিশনার	১৯০৫-০১-০১ থেকে ১৯০৬-০১-০১

ক্র. নং	নাম	পদবি	কর্মকাল
৯৪.	মি. এফ. এস. আর. অ্যানলি	ডেপুটি কমিশনার	১৯০৬-০১-০১ থেকে ১৯০৬-০৭-০৮
৯৫.	মি. এইচ. এ. সি. কল	ডেপুটি কমিশনার	১৯০৬-০১-০১ থেকে ১৯০৮-০৭-০১
৯৬.	মি. জে. হেজলেট	ডেপুটি কমিশনার	১৯০৮-০১-০১ থেকে ১৯১০-০১-০১
৯৭.	মি. এফ. সি. হেনুইকার	ডেপুটি কমিশনার	১৯১০-০১-০১ থেকে ১৯১১-০১-০১
৯৮.	মি. জে. এইচ. এ. স্ট্রল	ডেপুটি কমিশনার	১৯১২-০১-০১ থেকে ১৯১২-০৪-০১
৯৯.	মি. ডব্লিউ এ কস্গ্রেন	ডেপুটি কমিশনার	১৯১২-০২-০১ থেকে ১৯১২-০৮-০১
১০০.	মি. এইচ. সি. বার্নেস	ডেপুটি কমিশনার	১৯১২-০১-০১ থেকে ১৯১২-০৯-০১
১০১.	মি. এইচ. সি. বার্নেস	ডেপুটি কমিশনার	১৯১২-০১-০১ থেকে ১৯১৩-০১-০১
১০২.	মি. ডব্লিউ এ কস্গ্রেনস্	ডেপুটি কমিশনার	১৯১৩-০১-০১ থেকে ১৯১৪-০১-০১
১০৩.	মি. জে. ই. ওয়েলেষ্টার	ডেপুটি কমিশনার	১৯১৪-০১-০১ থেকে ১৯১৬-০১-০১
১০৪.	মি. ডব্লিউ এ কস্গ্রেনস্	অন্যান্য	১৯১৬-০২-০১ থেকে ১৯১৬-০৭-২০
১০৫.	মি. আর. ফ্রিল	ডেপুটি কমিশনার	১৯১৭-০৩-০১ থেকে ১৯১৭-০৯-০১
১০৬.	মি. জে. হেক্সলেট	ডেপুটি কমিশনার	১৯১৭-০১-০১ থেকে ১৯১৭-১০-০১
১০৭.	মি. এ ফিলিপসন	ডেপুটি কমিশনার	১৯১৭-০৪-০১ থেকে ১৯১৭-১০-০১
১০৮.	মি. জে. হেক্সলেট	ডেপুটি কমিশনার	১৯১৭-০১-০১ থেকে ১৯২০-০১-০১
১০৯.	মি. জে. এ. ডওসন	ডেপুটি কমিশনার	১৯২০-০১-০১ থেকে ১৯২১-০১-০১
১১০.	মি. জি. টি. এল. লয়েড	ডেপুটি কমিশনার	১৯২১-০৩-০১ থেকে ১৯২১-১১-০১
১১১.	মি. সি. জি. জি. হেলমি	ডেপুটি কমিশনার	১৯২২-০৩-০১ থেকে ১৯২২-১০-১২
১১২.	মি. জে. এ. ডওসন	ডেপুটি কমিশনার	১৯২২-০৩-০১ থেকে ১৯২৩-০৯-০১
১১৩.	মি. সি. জিমসন	ডেপুটি কমিশনার	১৯২৩-০২-১৮ থেকে ১৯২৩-১০-১৬
১১৪.	মি. সি. জিমসন	ডেপুটি কমিশনার	১৯২৩-১১-০১ থেকে ১৯২৩-১২-০১
১১৫.	মি. এ ডব্লিউ বেন্টিংক	ডেপুটি কমিশনার	১৯২৩-১১-১৩ থেকে ১৯২৪-০৪-১২
১১৬.	মি. এ ডব্লিউ বেন্টিংক	ডেপুটি কমিশনার	১৯২৪-০১-০১ থেকে ১৯২৭-০৬-০১
১১৭.	মি. এ পি. ডেসনি	ডেপুটি কমিশনার	১৯৩১-০৩-০৬ থেকে ১৯৩১-০৫-২৩
১১৮.	মি. সি. জি. জি. হেলমি	ডেপুটি কমিশনার	১৯২৭-০৭-০১ থেকে ১৯৩১-০৭-০১
১১৯.	মি. সি. জি. জিমসন	ডেপুটি কমিশনার	১৯৩১-০৫-২৩ থেকে ১৯৩১-০৮-০৩
১২০.	মি. সি. এস. গানিং	ডেপুটি কমিশনার	১৯৩১-০৯-৩০ থেকে ১৯৩৫-০২-০২
১২১.	মি. এ. জি. পেটম	ডেপুটি কমিশনার	১৯৩৫-০২-০৩ থেকে ১৯৩৭-০৪-০১
১২২.	মি. জি. পি. স্টিউয়ার্ট	ডেপুটি কমিশনার	১৯৩৭-০৪-০১ থেকে ১৯৩৭-১১-০৪
১২৩.	মি. এইচ জি ডেনাই	ডেপুটি কমিশনার	১৯৩৭-১১-০৫ থেকে ১৯৩৮-০১-১১
১২৪.	মি. কে ডব্লিউ পি. মেরার	ডেপুটি কমিশনার	১৯৩৮-০২-০৭ থেকে ১৯৩৯-০২-১৪
১২৫.	মি, আই. এম. সোম	ডেপুটি কমিশনার	১৯৩৯-০২-১৫ থেকে ১৯৩৯-০২-২৪
১২৬.	মি. জি. পি. স্টিউয়ার্ট	ডেপুটি কমিশনার	১৯৩৯-০২-২৫ থেকে ১৯৪১-০৯-১০
১২৭.	মি জি. এস. গুহ	ডেপুটি কমিশনার	১৯৪১-০৯-১১ থেকে ১৯৪১-০৯-১৯
১২৮.	মি. এস গোস্বামী	ডেপুটি কমিশনার	১৯৪১-০৯-২০ থেকে ১৯৪১-১০-২৬
১২৯.	মি. কে ডব্লিউ পি. মেরার	ডেপুটি কমিশনার	১৯৪১-১০-২০ থেকে ১৯৪১-১০-২৬
১৩০.	মি. ভি. কে. পুরি	ডেপুটি কমিশনার	১৯৪৪-০৫-০১ থেকে ১৯৪৫-০২-০১
১৩১.	মি. এম. খুর্শিদ	ডেপুটি কমিশনার	১৯৪৫-০২-০১ থেকে ১৯৪৬-১২-১২
১৩২.	মি. এম.খোরশিদ	ডেপুটি কমিশনার	১৯৪৫-০২-০১ থেকে ১৯৪৬-১২-১৬
১৩৩.	মি. সি. এ. হামফ্রে	ডেপুটি কমিশনার	১৯৪৬-১২-১৭ থেকে ১৯৪৭-০৩-১৪
১৩৪.	মি. জে. ডাম ব্রিক	ডেপুটি কমিশনার	১৯৪৭-০৩-২৫ থেকে ১৯৪৭-০৯-১৪
১৩৫.	কে. বি. সৈয়দ নবীব আলী	জেলা প্রশাসক	১৯৪৭-০৯-১৫ থেকে ১৯৪৭-১১-১৭
১৩৬.	এম. খুরশীদ	জেলা প্রশাসক	১৯৪৭-১১-১৮ থেকে ১৯৪৯-০৯-০২
১৩৭.	এইচ, এইচ, নোমানী	জেলা প্রশাসক	১৯৪৯-০৯-০২ থেকে ১৯৫০-০৫-০৯
১৩৮.	এস. রহমত উল্লাহ	জেলা প্রশাসক	১৯৫০-০৫-০৫ থেকে ১৯৫২-০২-২২
১৩৯.	এইচ হায়দার	জেলা প্রশাসক	১৯৫২-০২-২২ থেকে ১৯৫৩-০৪-২১
১৪০.	আলী আহমদ	জেলা প্রশাসক	১৯৫৩-০৪-২৭ থেকে ১৯৫৪-১২-২৭
১৪১.	ডা. আই. এইচ. ওসমানী	জেলা প্রশাসক	১৯৫৪-১২-২৭ থেকে ১৯৫৬-০৫-০৪

ক্র. নং	নাম	পদবি	কর্মকাল
১৪২.	এ. কে. এম. আহসান	জেলা প্রশাসক	১৯৫৬-০৬-২৬ থেকে ১৯৫৬-১০-০২
১৪৩.	এ. এম. সানাউল হক	জেলা প্রশাসক	১৯৫৬-১০-১০ থেকে ১৯৫৮-০১-২১
১৪৪.	আলী হাসান	জেলা প্রশাসক	১৯৫৮-০১-২১ থেকে ১৯৬০-০৮-২৭
১৪৫.	এস এম ওয়াসিম	জেলা প্রশাসক	১৯৬০-০৮-২৭ থেকে ১৯৬১-০৭-১৫
১৪৬.	এম আলাউদ্দিন	জেলা প্রশাসক	১৯৬১-০৭-২১ থেকে ১৯৬৪-০৬-১০
১৪৭.	কে. এফ. রহমান	জেলা প্রশাসক	১৯৬৪-০৬-১০ থেকে ১৯৬৬-০৫-০৮
১৪৮.	ড. এ. কে. এম. গোলাম রববানী	জেলা প্রশাসক	১৯৬৬-০৫-০৮ থেকে ১৯৬৬-১১-০৫
১৪৯.	এম এস এইচ চিস্তি	জেলা প্রশাসক	১৯৬৬-১১-০৫ থেকে ১৯৬৮-০২-১৮
১৫০.	এম মোকাম্মেল হক	জেলা প্রশাসক	১৯৬৮-০২-১৮ থেকে ১৯৬৮-০৮-০৭
১৫১.	শফিউল আলম	জেলা প্রশাসক	১৯৬৮-০৮-০৭ থেকে ১৯৬৯-০৭-১৯
১৫২.	এ. সামাদ	জেলা প্রশাসক	১৯৬৯-০৭-২৮ থেকে ১৯৭১-০৪-২৮
১৫৩.	মো. তৌহিদ খান	জেলা প্রশাসক	১৯৭১-০৪-২৮ থেকে ১৯৭১-০৬-১৪
১৫৪.	সৈয়দ আহমদ	জেলা প্রশাসক	১৯৭১-০৬-১৫ থেকে ১৯৭১-১২-১৫
১৫৫.	সৈয়দ আহমদ	জেলা প্রশাসক	১৯৭১-১২-১৬ থেকে ১৯৭২-০৫-১৭
১৫৬.	এম এ মালিক	জেলা প্রশাসক	১৯৭২-০৫-১৭ থেকে ১৯৭৩-০১-২৬
১৫৭.	এএমএম শওকত আলী	জেলা প্রশাসক	১৯৭৩-০১-২৬ থেকে ১৯৭৪-০৬-১৬
১৫৮.	মুহম্মদ ইরশাদুল হক	জেলা প্রশাসক	১৯৭৪-০৭-২৫ থেকে ১৯৭৬-০৩-২৭
১৫৯.	কাজী সামসুল আলম	জেলা প্রশাসক	১৯৭৬-০৩-২৭ থেকে ১৯৭৬-০৯-১৫
১৬০.	মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ	জেলা প্রশাসক	১৯৭৬-০৯-১৫ থেকে ১৯৭৯-০১-০৮
১৬১.	মুজিবুর রহমান	জেলা প্রশাসক	১৯৭৯-০১-০৮ থেকে ১৯৮১-০৩-৩১
১৬২.	এএইচএম সিরাজুল হক	জেলা প্রশাসক	১৯৮১-০৩-৩১ থেকে ১৯৮৪-০৩-০৮
১৬৩.	এএনএম হাফিজুল ইসলাম	জেলা প্রশাসক	১৯৮৪-০৩-১৩ থেকে ১৯৮৮-০৫-০২
১৬৪.	মো. হাবিবুর রহমান	জেলা প্রশাসক	১৯৮৮-০৫-০২ থেকে ১৯৯০-০৮-১৯
১৬৫.	মো. খোরশেদ আনসার খান	জেলা প্রশাসক	১৯৯০-০৮-১৯ থেকে ১৯৯১-০৫-১৭
১৬৬.	সহিদ উদ্দিন আহমদ	জেলা প্রশাসক	১৯৯১-০৫-২৭ থেকে ১৯৯২-০৪-১২
১৬৭.	মো. আব্দুল লতিফ	জেলা প্রশাসক	১৯৯২-০৪-১২ থেকে ১৯৯৪-০৮-১৮
১৬৮.	মুহম্মদ আবু তাহের খান	জেলা প্রশাসক	১৯৯৪-০৮-১৮ থেকে ১৯৯৫-১১-৩০
১৬৯.	মো. আফজাল হোসেন	জেলা প্রশাসক	১৯৯৫-১২-০১ থেকে ১৯৯৬-০৪-২৪
১৭০.	মোহাম্মদ আইয়ুব	জেলা প্রশাসক	১৯৯৬-০৪-২৪ থেকে ১৯৯৯-১১-০১
১৭১.	আলী ইমাম মজুমদার	জেলা প্রশাসক	১৯৯৯-০১-১১ থেকে ২০০০-১০-০৫
১৭২.	আব্দুস সোবহান সিকদার	জেলা প্রশাসক	২০০০-১০-০৫ থেকে ২০০১-০৭-৩১
১৭৩.	ড. একেএম. হেলালউজ্জামান	জেলা প্রশাসক	২০০১-০৭-৩১ থেকে ২০০১-০৮-১৩
১৭৪.	মো. হাসানুর রহমান	জেলা প্রশাসক	২০০১-০৮-১৩ থেকে ২০০২-০২-২৮
১৭৫.	ড. একেএম. হেলালউজ্জামান	জেলা প্রশাসক	২০০২-০৩-১৪ থেকে ২০০২-১০-০৩
১৭৬.	মো. আবুল হোসেন	জেলা প্রশাসক	২০০২-১০-০৩ থেকে ২০০৪-০৭-২৫
১৭৭.	মুহাম্মদ হারুন চৌধুরী	জেলা প্রশাসক	২০০৫-০৫-০৪ থেকে ২০০৬-১১-১৯
১৭৮.	এস. এম ফয়সল আলম	জেলা প্রশাসক	২০০৫-০৫-০৪ থেকে ২০০৬-১১-১৯
১৭৯.	মো. জামাল হোসেন মজুমদার	জেলা প্রশাসক	২০০৬-১১-২০ থেকে ২০০৭-০৫-১৭
১৮০.	হারুন উর-রশীদ খান	জেলা প্রশাসক	২০০৭-০৫-১৭ থেকে ২০০৮-০৯-০১
১৮১.	সাজ্জাদুল হাসান	জেলা প্রশাসক	২০০৮-০৯-০২ থেকে ২০১০-০৮-১৬
১৮২.	আবু সৈয়দ মোহাম্মদ হাশিম	জেলা প্রশাসক	২০১০-০৮-১৭ থেকে ২০১১-০৭-০৫
১৮৩.	খান মোহাম্মদ বিল্লাল	জেলা প্রশাসক	২০১১-০৭-০৫ থেকে ২০১৩-০৫-০৬
১৮৪.	মো. শহিদুল ইসলাম	জেলা প্রশাসক	২০১৩-০৫-০৬ থেকে ২০১৫-০৬-০৫
১৮৫.	মো. জয়নাল আবেদীন	জেলা প্রশাসক	২০১৫-০৬-০৫ থেকে ২০১৭-০২-১৩
১৮৬.	মো. রাহাত আনোয়ার	জেলা প্রশাসক	২০১৭-০২-১৩ থেকে ....

পরিশিষ্ট-৫

ইংরেজ শাসনামল ১৯৩০ সাল থেকে অদ্যাবধি সিলেট জেলায় কর্মরত পুলিশ সুপারগণের নামের তালিকা ও কর্মকাল দেখানো হলো :

Superintendent of Police, Sylhet.			
SL.No	Name	From	To
British Period			
01	H. Beaumont	12.04.30	09.11.30
02	R.C.P. Cummig	10.11.30	26.10.31
03	H. Beaumont	27.10.31	26.12.33
04	H.G. Bartley	27.12.33	12.03.35
05	J.R. Craee	13.03.35	23.12.35
06	H.G Bartley	24.12.35	25.02.36
07	R. Ahmed	26.02.36	11.11.36
08	H.G. Bartley	12.11.36	03.04.38
09	R. Ahmed	04.04.38	13.12.38
10	J.E. Reid-Ed	14.12.38	16.11.40
11	R. Routlege	20.11.40	05.03.41
12	J.E. Reid-Ed	06.03.41	16.09.41
13	R. Curse	18.09.41	08.09.42
14	H.F.G Burbrige	09.09.42	09.12.45
15	G.S. Lightfoot	10.12.45	10.12.46
16	D.C. Dott	11.12.46	13.08.47
Pakistan Period			
17	A.M. Chowdhury	14.08.47	01.01.48
18	A.S.M. Ahmed	02.01.48	13.04.51
19	M.S. Hoque	08.07.51	15.06.53
20	S.M. Lutfullah	22.06.53	06.09.55
21	S.A. Sayood	07.09.55	06.01.57
22	M.S. Haider	07.01.57	16.06.57
23	A.M. Mesbahuddin	17.06.57	20.01.58
24	A.R. Talukder	21.01.58	22.02.58
25	A.F.M. Mannan	07.03.58	28.02.60
26	S. Ahmed	01.03.60	24.03.61
27	Mohammad Isa	25.04.61	31.08.63
28	A.S.F. Kabir	03.10.63	14.03.64
29	M.N. Huda	06.04.64	30.06.66
30	A.H. Nurul Islam	24.08.66	12.08.68
31	M. Habibur Rahman	09.09.68	17.12.68
32	M. Shamsul Huq	04.02.69	29.12.69
33	M. Shamul Huq	22.04.70	04.12.70
34	M.A. Quddus P.P.M.	05.12.70	27.09.71

Superintendent of Police, Sylhet.			
SL.No	Name	From	To
বাংলাদেশ সময়			
৩৫	এ.এইচ.এম. এম হান্নান	১২.১২.৭১	১৭.০২.৭২
৩৬	এস. জাকির হোসেন	১৮.০২.৭২	১১.১০.৭২
৩৭	এ.এম. নূর-নবী	২৭.১০.৭২	২৫.০৯.৭৩
৩৮	কাজী গোলাম রহমান	১০.১২.৭৩	০৯.০৬.৭৫
৩৯	এম.এম. শরীফ আলী	০৯.০৬.৭৫	২৫.০২.৭৬
৪০	হোসেন আহমদ	২২.০৪.৭৬	১৭.০১.৭৭
৪১	এ.কে.এম. মাহবুবউল হক	১৭.০১.৭৭	০২.০৩.৭৯
৪২	মো. সিদ্দিক হোসেন, পিপিএম	০২.০৩.৭৯	০৭.০৫.৮২
৪৩	এম. শহিদুল ইসলাম চৌধুরী	০৭.০৫.৮২	২৩.১০.৮৪
৪৪	কাজী নজরুল ইসলাম	২৩.১০.৮৪	২৫.০১.৮৬
৪৫	চৌধুরী এ.এ.জি কবির (ভারপ্রাপ্ত)	২৭.০১.৮৬	৩০.০৩.৮৬
৪৬	কাজী নজরুল ইসলাম	৩০.০৩.৮৬	০৭.০৩.৮৭
৪৭	মো. আনোয়ারুল ইকবাল, পিপিএম	০৭.০৩.৮৭	২১.০২.৮৮
৪৮	চৌধুরী এ.এ.জি কবীর	২৯.০২.৮৮	০২.০৮.৮৮
৪৯	মো. আনোয়ারুল ইকবাল, পিপিএম	০২.০৮.৮৮	১২.০৭.৮৯
৫০	মো. আব্দুর রহিম খান, পিপিএম	১৯.০৭.৮৯	১৭.০৪.৯০
৫১	শেখ নূরোল আনোয়ার (ভারপ্রাপ্ত)	২৫.০৪.৯০	০৮.০৯.৯০
৫২	মো. আব্দুর রহিম খান, পিপিএম	০৯.০৯.৯০	১০.১০.৯১
৫৩.	মো. আব্দুল কাইয়ুম	১২.০১.৯১	২১.০৭.৯১
৫৪.	চৌধুরী আহসানুল কবির	০২.০৯.৯১	১৮.০৪.৯৩
৫৫.	এ.বি.এম বজলুর রহমান	২২.০৪.৯৩	১০.১০.৯৫
৫৬.	মো. হাবিবুর রহমান	২৭.১০.৯৫	১১.১২.৯৬
৫৭.	তাজুল ইসলাম	১১.১২.৯৬	১৮.০১.৯৮
৫৮.	মো. আনিসুর রহমান	১৯.০১.৯৮	০৫.১১.৯৯
৫৯.	এম.এ হানিফ	০৫.১১.৯৯	১৯.১১.০০
৬০.	মো. মোখলেছুর রহমান	১৯.১১.০০	১৯.১২.০১
৬১.	এম.এ হানিফ	১১.১২.০১	০৯.০৫.০২
৬২.	মো. আব্দুল মান্নান(ভারপ্রাপ্ত)	০৯.০৫.০২	২৩.০৭.০২
৬৩.	এ.বি.এম বজলুর রহমান	২৩.০৭.০২	০২.১১.০২
৬৪.	ডা. এম. সাদিকুর রহমান	০২.১১.০২	২০.১০.০৩
৬৫.	মো. শাহাদাত হোসেন	২০.১০.০৩	২৫.০৫.০৪
৬৬.	মো. মোস্তফা কামাল	০১.০৭.০৪	০২.০৯.০৫
৬৭.	আনসার উদ্দিন খান পাঠান	০২.০৯.০৫	২৭.০৪.০৬
৬৮.	মল্লিক ফখরুল ইসলাম	২৭.০৪.০৬	২৪.১১.০৬
৬৯.	মোহাম্মদ আব্দুর রহিম,পিপিএম	২৬.১১.০৬	১৯.০২.০৭
৭০.	মো. আব্দুল্লাহেল বাকী, পিপিএম	০৩.০৩.০৭	০৯.০৮.০৭
৭১.	মো. আশরাফুর রহমান	০৯.০৮.০৭	১২.১২.০৭
৭২.	এস.এম রুহুল আমিন	১৮.১২.০৭	০৭.০৩.১০
৭৩.	মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন	১৪.০৩.১০	২৮.০৪.১৩
৭৪.	নুরেআলম মিনা পিপিএম	২৮.০৪.১৩	১৯.০৭.১৬
৭৫.	মো. মনিরুজ্জামান	১৯.০৭.১৬	....

পরিশিষ্ট-৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০(দশ)টি বিশেষ উদ্যোগ:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া ও রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার অঙ্গীকার নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়। তৃতীয় মেয়াদে ২০১৪ সালে সরকার গঠনের পর দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করে। একইসাথে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারী ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোট দশটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বিশ্বব্যাপী চরম অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টায় চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশের মাইলফলক স্পর্শ করেছে। মাথাপিছু আয় ১৬০২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার নেমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২২ ভাগে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৩.৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন ‘আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন ‘। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে দশটি বিশেষ উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন। এই উদ্যোগসমূহের শতভাগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ ও ২০৪১-এর মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) সাফল্যের পর ২০১৬ সাল থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছে দেশ। জাতিসংঘের ভাষ্যমতে, এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশকে বলা হয় এমডিজির ‘রোল মডেল’। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) সাফল্য অর্জনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি উদ্যোগ কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়তে সহায়তা করবে।

উদ্যোগ-১: একটি বাড়ি একটি খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

গ্রামের দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্প আজ একটি বিপ্লবে পরিণত হয়েছে। আর এই বিপ্লবের মূল সুর- ‘দিন বদলের স্বপ্ন আমার, একটি বাড়ি একটি খামার’। এ প্রকল্পের ভিশন হলো নিজস্ব পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন। ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্প টি ১ জুলাই ২০১৬ থেকে’ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক’- এর সাথে কাজ করছে। এ ব্যাংকের ৪৯%অংশের মালিক প্রকল্পের উপকারভোগীগণ।

অর্জন:

- সারা দেশে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় এযাবৎ ৫৫ হাজার ৭৮৬ টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গড়ে উঠেছে।
- সমিতির উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ২৯ লাখ ৩৫ হাজার ৮৪৩।
- প্রকল্পের প্রত্যক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা ১ কোটি ৪৭ লাখ।
- বছরে প্রকল্পভুক্ত পরিবারে আয় বৃদ্ধি গড়ে ১০ হাজার ৯২১ টাকা।
- প্রকল্প এলাকায় নিম্ন আয়ের পরিবারের সংখ্যা ১৫% থেকে কমে ৩% - এ দাঁড়িয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় অধিক আয়ের পরিবারের সংখ্যা ২৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১% -এ উন্নীত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- দারিদ্র্যের হার ২২.৮ শতাংশ থেকে ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং ২০২০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ৮ শতাংশে আনার লক্ষ্যে এ প্রকল্প কাজ করছে।
- ২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান দারিদ্র্যসীমার নিচের ১ কোটি পরিবারকে প্রকল্পভুক্ত করে দারিদ্র্যকে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- লিজকৃত মজা, খাস পুকুর/ডোবা/খাল পুনর্খনন করে মাছ হাঁস চাষের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনার নিচু জায়গা ভরাট করে সবজি ফলদ ওষধি গাছ চাষের আওতায় আনা।
- বসতবাড়ি দুর্যোগ সহনীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

উদ্যোগ-২: আশ্রয়ণ প্রকল্প

ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনে ছিন্নমূল আসহায় পরিবারের পুনর্বাসন এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিদুর্গত মানুষের জন্য তৎকালীন নোয়াখালীর (বর্তমানে লক্ষীপুর) রামগতিতে 'গুচ্ছগ্রাম' গড়েছিলেন। একই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ –এর ঘূর্ণিঝড়ে গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয়ণ গড়ে তোলেন। স্থানীয় প্রশাসন এবং সশস্ত্রবাহিনীর যৌথ সহায়তায় গড়ে উঠেছে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ ও প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলাও আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। আশ্রয়ণ কোনো সাহায্য প্রকল্প নয়, হতদরিদ্র মানুষের জীবন- জীবিকার ন্যায্য অধিকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনবান্ধব সরকার ছিন্নমূল মানুষের সেই অধিকার নিশ্চিত করছে।

অর্জন:

- সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের ৩টি পর্যায়ে ১৯৯৭ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১ লাখ ৫৯ হাজরের বেশি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে।
- আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫৩ হাজারের বেশি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে।
- ইতোমধ্যে ৮০২টি প্রকল্প গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং প্রায় ৪ লাখ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- 'নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ' কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৬০১ টি ভিক্ষুক পরিবারসহ ১৫,৭৭৫টি গৃহহীন পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।
- ২০১০ থেকে অদ্যাবধি ২৩,৫৭৫টি পরিবারের মাঝে ৩৭.৮৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৬,০৩০টি পরিবারকে ১০.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- আশ্রয়ণ প্রকল্প -২ এর আওতায় ২০১৯ সালের মধ্যে ২ লাখ ৫০ হাজার গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- প্রকল্প এলাকার বাড়িগুলোকে দুর্যোগ সহনীয়ভাবে তৈরি করা।
- প্রকল্প এলাকায় পুকুর খনন করা এবং টেকসই সংযোগ সড়ক ও কালভার্ট নির্মাণ করা।

- দুর্যোগ সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার বসিন্দাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

উদ্যোগ-৩: ডিজিটাল বাংলাদেশ

শেখ হাসিনার উপহার ডিজিটাল সরকার
বঙ্গাবন্ধু সুখী-স্বনির্ভর ‘সোনার বাংলা’ গড়তে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই সময়োপযোগী ‘ডিজিটাল কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ। ‘রূপকল্প: ২০২১’ বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ। সেই লক্ষ্য পূরণে জাতি অঙ্গীকারবদ্ধ। জনগণের দোরগোড়ায় অনলাইন রাষ্ট্রীয় সেবা পৌঁছানো এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য যাতে ভোগান্তিবিহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছতার সাথে স্বল্পতম সময়ে জনগণের কাছে সেবা পৌঁছানো যায়। মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছানো এবং সরকারি যাবতীয় তথ্য ও সেবাকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরা- এ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

অর্জন:

- ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, ৩৮৮টি উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার, ৬১টি জেলা ডিজিটাল সেন্টার, ৩২৫ টি পৌর ডিজিটাল সেন্টার ও ৪০৭ টি নগর ডিজিটাল সেন্টারসহ এ যাবৎ ৫,৭৩৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল তথ্য সেবাকেন্দ্র থেকে অনলাইনে ১১৬ ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- সারা দেশে স্থাপিত ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে রুরাল ই-কমার্স কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমানে দেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি।
- ৪৩ হাজার অফিস ও ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল ‘জাতীয় তথ্য বাতায়ন’ চালু হয়েছে।
- জীবন-জীবিকাভিত্তিক তথ্য এক জায়গা থেকে খুঁজে পেতে বাংলা ভাষায় জাতীয় ই-তথ্য কোষ চালু হয়েছে।
- ২৩,৫০০টি মাধ্যমিক, ৫,৫০০টি মাদরাসা ও ১৫,০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে স্থাপিত হয়েছে।
- ১ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তক অনলাইনে প্রাপ্তির জন্য ই-বুক প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে।
- ওয়েবসাইট ও এসএমএস-এর মাধ্যমে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।

- দেশের সকল ভূমি রেকর্ড (খাতিয়ান)-কে ‘ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ডরুম সার্ভিস’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১,৩৫৫টি সরকারি অফিসে ই-ফাইলিং চালু হয়েছে।
- ই-পেমেন্ট ও অনলাইন ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস (ইএমটিএস)- এর মাধ্যমে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৭,১২৫ কোটি টাকা প্রেরণ করেছে।
- পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে টাকা জমা-উত্তোলন ও ট্রান্সফারসহ নির্দিষ্ট আউটলেট থেকে কেনাকাটা সম্ভব হচ্ছে।
- ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে একজন নাগরিক বিনামূল্যে এবং সহজে স্বাস্থ্য, বিষয়ক পরামর্শ নিতে পারছেন।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে অনলাইন ও মোবাইল টিকেটিং সেবা চালু করেছে।
- ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় নাগরিক পরিষেবার বিল পরিশোধ, ই-টিন গ্রহণ ও অনলাইন ট্যাক্স প্রদান সম্ভব হয়েছে।
- ডিজিটাল মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।
- হজ ব্যবস্থাপনাকে আরো কার্যকর, সহজ এবং সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে অনলাইন হজ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।
- কৃষি সম্পর্কিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সেবা ও তথ্য সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কৃষি কল সেন্টার চালু করা হয়েছে।
- সকল সেবা ফরম এক ঠিকানায় প্রাপ্তির লক্ষ্যে ‘ফরমস বাতায়ন’ চালু করা হয়েছে।
- আইটি সেক্টরে গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪০০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে।
- ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে ই-সেবার সাথে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার অর্জন করেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- আইসিটি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে ব্যয় জিডিপির ০.৬ শতাংশ থেকে ১ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ২০১৮ সালের মধ্যে আইসিটি খাত থেকে বৈদেশিক আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ব্রডব্যান্ড কভারেজ ৩০ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।

- ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌর ও নগর পর্যায়ে আরো ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা এবং সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরো কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
- এলজিইডিসহ দেশের সকল সিটি করপোরেশন , উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভায় ১০০% ই-জিপি বাস্তবায়ন করা।
- ২০১৯-২০ সময়ের মধ্যে ১০০% জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করা। ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৫% জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।

উদ্যোগ-৪: শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

শিক্ষিত জাতি সমৃদ্ধ দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগে যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। সে সময় সরকারি শিক্ষকদের পদমর্যাদা লাভ করেন। দেশের ১ লাখ ৫৭ হাজর ৭২৪ জন শিক্ষক। এই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যার সুফল লাভ করছে শিক্ষার্থীরা।
এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে স্কুলে যাওয়ার বয়সি শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়ন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এফতেদায়ি, দাখিল ও এসএসসি পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, মেয়েদের বিনা বেতনে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যায়নের সুযোগ এবং শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি, সকল শ্রেণির মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান, পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ করা এবং আইটি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনসহ শ্রেণিকক্ষসমূহে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ।

অর্জন:

- দেশে শিক্ষার হার গত ৮ বছরে ৪৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২.৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- গত ৮ বছরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এফতেদায়ি, দাখিল ও এসএসসি পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে মোট ১৯০ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে।
- ১ জানুয়ারি ২০১৭ সালে ৪.২৭ কোটি শিক্ষার্থী মাঝে বিনামূল্যে ৩৬ কোটি ২২ লাখ বই বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাথমিক স্তরের ১২ কোটি ৭ লাখ শিক্ষার্থীর মাঝে প্রথম কিস্তিতে ২৮৭ কোটি টাকার উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পঞ্চম শ্রেণিতে সাধারণ ও ট্যালেন্টপুলে মোট ৮২,৪৫৪ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- ২৬,১৯৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়েছে।
- সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩ হাজার ১৭২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এযাবৎ ৫,৫৪৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন নিমার্ণ করা হয়েছে।
- পাঠ্যপুস্তকের অনলাইন ভার্সন তৈরি করা হয়েছে।
- ২০১৫ সাল থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্রেইল পদ্ধতির বই বিতরণ করা হচ্ছে।
- ১৭ লাখ শিক্ষককে কম্পিউটার, ইংরেজি, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- উচ্চ শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত নতুন ৮টি সরকারি এবং ৪২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত বেসরকারি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদরাসার মোট ১,১৬,৮৩৬ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে এমপিও. ভুক্ত করা হয়েছে।
- বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড থেকে ২০০৯-১৬ পর্যন্ত ৫১,৮৭৪টি আবেদনের বিপরীতে ২,০৬৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীতকরণ ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
- প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এফতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ঝরে পড়া রোধ, পুষ্টি সহায়তা ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা।
- যে সকল উপজেলায় সরকারি স্কুল ও কলেজ নেই সে সকল উপজেলায় একটি স্কুল ও একটি কলেজ জাতীয়করণ করা।
- অটিস্টিক ও স্নায়ু বিকাশজনিত শিশুদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিকমানের 'ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডায়াবিলিটিজ' প্রতিষ্ঠান করা হবে।

উদ্যোগ-৫: নারীর ক্ষমতায়ন

সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য নারীর ক্ষমতায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১'। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গে নারীরা উড়িয়েছে বাংলাদেশের বিজয় পতাকা। নারী জনশক্তিনির্ভর তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত কর্মসূচি দেশে নারীদের দৃঢ় সামাজিক অবস্থানে নিয়ে গেছে।

অর্জন:

- নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে নারী পুনর্বাসন বোর্ড, জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ২০১১ সালে জয়িতা ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা হয়েছে।
- মহিলা হোস্টেল নির্মাণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- নারীর প্রতি সহিসংসতা প্রতিরোধ আইন ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- পাসপোর্টে মায়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী ১২ হাজার ৯৫৬টি পল্লী মাতৃস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশুর যত্নসহ যাবতীয় বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধকরণ ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে।
- বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে এবং দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- সরকারি কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ৪০টি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার সেনসিটিভ বাজেট তৈরি হচ্ছে।
- জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৩,৪৩২ জন শিক্ষিত বেকার নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- নারীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এযাবৎ প্রায় ১৯ লাখ নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- নারীর ক্ষমতায়নে আত্মকর্মসংস্থান কার্যক্রম (IGA) –এর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেড ব্যাংক তৈরি করা হয়েছে।

- ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (VGD) –এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০ লাখ উপকারভোগীকে ২৪ মাস মেয়াদি প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল প্রদান করা হয়েছে।
- শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং ভাতা-এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ১,৮০,৩০০ জন উপকারভোগীর মধ্য থেকে জেলা পর্যায়ে ৭১,১৯০ জন উপকারভোগীকে মাসিক মাথাপিছু ৫০০ টাকা হারে প্রায় ২২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ তহবিল-এর আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ায় প্রায় ১০৯ কোটি টাকা অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- নারীর ক্ষমতায়নে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৮.২০ লাখ নারীর প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সরকারি চাকরিতে নারী কর্মকর্তার হার ২০২০ সাল নাগাদ ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ২০ থেকে ২৪ বছরের নারীদের সাক্ষরতার হার শতভাগে উন্নীতকরণ।
- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৫.৭৫ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ায় ৫৩,৮০৩ জন অবহলিত ও সুবিধাবঞ্চিত নারীর মাঝে ৬,২৫৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ।
- নগরভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এর আওতায় ২০২০ সালের মধ্যে ৪৫ হাজার শহরভিত্তিক দরিদ্র, অসহায় এবং স্বল্প আয়ের নারীকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- পরবর্তী ৫ বছরে ২০,০৭০ জন শিক্ষিত বেকার নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নে আত্মকর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- জুন-২০২০ সাল পর্যন্ত আরো ৫৬,১০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- গ্রামীণ নারীদের নেতৃত্ব সৃষ্টি করে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা।
- ট্রেড ব্যাংকের প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহের ওপর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে ৬৪টি জেলার ৪২৬টি উপজেলায় নির্বাচিত নারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- ভিজিডি-এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরো ১০ লাখ উপকারভোগীকে সুবিধা প্রদান করা হবে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬ লাখ দরিদ্র গর্ভবতী মা-কে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হবে।

- শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং ভাতা আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২ লাখ নতুন উপকারভোগীকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে।

উদ্যোগ-৬: ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি বিদ্যুৎ। আর্থসামাজিক ও মানব উন্নয়নে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো এ কর্মসূচির লক্ষ্য। ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই শেখ হাসিনা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক সাধন করেন। তাঁর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে দেশের সর্বত্রই এখন বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ, উইন্ডমিল ও বায়োগ্যাস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও দেশে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে পরমাণু বিদ্যুতের উৎপাদন।

অর্জন:

- ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণকালে বিদ্যুতের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩,২৬৮ মেগাওয়াট। বর্তমানে উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,৭৫৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।
- বিগত ৮ বছরে ৪৭% থেকে ৮০% লোক বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।
- ৮১টি নতুন বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে। নির্মাণাধীন রয়েছে ১৫টি এবং আরো ৪১টি প্লান্ট নির্মাণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিগত ৭ বছরে ১ কোটিরও বেশি গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।
- ২০০৯ সালের পর সৌর বিদ্যুতের সুবিধাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ২০ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।
- দেশের বিদ্যুৎ খাতের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে অবকাঠামো, কৃষি ও শিল্প খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ৭ম পঞ্চবার্ষিকী (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনায় ২০২০ সাল নাগাদ ২৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং দেশের ৯৬ শতাংশ এলাকাকে বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে।
- রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিদ্যুৎবিহীন এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা।

উদ্যোগ-৭: কমিটিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চত করাই এ কর্মসূচির লক্ষ্য। সকল জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এর আওতায় সন্তানসম্ভবা মায়েদের মাতৃত্বকালীন যাবতীয় সেবা নিশ্চিত করা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সকল ধরনের সেবা প্রদান করা, জন্ম, মৃত্যু নিবন্ধন এবং নতুন বিবাহিত দম্পতি ও সন্তানসম্ভবা মায়েদের নিবন্ধিত করা, মা ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টির বিষয়ে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে উন্নততর চিকিৎসার জন্য উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্জন:

- গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাতে প্রতি ৬,০০০ মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলা হয়েছে।
- সারা দেশে ১৩,১৩৬ (জুন ২০১৬) কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে সাধারণ রোগের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যুর হার ৪১ থেকে ৩৭-এ নামিয়ে আনা এবং প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৪ থেকে ১০৫-এ নামিয়ে আনা।
- ১২ মাসের নিচের শিশুদের শতভাগ টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনা।
- দম্পতিদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় আনার হার ৭৫ শতাংশ উন্নীতকরণ।
- গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচির আওতায় শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে।

উদ্যোগ-৮: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

বয়স্ক, অক্ষম জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্‌বুদ্ধকরণ করাই

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির লক্ষ্য। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য মাসিক ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। ভূমিহীন, ছিন্নমূল পরিবারের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অর্জন:

- ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সঙ্কটকালীন সময়ে (Lean Period, মার্চ-মে ও নভেম্বর-ডিসেম্বর) ৫০ লাখ পরিবারকে ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হচ্ছে।
- সমাজের অবহেলিত, অক্ষম, নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার ১৩২টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বাস্তাবয়নের জন্য প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা ছিল।
- প্রায় ২৫ লাখ অসহায় বয়স্ক মানুষের মাসে ৪০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- ৯ লাখের অধিক বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীকে প্রতি মাসে ৪০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- ১ লাখ ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫৫ হাজার একর কৃষিজমি বিতরণ করা হয়েছে।
- ১,৮০,৯৯৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে জনপ্রতি মাসিক ১০ হাজার টাকা সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সময়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায় পর্যন্ত মোট ২ কোটি ১৫ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ২০২০ সাল নাগাদ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি খাতে ব্যয় জিডিপির ২.৩ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সঙ্কটকালীন সময়ে ৫০ লাখ পরিবারকে ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হবে।
- মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রতি অর্থবছরে ১৫০০ জন দুঃস্থ, অসহায়, মহিলার মাঝে ১.৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ।
- মাসিক সম্মানী ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ১ লাখ ৮০ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে ২ লাখ করা হবে।

উদ্যোগ-৯: বিনিয়োগ বিকাশ

বাংলাদেশ এক বিপুল সম্ভাবনার দেশ। অতীতে এদেশের সৌন্দর্য এবং সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আরব ও ইউরোপ থেকে বণিকেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে আসত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব নিয়েই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিনিয়োগের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিদ্যুৎ। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ ঘাটতি দূর করে উৎপাদন ক্ষমতা ১৫৭৫৫ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছে। যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন বিনিয়োগের নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছে। নির্মানাধীন পদ্মা সেতুর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মহাসড়কসমূহ চার লেনে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে দেশের অভ্যন্তরে এবং আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর অত্যাধুনিক সমুদ্রবন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছে।

অর্জন:

- দেশের ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে ৪৬৪টি চালু শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এ যাবৎ ৪.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে।
- ২০০১-০৮ সময়ে ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৯৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৯-১৬ পর্যন্ত এই বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ১৭৯%।
- দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রচার ও প্রসার এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন একীভূত করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) গঠন করা হয়েছে।
- পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত অঞ্চলসহ দেশের সম্ভাবনাময় এলাকাসমূহে অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) গঠন করা হয়েছে।
- সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি পার্ক, আইটি ভিলেজ, আইটি হাব ও আইটি খাতে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।
- বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর করতে গ্যাস-বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন, প্লট বরাদ্দ, ওয়ার্ক পারমিট, রেসিডেন্ট ও নন-রেসিডেন্ট ভিসাসহ ১৬ ধরনের সেবা এক ছাতার নিচে দেওয়ার জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১৭ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ‘রূপকল্প-২০২১’-এর আওতায় বৈদেশিক বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

- ২০৩০ সালের মধ্যে সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্ট করা হবে।

উদ্যোগ-১০: পরিবেশ সুরক্ষা

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, গবেষণা, উদ্ভিজ্জ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ এ উদ্যোগের লক্ষ্য। বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও শনাক্তকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণ রোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই পরিবেশ উন্নয়নই এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

অর্জন:

- ২০০৫-০৬ সালের শতকরা ৭-৮ ভাগ থেকে বনভূমির বিস্তার ডিসেম্বর ২০১৬ সালে শতকরা ১৭.৪৮ ভাগে উন্নীত হয়।
- ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (Climate Change Trust Fund) গঠন করা হয়েছে এবং এই ট্রাস্ট্রের তহবিলে ২৯০০ কোটি টাকা সরকার বরাদ্দ দিয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় এযাবৎ আইলা দুর্গত উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধী বাড়ি নির্মাণ, দেশব্যাপী ৫৩৫ কিলোমিটার খাল পুনর্খনন, ১২২ কিলোমিটার নদী বাঁধ সংরক্ষণ এবং ১৫.৪ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণসহ উপকূলীয় এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৭৪০টি গভীর নলকূপ খনন, ৫৫০টি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার স্থাপন, ৪৯৭১ হেক্টর জমি বনায়ন এবং অফ-গ্রিড এলাকায় ১২,৮৭২টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- উন্নয়ন সহযোগী এবং দাতাদের সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন রিজিলিয়েন্স ফান্ড গঠন করা হয়েছে।
- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' ০১ জুলাই ২০১৪ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে।
- বায়ুদূষণ রোধের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মল বায়ু ও টেক্সই পরিবেশে (Clean Air & Sustainable Environment-CASE) প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট ১৮২টি শিল্পকারখানায় বর্জ্য শোধনাগার প্ল্যান্ট (Effluent Treatment Plant- ETP) স্থাপিত হয়েছে।

চামড়া শিল্প থেকে ঢাকা শহর ও বুড়গঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক হাজারীবাগের ট্যানারিগুলো সাভারের হরিণধরা এলাকায় স্থানান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত অন্যান্য আইনগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন-২০১০, পরিবেশ আদালত আইন-২০১০, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১০।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষেত্রে তাঁর সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের জন্য জাতিসংঘের পলিসি লিডারশিপ শ্রেণিতে ‘চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ-২০১৫’ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ২০২০ সাল নাগাদ বনভূমির হার ২০ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে বায়ুর গুণগত মান বাড়ানো এবং বায়ুদূষণ কমিয়ে আনা।
- শিল্পকারখানায় বর্জ্য নির্গমণ শূন্যতে নামিয়ে আনা।
- ১৫ শতাংশ জলাশয় শুষ্ক মৌসুমে অভয়ারণ্য হিসেবে গড়ে তোলা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

পরিশিষ্ট-৭

বিগত ১০ (দশ) বছরের বিভিন্ন বিভাগ হতে সিলেট জেলায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প

সড়ক ও জনপথ বিভাগ, সিলেট

(লাখ টাকায়)

ক্র.নং	প্রকল্প'র নাম/ কার্যক্রমের নাম	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ	অর্জিত সাফল্য	মন্তব্য
১	সুরমা নদীর ওপর পুরাতন কিন সেতুর নিকটে কাজীরবাজার নামক স্থানে পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ ও আম্বরখানা বাইপাস সড়ক নির্মাণ (২য় সংশোধিত) [২০০০-২০০১ হতে ৩১/০৬/২০১৬ পর্যন্ত]	৪২৯.৫০	১০০.০০%	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
২	সিলেট-জকিগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (সংশোধিত) [১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত]		১০০.০০%	২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
৩	সিলেট-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়কে ১০টি সেতু নির্মাণ [০১/০৩/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৩ পর্যন্ত]		১০০.০০%	২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
৪	জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প [০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৩ পর্যন্ত]			২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
	(ক) দরবস্ত-কানাইঘাট-শাহবাগ সড়ক [Z 2011]		১০০.০০%	
	(খ) সারি-গোয়াইনঘাট সড়ক [Z 2012]		১০০.০০%	
	(গ) সিলেট-দাউদাবাদ-দাউদপুর-ঢাকাদক্ষিণ-ভাদেশ্বর-মীরগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়ক [Z 2832]		১০০.০০%	
	(ঘ) রশিদপুর-বিশ্বনাথ-রামপাশা-লামাকাজী সড়ক [Z 2016]		১০০.০০%	
৫	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত সেতুসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) [০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত]			২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
	(ক) সদাখাল সেতু		১০০.০০%	
	(খ) চন্দরপুর সেতু		১০০.০০%	
	(গ) কুড়া-২ সেতু		৮৫.০০%	
৬	বাদাঘাট বিমানবন্দর সংযোগ সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (সংশোধিত) [০১/০৬/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত]		৬০.০০%	
৭	চারখাই-শেওলা-বিয়ানীবাজার-বারইগ্রাম সড়কের বিয়ানীবাজার শহর অংশের উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণসহ ৭টি সেতু পুনর্নির্মাণ [০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত]	১৬৫.০০	১০০.০০%	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
৮	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সমূহের জরুরি পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প [০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১২ পর্যন্ত]		১০০.০০%	২০১১-২০১২ অর্থবছরে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
৯	ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি), সিলেট। [০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত]		১০০.০০%	২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
১০	বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প। [০১/০৩/২০১৫ হতে ২৮/০২/২০১৮ পর্যন্ত]	৪৫০০.০০	১০.১৯%	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।
১১	জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সিলেট জোন) [সিলেট সড়ক বিভাগের অংশ] [০১/০৩/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৭]	১১৪৩.৭৮	৩৯.০৪%	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা হবে।
১২	সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সিলেট অংশ) [০১/০১/২০১৬খ্রি: হতে ৩০/০৬/২০১৯খ্রি: পর্যন্ত।]			দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।

পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট

(লাখ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কাজের নাম	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
১	সিলেট সদর কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলার জিলকার হাওর পাথর চাউলী হাওর লংপুর ও বাউরভাগ হাওরের বাঁধ মেরামত প্রকল্প।	২৫.৯১৪	১০৯৪.২৬	
২	জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় নদী পুনর্খনন প্রকল্প।	১৯.০০	৮৬৮.০০	
৩	জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় বিয়ানীবাজর নদী তীর সংরক্ষণকাজ	১.০০	৪৪৮.৯০	
৪	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (কানাইঘাট)।	১টি	৪৭৪৬.০০	
৫	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (সিলেট সদর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ)।	১টি	১০৬৮৬.০০	
৬	নদী তীর সংরক্ষণকাজ	৫.৫৩৭	২৯৮৫.২৬	
		মোট	**২০৮২৮.৪২**	

গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট

(লাখ টাকায়)

ক্রমিক নং	**প্রকল্পের নাম**	**প্রকল্প/দরপত্র মূল্য**	**মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ**	**আর্থিক ব্যয়**	**ভৌত অগ্রগতি (%)**	**মন্তব্য**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়					
০১.	সিলেট **কেন্দ্রীয় কারাগার** নির্মাণ প্রকল্প।	১৯৭৭২.৭২ (১ম সংশোধিত)	১৬৫৬৭.৪৫	১৫৯৬৯.৬৩	৮২%	প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন ভবনের নির্মাণকাজ দ্রুত গতিতে চলছে।
০২.	৭টি **র‍্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ** প্রকল্পের আওতায় সিলেটে ১টি র‍্যাব-০৯ কমপ্লেক্স নির্মাণ।	৬২৪৭.৩২	৪৩৪৫.৪৭৭৫	৪১৩৫.৭১৭৫	৬৫%	প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন ভবনের নির্মাণকাজ দ্রুত গতিতে চলছে।
০৩.	বাংলাদেশের ৭৬টি উপজেলা সদরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় **সিলেট** জেলায় **জকিগঞ্জ-১টি (বি-টাইপ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশননির্মাণকাজ**।	১২৪.৮৭	১২৪.৮৭	১২৪.৮৭	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।
০৪.	বাংলাদেশের ৭৬টি উপজেলা সদরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় **সিলেট** জেলায় **ফেঞ্চুগঞ্জ-১টি (বি-টাইপ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশননির্মাণকাজ**।	১৩১.৮৫ (সংশোধিত)	১৩১.৮৫	১৩১.৮৫	১০০%	কাজ সমাপ্ত। ভবনটি হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প/দরপত্র মুল্য	মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ	আর্থিক ব্যয়	ভৌত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৫.	বাংলাদেশের ৪৭টি উপজেলা সদরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় **সিলেট** জেলায় **বিয়ানীবাজার-১টি (সি-টাইপ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশননির্মাণকাজ**।	২৭১.৬৫	১৬০.৪৬	১৬০.৪৬	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।
০৬.	পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলার **ওসমানীনগর-১টি নতুন থানা ভবন নির্মাণকাজ**।	৭৪৮.৩১	৬৯৯.১৪২৭	৬৯৯.১৪২৭	১০০%	কাজ সমাপ্ত। ভবন হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
০৭.	এস.এম.পি'র **শাহপারন (র:) থানা ভবন** নির্মাণ	৩৪৫.৬০ (সংশোধিত)	১০০.০০	১০০.০০	৬৯ %	১ম তলার ছাদের নিচ পর্যন্ত কলাম ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।
০৮.	‘‘বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণ ’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় **সিলেট আলমপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিস ভবন নির্মাণ।**	৪৩৫.৩৪	৩৮১.২০	৩৬৯.৮৫	৮০%	মূল ভবনের রংয়ের কাজ চলছে। জলাধার ও গভীর নলকূপ এর কাজ সম্পন্ন। সীমানাপ্রাচীরের প্লাস্টারের কাজ চলছে। মাটি ভরাট সম্পন্ন।
০৯.	বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় সদরে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ ’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় **সিলেট বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস ভবন নির্মাণ।**	৫৭৭.২৮	৫৪৮.৬৩	৫৪৮.৬৩	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।
১০.	বাংলাদেশ পুলিশের ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সিলেট **আর.আর.এফ এর ব্যারাক ভবন** নির্মাণ ।	৯২৪.২৪	৯১১.৯৭	৯১১.৯৭	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।
১১.	বাংলাদেশ পুলিশের ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সিলেট **এপিবিএন এর-ব্যারাক ভবন** নির্মাণ।	১০৩৫.৪৬	১০৪৪.২৯	১০৪৪.২৯	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।
১২.	পুলিশ বিভাগের জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ (৫০ টি থানা) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলার **কোম্পানীগঞ্জ থানা ভবন** নির্মাণকাজ।	২৫১.০৬	২৪৮.৩৯	২৪৮.৩৯	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।
১৩.	বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় সদরে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ ’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় **সিলেট বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস ভবন নির্মাণ।**	৫৭৭.২৮	৫৪৮.৬৩	৫৪৮.৬৩	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প/দরপত্র মূল্য	মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ	আর্থিক ব্যয়	ভৌত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়					
১৪.	৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেটে-১টি চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১২-তলা ভিতবিশিষ্ট ৫-তলা ভবন নির্মাণ)।	৬০১২.৬৭ (সংশোধিত)	২২৮০.৮৩	২২২৯.৪৩	১০০% (১ম পর্যায়)	কাজ সমাপ্ত। ১৫/০২/২০১৫ ইং তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও আইন মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ভবনটি উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করিতেছেন। ঠিকাদারের দায়-দেনা রহিয়াছে। ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন। ভেরিয়েশন অনুমোদন হলে অবশিষ্ট সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।
	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়					
১৫.	দেশের ২০টি জেলায় জেলা রেজিস্ট্রার ও ৬৩টি উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সিলেটে জেলায় গোলাপগঞ্জ উপজেলায় **ঢাকা-দক্ষিন সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণকাজ।**	১৪০.৬৭	১১৮.৭৬	১১৮.৭৬	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।
১৬.	দেশের ২০টি জেলায় জেলা রেজিস্ট্রার ও ৬৩টি উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলায় **জকিগঞ্জ উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণকাজ।**	১৬১.৮৫	১৫৩.৬২	১৫৩.৬২	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।
১৭.	কন্সট্রাকশন অব উপজেলা অ্যান্ড রিজিওনাল সার্ভার স্টেশনস ফর ইলেক্টোরাল ডাটাবেইজ (সিএসএসইডি) প্রকল্পের আওতায় **সিলেট ১টি রিজিওনাল সার্ভার স্টেশননির্মাণকাজ** (৫-তলা ভিতের ওপর ৩-তলা নির্মাণ)।	৪০০.০০	৩৯২.৪২	৩৯২.৪২	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়					
১৮	নারীনির্যাতন প্রতিরোধে ৫টি বিভাগীয় শহরে ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ প্রকল্পের আওতায় সিলেট বিভাগীয় শহরে একটি নির্মাণ।					

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প/দরপত্র মূল্য	মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ	আর্থিক ব্যয়	ভৌত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	ক) অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ (১০-তলা ভিতের ওপর ২-তলা নির্মাণ)। **খ) ডরমিটরী ভবন নির্মাণ** (১০-তলা ভিতের ওপর ২-তলা নির্মাণ)।	৯১০.৮৮	৮২৪.৫০	৮২৪.৫০	১০০%	ভবন ২টি হস্তান্তরিত।
	কৃষি মন্ত্রণালয়					
১৯.	সার পরীক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় **সিলেট জেলার পিরিজপুরে ১টি সার পরীক্ষাগার ও গবেষণাগার ভবন নির্মাণকাজ।**	৪৪৩.০৯ (সংশোধিত)	৩৮৩.২৬	৩৮৩.২৬	৯৬%	কাজ প্রায় সমাপ্ত।
	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়					
২০.	সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন **সিলেট মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন** নির্মাণকাজ।	২৪৫.৯২ (অনুমোদিত)	২২০.০০	২২০.০০	৯৮%	ভবনের ফিনিশিং কাজ চলছে।
	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়					
২১.	সিলেট বিভাগীয় ও জেলা **এনএসআই কার্যালয় ভবন** (৫-তলা ভিতবিশিষ্ট ৩-তলা)নির্মাণ।	৪০৪.২৫	৩০৫.০০	৩০৫.০০	৯২%	মূল ভবনের ফিনিসিং কাজ চলছে। সীমানা প্রাচীরের কাজ শেষ পর্যায়ে। ২-তলা ৩টি গাড়ির গ্যারেজ নির্মাণের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়					
২২.	সিলেট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে চত্বরে ১টি **রেকর্ডরুম** নির্মাণকাজ।	৩৯৪.৭৬	৩৯৪.৭৬	৩৯৪.৭৬	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়					
২৩.	সিলেট এমএজি **ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ** কাজ (৩-তলা ভবন আউটডোর কমপ্লেক্স)।	১৪২৩.০০	১৩০৩.০০	১৩০৩.০০	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।
২৪.	সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরে **নার্সিং কলেজ ভবন নির্মাণকাজ।**	৪৯১.৫৩	৪৯১.৫৩	৪৯১.৫৩	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।
২৫.	সিলেট এমএজি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন **ডেন্টাল ইউনিট স্থাপন**কাজ।	১২৬.১৫	১২৬.১৫	১২৬.১৫	১০০%	ভবনটি হস্তান্তরিত।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

প্রধান প্রধান অঙ্গের নাম	একক	জানুয়ারি ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত স্কিমসমূহ		চলমান স্কিমসমূহ	
		পরিমাণ	ব্যয় (লাখ টাকায়)	পরিমাণ	চুক্তিমুল্য
১	২	৩	৪	৮	৯
পল্লী অবকাঠামো.					
সড়ক নির্মাণ	কিমি	৭৬৪৫৯	২৮৬১৮৮১	১৯৬২৮	১২২৯৪৪৮
ব্রিজকালভার্ট নির্মাণ/	মি.	৩৫০৭৯১	৯৫৪৬৬৬	৬৭২০৩	৩২৯৯৫২
গ্রোথ সেন্টার হাটবাজার/	সংখ্যা	২৯০০	৯৩৭৮২	৬০০	২১৩১৪
উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন সম্প্রাসারণ	সংখ্যা	১০০	৪৫৩২০	৪০০	২০৮৪০০
নবসৃষ্ট উপজেলা কমপ্লেক্স	সংখ্যা	১০০	২৫০০	০০০	০০০
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ	সংখ্যা	২১০০	১৫২৯১৮	৪০০	৩৫২৮৯
বৃক্ষরোপণ	কিমি	৭১৬৩	৫০০৮	৪০০	৪০০
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ	সংখ্যা	৩০০	১২৭০০	০০০	০০০
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	২০০	৫১০০০	৫০০	৭৭৩০০
ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ	সংখ্যা	৩০০০	২৭০০০	৩৫০০	৩৩৫০০
ঘাট নির্মাণ	সংখ্যা	৪০০	২২২০০	১০০	২৯৩৯
পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	কিমি	১০৩০৮৭	১৩৬২৫৩৮	৩৪৮১২	৯০৮৮৮৭
ব্রিজ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ/	কিমি	৪৭২৪৭	৫৬০১৯	১৭০০	৬১৪৫
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়োজিত দুঃস্থ মহিলা দ্বারা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	জন দিবস	৩২৯৫৭০০	৪৯৪৩৫৫	২৮১৭৬০	৪২২৬৪
মোট:			**৬১৪১৮৮৭**		**২৮৯৫৮৩৮**
পানি সম্পদ:					
স্লুইজ গেট রেগুলেটর নির্মাণ/	মি.	১০৭৩০	২৬২৭৫১	০০০	০০০
বাঁধ নির্মাণ	কিমি	৭৭১১	৭২৩৪০	০০০	০০০
খাল খনন পুনর্খনন	কিমি	৫০০১	৬৪৬৭১	০০০	০০০
মোট:			**৩৯৯৭৬২**		**০০০**
অন্যান্য					
প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মান পুনর্নির্মাণ	সংখ্যা	৭৭৯০০	২৩৯২৪০০	৩৫০০	১৩৪০০০
আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি সেন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	০০০	০০০	১০০	৩২৫০০
শাহী ঈদগাহ মিনার নির্মাণ (পিপিএনবি)	সংখ্যা	১০০	৩৯৮০০	০০০	০০০
উপজেলা সার্ভার স্টেশন নির্মাণ	সংখ্যা	১০০০	২৯০৮৬	০০০	০০০
মোট:			**২৪৬১২৮৬**		**১৬৬৫০০**
সর্বমোট:			**৯০০২৯৩৫**		**৩০৬২৩৩৮**

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প

বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের নাম	বিবরণ	প্রকল্প মূল্য (লাখ টাকা)
১	২	৩
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ।	জকিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণকাজ।	৬৪৯.২৪
	ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণকাজ।	৯৬০.১০
	বিশ্বনাথ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণকাজ।	১১২৯.০২
বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ও সিভিল সার্জন অফিস, সিলেট নির্মাণ।	বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ও সিভিল সার্জন অফিস, সিলেটের নির্মাণকাজ।	৬৯৪.২৬

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লাখ টাকা)	মন্তব্য
১	সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ড্রেনেজ প্রকল্প	প্রকল্পের আওতায় প্রতিদিন ২০ মিলিয়ন লিটার ও ৮ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণকাজ, ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন ১০১কি.মি., ১৪টি উৎপাদক নলকূপ ও আনুষঙ্গিক কাজ।	১৩২০০.০০	অগ্রগতি=১০০% প্রকল্পটি জুন/২০১৬ সালে সমাপ্ত হয়।
২	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলায় ১৯৬৯টি পানির উৎস স্থাপনকাজ।	১১৭০.০০	অগ্রগতি=১০০% প্রকল্পটি জুন/২০১৫ সালে সমাপ্ত হয়।
৩	ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টের্ড ভিলেজ পাইপড লাইন পাইলট প্রকল্প	প্রকল্পের আওতায় সিলেট সদর উপজেলার টুকের বাজার ইউনিয়নে ৩টি উৎপাদক নলকূপ, ১০কি.মি. পাইপ লাইন, মিনি আয়রন রিমুভাল প্লান্টসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১১০.০০	অগ্রগতি=১০০% প্রকল্পটি জুন/২০১২ সালে সমাপ্ত হয়।
৪	Third primary Education Development Program (PEDP-3)	প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলায় বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৬১ টি পানির উৎস স্থাপনকাজ এবং বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৫০টি WASH BLOCK নির্মাণকাজ।	১৩০০.০০	অগ্রগতি=৯৮% প্রকল্পটি জুন/২০১৭ সালে সমাপ্ত হবে।
৫	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প	প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলার ০৩টি উপজেলায় ০৬টি ইউনিয়নে (কানাইঘাট, বালাগঞ্জ ও দক্ষিণ সুরমা) ২২০টি পানির উৎস স্থাপনকাজ।	৩০০.০০	অগ্রগতি= ৮৫% প্রকল্পটি জুন/২০১৭ সালে সমাপ্ত হবে
৬	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প	প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার ০৬টি ইউনিয়নে ৩৮০ টি পানির উৎস স্থাপনকাজ।	৩৫০.০০	অগ্রগতি= ৮৫% প্রকল্পটি জুন/২০১৮ সালে সমাপ্ত হবে
৭	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলায় ১৫১৯টি বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপনকাজ।	১০৬০.০০	অগ্রগতি=৩০% প্রকল্পটি জুন/২০১৯ সালে সমাপ্ত হবে
৮	৪৫টি পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল	বিয়ানীবাজার পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় ৩টি উৎপাদক নলকূপ খনন, ১০কি.মি. পাইপ লাইন, ১টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও ৩টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণকাজ।	৯০০.০০	কাজ চলমান প্রকল্পটি জুন/২০১৯ সালে সমাপ্ত হবে

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লাখ টাকা)	মন্তব্য
	স্যানিটেশন ও প্রকল্পের			
৯	৪০টি পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জকিগঞ্জ উপজেলার কালিগঞ্জ গ্রোথ সেন্টারে প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি হাউজ কানেকশন, ৩০টি নলকূপ, ১টি পাবলিক টয়লেট, ৫কিমি বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন, ২টি উৎপাদক নলকূপ খনন, ২টি উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন কাজ।	২৫০.০০	কাজ চলমান প্রকল্পটি জুন/২০১৯ সালে সমাপ্ত হবে
১০	জাতীয় স্যানিটেশন (৩য় পর্ব) প্রকল্প	প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলায় কমিউনিটি টয়লেট ও পাবলিক টয়লেট নির্মাণ এবং স্বল্প মূল্যের রিং ও স্ল্যাব উৎপাদন ও বিতরণ।	১২০.০০	অগ্রগতি= ৫০% জুন/২০১৯ সালে সমাপ্ত হবে

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কাজের নাম	মন্তব্য
০১।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ‘‘সিলেট, বরিশাল ও খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন। ’’	১) সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬-তলা অ্যাকাডেমিক কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ।	চলমান
		২) সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দ্বিতল বাসভবন নির্মাণ।	
		৩) দক্ষিণ সুরমা সরকারি হাইস্কুল এর ৭-তলা অ্যাকাডেমিক কাম- প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ।	
০২।	শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত স্নাতকোত্তর লেজসমূহের উন্নয়ন ।	১) সিলেট সরকারি এম.সি কলেজে ৫ - তলা অ্যাকাডেমিক কাম-পরীক্ষা হল নির্মাণ।	সমাপ্ত
		২) সিলেট সরকারি এম.সি কলেজে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ৪ - তলা ছাত্রাবাস নির্মাণ।	সমাপ্ত
		৩) সিলেট সরকারি এম.সি কলেজে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ৪ - তলা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ।	চলমান
০৩।	“তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।	১) ব্লু-বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৫ -তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ।	চলমান
		২) আম্বরখানা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিদ্যমান অ্যাকাডেমিক ভবনের(২য় ও ৩য় তলা) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।	সমাপ্ত
০৪।	সিলেট জেলাধীন সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় , সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ এবং সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের উন্নয়ন।	১) সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজে ৫-তলা ভিতসহ ৪-তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ।	সমাপ্ত
		২) সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫-তলা ভিতসহ ৪ -তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ।	
		৩) সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের ৫-তলা ভিতসহ ৪ -তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ।	

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

(ক) সম্পাদিত প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অগ্রগতি/আলোচনা (সুপারিশসহ)
সিলেট ১৫০ মে. ও. কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।	৮৭৯.৯৯ কোটি টাকা	১০০%	সিলেট ১৫০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৪ মার্চ ২০১২ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন। বর্তমানে চালু আছে।
সেন্ট্রাল জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট	৩০০ কোটি টাকা	১০০%	(ক) ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (নতুন) = ৪টি (খ) ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (পুনর্বাসন) = ৪টি (গ) ৩৩ কেভি লাইন নির্মাণ (নতুন) = ৩৫.১৭ কি.মি (ঘ) ৩৩ কেভি লাইন (পুনর্বাসন) = ৩৪.৪১ কি.মি. (ঙ) ১১ কেভি লাইন (নতুন) = ৩৮.৩৩ কি.মি. (চ) ১১ কেভি লাইন (পুনর্বাসন) = ৭১.৭৫ কি.মি. (ছ) ১১/০.৪ কেভি লাইন (নতুন) = ৮৭.৬৮ কি.মি. (জ) ১১/০.৪ কেভি লাইন (পুনর্বাসন) = ১০৬.৭৪ কি.মি (ঝ) ০.৪ কেভি লাইন (নতুন) = ১৫৩.০৫ কি.মি (ঞ) ০.৪ কেভি লাইন (পুনর্বাসন) = ২৮৫.৯৪ কি.মি (ট) ১১ কেভি আন্ডারগ্রাইন্ড লাইন (নতুন) = ০১.০০ কি.মি (ঠ) ১১/০.৪ কেভি, ২৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার (নতুন) = ১৮৫টি (ড) ১১/০.৪ কেভি, ১০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার (নতুন) = ১৮৭টি (ঢ) ১১/০.৪ কেভি, ২০০/২৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার (পুনর্বাসন) = ১৬০টি (ণ) ১১/০.৪ কেভি, ১০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার (পুনর্বাসন) = ১০৯টি	বর্ণিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হয়েছে।

(খ) চলমান প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অগ্রগতি/আলোচনা (সুপারিশসহ)
কনভার্শন অব সিলেট ১৫০ মে.ও. জিটি টু ২২৫ মে.ও. কম্বাউন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র	৭০৭ কোটি টাকা	ভৌত ৬.৫% ও আর্থিক ২.৯৯ কোটি টাকা	কনভার্শন অব সিলেট ১৫০ মে.ও. জিটি টু ২২৫ মে.ও. কম্বাউন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র।	২০/১১/২০১৬ তারিখ আইডিবি ইআরডি-কে উক্ত প্রকল্পে অর্থায়ন করবে না মর্মে পত্র প্রদান করেছেন। ০২/০১/২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আরডিপিপি অনুমোদন হয়েছে। ০৩/০১/২০১৭ইং তারিখে বিইআরসি-তে রক্ষিত বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন/ রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল হতে অর্থায়নে সম্মতিপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প সিলেট, বিভাগ, বিউবো, সিলেট	৮৩৮.৮২ কোটি টাকা	৫.৪%	(ক) ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (নতুন) = ৯ টি (খ) ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (ক্ষমতা উন্নয়ন) = ২ টি (গ) ৩৩ কেভি লাইন নির্মাণ (নতুন) = ৬৭ কিমি (ঘ) ৩৩ কেভি লাইন (পুনর্বাসন) = ৬৩ কিমি (ঙ) ১১ কেভি লাইন (নতুন) = ২৭৬ কিমি (চ) ১১ কেভি লাইন (পুনর্বাসন) = ৩৫৬ কিমি (ছ) ১১/০.৪ কেভি লাইন (নতুন) = ২৪৫ কিমি (জ) ১১/০.৪ কেভি লাইন (পুনর্বাসন) = ৩১২ কিমি (ঝ) ০.৪ কেভি লাইন (নতুন) = ৫৬৮ কিমি (ঞ) ০.৪ কেভি লাইন (পুনর্বাসন) = ৬১০ কিমি (ট) ১১ কেভি আন্ডারগ্রাইন্ড লাইন (নতুন) = ০১.০০ কিমি (ঠ) ১১/০.৪ কেভি, ২৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার (নতুন) = ১৮৩১ (ড) ১১/০.৪ কেভি, ২০০/২৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার (পুনর্বাসন) = ১২৮ (ণ) ১১/০.৪ কেভি, ১০০/২৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার (পুনর্বাসন) = ৮৭ (ত) ১১/০.৪ কেভি, ২৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার (পুনর্বাসন) = ১০৮ (থ) ৩৩ কেভি ‘বে’ বর্ধিতকরণ = ১৭ টি	মালামালের ক্রয় প্রক্রিয়া ও উপকেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান।

সিলেট, সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১			
বিবরণ	১৯৭৮ হতে ২০০৮ পর্যন্ত (৩০ বছর)	জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত (০৭ বছর)	বছরভিত্তিক তুলনা
গ্রাহক সংযোগ	১ লাখ ৪৬ হাজার	১ লাখ ০৭ হাজার	৪,৮৬৭:১৫,২৮৬
লাইন নির্মাণ (কিঃ মি.)	৪,০০৫	১,৭৭৩	১৩৩.৫০:২৫৩.২৯
উপকেন্দ্র নির্মাণ (সংখ্যা)	০৭	০৭	০.২৩:১.০০
উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	৬৭.৫০	৬২.৫০	২.২৫:৮.৯৩
বিদ্যুৎ সরবরাহ (মেগাওয়াট)	৩৮	৪৪	১.২৭:৬.২৮
বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনগণ	৪৮%	৩৬%	১.৬০:৫.১৪
সিস্টেম লস	১৯.৬৫%	১৭.৮৮%	১.৭৭% হ্রাস
মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয় (কোটি)	৩.৯৬	১২.৯০	৩.২৬ গুন বৃদ্ধি

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ (ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত) অর্থবছরের অত্র পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উন্নয়নমূলক কার্যাদি:

০১। গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত:

ক্রমিক নং	গ্রাহক শ্রেণী	অর্থবছর		সমিতির শুরু হতে মোট সংযোগ (টি)
		২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত)	
০১	আবাসিক	১৮,৭৪০	৯,৯৪৮	৯৭,০৫৩
০২	বাণিজ্যিক	৯০৮	৫৩১	৮,৭৮২
০৩	শিল্প	৩৭	১০	১,০২৩
০৪	সেচ	৩৮	০০	২১৮
০৫	দাতব্য প্রতিষ্ঠান	২৮৭	১১২	২,০৩৭
০৬	স্ট্রীট লাইট	০৭	০০	৫৮
	মোট =	২০,০১৭	১০,৬০১	১,০৯,১৬১

০৩। **উপকেন্দ্র সংক্রান্ত:**

ক্রমিক নং	উপকেন্দ্রের নাম	উপজেলা	ক্ষমতা (এমভিএ)	ক্রমপুঞ্জিত উপকেন্দ্রসমূহের মোট ক্ষমতা (এমভিএ)
০১	বাদাঘাট উপকেন্দ্র	বাদাঘাট	১০	৫০
০২	গোয়াইনঘাট উপকেন্দ্র	গোয়াইনঘাট	১০	

০৫। **উপজেলাভিত্তিক শতভাগ বিদ্যুতায়ন:-**

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	শতভাগ বিদ্যুতায়নের সময়	সম্ভাব্য গ্রাহক সংখ্যা (টি)
০১	সিলেট সদর	ডিসেম্বর/১৬	১৫,২০০
০২	কানাইঘাট	ডিসেম্বর/১৮	৫০,৫৮৫
০৩	জৈন্তাপুর	ডিসেম্বর/১৭	১৮,৭৫১
০৪	গোয়াইনঘাট	ডিসেম্বর/১৮	৪৩,৭৮৫
০৫	কোম্পানীগঞ্জ	জুন/১৮	৩০,৯৮৭
০৬	ছাতক (আংশিক)	ডিসেম্বর/১৭	১,২০০
		মোট	১,৬০,৫০৮

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

বিবরণ	পবিস জন্মলগ্ন হতে ২০০৮ পর্যন্ত (০৯ বছর)	জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত (০৭ বছর)	অর্জনের হার
গ্রাহক সংযোগ	৩৮,৮৭০	৫৯,২৬৩	১৫২%
লাইন নির্মাণ (কি.মি.)	১,৭৪৫	১,০৮৪	৬২%
উপকেন্দ্র নির্মাণ (সংখ্যা)	০৩ টি	০১ টি	৩৩%
উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	২০	২০	১০০%
বিদ্যুৎ সরবরাহ (মেগাওয়াট)	১২	২৭	২২৫%
বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনগণ	২৫%	৩৭%	৩৭%
সিস্টেম লস	১৫.৯২%	১৭.২২%	(+) ০.৮৩%

জেলা পরিষদ

২০০৮-২০০৯ অর্থবছর হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত সিলেট জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প।

ক্র. নং	প্রকল্পের ধরন	অর্থবছর ২০০৮-২০০৯		অর্থবছর ২০০৯-২০১০		অর্থবছর ২০১০-২০১১		অর্থবছর ২০১১-২০১২	
		সংখ্যা/ বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ	বরাদ্দের পরিমাণ (লাখ টাকায়)	সংখ্যা/ বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ	বরাদ্দের পরিমাণ (লাখ টাকায়)	সংখ্যা/ বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ	বরাদ্দের পরিমাণ (লাখ টাকায়)	সংখ্যা/ বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ	বরাদ্দের পরিমাণ (লাখ টাকায়)
১	মসজিদ উন্নয়ন।	২৭টি	৩৬.০০	২৭টি	৩৬.০০	২২টি	৩৪.০০	৩২টি	৪২.০০
২	ঈদগাহ উন্নয়ন।	৪টি	৭.০০	৪টি	৭.০০	২ টি	৪.০০	১টি	৩.০০
৩	কবরস্থান উন্নয়ন।	৩টি	৪.০০	৩টি	৪.০০	-	-	২টি	৬.০০
৪	মন্দির উন্নয়ন।	৭টি	৩৬.০০	৭টি	৩৬.০০	২টি	৪.০০	২৬টি	৩০.০০
৫	শ্মশান উন্নয়ন।	২টি	২.০০	২টি	২.০০	২টি	২.০০	২টি	৪.০০
৬	এতিমখানা উন্নয়ন।	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	পাকা ঘাটলা নির্মাণ।	৪টি	৮.০০	৪টি	৮.০০	৪টি	৪.০০	২টি	৬.০০
৮	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	৫টি	১২.০০	৫টি	১২.০০	১০টি	১৫.০০	৪টি	৯.০০
৯	পাকা রাস্তা নির্মাণ।	৯টি ২.২৩ কি.মি.	২১.০০	৯টি ২.২৩ কি.মি.	২১.০০	৫৫টি ৮.৪৫কি.মি.	১৯০.০০	২৬টি ১০.৫কি.মি.	১১৫.০০
১০	পাকা রাস্তা মেরামত।	৫টি ০.৮০ কি.মি.;	৬.০০	৫টি ০.৮০ কি.মি.;	৬.০০	২টি ০.৫০ কি.মি.	৩.০০	৪ টি০.৮০ কি.মি.	৬.০০
১১	ড্রেইন নির্মাণ।	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	৫টি	৮.০০	২টি	৩.০০
১২	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।	২টি	৫.০০	২টি	৫.০০	২টি	৬.০০	১টি	২.০০
১৩	ক্লাব/সংস্থা/সমিতি উন্নয়ন।	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	৪ টি	৪.০০	৩টি	৩.০০
১৪	কালভার্ট নির্মাণ।	১টি	২.০০	১ টি	২.০০	৪ টি	৫.০০	২টি	৮.০০
১৫	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়ন। (স্কুল/কলেজ/মাদ্রাস)	২১টি	৩৭.০০	২১টি	৩৭.০০	৩৮ টি	৫০.০০	৬৬টি	১৩৫.০০
১৬	পাঠাগার নির্মাণ।	৪টি	৮৮.০০	৪টি	৮৮.০০	৩ টি	৪.০০	২টি	৫.০০
১৭	টিউবওয়েল স্থাপন।	৫ টি	১০.০০	৫টি	১০.০০	১৩ টি	১৩.০০	৪টি	৩.০০
১৮	ল্যাট্রিন নির্মাণ।	৯ টি	১১.০০	৯টি	১১.০০	৩ টি	৪.০০	৭টি	৮.০০
১৯	স্মৃতিসৌধ নির্মাণ।	-	-	-	-	২ টি	৪.০০	-	-
২০	শহীদমিনার নির্মাণ।	১টি	২.০০	১টি	২.০০	২ টি	৬.০০	৩টি	৫.০০
২১	মূর‌্যাল নির্মাণ।	-	-	-	-	-	-	-	-
২২	যাত্রি ছাউনি নির্মাণ।	১০টি	২২.০০	১০টি	২২.০০	৪টি	৮.০০	৭টি	১৮.০০
২৩	হাট-বাজার উন্নয়ন।	-	-	-	-	-	-	-	-
২৪	অন্যান্য	৩১টি	৩২.০০	৩১টি	৩২.০০	৮৯টি	৯৭.০০	২৫টি	৩০.০০
২৫	আসবাবপত্র সরবরাহ (স্কুল/কলেজ/মাদরাসা)	২৭টি	৩৬.০০	২৭টি	৩৬.০০	৩৩টি	৩৭.০০	২০টি	৪২.০০
২৬	ডাকবাংলো নির্মাণ।	২টি	১১০.০০	২টি	১১০.০০	-	-	-	-
	মোট	১৮৩টি	৪৯৫.০০	১৮৩টি	৪৯৫.০০	৩০১টি	৫০২.০০	২৪১টি	৪৮৩.০০

২০০৮-২০০৯ অর্থবছর হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত সিলেট জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প।

ক্র. নং	প্রকল্পের ধরন	অর্থবছর ২০১২-২০১৩		অর্থবছর ২০১৩-২০১৪		অর্থবছর ২০১৪-২০১৫		অর্থবছর ২০১৫-২০১৬	
		সংখ্যা/ বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ	বরাদ্দের পরিমাণ (লাখ টাকায়)	সংখ্যা/ বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ	বরাদ্দের পরিমাণ (লাখ টাকায়)	সংখ্যা/ বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ	বরাদ্দের পরিমাণ (লাখ টাকায়)	সংখ্যা/ বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ	বরাদ্দের পরিমাণ (লাখ টাকায়)
১	মসজিদ উন্নয়ন।	৪২টি	৬৫.০০	২৬টি	২৫১.০০	৩২টি	৪২.০০	২৭টি	৩১৭.০০
২	ঈদগাহ উন্নয়ন।	-	-	৪টি	১০.০০	২টি	৪.০০	২টি	২.০০
৩	কবরস্থান উন্নয়ন।	১টি	২.০০	২টি	৬.০০	-	-	-	-
৪	মন্দির উন্নয়ন।	২৬টি	৩৫.০০	১২টি	৮২.০০	১৫টি	৪২.০০	১৬টি	২০.০০
৫	শ্মাশান উন্নয়ন।	২টি	৪.০০	১টি	৩৪.০০	১টি	২.০০	২টি	২.০০
৬	এতিমখানা উন্নয়ন।	-	-			-	-	-	-
৭	পাকা ঘাটলা নির্মাণ।	৪টি	৮.০০	৬টি	২১.০০	৫টি	৮.০০	৩টি	৫.০০
৮	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	৫টি	৮.০০	৬টি	১৯৫.০০	৩টি	৮.০০	৪টি	৯.০০
৯	পাকা রাস্তা নির্মাণ।	৩৭টি ৯.৪৫কি.মি.	৮৫.০০	৪৪টি	২০৮.০০	৪৫টি ১৫.২০কি.মি.	২২৫.০০	২৭টি ১৮.৫০কি.মি.	১৯০.০০
১০	পাকা রাস্তা মেরামত।	৪টি ০.৫০ কি.মি.	৩.০০	২টি	৪.০০	৫ টি ১.২০ কি.মি.	১২.০০	১০টি ০.৮০কি.মি.	১২.০০
১১	ড্রেইন নির্মাণ।	২টি	৬.০০	৫টি	১২.০০	২টি	৫.০০	৩টি	৯.০০
১২	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।	টি	৫.০০	২টি	৭.০০	১টি	৪.০০	-	-
১৩	ক্লাব/সংস্থা/সমিতি উন্নয়ন।	১টি	২০.০০	১টি	২১৭.০০	৪টি	৫.০০	৩টি	৩.০০
১৪	কালভার্ট নির্মাণ।	৮টি	১৬.০০	৬টি	১১.০০	৫টি	৮.০০	২টি	৪.০০
১৫	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়ন। (স্কুল/কলেজ/মাদরাসা)	৮৮টি	৭২.০০	৩৬টি	৪১.০০	৪২টি	৮৬.০০	৬৫টি	১৮৫.০০
১৬	পাঠাগার নির্মাণ।	৩টি	৬.০০	১টি	২৭.০০	২টি	১০.০০	৮টি	১৯.০০
১৭	টিউবওয়েল স্থাপন।	৭টি	৮.০০	৪টি	৭.০০	৭টি	১০.০০	৭টি	৩.০০
১৮	ল্যাট্রিন নির্মাণ।	১৪টি	২০.০০	১২টি	১৬.০০	২৬টি	৩৫.০০	১২টি	১৫.০০
১৯	স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ।	-	-	১টি	২৫.০০	-	-	-	-
২০	শহীদমিনার নির্মাণ।	২টি	৪.০০	৩টি	১১.০০	১টি	২.০০	২টি	৬.০০
২১	মূর্যাল নির্মাণ।	-	-	২টি	২৬.০০	-	-	২টি	৩.০০
২২	যাত্রি ছাউনি নির্মাণ।	৪টি	১২.০০	৪টি	১১.০০	৩টি	৮.০০	৬টি	১৮.০০
২৩	হাট বাজার উন্নয়ন।	-	-			-	-	-	-
২৪	অন্যান্য	৫৮টি	১৩৩.০০	৮৮টি	২৪২.০০	২০৭টি	৩৭১.০০	২৮টি	৬৬.০০
২৫	আসবাবপত্র সরবরাহ (স্কুল/কলেজ/মাদরাসা)	৪৬টি	৫২.০০	৩৭টি	৪৯.০০	২৪টি	৫২.০০	২৬টি	৩০.০০
২৬	ডাকবাংলো নির্মাণ।	-	-			-	-	-	-
	মোট	৩৫৫টি	৫৬৪.০০	৩০৫	১৫১৩.০০	৪৩২টি	৯৩৯.০০	২৫১টি	৯১৮.০০

সিলেট সিটি করপোরেশন

জানুয়ারি-২০০৯ হতে ডিসেম্বর-২০১৪ এবং জানুয়ারি-২০১৫ হতে এ পর্যন্ত অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা

১। জানুয়ারি-২০০৯ হতে ডিসেম্বর-২০১৪ পর্যন্ত অনুমোদিত প্রকল্প:

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্পব্যয়			অনুমোদনের তারিখ	মূল কার্যক্রম	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (নভেম্বর-১৬ পর্যন্ত)		মন্তব্য
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য			ভৌত	আর্থিক	
১	সিলেট সিটি করপোরেশন প্রাইমারী ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নগর ভবন নির্মাণ ও অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত)। (জুলাই/০৯-জুন/১৬)	৪৪৫০.৪৮৬	৩৫৬০.০০	-	মূল-৩০/০৯/২০০৯ সংশোধিত-১১/১১/২০১৩	ছড়া/খাল খনন, পুনর্খনন, আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, নগর ভবন নির্মাণ, অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়।	১০০%	৪৪৫০.৪৮৬	
২	সিলেট সিটি করপোরেশন গুরুত্বপুর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রাসারণ। (জুলাই/১০-জুন/১৬)	২৩৬৭৭.০২	২০১২৫.৫০	-	০৯/০৯/২০১০	রাস্তা উন্নয়ন/নির্মাণ, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ, রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন, পীর হাবিবুর রহমান পাঠাগার নির্মাণ, ক্লিনার কলোনি নির্মাণ, সিসি ব্লক দ্বারা নদীর তীর সংরক্ষণ।	১০০%	২৩৬৭৭.০২	
৩	সিলেট সিটি করপোরেশনের অনুন্নত এলাকা কাঁচা রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ, রিটেইনিং ওয়াল ও কালভার্ট নির্মাণ। জুলাই/১২-জুন/১৭।	১৫৩১৩.২১	১৩৭৮১.৮৯	-	০২/০২/২০১৩	রাস্তা উন্নয়ন/নির্মাণ, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ, রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ।	৮০%	১০,৩০০.০০	
৪	হযরত গাজী বোরহান উদ্দিন (রহঃ) মাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন। জুলাই/২০১৩-জুন/১৬।	১৮৭৭.৪৫২	১৬৯০.০০	-	০২/০৪/২০১৩	হযরত গাজী বোরহান উদ্দিন (রহ.) মাজার মসজিদ নির্মাণ, মহিলা এবাদতখানা নির্মাণ, এসফল্ট দ্বারা সংযোগ সড়ক নির্মাণ, কার্পেটিং দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	১০০%	১৮৭৭.৪৫২	

জানুয়ারি-২০০৯ হতে ডিসেম্বর-২০১৪ এবং জানুয়ারি-২০১৫ হতে এ পর্যন্ত অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা।

২। জানুয়ারি-২০১৫ হতে এ পর্যন্ত অনুমোদিত প্রকল্প:

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্পব্যয়			অনুমোদনের তারিখ	মূল কার্যক্রম	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (নভেম্বর-১৬ পর্যন্ত)		মন্তব্য
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য			ভৌত	আর্থিক	
১	সিলেট সিটি করপোরেশন এলাকায় জমি অধিগ্রহনের মাধ্যমে ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প। জানু:/১৫-জুন/১৮।	২৩৯৫.০০	১৬৭৬.৫০	-	১৯/০১/১৫	জমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল, কাউন্টার বিল্ডিং নির্মাণ, অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ ইত্যাদি।	৭০%	৯৩৫.০০	
২	উন্নত পরিবেশ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সিলেট সিটি করপোরেশন এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ। (ভারতীয় অনুদান) জানু/১৬-ডিসে/১৭	২৪২৮.০০	-	২৪২৮.০০	২১/০৩/১৬	ধোপাদিঘীরপার এলাকায় আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল, ওয়াকওয়ে ও সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ, ৬ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ক্লিনার কলোনি নির্মাণ, চারাদিঘীরপার এলাকায় ৬ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ।	০.০০	০.০০	
৩	সিলেট সিটি করপোরেশনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ১১ টি প্রধান প্রধান ছড়া/খাল এর পার্শ্বে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প। জানুয়ারি/২০১৭-ডিসে:২০১৯।	২৩৬৪০.৩৬	২০০৯৪.৩১	-	২২/১২/১৬	ছড়া/খালের পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, খনন ও পুনঃ খনন কাজ, আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, ইউ টাইপ ড্রেন নির্মাণ, ওয়াকওয়ে ও সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ।	০.০০	০.০০	

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট

সিলেট জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবরণী ২০০৯-২০১৬ পর্যন্ত:

ক্র. নং	প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম	অর্থবছর	অর্থের পরিমাণ (লাখ টাকায়)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	বোরো চাষে ডিজেল ক্রয়ে ভর্তুকি	২০০৯-১০	৮৩৪.৮৫	১০০%	
০২	কৃষি উন্নয়ন সহায়তা কার্ড তৈরী	২০০৯-১০	৫.৯৯	১০০%	
০৩	বোরো চাষে উপকরণ সহায়তা	২০১০-১১	৭২৫.৭৫	১০০%	
০৪	উফশী আউশ চাষে বিনামূল্যে সার সহায়তা	২০১০-১১(২০১০)	৭০.১৮	১০০%	
০৫	উফশী আউশ চাষে বিনামূল্যে সার সহায়তা	২০১১-১২ (২০১১)	৭১.৫২	১০০%	
০৬	খামার যান্ত্রিকীকরণে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ভর্তুকি	২০১১-১২(২০১১)	১২২.৮৩	১০০%	
০৭	আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহায়তা প্যাকেজ	২০১২-১৩(২০১২)	৭০.২৮	১০০%	
০৮	আউশ (উফশী ও নেরিকা) এলাকা সম্প্রসারণে প্রণোদনা প্যাকেজ	২০১৩-১৪(২০১৩)	২২৭.১০	১০০%	
০৯	কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড তৈরি	২০১৩-১৪(২০১৪)	৮.২০	১০০%	
১০	মূল্য কমায় ইউরিয়া সারের ভর্তুকি	২০১৩-১৪(২০১৪)	২৬.১৯	১০০%	
১১	আউশ (উফশী ও নেরিকা) এলাকা সম্প্রসারণে প্রনোদনা প্যাকেজ	২০১৪-১৫(২০১৪)	১৬৯.৯৯	১০০%	
১২	রোপা আমন (উফশী ও নেরিকা) চাষে বীজ সার সহায়তা	২০১৪-১৫(২০১৪)	১৯.২৯	১০০%	
১৩	উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সহায়তা ও বাস্তবায়ন	০১/০১/০৯ হতে ৩১/১০/২০১৬পর্যন্ত	৫১০.৪২	১০০%	
১৪	রবি মৌসুমে কৃষি পুনবার্সন কর্মসুচি	২০১৪-১৫(২০১৪)	৫৬.৬৯	১০০%	
১৫	আউশ প্রনোদনা (উফশী ও নেরিকা)	২০১৪-১৫ (২০১৪)	১২৩.৬১	১০০%	
১৬	হাওর এলাকায় রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্র সরবরাহ সংক্রান্ত প্রনোদনা কর্মসুচি	২০১৫-১৬(২০১৫)	৭৯.৮০	১০০%	২১টি
১৭	হাওর এলাকায় রিপার যন্ত্র সরবরাহ সংক্রামন্ত প্রনোদনা কর্মসুচি	২০১৫-১৬(২০১৫)	৭৩.১০	১০০%	৪৩টি
১৮	আউশ প্রনোদনা উফশী ও নেরিকা (উৎপাদন বৃদ্ধির লাক্ষ্যে)	২০১৫-১৬(২০১৫)	১২৯.২৩	১০০%	
১৯	রবি ও খরিপ-১ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসুচি	২০১৬-১৭ (২০১৬)	২৯.৪৩	১০০%	
২০	রাজস্ব খাতের প্রদর্শনী বাবদ (রবি ও খরিপ-১ মৌসুম)	২০১৬-১৭ (২০১৬)	৪৫.৭২	৪৩%	
সর্বমোট			৩৪০০.১৭		

ক্র. নং	উপজেলার সংখ্যা	কমিটির আওতায় নির্বাচিত ইউনিয়নের সংখ্যা	পতিত জমি আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টরে)	পতিত জমি আবাদের অগ্রগতি (হেক্টরে)	অর্থবছর	উৎপাদিত ফসলের প্রাপ্ত মূল্য (লাখ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
১	১৩	১৩	১৩৮৪১	১০১৩৪	২০১৫-১৬	১০৬৩.৪৩	৭৩%	-
২	১৩	৩৯	৩৩,১৬৯	৪৭৩৯.৩১	২০১৬-১৭	-	-	কার্যক্রম চলমান

প্রাণিসম্পদ বিভাগ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ	বাস্তবায়নের হার	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রকল্প	২৬১,৩৬,০০০/-	১০০%	
২।	সমাজভিত্তিক ও বাজনজ্যিক খামারে দেশি ভেড়া পালন প্রকল্প	৬,৯৪,৮০০/-	১০০%	
৩।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প(ইউএলডিসি)	১১,৩৪,০০,০০০/-	৯০%	
৪।	প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (কোয়ারেনটাইন)	৬,৪৮,০০,০০০/-	৯০%	
৫।	প্রাণিপুষ্টি ও ঘাস চাষ সম্পসারণ প্রকল্প	৩,৯৭,১৩৪/-	৯০%	
৬।	কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রাসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রকল্প	৫,৮৩,২০০/-	১০০%	

সিভিল সার্জন অফিস

ক্রমিক নং	উন্নয়ন/অগ্রগতির বিবরণ	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১.	**অবকাঠামোগত উন্নয়ন**	কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ:-প্রস্তাবিত ২৮৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ১৮৫ টি নির্মাণ করা হয় ।	
	১৯৯৯- ২০১০ বৎসর **২০১১ সাল** **২০১২** **২০১৩-২০১৪** **২০১৫-২০১৬**	নতুন ১৩টি ১৯টি ৩৩টি ৬ টি , বর্তমানে নির্মাণাধীন ১০টি। এ পর্যন্ত মোট ২৫৬ টি চালু আছে এবং সে গুলোতে সেবা কার্য্যক্রম চলছে।	
২	**স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত অগ্রগতি**	কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক সেবা- সেবার সাল মোট রোগীর সংখ্যা ২০১০ ২,১৮,২৪৫ জন ২০১১ ৫,০২,৪৬৫ ২০১২ ১০,৮৬,৬৫৪ ২০১৩ ২২,৮৬,০৬৫ ২০১৪ ২৪,২০,১৭০ জন ২০১৫ ২২,৬৭,২৯১ জন ২০১৬ ২২৫৩৬৬৫ জন তাছাড়া ২০১২ সাল হতে নভেম্বর /২০১৬ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকে মোট ৩৪৫টি ডেলিভারী সম্পন্ন করা হয়েছে।	
৩.	**প্রতিরোধমূলক ও ইপিআই কর্মুসুচি:**	টিকাদান কর্মসুচি : সিলেট জেলায় ২৭০৫ টি অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের ৬ টি মারাত্মক রোগের (ডিপথেরিয়া, যক্ষা, পোলিও, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হাম, জন্ডিস, মেনিঞ্জাইটিস ও নিউমোনিয়া) রোগ সহ মোট ০৯ টি রোগের প্রতিষেধক টিকা কার্য্যক্রম চলছে। সাল ইপিআই টিকা অর্জনের হার (শিশু) ২০১০ ৯৫% ২০১১ ৯৬% ২০১২ ৯৮% ২০১৩ ৮৯% ২০১৪ ৯৭% ২০১৫ ৯৭% ২০১৬ ৮৮% (নভেম্বর পর্যন্ত) পোলিও টিকা খাওয়ানো অর্জনের হার ২০১০ ৯৯% ২০১১ ১০১% ২০১২ ১০০% ২০১৩ ১০০%	
	২০০৯-২০১৬	MDG-4 & 5 t মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসুচি গ্রহনের ফলে সিলেট জেলায় ব্যাপক হারে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু কমে ২০১৫ সালের অর্জন লক্ষ্যমাত্রার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। BBS পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমান সালে দেশের শিশু মৃত্যু ও মাতৃ মৃত্যুরহার দেওয়া হলো: শিশু মৃত্যুঃ- ০-২৮ দিন ২৮/১০০০ (জীবিত জন্ম) ২৮দিন -১ বছর ৩৮ /১০০০ (জীবিত জন্ম) ১-৫ বছর ৪৬/১০০০ (জীবিত জন্ম) মাতৃ মৃত্যুঃ- ১৭০/১০০০০০ (জীবিত জন্ম)	

ক্রমিক নং	উন্নয়ন/অগ্রগতির বিবরণ	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
৪.	জনবল নিয়োগ	বর্তমান সরকারের আমলে সিভিল সার্জন, সিলেটের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে **মোট ২৭৬ জন** ডাক্তার, **৯৯ জন সিনিয়র ষ্টাফ নার্স, ৩য় শ্রেণি ১৩৩ জন, ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে ১৪৮ জনসহ মোট ৬৫৬** জন জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে । তাছাড়া গ্রামপর্যায়ে প্রান্তিক জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান সরকারের আমলে কমিউনিটি ক্লিনিকে **মোট ২৫৪ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।**	
৫.	মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা সার্ভিস	বর্তমান সরকারের আমলে ১১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহে **মোবাইল ফোন সরবরাহের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মোবাইল ফোনে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।** এবং বিভিন্ন চিকিৎসা বিষয়ে স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। **যা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের যুগান্তকারী পদক্ষেপ।**	

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	অর্থবছর	মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ	ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	বয়স্কভাতা	২০০৯-১০	৩০০/-	৪৯,৮৪৬	১৭,৯৪,৪৫,৬০০/-	বয়স্কভাতা কার্যক্রম বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে শুরু হয়। চলতি অর্থবছরে সেপ্টেম্বর, ১৬ পর্যন্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
		২০১০-১১	৩০০/-	৫৪,১৮৭	১৯,৫০,৭৩,২০০/-	
		২০১১-১২	৩০০/-	৫৪,১৮৭	১৯,৫০,৭৩,২০০/-	
		২০১২-১৩	৩০০/-	৫৪,১৮৭	১৯,৫০,৭৩,২০০/-	
		২০১৩-১৪	৩০০/-	৫৯,৬০৬	২১,৪৫,৮১,৬০০/-	
		২০১৪-১৫	৪০০/-	৫৯,৬০৬	২৮,৬১,০৮,৮০০/-	
		২০১৫-১৬	৪০০/-	৬৫০৮৩	৩১,২৩,৯৮,৪০০/-	
		২০১৬-১৭	৫০০/-	৬৭৯৩৭	১০,১৯,০৫,৫০০/-	
০২	**বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা**	২০০৯-১০	৩০০/-	১৫,৮১৬	৫,৬৯,৩৭,৬০০/-	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলের ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে শুরু হয়। চলতি অর্থবছরে সেপ্টেমর,১৬ পর্যন্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
		২০১০-১১	৩০০/-	১৫,৮১৬	৫,৬৯,৩৭,৬০০/-	
		২০১১-১২	৩০০/-	১৫,৮১৬	৫,৬৯,৩৭,৬০০/-	
		২০১২-১৩	৩০০/-	১৫,৮১৬	৫,৬৯,৩৭,৬০০/-	
		২০১৩-১৪	৩০০/-	১৭,৩৯৮	৬,২৬,৩২,৮০০/-	
		২০১৪-১৫	৪০০/-	১৭,৩৯৮	৮,৩৫,১০,৪০০/-	
		২০১৫-১৬	৪০০/-	১৯,০৮৫	৯,১৬,০৮,৮০০/-	
		২০১৬-১৭	৫০০/-	১৯,৫৬৬	২,৯৩,৪৯,০০০/-	
০৩	**অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা**	২০০৯-১০	৩০০/-	৫,৭২৭	২,০৬,১৭,২০০/-	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সেপ্টেমর, ১৬ পর্যন্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
		২০১০-১১	৩০০/-	৫,৭২৭	২,০৬,১৭,২০০/-	
		২০১১-১২	৩০০/-	৫,৭২৭	২,০৬,১৭,২০০/-	
		২০১২-১৩	৩০০/-	৫,৭২৭	২,০৬,১৭,২০০/-	
		২০১৩-১৪	৩০০/-	৬,২৯৯	২,৬৪,৫৫,৮০০/-	
		২০১৪-১৫	৫০০/-	৮,০০৯	৪,৮০,৫৪,০০০/-	
		২০১৫-১৬	৫০০/-	১২,১৩৮	৭,২৮,২৮,০০০/-	
		২০১৬-১৭	৬০০/-	১৫,১৭২	২,৭৩,০৯,৬০০/-	
০৪	**মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা**	২০০৯-১০	১,৫০০/-	৩,২০০	৫,৭৬,০০,০০০/-	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে শুরু হয়। জুলাই, ১৫ থেকে ডিসেম্বর,১৫ পর্যন্ত ৫,০০০/-টাকা এবং জানুয়ারি, ১৬ থেকে জুন,১৬ পর্যন্ত মাথাপিছু ৮,০০০/- টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়। চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর, ১৬ পর্যন্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
		২০১০-১১	২,০০০/-	৩,৮৪১	৯,২১,৮৪,০০০/-	
		২০১১-১২	২,০০০/-	৩,৮৪১	৯,২১,৮৪,০০০/-	
		২০১২-১৩	৩,০০০/-	৩,৮৪১	১৩,৮২,৭৬,০০০/-	
		২০১৩-১৪	৫,০০০/-	৪,১০৮	২৪,৬৪,৮০,০০০/-	
		২০১৪-১৫	৫,০০০/-	৪,১০৮	২৪,৬৪,৮০,০০০/-	
		২০১৫-১৬	৫,০০০/- ৮,০০০/-	৪,১৩৬	২৪,৮৩,১০,০০০/-	
		২০১৬-১৭	১০,০০০/-	৪,১৩৭	২৪,৮২,২০,০০০/-	

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	অর্থবছর	মাথাপিছু মাসিক/ভাতা উপবৃত্তির পরিমাণ	উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৫	**প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম**	২০০৯-১০	প্রাথমিক: ৩০০ টাকা, মাধ্যমিক: ৪৫০ টাকা উচ্চ মাধ্যমিক: ৬০০ টাকা স্নাতক ও উচ্চতর শ্রেণি: ১০০০ টাকা	২৬৭	২,২৯,৮০০/-	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে শুরু হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
		২০১০-১১		২৭১	২,৬৫,৮০০/-	
		২০১১-১২		২৮৭	২,৯৩,৪০০/-	
		২০১২-১৩		২৮৭	২,৯৩,৪০০/-	
		২০১৩-১৪		৩১৭	১২,৫৫,৮০০/-	
		২০১৪-১৫		৭২২	৩৩,৭০,৮০০/-	
		২০১৫-১৬	প্রাথমিক : ৫০০ টাকা, মাধ্যমিক: ৬০০ টাকা উচ্চ মাধ্যমিক: ৭০০ টাকা স্নাতক ও উচ্চতর শ্রেণি: ১২০০ টাকা	৯৪০	৬৩,০৯,৬০০/-	
০৬	**হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম**	২০১২-১৩	প্রাথমিক: ৩০০ টাকা, মাধ্যমিক: ৪৫০ টাকা উচ্চ মাধ্যমিক: ৬০০ টাকা স্নাতক ও উচ্চতর শ্রেণি: ১০০০ টাকা	১৮	১১,১০০/-	হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বর্তমান সরকারের আমলের ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে শুরু হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
		২০১৩-১৪		১৮	৬৯,৯৫০/-	
		২০১৪-১৫		১৮	৯০,৬০০/-	
		২০১৫-১৬		৩৭	১,২৭,৩৫০/-	
০৭	**হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা** এই কার্যক্রমের আওতায় ৫০ বছরের উর্ধ্বের হিজড়া জনগোষ্ঠীকে ভাতা প্রদান করা হয়। এটি বর্তমান সরকারের আমলে ২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে।	২০১২-১৩	৩০০/-	২৩	৮২,৮০০/-	হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা বর্তমান সরকারের আমলের ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে শুরু হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
		২০১৩-১৪	৩০০/-	২৩	৮২,৮০০/-	
		২০১৪-১৫	৫০০/-	২৩	১,৩৮,০০০/-	
		২০১৫-১৬	৫০০/-	২৩	১,৩৮,০০০/-	
০৮	**হিজড়া জনগোষ্ঠির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম** এ কার্যক্রমের আওতায় ১৮ বছরের উর্ধ্বের হিজড়া জনগোষ্ঠিকে প্রতিবছর ৫০ দিনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণোত্তর পূনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা হয়	২০১২-১৩		৫০	৮,৭৫,০১৮/-	হিজড়া জনগোষ্ঠির **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম** বর্তমান সরকারের আমলের ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে শুরু হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
		২০১৩-১৪		৫০	১৪,৫৫,২০০/-	
		২০১৪-১৫		৫০	১৪,১৮,৫০০/-	
		২০১৫-১৬		৫০		
০৯	**চা-শ্রমিকদের এককালীন আর্থিক সহায়তা কর্মসুচি** এ কার্যক্রমের আওতায় চা-শ্রমিকদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ জাতীয়	২০১২-১৩	৫০০০/-	৯০০	৪৫,০০,০০০/-	চা-শ্রমিকদের এককালীন আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের আমলের ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে শুরু হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ পাওয়া
		২০১৩-১৪	৫০০০/-	৯০০	৪৫,০০,০০০/-	
		২০১৪-১৫	৫০০০/-	৯০০	৪৫,০০,০০০/-	
		২০১৫-১৬	৫০০০/-	৯০০	৪৫,০০,০০০/-	

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	অর্থবছর	মাথাপিছু মাসিক/ভাতা উপবৃত্তির পরিমাণ	উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়।					যায়নি।
১০	**চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসুচি:** এ কর্মসুচির অধীনে সিলেট জেলার বিভিন্ন চা-বাগানের শ্রমিক পরিবারকে পরিবারপ্রতি ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী তিনটি প্যাকেজে সরবরাহ করা হয়।	২০১২-১৩	৫০০০/-	২০০০	৮০,০০,০০০/-	চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসুচি বর্তমান সরকারের আমলের ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে শুরু হয়।
		২০১৩-১৪	০	০	০	
		২০১৪-১৫	৫০০০/-	৬০০	৩০,০০,০০০/-	
		২০১৫-১৬	৫০০০/-	১৪৭০	৭৩,৫০,০০০/-	
		২০১৬-১৭	৫০০০/-	২৭৬৮	১,৩৮,৪০,০০০/-	
১১	**ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভুক্ত দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা কর্মসুচি:** এ কর্মসুচির অধীনে উপরে উলেস্নখিত জনগোষ্ঠীর লোকজনদের বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে মাথাপিছু ৫,০০০/- টাকার চেক প্রদান করা হয়।	২০১২-১৩	৫০০০/-	১০০	৫,০০,০০০/-	ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভুক্ত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের আমলের ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে শুরু হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
		২০১৩-১৪	৫০০০/-	১০০	৫,০০,০০০/-	
		২০১৪-১৫	৫০০০/-	১৫০	৭,৫০,০০০/-	
		২০১৬-১৬	৫০০০/-	১৫০	৭,৫০,০০০/-	

ক্যানসার , কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি :

ক্র. নং	অর্থবছর	মাথাপিছু বরাদ্দ	সাহায্যপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	মোট বিতরণকৃত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১২	২০০৯-১০	৫০,০০০/-	১৩	৬,৫০,০০০/-	এটি বর্তমান সরকারের আমলের ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে শুরু হয়।
	২০১০-১১	৫০,০০০/-	০	০	
	২০১১-১২	৫০,০০০/-	৪	২,০০,০০০/-	
	২০১২-১৩	৫০,০০০/-	৮	৪,০০,০০০/-	
	২০১৩-১৪	৫০,০০০/-	৩৬	১৮,০০,০০০/-	
	২০১৪-১৫	৫০,০০০/-	১৪৮	৭২,০০,০০০/-	
	২০১৫-১৬	৫০,০০০/-	১৭৪	৮৭,০০,০০০/-	
	২০১৬-১৭	৫০,০০০/-	৪৯	২৪,৫০,০০০/-	
		মোট :	৪৩২	২,১৬,০০,০০০/-	

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	অর্থবছর	অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থার সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১৩	**স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের মধ্যে এককালীন অনুদান বণ্টন**	২০০৯-১০	৪০	১০,২৬,০০০/-	এই কার্যক্রমের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের মধ্যে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়।
		২০১০-১১	৬৭	৫,২৩,০০০/-	
		২০১১-১২	৬৫	১৫,৯০,০০০/-	
		২০১২-১৩	৭৬	২১,৯৮,০০০/-	
		২০১৩-১৪	৮৪	২৩,৯৫,০০০/-	
		২০১৪-১৫	৯৬	২৩,৮৪,০০০/-	
		২০১৫-১৬	১০৭	৩৪,৪৪,০০০/-	
		২০১৬-১৭			

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	অর্থবছর	গ্র্যান্টপ্রাপ্ত এতিমের সংখ্যা	মাথাপিছু মাসিক বরাদ্দের পরিমাণ	মোট বরাদ্দ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪	**নিবন্ধিত বেসরকারি এতিমখানাসমূহের মধ্যে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান** এই কার্যক্রমের আওতায় নিবন্ধিত বেসরকারি এতিমখানাসমূহের অনাথ শিশুদের মাথাপিছু মাসিক নির্দিষ্ট হারে গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়।	২০০৯-১০	২৬০	৭০০/-	২১,৮৪,০০০/-	
		২০১০-১১	২৯০	১,০০০/-	৩৪,৮০,০০০/-	
		২০১১-১২	৩১৩	১,০০০/-	৩৭,৫৬,০০০/-	
		২০১২-১৩	৩৮৬	১,০০০/-	৪৬,৩২,০০০/-	
		২০১৩-১৪	৪৪৫	১,০০০/-	৫৩,৪০,০০০/-	
		২০১৪-১৫	৪৬৪	১,০০০/-	৫৫,৬৮,০০০/-	
		২০১৫-১৬	৪৬৯	১,০০০/-	৫৬,২৮,০০০/-	
		২০১৬-১৭				

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	অর্থবছর	সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা (জন)	হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, সাদাছড়ি ইত্যাদি উপকরণ গ্রহীতা রোগীর সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১৫	**প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, তালতলা, সিলেট** এই কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশণ থেরাপি, স্পিচ থেরাপী, শ্রবণমাত্রা পরীক্ষা এবং কাউন্সিলিং প্রদান করা হয়। কার্যক্রম শুরু : ৮/১/১২	২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭	১,৫১৭ ৩,৫০৫ ৫,৮২৫ ৮,৫৫০ ১০,৭৫৫ ১৫,২৬০	প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১। হুইল চেয়ার-১৯৮টি ২। ট্রাইসাইকেল-৫টি ৩। সাদাছড়ি-৬২টি ৪। কম্বল-১০০টি প্রদান করা হয়েছে।	কার্যক্রমটি বর্তমান সরকারের আমলে ২০১১-১০১২ অর্থবছর থেকে শুরু হয়। উক্ত কার্যালয়ের অধীনে বর্তমানে ১০ আসন বিশিষ্ট স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম নামে একটি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে।

১৬) প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম:

প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্থবছর	মাথাপিছু মাসিক খোরাকি ভাতা	বার্ষিক বরাদ্দ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১) সরকারি শিশু পরিবার (বালক) **২) সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা)** **৩) ছোটমণি নিবাস (বেবী হোম)** **৪) সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শেখঘাট, সিলেট** **৫) মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম), সিলেট** **৬) সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র** **৬টি প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৬৪৫ টি**	২০০৯-১০	১,৫০০/	১,১৬,১০,০০০/-	
	২০১০-১১	১,৫০০/	১,১৬,১০,০০০/-	
	২০১১-১২	২,০০০/-	১,৫৪,৮০,০০০/-	
	২০১২-১৩	২,০০০/	১,৫৪,৮০,০০০/-	
	২০১৩-১৪	২,০০০/	১,৫৪,৮০,০০০/-	
	২০১৪-১৫	২,৬০০/-	২,০১,২৪,০০০/-	
	২০১৫-১৬	২,৬০০/-	২,০১,২৪,০০০/-	
	২০১৬-১৭	২,৬০০/-	২,০১,২৪,০০০/-	
শেখ রাসেল ঝুঁকিপূর্ণ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র. সিলেট সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন অ্যাট রিস্ক (স্কার) নামক প্রকল্পের অধীন পরিচালিত এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ মেয়ে পথশিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক আত্মনির্ভরশীল করে সমাজে পুনর্বাসন করা হয়। **মোট আসন সংখ্যা : ১৫০টি**	২০১২-১৩	২,০০০/-	৩৬,০০,০০০/-	কার্যক্রমটি বর্তমান সরকারের আমলে ২০১২-১৩ অর্থবছরে শুরু হয়।
	২০১৩-১৪	২,০০০/-	৩৬,০০,০০০/-	
	২০১৪-১৫	২,০০০/-	৩৬,০০,০০০/-	
	২০১৫-১৬	২,৫০০/-	৪৫,০০,০০০/-	
	২০১৬-১৭	২,৫০০/-	৪৫,০০,০০০/-	

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	অর্থবছর	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১৭	**পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম)**	২০১১-১২	৫৮,০০,০০০/-	৫৮,০০,০০০/-	
		২০১২-১৩	৬০,০০,০০০	৬০,০০,০০০/-	
		২০১৩-১৪	৯৪,০০,০০০/-	৯৪,০০,০০০/-	
		২০১৪-১৫	১,০৯,৫০,০০০/-	১,০৯,৫০,০০০/-	
		২০১৫-১৬	৭,১২,৩৩,৩২০/-	৭,১২,৩৩,৩২০/-	
		২০১৬-১৭	৭,৭০,৮৩,৩২০/-	৭,৭০,৮৩,৩২০/-	
১৮	**শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম**	২০১৩-১৪	৩০,০০,০০০/-	৩০,০০,০০০/-	আশির দশকে ২,৯৭,০০০/- দিয়ে ঋণ কার্যক্রম শুরু হলে দীর্ঘদিন কোনো বরাদ্দ আসেনি। কর্তমান সরকারের আমলে ৩০ লাখ বরাদ্দ দিয়ে কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ক্র. নং	বিবরণ	২০১৫-২০১৬ অর্থবছর			২০১৬-২০১৭ অর্থবছর (নতুন নির্বাচন)	মোট	
০১.	১২টি উপজেলায় মোট মাতৃত্ব ভাতাভোগী	৩,০২৫ জন			৮,২২৫ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।	১১,২৫০ জন	
০২.	ভিজিডি কর্মসূচি	৫৩০০ জন (ডিসেম্বরে শেষ হবে)			১৩,৬৫০ জন	১৩,৬৫০ জন নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন	
০৩.	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি	সিটি করপোরেশনের ১৫০০ জন উপকারভোগীর ৪কিস্তির টাকা প্রদান করা হয়েছে। ৩০০ জন গোলাপগঞ্জ নির্বাচিত (২কিস্তির টাকা বিতরণ করা হয়েছে)			১৫০০ জন উপকারভোগী নির্বাচন শেষ পর্যায়।		
	ক্ষুদ্রঋণের হিসাব	জন	বিতরণ	আদায়	চলতি অনাদায়ী	খেলাপি	(%) হার
১	সিলেট সদর	২১৫	২৩,৬০,০০০/-	১৫৪০০৮৮/৫২	৬,০৮,৫৫০/-	২,১১,৩৬১/-	৬১%
২	দক্ষিণ সুরমা	৭৬	৭৬০০০০/-	৭৪৩৭৫০/-	-	৫৪২৫০/-	৭৭%
৩	বিশ্বনাথ	২০৪	২০১৫০০০/-	১২৮১৪৩৪/-	২৪৮৩০৮/-	৪৮৪২৫৭/-	৬৩%
৪	গোলাপগঞ্জ	২১৮	১৭৭০০০০/-	১৫৬১৩৭২/-	-	২০৭৭৯২/-	৮৮%
৫	কানাইঘাট	৮৯	৭৪০০০০/-	৪১৫০৬৮/-	-	৩২৪৯৩১/-	৫৬%
৬	বিয়ানীবাজার	১৮১	১৭৪০০০০/-	১০৪২৮৫০/-	৪৬৬২৪৩/-	২২৯১৫০/-	৫৯%
৭	গোয়াইনঘাট	৯৬	২০০০০০/-	১৭৪৫৪৫/-	১৫৪৭২৫/-	২৪৪৫৪/-	৮৭%
৮	জৈন্তাপুর	৬১	৪৫০০০০/-	২৯৪২৮২/-	১২৫৫৮৮/-	২৮৬৬০/-	৬৫%
৯	বালাগঞ্জ	৯১	৯৯০০০০/-	২৯০৯৬৬/-	১১৫০০০/-	৫৮৪০৩৪/-	২৯%
১০	ফেঞ্চুগঞ্জ	১৫৩	১৫০৩০০০/-	৯৫০১৪৯/-	৩১৬৪০০/-	২৩৬৪৫১/-	৬৩%
১১	কোম্পানীগঞ্জ	১৬৯	১৩৫৫০০০/-	১০৪২৮৫০/-	-	৪৫২৫৩৩/-	৭৩%
১২	জকিগঞ্জ	১৩৯	১৪০৩৫০০/-	৯০৪০৬৬/-	১৩২৩২৩/-	৩৬৭১১০/-	৬৪%
	সর্বমোট =	১৬৯২	১৫২৮৬৫০০/-	১০২৪১৪২০/-	২১৬৭১৩৭/-	৩২০৪৯৮৩/-	

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ক্র. নং	প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম	অর্থবছর	বরাদ্দ (লাখ টাকা)	কার্যক্রম অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম	২০০৯-২০১০	১২৩.৬০	৯৮%	
		২০১০-২০১১	২৯৪.৬৩৫	৯৭%	
		২০১১-২০১২	২৯৬.৫৬৬	৯৯%	
		২০১২-২০১৩	৩৩০.২৯৪	৯৯%	
		২০১৩-২০১৪	৩২০.১৩৪	৯৮%	
		২০১৪-২০১৫	৩৬৯.৪৪৬	৯৫%	
		২০১৫-২০১৬	৫২১.১৪০	৯৩%	
	মোট:	**২০০৯-২০১৬**	**২২৫৫.৮১৫**	**৯৭%**	
০২	মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প	২০০৯-২০১০	২১.৫২	৯৫%	
		২০১০-২০১১	২১.৫২	১০০%	
		২০১১-২০১২	০	-	প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ ছিল
		২০১২-২০১৩	০	-	প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ ছিল
		২০১৩-২০১৪	৩.২৫৫	১০০%	
০৩	মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	২০১৪-২০১৫	৪.৭৫৮	৯৮%	
		২০১৫-২০১৬	৯.১৭৩	১০০%	
	মোট:	**২০০৯-২০১৬**	**১৮৫.৬০৫**	**৯৮.৬%**	
০৪	সরকারি জাকাত ফান্ড	২০০৯-২০১০	০.৯২৫	১০০%	
		২০১০-২০১১	০.৩২৫	১০০%	
		২০১১-২০১২	১.৫৯	১০০%	
		২০১২-২০১৩	২.৫৭৪	১০০%	
		২০১৩-২০১৪	১.২২	১০০%	
		২০১৪-২০১৫	১.৯৭	১০০%	
		২০১৫-২০১৬	২.১৭৫	১০০%	১০.৭৭৯
	মোট:	**২০০৯-২০১৬**	**১০.৭৭৯**	**১০০%**	
০৫	ইমাম মোয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাষ্ট	২০০৯-২০১০	০	০	
		২০১০-২০১১	০	০	
		২০১১-২০১২	১.৫০	৯৯%	
		২০১২-২০১৩	৪.৬৮	১০০%	
		২০১৩-২০১৪	৩.৯৬	১০০%	
		২০১৪-২০১৫	৩.৬০	১০০%	
		২০১৫-২০১৬	৩.৬০	১০০%	১৭.৩৪
	মোট:	**২০০৯-২০১৬**	**১৭.৩৪**	**৯৯.৮০%**	
০৬	ইসলামিক ফাউন্ডেশন সিলেট বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয় এবং ইমাম প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি ভবন নির্মাণ	২০০৯-২০১১	৭৩০.৩৮	সমাপ্ত	১১-জুন ২০১১ উদ্বোধন। এই ভবনে অফিসের কার্যক্রম চলমান
০৭	ইমাম প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি সিলেট	২০০৯-২০১০	৮৯.৪৩	৯৯.৬৬%	
		২০১০-২০১১	১১৫.১২৭	৯৯.৮৬%	
		২০১১-২০১২	১০৮.৩৩৭	৯৯.৮৬%	
		২০১২-২০১৩	১১৩.০৯১	৯৯.৫০%	
		২০১৩-২০১৪	১২০.১৩২	৯৯.৬৬%	
		২০১৪-২০১৫	১৩৫.০৮	১০০%	
		২০১৫-২০১৬	১৫০.০৬২	৯৯.২২%	৮৩১.২৫৯
	মোট:	**২০০৯-২০১৬**	**৮৩১.২৫৯**	**৯৯.৬৮%**	

জেলা ক্রীড়া সংস্থা

ক্র. নং	উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ
০১	সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম	একশ তিন কোটি টাকা
০২	আবুল মাল আবদুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্স	চবিবশ কোটি টাকা
০৩	সিলেট জেলা স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নয়ন (বঙ্গাবন্ধু গোল্ডকাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্ণামেন্ট-২ কোটি এবং সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৬-১ কোটি)	তিন কোটি টাকা
০৪	সিলেট ফুটবল অ্যাকাডেমি	সাতানববই লাখ টাকা
০৫	সিলেট আন্তর্জাতিক আউটার স্টেডিয়াম	অনুমোদনের অপেক্ষায়
০৬	সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে বর্ধিত ক্রীড়া ভবন ও ভিআইপি গ্যালারি নির্মাণ সহ মেরামত ও সংস্কারকাজ	অনুমোদনের অপেক্ষায়

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

পূর্বের বিদ্যামান ০৯ টি ফায়ার স্টেশনসহ বর্তমান নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশনের উন্নয়নকাজ সমাপ্ত হলে সিলেট বিভাগে মোট ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হবে (৯+২৮)=৩৮ টি।

ক্রমিক নং	উন্নয়ন খাতের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ
১।	কমলগঞ্জ ফায়ার স্টেশননির্মাণকাজ	৯২,৩৭,০০০/-
২।	সিলেট দক্ষিণ ফায়ার স্টেশনে নতুন রেস্ট হাউজ নির্মাণকাজ	৬৫,০৪,০০০/-
৩।	সিলেট সেনানিবাস ফায়ার স্টেশননির্মাণকাজ	১,৫৪,৭১,০০০/-
৪।	বিয়ানীবাজার ফায়ার স্টেশননির্মাণকাজ	১,২৫,৬৪,০০০/-
৫।	গোলাপগঞ্জ ফায়ার স্টেশননির্মাণকাজ	১,৩৫,০০,০০০/-
৬।	শায়েস্তাগঞ্জ ফায়ার স্টেশননির্মাণকাজ	১,৬৪,০০,০০০/-
৭।	বানিয়াচং ফায়ার স্টেশননির্মাণকাজ	১,৬৪,০০,০০০/-
৮।	জগন্নাথপুর ফায়ার স্টেশননির্মাণকাজ	১,৩৫,২৮,০০০/-
৯।	জামালগঞ্জ ফায়ার স্টেশননির্মাণকাজ	১,৩৫,২৮,০০০/-
১০।	শালস্না ফায়ার স্টেশননির্মাণকাজ	১,৫১,৮২,০০০/-
১১।	ধর্মপাশা ফায়ার স্টেশননির্মাণকাজ	১,৭৫,০০,০০০/-
১২।	বিশ্বম্বরপুর ফায়ার স্টেশননির্মাণকাজ	১,৮২,৪৩,০০০/-
১৩।	দিরাই ফায়ার স্টেশননির্মাণকাজ	১,৩৮,২০,০০০/-
মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ=		১৮,১৮,৭৭,০০০/-

(আঠারো কোটি আঠারো লাখ সাতাত্তর হাজার টাকা)

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	অর্থবছর	অর্থের পরিমাণ	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	সিসিমপুর আউটরি প্রকল্প	২০১১-২০১৩ ইং	১৪,১৪৬০০/-	২০০ (দুইশ) প্রাক-প্রাথমিক (সরকারি) শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন স্কুলের ৬০০০ (ছয় হাজার) অভিভাবককে নিয়ে সভা করা হয়েছে। তা ছাড়া সদর উপজেলার ৫০টি বিদ্যালয়ে সিসিমপুর অনুষ্ঠান দেখানো হয়েছে।	এ প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুরা খেলাচ্ছলে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। অভিভাবক ও শিক্ষকগণ খেলাচ্ছলে আনন্দময় ও শিশু বান্ধব পরিবেশে কীভাবে শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার জ্ঞান এ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জন করতে পেরেছে।
২.	শিশুদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	জুলাই/২০১২-অক্টোবর/২০১৬	২২০,০০০	কর্মসূচি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।	প্রায় ৩০০ শিশু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আইসিটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে উপকৃত হয়েছে।
৩.	শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (২য় পর্যায়) প্রকল্প	ডিসেম্বর ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৬	৩,৫২,০০০/-	কর্মসূচিটি কেবলমাত্র শুরু হয়েছে এবং চলমান আছে।	প্রায় ৪৫৬০ শিশু **উপকৃত হয়েছে।**
৪	জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা	জানুয়ারি/২০০৯-অক্টোবর/২০১৬	১০,৭৬০০০/-	সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করা হয়েছে।	প্রায় ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) শিশু উপকৃত হয়েছে।
৫	মৌসুমী প্রতিযোগিতা	জানুয়ারি/২০০৯-অক্টোবর/২০১৬	৪২০,০০০/-	সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করা হয়েছে।	প্রায় ১৫,০০০ (পনের হাজার) শিশু উপকৃত হয়েছে।
৬	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস মহান বিজয় দিবস মহান স্বাধীনতা দিবস শহীদ বুদ্দিজীবী দিবস বাংলা নববর্ষ	জানুয়ারি/২০০৯-অক্টোবর/২০১৬	৮০,০০০/- ৭০,০০০/- ৭০,০০০/- ৫৫০০০/- ৮০,০০০/-	অনুষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করা হয়েছে।	অনুষ্ঠানগুলো পালনের মাধ্যমে শিশুদের অনেক সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। এতে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) শিশু উপকৃত হয়েছে।
৭	শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস	জানুয়ারি/২০০৯-অক্টোবর/২০১৬	১৭০,০০০/-	সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করা হয়েছে।	প্রায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) শিশু উপকৃত হয়েছে এবং এতে শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে।
৮	শিশু আনন্দমেলা	জানুয়ারি/২০০৯-অক্টোবর/২০১৬	১২০,০০০/-	ঐ	প্রায় ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) শিশু উপকৃত হয়েছে এবং এতে শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে।
৯	সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ	জানুয়ারি/২০০৯-অক্টোবর/২০১৬	৪৩২০০০/-	চিত্রাংকন, আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য ও তবলা ৬৫০০জন শিশু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।	৬৫০০ জন শিশু সরাসরি উপকৃত হয়েছে
১০	শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	জানুয়ারি/২০০৯-অক্টোবর/২০১৬	৬০২০০০০/-	সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করা হয়েছে।	৪২০ জন শিশু উপকৃত হয়েছে

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস

২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরাধীন সিলেট জেলায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের তথ্য :

১. গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর -খাদ্যশস্য)

ক্রমিক নং	অর্থবছর	উপজেলা/পৌরসভার সংখ্যা	বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য মে:টন	গৃহীত প্রকল্প	ব্যয়কৃত খাদ্যশস্য মে.টন	কাজের অগ্রগতি
১	২০০৮-০৯	১২ টি	৮৮২৩.৭৮১	৪৮৭১	৮৮.১০.৭৮১	৯৯.৭৯%
২	২০০৯-১০	১২ টি	৭৮৯১.৬৪২	৪৮৪১	৭৭৯৩.৬৪২	৯৮.৫৬ %
৩	২০১০-১১	১২ +৪	৩৮১৪.৩৪৮	২১৯৮	৩৮১৪.২৪২	৯৯.৭৪ %
৪	২০১১-১২	১২+৪	৬৬০৪.৯৮৩২	৪৩১১	৬৪৮২.৪৭৫	৯৮.০২%
৫	২০১২-১৩	১২+৪	৭৬৯৯.৬৭৪৪	৩৯৪৮	৭৬৬৫.৬৭৪৪	৯০%
৬	২০১৩-১৪	১২+৪	৮০১২.০৬২১	৪৫৭৮	৭৯৮৯.০৬২৬	৯৯.৭৬%
৭	২০১৪-১৫	১২+৪	৩৪৯৮.৯৬৮৮	১৯৭৮	৩৪৫০.০৯৫০	৯৯.১৪%
৮	২০১৫-১৬	১৩+৪	৩৫৫০.৭৪৩৭	২০২৩	৩৫১৪.৪৩৩২	৯৯.৭১%
৯	২০১৬-২০১৭	-	-	-	-	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি

২. গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর -নগদ টাকা)

ক্রমিক নং	অর্থবছর	উপজেলা/পৌরভার সংখ্যা	বরাদ্দকৃত নগদ টাকা	গৃহীত প্রকল্প	ব্যয়কৃত টাকা	কাজের অগ্রগতি
১	২০০৮-০৯	-	-	-	-	-
২	২০০৯-১০	-	-	-	-	-
৩	২০১০-১১	১২	৭,৩১,০০,০০০/-	১,৮৭১ টি	৭,২৬,৬০০০/-	৯৯.৩৮%
৪	২০১১-১২	-	-	-	-	-
৫	২০১২-১৩	-	-	-	-	-
৬	২০১৩-১৪	-	-	-	-	-
৭	২০১৪-১৫	১২+৪	৮,২৮,৩১,৯২৯/৪৮	২২৪১	৩,৮৫,২৯,৮৩০/-	৪৫%
৮	২০১৫-১৬	১৩+৪	৯,২৬,৮১,৮১৫/৪৯	১৯৪১	৯,০২,৭৯,৫৯০/-	৯৭.১২%
৯	২০১৬-২০১৭	১৩	১১,৮৭,৫৭,১৫৩/৭৫	--	--	প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন

৩. গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা -খাদ্যশস্য)

ক্রমিক নং	অর্থবছর	উপজেলা/ পৌরসভার সংখ্যা	বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য মে.টন	গৃহীত প্রকল্প	ব্যয়কৃত খাদ্যশস্য মে:টন	কাজের অগ্রগতি
১	২০০৮-০৯	১২	৬১৪৬.৪৫৬	৮৮০	৫৯১০.৫৯৩	৯৭%
২	২০০৯-১০	১২	৭৫৩৯.২৩৫	৯৯৩	৬৮১৩.৬২৬	৮৫%
৩	২০১০-১১	১২	১৬৯২.০০০	১৭৩	১৬৪১.৯১১	৯৭%
৪	২০১১-১২	১২	৭১১০.৬২০	১১০৯	৬৯৫৬.৭৫২	৯৭.৭৫%
৫	২০১২-১৩	১২	৭৩৫২.৪২৪৮	৯২৭	৭১৮৯.৭৫৮৯	৯৮.২৩%
৬	২০১৩-১৪	১২	৩৫৩২.৭২৭৫	৩৭৬	৩৪৮৯.১৯৪৮	৯৮.৭৪%
৭	২০১৪-১৫	১২	৫৯৪৪.৬৮৮	৬৯৩	৪৫৩৫.৯৬৪	৮০%
৮	২০১৫-১৬	১৩	৪২৪১.১০৭	৪৯৮	৪১০০.১৪৮৩	৯৬.৩৫%
৯	২০১৬-২০১৭	--	--	--	--	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি

৪. গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা -নগদ টাকা)

ক্রমিক নং	অর্থবছর	উপজেলা/ পৌরসভার সংখ্যা	বরাদ্দকৃত নগদ টাকা	গৃহীত প্রকল্প	ব্যয়কৃত নগদ টাকা	কাজের অগ্রগতি
১	২০০৮-০৯	-	-	-	-	-
২	২০০৯-১০	-	-	-	-	-
৩	২০১০-১১	১২	৫,৬৬,০০,০০০/-	৩৪৯	৫,৫৩,৬১,৩১৯/-	৯৮%
৪	২০১১-১২	-	-	-	-	-
৫	২০১২-১৩	-	-	-	-	-
৬	২০১৩-১৪	১২	৯,২৭,৭৬,৮৭৫/২১	৪৬৭	৮,৯৩,০৭,১৭৮/৫৭	৯৭%
৭	২০১৪-১৫	১২	২,৩৮,৮০,০০০/-	১০৪	১,১২,৪০,০০০/-	৫২.৫০%
৮	২০১৫-১৬	১৩	৭,৬২,৮৬,৪১৯/৭৪	২৯৬	৭,২৯,৯৭,০৪৭/৬১	৯৫%
৯	২০১৬-২০১৭	১৩	১২,১৮,২৪,৬৩১/-	-	-	প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন

৫. “অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান” কর্মসুচি   -

ক্রমিক নং	অর্থবছর	উপজেলা/ পৌরসভার সংখ্যা	বরাদ্দকৃত নগদ টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	ব্যয়কৃত নগদ টাকা	কাজের অগ্রগতি
১	২০০৮-০৯	১২	২০,০৪,৬০,০০০/-	৩৩৪১০	১৫,২৭,৬৬,৬০০/-	৭৮.১১%
২	২০০৯-১০	১২	৪,৩৫,৬০,০০০/-	৯০৭৫	৩,৮৩,৯২৪৪০/-	৯১%
৩	২০১০-১১	১২	৪,০৮,৯৬,০০০/-	৬৮১৬	৩,৬৩,০১,৫৭৫ /-	৮৮%
৪	২০১১-১২	১২	৩,১৮,৭৮,০০০/-	৪৫৫৪	৩,১৩,৯১,৮৭৫/-	৯৮.৫৫%
৫	২০১২-১৩	১২	৩,৩৮,৭৩,০০০/-	৪৮২৭	৩,২৮,২২,২৮০/-	৯৭%
৬	২০১৩-১৪	১২	৭,১৭,৬৮,০০০/-	৮৯৭১	৭,০৮,৫৩,০০০/-	৯৮.৭৪%
৭	২০১৪-১৫	১২	২৮,৯০,৯৬,০০০/-	৩৬,১৩৭	২৭,৯৯,৬৯,০০০/-	৯৭%
৮	২০১৫-১৬	১৩	২৮,৭৫,৬৮,০০০/-	৩৫৯৪৬	২৮,৫৩,৪৭,২০০/-	৯৮.২১%
৯	২০১৬-২০১৭	১৩	১৫,৮২,৯৬,০০০/-	১৯,৭৮৭	-	কাজ শুরু হয়েছে

৬. ব্রিজ কালর্ভাট নির্মাণ (১২ মিটার পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	অর্থবছর	উপজেলা/ পৌরসভার সংখ্যা	বরাদ্দকৃত নগদ টাকা	গৃহীত প্রকল্প	ব্যয়কৃত নগদ টাকা	কাজের অগ্রগতি
১	২০০৮-০৯	১২	১,১৫,০৬,৭৩৭/-	১২ টি	১,১৫,০৬,৭৩৭/-	১০০%
২	২০০৯-১০	১২	২,২৩,৭৭,২৪০/-	১২ টি	২,২৩,৭৭,২৪০/-	১০০%
৩	২০১০-১১	১২	২,২৭,৩৩,২৬২/-	১২ টি	২,২৭,৩৩,২৬২/-	১০০%
৪	২০১১-১২	১২	২,৮১,৯৮,২৩৬/-	১৪ টি	২,৮১,৯৮,২৩৬/-	১০০%
৫	২০১২-১৩	১২	৫,৪১,৫২,৩৭৫/-	২৬ টি	৫,৪১,৫২,৩৭৫/-	১০০%
৬	২০১৩-১৪	১২	৮,৪০,৫২,১০২/-	৩৭ টি	৮,৪০,৫২,১০২	১০০%
৭	২০১৪-১৫	১২	৯,৫৩,৮৯,৭২৫/-	৪০ টি	৯,৫৩,৮৯,৭২৫/-	১০০%
৮	২০১৫-১৬	১৩	৩,৯৮,০২,৩০০/-	১৮ টি	৩,৯৮,০২,৩০০/-	১০০%
৯	২০১৬-১৭	১৩		২৩৫ টি		প্রক্রিয়াধীন

৭. ভিজিএফ কর্মসূচি

ক্রমিক নং	অর্থবছর	উপজেলা/ পৌরভার সংখ্যা	বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য মে.টন	কার্ড সংখ্যা	ব্যয়কৃত খাদ্যশস্য মে. টন	কাজের অগ্রগতি
১	২০০৮-০৯	১২ +৪	১৪৩৭১.৮৭৫	১,৯৬,৮৭৫	১৪৩৭১.৮৭৫	১০০%
২	২০০৯-১০	১২ +৪	৪৩২৩.৮৯০	২২১৩৮৯	৪৩২৩.৮৯০	১০০%
৩	২০১০-১১	১২ +৪	১৫৫৩.৪৯০	৭৮,৫৩৭	১৫৫৩.৪৯০	১০০%
৪	২০১১-১২	১২ +৪	২৭৪১.০০০	১,৬৭,১০০	২৭৪১.০০০	১০০%
৫	২০১২-১৩	১২ +৪	৩১৩৬.৫২০	১,৫৬,৮২৬	৩১৩৬.৫২০	১০০%
৬	২০১৩-১৪	১২ +৪	২৭৮৩.৪২০	২,৭৮,৩৪২	২৭৮৩.৪২০	১০০%
৭	২০১৪-১৫	১২ +৪	৬০৭.৫৮০	৬০,৭৫৮	৬০৭.৫৮০	১০০%
৮	২০১৫-১৬	১৩ +৪	১২১২.৭৪০	৬০,৬৩৭	১২১২.৭৪০	১০০%
৯	২০১৬-২০১৭	১৩+৪	৬০৬.৩৭০	৬০,৬৩৭	৬০৬.৩৭০	১০০%

বিএডিসি (সেচ)

ক্র. নং	প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম	২০১৬-১৭ অর্থবছর		
		সংখ্যা/পরিমাণ	অর্থের পরিমাণ (লাখ টাকায়)	অগ্রগতি (%)
০১	খাল পুনর্খনন	২২ কি.মি.	২৫০.০০	২০%
০২	সেচ প্রকল্পের বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	২৫ টি	৭৫.০০	১৫%
০৩	৫-কিউসেক বৈদ্যুতিক মটর-পাম্প সেটসহ ট্রান্সফরমার ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ (এলএলপি)	২৫ টি	১৬২.৫০	১০০%
০৪	৫-কিউসেক বৈদ্যুতিক পাম্পের হেডার ট্যাংকসহ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (এলএলপি)	০৯ টি	১০৮.০০	৪০%
০৫	২-কিউসেক বৈদ্যুতিক পাম্পের হেডার ট্যাংকসহ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (এলএলপি)	০১ টি	১০.৫০	৭০%
০৬	মাঝারি আকারের ২/৩-ভেন্ট ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার নির্মাণ	০২ টি	৯৬.০০	-
০৭	বক্স কালভার্ট নির্মাণ	০৪ টি	১৫.০০	৭০%
০৮	ফোর্স মোড নলকূপ স্থাপন	০২ টি	১০০.০০	৫০%
০৯	সোলার ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন	০২ টি	১০০.০০	৫০%
১০	এলএলপি সেচ যন্ত্রের ভাড়া/সেচচার্জ আদায়	১৫০ টি	১৪.৭৫	৪০%
১১	গভীর নলকূপের ভাড়া/সেচচার্জ আদায়	০৩ টি	০.৭০৫	-

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণী:

ক্র. নং	প্রকল্প/ কাযর্ক্রমের নাম	অর্থের পরিমাণ (লাখ টাকায়)	অগ্রগতি	মন্তব্য
১	বিসিক শিল্প নগরী, গোটাটিকর, সিলেটের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	১৯.৯৫	১০০%	-
২	বিসিক শিল্প নগরী, গোটাটিকর, সিলেটের কালভার্ট ও রাস্তা উঁচুকরণ ও পুনর্নির্মাণ	২৩.৯৫	১০০%	-
৩	বিসিক শিল্প নগরী, গোটাটিকর, সিলেটের প্রধান ফটক ও প্রশাসনিক এলাকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৭.৯৩	১০০%	-
৪	বিসিক শিল্প নগরী, খাদিমনগর, সিলেটের গভীর নলকূপ সংস্কার	৪.৭৮	১০০%	-
৫	বিসিক শিল্প নগরী, গোটাটিকর, সিলেটের ড্রেন পুনর্নির্মাণ	৬.৬৫	১০০%	-
৬	বিসিক শিল্প নগরী, খাদিমনগর, সিলেটের পাম্প মেশিন মেরামত	৪.৫৩	১০০%	-
৭	বিসিক শিল্প নগরী, খাদিমনগর, সিলেটের রাস্তা মেরামত	২০.০০	১০০%	-
৮	বিসিক শিল্প নগরী, গোটাটিকর, সিলেটের রাস্তা ও ড্রেন মেরামত	২৫.০০	১০০%	-
	মোট =	১১২.৭৯		

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আজম, মো. আলী, বি.এ	:	মৌলবি আবদুল করিমের জীবন, কলকাতা, ১৯৩৯;
আজরফ, দেওয়ান মোহাম্মদ	:	সিলেটে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৫;
আজাদ, আল	:	একাত্তরের সিলেট: অন্যরকম যুদ্ধ, সিলেট, ১৯৯৮;
আজিজ, মো. আবদুল	:	সিলেট: জনমানস ও অর্থনীতি, সিলেট, ১৯৯৪;
	:	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সিলেট, সিলেট, ২০১৪;
	:	কালের যাত্রার ধ্বনি, সিলেট, ২০০৮;
	:	মুরারিচাঁদ কলেজের ইতিকথা (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত), সিলেট, ২০১৪;
	:	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সিলেট, চৈতন্য প্রকাশনা, সিলেট, ২০১৪
আজিজ, মো. আব্দুল ও অন্যান্য (সম্পাদিত)	:	বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, সিলেট, ১৯৯৭;
	:	বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, সিলেট, ২০০৬;
আলী, মুহম্মদ আসাদ্দর	:	চর্যাপদে সিলেটি ভাষা, লন্ডন, ১৯৯৩;
	:	ছিলোটি ভাষা, সিলেট : ১৯৯৮;
	:	আসাদ্দর রচনাসমগ্র : দ্বিতীয় খণ্ড, সিলেট , ২০০৩;
	:	আসাদ্দর রচনাসমগ্র ৩য় খণ্ড, সিলেট, ২০০৩;
	:	চর্যাপদে সিলেটী ভাষা; সিলেট, ১৯৯৩;
	:	লোকসাহিত্যে জালালাবাদ, সিলেট, ১৯৯৫;
আলী, সৈয়দ মর্তুজা	:	‘চর্যাপদের ভাষা’ (প্রবন্ধ) সাহিত্য পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাবি, ১৩৭০;
	:	হযরত শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৮;
আলী, সৈয়দ মুজতবা	:	‘সিলেটী’ (প্রবন্ধ), পরিক্রম, ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা (মাঘ ১৩৬৯), ১৯৬২;

আহমেদ, তোফায়েল : লোকশিল্প এলবাম, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪;

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন (সম্পাদিত) : সিলেট : ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা, ১৯৯৯;

আহমদ, মোহাম্মদ ফারুক : *মুক্তিযুদ্ধে সিলেট, বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,* বৃহত্তর সিলেট ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ, সিলেট, ২০০৬;

ইসলাম, নূরুল : প্রবাসীর কথা, সিলেট, ১৯৮৯

ইসলাম, মযহারুল : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ঢাকা, ১৯৭৪;

ইসলাম, রফিকুল : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকা, ১৯৮১;

: বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর ৫, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০৬;

ইসলাম, সিরাজুল : বাংলার ইতিহাস, ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ঢাকা, ১৯৮৪;

উমর, বদরুদ্দীন : পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, ঢাকা-১৯৭০;

এলাহী, শেখ ফজলে : মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ জেলা, ঢাকা, ২০১১;

কর, সুবীর : বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস, কলকাতা : ১৯৯৯;

কাদির, এস. এম. গোলাম : সিলেটী নাগরী লিপি: ভাষা ও সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯৯;

কামাল, মেসবাহ ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭;

কামাল, সৈয়দ মোস্তফা : সিলেট বিভাগের পরিচিতি, সিলেট, ২০০৪;

খান, এ. টি. এম. জিল্লুর রহমান (সম্পাদিত) : জেলা পরিক্রমা, সিলেট, ১৯৯১-৯২;

খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদিত) : বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫;

খান, শামসুজ্জামান : স্মারকগ্রন্থ ৯২, জালালাবাদ লোক সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৮;

গাইন, ফিলিপ (সম্পাদিত) : চা-শ্রমিকের কথা; সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা, ২০০৯;

গুপ্ত, কমলাকান্ত	:	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপূর্ব শ্রীহট্টের ভূমি রাজস্বব্যবস্থা, সিলেট, ১৯৯৬;
গুপ্তচৌধুরী, শ্রীনরেন্দ্রকুমার	:	শ্রীহট্ট-প্রতিভা, ঢাকা-১৩৬৮;
চক্রবর্তী, রতনলাল	:	সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র; ঢাকা, ১৯৯৮;
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র	:	বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সমগ্র), 'বাঙ্গালার ইতিহাস', কলকাতা, ১৯৮৬;
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার	:	বাঙালীর সংস্কৃতি; কলকাতা, ১৯৯১;
চাকমা, মঙ্গল কুমার ও অন্যান্য (সম্পাদিত)	:	বাংলাদেশের আদিবাসী : এথনোগ্রাফিক গবেষণা, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা-২০১০;
চৌধুরী, ফারুক	:	দেশদেশান্তর, ঢাকা, ১৯৯৬;
চৌধুরী, মুস্তাকীম আহমদ	:	হবিগঞ্জের ইতিহাস, সিলেট, ২০০৭;
চৌধুরী, রাগিব হোসেন	:	সিলেটের শতবর্ষের ঐতিহ্য, কেমুসাস, লন্ডন, ২০০৪;
চৌধুরী, সুজিৎ	:	শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস, প্রথম খন্ড, কলকাতা, ১৯৯২;
টিটো, সৌমিত্র দেব	:	সিলেটের শিশুসাহিত্য, বৃহত্তর সিলেট শাববীর শিশুসাহিত্য সম্মেলন স্মারক, ১৯৯৩;
তত্ত্বনিধি, অচ্যুতচরণ চৌধুরী	:	শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উত্তরাংশ, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২;
	:	শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯;
	:	শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণ (আসাম ও ঢাকা দক্ষিণ লীলা প্রসঙ্গ), কলকাতা, ২০০৮;
তরফদার, মুহাম্মদ ইসমাইল	:	ভাষা আন্দোলনে হবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ২০০০;
তাজুল, মোহাম্মদ	:	সিলেটে গণহত্যা, ঢাকা, ১৯৮৯;
	:	ভাষা আন্দোলনে সিলেট, ঢাকা, ১৯৯৪;
	:	সিলেটের যুদ্ধকথা, ঢাকা, ১৯৯৩;
	:	সিলেটের দুইশত বছরের আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৯৫;
	:	জোবায়দা খাতুন চৌধুরী: সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য, ঢাকা, ২০০৮;
	:	হেনা দাস: জীবন নিবেদিত মুক্তির প্রয়াসে,

তাজুল মোহাম্মদ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯

তাজুল, মোহাম্মদ : ভাষা আন্দোলনে সিলেট, বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, বৃহত্তর সিলেট ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ, সিলেট, ২০০৬;

দত্ত, অসীমকুমার ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : শ্রীভূমি শ্রীহট্ট, দুর্গাপুর শ্রীহট্ট সম্মিলনী, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৫;

দত্ত, বারীণ : সংগ্রামমুখর দিনগুলি, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১;

দাশ, নৃপেন্দ্রলাল : শ্রীভূমি সিলেটে রবীন্দ্রনাথ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২;

দাস, নিতাই : বাংলাদেশে শিক্ষা আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৮৯;

দাস, হেনা : স্মৃতিময় ’৭১, ঢাকা, ১৯৯১;

দে, প্রদীকুমার ও অন্যান্য : ঈষিকা (শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক স্মারক), মদনমোহন কলেজ, সিলেট, ২০১৪;

দে, বিজিতকুমার : সাহিত্য সাধনায় সিলেট (প্রবন্ধ), সিলেটকথা, সিলেট ১৯৮৬;

দেবশর্ম্মা, ভুবনমোহন : ‘সুরমোপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ’ সুবীর কর (সম্পাদিত) বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯৯;

দেব, শ্রীমতিল্ল : সাপ্তাহিক যুগের আলো, সিলেট, ১৯৪৫;

নাথান, মির্জা : বাহারীস্তান-ই, গায়বী, খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত, ঢাকা, ২০০৪;

পতাম, বুশ : খাসিয়াদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি; সিলভানুস লামিন, ঢাকা ২০০৫;

পারভেজ, আজিজুল : একাত্তরের গণহত্যা: রাজধানী থেকে বিয়ানীবাজার, ঢাকা, ২০০৯;

পালচৌধুরী, কৃষ্ণকুমার : সিলেটকথা, সিলেট, ১৯৮৬;

: ‘সিলেট, সিলেটিত্ব ও সিলেটের অহঙ্কার’ (প্রবন্ধ) শ্রীভূমি শ্রীহট্ট, দুর্গাপুর শ্রীহট্ট সম্মিলনী, কলকাতা, ১৯৯৫;

পুরাকাইত, নিখিলেশ : বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার ভৌগোলিক জরিপ, কলকাতা, ১৯৮৯;

ফাত্তাহ, আবুল ফতেহ	:	সিলেট-গীতিকা : সমাজ ও সংস্কৃতি, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫;
	:	প্রসঙ্গা: সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, (সম্পাদিত),সিলেট, ২০০৬;
	:	একাত্তরে সিলেট: স্মৃতিকথা (যৌথ সম্পাদনা), সিলেট, ১৯৯৪;
	:	সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় সিলেট (প্রবন্ধ), জেলা পরিক্রমা, জেলা তথ্য অফিস, সিলেট ১৯৯৪;
বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ	:	বাংলার লৌকিক দেবতা, কলকাতা ১৯৮৭;
বসু, শ্রীঅনাথনাথ	:	আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৩৫৩;
বদিউজ্জামান (সম্পাদিত)	:	সিলেট গীতিকা : প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৬৮;
বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (সম্পাদিত)	:	দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কোলকাতা, ১৯৮১;
বাড়াইক, পরিমল সিং	:	চা-জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভূড়ভূড়িয়া চা-বাগান, শ্রীমঙ্গল, ২০০৯;
বেগম, মালেকা	:	একাত্তরের নারী, ঢাকা, ২০০৪;
ভট্টাচার্য, আশুতোষ	:	বাংলার লোক-সংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০১০;
ভট্টাচার্য, কুমুদরঞ্জন	:	সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় শ্রীহট্টের অবদান, শিলং, ১৯৭৩;
ভট্টাচার্য, ড. অমলেন্দু	:	বরাক উপত্যকার বারমাসী গান; শিলচর, ১৯৮৪;
ভট্টাচার্য, মায়া ও করবী সেনগুপ্ত	:	যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (জীবনী), কলকাতা, ১৯৯৬;
ভূঞা, মো. হাফিজুর রহমান	:	সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমিব্যবস্থা, সিলেট ১৯৯৮;
মজুমদার, রমেশচন্দ্র	:	বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৭;
মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ	:	হারামণি, সপ্তম খণ্ড; ঢাকা, ১৯৭৮;
মনিরুজ্জামান	:	উপভাষা চর্চার ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৯৪;
মল্লিক, আজিজুর রহমান	:	বৃটিশ রাজনীতি ও বাংলার মুসলমান, ঢাকা,

		১৯৯২;
মানিক, আবদুল হামিদ	:	সিলেটে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি, সিলেট, ২০০০;
মামুন, মুনতাসীর ও রহমান, মাহবুবুর	:	স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, ঢাকা, ২০১৪;
মামুন, মুনতাসীর	:	উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদসাময়িকপত্র, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫;
মামুন, শামীম আল	:	সম্ভাবনাময় চা-শিল্প, জাতীয় ই-তথ্যকোষ, ডিসেম্বর ২০১৩;
মারাক, মণীন্দ্রনাথ	:	গারো উপজাতি: বাংলাদেশের মঙ্গোলীয় আদিবাসী, (মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫;
মুখোপাধ্যায়, প্রবীর (সম্পাদিত)	:	বাঙালির শিক্ষাচিন্তা (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত), কলকাতা, ১৪০৩;
মুহিত, আবুল মাল আবদুল	:	বাংলাদেশের জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব, ঢাকা, ২০০১;
মুস্তাফা, মজিদ (সম্পাদিত)	:	বাংলাদেশের মঙ্গোলীয় আদিবাসী, ঢাকা, ২০০৫;
মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর	:	আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, কলকাতা, ১৯৯৭;
মোহান্ত, দীপংকর	:	লোকসঙ্গীত সমীক্ষা (প্রবন্ধ), সিলেট বিভাগ, ২০১০;
	:	মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চা-শ্রমিক, ঢাকা, ২০০০;
মোহান্ত, রসময়	:	বাংলাদেশের চা, শিল্প ও শ্রম, ২০০৮;
	:	সিলেট অঞ্চলের শিক্ষাঙ্গান, অতীত ও বর্তমান, মৌলভীবাজার, ১৯৯০;
মৌলভি, মুহম্মদ মবশ্বির আলি চৌধুরী	:	তারিখে জালালি (মোস্তাক আহমাদ দীন অনূদিত), সিলেট, ২০০৩;
রহমান, ফজলুর	:	সিলেটের মাটি, সিলেটের মানুষ, সিলেট, ১৯৯১;
রহমান, মাহফুজুর	:	সিলেট অঞ্চলে নৃ-তাত্ত্বিক ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, ঢাকা, ২০০৯;
রহমান, মুহাম্মদ ফয়জুর	:	বৃটেনে বাংলাদেশী, সেন্টার ফর ইনফরমেশন এন্ড রিসার্চ, সিলেট, ১৯৯৯;

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত)	:	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮২
রহিম, ড. আব্দুর ও অন্যান্য	:	বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৭;
রায়, নীহাররঞ্জন	:	বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলকাতা, ১৯৯৩;
রায়, মৃত্যুঞ্জয়	:	বাংলার বিচিত্র ফল, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭;
রহমান, সাঈদ-উর	:	পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা, ১৯৮৩;
লজু, রফিকুর রহমান	:	শ্রীহট্ট লক্ষ্মীর হাট আনন্দের ধাম (প্রবন্ধ), দৈনিক উত্তরপূর্ব, বাংলা নববর্ষ সংখ্যা, ১৪১৫;
লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন	:	সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ঢাকা ১৩৬৮;
লিন্ডসে, রবার্ট	:	সিলেটে আমার বার বছর, আবদুল হামিদ মানিক অনূদিত, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট, ২০০৩;
শর্মা, অপূর্ব	:	সিলেটে যুদ্ধাপরাধ ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র, ইত্যাদি, গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০;
	:	মুক্তি সংগ্রামে নারী, শুদ্ধস্বর, ঢাকা, ২০১৪
	:	বীরাঙ্গনা কথা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩;
	:	চা-বাগানে গণহত্যা, ১৯৭১, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫;
	:	মুক্তিযুদ্ধে সিলেটের নারী (প্রবন্ধ), মাসিক একুশে পত্রিকা, চট্টগ্রাম, ২০১২;
	:	সিলেটের টক ফল (প্রবন্ধ), সাপ্তাহিক ২০০০, ঢাকা, ২৬ অক্টোবর ২০১২
		সংঙ্গীত ছিল তার প্রতিবাদের ভাষা (প্রবন্ধ), দৈনিক জনকন্ঠ, ১৮ এপ্রিল, ২০১৪
শর্মা, নন্দলাল	:	ফোকলোর চর্চায় সিলেট, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯;
	:	লোকসংস্কৃতি : সিলেট প্রেক্ষিত, সিলেট, ২০০৯;
	:	সিলেটের সাহিত্য : স্রষ্টা ও সৃষ্টি, সিলেট, ২০০৯;
	:	রচনাসমগ্র-১: ফোকলোর ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক, ঢাকা, ২০১৩;

শর্মা, নন্দলাল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা)	:	সিলেটের বারমাসী গান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২;
শর্ম্মণ, শ্রীহট্টবাসী	:	রাধানাথ-চরিত, (শ্রীহট্টগৌরব চরিতাবলী), কলকাতা, ১৩১৬;
শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ	:	বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৬৩;
হুসাম, শামসাদ ও মাসুম রহমান আকাশ (সম্পাদিত)	:	কালের ক্যানভাসে যারা, শেকড়ের সন্ধানে, সিলেট, ২০০২;
শীরু, মহিউদ্দিন	:	সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা, সিলেট, ১৯৯৮;
	:	সিলেটের কুটির শিল্প: বাঁশ ও বেত, সিলেট ইতিহাস ঐতিহ্য, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি ১৯৯৯;
শেরাম, এ. কে	:	বাংলাদেশের মণিপুরী : ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে; ঢাকা, ১৯৯৬;
	:	'সিলেটের দর্শনীয় স্থানসমূহ' (প্রবন্ধ) মাহবুবুজ্জামান চৌধুরী সম্পাদিত জাতীয় গ্রন্থবর্ষ ২০০২: সিলেট বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, সিলেট, ২০০২;
সরকার, দীনেশচন্দ্র	:	পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা, ১৯৮২;
সরকার, পবিত্র	:	বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, কলকাতা, ২০০৬;
সলীম, গোলাম হোসায়েন	:	রিয়াজ-উস-সালাতিন, আকবর উদ্দিন অনূদিত, ঢাকা, ১৯৭৪;
সাঈদ, আবু আল	:	আওয়ামী লীগের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১, ঢাকা, ১৯৯৩;
সাংমা, বিভা	:	গারোদের উৎসব, নৃত্য, সঙ্গীত এবং ধর্মাচার (প্রবন্ধ); আদিবাসী সংস্কৃতি (মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত), ঢাকা, ২০০৯;
সুমিত, সরকার	:	আধুনিক ভারত, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫;
সেন, সুকুমার	:	ভাষার ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৯৯৪;
সেন, সুধীর	:	বাংলা সাহিত্যে আসামের বাঙ্গালীদের অবদান,

		বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, গৌহাটি, ১৩৭৮;
হাই, মুহম্মদ আবদুল	:	সিলেটী (প্রবন্ধ) পরিক্রম, ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ১৯৬২;
হবিব, ইরফান	:	মোগল ভারতের কৃষিব্যবস্থা, কলিকাতা, ১৯৯০;
হোসেন, মোহাম্মদ আশরাফ	:	শিলহটের ইতিহাস, ঢাকা, ২০০৬;
	:	শিলহটের ইতিহাস, ১ম খন্ড, সিলেট-১৯৯০;

বিবিধ তথ্যসূত্র:

একাত্তরের বিজয়িনী, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৫ মার্চ, ২০১১;

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট, বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১২-২০১৩;

ছায়াতরু, ঊষা দাশ পুরকায়স্থ স্মৃতি রক্ষা পরিষদ, সিলেট, ২০০৮;

জেলা সমবায় কার্যালয় সিলেট-এর পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট নথি;

জেলা তথ্য অফিস সিলেট, জেলা পরিক্রমা : সিলেট, ১৯৯১-৯২;

জেলা তথ্য অফিস, সিলেট, জেলা পরিক্রমা, সিলেট, ১৯৯৪;

দেওয়ান তালেবুর রাজা ট্রাস্ট (প্রকাশিত), মিউজিয়াম অব রাজাস, রাজাকুঞ্জ, সিলেট, ২০০৬;

দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা, ১ অক্টোবর, ২০১১;

দৈনিক যুগভেরী, ৯ ডিসেম্বর, ২০১৩;

দৈনিক গ্যাস উত্তোলন, মজুদ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ পেট্রোবাংলা, ১২ জুন, ২০১৪;

প্রত্যাশা, এমসি কলেজ, সিলেট;

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ, জাতীয় সংসদ, ১৪ জুলাই, ২০১০;

প্রবাসী কল্যাণ সংস্থা বাংলাদেশ ওভারসিজ সেন্টারের ব্রুশিয়র ও প্রবাস দর্পণ ম্যাগাজিন;

৪০ বছর পূর্তি ম্যাগাজিন, সরকারি মহিলা কলেজ, সিলেট;

বাংলা উইকিপিডিয়া, সংগ্রহ ২৪ আগস্ট, ২০১৪;

বাংলাপিডিয়া, খন্ড ১০, এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩;

বাংলাপিডিয়া, খন্ড ১৩, এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২;

বাংলাদেশ গেজেট প্রথম অংশ, ৬ নভেম্বর, ২০০৩;

বার্ষিক প্রতিবেদন, পেট্রোবাংলা, ২০১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬;

বাংলাদেশের পেট্রোলিয়ামের সম্ভাবনা ও সম্পদ যাচাইয়ের চূড়ান্ত প্রতিবেদন, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, জুন, ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩১;

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩, সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা;

মাসিক কম্পিউটার জগৎ, জুন ২০১৪;

শ্রীহট্ট থেকে সিলেট, প্রকাশনায় জেলা প্রশাসন সিলেট, ২০১৩;

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সিলেট;

সর্ববৃহৎ পিট কয়লাক্ষেত্র, দৈনিক প্রথম আলো, ২০ জুন, ২০১৪;

সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা, ক্রোড়পত্র : একাদশ শেরেবাংলা কাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা, ১৯৮৩

সমবায় পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০১৩; সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত;

সম্পাদনা পরিষদ: সুহাসিনী দাস, সংবর্ধনা গ্রন্থ, সিলেট, ১৯৯৯;

Adams, Caroline	:	Across seven seas and thirteen rivers: Life stories of pioneer Sylhetti settlers in Britain, UK, 1987;
Ahmed, Qazi Kholiquzzaman, & Others	:	Remittance from Abroad for local Employment promotion, The case of Sylhet Division, ILO, UP, 1997;
Ahmad, Kamaluddin	:	' The Islamic Architechture in Assam', The Common Quest, Department of Information and Public Relations, Assam, Gauhati, 1976;
Ahmed, Sharif Uddin (Ed.)	:	Sylhet : History and Heritage, Bangladesh History Association, Dhaka, 1999;
Allen B. C., C.S.	:	Assam District Gazzetteers, Vol-ii, Sylhet, Calcutta 1905.
Arnold David	:	The new history of India, science, technology and medicine in colonial India, Cambridge University press, 2000;
Bowers, Faubian	:	The Dance in India, Newyork, 1953;
Chatterji, Suniti kumar	:	The origin and Development of the Bengali Language, Vol-I, Delhi, 1986;
Chowdhury, Alam A.B.M.S, M.S.M and Sobhan, I	:	Biodiversity of Tanguar Haor: A Ramsar Site of Bangladesh, Volume 1, IUCN Bangladesh, 2012;
Chowdhury, J. K. et al.	:	Biodiversity of Ratargul Swamp Forest, Sylhet, IUCN, Bangladesh, 2004;
Chowdhury, Munir	:	'The Language Problem in East Pakistan', International Journal of American Linguistics, Part III, vol 26, No 3, 1960.

Curiale, J.A., Covington, G.H., Shamsuddin, A.H.M., Morelos, J.A.	:	Origin of petroleum in Bangladesh: AAPG Bull, v. 86, no. 4, 2002;
C. R. Harler	:	The Culture and Marketing of Tea, Oxford University Press, London, 1956;
Das, Dilip Kumar and Alam, Khairul	:	Trees of Bangladesh, Bangladesh Forest Research Institute, Chittagong, 2009;
Das, Dilip Kumar	:	Forest Types of Bangladesh, Bulletin 6, Plant Taxonomy Series, Bangladesh Forest Research Institute, Bangladesh, 1990;
Das, Rabindra	:	The Muslims of Assam – A critical study, Bholanath College, Dubri, India;
David, Ludden	:	First boundary of Sylhet, Northern border (Source Internet), 2003;
David & Nancy Spratt.	:	The Phonology of Bangla. (Revised). England: Horsleys Green, 1987;
E.M. Lewis.	:	Principal, A head of the history and statistics of Dacca division, Calcutta 1868;
Fergusion & Chowdhury, C.A, Munier	:	The Phonemes of Bengali. Dacca, 1960;
Gait, E. A.	:	The History of Assam; Calcutta, 1905 (Reprint-1967).
	:	Census of India 1891, Assam, Vol. II. Shillong: Assam Secretariat Printing Office, 1892;
Grierson, G.A.	:	Linguistics Survey of India, Vol-v, part-1: 'Indo-Aryan family Eastern Group, 1903;
Gupta, Kamla Kanto	:	Copper Plates of Sylhet, Sylhet, 1967;
Hai, Muhammed	:	'A study of Sylheti dialect', Studies in Pakistan Linguistics: 7, 1966

Abdul.		(Shahidulla presentation volume);
Haider Ali Kabir, Rahman Laskar Maksudur and Rahman, Md Abdur	:	Reedland Integrated Social Forestry Project- An Introductory, Sylhet Forest Division, 2006;
Halder, Gopal	:	A comparative Grammar of East Bengali Dialects, Calcutta, 1986;
Harrison	:	Public health medicine in British India, an assessment of British contribution, 1998;
Hossain, Monowar and Chowdhury, Shafique Haider	:	Butterflies of Bangladesh- A Pictorial Handbook. 1st edition, Dhaka, 2011;
Hunter, W.W	:	Statistical Account of Assam, Vol.11, London, 1879;
Islam, Muinul	:	Overseas Migration from Rural Bangladesh, A micro Study, (Rural Economics Programme, Dept. of Economics, University of Chittagong, Bangladesh) 1987.
Islam, Nurul	:	Sojourners to Settlers, The Tales of Immigrant, Bangla Academy, Dhaka, 2013
Islam, N. and Islam, M.S	:	Feasibility study of construction materials of the Jaflong area of Gowainghat Upazila, Sylhet, SUST Journal of Science and Technology, Accepted Manuscript (In Press), 2014;
Jone, Tylor	:	Sketch of the Topography & Statistics of Dacca, Military orphan press, Calcutta, 1840;
Karim, Abdul	:	Corpus of the Arabic and Persian Inscription, Bangal, Dhaka-1992;
Marshal, Richard and Rahman	:	Internal Migration in Bangladesh: Characters, Drivers and Policy Issues,

Shihaab		UNDP Bangladesh, Dhaka, 2013;
Monirul M., Khan H	:	Protected Areas of Bangladesh – A Guide to Wildlife, Nishorgo Program. Bangladesh Forest Department, Dhaka, Bangladesh, 2008.
Mortimer, Robert	:	The Indus civilization (The Cambridge history of India) – University Press, 1968
Mushtaq, Muhammed Umair	:	Public health in British India; A brief account of the history of medical services and disease prevention in colonial India, Indian journal of community medicine /Vol-34/2009;
Nath, S.R.	:	Feasibility study of available georesources of Jaintia Upazila in Sylhet District, an unpublished B. Sc thesis, Department of Petroleum and Mining Engineering, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet, 2013;
Rashid, Harun Er	:	Geography of Bangladesh, University Press Limited, Dhaka, 1991;
Rizvi, S.N.H	:	Bangladesh District Gazetteer: *Sylhet*. Dacca: East Pakistan Government Press, 1970;
Shamsuddin, A. H. M., and Khan, S. I	:	Geochemical criteria of migration of natural gases in the Miocene sediments of the Bengal, Fore deep, Bangladesh: Journal of Southeast Asian Earth Sciences, vol. 5, n. 1991;
Wenger Clare and others	:	Families and Migration: Older People from South Asia, DFID, UK, 2003;

Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh, Vol. 6-13. Asiatic Society of Bangladesh, 2009.

Epigraphica Indica-XII

Epigraphica Indica-XV

IOM, Dhaka- Dynamics of Remittance Utilization in Bangladesh;

National Library of Scotland, India Papers collection. Available from: http://www.nls.uk/indiapapers/index.html;

Specimens of the Bengali and Assamese Language'. Calcutta Rept. New Delhi, 1903.

Statistical Yearbook of Bangladesh -2010/ 2012/2014, BBS, Dhaka, 2016;

Statistical Pocketbook Bangladesh -2010/ 2012/ 2014/ 2016, BBS, Dhaka;

Report of the Household Income and Expenditure Survey-2010, BBS, 2011;

Bangladesh Bank, Scheduled Banks Statistics - April - June 2013;

Census of India-1971; Language Handbook on Mother Tongues in Census; Monograph No. 10; Delhi, 29 June 1972; All India Alphabetical List;

District Statistics 2011 Sylhet, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, 2013;

Economic Census 2013, District Report, Sylhet, BBS, Dhaka, 2016

Population and Housing Census 2001, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, 2002;

Population and Housing Census 2011, National Report, Volume 4, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, 2012;

Population and Housing Census 2011, Community Report, Sylhet, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, 2013;

Wikipedia, INTERNET;

http://www.bangladesh.gov.bd;

http://www.sylhet.gov.bd;

http://esylhet.com/directory;

https://www.teachers.gov.bd;

https://www.ictinedubd.ning.com;

http://www.bbs.gov.bd

http://en.wikipedia.org/wiki/East_Indian_Railway_compuny;

http:/wiki.fibis.org/index.php?title=Begal_and_Assam_Railway;

http://www.banglavasha.com/image_gallery.php?action=browse&spot_id=197;

http://en.wikipedia.org/wiki/Osmani_International_Airport.

Yearbook of Agricultural Statistics -2014/ 2015, BBS, Dhaka, 2016;

Census of Agriculture 2008, Zila series, Sylhet, BBS, Dhaka, 2011;

District Livestock Office, Sylhet;

District Fishery Office, Sylhet;

District Agricultural Extension Office, Sylhet;

District Statistical Office, Sylhet;

ছবি

হযরত শাহ্জালাল মাজার, সিলেট

হযরত শাহ্পরাণ মাজার, সিলেট

শাহজালাল তথ্য ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত বঙ্গাবন্ধুর ম্যুরাল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক সিলেট গ্যাস ফিল্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম উদ্বোধন

মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক সিলেটে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ভবন

Prime Minister Sheikh Hasina has inaugurated and laid the foundation stones of 35 development projects in Sylhet on 30 January 2018

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট

সার্কিট হাউস, সিলেট

বিছানাকান্দি, সিলেট

জাফলং, সিলেট।

জৈন্তাবাড়ী, সিলেট।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম

লালাখাল, সিলেট ।

এম.সি কলেজ, সিলেট ।

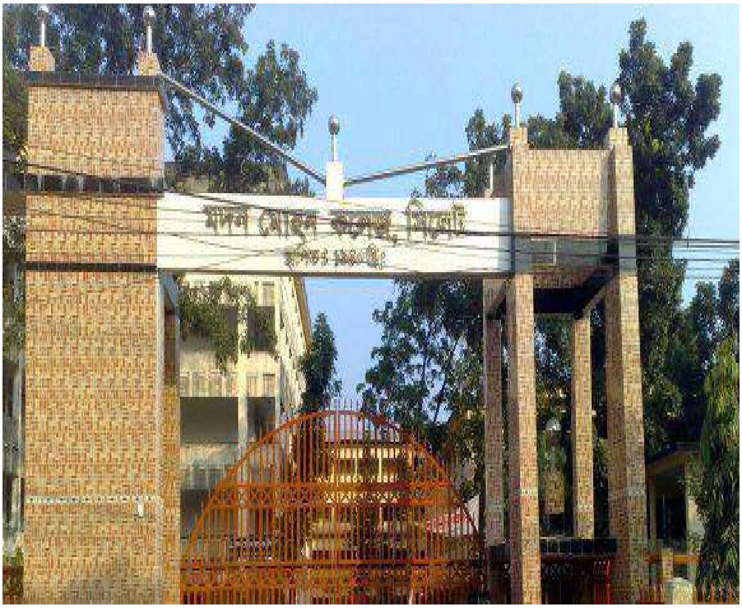

মদন মোহন কলেজ, সিলেট

মনিপুরী রাজবাড়ী, সিলেট।

হাছন রাজার স্মৃতিসমৃদ্ধ
রাজাদের জাদুঘরে
স্বাগতম
USEUM of RAJAS'
মিউজিয়াম অব রাজাস
Sponsor:
হাছন রাজার জাদুঘর, সিলে

ওসমানী জাদুঘর, সিলেট

রাতারগুল, সিলেট

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির, সিলেট

সুরমা নদী, সিলেট।

চেতনা ৭১, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

চা বাগান, সিলেট।

ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারী, সিলেট।